কোচবিহার দর্পণ।

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
—রবীন্দ্রনাথ।

অষ্টম বর্ষ, { জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২ সন, রাজশক ৪৩৬ } ২য় সংখ্যা।

উদ্বোধন।

ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম্-এ; পি-এইচ্-ডি; ডি-লিট্; সি-আই-ই।

যদি ভুলে যাও, তবে ভুলে যাও পুঞ্জিত ব্যথাভার
মোচড়ি তোমার কঠিন আঘাতে ছিঁড়ে দাও এই তার।
গ্রন্থি-বাঁধনে মথনে মথনে যাহা কিছু জমে উঠে
নিষ্ফল তার সঞ্চয়-ভার সহজে যায় সে টুটে।
তবুও চিত্ত নিঃস্ব-বিত্ত তারই পানে ছুটে যায়
কিছু নাই, তবু কুড়ায়ে কুড়ায়ে পুঞ্জ বানাতে চায়।

হোক্ সে দুঃখ, হোক্ সে বেদনা, হোক্ সে হাসির ধারা
আপন রসেতে আপনি সে ফোটে, আপনাতে হয় হারা।
ফাগুন দিনের মন্ত্রণা জাগে পল্লব দল মাঝে
তারই আনন্দ গন্ধ জাগায় পুষ্পের নব সাজে।
ফুল ফোটে আর ফুল ঝরে যায়, কে রাখে তাহার ঠিকানা
পাতা ঝরে, নব পল্লব ওঠে, কে জানে তাহার সীমানা।
তারই অন্তরে মোহন মন্ত্র নাচিছে তরুর পুরে
অজানা রাগিণী ঝঙ্কৃত হয় অন্তবিহীন সুরে।
তারই উল্লাসে কল্লোলি ওঠে যে তরুর নব ফল
বৃক্ষের রস সঞ্চরি ফেরে উল্লাসে টলমল।
দিন আসে, দিন চলে যায় দূরে, গান নাহি যায় শোনা,
প্রাণের ধর্ম্ম চঞ্চরি উঠে ফলে করে আনাগোনা।
এমনি প্রাণের শক্তি আপনা আপনি সৃষ্টি করে,
আমি অভাগ্য সঞ্চয় করি আপন ক্ষুধার তরে।

বুদ্ধিরে মম নিদ্রিত কর বুলায়ে তোমার মায়া,
প্রাণেরে আমার জাগ্রত কর অঞ্চলে টানি ছায়া।
তিল তিল করি গুঞ্জন করা পুঞ্জিত মধু মিছে,
কালের হস্ত দক্ষিণে বামে ঘুরিছে তাহার পিছে।
যে বাণী তোমার প্রাণের ধর্ম্মে আপনি বাঁচিতে পারে,
তারে ছেড়ে দাও বিশ্বের মাঝে সৃষ্টির নব পাড়ে।
শক্তি যেথায় নিজ রচনায় রচিবে নতুন সৃষ্টি,
সেথায় জননী আমারে ফিরাও, খুলে দাও নব দৃষ্টি।

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব।

ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এম্‌-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি।

জীবনের লক্ষণই আত্ম-চেতনা। স্তব্ধ অচল পাষাণ-পর্ব্বত—সেও আছে, কূলপ্লাবিনী নৃত্যচঞ্চলা নদী—সেও আছে, অনন্ত রসবৈচিত্র্যে শত ঘাতপ্রতিঘাতে জীবনের খরস্রোতে ভাসমান আমরাও আছি। কিন্তু চারিপাশের এই সকল থাকার ভিতরে আমরা যে এমন বিশেষ করিয়া আছি তাহার কারণ আমাদের অবিরাম গতি এবং সেই গতি-প্রবাহে জাগিয়া-ওঠা আত্ম-চেতনা। এই আত্ম-চেতনা জাগিয়া ওঠে নিরন্তর দ্বন্দ্বে—প্রবাহের ঘূর্ণিতে, অন্তরের সহিত বাহিরের নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাতে। যেখানে সেই ঘাত-প্রতিঘাতের তীব্র স্পন্দন নাই—সেখানে আত্ম-চেতনা নাই; যেখানে চেতনা নাই সেইখানেই বুঝিতে হইবে মানুষের প্রাণ-শক্তিও স্তিমিত হইয়া আসিতেছে।

একটা জাতীয় জীবন বা সাহিত্য সম্বন্ধেও সেই একই কথা খাটে। যে জাতি আপনার অতি ক্ষুদ্র পরিসরের ভিতরেই নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া বৃহৎ জগতের আলোড়ন বিলোড়নময় অখণ্ড জীবন-স্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, সঙ্কীর্ণ লোকাচার ও অন্ধ-সংস্কারের রন্ধ্রহীন প্রাচীরের দ্বারা বাহিরের উন্মুক্ত নির্ম্মল আলো-হাওয়া বন্ধ করিয়া দেয়, সে একদিন তাহার স্পন্দনহীন আত্ম-বিস্মৃতির ভিতরে আবিষ্কার করিয়া বসিবে তাহার শোচনীয় মৃত্যু।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাঙালী জাতির জীবন-ধারাটা চলিয়াছিল অনেকখানি এই ঘাতপ্রতিঘাতহীন স্পন্দনহীন আত্ম-বিস্মৃতির পথে, আর জাতীয় জীবনের সহিত জাতীয় সাহিত্যও চলিয়াছিল একটা তরঙ্গহীন নির্জীব স্রোতে। যে প্রেম-গীতিকার ঢেউ তুলিয়া দিয়াছিলেন বৈষ্ণব কবিগণ তাহাই শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়িয়া বাঙলা-সাহিত্যকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছিল একটানা বৈচিত্র্যহীন প্রেমবর্ণনার স্রোতে; তাহার জের চলিতেছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্য্যন্ত কবিওয়ালাদের সঙ্গীতে। সেই রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদের পর অনুবাদ, সেই মঙ্গলকাব্যের চিরাচরিত দেবদেবীগণের অসংখ্য অহৈতুক উৎপাত।

ঝিমাইয়া-পড়া এই বাঙালী জীবন ও তাহার সাহিত্যের নব জাগরণের জন্য প্রয়োজন ছিল বাহিরের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতের, আদানপ্রদানের; প্রাচীর-বেষ্টিত এই জীবনের আবছায়া ও বদ্ধ হাওয়ার ভিতরে প্রয়োজন ছিল বাহিরের আলো-বাতাসের। এই সংঘাত প্রথম আসিয়াছিল বঙ্গে মুসলমানবিজয়ের পরে; কিন্তু সেটাও স্থাবরের সহিত স্থাবরের সংঘাতের ন্যায় কোন দিকেই তেমন কোন পরিবর্ত্তন সৃষ্টি করিতে পারে নাই। বাঙালীর জীবনে, চিন্তায়, সাহিত্যে সত্যকার সংঘাত আসিয়াছিল ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে—সেই সংঘাতেই একটু একটু করিয়া উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল আমাদের জাতীয়-চেতনা; বঙ্কিমচন্দ্রের লোকোত্তর পুরুষীয় সত্তার ভিতর দিয়া সেই আত্মচেতনাই রূপগ্রহণ করিয়াছিল একটি বিশিষ্ট জাতীয়তাবোধের।

ইংরেজকে আমরা পাইয়াছিলাম শুধু মানুষ হিসাবে নয়, সমগ্র ইউরোপের চিত্ত-প্রতীক রূপে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "যুরোপের চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির পরে, ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে।" এখানে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য এই, বাহির হইতে যে আঘাত আসিল তাহাতে সে একান্ত বিমূঢ় হইয়া নিজেকে একেবারে হারাইয়া ফেলিল না—ইউরোপের বিপুল কর্মোন্মাদনাময় জীবনাদর্শকে সে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল একটা নবজীবনের প্রেরণা হিসাবে,—একটা আত্মোপলব্ধির মন্ত্র হিসাবে। তাই পাশ্চাত্ত্যের সহিত মিলনসংঘাত বাঙালীর জীবনে এবং সাহিত্যে অবিমিশ্র অমঙ্গলেরই সূচনা করে নাই,—তাহার মঙ্গলময় পরিণতিও শ্রদ্ধার্হ। ইউরোপের এই বিজাতীয় ভাববন্যাকে স্বীকরণের ভিতর দিয়াই বাঙালী সেদিন তাহার প্রাণপ্রাচুর্যের পরিচয় দিয়াছিল।

বাঙলা সাহিত্যে এই পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ফল-পুষ্পে সুসজ্জিত হইয়া প্রথম প্রকাশ পাইল পদ্যে মধুসূদনের ভিতর দিয়া এবং গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতর দিয়া। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের বহুপূর্ব হইতেই পাশ্চাত্ত্য প্রভাব আমাদের সাহিত্যের ভিতরে নানাপ্রকারে কাজ করিতেছিল ;—কিন্তু মধু-বঙ্কিমের পূর্বে ইহা কোথাও দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই,—মধু-বঙ্কিমের ভিতরেই ইহা লাভ করিয়াছিল একটি বিশিষ্ট রূপ।

বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র দীপ্তোজ্জ্বল রাজমুকুট মাথায় পরিয়াই আবির্ভূত হইয়াছিলেন একহাতে তাঁহার সৃজনী-শক্তি—অন্য হাতে কঠোর শাসন-দণ্ড। তাঁহার ভাস্বর প্রতিভার ভিতরে এমন একটা সংস্কারবিহীন স্বাধীনতাবোধ, এমন একটা শান্ত ধীর দৃঢ় অনমনীয় ব্যক্তিত্বের জয়-গৌরব, এমন একটা সুশাসন ও সুনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ছিল যে, যুগযুগান্তরের স্তূপীকৃত লোকাচার, অন্ধ বিশ্বাস এবং সঙ্কীর্ণতার কলুষ আপনা হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল; এ যেন প্রভাতের নির্মল মুক্ত আলোক-সম্পাতে বিশ্ব-প্রকৃতির স্মিতহাস্যে নব জাগরণ। বঙ্কিম যেদিন তাঁহার প্রতিভার বাহন বঙ্গদর্শন লইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন সেদিন হইতেই প্রকৃত-পক্ষে বাঙ্গলা সাহিত্যের অসীম আশাআকাঙ্ক্ষামণ্ডিত একটি নূতন যুগের সূচনা। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"বঙ্গ-দর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ', এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী-নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত-কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"

বাঙ্গলা-সাহিত্যে তখনও যিনি একরূপ একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন তিনি গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্র। আদর্শে তিনি পাশ্চাত্ত্যের প্রতি কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধান্বিত থাকিলেও রচনাশৈলীতে তিনি ছিলেন প্রাচীনপন্থী; পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন নবীন লেখকগণ তাঁহার উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি নিজে যমক-অনুপ্রাস-শ্লেষের মোহ কাটাইতে পারেন নাই। বাঙ্গলা গদ্যরীতিতে তখন চলিতেছিল কেবলই দ্বন্দ্ব ; এই সকল দ্বন্দ্বকে মিটাইয়া দিয়া বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যকে একটি বিশিষ্টরূপ দান করিবার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি

অনন্যসাধারণ প্রতিভার,—যে প্রতিভা আপনার শক্তি ও ঐশ্বর্যের ভিতরে সকল দ্বন্দ্বকে সংহরণ করিয়া সকলের সমবায়ে আবার সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিল নূতন প্রকাশভঙ্গি। বঙ্কিমচন্দ্রের এই নব প্রকাশভঙ্গির মর্যাদা এইখানে যে ইহার ভিতরে ছিল একটা স্বাতন্ত্র্যের আত্ম-গরিমা।

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব বাঙ্গালী জীবনে ও সাহিত্যে এই যে আত্ম-শক্তির উদ্বোধন করিল ইহা আমাদের জাতীয় জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। সেই যে আমরা একদিন আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলাম তাহাই আনিয়া দিয়াছে আমাদিগকে নব নব আত্ম-প্রত্যয়—তাই আজ আমরা আত্ম-শক্তি দ্বারাই আমাদের জীবন ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবার সাধনায় ব্যাপৃত। বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব আজিকার দিনে তাই আমাদের নিকটে এত উজ্জ্বলরূপে স্মরণীয়।

এক দেহে একাধিক মানুষ

বা

বহুব্যক্তিত্ব।

অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন এম-এ।

ভয় পাইবেন না। মনে করুন আপনার পরিবারভুক্ত কেহ যদি একদিন প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গিলে আপনাকে বা বাড়ীর আর কাহাকেও চিনিতে না পারে, আপনার বাড়ী ঘর এবং পরিচিত বন্ধুবান্ধব সকলই তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়া যায়, এমন কি যদি সে নিজের নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া নবজাত শিশুর মত নিতান্ত অজ্ঞান ও অসহায়বৎ ব্যবহার করিতে থাকে, তাহা হইলে আপনি যার-পর-নাই বিস্মিত হইবেন না কি? এই প্রবন্ধে এই ধরণের কয়েকটী কাহিনী বিবৃত করা হইবে। ইহার প্রত্যেকটী বাস্তব সত্য, অথচ ভৌতিক কাহিনীর মতই চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর।

মেরি রীনল্ডস্।

মেরি রীনল্ডসের পিতা আমেরিকার পেন্‌সিলভেনিয়া অঞ্চলে বসবাস করিতেছিলেন। শিশুকাল হইতেই মেরি খুব মেধাবী ও প্রখরস্মৃতিশক্তিসম্পন্না ছিল। আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সে স্কুলে ও গৃহে নানাবিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন করিবার সুযোগ লাভ করে। সে নিতান্ত শান্ত নিরীহ ও ঈষৎ বিষণ্ণ প্রকৃতির মেয়ে ছিল। গৃহের বাহিরে খেলাধূলা ও ছুটাছুটীর কাজে সময়ক্ষেপণ করা অপেক্ষা ঘরে বসিয়া

লেখাপড়া বা শিল্পকার্য্য অভ্যাস করাই সে বেশী পছন্দ করিত। আঠার বৎসর বয়সের সময় একবার মূর্চ্ছা (Hysteria) রোগের আক্রমণে তাহার দর্শন ও শ্রবণশক্তি লোপ পায়। এই অবস্থায় প্রায় তিন মাস থাকিবার পর সে তাহার নষ্ট স্বাস্থ্য ও দর্শন এবং শ্রবণশক্তি ধীরে ধীরে ফিরিয়া পায়। এই সময়ে একদিন সে প্রায় বিশ ঘণ্টা ধরিয়া গভীরভাবে নিদ্রা যায়। নিদ্রাভঙ্গের পর দেখা গেল যে তাহার মানসপট হইতে এই দীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসরের সমস্ত স্মৃতি নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। সে তাহার পিতামাতা ভাইভগ্নী বন্ধুবান্ধব বাড়ীঘর কিছুই চিনিতে পারিতেছে না। সমস্ত জগতটা তাহার নিকট একান্ত অপরিচিত ও নূতন বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। অষ্টাদশ বৎসরের পুরাতন দেহের মধ্যে সদ্যপ্রসূত শিশুর মনের ন্যায় একান্ত নূতন একটী মন লইয়া সে যেন জগতের সঙ্গে নূতন করিয়া পরিচয় ও সম্বন্ধ স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইল। আবার নূতন করিয়া তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু এবার তাহার শিক্ষা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। এই নূতন মানুষটীর স্বভাব চরিত্রেও বিলক্ষণ পার্থক্য দেখা যায়। কোথায় সেই বিষণ্ণস্বভাবা শান্তপ্রকৃতি সঙ্গবিরাগী পুরাতন মেরি রীনল্ডস্, আর কোথায় এই চঞ্চলপ্রকৃতি সদাপ্রফুল্ল আমোদপ্রিয় সঙ্গ-বিলাসী নবীনা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মেরির হাতের লেখার সহিতও এই নবীনার হস্তলিপির বিন্দুমাত্র মিল দেখা যায় নাই।

এই রূপে প্রায় ছয় সপ্তাহ কাটিবার পর একদিন সে পুনরায় দীর্ঘকালব্যাপী গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়। এই নিদ্রা হইতে যে জাগিল সে আমাদের সেই পুরাতন মেরি রীনল্ডস্, যে এই দেড়মাস যাবৎ ইহজগৎ হইতে অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে কোনও অজ্ঞাত রহস্যময় জগতে উধাও হইয়া গিয়াছিল। আর যে নূতন মানুষটী তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার পরিত্যক্ত দেহযন্ত্রটী অধিকার করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল তাহার কোনও চিহ্ন আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। জাগিয়া উঠিয়া মেরির মনে হইল যেন সে কেবল কালই ঘুমাইতে গিয়াছিল এবং ঘুমাইতে যাইবার পূর্ব্বে যে সমস্ত কাজের সংকল্প করিয়া রাখিয়াছিল এখন তাহাই সম্পন্ন করিতে উদ্যোগী হইল। তবে এই স্বল্পকাল মধ্যে তাহাদের বাড়ীতে এত পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া হইল, আর তাহার আত্মীয়স্বজনেরাই বা তাহাকে দেখিয়া এরূপ বিস্ময়বোধ করিতেছে কেন, এই সব চিন্তা করিয়া সে নিজেই কেমন অবাক হইয়া গেল।

কিন্তু মেরি রীনল্ডসের এই পুরাতন ব্যক্তিত্ব পুনরায় আবির্ভূত হইবার পর বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। ইহার কয়েক সপ্তাহ পরেই আবার একদিন অস্বাভাবিক গভীর নিদ্রার ফলে প্রথম মেরির অন্তর্ধান হইয়া তাহার স্থলে দ্বিতীয় মেরি আবির্ভূত হইল। আবির্ভূত হইয়া ইহারও মনে হইল যেন সে কেবল কালই ঘুমাইতে গিয়াছিল এবং সেই ঘুম হইতে এই জাগিল। তাহার প্রথম আবির্ভাব এবং দ্বিতীয় আবির্ভাব লইয়া যেন একটী অখণ্ড ধারাবাহিক জীবন এবং এর মধ্যে কোনও স্থান বা কালের ব্যবধান ঘটে নাই। প্রথম মেরি সম্বন্ধে এর মনে কোনও প্রকার ধারণাই ছিল না।

এইরূপে ক্রমাগত ১৫।১৬ বৎসর ধরিয়া মেরি রীনল্ডসের দেহযন্ত্র অবলম্বনে একাদিক্রমে দুইটী ব্যক্তিত্ব উপর্য্যুপরি আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। অথচ এদের মধ্যে একে অন্যের অস্তিত্ব বা প্রকৃতি সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ কিছুমাত্র জানিত না। যেন সমান্তরাল দুইটী নদীস্রোত একই সমতলে প্রবাহিত; একটী যখন চলিতে চলিতে বিস্তৃত বালুচরের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলে, অপরটী তখন

জল-কল-নিনাদে আপনার প্রকাশবার্ত্তা ঘোষণা করে। শেষদিকে দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের স্থায়িত্বকাল ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া বাড়িতে থাকে। সেই সময়ে প্রথম মেরি রীনল্ডসের মনে কখনও কখনও অত্যন্ত অস্ফুট স্বপ্নস্মৃতির মত দ্বিতীয় মেরির জীবনের কোনও কোনও ঘটনার অস্পষ্টস্মৃতি জাগিয়া উঠিত। কিন্তু সে তাহা অলীক স্বপ্ন বলিয়াই মনে করিত।

ডাঃ অস্‌বোর্ণের বর্ণিত কাহিনী।

আমেরিকার মনোবিদ্যাবিশারদ ডাঃ অস্‌বোর্ণ এই জাতীয় আর একটী কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। তবে এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব একবার মাত্র আবির্ভূত হইয়া প্রায় দুই বৎসর কাল থাকিবার পর চিরতরে অন্তর্হিত হয়। মেরি রীনল্ডসের দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের মত ইহা পুনঃ পুনঃ আত্মপ্রকাশ করে নাই।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ফিলাডেলফিয়ার সন্নিকটে একটা ছোট সহরে জনৈক মধ্যম বয়সী যুবক বাস করিত। ঐ সহরেই টিনের আসবাবপত্র প্রস্তুত করিবার একটী কারখানা স্থাপন করিয়া সে বেশ সাফল্যের সহিত কারবার করিতেছিল। একদিন রবিবার। সকাল হইতে আকাশ ঘন কুয়াসাচ্ছন্ন ছিল। যুবকটী সারা দিন গৃহে থাকিয়া শুইয়া বসিয়া কখনও বা একটু বই পড়িয়া, আবার কখনও বা নিজের শিশুদের সহিত একটু খেলাধুলা করিয়া সময় কাটায়। সন্ধ্যার সময় কিছুক্ষণের জন্য মুক্তবায়ু সেবন করিবার উদ্দেশ্যে সে বেড়াইতে বাহির হয়। কিন্তু সেই হইতেই সে একেবারে নিরুদ্দেশ। বহু অনুসন্ধানেও তাহার কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। তিমির রজনীর অন্ধকার কি তাহাকে নিঃশেষে গ্রাস করিয়া ফেলিল!

এই ঘটনার প্রায় দুই বৎসর পরে একদিন দক্ষিণ আমেরিকার কোনও সহরে একটী টিনের কারখানায় একজন শ্রমিক কাজ করিতে করিতে সহসা কাজ ছাড়িয়া বিস্ময়বিমূঢ়ের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিল—'এ কি! আমি এখানে কেন? কেমন করেই বা এলাম? এ কারখানা, এ লোকজন—এ কি সব! আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না!' প্রথমতঃ তাহার সহকর্ম্মী অন্যান্য শ্রমিকেরা ঠাট্টা মনে করিয়া তাহার কথায় কোনও গুরুত্ব দিল না। কিন্তু তাহার বিস্মিত ও ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি এবং মুখভঙ্গী দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া গেল। যে লোকটী এতদিন নীরবে অসাধারণ নিষ্ঠা ও পরিশ্রম সহকারে কারখানার কাজ করিয়া যাইতেছে তাহার এই আকস্মিক ভাবান্তর দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এ তাহার পাগল হইবার পূর্ব্বলক্ষণ মনে করিয়া তাহারা নানাপ্রকারে তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু করিলে কি হইবে। সে আর এখন তাহাদের এতদিনের সহকর্ম্মী শ্রমিকটি নহে। যে মানুষটির সহিত তাহারা এখন আলাপ করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহার সহিত ইহাদের বিন্দুমাত্র পরিচয়ও নাই। এমন কি যে অতিপরিচিত নামে তাহারা এই লোকটিকে সম্বোধন করিতেছে সে নামটীও এর নিকট অপরিচিত। বাহিরের খোলসটী এক আছে বটে, কিন্তু ভিতরের মানুষটী একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। কাজেই তাহার সহিত পুরাতন পরিচিত সুরে আলাপ করিবার চেষ্টা বৃথা।

যাহা হউক, ধীরে ধীরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া সে কারখানার মালিকের নিকট গিয়া সব কথা কহিল। উত্তর আমেরিকার কোনও সহরে তাহার বাড়ী। সে যে কেমন করিয়া এখানে আসিয়া পড়িল তাহা ভাবিয়া পাইতেছে না। সেও একটী টিনের কারখানার মালিক। কোনও রকমে তাহার নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলে সে বিশেষ উপকৃত হয়। শ্রমিক হিসাবে ঐ কারখানায়

তাহার যে পরিশ্রমিক প্রাপ্য হইয়াছিল তাহাই তাহাকে দেওয়া হয়। এবং শীঘ্রই সে দেশে ফিরিয়া আপন পরিবারের সহিত মিলিত হয়। এর পর এই লোকটির আর কোনও প্রকার মনোবিকৃতির কথা শুনা যায় নাই।

বহু ব্যক্তিত্ব—মংকুসের কথা।

অনেকের জীবনে চারি পাঁচটি করিয়া নূতন নূতন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। লণ্ডন সহরে মংকুস নামক একটী যুবকের মধ্যে একাদিক্রমে চারিটি বিভিন্ন এবং বিপরীত প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব প্রকট হইয়াছিল। মংকুস প্রথমে ছিল নিরীহ স্বভাবের কেরানী, তারপর হয় উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির বেতনভোগী সাইকেল আরোহী; তৃতীয় বারে সে সৌখীন সমাজ-প্রিয় ভদ্রলোক এবং চতুর্থ বারে বেপরোয়া দুঃসাহসিক গুণ্ডারূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই চারিবারে তাহার চারিদল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বন্ধু জুটিয়াছিল। সৌখীন ভদ্রলোক হিসাবে সে লণ্ডনসমাজের বহু মহিলার চিত্ত আকর্ষণ করে এবং তাহাদের মধ্যে চারিজন তাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে উৎসুক হন। শেষবারে যখন সে গুণ্ডাজীবন যাপন করিতেছিল তখন বহুবৎসর নৈপুণ্যের সহিত রাহাজানি করিয়া অবশেষে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। এই অবস্থায় কারাগারে তাহার শেষ জীবন অতিবাহিত হয়।

ডরিসের কাহিনী।

আমেরিকার মনোবিৎ চিকিৎসক ডাঃ ডব লিউ, এফ, প্রিন্স্ এইরূপ একটি রোগিণীর চিকিৎসা করেন। রোগিনীর নাম ছিল ডরিস্। ডরিসের কাহিনী নানাদিক দিয়া বেশ কৌতুকপ্রদ। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমরা তাহার মুহুর্মুহু ব্যক্তিত্ব বদ্লাইবার কথা বিশদভাবে উল্লেখ করিতে পারিলাম না। এই হতভাগ্য মেয়েটীর জীবনে কতকগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব মুহুর্মুহু যাতায়াত করিত। তার মধ্যে প্রকৃত ডরিস ছিল সজীব, ক্রীড়ামোদী এবং প্রফুল্লপ্রকৃতির মেয়ে। দেখিতে দেখিতে সহসা তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হইত, তাহার দৃষ্টি নির্ব্বোধের ন্যায় ফ্যাল-ফেলে হইয়া যাইত এবং তাহার আড়ষ্ট ব্যবহার ও শুষ্ক প্রাণহীন হাসিতে একটী নির্জীব ভীরু প্রকৃতির পরিচয় ফুটিয়া উঠিত। ডাঃ প্রিন্স্ এই দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বটীর নাম দিয়াছিলেন রুগ্ন ডরিস। মুহূর্ত্তের মধ্যেই আবার রুগ্ন ডরিসকে অভিভূত করিয়া একটী নূতন ব্যক্তিত্ব জাগিয়া উঠিত। রুগ্ন ডরিসের মত তাহার ব্যবহারে কোনও জড়তা ছিল না। বরং সে রীতিমত চঞ্চল এবং দুষ্ট প্রকৃতির মেয়ে ছিল। রুগ্ন ডরিসের চেহারায় একটু বয়সের পক্কতা ও কাটখোট্টা ভাব প্রকাশ পাইত। কিন্তু এই বালিকাটীর শিশুসুলভ চপল ব্যবহারে এবং শিশুর ন্যায় অকপট কথাবার্ত্তায় সকলেই বিশেষ আমোদ উপভোগ করিত। এই তৃতীয় ব্যক্তিটি মার্গারেট নামে আপনার পরিচয় দিয়াছিল। এই তিনটি সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব ছাড়া আরও দুইটী গৌণ ব্যক্তিত্ব এই দেহে আসা যাওয়া করিত। চিকিৎসক তাহাদের নাম দিয়াছিলেন ঘুমন্ত ডরিস ও ঘুমন্ত মার্গারেট। হাবভাব ও প্রকৃতিতে এদেরও বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। মাঝে মাঝে রুগ্ন ডরিসের অবস্থিতিকালেই সহসা মার্গারেট আত্মপ্রকাশ করিত। বুদ্ধিমতী মার্গারেট নির্ব্বোধ রুগ্ন ডরিসকে নানা-প্রকার শিক্ষা ও খেলাধূলার মধ্য দিয়া মানুষ করিতে চেষ্টা করিত; আবার সময়ে সময়ে তাহার উপর মুরুব্বিয়ানা করিয়া তাহাকে রীতিমত মারধর করিত। মার্গারেটের নির্য্যাতন সময়ে সময়ে রুগ্ন ডরিসের পক্ষে অসহনীয় বোধ হইত। অনেক সময় এমন হইত, যে হাত দুখানি যেন মার্গারেটের আর মুখখানি যেন রুগ্ন ডরিসের, এই সময়ে হাতের নখের আঁচড়ে মুখ ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইত।

ডাঃ প্রিন্সের চিকিৎসার ফলে ধীরে ধীরে এই সব গৌণ ব্যক্তিত্ব মিলাইয়া যায় এবং প্রকৃত ডরিস স্থায়ীভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কারণ নির্ণয়।

মনোজগতের এই যে বিস্ময়কর বিপর্য্যয়, খণ্ড প্রলয়ের মত যাহাতে শরীর বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও একটী সম্পূর্ণ মনের অস্তিত্ব অন্ততঃ সাময়িকভাবে একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়, এবং তাহার স্থলে অপর একটী অপরিচিত মন আত্মপ্রকাশ করে, ইহা কোনও ভৌতিক ব্যাপার বা ঐন্দ্রজালিক প্রকাশের মত অপ্রকৃত ঘটনা নহে। প্রাচীন কাল হইতে বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত অ.শা এই ধরণের ব্যাপারকে ভূত প্রেত অথবা কোনও দৈব শক্তির কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইত। মধ্য যুগে ইউরোপে উন্মাদ রোগ বা যে কোনও প্রকারের মনোবিকার ডাইনীদের প্রভাবেই ঘটে বলিয়া লোকের ধারণা ছিল, এবং এই প্রকার রোগে চিকিৎসার জন্য ডাইনী চিকিৎসকদের (witch-doctor) শরণাপন্ন হইত। সম্প্রতি মনোবিদ্গণ এই জাতীয় ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে ইহা একপ্রকার মানসিক ব্যাধি ছাড়া আর কিছুই নহে এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে মনের চিকিৎসার দ্বারা এই সব ব্যাধির প্রতিকার করা যায়। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ইহার কারণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে। আমরা সংক্ষেপে এসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রথমেই ব্যক্তিত্ব কি এবং ইহা কি উপাদানে গঠিত তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন। কিন্তু ব্যক্তিত্বের কোনও পরিষ্কার সংজ্ঞা দেওয়া শক্ত। তবে সাধারণ ভাবে বলা যায় যে একটী লোকের মানসিক বৃত্তি ও শক্তিসমূহের সমবেত ফলই তাহার ব্যক্তিত্ব। অমুক একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক—ইহার অর্থ এই যে তাঁহার মানসিক বৃত্তিগুলি কোনও কোনও বিষয়ে অসাধারণ উৎকর্ষলাভ করিয়াছে এবং তিনি তাঁহার জ্ঞান ও শক্তির দ্বারা বহুলোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। মানুষ জন্ম হইতেই একটা ব্যক্তিত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। ইহা ধীরে ধীরে তাহার গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে গড়িয়া উঠে। ব্যক্তিত্ববোধের মূলে থাকে একটা কেন্দ্রীয় অনুভূতি। আমরা ইহার নাম দিতে পারি অস্মিতাবোধ (self feeling)—আমি যে আছি এই অনুভূতি। আমাদের দেহযন্ত্রের ভিতরে বাহিরে, শ্বাসে প্রশ্বাসে, রক্তসঞ্চালনে, হৃৎপিণ্ড ফুস্‌ফুস্ অন্ত্র প্রভৃতির সঙ্কোচন ও প্রসারণে অবিরত যে ক্রিয়া ও স্পন্দন অনুভূত হইতেছে তাহাই এই অস্মিতাবোধের ভিত্তিস্বরূপ। এই অস্মিতাবোধকে কেন্দ্র করিয়া আবার নানা ইচ্ছা, চিন্তা, ভাব প্রবৃত্তি প্রভৃতির উদয় ও বিলয় হইতেছে, ইচ্ছা ও চিন্তার মধ্যে আবার কতগুলি কার্য্যে পরিণত হইতেছে। এই প্রকারে মানসিক বৃত্তিসমূহের উদয়, বিলয় ও পরিণতি-দ্বারা প্রত্যেক মানুষের মূলীভূত অস্মিতাবোধ এক একটা নির্দ্দিষ্ট ছাঁচে গড়িয়া উঠে। তাহার দ্বারা আবার পরবর্ত্তী ইচ্ছা চিন্তা ও কর্ম্মসমূহ নিয়ন্ত্রিত হয়। এই আত্মবোধ ও আত্মনিয়ন্ত্রণই (self consciousness and self-determination) ব্যক্তিত্বের মৌলিক উপাদান। সহজাত প্রবৃত্তি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন লোকের ব্যক্তিত্বও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে।

সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ব্যক্তিত্ববোধ একটা অখণ্ড প্রবাহের মত কাজ করিয়া থাকে। তাহাদের চিন্তা, ইচ্ছা, ভাব, কর্ম্ম প্রভৃতি সাধারণতঃ একমুখী; অন্ততঃ তাহাদের

মধ্যে বিরোধ ও অসামঞ্জস্য খুবই কম। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক মানুষের মনেই সময়ে সময়ে অল্প-বিস্তর ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির বিরোধ ঘটিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ একজন কৃপণের কথা ধরা যাক্। কৃপণের হয়ত খুব ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার ইচ্ছা হইল, অথচ ইহাতে অনেক টাকা পয়সা খরচ হইয়া যাইতে পারে। অতএব কৃপণের মনে একদিকে ধর্ম্মলাভের ইচ্ছা এবং অন্যদিকে অর্থের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি—এই দুইটী বৃত্তির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। সে এখন কি করিবে তিনটী ভিন্ন ভিন্ন উপায় এই বিরোধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে। যথা :—

(১) উভয় প্রবৃত্তির লাভ ক্ষতি বা দোষগুণ যথাযথ বিচার করিয়া যেটী ন্যায়সঙ্গত মনে হয় সেইটী গ্রহণ করা। যেমন কৃপণ হয়ত বিচার করিয়া দেখিল যে সে সারাজীবন বহুকষ্টে যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে এখন কোনও কারণে তাহা খরচ হইয়া গেলে সে মনে শান্তি পাইবে না। অতএব টাকা পয়সা খরচ করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করার তাহার প্রয়োজন নাই।

২। বিরোধী ইচ্ছা দুইটীর মধ্যে মন যেটীকে বর্জ্জন করিতে চাহিতেছে, বুদ্ধির দ্বারা তাহা বর্জ্জন করিবার পক্ষে কোনও যুক্তি আবিষ্কার করা এবং তাহার দ্বারা মনকে এবং অপরাপর সকলকে বুঝ দেওয়া, মনোবিদ্যার (Psychology) ভাষায় ইহার নাম যুক্ত্যাভাস (Rationalisation)। যেমন কৃপণ হয়ত স্থির করিল যে সে সামান্য যে কয়েক লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছে ইহা তাহার বংশধরদের জন্য পর্য্যাপ্ত নহে। অতএব তাহাদের মুখ চাহিয়া সে ইহা হইতে ধর্ম্মকার্য্যে কিছু খরচ করিতে পারে না। বংশধরদের বঞ্চিত করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিলে ভগবান তাহার উপর রুষ্ট হইবেন। ইত্যাদি।

এ স্থলে প্রকৃত কারণ হইল কৃপণ ব্যক্তির অর্থের প্রতি অহেতুক আসক্তি। কিন্তু সে বংশধরদের দোহাই দিয়া নিজের কাছে এবং অপরের কাছে এই প্রকৃত কারণ গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহা আত্ম-প্রবঞ্চনার নামান্তর মাত্র। দুর্নীতির সুনীতিকে তুষ্ট করিবার একটি কৌশল (the homage that vice pays to virtue.)।

৩। এই বিরোধ মীমাংসার আর একটী উপায় হইতেছে বিরোধী ইচ্ছা দুইটীর মধ্যে একটিকে অবদমিত (repress) করা। সহজ কথায় ইহাকে বলা যায় ধামাচাপা দেওয়া। অর্থাৎ কোনও প্রবৃত্তি বলবতী থাকা সত্ত্বেও তাহা যেন নাই এইরূপ বোধে আচরণ করা। যেমন কৃপণের অর্থের প্রতি যথেষ্ট আসক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি সে মনে করে 'আমার আর অর্থের উপর টান নাই, এবার আমি ধর্ম্মকর্ম্মে যথেচ্ছ ব্যয় করিব',—তাহা হইলে অর্থ রক্ষা করিবার প্রবৃত্তিকে অবদমন করা হইবে। কিন্তু জোর করিয়া অস্বীকার করিলেই কোনও প্রবৃত্তি চলিয়া যায় না। চেতন মনের স্তর হইতে সাময়িকভাবে অপসারিত হইয়া তাহা নির্জ্জন মনের স্তরে যাইয়া অবস্থিতি করিতে থাকে।

এই প্রকারের অবদমিত ইচ্ছা হইতে নানা প্রকার মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়। অবদমিত প্রবৃত্তিটী যদি খুব শক্তিশালী হয় তাহা হইলে অবচেতন মনে গূঢ় থাকিয়াও ইহা নানাপ্রকারে নিজেকে চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করে। এই জন্যই মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের মধ্যে নানাপ্রকার অসংলগ্ন, অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। শুচিবাই গ্রস্ত লোক পঞ্চাশবার হাত ধুইয়াও মনে করে তাহার হাত বুঝি

পরিষ্কার হইল না। তাহার সংশয় আর কিছুতেই কাটে না। তাহার এইরূপ ব্যবহার যে যুক্তিহীন ও অস্বাভাবিক তাহা সে বুঝিয়াও বোঝে না। কোনও অবদমিত প্রবৃত্তির তাড়নায় সে ঐরূপ করিতে বাধ্য হয়। এইরূপ কোনও কোনও লোকের আরশুলা টিকটিকি, কেঁচো প্রভৃতি প্রাণী হইতে ভীষণ ভয়; অথচ তাহারা নিজেরাই এরূপ অহেতুক ভয়ের কারণ খুঁজিয়া পায় না। এই জাতীয় ব্যবহার তাহাদের মূল ব্যক্তিত্বের সহিত সামঞ্জস্যহীন ও অসংলগ্ন। তাহাদের চেতন মন যে সকল ইচ্ছাকে জোর করিয়া অস্বীকার করিয়াছে সেই সকল ইচ্ছাই অবচেতন মন হইতে এই প্রকার অহেতুক ব্যবহারের ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করে। পাছে চেতন মনের নিকট ধরা পড়িয়া যায়, এই জন্য ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ। প্রশ্ন হইতে পারে যে ধরা পড়িলেই বা ভয় কি? ইহার উত্তর এই যে ধরা পড়িলে ঐ প্রবৃত্তি নিজেকে চরিতার্থ করিবার সুযোগটি হারাইবে। কারণ তাহা হইলে যে কারণে ইহা অবদমিত হইয়াছিল সেই মূল বিরোধটি আবার দেখা দিবে, এবং যতক্ষণ মনের মধ্যে দুইটি ইচ্ছার বিরোধ চলিতে থাকে ততক্ষণ উহাদের কোনটিই কার্য্যকরী হইতে পারে না।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে প্রবল ইচ্ছার অবদমনের ফলে আমাদের কোনও কোনও ব্যবহার মূল ব্যক্তিত্বের সূত্র হইতে অসংলগ্ন বা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই প্রকার ব্যবহারের অসংলগ্নতা বা বিচ্ছেদকে মনোবিদ্যার ভাষায় 'বিষঙ্গ' বা Dissociation বলে। বহুব্যক্তিত্ব এই প্রকার বিষঙ্গেরই চরম পরিণতি। বিরোধের ফলে বিষঙ্গের উৎপত্তি। একটী ইচ্ছার সহিত যেমন অপর একটী ইচ্ছার বিরোধ ঘটিতে পারে, তেমনি আবার আমাদের মূল ব্যক্তিত্বের সহিত আর একদল পরস্পর সাপেক্ষ ইচ্ছা, চিন্তা ও প্রবৃত্তির বিরোধ ঘটিতে পারে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে যদি ঐ পরস্পর সম্বদ্ধ চিন্তা, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি সমূহকে অবদমিত করা হয় তাহা হইলে তাহারা অবচেতন মনে গূঢ় থাকিয়াও অনেক সময়ে একটী স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে পরিণত হয় এবং সুযোগ পাইলেই মূল ব্যক্তিত্বকে অভিভূত করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে উপরিলিখিত প্রত্যেক কাহিনীতেই পরস্পর বিরোধী দুই বা ততোধিক ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, চিন্তা-ধারা একই লোকের মনে গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করিত। উপযুক্ত সুযোগ বুঝিয়া ইহাদের প্রত্যেকটী এক একটী স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। চতুর্থ কাহিনীর রোগী ডরিসের মনে যে গূঢ় অন্তর্দ্বন্দ্ব বর্ত্তমান ছিল তাহারই ফলে তাহার অতগুলি ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল। ডাঃ প্রিন্স্ মনোবিশ্লেষণের দ্বারা এই দ্বন্দ্বের নিরসন করেন এবং তাহার ফলে ডরিসের গৌণ ব্যক্তিত্বগুলি মিশাইয়া যায়। ডাঃ জেকিল ও মিঃ হাইড্ নামক গল্পে ইংরাজ ঔপন্যাসিক ষ্টিভেন্সন্ একই লোকের এইরূপ পরস্পর বিরোধী দুইটী স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। উদার জনপ্রিয় যশস্বী ডাঃ জেকিল এবং ক্রূরকর্ম্মা নিষ্ঠুর পশু তুল্য মিঃ হাইড্ একই লোকের সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তির মূর্ত্ত স্বরূপ।

পরিশেষে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে সাধারণ লোকের ব্যক্তিত্বের সহিত এই প্রকার একাধিক ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট লোকের কোনও প্রকারগত বৈষম্য নাই। এক হিসাবে মানুষ মাত্রই বহুব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট। অল্পবিস্তর অন্তর্বিরোধ ও অসামঞ্জস্য প্রায় প্রত্যেক লোকের চরিত্রেই দেখা যায়। আমরা অনেকেই ঘরে এক প্রকার ও বাহিরে বিপরীত আচরণ করিয়া থাকি এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন মানুষ সাজিয়া বসি। তবে স্বাভাবিক মানুষের ব্যবহারে এইরূপ অসামঞ্জস্য তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ

করে না। শুচিবাই কিংবা অহেতুক ভীতিগ্রস্ত লোকের ব্যবহারে এই অসামঞ্জস্য পরিস্ফুট। মৃগী রোগ (Hysteria) অথবা হিপ্নটিজম (Hypnotism) এর প্রভাবে কোনও কোনও লোকের ব্যবহারে সাময়িকভাবে এইরূপ অসংলগ্নতা আরও বেশী প্রকট হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বে যে বিযঙ্গ বা dissociation এর কথা বলা হইয়াছে এই সমস্ত ঘটনা তাহারই এক একটী ক্রমিক স্তরের পরিচায়ক মাত্র। এইরূপ স্তরে স্তরে অগ্রসর হইলে বিযঙ্গের সর্ব্বশেষ স্তরে আমরা পাই—এক দেহে একাধিক মানুষের অভিব্যক্তি।

পাঁঠা ও কমলাকান্ত।

শ্রীজগদীশ গুপ্ত।

কালী পূজা; বাজিতেছে কাঁসি আর ঢাক
তোলপাড় করি' সেই পাড়াটা বেবাক্।
ছেলেরা ঝুঁকেছে খুব দেখিতে প্রতিমা—
তাহাদের আনন্দেরি নাহি পরিসীমা।
শামিয়ানা লট্কানো, দূর্ব্বাগুলি চাঁচা;
মণ্ডপ উঠেছে ঠেলে প্রচুর আগাছা।
পুরুত আছেন বসি'; শরীর বিশাল—
পরিহিত বস্ত্রখানা টকটকে' লাল।
পাঁঠা আছে বাঁধা দূরে বাঁশের খুঁটিতে—
মুখে দেয় আম্রপত্র বালক দু'টিতে ··
খুব স্ফূর্ত্তি তাহাদের খাইয়ে পাঁঠায়,
বুলাইছে হাত সেই রোমশ গা-টায়।

সকলেই জানে, এই পাঁঠা হবে বলি—
কেহ কেহ স্বাদ তার ভাবিছে কেবলি,
কেবল জানে না সেই ছাগশিশু নিজে,
কেন ঐ পূজা, আর, ভবিষ্যৎ কি যে।

খাইছে সে আমপাতা নির্ব্বিকার চিত্তে·
দেখে তা' নির্ব্বোধ বলি' হাসিতে হাসিতে
কেহ বা করিছে লক্ষ্য; কেহ ম্রিয়মান—
মিছামিছি জীবটির নে'য়া হবে প্রাণ।
সসীম এ পৃথিবীরে করিতে অসীম
কমলাকান্তের আছে শাশ্বত আফিম;
দিব্যচক্ষু খুলে' যায় তারি প্রসাদাৎ—
সেই ফাঁকে খেলে ভালো প্রসন্ন'র হাত,
দুধে সে মেশায় জল ঘটি গুণে' গুণে',
গা'ল পাড়ে বটু বঠে 'বিটলে বামুনে।'

শুনিয়া কমলাকান্ত ঢাকের বাজনা—
দেখিয়া আলোক আর বহু আনাগোনা
আসিল সেখানে, চক্ষে পড়িল পাঁঠাটি,
অতীব নিরীহ জীব, ক্ষুদ্র, পরিপাটি;
চর্ব্বণ করিছে পত্র মনোযোগ দিয়া,
যেন সে ভালই আছে এখানে আসিয়া··

দাঁড়া'ল কমলাকান্ত তারি কাছে এসে—
খুলে' গেল দিব্যকর্ণ একটি নিমেষে ;
শুনিল, কহিছে পাঁঠা : "প্রণাম ঠাকুর ;
বদন বিষণ্ণ কেন ? দুঃখ করো দূর।
ফুরায়েছে আয়ু, আমি তবু নির্ব্বিকার—
ইহাই কি বর্ত্তমান বেদনা তোমার ?
তোমরা কি করো না তা' ? মরণ শিয়রে
ফেলে' অন্ন তোলো নাকি মুখে অকাতরে !
সেই অন্ন আনো ঘরে কেড়ে' কি ঠকিয়ে,
তবু কি মৃত্যুরে কেউ রেখেছ ঠেকিয়ে।
মরিতেছ লাখ লাখ হাস্যকরভাবে,
অকারণে, অনর্থক। তুমিও ত' যাবে—
সেদিন জন্মিয়া মনে ভয় ক্রোধ ক্ষোভ
ছাড়িতে পারিবে তুমি গোদুগ্ধের লোভ ?
তোমরা মরিছ ভুগে', না খেয়ে, মড়কে—
মরিয়া সটান্ যাও অনন্ত নরকে ·
আমি কাজে লাগিলাম, মায়ের সম্মুখে
প্রাণ দেব, রক্তপান করিবে মা সুখে।
পুলকে গোলোকে যাবো মাতৃ আশীর্ব্বাদে,
তৃপ্ত হবে মানবাত্মা এ-দেহের স্বাদে"...

একটু নীরব থাকি' হাসিয়া একটু
কহিল : "করিও ক্ষমা যদি লাগে কটু—
মাংস নয়, কথাগুলো। তোমাতে আমাতে
ইতর বিশেষ কতো দেখো হাতে হাতে
বাজারে লইয়া যাও তোমার ও দেহ,
এক কানা কড়ি দিয়া কিনিবে না কেহ,
কারণ, অখাদ্য তুমি, মাংস অতি হেয়,
বাজারে চাহিদা নাই, নহ তুমি ক্রেয়।
আমারে এনেছে কর্ত্তা ন'সিকায় কিনে'—
অঙ্গহীন হবে পূজা এই দেহ বিনে ;
কত দরকারী আমি ভেবে' দেখো মনে—
নিজের মূল্যও ভাবো ; কোনোই কারণে
তোমার ন'সিকে মূল্য হবে না কভুও ;
আমার অদৃষ্ট ভাবি' দুঃখ তব ভুও।
কোনো কাজে লাগিলে না, কোনো মূল্য নাই ;
প্রসন্ন'র মতো কেহ ভাবে না বালাই
আমারে কি স্বজাতিরে। প্রণাম, ঠাকুর ;
নিজেরে ভাবিয়া দুঃখ করহ প্রচুর।"
শুনিয়া পাঁঠার কথা দাতে কাটি' জিব
প্রশান্ত কমলাকান্ত হ'ল অপ্রতিভ।

তারাশঙ্করের "মন্বন্তর"

আলোচনা।

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি।

"মন্বন্তর" (জানুয়ারী, ১৯৪৪) তারাশঙ্করের আধুনিকতম রচনা। ইহাতে লেখক বোমাবর্ষণের ভয়ে আতঙ্কবিমূঢ় কলিকাতার স্বল্পকালস্থায়ী বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতাকে উপন্যাসের মধ্যে চিরন্তন রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তা'ছাড়া দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট, কঙ্কালসার নরনারীর কলিকাতায় অভিযান, খাদ্যনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থায় দরিদ্র ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর দারুণ দুর্দ্দশা, মহাত্মা গান্ধীর একবিংশতি দিবসব্যাপী অনশন উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশের অসহ উদ্বেগ ও রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা ইত্যাদি যে সমস্ত সমস্যা জনসাধারণের চিত্তকে ইদানীন্তনকালে আলোড়িত করিয়াছে সেইগুলি উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সংবাদপত্রের স্তম্ভ ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনার ক্ষেত্র তাহাদিগকে উপন্যাসের পৃষ্ঠায় স্থানান্তরিত করায় উপন্যাসের পরিধি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নূতন করিয়া ভাবিবার প্রয়োজন ঘটিয়াছে। উপন্যাসটি পড়িতে পড়িতে সন্দেহ জাগে যে ইহা কি সংবাদপত্রের ঢেঁকির সাহিত্যের পুষ্পকরথে স্বর্গারোহণ, না সাময়িক ঘটনা বিবৃতির ক্ষেত্রে সাহিত্যের অনধিকার প্রবেশ? কালের সূতিকাগার হইতে সদ্য নিষ্ক্রান্ত নবজাত শিশুকে কি সাহিত্যলোকের চিরন্তনতায় উন্নীত করা সম্ভব? যে আঘাত এখনও আমাদের শিরাস্নায়ুতে অনুরণিত হইতেছে, যে আতঙ্ক আমাদের রক্তপ্রবাহে এখনও সক্রিয়, যে হিমশীতল স্পর্শ এখনও আমাদের হৃৎস্পন্দনকে অবশ ও অসাড় করিয়া দিতেছে, তাহারা কি এত শীঘ্র এই অচির-উপলব্ধ ভয়ের মুখোস খুলিয়া আর্টিষ্টের নিকট নিজ সনাতন সত্যরূপটি উদ্‌ঘাটিত করিবে? ইহারা কি আমাদের ভীতিবিহ্বলতার ধূম্রলোক অতিক্রম করিয়া চিরন্তন সত্যের সূর্য্যালোকে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার দুরত্ব ও রূপবৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিয়াছে? অবশ্য এই ঘটনাগুলি আমাদিগকে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছে লেখকও গভীর আবেগপূর্ণ অনুভূতি ও মননশীলতার সহিত ইহাদের আলোচনা করিয়াছেন। তথাপি মনে হয় যে আমরা যাহা পাইতেছি তাহা উপন্যাসের কাঁচা মাল মাত্র, ইহার পরিণত শিল্প সৌন্দর্য্য নহে।

অবশ্য লেখকের উদ্দেশ্য যে আবেগময় তথ্যবিবৃতি তাহা নহে, এই সমস্ত তথ্যের সাহায্যে তিনি এক যুগান্তর সূচনাকারী ধ্বংসোন্মুখতার প্রতিবেশ রচনা করিতে চাহেন। এই চেষ্টার সাফল্যের উপরই উপন্যাসের সার্থকতা নির্ভর করে। এই সর্ব্বব্যাপী আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা, ভয়তাড়িত পশুর ন্যায় সমাজসংহতি হইতে দূরোৎক্ষিপ্ত নরনারীর উন্মত্ত পলায়ন, পারিবারিক বন্ধনচ্ছেদ, সমাজব্যবস্থার চরম বৈষম্যের বীভৎস আত্মপ্রকাশ, দানবীয় ধ্বংসশক্তির অবাধ তাণ্ডবলীলা একদিকে; অপরদিকে এই প্রলয়দুর্য্যোগের মধ্যে মানবের কল্যাণকামনা ও সেবাপ্রবৃত্তির উদ্বোধন, মহাত্মার কৃচ্ছ্রসাধনের ভিতর দিয়া অধ্যাত্মশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক সাম্যের উপর নূতন সমাজ ও অহিংসার উপর নব রাষ্ট্রশক্তি গঠনের মহান্ পরিকল্পনা; এই

উভয়ের সমাবেশ এক সুদূরপ্রসারী সাঙ্কেতিকতার অর্থ-গৌরব বহন করে। কিন্তু এই সাঙ্কেতিক অর্থটি কয়েকটি ব্যক্তি বা পরিবারের মানস-পরিস্থিতির মধ্যে ফুটাইয়া তোলাই ঔপন্যাসিকের বৈশিষ্ট্য, এইখানেই রাজনৈতিক আলোচনার সহিত উপন্যাসের প্রভেদ। তারাশঙ্কর এই লক্ষ্য আন্তরিকতার সহিত অনুবর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সাইরেণের ধ্বনি সর্ব্বসাধারণের মনে যে ভীতিশিহরণ জাগায় তিনি তাহাই ফুটাইয়াছেন; কিন্তু ইহা যখন ঘনায়মান অন্তর্বন্দ্বগ্যাের তীক্ষ্ণ ও সার্থক বহিঃপ্রকাশ রূপে প্রতিভাত হয় তখনই যে ইহা ঔপন্যাসিকের বিশেষভাবে আপনার বস্তু হয়, এই সত্য তিনি সর্ব্বদা স্বীকার করেন নাই। উপন্যাসের মধ্যে যে কয়েকবার সাইরেণ বাজিয়াছে তাহার মধ্যে ইহা একবার মাত্র থিয়েটারের বাত্রে কানাই ও লীলার পরস্পরের প্রতি ক্ষুব্ধ অনুযোগ-ভরা, উত্তেজিত হৃদয়বৃত্তির ও কানাইএর প্রতি গীতার অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হিংস্র মনোভাবের সহিত এক সুরে বাঁধা হইয়া উপন্যাসোচিত অসাধারণ অর্থব্যঞ্জনায় অনুরণিত হইয়াছে। শেষবার ইহা শিশুর শ্বাসরোধে মৃত্যু ঘটাইয়া ভারাক্রান্তার আতিশয্য দ্বারা আমাদের অশ্রুসিক্ত জীবনপথকে আরও কর্দমপিচ্ছিল করিয়াছে। অন্য সময় ইহা কেবলমাত্র বিপদের যান্ত্রিক সঙ্কেতের অংশ অভিনয় করিয়াছে।

"মন্বন্তর" গ্রন্থে ঔপন্যাসিক আদর্শচ্যুতির রেখাটি স্পষ্টভাবে অনুসরণ করা যায়। গ্রন্থারম্ভে সুখময় চক্রবর্ত্তীর পরিবারে ব্যাধিবিকৃত, দারিদ্র্য-পিষ্ট, অন্তর্জীর্ণ আভিজাত্য মোহের চিত্রে একটি চমৎকার উপন্যাসের বীজ উপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা অনুভব করি। এই ধ্বংসোন্মুখ পরিবারের যে বংশানুক্রমিক পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা আমাদিগকে Galsworthyর Forsyte Sagar কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বংশশাখার ধাপে ধাপে এই বিকৃতির লক্ষণ কেমন স্ফুটতর, ক্ষয়জীর্ণতা কেমন প্রকটতর হইয়া আসিতেছে তাহা সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। মেজকর্ত্তার যে আভিজাত্য গৌরব একটা স্পর্দ্ধিত, বেপরোয়া উদারতার স্তিমিত শিখায় বাঁচিয়া আছে, কানাইএর পিতার মধ্যে তাহা স্বার্থপর অক্ষম ভোগলোলুপতায় নির্ব্বাপিত হইয়াছে; আবার কানাইএর ছোট খুড়িমার মধ্যে তাহা শ্লেষব্যঙ্গ বক্রোক্তি প্রবণতায় নিষ্ঠুর আঘাত হানিয়া পৃথিবীর উপর প্রতিশোধ তুলিবার প্রবৃত্তিতে এক বিকৃত রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। এই বংশের গৃহিণীদের অন্ধ পাতিব্রত্য ও মূঢ় ভক্তি-বিহ্বলতা ইহার শোচনীয় ক্ষয়শীলতাকে করুণ অসহায়তার ম্লান গোধূলিচ্ছটায় অভিষিক্ত করিয়াছে। কানাইএর উপর মেজকর্ত্তার তীব্র রোষের অগ্ন্যুৎক্ষেপ ও ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের পর ক্ষমাস্নিগ্ধ আশীর্ব্বাদবর্ষণ তাঁহার মধ্যে যে সত্যিকার মহিমান্বিত বংশপ্রেরণা ছিল তাহার শেষ রশ্মি বিকীরণ। গীতাদের বাড়ীর আভ্যন্তরীণ অবস্থাও উপন্যাসের প্যাটার্নের মধ্যে পড়ে; কিন্তু দেবপ্রসাদের গার্হস্থ জীবনে রাজনৈতিক প্রভাবেরই প্রাধান্য। লেখক চক্রবর্ত্তীবংশের কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী উপেক্ষা করিয়া বোমাবিভ্রাটে পর্য্যুদস্ত সাধারণ নাগরিক জীবনের প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। অবশ্য চক্রবর্ত্তী বাড়ীর উপর বোমা ফেলিয়া তিনি কতকটা তাঁহার প্রথম পরিকল্পনার অনুবর্ত্তন করিয়াছেন—দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে জীবনের সুস্থ অগ্রগতির সহিত নিঃসম্পর্ক, মাকড়সার জালের মত নিজ অসুস্থ মনো-বিকারের জটিল পাকে বন্দী, অতৃপ্ত ভোগকামনার অন্তঃরুদ্ধ উত্তাপে দেহে ও মনে জীর্ণ, বংশের উপর

বিধির অমোঘ ব্যবস্থায় প্রণয়ের বজ্র নামিয়া আইসে। কিন্তু এই প্রমাণে অনিবার্য্যতা অপেক্ষা আকস্মিকতার উপাদানই বেশী। লেখক দৈনিক সংবাদপত্র হইতে সংবাদসঙ্কলনে অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া এই চমৎকার ঔপন্যাসিক সম্ভাবনাটির অকালমৃত্যু ঘটাইয়াছেন। তিনি সস্তা জনপ্রিয়তার মোহে আত্মসমর্পণ করিয়া ঔপন্যাসিকের উচ্চ চূড়া হইতে সাংবাদিকতার (Journalism) সমতলভূমিতে অবতরণ করিয়াছেন।

উপন্যাসের চরিত্রগুলির ব্যক্তিগত জীবন, সাধারণ বিপৎপাতে যে অভিন্ন যৌথ অবস্থার সৃষ্টি করে, তাহার দ্বারা অভিভূত হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে কানাই ও গীতার ব্যক্তিগত জীবন সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট। কানাই ব্যক্তিগত প্রেরণায় নিজ পরিবারের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছে; লীলার প্রতি আকর্ষণে হৃদয়াবেগ অপেক্ষা আদর্শ-সাম্যই অধিকতর কার্য্যকরী হইয়াছে। গীতার করুণ জীবনের নিদারুণ অভিজ্ঞতার স্মৃতি তাহার সমস্ত পরবর্ত্তী জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে। লীলা ও নেপীর ব্যক্তিত্ব রাজনীতি সমাজসেবার বৎচক্রস্রোতের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা পড়িয়াছে। লীলাকে আমরা ঠিক প্রেমিকারূপে উপলব্ধি করিতে পারি না—পিতার সন্দেহপরায়ণতার প্রতিবাদস্বরূপ গৃহত্যাগ করিয়া সে নিজ স্বাধীন জীবন খুঁজিয়া পায় নাই, বোমা বিস্ফোরণের ঘূর্ণাবর্ত্তে অন্ধবেগে ঘূর্ণিত হইয়াছে। বরং হীরণের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কিছু পরিচয় মিলে—কানাইএর উপর তাহার ছুরিকাঘাত এই প্রাণশক্তিরই মুহূর্ত্তের জন্য স্ফুরণ। বিজয়দার পারিবারিক জীবনের বালাই নাই—তাহার জীবনের সমস্ত শক্তিই তিনি সমাজসেবায় উৎসর্গ করিয়াছেন; কাজেই এই নিম্নতর স্তরে তিনি বেশ সজীব। এই অর্দ্ধজীবিত, প্রতিবেশের সর্ব্বগ্রাসী ও ভাবে রাহুগ্রস্ত, প্রাণীগুলির মধ্যে মেজকর্ত্তা জরাজীর্ণ সিংহের ন্যায় দৃপ্ত কেশর ফুলাইয়া দণ্ডায়মান। তাঁহার থিয়েটারী অভিনয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে সত্যকার বীরত্বের সুর লাগে। ইঁহারই প্রাণস্পন্দন লেখক মনে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন। বাকী সমস্ত চরিত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য স্তর অতিক্রম করে নাই।

তারাশঙ্করের ছোট গল্প ও বড় উপন্যাস একই সুরে গাঁথা—একই দোষগুণের আকর। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর অকৃত্রিম সরলতা চরিত্রসৃষ্টি ও জীবন সমালোচনায় তুল্যভাবে প্রকটিত। তাহার মধ্যে জটিল বিশ্লেষণের আতিশয্য নাই, তাহার চরিত্রগুলি সুস্থ, স্বাভাবিক, প্রাণশক্তি সমৃদ্ধ জীবন যাত্রার প্রতীক। তাঁহার উপন্যাসের কোন দৃশ্য অবিস্মরণীয় ভাবে মর্ম্মমূলে মুদ্রিত হয় না—সর্ব্বত্রই একটা পরিমিত, সুসমঞ্জস ভাব-গভীরতার উচ্ছ্বাস অনুভূত হয়। রাঢ় দেশের সাধারণ জীবন যাত্রার কয়েকটা অধ্যায়, বিশেষতঃ জমিদারের সামন্ত-তান্ত্রিক মনোভাব, তাঁহার উপন্যাসের পৃষ্ঠায় আর্টের চিরন্তন সৌন্দর্য্যে ধৃত হইয়াছে। তাঁহার উপন্যাসে স্ত্রীচরিত্র অপ্রধান ও প্রেম গৌণ। স্বাভাবিকভাবে সীমা লঙ্ঘন না করিয়া, অতিরঞ্জনের রং না ফলাইয়া, বিশ্লেষণের অতিশয্যে চরিত্রসঙ্গতি বিসর্জ্জন না দিয়া যে উচ্চাঙ্গের উপন্যাস লেখা সম্ভব তারাশঙ্কর তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভার স্বর্ণে রাজনৈতিক আবেদনের অপব্যবহাররূপ খাদ মিশানো আছে। এই খাদের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের উপর তাঁহার ভবিষ্যৎ আর্টের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ভর করিবে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তিনি আশু জনপ্রিয়তার মোহ অতিক্রম করিয়া চিরন্তনতার দুরূহতর অনুশীলনে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন কিনা এই প্রশ্ন সমালোচকের মনে আবর্তিত হইতে থাকিবে।

কুচবিহারী কাণ্ড।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

পাঁচপুরের পঞ্চাননের জীবনে, ১৯১৫ সালটা তিনটি ঘটনার জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। ঐ বছরেই তাহার বিয়ে হয়, ঐ বছরেই সে বি-এ ফেল করে এবং ঐ বছরের শেষের দিকেই তাহার বাবা হার্ট ফেল করিয়া মারা যান।

পাঁচপুরের মধ্যে একমাত্র পঞ্চাননই, ফেল করিলেও, বি-এর ধাপ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল—বলিতে ডিঙ্গাইতে পারে নাই। সুতরাং গ্রামের মধ্যে পঞ্চানন নামজাদা ব্যক্তি। কিন্তু তা' সত্ত্বেও, শুধু পঞ্চানন বলিলে কেহই তাহাকে চিনিবে না, যেহেতু .. ..

'যেহেতু'টা একটু বিশদভাবে বলা দরকার।

পাঁচপুর গ্রামটা নদীয়া জেলার মধ্যে। পাঁচপুর ক্রোশ আড়াই দূরে—অবস্থিত। অমনচাঙ্গার পঞ্চানন ঠাকুর ও-তল্লাটে খুব বিখ্যাত ও জাগ্রত। যাহাদের সন্তান হয় না, বা হইয়া বাঁচে না, তাহারা এই পাঁচুঠাকুরের দোর ধরিয়া 'মানত' করিলে সন্তান হয় এবং রক্ষা পায়। তাই এ-অঞ্চলে পাঁচুঠাকুরের দোর-ধরা ছেলে মেয়ের সংখ্যা অধিক—শতকরা প্রায় বিশ-পঁচিশ জন। ইহাদের সকলেরই নাম—ছেলে হইলে পঞ্চানন, মেয়ে হইলে—পঞ্চাননী। পাঁচপুরের পঞ্চাননের সংখ্যা, বর্ত্তমানে—সাত জন। সুতরাং সহজে যাহাতে সনাক্ত করিতে পারা যায়, সেজন্য প্রত্যেক পঞ্চাননের সঙ্গে সাধারণে একটি করিয়া—বিশেষণ যোগ করিয়া দিয়াছে। ইহাকে নামের নেজুড় বলা চলে না, টিকি বলা যাইতে পারে। পাঁচপুরের সপ্ত পাঁচুর টিকি যথাক্রমে—বগাই' 'নেকো' 'টেঁপো' 'মোটা' 'ন্যাটা' 'বেঁটে' 'বোকা'—অর্থাৎ, বগাই পাঁচু, নেকো পাঁচু, টেঁপো পাঁচু, মোটা পাঁচু, ন্যাটা পাঁচু, বেঁটে পাঁচু এবং সকলকে ঝক্ মারিয়া আমাদের পঞ্চানন—বোকা পাঁচু। কিন্তু এই গৌরব-আখ্যা কেন যে তাহাতে বর্ত্তিত হইয়াছিল, কোন্ সূত্রে তাহার এই টিকিকরণ হইয়াছিল তাহা নিরূপণ করা কঠিন; যেহেতু বোকামীর কোন চিহ্নই তাহার কথায় ও কাজে পাওয়া যায় না। ক্ষুদ্র সংসারের সকল দিকেই তাহার সতর্ক দৃষ্টি, সকল খুঁটিনাটির প্রতিই তাহার তীব্র লক্ষ্য। বাপ নিতাইচাঁদ মারা যাইবার পর হইতে এই দশ বৎসর কাল সংসারের বেদিকেই জল পড়িয়াছে, বুদ্ধি এবং চাতুর্য্যের সহিত সেই দিকেই সে ছাতা ধরিয়াছে। পিতার আমলে সংসারের যে-একটা বিশৃঙ্খলা ছিল, তাহার আমলে তাহা এখন যুক্ত হইয়াছে। অথচ, সে হইল বোকা-পাঁচু! গভীর জাগতিক রহস্য! বরং তাহার নাম—'কুচ্পরোয়া পাঁচু' রাখিলে মানাইত, কারণ কথাবার্ত্তার মধ্যে অনাবশ্যক ঐ শব্দটার বহু ব্যবহার, তাহার একটি মুদ্রাদোষের মধ্যে ছিল।

শ্রাবণ মাস। সারাদিনই আকাশ মেঘে আঁধার আর মাঝে মাঝে বৃষ্টির ঝর্‌ঝরাণি। ছোট্ট বৈঠকখানা ঘরটিতে একাকী বসিয়া পঞ্চানন অনেক কিছুই ভাবিতেছিল। বাহিরের বারিবর্ষণ আজ যেন তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার সকল উৎসাহ ও কল্পনাকে ভাসাইয়া দিতেছিল। তারি মধ্যে, অন্তরের অন্ধকারে বারে বারে ফুটিয়া উঠিতেছিল গৌরীর মুখখানা। গৌরী তাহার স্ত্রী, সেই সাবেক কালের স্ত্রীর মত স্ত্রী। সদাই একগলা ঘোমটা, পদে পদে অনাবশ্যক আড়ষ্টতা, বুকভরা লজ্জা, ঠাকুর দেবতার প্রতি ভক্তি, ব্রত-নিয়মের প্রতি প্রীতি, আর হাজার রকম অন্ধ-সংস্কার তাহাকে আষ্টেপৃষ্ঠে

সাপের মত জড়াইয়া বাঁধিয়াছে। আর কোনদিক দিয়াই পঞ্চাননের অশান্তি বা অতৃপ্তি ছিল না, ছিল শুধু—নামের দিক দিয়া এবং গৌরীর দিক দিয়া। পঞ্চানন এরূপ স্ত্রী চায় না। গৌরীকে সে সাবেক কালের অকর্ম্মণ্য গৃহবধূ বলিয়া মনে করে, যাহা একালে অচল। স্বামীর সে জীবনসঙ্গিনী নয়। সে চায়—জীবনসঙ্গিনী। মুক্ত জানালার ফাঁকে সিক্ত প্রকৃতির দিকে চাহিয়া থাকিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত পঞ্চানন আকাশ-পাতাল অনেক কিছুই ভাবিল। তারপর একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং মনে-মনে বলিল—"কুচ্ পরোয়া নেই! দেখা যাক—কি হয়।"

* * * *

শয়নঘরের মেজেয় বসিয়া পঞ্চানন একটা হিসাবের খাতা দেখিতেছিল আর গৌরী অদূরে চুপ করিয়া বসিয়া সেইদিকে চাহিয়াছিল।

আজ পাঁচসাতদিন হইল পঞ্চানন একখানা খাতা বাঁধিয়া গৌরীকে দিয়াছিল, সংসারের প্রাত্যহিক খরচগুলি তাহাকে সেই খাতায় লিখিতে হইবে। এতবড় একটা ভীষণ কাজ লইতে গৌরী কিছুতেই রাজী হয় নাই, কিন্তু পঞ্চানন তাহার আপত্তিতে কর্ণপাত করে নাই। পুরুষ মানুষের মত খাতায় রোজ হিসাব লেখা, গৌরীর এত লজ্জা করে! কেউ যদি কোনদিন দেখিয়া ফেলে তাহা হইলে কি লজ্জার কথা!

খাতা হইতে মাথা তুলিয়া পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করিল "পঁয়ত্রিশ আনার ক' আনা নাবে?"

বলিদানের ছাগের মত কম্পিত অন্তরে গৌরী বলিল—'পঁয়ত্রিশ? পঁয়ত্রিশের ত পাঁচ নাবে।'

'পঁয়ত্রিশের পাঁচই নাবে বটে, কিন্তু পঁয়ত্রিশ আনার ত পাঁচ আনা নাবে না; তিন আনা নাববে। আর মিছরী পাঁচ মণ নয়, পাঁচ পো।'

'ওসব হিসেব-টিসেব রাখতে আমি পারব না।'

'কুচ্ পরোয়া নেই; তোমাকে রাখতেই হবে'—বলিয়া পঞ্চানন খাতাখানা বন্ধ করিল। বাহিরের কে তাহাকে ডাকিতেছিল।

বাহিরে আসিয়া দেখিল, ও-পাড়ার জয়কালী খুড়া। খুড়া বলিলেন—'বাবাজি, একটি জিনিস আমাকে দিতে হবে।'

পঞ্চানন কহিল—'কি বলুন?'

'একটু পুরণো ঘি, বাবা। কোথাও আর পেলুম না, বাখাল বল্লে, বোকা পাঁচুর কাছে যান, পাবেন।'

পঞ্চাননের মুখখানা বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। কি কুক্ষণেই যে তাহার মা পঞ্চাননের দোর ধরিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনে মা-বাপের উপর একটা ক্রোধের ভাব জমিয়া উঠিল।

রাত্রে গৌরী পঞ্চাননকে বলিল—'দেখ আজ ক'দিন হল 'অম্বল'টা আমার বড্ড বেড়েচে; কোবরেজ মশায়ের কাছ থেকে ওষুধটা এনে দেবে?'

পঞ্চানন কহিল—'কোবরেজ মশাই বোলচেন, নিয়মে খাওয়া-দাওয়া না করলে, শুধু ওষুধে বিশেষ ফল হবে না। রোজ বেলা দেড়টা দুটোর সময় ভাত খেলে ঐ 'অম্বলে'ই তোমাকে মরতে হবে। দুটি মাছের ঝোল ভাত সকাল-সকাল তোমায় রোজ খেতে হবে।

গৌরী কহিল—'ঠাকুরের ভোগ হবে, তারপর তুমি খাবে, তবে ত আমি খেতে পারব। তার আগে কি করে খাব?'

'কুচ্‌পরোয়া নেই; তার আগে তুমি খেতে পারবে না?'

'তা কি হয়? ঠাকুরের আগে, তোমার আগে আমি কি করে খাব?'

'নিজের শরীর বাঁচাবার জন্যেও পারবে না?'

'না। বেলায় খেলেও যে ওষুধে উপকার হয়, সেই রকম ওষুধ যেন কোবরেজ মশাই দেন। তেমন ওষুধ নেই? ওষুধ ত সব রকমই থাকে।'

পঞ্চানন আর কোন কথা কহিল না।

পরদিন বাজার যাইবার পথে পিছন হইতে পঞ্চাননকে কে ডাকিল—'বোকা দা!'

অত্যন্ত অপ্রসন্ন মনে ফিরিয়া দাঁড়াইতেই নীলমণি কহিল—'কাল নরেন এসেচে। এবার দু'তিন দিন থাকবে।'

নরেন্দ্রনাথ নীলমণির ভগিনীপতি। পঞ্চাননের একজন পুরাতন বন্ধু, বেইনগব কালেজে দু'জনে একসঙ্গে পড়িত। কিন্তু দুই বন্ধুর ভাগ্য দুই জনকে বিপরীত দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। একজন পাঁচপুরের 'বোকা পাঁচু' হইয়া অশিক্ষিতা সেকেলে স্ত্রীর স্বামীরূপে পাড়াগাঁয়ে বৈচিত্র্যবিহীন জীবন কাটাইতেছে; আর একজন, নব্য-সভ্য-শিক্ষিতা স্ত্রীভাগ্যে গর্ব্বিত হইয়া, 'বিং ফিল্মে'র শ্রেষ্ঠ 'আর্টিষ্ট'রূপে সংসারে স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছে। ভাগ্যের এই বিড়ম্বনার কথা ভাবিতে ভাবিতে পঞ্চানন গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিল। বাড়ী পৌঁছাইয়া দেখিল, সদরের রোয়াকের উপর নরেন তাহার অপেক্ষায় পায়চারী করিতেছে।

পঞ্চাননের মা সেদিন বাড়ী ছিল না। ক্রোশ-তিনেক দূরে নবগ্রামের কালীবাড়ী গিয়াছিল। ভাদ্রমাসে নবগ্রামের কালীদর্শনে খুব পুণ্য, তাই গ্রামের দশ-বারজন স্ত্রীলোক মিলিয়া খুব ভোরে রওনা হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যায় সকলে ফিরিবে।

পঞ্চানন নরেনকে বাড়ীর মধ্যেই লইয়া গিয়া বসাইল এবং গৌরীকে চা ও হালুয়ার ব্যবস্থা করিতে বলিল।

নরেন চোখের চশমাটা খুলিয়া ভাল করিয়া একবার মুছিয়া লইল; তারপর একটা বর্ম্মা চুরুট ধরাইয়া কহিল "দিব্যি আছ বাবা! কোন ঝক্কি নেই। বুড়ী মরে গেলে আর কোন হাঙ্গামাই থাকবে না, তখন শুধু 'হার মেজেষ্টি' আর 'হিজ্‌ হাইনেস্‌!'—বলিয়া একটা উচ্চ হাসির রোল তুলিল। তারপর চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল—"গিন্নীর নামটি কি হ্যা? গিন্নী নিজে চা না দিয়ে গেলে কিন্তু খাচ্চি না, কিছুতেই না; তুমি বরং গিয়ে বোলে এস। কি? চুপকরে রইলে যে?"

পঞ্চানন কি একটা দুঃখের কথা ক্ষণেকের জন্য ভাবিয়া লইল; বলিল—'কুচ্‌-পরোয়া নেই, ক'দিন আছ বল।"

"আছি আজ, এবং থাকবো কালও। কৈ, যাও হে; চা কতদূর—দেখে এস।"

পঞ্চানন উঠিয়া রান্নাঘরে গেল এবং দেখিল চা ও হালুয়া তৈরী। গৌরীর একগলা ঘোমটা। ঘোমটা সরাইয়া কহিল "চা ঠাণ্ডা হোয়ে যাবে, নিয়ে যাও।"

"নিয়ে যাব কি, তুমি দিয়ে এস। ও আমার বিশেষ বন্ধু, লজ্জার ত কিছু নেই।"

'আমি দিয়ে আসবো কি গো? সে আমি কিছুতেই পারব না।"

"কুচ্‌-পরোয়া নেই; তোমাকে পারতেই হবে। মানুষের সামনে মানুষ যাবে, এতে লজ্জা করবার ত কিছু নেই। আমি যাচ্চি, তুমি নিয়ে এস।"—পঞ্চানন চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

গৌরীর গা ঘামিয়া উঠিয়াছিল, বলিল—"তুমি নিয়ে যাও, আমি কিছুতেই পারবো না, তোমার পায়ে পড়ি, তোমার…… ……"

বাধা দিয়া বিরক্তভাবে পঞ্চানন কহিল—"কোন কথা নয়, তোমাকে দিয়ে আসতেই হবে।"—পঞ্চানন চলিয়া গেল।

গৌরী—একমিনিট পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর একহাতে চায়ের বাটি, আর এক হাতে হালুয়ার ডিশ্ লইয়া এক-পা এক-পা করিয়া বাহিরের দিকে অগ্রসর হইল। মুক্ত জানালার ফাঁকে সেই অবস্থায় গৌরীকে বারান্দা দিয়া আসিতে দেখিয়া, মদন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—"আরে চমৎকার বউ তোমার হে! ভেরী নাইস্! বাঃ! বা!"

সঙ্গে-সঙ্গেই এককাণ্ড ঘটিয়া গেল। ঝন্ ঝন্ করিয়া চায়ের কাপ এবং হালুয়ার ডিশ্ গৌরীর কম্পিত হাত হইতে মেঝেয় পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল। [illegible] নিজেকে সে কোনরকমে সামলাইয়া লইয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে, টলিতে টলিতে, বারান্দায় আসিয়া [illegible] মত দেওয়াল ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

*   *   *   *

কলিকাতার একটি মেসের দ্বিতলস্থ একখানি কক্ষ। রাত্রি প্রায় একপ্রহর।

"কি হয় বিহারী বাবু?"

একখানা নভেল হইতে মাথা তুলিয়া বিহারী বাবু বলিলেন—"এই একখানা বই পড়চি।"

"কি বই ওখানা?"

"হৃদয়ে ফুটেছিলো যে কুসুম"।

"বইয়ের নাম ওই অতবড়!—চলুন, খেতে যাবেন না?"

"কুচ্ পরোয়া নেই, আপনি—অগ্রগামী হোন, আমি পশ্চাদ্‌গামী হচ্ছি"—বলিয়া বিহারী বাবু 'হৃদয়ে ফুটেছিল যে কুসুম'এ মনঃসংযোগ করিলেন; কিন্তু সোজা কথায় বলা যায়,—পঞ্চানন বইখানা আবার পড়িতে লাগিল।

প্রায় একমাস হইল পঞ্চানন কলিকাতায় আসিয়া এই মেসে অবস্থান করিতেছে। এখানে আসিয়াই সে তাহার নাম ভাঁড়াইয়াছে। তাহার ছেলেবেলার চলিত নাম পঞ্চাননকে চাপা দিয়া তাহার উপর তাহার বাপ-দেওয়া নাম 'বিহারী'র লেবেল আঁটিয়া দিয়াছে। দীর্ঘ ৩২ বৎসর পরে সংসারে পঞ্চাননের অকাল-মৃত্যু ঘটিলেও, জয়োদ্দীপ্ত বিহারীকে টিকিদানে বিধাতা কার্পণ্য করেন নাই। পাড়াগেঁয়ে পঞ্চানন কলিকাতায় আসিয়া নিজেকে বিহারীতে পরিণত করিলেও তাহার ভাগ্যে নূতন টিকিলাভ আপনা হইতেই হইয়া গেল। এই মেসে আর-এক বিহারী বাবুও ছিলেন। এই দুই বিহারী বাবুর মধ্যে প্রথম দিনকতক বিশেষভাবে ঠোকাঠুকি হইবার পর, আপনা হইতে যেন ইহার মীমাংসা হইয়া গেল। পুরাতন বিহারী বাবু বিহারী বাবুই থাকিয়া গেলেন, নূতন বিহারী বাবু হইলেন—'কুচ-বিহারী' বাবু। সহসা এতবড একটা অঘটন কে ঘটাইল, কবে ঘটাইল, কখন ঘটাইল, কেমন করিয়া ঘটাইল, তাহা নিরূপণ করা দুরূহ, কিন্তু ঘটিয়াছিল। রাত [illegible], উক্ত ভদ্রলোকটি পঞ্চাননকে ডাকিয়া নীচে খাইতে আসিলে, যে পিঁড়িটার উপর বসিতে যাইতেছিলেন, বামুন ঠাকুর সেই পিঁড়িখানাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—"ওখানায় বসবেন না, ওটা বেহারী বাবুর ঠাঁই।"

"কোন্ বেহারী বাবু?"

"কুচ্‌বেহারী বাবু।"

সুতরাং পঞ্চানন আর বোকাপাঁচু নয় বা বোকারা'ও নয়,—পঞ্চানন এখন কুচ্‌বিহারী।

কুচবিহারী দ্বিতলে যে ঘরে থাকে, সেই ঘরের কড়ু-কড়ু রাস্তার অপর পারের একখানি ঘরের জানালায় প্রায়ই একটি অবিবাহিত তরুণীকে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সময়ে এঘরের জানালার ধারেও কুচবিহারীর আবির্ভাব ঘটে। রাস্তার একটা ইলেক্‌ট্রিক পোষ্টে একখানা ঘুড়ি ছিন্নভিন্ন অবস্থায় আটকাইয়াছিল। উভয়েই বোধ হয় একই সময়ে ঐ ঘুড়িখানি দেখিতে ইচ্ছা করিত এবং ভালবাসিত, তাই একই সময়ে উভয়ে উভয়ের জানালার সামনে আসিয়া দাঁড়াইত।

জ্যামিতির একটা সূত্র আছে—'যদি দুইটি বস্তু অন্য আর একটি বস্তুর সমান হয়, তাহা হইলে উক্ত দুই বস্তুও পরস্পর সমান।' এখানে কুচবিহারী ক এবং তরুণী খ, উভয়েই যখন তুল্যভাবে ঘুড়িখানার প্রতি আকৃষ্ট, তখন ক ও খ উভয়েই সমান, অর্থাৎ উভয়েরই বাক্য সমান, ইচ্ছা সমান এবং অন্তর সমান। এবং এই সমান হওয়ার ফলে—

একদা কোন্ ফাঁকে,
জড়াল পাকে-পাকে,
এই দুটি প্রণয়ী অন্তর।

এবং বিধির বিধান অনুযায়ী, একদা এক হেমন্ত সন্ধ্যায় এই দুটি শিক্ষিত ও শিক্ষিতা অন্তর, পরিণয়ের পুণ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইল!

পাঁচপুরের পঞ্চাননের মনের মধ্যে যে দুইটি বিষয়ে অশান্তি ও অতৃপ্তি ছিল, কলিকাতায় আসিবার ফলে তাহা এইভাবে দূর হইয়া তাহাকে পরিপূর্ণ শান্তি ও তৃপ্তির অধিকারী করিয়া তুলিল।

শুভবিবাহের পর একমাস এখনো অতিবাহিত হয় নাই; নবদম্পতির মধ্যে নিম্নপ্রকার সুখালাপ হইতেছিল।

কুচবিহারী বলিল—"দেখ কুমকুম্, এখন তুমি একজনের স্ত্রী হোয়েচ; এখন তোমার এরকম যার-তার সঙ্গে এখানে সেখানে ঘোরাঘুরি অশোভন'ও বটে, অন্যায়'ও বটে। এরকম চলবে না কিন্তু।"

আই-এ পাশ শ্রীমতী কুমকুম কহিল—"আলবৎ চলবে। বিয়ে হোয়েচে বোলে, আমার অন্তরের স্বাধীনতা ত তোমার পায়ে বিসর্জ্জন দিই নি।"

"দাও নি?"

"না। আমি ত আর সেই বক্তিয়ার খিলিজির আমলের অশিক্ষিত বাঙালী স্ত্রী নয়, যেমন শুনতে পাই তোমার দেশের সেই স্ত্রী বটি। কি তার নামটি? গৌরী না? ক্ষেমঙ্করী কিংবা জগদম্বা হোলে বোধ হয় আরো মানানসই হোত।"

"কুচ্‌পরোয়া নেই, আজ সারাদিন তুমি ছিলে কোথায়?"

"আজ আমাদের 'নৃত্য-বীথিকা'র অধিবেশন ছিল। তোমায় আমারও একটা প্রশ্ন করবার আছে। তুমি আমাকে না জানিয়ে আমার 'ভ্যানিটী ব্যাগ' খুলে কি খোঁজ বলত? জানবে, that's a crime!"

"কুচ্‌পরোয়া নেই, আচ্ছা তুমি যাও।"

"আমি ত নিজেদের বাড়ীতেই আছি, যাব কোথা?"

বলা বাহুল্য যে কুচবিহারী বিবাহের পর হইতেই মেস ত্যাগ করতঃ তল্পি-তল্পা লইয়া শ্বশুরের আশ্রয়ে আসিয়া আছে এবং যে পাঁচসাত শ টাকা সে সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিল, তাহা শ্বশুরের হস্তে প্রদান করিয়াছে।

আর একদিনের আলাপ—

"কুম্‌কুম্।"

"আজ্ঞা করুন মহারাজ।"

"তোমার নামটি খুব মধুর!"

"হ্যাঁ, মধুরই মত।"

"তুমি নিজেও খুব সুন্দর; কিন্তু……."

"কিন্তু—মোটে শ'পাঁচেক টাকা সংসারে দিয়েছ, কিছু টাকা কড়ির দরকার হোয়েচে যে। আমাদের দুজনের খরচ ত অনেকই হয়। বাবার কাছে আমার বড় লজ্জা হয়।"

"কুচ্‌পরোয়া নেই। কিন্তু আমি ত এই সেদিন পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা আমাদের দু'জনের খরচের জন্য দিলুম; আবার এরি মধ্যে………"

"সে ত প্রায় মাস দেড়েক হোতে চল্লো। তার থেকে আমার কয়েকখানা সাড়ী, ব্লাউজ, আর কিছু কিছু অন্য জিনিব কিনতেই ত শ'আড়াই টাকা খরচ হোয়ে গেছে।"

ঘরের ছাদটা যেন নামিয়া আসিয়া কুচ্‌বিহারীর মাথায় চাপিয়া বসিল। কুম্‌কুম্ কহিল—"বার মাসে অন্ততঃ হাজার দুই টাকা খরচ বাবদ তোমাকে বাবার হাতে দিতে হবে ত।"

"কুচ্‌পরোয়া নেই; কিন্তু কি বলচো তুমি? দুটো লোকের জন্যে বছরে দু'হাজার টাকা।"

"তবে কি পাঁচশো টাকায় দু'জনের একবছর চলবে?"

"আজ সুশীল ডাক্তারের গাড়ী করে কোথায় গিয়েছিলে তুমি?"

"সুশীলবাবু বাবাকে দেখতে এসেছিলেন। ভদ্রতার খাতিরে তাঁকে একটু এগিয়ে দাওয়া দরকার ত?"

"এগিয়ে দিতে সারাদিনটা গেল? কুচ্‌………

"কুচ্‌ ডব্‌ নেহি প্রিয়তম। আমি তোমার জীবন রাসমঞ্চে রাসময়ী—, তুমি রাসবিহারী, কুম্‌কুমের লালিমায় সারাজীবন তোমায় রাঙিয়ে রাখবো।"

কুচ্‌বিহারী আর কোন কথা না বলিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

* * * *

আজ দুইদিন হইল কুচ্‌বিহারীর জ্বর হইয়াছে। একেলা বিছানায় শুইয়া থাকিয়া আকাশ-পাতাল অনেক কিছুই ভাবিতেছে। খাশুড়ী এক বাটি জল সাগু মাথার ধারে রাখিয়া দিয়া বলিল—"খেয়ে ফেল বাবা। মুখপোড়া গয়লার ও-মাসের দুধের দাম বাকী আছে বোলে, একেবারে পুকুরের জলগুলো শুধু ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে। তার চেয়ে এই জল সাবুই ভাল। খেয়ে ফেল বাবা, নেবু দিয়ে দিয়েছি।"

খানিক পরে বাইরে কোথাও থেকে ঘুরিয়া আসিয়া কুম্‌কুম্ ঘরে প্রবেশ করিল; কহিল—"কেমন আছ?"

"বড্ড মাথাটা ধরেচে।"

কুম্‌কুম্ তৎক্ষণাৎ দেরাজ খুলিয়া একটা অডিকলোনের শিশি বাহির করিল এবং তাহাতে নেকড়া ভিজাইয়া কুচবিহারীর কপালে পট্টি লাগাইয়া দিল।

পরদিন সমস্ত দিনটা কুম্‌কুমকে দেখিতে না পাইয়া কুচ্‌বিহারী খাশুড়ী ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—"কি জানি বাবা, তাদের আজ কিসের মজলিস হবে; এত কোরে বল্লুম, যে বাড়ীতে অসুখ, আজ আর কোথাও যাস নি, তা ………………"

সেদিন অনেক রাত্রে কুম্‌কুম্ বাড়ী ফিরিল। কুচ্‌বিহারীকে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"মাথাটা একটু টিপে দোবো?"

"না; কুচ্‌পরোয়া নেই"—বলিয়া কুচ্‌বিহারী ওদিকে পাশ ফিরিল।

সে-রাত্রে মোটেই তাহার ঘুম হইল না। সারা রাত ধরিয়া হাজার রকমের চিন্তা তাহার দুর্ব্বল দেহ-মনকে আরো অবসন্ন করিয়া তুলিল। যে তৃপ্তি ও আনন্দের মিথ্যা আশায় সে এক পথ হইতে আর এক পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখন দেখিল, এ পথের দুঃখ এবং ব্যথা নিদারুণ। সে মরিয়া হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে-সঙ্গে স্থির করিয়া ফেলিল,—"কুচ্‌পরোয়া নেই, এপথও নয়, ওপথও নয়, সন্ন্যাসী হব।"

শেষরাত্রে অতি সন্তর্পণে সে শয্যা হইতে উঠিল। দেখিল, ঝুমঝুমের গলার হার ও কাণ-পাশা জোড়া মাথার বালিশের পাশে রহিয়াছে। শয়নকালে প্রত্যহই ঝুমঝুম হার ও পাশা খুলিয়া এইভাবেই রাখিত। কুচ্‌বিহারী অতি সাবধানে জিনিষ দুইটি লইয়া, পকেটে রুমালের সঙ্গে জড়াইয়া রাখিল। তারপর নিঃশব্দে দরজার খিল খুলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। সে রাত্রে তাহার জ্বর আসে নাই।

বেলা প্রায় দশটার সময় কুচবিহারী হাওড়া ষ্টেশনে আসিল এবং বুকিং আফিসে একখানা দশটাকার নোট দিয়া বলিল—"একখানা টিকিট দিন ত?"

"কোথাকার টিকিট দেবো?"

"যেখানের হউক দিন—বদ্দিনাথ কি গয়া, আচ্ছা বেনারসেরই দিন।"

পশ্চিমের গাড়ীর তখন ঘণ্টা দেড়েক দেরী ছিল। টিকিটখানা পকেটে রাখিয়া কুচ্‌বিহারী একখানা বেঞ্চের উপর আসিয়া বসিল। আজ সন্ন্যাসের পথে পা বাড়াইবার প্রাক্কালে তাহার মনে অনেক কথা উদয় হইতে লাগিল—

"ঝুমঝুম! আই-এ, পাশ। দেখতে শুনতে বাইরে থেকে চমৎকার! কিন্তু যাক্—ও আর ভাববো না। গৌরি—গৌরি—বর্ত্তমান যুগের অনেক পেছনে পড়ে আছে! একদম সেকেলে প্যাটার্ণ। কিন্তু বেচারা একবারেই নিরীহ! ভারি লাজুক—যেন লজ্জাবতী লতা! বন-হরিণীর মত সদাই যেন সন্ত্রস্ত! অত গো-বেচারিকে নিয়ে .... .. কিন্তু .. ...কিন্তু কালনাগিনীর চেয়ে বনহরিণী হাজার গুণে ভালো। আমার অসুখ-বিসুখ করলে সঙ্গে-সঙ্গে তারও আহার নিদ্রা বন্ধ। নিজের শরীরের ভালোমন্দের দিকে একেবারেই ওর .... আর আমার ভালোর জন্য ঠাকুর-দেবতার কাছে কী মাথা ঠুকতেই পারে!"

কুচবিহারী বড় ঘড়িটার দিকে একবার চাহিয়া দেখিল; গাড়ীর এখনো অনেক দেরী। তাহার চিন্তারও বিরাম নাই ...

"বোকা পাচু! বোকা দা'! ... বিশ্রী .. ...কিন্তু মস্ত একটা আত্মীয়তার—একটা ভালোবাসার সুর ছিল ঐ ডাকের মধ্যে! যা'ক ওসব..........ঝুমঝুমরা আর আমার পাত্তাই পাবে না। বলেছি—ময়মনসিংহে দেশ; বোধ হয় একবার সেখানে খোঁজ-খবর করবে। শর্ম্মা এ দিকে বেনারস!.........মা, আমার দেখা না পেলে আর বেশী দিন বাঁচবে না। মাও মারা যাবে, গৌরিও মারা যাবে।............... গৌরি কিন্তু ...."

গাড়ী বাঁশী দিতে দিতে প্ল্যাটফরমে ঢুকিল। সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রীরা সোরগোল তুলিয়া গাড়ীর মধ্যে উঠিতে লাগিল। কুচ্‌বিহারীও উঠিয়া দাঁড়াইল। পাশে থেকে কে-একজন জিজ্ঞাসা করিল—আপনি যাবেন কোথায়?"

"বেনারস।"

"ওকি মশাই, টিকিটখানা যে ছিঁড়ে ফেললেন?"

কথার উত্তর না দিয়া বৃদ্ধ বিহারী একপা একপা করিয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিল এবং শিয়ালদ'র 'বাস' চাপিয়া বসিল।

ষ্টেশনে তখন দুই নম্বর প্ল্যাটফরমে রাণাঘাট লোক্যাল দাঁড়াইয়াছিল। তাড়াতাড়ি একখানা টিকিট কিনিয়া গাড়ীর মধ্যে আসিয়া বসিতেই, পাশের এক-জন লোক জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাবেন আপনি?"

"পাঁচপুর।"

শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন।

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ।

কবি এই রহস্যময় শ্লোকে তাঁহার অতুলনীয় প্রেম গীতিকাব্য শ্রীগীতগোবিন্দের সূচনা করিয়াছেন। আজ আটশত বৎসর ধরিয়া এই গীতিকাব্যখানি প্রেমিক ভক্ত ও সুরসিক সাহিত্যসাধকগণকে আনন্দ দান করিয়া আসিতেছে। কবির বর্ণনার বিষয় রাসলীলা। কিন্তু সূচনা শ্লোকে বর্ষার বর্ণনা নানা প্রশ্নের সৃষ্টি করিয়াছে। আটশত বৎসর ধরিয়া টীকাকার এবং ব্যাখ্যাতাগণ এই শ্লোকের নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা আজিও শেষ হয় নাই। সুতরাং আলোচনারও আবশ্যকতা ফুরায় নাই। আমিও একজন জিজ্ঞাসু। রসজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই আমার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের অবতারণা।

গত সন ১৩১৬ সালে আমার সম্পাদিত "কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সে সময় আমি এই প্রথম শ্লোকের সম্প্রদায়-সম্মত ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাহার পর দীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসর অতীত হইয়াছে। ইতি মধ্যে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন আবিষ্কারে এই শ্লোকের উপর কথঞ্চিৎ আলোক সম্পাত হওয়ায় নূতন অনুমানের অবকাশও পাওয়া গিয়াছে। এই নিবন্ধে তাহারই আলোচনা করিব।

গত সন ১৩৩০ সালের শ্রাবণ সংখ্যা "ভারতবর্ষে" ভারত প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, ডী-লীট্ মহাশয় "শ্রীজয়দেব কবি" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি "সদুক্তি কর্ণামৃত" হইতে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের "নন্দ নিদেশতঃ" শব্দের অর্থ গোপরাজ নন্দের আদেশ ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। শ্রীগীতগোবিন্দের বহু

টীকা প্রচলিত আছে। ইহার মধ্যে অসাম্প্রদায়িক টীকাও আছে। "নন্দ নিদেশত." শব্দের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন টীকাকারগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অনেকে "নন্দ নিদেশতঃ" শব্দের গোপরাজ নন্দের আদেশ অর্থও ধরিয়াছেন। আবার অনেকে এই অর্থ গ্রহণ করেন নাই। কেহ কেহ "নন্দ নিদেশতঃ" অর্থ "আনন্দ জনক সখী বাক্য" ধরিয়াছেন। আমি কোন লিখিত গ্রন্থ না পাইলেও সম্প্রদায়পরম্পরা প্রচলিত গুরুমুখী সিদ্ধান্ত অনুসারে নন্দ শব্দে বংশী অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলাম। এইরূপ অর্থ গ্রহণে কোন বাধা না থাকিলেও শ্লোকটীর দৃশ্যতঃ আক্ষরিক অর্থ যে গোপরাজ নন্দের আদেশ এবং ইহার অধ্যাত্মিক অর্থের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই ডক্টর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ইহাই বক্তব্য। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্ধৃত শ্লোক দুইটি শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী সংকলিত পদ্যাবলীর মধ্যে আছে। পদ্যাবলীতে দুইটী শ্লোকই সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের নামে আছে। কিন্তু সদুক্তিকর্ণামৃতে একটি শ্লোকের রচয়িতা রূপে যুবরাজ কেশব সেনের নাম পাওয়া যাইতেছে। শ্লোক দুইটী এই—

লক্ষ্মণ সেনের শ্লোক—(পদ্যাবলী ২০৩ সংখ্যকশ্লোক)

কৃষ্ণ ত্বদ্ বনমালয়া সহকৃতং কেনাহপি কুঞ্জোদরে
গোপীকুন্তলবর্হদাম তদিদং প্রাপ্তং ময়া গৃহ্যতাম্।
ইত্থং দুগ্ধমুখেন গোপশিশুনাখ্যাতে ত্রপানম্রয়ো
রাধা মাধবয়ো র্জয়ন্তি বলিত স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ॥

কৃষ্ণ, আমি কুঞ্জ মধ্যে গোপীকুন্তল (কোন গোপকিশোরীর দীর্ঘকেশ) লগ্ন ময়ূরচন্দ্রিমামাল্যযুক্ত তোমার এই বনমালা প্রাপ্ত হইয়াছি, গ্রহণ কর। কোন দুগ্ধমুখ (অজ্ঞান) গোপশিশুর মুখে এই কথা শ্রবণ জনিত রাধামাধবের লজ্জাবিনম্র স্মেরালস দৃষ্টির জয় হউক। অর্থাৎ এই কথা শুনিয়া রাধামাধবের "চক্ষুস্থির" হইয়াছিল। সেই লজ্জানত ঈষৎহাস্যযুক্ত দৃষ্টির জয় হউক।

কেশব সেনের রচিত শ্লোক—(পদ্যাবলী সং ২০৭)

আহূতাদ্য ময়োৎসবে নিশি গৃহং শূন্যং বিমুচ্যাগতা
ক্ষীবঃ প্রেষ্যজনঃ কথং কুলবধূরেকাকিনী যাস্যতি।
বৎস ত্বং তদিমাং নয়ালয়ম্ ইতি শ্রুত্বা যশোদাগিরো
রাধামাধবয়ো র্জয়ন্তি মধুরস্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ॥

রাধা আমার উৎসবে আমন্ত্রিতা হইয়া আসিয়াছেন। গৃহে দ্বিতীয় কেহ নাই। কুলবধূর একাকিনী যাওয়া উচিত নহে। এদিকে ভৃত্যগণ মধুপানে মত্ত হইয়া রহিয়াছে। অতএব কৃষ্ণ, তুমি ইহাকে গৃহে রাখিয়া আইস। শ্রীযুক্তা যশোদার এই কথা শুনিয়া রাধামাধবের যে মৃদুহাস্যমন্থর মধুর দৃষ্টি বিকশিত হইয়াছিল, সেই দৃষ্টির জয় হউক।

সম্রাট ও যুবরাজ রচিত শ্লোক দুইটী হইতে এই অনুমান স্বাভাবিক যে কবি জয়দেবরচিত শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক পাঠে আনন্দিত হইয়া পিতা পুত্রে ঐ শ্লোক দুইটী লিখিয়া কবিকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। এবং দ্বিতীয় শ্লোকটী জয়দেবরচিত শ্লোকের প্রতিশ্লোক বা প্রত্যুত্তর। কবিরচিত প্রথম শ্লোকের অর্থ—"আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, বনভূমিও তমালতরুনিকরে শ্যামায়মান হইয়াছে। তাহাতে আবার রাত্রি কাল। কৃষ্ণ ভয় পাইয়াছে, রাধে, তুমি তাহাকে লইয়া গৃহে যাও, এইরূপ নন্দ নিদেশে গৃহ গমনোদ্যত রাধামাধবের যমুনাতীরবর্ত্তী প্রতি পথতরু কুঞ্জতলের নির্জ্জন কেলি জয়যুক্ত হউক!"

কেশব সেন রচিত শ্লোকের "যশোদাগিরো" শব্দের যেমন অন্য অর্থ গ্রহণ করা চলে না, সেইরূপ কবি

রচিত "মন্দ নিদেশতঃ" শব্দেরও অন্য অর্থ অপব্যাখ্যাই হইবে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্থূলতঃ ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে অনুমান করিয়াছেন সম্রাট হয়তো 'রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি' শ্লোকাংশ পাদ পূরণার্থ সভাসদ্‌গণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কবি জয়দেব তাহারই প্রতি উত্তরে শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, এবং পরে সম্রাট ও যুবরাজ সদুক্তি-কর্ণামৃত ধৃত শ্লোক দুইটী রচনা পূর্ব্বক অন্যরূপেও যে 'রাধা মাধবয়োর্জয়ন্তি' শ্লোকাংশের পাদপূরণ করা যায় এইরূপ দেখাইয়াছিলেন, এই অনুমানের কোন ভিত্তি আছে বলিয়া আমি মনে করি না। কেন কবি না তাহা বলিবার পূর্ব্বে শ্রীগীতগোবিন্দ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক।

পূর্ব্বে কেহ কেহ এই মত পোষণ করিতেন যে শ্রীগীতগোবিন্দের গান কয়েকটী কবি জয়দেব রচনা করিয়াছিলেন। পরে কেহ শ্লোকগুলি রচনা পূর্ব্বক গানগুলির সংযোগসূত্ররূপে যোগ দিয়া সম্পূর্ণ কাব্য সঙ্কলন করেন অর্থাৎ শ্রীগীতগোবিন্দকে কাব্যের আকার দান করেন। এরূপ অনুমানের একতম কারণ গানগুলি অতি সুললিত ভাষায় রচিত কিন্তু শ্লোকগুলি কঠিন শব্দপূর্ণ কর্ণপীড়াদায়ক কটমট। এই সেদিন পর্য্যন্তও এই মতের প্রতিধ্বনি শুনিয়াছি। সদুক্তিকর্ণামৃত সম্পূর্ণ প্রকাশিত হওয়ার পর এ মত অসার প্রতিপন্ন হইয়াছে। লক্ষ্মণসেনের মহাসামন্ত বটুদাসের পুত্র শ্রীধর দাস ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে সদুক্তিকর্ণামৃত সঙ্কলন করেন। তিনি কবি জয়দেবের প্রায় সম-সাময়িক বা অব্যবহিত পরবর্ত্তী ব্যক্তি। তিনি সদুক্তিকর্ণামৃতে শরণ, গোবর্দ্ধন, উমাপতিধর প্রভৃতির কবিতার সঙ্গে জয়দেবেরও তেত্রিশটি বিভিন্ন বিষয়ক কবিতা সংকলন করিয়াছেন। শরণাদি কবিগণ যে লক্ষ্মণ সেনের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন, এবিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। জয়দেবরচিত কবিতাগুলির ছন্দ শব্দঝঙ্কার অলঙ্কার-পারিপাট্য আদি দেখিয়া অবাধে স্বীকার করিতে হয় যে কবি জয়দেব কোমল কঠোর সর্ব্ববিধ রচনাতেই পারঙ্গম ছিলেন। শ্রীগীতগোবিন্দের প্রস্তাবনায় কবি আপনার সন্দর্ভশুদ্ধির যে শ্লাঘা করিয়াছেন তিনি তাহার অবিসম্বাদী অধিকারের দাবী করিতে পারেন। সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত কবি রচিত তেত্রিশটী শ্লোকের মধ্যে বেরী নিনাদ আদির বর্ণনায় বুঝিতে পারা যায় যে তিনি বৈষ্ণব হইলেও তাঁহার হৃদয় উদার ও মন সর্ব্ববিষয়-ধারণক্ষম ছিল। এই তেত্রিশটী শ্লোকের মধ্যে পাঁচটি শ্লোক শ্রীগীতগোবিন্দ হইতে গৃহীত। সুতরাং কাব্যখানি যে কবির জীবদ্দশাতেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল সে বিষয়েও সন্দেহের কোন কারণ নাই। এখন দেখিতে হইবে—যে শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্যখানি রাজা ও রাজসভাসদগণের চিত্ত বিনোদনের জন্য রচিত হইয়াছিল, অথবা কবি আপন অনুকরণীয় মধুর কোমলকান্ত পদাবলীতে উপাস্য শ্রীরাধামাধবের লীলা কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন। আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস শ্রীগীতগোবিন্দ কবির উপাস্য দেবতার লীলাবর্ণনাতেই পরিপূর্ণ। এ বিশ্বাসের কারণ কি তাহা বলিতেছি।

শ্রীগীতগোবিন্দ রচনার বহুপূর্ব্বেই গোপীকথা লইয়া কাব্য নাটক ও শ্লোকাদি রচিত হইয়াছিল। ভাসের বালচরিত ইহার একতম প্রমাণ। ভাস খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দের কবি। হাল সপ্তশতীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের কথা আছে। মহাকবি কালিদাস বিষ্ণুর গোপবেশ ও শ্রীবৃন্দাবনের কথা লিখিয়াছেন। ইতিমধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যে উপাস্যরূপে গৃহীত হইয়াছেন অষ্টম শতকের কবি ভট্টনারায়ণের

বেণীসংহারের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে নবম শতকের আলঙ্কারিক আনন্দবর্দ্ধনের ধ্বন্যালোকে সংগৃহীত একটী শ্লোকে এবং একাদশ শতকের কবি ক্ষেমেন্দ্রের দশাবতার চরিতের কয়েকটী শ্লোক হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষেমেন্দ্র দশাবতার চরিত রচনা করেন। ১০৬২ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য্য নিম্বার্ক আবির্ভূত হন। আচার্য্য নিম্বার্কই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে উপাস্যরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। প্রস্থান-ত্রয়ের ব্যাখ্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদ বাদ ইঁহারই প্রবর্ত্তিত। আচার্য্য নিম্বার্কের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ লক্ষ্মণ দেশিকাচার্য্য "সারদাতিলক" সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই সারদাতিলকে—"গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং, গোগোপসংঘাবৃত বলবেণুবাদনপর" গোবিন্দের ধ্যান আছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণমাধুরী গ্রন্থে বিল্বমঙ্গল রচিত তৃতীয় শতক শ্লোকসংগ্রহে এই ধ্যানমন্ত্রটী পাওয়া যায়। বিল্বমঙ্গল লক্ষ্মণ দেশিকাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং দেখিতেছি গোপীপরিবৃত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে। তবে নিম্বার্কের পূর্ব্বে সুসংবদ্ধ ভাবে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক অপর কেহ রাধাকৃষ্ণের উপাসনা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন কিনা অনুসন্ধান আবশ্যক।

শ্রীমদ্ভাগবত চারি সম্প্রদায় বৈষ্ণবগণেরই আদরণীয় গ্রন্থ। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধার নাম নাই। চারি সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রামাণ্য শ্রুতি গোপালতাপনীর মধ্যেও রাধার নাম পাওয়া যায় না। প্রধানা গোপী তাপনীতে গান্ধর্ব্বী নামে পরিচিতা। তাহা হইলে নিম্বার্ক কোন্ প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে শ্রীরাধাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন? আমি যতদূর জানি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, পদ্মপুরাণ, নারদপাঞ্চরাত্র প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে নিম্বার্কের পূর্ব্ব হইতেই এই সমস্ত গ্রন্থ সম্প্রদায় বিশেষের নিকট প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছিল। আচার্য্য নিম্বার্ক তাঁহার বেদান্তদশশ্লোকীতে উপাস্য নির্দ্দেশ করিতেছেন—

> স্বভাবতঃ অপাস্ত সমস্ত দোষম্
> অশেষ কল্যাণ গুণৈক রাশিম্।
> ব্যূহাঙ্গিনং ব্রহ্মপরং বরেণ্যম্
> ধ্যায়েম কৃষ্ণং কমলেক্ষণং হরিম্॥

স্বভাবত সর্ব্বপ্রকার দোষ হীন, অশেষ কল্যাণ গুণরাশি, চতুর্ব্ব্যূহ যুক্ত, বরণীয় পরমব্রহ্ম পদ্মপলাশলোচন হরি শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি।

> অঙ্গেতু বামে বৃষভানুজাং মুদা
> বিরাজমানা মনুরূপ সৌভগাং।
> সখিসহস্রৈঃ পরিসেবিতাং সদা
> স্মরেম দেবীম্ সকলেষ্ট কামদাম্॥

তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) বামাঙ্গে বিরাজমানা অনুরূপা সৌভাগ্যশালিনী, আনন্দিতা সখীসহস্রপরিসেবিতা, সকল ইষ্টকামদাত্রী বৃষভানুনন্দিনীকে স্মরণ করি।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় পুরুষোত্তমাচার্য্য বলিয়াছেন—দেবীম্ পদে রুক্মিণী দেবীকে এবং উপলক্ষণে সত্যভামা দেবীকে বুঝিতে হইবে। "তথাচ রুক্মিণী সত্যভামা ব্রজস্ত্রীবিশিষ্টঃ শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমঃ সাম্প্রদায়িভির্বৈষ্ণবৈঃ সদা উপাসনীয়।" ব্রজস্ত্রী বলিতে তিনি বুঝাইতেছেন—"ব্রজস্ত্রী শব্দবাচ্যয়োঃ গোপী প্রধানভূতায়াঃ শ্রীবৃষভানুজায়া শ্রীকৃষ্ণেন সহ নিত্যযোগং বিধত্তে শ্রীবৃষভানুজামিতি॥"

বেদান্তরত্নমঞ্জুষা॥

গোপালতাপনীতে গোপীনাথ, রমামানসহংস এবং রুক্মিণীকান্ত গোপীজনমনোহর শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা আছে। আচার্য্য নিম্বার্কের মতে রমাকান্ত পুরুষোত্তম কৃষ্ণই উপাস্য এবং তাঁহার মতে রমাই শ্রীরাধা।

ব্রহ্মরুদ্রসুররাজচর্চ্চিতঃ
চর্চ্চিতশ্চ রময়াক্ষমালয়া।
চর্চ্চিতশ্চ নবগোপবালয়া
প্রেমভক্তি রসশালিমালয়া॥
(সবিশেষ নির্ব্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণস্তব)

নিম্বার্কাচার্য্যের রাধা শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী। এই সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহ স্বীকার করিয়া থাকেন। গর্গসংহিতা গোলক-খণ্ডে এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ জন্ম-খণ্ডে এই বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বলিতেছেন নন্দ ভাণ্ডীরবনে গোচারণে গিয়া কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করতঃ বটমূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এমন সময় মায়াময় কৃষ্ণের মায়াবশে নভোমণ্ডল হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হইল। মহারাজ নন্দ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও কাননাভ্যন্তর শ্যাম বর্ণ দেখিলেন। ঝঞ্ঝাবাত, মেঘের সুদারুণ শব্দ ও ঘোরতর বজ্রনাদ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। স্থূল বৃষ্টি ধারা পতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে নন্দ ভীত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণও মায়াকল্পিত ভয়ে রোদন করতঃ পিতার কণ্ঠ ধারণ করিলেন। এমন সময় শ্রীরাধা রাজহংসের ন্যায় মন্দগমনে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইলেন। নন্দ তাঁহার স্তব করিয়া বলিলেন দেবি, আমি গর্গমুখে শুনিয়া আপনাকে জানিয়াছি। আপনি লক্ষ্মী হইতেও শ্রীহরির অধিক প্রিয়তমা। এই বালক মহাবিষ্ণু হইতেও শ্রেষ্ঠ। এখন এই আপনার প্রাণ-নাথকে গ্রহণ করুন।

গর্গসংহিতা বলিতেছেন—

গুপ্তং বিদং গর্গমুখেন বেদ্মি
গৃহাণ রাধে নিজনাথমঙ্কাৎ।
এনং গৃহং প্রাপয় মেঘভীতং
বদামি চেত্থং প্রাকৃতে গুণ ঢ্যম্॥

তোমার তত্ত্ব আমি গর্গমুখে গুপ্তভাবে জানিয়াছি। আমার ক্রোড় হইতে নিজনাথকে গ্রহণ কর। কৃষ্ণ মেঘ হইতে ভীত হইয়াছে। ইহাকে গৃহে লইয়া যাও।

শ্রীরাধা কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া সুদূর দেশে গমন পূর্ব্বক রাসমণ্ডলকে স্মরণ করিলেন। রাসমণ্ডল আবির্ভূত হইলে স্বয়ং ব্রহ্মা আসিয়া শ্রীরাধাকে কৃষ্ণের করে যথাবিহিত সম্প্রদান করিলেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও গর্গসংহিতা)

আমার মনে হয় শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের এই বর্ণনারই ইঙ্গিত রহিয়াছে। শ্রীগীতগোবিন্দের পৌরাণিক মূল অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে শারদ রাসের বর্ণনা আছে। জয়দেব বাসন্তরাসের বর্ণনা করিয়াছেন। একমাত্র ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেই বাসন্তরাসের বর্ণনা পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে দন্তবক্রবধের পর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে ব্রজে আগমন পূর্ব্বক দ্বিতীয়বার রাসের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই সমস্ত আলোচনায় আমরা দেখিতেছি পুরাণের সঙ্গে জয়দেবের পরিচয় ছিল। এ সম্বন্ধে একটী কথা বিচার্য্য। যে কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় বাসন্তরাস, বর্ষাবর্ণনাত্মক শ্লোকে সে কাব্যের সূচনা হইবে কেন? কোন টীকাকারই এই শ্লোকটীকে পরিত্যাগ করেন নাই। অনেকেই এই শ্লোকটীকে আশীর্ব্বাদ নমস্কার ও বস্তুনির্দ্দেশ রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং এই শ্লোকের গুরুত্ব অস্বীকার করিবার

উপায় নাই। সদুক্তিকর্ণামৃত প্রকাশিত হওয়ার পর এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে আমরা জয়দেব প্রণীত গীতগোবিন্দ গ্রন্থ কবি গ্রথিত যথাযথ আকারেই পাইয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে প্রথম শ্লোকও কবি জয়দেব রচিত, এবং ইহার সঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ও গর্গসংহিতার ঐক্য আছে।

এ কথা বলিবার আরও একটী কারণ আছে। স্বকীয়া নায়িকা লইয়া অভিসার, আদি বর্ণনার আবশ্যকতা থাকে না। একমাত্র শ্রীবৃন্দাবনের গোপীলীলা ভিন্ন অন্যত্র কোন সৎকাব্যে সাধারণ পরকীয়া প্রসঙ্গ আছে বলিয়া মনে হয় না। জয়দেব শ্রীরাধাকে পরকীয়া নায়িকা রূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। অথচ কাব্যমধ্যে বর্ণনা করিতেছেন—"পরস্পরের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে তোমরা যখন মিলিত হইবে এবং সম্ভাষণ দ্বারা উভয়ে উভয়কে জ্ঞাত হইয়া রসাবেশে প্রীতিলাভ করিবে তখন—
"দম্পত্যোরিহ কো ন কো ন তমসি ব্রীড়া বিমিশ্রোরসঃ।"
অন্যত্র—"রেভিঃ বামশরৈস্তমদ্ভুতমভূদ্ ভুর্ম্মনঃ কীলিতম্॥"
এই যে দম্পতি ও পতি শব্দ ইহা পরকীয়া নায়িকায় প্রযুক্ত হইবে কেন? শ্রীমদ্ভাগবতেও এইরূপ পতি শব্দের প্রয়োগ আছে। জয়দেবের কাব্য রসাভাস দোষ দুষ্ট, আশা করি এ কথা কেহ বলিবেন না। জয়দেব এ ক্ষেত্রে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণ করিয়াছেন। এই জন্যই জয়দেবের রাধা—"অবিবিক্ত স্বকীয়া পরকীয়া"—গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ঐ বিবাহ কথা যে ভক্ত সমাজে বিশেষরূপ প্রচারিত ছিল, মহাকবি সুরদাসের নিম্নোক্ত কবিতা হইতেও তাহা প্রমাণিত হয়। কবিতাটীর সঙ্গে শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক অপেক্ষা ব্রহ্মবৈবর্ত্তেরই সম্পূর্ণ ঐক্য রহিয়াছে।

> গগন গরজি ঘহরাই জুরী ঘটাকারী।
> পৌন ঝকঝোর চপলা চমকি চহুঁ ওর,
> সুবন তনচিতৈ নন্দ ডরত ভারী॥
> কহো বৃষ ভানুকী কুঁয়রি সোঁ বোলিকৈ
> রাধিকা কান্হ ঘর লিয়ে জা রী॥
> দো ঘর জাহু সঙ্গ নভ ভয়ো শ্যাম রঙ্গ
> কুঁয়র গহো বৃষভানু বারী॥
> গয়ে বনঘনওর নবল নন্দকিশোর
> নবল রাধা নয়ে কুঞ্জ ভারী॥
> অঙ্গ পুলকিত ভয়ে মদন তিনতনজয়ে
> সুর প্রভু শ্যাম শ্যামাবিহারী॥

গগনে ঘন ঘোর গর্জ্জন। আকাশে কাল মেঘের ঘটা। দমকা বাতাসের ঝাপটা। বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। পুত্রের দেহের দিকে তাকাইয়া নন্দ ভয় পাইয়াছেন। তিনি বৃষভানু কুমারীকে বলিলেন রাধা তুমি কানাইকে ঘরে লইয়া যাও। দুজনে একসঙ্গে ঘরে যাও। আকাশের রং কাল। বৃষভানুবালা কুমারকে গ্রহণ করিলেন। নওল নন্দকিশোর নওলী রাধাকে লইয়া গহন বনে এক নূতন কুঞ্জের দিকে চলিয়া গেলেন। অঙ্গ পুলকিত হইল; সুরদাসের, প্রভু শ্যামা এবং শ্যামাবিহারীর এই তিন জনের তনুকে মদন জয় করিল। লক্ষ্য করিবার বিষয় জয়দেব রসোৎকর্ষের জন্য প্রথম শ্লোকে নক্ত অর্থাৎ রাত্রির অবতারণা করিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে, গর্গসংহিতায় অথবা সুরদাসের কবিতায় রাত্রির কোন প্রসঙ্গ নাই।

জয়দেবের মত সৌভাগ্যবান কবি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কালিদাসের কুমারসম্ভবও শেষ

সম্প্রদায়ের নিকট শাস্ত্রীয় মর্য্যাদা লাভ করে নাই। কিন্তু শ্রীগীতগোবিন্দ সকল সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবের নিকটই শাস্ত্ররূপে গৃহীত হইয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এবং তদীয় অনুগত রায় রামানন্দ প্রভৃতি রসিক, ভক্ত ও কবিগণ শ্রীগীতগোবিন্দগ্রন্থকে শ্রীমদ্ভাগবতের কবিত্বময় ভাষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মহাকবি কালিদাসও পুরাণের অনুসরণ করিয়াছেন। হর-গৌরীর, অনাদি পুরুষ প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত সম্ভ্রম লইয়া মর্য্যাদানুরূপ ভাষা এবং ছন্দেই তিনি কুমারসম্ভব রচনা করিয়াছেন। কবিত্বে এবং প্রতিষ্ঠায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু এ সৌভাগ্য তাঁহারও হয় নাই। জানিনা সেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, সেই প্রেম-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র এই আদিরসাত্মক কবিনির্ম্মিতির মধ্যে সেই রসস্বরূপকে কোন্ রূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, রসভাণ্ডের কি মধুর আস্বাদন লাভ করিয়াছিলেন, যাহার জন্য শ্রীগীতগোবিন্দ তাঁহার নিত্যপাঠ্য গ্রন্থরূপে, অন্যতম আস্বাদনীয় গ্রন্থরূপে গৃহীত হইয়াছিল। বাহিরের মানুষ আমরা—বাহিরের দৃষ্টি দিয়া মাত্র এইটুকুই দেখিয়াছি—যে নিশ্চিত মৃত্যু আসন্ন জানিয়া পার্থিব সাম্রাজ্য ভুক্তি-মুক্তির মত পরিত্যাগপূর্ব্বক যে রাজর্ষি অপার্থিব রাজ্যের সংবাদ শুনিবার আকুলতায় পরম ভাগবত শ্রীশুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, যে প্রশ্ন শ্রবণে উল্লসিত হইয়া শুকদেব পরীক্ষিতকে বলিয়াছিলেন—

> সম্যগ্ব্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজর্ষিসত্তম।
> বাসুদেব কথায়াং তে যজ্জাতা নৈষ্ঠিকী রতি॥

কবি জয়দেব সেই শুকপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। জাতির জিজ্ঞাসায় যুগপ্রয়োজনেই তিনি আমাদিগকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা কথা শুনাইয়াছেন।

> বাগ্দেবতাচরিতচিত্রিতচিত্তসদ্মা
> পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী।
> শ্রীবাসুদেবরতিকেলিকথাসমেত
> মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্॥

(ক্রমশঃ)

"গরিলারে গেরিলারা করিছে নকল"

শ্রীকিরণশঙ্কর গুপ্ত

শতাব্দীর সভ্যতার নামে—
আদিম অসভ্য যুগ প্রচলিত আজো।
ক্রূরতার উলঙ্গ প্রকাশ—
আরো যেন—স্পর্দ্ধিত, উদ্যত—
মানুষের ইতিহাস মানুষেরে করে পরিহাস—
ক্রমবিকাশের পথে—
আত্মাবমাননা—হিংসা দ্বেষ
আরো কত আদিম প্রেরণা—
হিমালয় সম অন্তরায়।
মানুষের হিত লাগি যত নব দান—
ধ্বংস হয়ে যায় এর দাবাগ্নিতে;
সুতরাং মূল্য নাই এর।

বুভুক্ষার বুঝি এই রূপ—
তিন হাত মানুষের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা—
জন্মিল কেমনে?

প্রাগৈতিহাসিক যুগ আসে নাই ফিরে—
আছে আজো নবতম বেশে—
চিনিতে কি পারো না ইহারে—?
রূপান্তর বিষ-তীর বিষ-বাষ্পে আজি—
পর্ব্বত কন্দর ছাড়ি মাটি কেটে—
লুকায় নিজেরে—অন্যেরে বধিতে সঙ্গোপনে।
দ্বিপদ গেরিলারা—বনে বনে গরিলারে
করিছে নকল—
উপমা ছাড়িয়া শেষে বলে যাই ওগো
ভ্রূণ হতে ধীরে ধীরে জন্মিল যে
কর্কটিকা মাতার জঠরে—
জননীর হত্যাকারী তারা।
সাবধান হও;
সেদিন আগত বুঝি—
আপনার রক্ত দিয়ে মানুষ করিবে তার
আপন তর্পণ—চির শান্তি লাগি।

নরনারায়ণ সেনানিবাস *

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ

চতুঃষষ্টি তন্ত্রশাস্ত্র একবাক্যে করে সমর্থন,
প্রশস্ত উত্তব দিক শক্তি-পীঠ কবিতে অর্চ্চন।
মূল-শক্তি-পীঠ তাই উত্তবেতে হইল স্থাপিত,
উত্তব-সাধক-পীঠ দক্ষিণ অংশেতে নিরূপিত।
ছুটি মহা-শক্তি-পীঠ মহনীয় কল্পনার ছবি,
বর্ণনাব ভাষা নাই—রূপ দিতে হাব মানে কবি।

* * * *

কোচবিহাবেব আদি পুণ্যশ্লোক নৃপকুলমণি,
মহাবাজ 'বিশ্বসিংহ' বিশ্বে যার চিব যশঃধ্বনি।
শ্রেষ্ঠ পুত্রদ্বয় তাব—জ্যেষ্ঠ নরনারায়ণ ভূপ,
উপনাম 'মল্লদেব' মল্লযুদ্ধে জগতে অনুপ।
দশভুজা দশভুজে একদা যাহাবে ক্রোড়ে ধরি'
অভয়া অভয়া-সাজে বসেছিলা সিংহাসন'পরি।
দিগ্বিজয়ী মহাবীব 'বিক্রম-আদিত্য' অবতার,
অনু-জন্মা 'চিলাবায' সেনাপতি স্বয়ং যাহার।
কবধৃত কববাল ভ্রাতৃদ্বয় পশিলে সমরে,
সম্মুখে বিজয়লক্ষ্মী দিত দেখা জয়মাল্য করে।
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে যাব হিমাচল ছিল ছত্রধারী,
বঙ্গ-সিন্ধু যোগাইত পাদপদ্ম প্রক্ষালন-বারি।

---

* স্বর্গীয় পুণ্যশ্লোক মহারাজ নবনারায়ণের নামে প্রতিষ্ঠিত সেনানিবাসের উদ্দেশে রচিত।

ভারত-গগন-রবি যোগাইত প্রথম কিরণ,
পশ্চিমে কাঞ্চনজঙ্ঘা জয়কেতু শোভিত হিরণ।
সম্মুখ সমরে হয়ে রুদ্রতেজে প্রতিহত গতি,
দিত কর নতশিরে অর্দ্ধশত সামন্ত নৃপতি।

*   *   *   *

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তেজে স্বকুল-কমল প্রকাশিলা,
দুষ্কীর্ত্তি দলিয়া পদে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিলা।
মহা-মহা-উপাধ্যায়ে সভাস্থল ছিল সমুজ্জ্বল,
প্রয়োগ-রত্নমালাদি আজো যার নিদর্শন স্থল।*
জ্ঞান বিদ্যা সদাচার ন্যায় নীতি করিয়া বিকাশ,
সাধন-উচিত ধামে চলিলা তেয়াগি' মর্ত্ত্যবাস।

*   *   *   *

পৌনে চারিশত বর্ষ অবসানে সে স্তিমিত দীপ,
উজলিলা দৃপ্ত-তেজে সিংহাসনে উদি' জগদ্দীপ।
সিংহের বিক্রম যত কবিবর ভাল বুঝে চিতে,
বীরের মর্য্যাদা দান উপযুক্ত বীরে পারে দিতে।
যোগ্যে যোগ্য যোজনায় যথা মণি-কাঞ্চনের শোভা,
তেমতি এ প্রতিষ্ঠান শৌর্য্য-বীর্য্যবান-মনোলোভা।
যুগ-উপযোগী শক্তি গঠনের মূল কেন্দ্র স্থান,
নব নব প্রচেষ্টায় হবে হেথা ক্রম-বর্দ্ধমান।
বিস্মৃতির স্মৃতিকল্পে প্রতিষ্ঠানদ্বয় বক্ষে ধরি,
ধন্য হ'ল আমাদের পূত কোচবিহার নগরী।

---

* বিশেষ বিবরণ খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত কোচবিহারের ইতিহাসের ১৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ধূলি-কণা

অধ্যাপক শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্-এস্-সি

কঠিন পদার্থ যখন অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় বিভক্ত হইয়া বায়ু মণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে তখন এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাকে ধূলিকণা বলা হয়। বাতাস, বৃষ্টি, আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন, তাপ, জীব এবং উদ্ভিদ দেহের পচন ক্রিয়ার ফলে বায়ুমণ্ডলে প্রচুর ধূলিকণা ছড়াইয়া পড়ে। কোন স্থানের ভৌগোলিক অবস্থানের উপর এই ধূলিকণার পরিমাণ নির্ভর করে। ইহা ছাড়া বর্ত্তমান জগতে কলকারখানার অন্ত নাই। যন্ত্র চালনায় প্রচুর ধূলিকণার উৎপত্তি হয়। শক্তি উৎপাদনের জন্য যে কয়লা বা তৈল পোড়ান হয় তাহার ধোঁয়া এবং যন্ত্রের প্রতিটি নড়াচড়া অসংখ্য ধূলিকণা সৃজন করে। "Every fire whether for the production of heat or power, every grinding or rubbing action and in general all mechanical function and industrial and constructional activity creates dust." ধূলি যন্ত্রযুগের একটা অভিশাপ। ইহা কোন অঞ্চলের শ্রমিক এবং বাসিন্দাদের মধ্যে বিভিন্ন রোগ বিস্তার করিয়া প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোকের অকালমৃত্যু ঘটাইয়া থাকে।

সমস্ত ধূলিকণার আকার এক নহে। ইহাদের আকার ১৫০ মাইক্রণ (১ মাইক্রণ এক ইঞ্চির পঁচিশ হাজার ভাগের এক ভাগ) হইতে ০·৫ মাইক্রণ পর্য্যন্ত হয়। আমরা নিঃশ্বাসের সহিত যে সমস্ত ধূলিকণা গ্রহণ করি তাহাদের আকার ০·৫ মাইক্রণ হইতে ১০ মাইক্রণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ বাতাসে ১·৫ মাইক্রণ অপেক্ষা বড় ধূলিকণা থাকে না। মিল অঞ্চলের ধূলিকণার আকার ১ মাইক্রণ হইতে ৩ মাইক্রণ পর্য্যন্ত হয় এবং এই অঞ্চলের বাতাসে ধূলিকণার পরিমাণ বিশুদ্ধ বাতাসের ধূলিকণার পরিমাণ অপেক্ষা বেশী। কারখানা ঘরের বদ্ধ বাতাসে প্রতি ঘনফুটে প্রায় দুইশত লক্ষ ধূলিকণা থাকে—বিশুদ্ধ বায়ুতে প্রতি ঘনফুটে পঞ্চাশ লক্ষ ধূলিকণা ভাসিয়া বেড়ায়।

ধূলিকণা বাতাসে ভাসমান অবস্থায় থাকে এবং অতি ধীরে ধীরে মাটির উপর জমা হয়। আকারে বড় এবং ভারী কণা শীঘ্রই মাটিতে পড়িয়া যায়। এই জন্য সীসক, পারদ, বেরিয়ম প্রভৃতি ভারী ধাতুর কণা বেশী দূর ছড়াইতে পারে না। ধোঁয়া, আলকাতরা, আর্সেনিক এবং গন্ধক হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদির কণা হালকা বলিয়া দীর্ঘকাল বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায় এবং বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে।

সাধারণতঃ ভারী ধাতু যথা সীসক, পারদ, বেরিয়ম, দস্তা এবং এই সমস্ত ধাতু হইতে প্রস্তুত বিভিন্ন সামগ্রীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাসমূহ রোগসংক্রামক ধূলিকণার পর্য্যায়ভুক্ত। এই সমস্ত কণা নিঃশ্বাসের সহিত শরীরে প্রবেশ করে এবং রক্তের সহিত মিশিয়া নানা রোগ উৎপন্ন করে। দরজা জানালায় যে রং ব্যবহৃত হয় তাহাতে লেড্ অক্সাইড্ (Lead oxide) এবং লেড্ কার্ব্বনেট্ (Lead Carbonate) ব্যবহৃত হয়। যে স্থানে এই রং প্রস্তুত হয় শুধু যে সেই স্থানের বায়ুমণ্ডলেই রঙের কণা ছড়াইয়া পড়ে তাহা নহে। আমাদের ঘরের দরজা জানালা হইতে রৌদ্রবৃষ্টির জন্য এই সমস্ত রঙের কণা বাসগৃহের বাতাসে ছড়াইয়া যায় এবং নিঃশ্বাসের সহিত শরীরে প্রবেশ করিয়া "সীসক্ বিষক্রিয়া" ঘটাইবার সম্ভাবনা থাকে। ডাঃ কে, বাগচী (Chemical Examiner to the Government of Bengal) বলেন যে হিন্দু পরিবারে বিবাহিত মহিলাগণ যে সিঁদুর ব্যবহার করেন উহাতে একজাতীয় সীসকের গুঁড়া বর্ত্তমান। এই কারণে হিন্দুগৃহের বাতাসে সর্ব্বদাই সীসকের কণা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান বলিয়া "সীসক বিষে" আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। যে সমস্ত কারখানায় আর্সেনিক হইতে নানা রকমের রঙ্, ইঁদুরমারা বিষ, আগাছাধ্বংস করিবার ঔষধ ইত্যাদি প্রস্তুত হয় সেই সকল কারখানা এবং আশেপাশের বায়ুমণ্ডলে আর্সেনিকের কণা ভাসিয়া বেড়ায় বলিয়া স্থানীয় লোকেরা "আর্সেনিক বিষে" আক্রান্ত হয়। জিঙ্ক্ অক্সাইড্ (Zinc oxide) প্রস্তুত করিবার সময় ইহার কণা ফুসফুসে প্রবেশ করিলে এক প্রকার রোগ জন্মে। এই রোগকে "Metal fume fever" বলে। চূণের কণাও রোগসৃষ্টি করে।

কয়লা, লৌহ, বালি, টিন, এস্‌বেষ্টস্‌ প্রভৃতি হইতে উদ্ভূত সূক্ষ্মকণা ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিলে "ফুস্‌ফুসের ধূলিরোগ" (Dust disease of the lungs) নামে এক প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। গ্রানাইট পাথর, কোয়ার্জ্জ, বালি প্রভৃতির কণা "সিলিকোসিস্‌" (Silicosis) নামে এক রোগ সৃষ্টি করে। এই রোগ "খনিমজুরের যক্ষা" নামেও অভিহিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার খনিমজুরদের মধ্যে এইরোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, এই রোগে আক্রান্ত হইলে রোগের শেষ অবস্থায় রোগটি যক্ষা, নিউমোনিয়া, প্লুরেসি প্রভৃতিতে দাঁড়াইয়া যায়। বিশেষ করিয়া যক্ষারোগ ত হইবেই। এবং শুধু যে খনি অঞ্চলের শ্রমিকেরাই আক্রান্ত হয় তাহা নহে। যে সমস্ত মিল অঞ্চলে লৌহ বা ইস্পাত নির্ম্মিত দ্রব্যাদি তৈয়ারী হয় সেই স্থানের শ্রমিক এবং বাসিন্দারা "সিলিকোসিস" রোগে আক্রান্ত হয়। পরে এই রোগ যক্ষায় পরিণত হয়। ইহার কারণ লৌহের কারখানায় ঘষামাজা এবং ছাঁচের কাজের জন্য প্রচুর পরিমাণে বালি ব্যবহৃত হয়। কাজেই বাতাসে বালির কণা বর্ত্তমান থাকে এবং রোগসৃষ্টির সহায়তা করে

যে স্থান কলকারখানা হইতে বহুদূরে অবস্থিত—যেমন গ্রাম অঞ্চল—সেই জায়গার বাতাসে যে ধূলিকণা থাকে তাহা নির্দ্দোষ বলা যাইতে পারে। এই সব ধূলিকণা নিজেরা রোগসৃষ্টি করে না কিন্তু রোগবীজাণু বহন করে। এই রোগবীজাণুর মধ্যে এনথাক্স, ধনুষ্টঙ্কার, ডিপ্‌থেরিয়া, যক্ষা, বসন্ত প্রভৃতি প্রধান।

উপরে যে বিভিন্ন রকমের ধূলিকণার উল্লেখ করা হইল ইহা ব্যতীত জীবদেহ এবং উদ্ভিদের পচনক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন ধূলিকণা এবং রঙ, বারুদ, নানাবিধ ঔষধ, তুলা ও পশমের কণা নানাবিধ ব্যাধি সৃষ্টি করে। ফুলের রেণু, ঘোড়া ও বিড়ালের লোম, পালক, যব ও চাউলের খোসা হইতে যে ধূলিকণা উৎপন্ন হয় তাহা নিঃশ্বাসের সহিত শরীরে প্রবেশ করিয়া "আর্টিকেরিয়া", "একৃজিমা", "পারপারা" (এই রোগে চামড়ার উপর লাল অথবা নীল দাগ দেখা যায়), "এ্যাজ্‌মা" প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন করে। কেহ কেহ ঘোড়া বা বিড়াল স্পর্শ করিলে "আর্টিকেরিয়া" রোগে আক্রান্ত হয়। এমন কি ঘোড়া বিড়ালের গায়ের গন্ধেও আর্টিকেরিয়া রোগ হয়।

ধূলিকণা এক হিসাবে সভ্যতার মাপকাঠি। কলকারখানার সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায় বাতাসে ধূলিকণার সংখ্যাও তত বেশী হইতে থাকে এবং বিভিন্নজাতীয় ধূলিকণা শিল্প-সমৃদ্ধি নির্দ্দেশ করে।

ডাঃ কে, এন্‌, বাগ্‌চী কলিকাতার সহিত ইংলণ্ডের লীড্‌স্‌ সহরের তুলনামূলক আলোচনায় দেখাইয়াছেন যে কলিকাতার বাতাসে তামার সূক্ষ্মকণা প্রায় নাই: লীড্‌স্‌এ তামার কণা অত্যন্ত বেশী। কলিকাতার সীসকের কণার সংখ্যা যদি ৫ এবং আর্সেনিকের কণা ২০ ধরা যায় তাহা হইলে লীড্‌স্‌এ সীসকের কণা ৩০২৫ এবং আর্সেনিকের ৪৭৬ হইবে। সুতরাং কলিকাতার তুলনায় লীড্‌স্‌এ কত বেশী শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহার একটা নির্দ্দেশ পাওয়া গেল।

কলকারখানা হইতে যে রোগসংক্রমক ধূলিকণা উৎপন্ন হয় তাহা কলঅঞ্চলের বাতাসেই বদ্ধ থাকেনা, চারিপাশে কিছুদূর পর্য্যন্ত এই ধূলিকণা ছড়াইয়া পড়ে এবং লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া দেয়। নিউইয়র্ক সহরের দৃষ্টান্ত লইয়া দেখা যায় যে ঐ সহরের বায়ুমণ্ডলে প্রতিবৎসর ৩০০,০০০ টন ধোঁয়া, আলকাতরা, ছাই প্রভৃতির কণা এবং ৩৫০,০০০ টন গন্ধকের কণা ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু সেখানকার অধিবাসিদের উত্তম স্বাস্থ্য, পুষ্টিকর আহার এবং নানারূপ সাবধানতা অবলম্বনের জন্য রোগ তেমন মারাত্মক হয় না।

কলিকাতা সহরে ক্রমশঃ কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং শীতের রাত্রিতে কলিকাতার বায়ুমণ্ডলে কি পরিমাণ ধোঁয়া এবং ধূলি ছড়ান থাকে তাহা সকলেরই বিদিত। এই ধূলিকণা প্রধানতঃ যক্ষা এবং আরও নানা রোগ সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং অধিবাসিদের, বিশেষভাবে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। লীড্‌স সহরে আয়তনের তুলনায় কলকারখানা যত বেশী কলিকাতায় তত নহে, কিন্তু ভবিষ্যতে যে হইবে না এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। তখন ধূলিসমস্যা আরও গুরুতর হইয়া পড়িবে। এই ধূলির হাত হইতে বাঁচিতে হইলে চাই উত্তম আহার এবং স্বাস্থ্যসম্বন্ধে নানারূপ সাবধানতা। আশা করা যায় আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা এই দিকে দৃষ্টি দিবেন।

রাজপরিবারের সংবাদ

মাতৃশ্রী শ্রীশ্রীমহারাণী সাহেবা কোচবিহারেই অবস্থান করিতেছেন। গত ২৭শে এপ্রিল তিনি মহারাণী ইন্দিরাদেবী বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণী সভায় সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন এবং ২৯শে এপ্রিল ঐ বিদ্যালয়ের বালিকাগণের বার্ষিক "ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা" দর্শনে বালিকাগণকে উৎসাহিত করেন ও ক্রীড়াশেষে পুরস্কার বিতরণ করেন। ৩রা মে তারিখে সুনীতি একাডেমির বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় সভানেত্রীত্ব করিয়া ছাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রী-গণকে উৎসাহিত করেন।

দেওয়াস্ রাজ্যের মহারাণী শ্রীশ্রীমেনকাদেবী গত ১৩ই মে কুচবিহারে আসিয়া পৌঁছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী সর্দ্দার ডি, কে, সেন; রাজস্বমন্ত্রী রায় বাহাদুর কে, সি, গাঙ্গুলী; হাউসহোল্ডমন্ত্রী মেজর রাজকুমার আর, সিং প্রভৃতি ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুর ১৪ই মে কলিকাতা হইতে কোচবিহারে আসিয়া পৌঁছেন। অপরাহ্ণে তিনি মিত্র-পক্ষের "বিজয়-উৎসব" উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মিলিটারী একাদশ বনাম অবশিষ্ট দলের ফুটবল ম্যাচে মিলিটারী একাদশের অধিনায়কত্ব করেন। ঐদিন সন্ধ্যায় ল্যান্সডাউন হলে বিজয়-উৎসব উপলক্ষ্যে যে বিরাট জন-সভা হয় তাহাতে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

ভগবানের কৃপায় রাজপরিবারের সকলে কুশলে আছেন।

শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুরের সমরযাত্রা

শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুর বর্ম্মা-যুদ্ধে মিত্রপক্ষীয় "লি-অ-জন্" অফিসারের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার নিমিত্ত গত শুক্রবার ১৮ই মে সন্ধ্যা ৭-১০ মিনিটের সময় ট্রেণযোগে কোচবিহার ত্যাগ করেন। যদিও তাঁহার যুদ্ধ-গমনের সংবাদ গোপন রাখা হইয়াছিল তথাপি ষ্টেশনে তাঁহার দর্শন-আকাঙ্ক্ষী অগণিত জনসমাগম হয়। মাতৃশ্রী শ্রীশ্রীমহারাণী সাহেবা সর্ব্বপ্রথম মহারাজাকে মাল্যভূষিত করেন। পরে অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী এবং মিলিটারী অফিসারগণ মহারাজা ভূপ বাহাদুরকে মাল্যভূষিত করেন। প্রধানমন্ত্রী সর্দ্দার ডি, কে, সেন ও সমবেত সকলের অভিনন্দন-ধ্বনির ভিতর ট্রেণ মহারাজা ভূপ বাহাদুরকে লইয়া প্রস্থান করে।

মহারাজা ভূপ বাহাদুর গত ২১শে মে ভোর ৫-৩০ মিনিটের সময় বিমান-যোগে কলিকাতা হইতে বর্ম্মা-যুদ্ধ-ক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন

স্থানীয় সংবাদ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব—

গত ২রা বৈশাখ হইতে ৪ঠা বৈশাখ পর্য্যন্ত তিন দিন কোচবিহার সহরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদক স্বামী সুন্দরানন্দ এই উৎসব উপলক্ষ্যে কোচবিহারে আগমন করেন। ২রা বৈশাখ ৺মনোমোহন বক্সী মহোদয়ের বাটিতে বিশেষ উৎসব হয়, পূর্ব্বাহ্নে হোম ও চণ্ডীপাঠ সহকারে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীরামনাম সংকীর্ত্তন ও ভজনাদি হয়। ৩রা ও ৪ঠা বৈশাখ সন্ধ্যায় স্থানীয় ল্যান্সডাউন হলে কোচবিহার রাজ্যের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে দুইটি বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। উভয় দিনই স্বামী সুন্দরানন্দ প্রধান অতিথিরূপে মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন ; প্রথম দিনের বক্তৃতার বিষয় ছিল "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের আদর্শ" এবং দ্বিতীয় দিনের বিষয় ছিল "স্বামী বিবেকানন্দের নারায়ণ জ্ঞানে নরসেবার আদর্শ"। উভয় দিনই সমবেত জনমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্বামীজির বক্তৃতা শ্রবণ করেন। অধ্যাপক তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা কুমারী গায়ত্রী দেবী উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে চমৎকৃত করে।

শুভ পুণ্যাহ দরবার—

গত ২৩শে এপ্রিল শুভ পুণ্যাহ উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুর রাজবাড়ীর দরবার হলে একটি দরবারের অনুষ্ঠান করেন। রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় দরবার উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় রাজবাটিতে উপস্থিত হইলে, মহারাজা ভূপ বাহাদুরের এ-ডি-সি-ইন-ওয়েটিং তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং রাজকীয় কায়দায় তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট আসনে লইয়া গিয়া বসান। দরবারিগণ পূর্ব্ব হইতেই স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। অতঃপর মহারাজা ভূপ বাহাদুর দুইজন এ-ডি-সি সমভিব্যাহারে দরবারকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। ক্রমান্বয়ে ১৩টি তোপধ্বনি দ্বারা তাঁহার দরবার গৃহে প্রবেশ ঘোষণা করা হয় এবং রাজকীয় সৈন্যদল সামরিক কায়দায় তাঁহাকে অভিবাদন করে ও রাজকীয় ব্যাণ্ড কুচবিহার-সঙ্গীত বাজাইতে থাকে। সুসজ্জিত ও আলোকমালায় পরিশোভিত দরবারকক্ষে মহারাজা ভূপ বাহাদুর যখন রত্নখচিত সিংহাসনে উপবেশন করেন, তখন রাজসভা এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। রাজগুরু কর্ত্তৃক মঙ্গলাচরণের পরে মহারাজা ভূপ বাহাদুরের আদেশক্রমে হাউসহোল্ড মন্ত্রী মহোদয় "দরবার আরম্ভ হইল" বলিয়া ঘোষণা করেন। দরবারিগণ পদমর্য্যাদা অনুসারে ক্রমান্বয়ে মহারাজাকে নজর প্রদান করেন এবং রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় মহারাজার আদেশ লইয়া শুভ পুণ্যাহের উদ্বোধন করেন। পুণ্যাহ শেষে রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় মহারাজা ভূপ বাহাদুরকে পান ও আতর অর্পণ করেন। তৎপরে দরবারিগণকে পান ও আতর প্রদান করা হইলে হাউসহোল্ড মন্ত্রী মহোদয় মহারাজা ভূপ বাহাদুরের অনুমতি লইয়া "দরবার শেষ হইল" বলিয়া ঘোষণা করেন। মহারাজা ভূপ বাহাদুর সৈন্যদলের সামরিক অভিবাদন গ্রহণ ও রাজকীয় ব্যাণ্ডের কুচবিহার-সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে দরবার কক্ষ হইতে প্রস্থান করেন। পর পর ১৩টি তোপধ্বনি দ্বারা দরবারের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মহারাণী ইন্দিরা দেবী বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ ও খেলাধূলা।

গত ২৭শে ও ২৯শে এপ্রিল যথাক্রমে মহারাণী ইন্দিরা দেবী বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভার অনুষ্ঠান এবং ছাত্রীগণের বার্ষিক খেলাধূলা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পুরস্কার বিতরণী সভার অনুষ্ঠান স্থানীয় ল্যান্সডাউন হলে হয় এবং বার্ষিক খেলাধূলা রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। উভয় অনুষ্ঠানেই মাতৃশ্রী শ্রীশ্রীমহারাণী সাহেবা সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়া বালিকাগণের উৎসাহবর্দ্ধন করেন। শ্রীমতী পারুলরাণী সরকার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক পুরস্কার লাভ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে এই বালিকাটি এই বৎসর এম্, ই পরীক্ষায় কুচবিহার রাজ্য হইতে বালক-বালিকাগণের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, আমরা শ্রীমতী পারুলরাণীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিতেছি। পুরস্কার বিতরণী সভায় বালিকারা স্থানীয় লেখক শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ শুকুল মহাশয়ের "যশোদা দুলাল" নাটিকা অভিনয় করিয়া বিশেষ অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন করে।

খেলাধূলার অনুষ্ঠানটিও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমহারাজ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ঘন ঘন করতালি প্রদান পূর্ব্বক বালিকাদিগের আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। শ্রীশ্রীঈশারাণী সাহেবা পুরস্কার বিতরণ করিয়া বালিকাদিগকে উৎসাহিত করেন।

সুনীতি একাডেমির পারিতোষিক বিতরণ।

গত ৩রা মে স্থানীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় সুনীতি একাডেমির পারিতোষিক বিতরণী সভা বিদ্যালয়ের হল ঘরে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। মাতৃশ্রী শ্রীশ্রীমহারাণী সাহেবা এই সভায় সভানেত্রীত্ব করিয়া ছাত্রীগণের আনন্দবর্দ্ধন করেন। সভায় শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর, শ্রীশ্রীঈশারাণী সাহেবা প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া সভার গৌরব বৃদ্ধি করেন। পুরস্কার বিতরণী উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের বালিকাগণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" নাটিকা অভিনয় করে, অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। অভিনয় ও সঙ্গীত নৈপুণ্যের জন্য তিনটি বালিকা বিশেষ পুরস্কার লাভ করে।

হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের জন্য মহারাজা ভূপ বাহাদুরের অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর।

১৯৪৫-৪৬ সালের বাজেটে মহারাজ ভূপ বাহাদুর হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের (শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) জন্য নিম্নলিখিত অতিরিক্ত নূতন ব্যয়সমূহ মঞ্জুর করিয়াছেন—

১। ম্যালেরিয়া নিবারণী পরিকল্পনার জন্য ১৫,০০০টাকা
২। ব্যাপক মহামারী নিবারণের জন্য ২০,০০০টাকা
৩। প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বেসরকারী বিদ্যালয়ে সাহায্যের জন্য .. ১০,০০০টাকা
৪। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণের জন্য ৫০০০টাকা
৫। প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার জন্য ... ৬০০০টাকা
৬। মহকুমা বালিকাবিদ্যালয়সমূহ সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য ... ৭৫০০টাকা
৭। বিদ্যালয় সমূহে ব্যায়ামশিক্ষার জন্য ... ৬৪৭০টাকা

কুচবিহার রাজ্য ক্রমশঃই নানাদিকে উন্নতিলাভ করিতেছে। রাজ্যের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য মহারাজ ভূপ বাহাদুরের এই সকল অতিরিক্ত নূতন ব্যয় তাঁহার প্রগতিশীল মন ও প্রজানুরক্তিরই পরিচয় দিতেছে।

রবীন্দ্র জন্মোৎসব—

গত ২৫শে বৈশাখ স্থানীয় রামভোলা স্কুলের উদ্যোগে ল্যান্সডাউন হল গৃহে রবীন্দ্র জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই

উপলক্ষ্যে এক মহতী জনসভা আহুত হইয়াছিল ; রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় এই সভায় পৌরোহিত্য করেন। হল গৃহের মঞ্চটি রবীন্দ্রনাথের মাল্যভূষিত মূর্তি ও প্রতিকৃতি দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছিল। সভায় গান, আবৃত্তি, প্রবন্ধ পাঠ, বক্তৃতা প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল, সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় আরম্ভ হইয়া রাত্রি সাড়ে নয়টার পর সভা ভঙ্গ হয়। সভার কর্ম্মতালিকা বড় দীর্ঘ ছিল বলিয়া এবং সভায় স্থানাতিরিক্ত বহু জনসমাগম হইয়াছিল বলিয়া উদ্যোক্তাগণ সভায় শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারেন নাই। দীর্ঘ কর্ম্মতালিকা দুইভাগে ভাগ করিয়া দুই দিন দুইটি সভা আহ্বান করিলে এবং উপস্থিত জনসংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখিলে সভার কার্য্য সুপরিচালিত হইত এবং রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হইত।

কোচবিহারে যুদ্ধবিজয়োৎসব।

প্রায় ছয় বৎসর বিশ্ববিধ্বংসী যুদ্ধের পর জার্ম্মাণী মিত্র পক্ষের নিকট বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করে। সম্মিলিত জাতির এই বিজয় উপলক্ষ্যে উৎসব করিবার নিমিত্ত কোচবিহার দরবার ৯ই, ১০ই এবং ১৪ই মে রাজ্যময় ছুটি ঘোষণা করেন। ১৩ই মে রবিবার যুদ্ধজয়ে ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য রাজ্যের সকল মন্দিরে, মস্‌জিদে ও গির্জ্জায় বিশেষ পূজা ও উপাসনার ব্যবস্থা করা হয়। মদনমোহন ঠাকুর বাড়ীতে ১৩ই মে তারিখে এক বিশেষ সংকীর্ত্তন হয়। ৯ই হইতে ১৪ই মে পর্য্যন্ত রাজবাড়ী এবং সকল সরকারী গৃহে কুচবিহার রাজ্যের ও সম্মিলিত জাতি সমূহের পতাকা উড্ডীন রাখা হয়।

১৪ই মে তারিখ সমগ্র কোচবিহার সহর আনন্দ মুখর হইয়া উঠে। এই দিন সর্ব্বদিবসব্যাপী নানারূপ অনুষ্ঠান চলিতে থাকে। বেলা ৮-৩০ মিনিটে রাজ্যের সৈন্যদল, পুলিশ ও স্কাউট দল চিলারায় ব্যারাকে একত্রিত হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তাসমূহে শোভা যাত্রা করিয়া বেড়ায়। বেলা ৩টার সময় সহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীগণকে মিষ্টান্ন খাওয়ান হয়; রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী, কলেজের অধ্যক্ষ এবং বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক এই কার্য্যের তদারক করেন। বেলা ৪টার সময় মদনমোহন ঠাকুর বাড়ীতে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা হয়। ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত রাজবাড়ীর খেলার মাঠে মহারাজের সৈন্য দল এবং অন্যান্যের মধ্যে ফুটবল ম্যাচ্ খেলা হয় হয়। ৬-৩০ মিনিটের সময় স্থানীয় ল্যান্সডাউন হলে শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়; এই সভায় সম্মিলিত জাতিসমূহের যুদ্ধবিজয়ের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। মহারাজ ভূপ বাহাদুর স্বয়ং এক বাংলা বক্তৃতায় সভার কার্য্য উদ্বোধন করেন। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন ধর মহাশয়ের বক্তৃতা ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রলাল রায়ের স্বরচিত কবিতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বিভিন্ন মহকুমার সদরেও এইরূপ জনসভার আয়োজন হইয়াছিল। সন্ধ্যায় সমগ্র সহর আলোকিত করা হয় এবং রাত্রি ৯টার সময় লাইনের মাঠে নানারূপ বাজি পোড়ান হয়।

বিজয়-উৎসব উপলক্ষ্যে আলোকিত কোচবিহার রাজপ্রাসাদ

দেশ-বিদেশের কথা

ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান

প্রায় ছয় বৎসর কাল পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিবার পর ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান হইয়াছে। পশ্চিম দিক হইতে ইংলণ্ড ও আমেরিকার সৈন্যবাহিনীর এবং পূর্ব্ব দিক হইতে সোভিয়েট বাহিনীর চাপে জার্ম্মাণী ক্রমশঃই বিপন্ন হইয়া পড়িতেছিল, জার্ম্মাণীর বহু ভূখণ্ড মিত্রবাহিনীর কবলিত হওয়ায় এবং রাজধানী বার্লিন রুশ সৈন্যের অধিকারে আসায় জার্ম্মাণী অবশেষে বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ৭ই মে রাত্রি ১২টা ৪১ মিনিটের সময় ফ্রান্সের অন্তর্গত রেইম্‌স্ সহরের একটি ক্ষুদ্র স্কুলগৃহে আত্মসমর্পণ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। এই স্কুলগৃহটিতে জেনারেল আইসেনহাওয়ারের প্রধান কার্য্যালয় অবস্থিত। আইসেনহাওয়ারের চীফ্ অফ ষ্টাফ জেনারল বিডেল মিত্র পক্ষের পক্ষ হইতে এবং জার্ম্মাণ আর্মির নূতন চীফ অফ ষ্টাফ্ কর্ণেল জেনারেল গুস্তাভ আত্মসমর্পণ পত্রে স্বাক্ষর করেন; রাশিয়ার পক্ষ হইতে জেনারেল ইভান্স সাসলোপারোফ এবং ফ্রান্সের পক্ষ হইতে জেনারেল ফ্রাঙ্কোয়া সেভেজ স্বাক্ষর করেন। ৯ই মে বার্লিনে পুনরায় আত্মসমর্পণের চুক্তি স্বাক্ষরের অনুষ্ঠান হয় এবং পশ্চিম রণাঙ্গণের মিত্রবাহিনী ও লালফৌজের হাই কম্যাণ্ডের নিকট জার্ম্মাণীর সমস্ত সশস্ত্র বাহিনী চূড়ান্তভাবে আত্মসমর্পণ করে।

জার্ম্মাণী প্রথমে মিত্রপক্ষের মধ্যে ভেদসৃষ্টির চেষ্টা করে; জার্ম্মাণ পক্ষ হইতে ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রতি আত্মসমর্পণের প্রস্তাব আসে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মাণী রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার সংকল্প প্রকাশ করে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার পক্ষ হইতে এই প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া জার্ম্মাণীকে ত্রিশক্তির নিকট বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়, এবং পরিশেষে জার্ম্মাণী তাহাতেই সম্মত হয়।

নাৎসী-নায়ক হিটলার বার্লিনেই মারা গিয়াছেন বলিয়া জার্ম্মাণ পক্ষ হইতে প্রচার করা হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার মৃতদেহ না পাওয়া পর্যন্ত একথা সকলে বিশ্বাস করিতেছেন না। গোয়েবেলসের মৃতদেহ বার্লিনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে এবং গোয়েরিংকে যুদ্ধবন্দীরূপে আটক করা হইয়াছে।

জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

জাপানও ক্রমশঃ মিত্রপক্ষের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেছে এবং হীনবল হইয়া আসিতেছে। অবশ্য জাপানীরা মুখে বলিতেছে যে শেষ পর্য্যন্ত অমিতবিক্রমেই তাহারা যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে; কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহারা শান্তির প্রস্তাব করিতেছে এরূপ খবরও পাওয়া যাইতেছে। যাহাই হউক মিত্রপক্ষের রেঙ্গুন বিজয়ের পর ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ শীঘ্রই শেষ হইয়া যাইবে এবং ব্রহ্ম পুনরধিকৃত হইবে ইহা আশা করা যাইতে পারে। প্রশান্ত মহাসাগরায় দ্বীপসমূহ হইতেও জাপান ক্রমশঃ বিতাড়িত হইতেছে এবং যুদ্ধ খাস জাপানের সন্নিকটবর্ত্তী হইতেছে। ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান হইল; এখন মিত্রপক্ষের সকল যুদ্ধোদ্যম জাপানের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত হইবে। কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে রুশিয়াও জাপানের বিরুদ্ধে লড়িবে, তাহা হইলে অতি অল্পকাল মধ্যেই—বর্ত্তমান বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই—জাপানও বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে।

এই সর্ব্বনাশা যুদ্ধ যত শীঘ্র শেষ হয় এবং পৃথিবীতে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হয় মানবসমাজের ততই মঙ্গল।

স্যানফ্রান্সিস্কো সম্মেলন—

আমেরিকার স্যানফ্রান্সিস্কো সহরে গত ২৫শে এপ্রিল হইতে বিশ্ব-নিরাপত্তা সম্মেলনের বৈঠক চলিতেছে। সম্মিলিত চতুঃশক্তি এই সম্মেলন আহ্বান করেন, পৃথিবীর ক্ষুদ্র বৃহৎ ৪৮টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছেন। ভারত হইতেও তিন জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে গিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর জগতে কিরূপে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহারই আলোচনা এই সম্মেলনে চলিতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পরস্পরের প্রতি যে ঈর্ষা ও সন্দেহের ভাব নেপথ্যে দেখা যাইতেছে তাহাতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল পার্লামেন্টে এক বক্তৃতায় সত্যই বলিয়াছেন, "স্যানফ্রান্সিস্কোতে যে বিশ্বপ্রতিষ্ঠান গঠিত হইতেছে, উহা যাহাতে নামমাত্রে পর্য্যবসিত না হয় আমাদিগকে সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই বিশ্বপ্রতিষ্ঠান যেন শক্তিশালীর বর্ম্মস্বরূপ ও দুর্ব্বলের পক্ষে উপহাস মাত্রে ("shield for the strong and mockery for the weak") পর্য্যবসিত না হয়।"

কলিকাতা হাইকোর্টের নবনিযুক্ত বিচারপতি চক্রবর্ত্তী—

কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সম্প্রতি হাইকোর্টের বিচারক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং গত ২৮শে এপ্রিল বিচারকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীর এম্-এ উপাধি লাভ করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক হইয়া যান। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এল পাশ করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী রূপে খ্যাতিলাভ করেন। বিজনীরাজ উত্তরাধিকার মামলা, ভাওয়াল মামলা প্রভৃতি বিখ্যাত মামলায় তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিচারপতি নিয়োগের সময় চক্রবর্ত্তী মহাশয় বঙ্গীয় ও কেন্দ্রীয় আয়করের কমিশনারের আইন উপদেষ্টা এবং বাংলার আয়কর ব্যাপারে ভারত সরকারের কৌঁসুলী ছিলেন। এম্-এ অধ্যয়ন কালে আমরা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সতীর্থ ছিলাম; তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহার দীর্ঘ সফলতাময় জীবন কামনা করিতেছি।

দেশীয় নৃপতি ও মন্ত্রী সম্মেলন—

গত ২৯শে ও ৩০শে এপ্রিল বোম্বাই সহরে দেশীয় রাজ্যসমূহের মন্ত্রী সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। কোচবিহারের প্রধান মন্ত্রী সর্দ্দার ডি, কে, সেন মহোদয় এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ১লা ও ২রা মে তারিখে বোম্বাই সহরেই দেশীয় নৃপতিগণের সম্মেলন হয়; এবং ৩রা ও ৪ঠা মে নৃপতিগণের বিশেষ কমিটির অধিবেশন হয় নৃপতি সম্মেলন ও কমিটির অধিবেশনে ভূপালের নবাব বাহাদুর সভাপতিত্ব করেন। পত্রান্তরে প্রকাশ যে নৃপতি সম্মেলন ও মন্ত্রী সম্মেলনে ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা, যুদ্ধ পরিস্থিতি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিতে শাসন ব্যবস্থায় সংস্কার এবং অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর রাজ্যসমূহের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা ও বর্দ্ধমানের মহারাজার দান

দ্বারভাঙ্গা মহারাজা অলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা উক্ত

বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল কলেজ ফণ্ডে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন এবং আগামী জুলাই মাসে মেডিক্যাল কলেজের কাজ আরম্ভ হইলে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। দ্বারভাঙ্গা ও বর্দ্ধমানের রাজবংশ চিরদিনই শিক্ষাকল্পে দানের জন্য প্রসিদ্ধ।

ডক্টর সুরেন দাশগুপ্তের লাইব্রেরী কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দান

ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান দর্শনাধ্যাপকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন। তিনি তাঁহার বিরাট লাইব্রেরী কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই লাইব্রেরী বহু অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ও মূল্যবান পুস্তকাদিতে সমৃদ্ধ। ভারতে ব্যক্তিগত সংগ্রহরূপে ইহা বোধ হয় অদ্বিতীয়; দর্শন, বিশেষ করিয়া ভারতীয় দর্শন এবং ভারততত্ত্ব (Indology) অধ্যয়ন করিতে হইলে এই পুস্তক সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। ডক্টর দাশগুপ্ত জীবনব্যাপী প্রচেষ্টায় এই লাইব্রেরী গড়িয়া তুলিয়াছেন; ইহার মূল্য সওয়া লক্ষ টাকা হইবে। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পৃষ্ঠপোষকতায় ডক্টর দাশগুপ্ত ১৯১৩ সালে তাঁহার লাইব্রেরী গড়িয়া তুলিতে আরম্ভ করেন; মহারাজা নন্দী আজীবন এই লাইব্রেরীকে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। ডক্টর দাশগুপ্তের ইচ্ছা যে এই লাইব্রেরীকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর নামে একটি গবেষণাগার গড়িয়া উঠে।

শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবীর জগত্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ

বাংলার বিখ্যাত লেখিকা শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন। এই পদক স্বর্গগত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দানে তাঁহার মাতৃদেবীর নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতি বৎসর বাংলার একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিককে এই পদক দেওয়া হয়। প্রথম বৎসরের পদক রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া হইয়াছিল। আমরা বর্ষীয়সী বাঙ্গালী লেখিকার এই পদকপ্রাপ্তিতে আনন্দিত হইয়াছি। নিরুপমা দেবীর "দিদি", "অন্নপূর্ণার মন্দির" প্রভৃতি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ।

সাময়িক প্রসঙ্গ

সপ্রু রিপোর্ট ও দেশীয় রাজ্য :—

সপ্রু কমিটির রিপোর্ট লইয়া দেশবিদেশে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু রিপোর্টের একটি সুপারিসের প্রতি সাংবাদিকগণের দৃষ্টি তেমন আকৃষ্ট হয় নাই। দেশীয় রাজ্যসমূহের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান সম্বন্ধে কমিটি একটি নূতন সুপারিস করিয়াছেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে এইরূপ বিধান আছে যে লোকসংখ্যার অনুপাতে অন্ততঃ অর্দ্ধেক দেশীয় রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে সম্মত না হইলে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা (Federal Government) প্রবর্ত্তিত হইবে না। কিন্তু সপ্রু কমিটি এরূপ কোন সর্ত্ত আরোপের বিরোধী। তাঁহারা বলেন দেশীয় রাজ্যসমূহ ইচ্ছা করিলে পৃথক পৃথক ভাবে বা কয়েকটি রাজ্য একত্রিত হইয়া সম্মিলিত ভাবে ("in blocs") যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের অধিকারী হইবেন, এবং এই যোগদানের সর্ত্ত যুক্তরাষ্ট্র ও দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে আলাপ আলোচনা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে।

দেশীয় রাজ্যসম্বন্ধে কমিটির আর একটি সুপারিশ এই যে দেশীয় রাজ্যসমূহের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক একজন মন্ত্রীর পরিচালনাধীনে থাকিবে। এই মন্ত্রীর তিন হইতে পাঁচজন উপদেষ্টা থাকিবেন এবং এই উপদেষ্টাগণ দেশীয় রাজ্যসমূহের সম্মতি অনুসারে নিযুক্ত হইবেন। সকল জরুরী ব্যাপারে মন্ত্রী এই উপদেষ্টাগণের সহিত পরামর্শ করিবেন এবং আইনে উল্লিখিত কতকগুলি নির্দিষ্ট ব্যাপারে মন্ত্রী উপদেষ্টাগণের পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। সপ্রু কমিটির এই সুপারিশ দেশীয় রাজ্যসমূহের স্বার্থসংরক্ষণে সহায়তা করিবে।

পরীক্ষায় ছাত্রগণের অসাধুতাঃ—

গত কয়েকবৎসর হইতে পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের মধ্যে নানারূপ অসাধুতা ও দুর্নীতির প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। ক্রমশঃ অবস্থা এরূপ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে ছাত্রগণ প্রকাশে পরীক্ষার পরিদর্শকগণকে ভয়প্রদর্শন, এমন কি প্রহার পর্য্যন্ত করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে না। গত প্রবেশিকা পরীক্ষার রংপুর কেন্দ্রে একজন ছাত্রকে অসাধুতার জন্য পরীক্ষাগৃহ হইতে বহিষ্কৃত করা হয়; স্থানীয় এক বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক মহাশয় এই অসাধু ছাত্রের বহিষ্কারের জন্য দায়ী, স্বীয় কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া শিক্ষক মহাশয় যখন গৃহে ফিরিতেছিলেন তখন পথিমধ্যে তিনি নৃশংসরূপে প্রহৃত হন এবং সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসপাতালে নীত হন, হাসপাতালে তাঁহাকে কয়েকদিন অতিশয় আশঙ্কাজনক অবস্থায় কাটাইতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এই ছাত্রকে চিরদিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষা দানের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন এবং পরীক্ষায় অসাধুতা নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। আমরা সাগ্রহে এই কমিটির সুপারিশের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি কথা বলিবার আছে। বর্ত্তমানে সারা দেশময় একটা অসাধুতা ও দুর্নীতির আবহাওয়া বহিতেছে উচ্চনীচ ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সমগ্র জাতি যেন একটা দুর্নীতিময় অসাধু জীবন যাপন করিতেছে; ঘুষ, চোরাবাজার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্যায়, অসত্য, দুর্নীতি কোনটাকেই আজ আর ঘৃণার চক্ষে দিয়া কেহ মনে করে না। জাতির মেরুদণ্ড ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে এবং দেশের যাহারা তরুণ, যাহারা ভবিষ্যতের আশাভরসার স্থল তাহাদের মধ্যেও দুর্নীতির বিষ প্রবেশ করিয়া জাতিকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। ছাত্রগণের বর্ত্তমান কলঙ্কজনক মনোবৃত্তি ও অশ্রদ্ধেয় আচরণের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য আমরা ছাত্র সমাজকেই আহ্বান করিতেছি। যৌবনের ভাবুকতা ও আশাবাদ লইয়া অগ্রসর হইলে তাহারাই দেশময় দুর্নীতি দূর করিতে সক্ষম হইবে।

সরকারী শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা—

ভারত-সরকার কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের ভবিষ্যত শিল্পনীতি বিবৃত করিয়া একটি পরিকল্পনা সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায় যে পূর্ব্বতন ঔদাসীন্য নীতি (Laissez faire) পরিত্যাগ করিয়া ভারত সরকার দেশের শিল্পোন্নয়ন নিজ হস্তে গ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। অবশ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও কিছু হয় নাই, তবে ভারত-সরকার তাঁহাদের পরিকল্পনার মোটামুটি একটা আভাস দিয়াছেন।

ভারতসরকার আনুমানিক কুড়িটি বৃহৎ শিল্প নিজ নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিতে চাহেন; তন্মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, ইঞ্জিন ট্রাক্টর বিমান প্রভৃতি নির্ম্মাণ, জাহাজ নির্ম্মাণ, বৈদ্যুতিক ও ভারী যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ, মেসিন টুল তৈয়ার, রাসায়নিক শিল্প, সিমেণ্ট, পাওয়ার এলকোহল, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন প্রভৃতি প্রধান। এতদ্ব্যতীত সরকার অন্য সকল শিল্পব্যাপারে বেসরকারী চেষ্টা যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে তজ্জন্য আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্য করিবেন। ভারত-সরকার বলেন যে এই উপায় অবলম্বনে ভারতের সমৃদ্ধি অচিরে বাড়িবে এবং অর্জ্জিত অর্থের সুষ্ঠু বণ্টনের দ্বারা দেশের দারিদ্র্য কমিবে এবং দেশময় জীবনধারণের মান বাড়িবে।

ভারত-সরকারের এই পরিকল্পনা দেশেবিদেশে নানারূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতীয় শিল্পপতিগণ ইহাতে বহুবিধ অনিষ্টের সম্ভাবনা দেখিতে পাইয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন; তাঁহারা বলেন যে এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে ব্যক্তিগত শিল্পপ্রচেষ্টা সমাধি লাভ করিবে। তাহা হয়তো করিবে; কিন্তু এক্ষেত্রে ইহাই বড় কথা নয়, আসলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে কিনা তাহাই

প্রধান বিবেচ্য। কেহ কেহ বলেন যে এই ব্যবস্থায় বৃটিশ শিল্পী ও পুঁজিপতিদিগেরই সুবিধা হইবে। আমাদের মনে হয় ভারত-সরকারের উপর যদি দেশীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারত-সরকার যদি জনগণের প্রকৃত কল্যাণকামনায় কার্য্য করেন তাহা হইলে এই শিল্পোন্নতি পরিকল্পনায় দেশের মঙ্গল হইবে।

দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশে যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত স্যার জন উডহেডকে সভাপতি করিয়া একটি দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সম্প্রতি এই কমিশনের রিপোর্টের প্রথমভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। কমিশনের মতে বাংলা দেশে অনশনে পনর লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে; অথচ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার পূর্ব্ব হইতে চেষ্টা করিলে এই দুর্ভিক্ষ ও লোকক্ষয় নিবারণ করিতে পারিতেন। এই দুর্ভিক্ষের জন্য উৎপন্ন শস্যের ঘাটতি কতকাংশে দায়ী, কিন্তু তাহা হইলেও গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতে সচেতন হইয়া শস্যসংগ্রহের ব্যবস্থা করিলে এবং দুর্ভিক্ষের সময় তাহার নিয়মিত বণ্টনের ব্যবস্থা করিলে এই দুর্ভিক্ষ নিবারণ করা কঠিন হইত না, ইহাই কমিশনের সুচিন্তিত অভিমত। দুর্ভিক্ষের সময় বেপরোয়াভাবে চাউলের চোরাবাজার চলিতে থাকে। গভর্ণমেণ্ট কেবল চাউলের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াই খালাস, কিন্তু নির্দ্ধারিত মূল্যে যাহাতে চাউলের সরবরাহ হয় গভর্ণমেণ্ট তাহার কোন বন্দোবস্ত করেন নাই। কমিশনের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে কেবলমাত্র চাউলের ব্যবসায়ে অতি-লোভী ব্যবসায়ীরা দুর্ভিক্ষের সময় ১৫০ কোটী টাকা লাভ করিয়াছিল, এবং এই লাভ যোগাইবার জন্য পনর লক্ষ বাঙ্গালীকে অন্নাভাবে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। প্রত্যেকটি বাঙ্গালীর মৃত্যুর বিনিময়ে চাউল ব্যবসায়ীরা হাজার টাকা অতিরিক্ত লাভ করিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি কথা বলিবার আছে। সাধারণতঃ সংবাদপত্রসমূহে দেশীয় রাজ্যের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়া থাকে; প্রায়ই বলা হয় দেশীয় রাজ্যের শাসনব্যবস্থা মধ্যযুগীয়, নানাদোষত্রুটি পূর্ণ এবং বর্ত্তমানের সহিত সামঞ্জস্যহীন। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি নানাবিষয়ে ব্রিটিশ ভারতের শাসনব্যবস্থা হইতে দেশীয় রাজ্যের শাসনব্যবস্থা উৎকৃষ্ট। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ বাংলা দেশের অন্তর্গত কোচবিহার রাজ্যেও দেখা দিয়াছিল, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইয়া চাউল সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং নিয়ন্ত্রিত মূল্যে সংকারী গুদাম হইতে সর্ব্বসাধারণকে প্রয়োজনায় চাউল সরবরাহ করিয়াছিলেন। চাউলের মূল্য ঊর্দ্ধে কেবল পক্ষকালের জন্য ২০৲ টাকা উঠিয়াছিল; কিন্তু সাধারণতঃ ১০৲ হইতে ১৫৲ টাকার মধ্যেই উঠা নামা করিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, না খাইতে পাইয়া কোচবিহার রাজ্যে কেহ মারা যায় নাই। সমালোচকগণ অনেক সময় ভুলিয়া যান যে দেশীয় রাজ্যের শাসনব্যবস্থার একটা মস্ত সুবিধা এই যে এখানে শাসক ও শাসিতের মধ্যে একটা প্রাণের যোগ থাকে, স্যার সি, ভি, রামন কয়েকদিন পূর্ব্বে এক সাংবাদিক বৈঠকে দেশীয় রাজ্যের এই "personal touch" এর সুখ্যাতি করিয়াছেন।

পঁচিশে বৈশাখ—

পঁচিশে বৈশাখ বাঙ্গালীর জীবনে এক স্মরণীয় দিন। লোকোত্তর প্রতিভা লইয়া ঐদিন রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অমর অবদানে সমৃদ্ধ হইয়া বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সম্মানজনক আসন লাভ করিতে সক্ষম হয়। আমরা যে ভাষায় আজ কথা বলি, যে ভাবে ভাবিত হইয়া চিন্তা করি তাহার কতখানি যে রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে আমরা পাইয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি 'স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্ত্তি"রূপে দেশে দেশে ভারতের সাধনা ও ঐতিহ্যের কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। গত পঁচিশে বৈশাখ তাঁহার জন্মদিনে দেশ বিদেশে সর্ব্বত্র তাঁহার উদ্দেশে স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। নরদেহে তিনি আর ইহলোকে নাই; কিন্তু আমাদের অন্তরে তিনি নবজন্ম লাভ করুন, আমরা সমগ্র হৃদয় দিয়া তাঁহার বাণী গ্রহণ করি, আমাদের সকল কর্ম্মে তাঁহার সাধনা ফুটিয়া উঠুক—তাহা হইলেই তাঁহার স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন সত্য ও সার্থক হইবে।

খেলাধূলা

মিত্রপক্ষের বিজয় উৎসব উপলক্ষ্যে ফুটবল খেলা—

১৫ই মে মিত্রপক্ষের বিজয় উৎসব উপলক্ষে রাজবাড়ীর মাঠে মিলিটারী একাদশ বনাম অবশিষ্ট কোচবিহার দলের মধ্যে একটি ফুটবল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। মহারাজা ভূপ বাহাদুর ও ক্যাপ্টেন এস্ রায় মিলিটারী একাদশের পক্ষে খেলেন।

খেলা দেখিবার জন্য বহু জনসমাগম হয়। খেলা আরম্ভ হইবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুই দলের তীব্র প্রতিযোগিতা লক্ষিত হয়। অবশিষ্ট দলের ফরোয়ার্ডগণের মধ্যে এ দাশ গুপ্ত, মণ্টু রায় ও ম াথাকে বেশ আদান প্রদান করিয়া খেলিতে দেখা যায়। এই দলের হাফ ব্যাক কেষ্ট ও কান্তি বেশ ভালভাবে ফরোয়ার্ড লাইনকে বল যোগায়। মিলিটারী দলের গোলকীপার বাবুলাল খুব দক্ষতার সহিত গোল রক্ষা করিতে থাকে; কিন্তু প্রথমার্দ্ধের শেষ ভাগে মণ্টু রায়ের কিকে একটি গোল হয়; বাবুলাল প্রথমে বলটি ধরিয়া ফেলে বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বলটি তাহার হাত হইতে ফসকাইয়া যায়।

দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথম হইতেই মিলিটারী দল আক্রমণ করিয়া খেলিতে থাকে এবং মহারাজা সাহেব অতি সুকৌশলে প্রতিপক্ষের ব্যাকদ্বয়কে অতিক্রম করিয়া একটি গোল করেন। ইহার পরে তীব্র প্রতিযোগিতার সহিত উভয় পক্ষের খেলা চলিতে থাকে। অবশিষ্ট দলের রক্ষিত গোল করিবার কয়েকটি সুযোগ পাইয়াও গোল করিতে পারিলেন না। পরে খেলা শেষ হইবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে মিলিটারী দলের লেঃ ভগবান সিং একটী গোল করেন। ফলে মিলিটারী দল ২-১ গোলে বিজয়ী হন

এসোশিয়েসন ফুটবল (কোচবিহার)

মে মাসের শেষ সপ্তাহে কোচবিহার এসোসিয়েসন ফুটবল কাপ টুর্ণামেন্ট খেলা আরম্ভ হইবে। এ পর্য্যন্ত বাহির হইতে দিনাজপুর, রংপুর, ধুবড়ী, গাইবান্ধা, বগুড়া পাবনা, দোমহনি, নিলফামরী, ডোমার, আলিপুর প্রভৃতি স্থান হইতে খেলোয়াড় দল প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য আবেদন পাঠাইয়াছেন।

হকিখেলা—

বেটন কাপ প্রতিযোগিতা—

কলিকাতায় বেটন কাপ প্রতিযোগিতামূলক হকি খেলা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। গত ২৮শে এপ্রিল এই খেলার ফাইন্যাল ক্যালকাটা মাঠে খেলা হয়। বি, এন, আর দল ও মহমেডান স্পোর্টিং দলের মধ্যে এই দিন প্রতিযোগিতা হয়। বি, এন, আর দল ৩-১ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে পরাজিত করে। এইবার লইয়া বি, এন, আর দল পর পর তিনবার বেটন কাপ বিজয়ী হইল; ইতিপূর্ব্বে একমাত্র কাষ্টমস্ দল ছাড়া অন্য কোন দল এইরূপ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে পারে নাই।

আগা খাঁ কাপ প্রতিযোগিতা—

আগা খাঁ কাপ প্রতিযোগিতা খেলা বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই খেলার ফাইন্যাল গত ২১শে এপ্রিল কানপুরের কমলা ক্লাব ও ইন্দোরের কল্যাণমল মিল দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। ফাইন্যালে কানপুর দল ২-০ গোলে ইন্দোর দলকে পরাজিত করিয়াছে।

ফুটবল খেলা আরম্ভ—

বাংলার ফুটবল খেলার মরসুম আরম্ভ হইয়াছে। খেলোয়ার ও দর্শক উভয়ের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। গত ১লা মে মঙ্গলবার হইতে কলিকাতা ময়দানে প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগ খেলা আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম দিনের খেলা খুব চমকপ্রদ হয়; এই দিন গত বৎসরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দল ডালহৌসী দলকে অতি সহজেই ৩-০ গোলে পরাজিত করে এবং ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব গত বৎসরের শীল্ড বিজয়ী বি ও, এ রেল দলকে ২-১ গোলে পরাজিত করে। বি, এ রেল দলের পরাজয় অপ্রত্যাশিত। জয় পরাজয়ের মধ্য দিয়া বিভিন্ন দলের লীগ প্রতিযোগিতা খেলা চলিতেছে।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

কোচবিহার দর্পণ

"তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে—
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।"

—রবীন্দ্রনাথ

অষ্টম বর্ষ | শ্রাবণ ১৩৫২ সন, রাজশক ৪৩৬ | ৪র্থ সংখ্যা

জয়দেব

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র রায় বাহাদুর এম্-এ

কবিশিরোমণি শ্রীজয়দেবের কথা পুরাতন। কিন্তু পুরাতন হইলেও জয়দেব চিরনূতন। জয়দেবের বহু আলোচনা হইয়াছে, হইবেও বহু। তাহার কারণ জয়দেব বাংলা কবিতাধারার মূল প্রস্রবণ। বাংলার এক ক্ষুদ্র পল্লী কেন্দুবিল্ব, সেই পল্লীর কবি নিভৃতে যে গীত গাহিয়া গিয়াছেন তাহা এই অষ্ট শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালীর প্রাণ মাতাইয়া রাখিয়াছে। জয়দেব হইতেই বাঙ্গালীর গীতিকবিতা। সেই 'কোমলকান্ত পদাবলী' সুরতানলয়ে কীর্ত্তনেরও জন্মদান করিয়াছিল। বৈষ্ণব-গীতিকবিতার তুলনাও সারা বিশ্বে মিলে না, কীর্ত্তনের মত এমন ললিতকোমল, মদিরা-তরল গানও জগতে দুর্লভ। এই জন্য সমস্ত সভ্য জগতে জয়দেবের সমাদর। ইংলণ্ডে Sir Edwin Arnold জয়দেবের কবিতার ঝঙ্কারে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার ইংরেজি কবিতার সঙ্গে "মা কুরু মানিনি মানময়ে" বুনিয়া দিয়াছেন। জার্ম্মাণ, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষায় গীতগোবিন্দের অনুবাদ হইয়াছে।

কেহ কেহ অনেক সময় গীতগোবিন্দকে অনুপ্রাস-বহুল শব্দালঙ্কারপ্রধান কাব্য বলিয়া একটু উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আমরা অলঙ্কারশাস্ত্র হইতে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তাহার এমন সহজ প্রয়োগের সুযোগ কি পরিত্যাগ করিতে পারি? কিন্তু এরূপ নিশ্চিন্ত মনে আমরা যে সিদ্ধান্ত করি, তাহার মূলে যে

কত বড় অবিচার আছে তাহা ভুলিয়া যাই। আমরা ভুলিয়া যাই যে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ একখানি গতানুগতিক ধরণের কাব্য নহে। কালিদাসের সমস্ত কাব্যসৃষ্টির মধ্যে মেঘদূত যেমন মৌলিকতায় এখনও বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করে, জয়দেবের এই গীতিকবিতা তেমনি একখানি মৌলিক কাব্য। ইহার তুলনা প্রাচীন সাহিত্যে বিরল—গীতিকবিতা হিসাবেও বটে, সুরলয়যুক্ত গান হিসাবেও বটে। কালিদাসের প্রসিদ্ধ কাব্য বিক্রমোর্বশীতে কয়েকটি অন্ত্যমিলযুক্ত গান আছে, গানগুলি প্রাকৃতে রচিত, প্রায়ই চর্চরী জাতীয়। কিন্তু জয়দেবের গীতগোবিন্দে ছন্দঝঙ্কারময়ী যে অনবদ্য গীতিকবিতা আমরা পাই, তাহার তুলনা কোনও দেশের সাহিত্যে মিলে না। আধুনিক সমালোচকের বিচারে যদি এই অতুলনীয় মাধুর্য প্রথমশ্রেণীর কাব্যোৎকর্ষ বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলেও মৌলিক স্রষ্টা হিসাবে জয়দেবের স্থান অনতিক্রম্য বলিয়া নিশ্চয়ই স্বীকৃত হইবে। জয়দেব বাংলা কবিতার আদি গুরু। বাংলা কবিতার ছন্দ, প্রকাশভঙ্গী, অনুপ্রাস, কোমলতা ও মাধুর্য সবই জয়দেবের বরহস্তের অমূল্য দান। জয়দেব তাঁর সংস্কৃত পদাবলীতে যে সুরে সুর বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন, বাংলা কাব্যলক্ষ্মীর বীণায় তাহাই আজ পর্যন্ত অনুরণিত হইতেছে।

জয়দেবকে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিরা কি ভাবে অর্চনা করিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায় যে, বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাঁহার স্থান কত উচ্চে :

জয় জয় জয়- দেব দয়াময়
পিরীত রতনখনি।
পরম পণ্ডিত পূজ্য গুণগণ-
মণ্ডিত চতুর মণি॥
পদ্মাবতী সঙ্গ গানে বিচক্ষণ
আনে কি উপমা সাজে।
পশু পক্ষ ঝুরে শুনিয়া গন্ধর্ব
কিন্নর মরমে লাজে॥

—নরহরি দাস।

এই কবিদম্পতি যে গানে অদ্ভুত প্রতিভাশালী ছিলেন, তাহা 'সেক শুভোদয়া' হইতেও জানা যায়। সেক শুভোদয়া সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত। সেক শুভোদয়ায় একটি গল্প আছে যে বুঢন মিশ্র নামে এক দিগ্বিজয়ী গায়ক লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় আসিয়া জয়পত্র লিখিয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু পদ্মাবতী ও জয়দেব এই দিগ্বিজয়ীকে গানে পরাস্ত করিলেন। গীতগোবিন্দের 'পদ্মাবতীচরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী' দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, জয়দেবের মনোহর গীতের সঙ্গে পদ্মাবতী নৃত্য করিতেন অথবা উভয়েই নৃত্যগীতের দ্বারা কৃষ্ণের উপাসনা করিতেন।

ভক্তমালে এবং বনমালী দাসের জয়দেব চরিত্রে জয়দেব সম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তী ও অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। তাহার মধ্যে একটি প্রবাদ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। জয়দেবের গীতগোবিন্দের একটি পদ ভগবান নিজে পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন। জয়দেব 'স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং' পর্যন্ত লিখিয়া অবশিষ্টাংশ লিখিতে কুণ্ঠিত হইলেন

কৃষ্ণ চাহে পাদপদ্ম মস্তকে ধরিতে।
কেমনে লিখিব ইহা বিস্ময় বড় চিতে॥

কিন্তু ভগবান সে সংশয়ের অবসান করিয়া দিলেন : নিজ পদ্মহস্তে লিখিয়া দিলেন :

দেহি পদপল্লবমুদারম্।

উপরে নরহরি দাসের যে পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতেও আছে :

যার বিরচিত শ্রীগীতগোবিন্দ
গ্রন্থ সুকৌশল তাতে।
গোবিন্দ আনন্দে 'দেহি পদপল্লব'
আদি বলিলেন যাতে॥

এই সকল কিম্বদন্তী ও প্রবাদ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, কবির হৃদয় ভক্তিভাবের উৎস ছিল এবং তাঁহার সমকালে এবং পরবর্ত্তী কালেও জয়দেবের ন্যায় ভক্ত কবি দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। বাঙ্গালীর মনের স্বাভাবিক ভাবালুতা ও রসপ্রবণতা জয়দেবের কবিতার স্বচ্ছ মুকুরে প্রথম আপনার রূপ দেখিল। বাস্তবিক এমন রূপ ও রসের পসরা লইয়া ইহার পূর্ব্বে বাংলা দেশে কোনও কাব্য আবির্ভূত হয় নাই। বাঙ্গালীর প্রতিভা সাধারণতঃ গীতিকবিতাধর্ম্মী। যে lyric মাধুর্য গ্রীকসাহিত্যে পাওয়া যায়, জর্ম্মাণ কবি হায়েনের মধ্যে যে রসটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইংরেজ কবি শেলির মধ্যে যে রসের আভাস মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, তাহারই মধ্যে বাঙ্গালীর কাব্য-প্রতিভার স্বাভাবিক বিলাস দেখিতে পাওয়া যায়। জয়দেবই সেই যাদুকর শিল্পী যিনি রূপে রসে মজাইয়া তাঁর অনুপম চিত্র আঁকিয়াছিলেন।

কাব্যে যতপ্রকার রস আছে, তাহার মধ্যে শৃঙ্গার রসই মুখ্য। বিশ্বের সমস্ত কাব্য ও কবিতার মধ্যে এই শৃঙ্গার রস ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে। সার্ব্বজনীন প্রীতির আস্পদ বলিয়াই শৃঙ্গার রসের নাম মধুর রস। কিন্তু জয়দেব এই মধুর রসকে যে ভাবে পরিবেশন করিয়াছেন তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কেহই সেরূপ পারেন নাই। বস্তুতঃ ভগবানকে মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার রস রূপে কল্পিত করিয়া তিনি যে ভক্তিভাব ও সাহিত্যরসের মধ্যে এক স্বর্ণশৃঙ্খল নির্ম্মাণ করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার। মনে রাখিতে হইবে যে, জয়দেবের কাব্য ধর্ম্মগ্রন্থ নহে, অর্থাৎ মনুসংহিতাও নয়, ভগবদ্গীতাও নয়। গীতগোবিন্দ কাব্য; কাব্যরসই ইহার প্রধান সম্পদ্। অথচ তাহার মধ্য দিয়া একটি স্বচ্ছন্দ অন্তঃসলিল প্রবাহরূপে ভক্তিভাবের ফল্গুধারা তিনি কেমন করিয়া বহাইলেন, তাহা চিরদিন ভাবুক-মনের বিস্ময়ের বস্তু হইয়া থাকিবে। তিনি যে 'মঙ্গলমুজ্জ্বল গীতি' গাহিয়া গিয়াছেন সেই উজ্জ্বল রসই বৈষ্ণব কাব্য, বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের সারকথা হইয়া রহিয়াছে।

কাহারও কাহারও মতে জয়দেবের কাব্যে এই আদি-রসাধিক্য শ্লীলতার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সমালোচনা নিছক রুচির উপর নির্ভর করিতেছে। কাব্যের নিয়ামক পরিবর্ত্তনশীল রুচি নহে, খেয়াল নহে, অলঙ্কার শাস্ত্রের ধরাবাঁধা নিয়ম। কাজেই কাব্যের রসসৃষ্টির প্রয়োজনে, অলঙ্কারশাস্ত্রের শাসনে জয়দেব যে চিত্রকাব্য রচনা করিয়াছেন তাহা সাময়িক রুচির দ্বারা বিচার্য নহে। হিন্দুসাম্রাজ্যের অস্তগমন কালে শেষ অক্ষম নরপতির রাজসভার রুচি যদি বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর রুচির দ্বারা সমর্থিত না-ও হয় তাহা হইলেও জয়দেবের অনন্যসাধারণ সৃজনীপ্রতিভার বিলাস ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না।

গীতগোবিন্দ আদিরসপ্রধান হইলেও জয়দেব যে সহজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না, তাহা বুঝা যায় তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই। তিনি বলিতেছেন যে,

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুর কোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্॥

—গীতগোবিন্দ ১ম সর্গ

সুতরাং জয়দেব যে আদিরসের জন্যই আদিরস সৃষ্টি করেন

নাই, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তিনি গ্রন্থশেষেও এই কথা বলিয়া উপসংহার করিতেছেন :

যদ্গান্ধর্বকলাসু কৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদ্বৈষ্ণবং
যচ্ছৃঙ্গারবিবেকতত্ত্বমপি যৎ কাব্যেষু লীলায়িতম্।
তৎসর্বং জয়দেবপণ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণৈকতানাত্মনঃ
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ।

হে সুধী সজ্জনগণ! যদি সঙ্গীত-শাস্ত্রোক্ত গীতরাগ তালাদিতে কৌশল, সর্বব্যাপী বিষ্ণুর অনুধ্যান, কাব্যকথায় লীলায়িত শৃঙ্গারতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের বাসনা থাকে, তবে কবি জয়দেব পণ্ডিতের এই শ্রীগীতগোবিন্দ হইতে আনন্দ সহকারে তাহা লাভ করিয়া আশঙ্কাপঙ্ক হইতে বিমুক্ত হউন (পরিশোধয়ন্তু), কারণ জয়দেবের আত্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত একতান, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান।

সহজিয়া সম্প্রদায় অনেকটা বৈষ্ণব ভাবধারা অনুসরণ করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের ভজন-প্রণালী কিছু ভিন্ন প্রকার। বৈষ্ণবেরা যেমন রাধাকৃষ্ণলীলাকে সর্বপ্রকার কামগন্ধবিবর্জিত ভাবে গ্রহণ করিবার প্রয়াসী, সহজিয়ারা তাহা নহেন। তাঁহাদের সহজসিদ্ধি বা সহজানন্দ যৌন প্রবৃত্তির একান্তবর্জননিষ্ঠ নহে। জয়দেবের মত যে ইহাদের অনুকূল ছিল না, তাহা বুঝা যায় শ্রীচৈতন্যের অনুরাগ হইতে। শ্রীচৈতন্য যে জয়দেবের কাব্যের অনুরাগী ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। চৈতন্যের প্রিয় পার্ষদ আজীবন ব্রহ্মচারী, সুপণ্ডিত, রসজ্ঞ ও ভক্ত স্বরূপ দামোদর জয়দেবের পদাবলী গান করিয়া চৈতন্যদেবকে তাঁহার দিব্যোন্মাদ দশায় আনন্দ দান করিতেন। এই জন্য অন্যান্য বৈষ্ণবমহাজনগণের অগ্রণী রূপে জয়দেব এখনও বঙ্গদেশে পূজিত হইয়া থাকেন।

শিক্ষার পথ-সঙ্কট

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত

জন্মাবধি আমরা শুনে আসছি স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখছি ভূমিষ্ঠ হওয়ার মুহূর্ত্ত থেকেই মানুষের সর্ব্ববিধ অধীনতার সূত্রপাত। দৈহিক স্বাধীনতা, অর্থাৎ ইচ্ছামত চ'লে ফিরে বেড়াবার শক্তি, অর্জ্জন করতে যেখানে গোবৎসের মাত্র কয়েক ঘণ্টা লাগে, হয়ত উচ্চস্তরের জীব ব'লেই, মানবশিশুর সেই প্রাথমিক স্বাধীনতাটুকু অর্জ্জন করতেও কয়েক বৎসর অতীত হয়। মানুষের প্রতি প্রকৃতি প্রথম থেকেই এমন অকরুণ। কেবল কাঁদবার শক্তিই বুঝি মানুষের সহজাত ও জন্মগত। বাকি সবই তাকে শিখে নিতে হয়,—দেখে ও ঠেকে। দেখতে দেখতে, ঠেকতে ঠেকতে মানুষ হাজার হাজার বৎসর ধ'রে নানা শিক্ষায় শিক্ষিত ও নানা দীক্ষায় দীক্ষিত হ'য়ে সভ্যতার বিবর্ত্তন পথে এক স্তর থেকে আর এক স্তরে ক্রমোন্নতিলাভ ক'রতে ক'রতে আজ এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছে— যেখানে সে গুটিপোকার মতই নিজের কর্মসূত্রে নিজে বাঁধা প'ড়ে গেছে। শুতে, বসতে, খেতে, সবদিকেই তার বন্ধন। সংস্কার তাকে বেঁধেছে, সমাজ তাকে বেঁধেছে,

রাষ্ট্র তাকে বেঁধেছে, ধর্ম্মও তার বন্ধন বাড়িয়ে চ'লেছে। শিক্ষা মানুষকে তার জন্মগত অধিকারে কতখানি অগ্রসর ক'রে দিয়েছে, সে পরিচয় আজ জগৎব্যাপী মহাবিপ্লবে নিতান্ত নির্ম্মমভাবে প্রকট হ'য়ে প'ড়েছে। স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে—বিশ্বমানব যুগযুগান্তর শিক্ষা পেয়েও তার অভীপ্সিত পথে কিছুমাত্র অগ্রসর হ'তে পারেনি,—যে পথে সে আশা করেছিল আত্মার স্বাধীনতা, শান্তি ও কল্যাণ মিল্‌বে।

এসব অবশ্য বড় কথা সারাবিশ্বের সর্ব্বমানবের অন্তর্নিহিত মর্ম্মকথা। হতভাগ্য ভারতের কথা আজ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দীর্ঘদিনের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে ভারত উপলব্ধি ক'রেছে—যে পথে আজ পর্য্যন্ত তার শিক্ষা চ'লে আসছে তা ভুলপথ, দাসত্বের রাজপথ। সে পথে কোন দিন চিন্তায় ও কর্ম্মে স্বাধীনতার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না। আত্মিক স্বাধীনতা, শান্তি ও কল্যাণের কথা দূরে থাক্—দৈহিক স্বাধীনতা শান্তি ও কল্যাণও এখানে একান্ত দুর্ল্লভ। এখানকার ও এখনকার স্বাধীনতা ব'লতে—বাধা গরুর চ'রে খাবার, খুঁটে খাবার স্বাধীনতা, শান্তি ব'লতে—ক্ষুধাশান্তি, কল্যাণ ব'লতে—পেটের কল্যাণ। ভারতের শিক্ষিতসাধারণ তার লব্ধশিক্ষার ফলে এই নিতান্ত সীমাবদ্ধ আদর্শের পথেও নিজের নিজের চ'রে খাবার খুঁটে খাবার শক্তি অর্জ্জন করে নি। দেশব্যাপী অর্দ্ধাশন অনশন মহামারীর মধ্যে আমাদের শিক্ষা কোন্ আশার বাণী বহন ক'রে আনে? দুর্ভিক্ষের মৃত্যুতাণ্ডবে আমাদের শিক্ষা কোন্ কাজে লাগ্‌ল? নগ্নদেহ নিরন্ন জাতি আজ ছুটে চ'লছে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পথে কে তাকে রোধ ক'রবে? ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, যা কিছু মানুষের লক্ষ্য হ'ক, তাকে খেয়ে-প'রে বেঁচে থাকতে হবে আগে। খাওয়াপরার স্বাধীনতা নিম্নস্তরের কথা বটে, কিন্তু সেই স্তরেই আছে বৃহত্তর স্বাধীনতার মূল, জীবনরসের যোগান্। এই খাওয়া-পরা বা অন্নবস্ত্রের সমস্যা সার্ব্বজনীনভাবে দূর করবার উপায় এদেশের শিক্ষার মধ্যে নেই, সুতরাং এপথে চ'লে স্বাধীনতার সন্ধানও মিলিবে না।

খাওয়াপরা সমস্যার সমাধান প্রতীচ্যদেশ সুষ্ঠুভাবেই ক'রেছিল। মানুষকে না খেয়ে মরতে হবে না এমন শিক্ষার ব্যবস্থা সে সব দেশের রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে হ'য়েছে। তবুও তাতে মানুষের প্রার্থিত স্বাধীনতা ও কল্যাণ আসে নি। কারণ সে ব্যবস্থা মূলতঃ কেড়ে খাওয়ার ব্যবস্থা। একশ্রেণী অপর শ্রেণীকে পেষণ ক'রে, একজাতি অপরজাতিকে শোষণ ক'রে কি উপায়ে অন্নবস্ত্রের সমস্যা দূর করা যায় সেই শিক্ষাই তারা দিয়ে এসেছে। বিড়ালমাতা যে পদ্ধতিতে তার শাবকদের শিকারকৌশল শিক্ষা দেয় এ যেন সেই পদ্ধতি। তারই ফলে আজ বিশ্বব্যাপী কুরুক্ষেত্র এখনও ধূমায়িত।

সুতরাং অন্নবস্ত্রের সমাধানক্ষম শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভাবতে গিয়েও আমাদের মনে আসে, পরস্পর কাড়াকাড়ি ক'রে খাওয়ার যে শিক্ষা তাতে প্রকৃত স্বাধীনতা, শান্তি বা কল্যাণ আসবে না। সে পথ প্রত্যক্ষ হিংসার পথ। তার একপ্রান্তে উৎকট দেশাত্মবোধ, অপর প্রান্তে সর্ব্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ। মানবজাতির পক্ষে এটি পথ নয়, মহাপথ। পশ্চিম ঘরে ও বাহিরে যে শিক্ষা প্রবর্ত্তিত ক'রেছে, উভয়ই মানুষের সমান অকল্যাণকর।

কেড়ে খাওয়ার পথ যদি ছাড়তেই হয়, তবে ভাগ ক'রে খাওয়ার পথই ধ'রতে হবে। সকলের প্রয়োজনমত দ্রব্য যথেষ্ট উৎপাদন ক'রে সকলে ভাগ ক'রে খাবে—প্রতীচ্যশিক্ষার প্রতিক্রিয়ারূপে উদ্ভাবিত এই নূতন পথে সোভিয়েট রাষ্ট্রতন্ত্রের শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়েছে। রাশিয়ার

নূতন শিক্ষা দেশথেকে সার্ব্বজনীন দারিদ্র্য দূর করেছে বা অদূর ভবিষ্যতে করবে, এতে আর সংশয় নেই। কেউ রাজা কেউ ফকির হয়ে জন্মায় - সে তার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফলে—এই শিক্ষা মানুষকে চিরকাল পঙ্গু ক'রে রেখেছিল। সোভিয়েট শিক্ষা দেশের দুর্গত সাধারণকে বুঝিয়ে দিয়েছে, দেখিয়ে দিয়েছে,—রাজা ফকিরের পার্থক্য মানুষের ইহকালের কর্ম্মদোষেই ঘটে আসছিল, পূর্ব্ব বা পরকালের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ ছিল না। তাই সে দেশে অসম্ভব সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু এই ভাগ ক'রে খাওয়ার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আর একটি বিধানও প্রচলিত। সেটি হচ্ছে - উৎপন্নকারীদের উদ্ভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় যারা কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করবে, তাদের সমূলে বিনাশ করার বিধান। এ ব্যাপারে আপোষের কোন স্থান নেই, এই বিধি ঐতিহাসিক ভিত্তিতে গাণিতিক সত্যরূপে সেখানে গৃহীত হ'য়েছে। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নেই, কিন্তু পথ সেই হিংসারই পথ। এর প্রতিক্রিয়া করে কিভাবে জগৎকে আঘাত করবে তা ভাবীকালই বলতে পারে।

Aldous Huxley বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী। তিনি জগতের আদিযুগ হতে আধুনিকতম কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত বহুবিধ সমাজ ও রাষ্ট্রতন্ত্রের আলোচনা ক'রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে বিশ্বমানবের প্রকৃত স্বাধীনতা শান্তি ও কল্যাণ একমাত্র অহিংসার পথেই সম্ভব। যুগে যুগে এর পরীক্ষা হ'য়েছে, আজও হচ্ছে। সম্রাট অশোকের সময় রাষ্ট্র এই অহিংসাবাদকে জনশিক্ষার মূলনীতিরূপে গ্রহণ করায় জগতে স্থায়ী কল্যাণ স্থাপিত হবার সম্ভাবনা যেমন ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিল, এমন আর কোন যুগে হয় নি। জগতের দুর্ভাগ্য যে অশোক সেই মহৎভার বহন করবার উপযোগী কোন উত্তরাধিকারী বা কর্ম্মীসঙ্ঘ গ'ড়ে যেতে পারেননি। তা যদি পারতেন তবে হয়ত জগতের রূপ চিরদিনের মত বদলে যেত। Huxley আরও বলেন যে আজ পর্য্যন্ত জগতে বহু সাধু মহাপুরুষ ও বহু অদ্ভুতকর্ম্মা বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু মানুষের দুর্ভাগ্য মহাপুরুষমাত্রই অবৈজ্ঞানিক, আর বৈজ্ঞানিক কেহই মহাপুরুষ নন। এই বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের পূর্ণসমন্বয় যে মহামানবের মধ্যে হবে তিনিই সম্পূর্ণ অনাসক্ত অথচ বিজ্ঞানদীপ্ত চিত্ত নিয়ে প্রকৃত শিক্ষার মধ্য দিয়ে জগতে শান্তি ও কল্যাণের পথ দেখাতে পারবেন। এই আদর্শে বিচার কোরে হাকস্‌লি দেখিয়েছেন—সাম্যবাদ জগতে স্থায়ী কল্যাণ আনতে পারবেনা, সেও হিংসাশ্রয়ী আসক্তির পথেরই নির্দ্দেশ দিচ্ছে। হাকস্‌লীর বক্তব্য বিচার ক'রে দেখলে অন্ততঃ একথাটা বেশ বুঝা যায় যে বিজ্ঞানবিদগণ যদি সাধুবুদ্ধিসম্পন্ন ও অনাসক্তচিত্ত হ'তেন তবে তাঁদের দিয়ে এত মারণাস্ত্রের উদ্ভাবন সম্ভব হত না। অপরপক্ষে ভগবৎকল্প সন্তদের বাণীর মধ্যে এমন সকল প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কথা বে-মালুম মিশিয়ে থাকে যে, যে কোন বিচারবুদ্ধিপ্রধান মানবচিত্তকে তা একেবারে বিমুখ করে দেয়।

বুদ্ধের চরণস্পর্শপূত এই দেশের আমাদের এই ঘোর দুর্দ্দশা ও দুর্ভাগ্যের যুগেই আর একজন মহাপুরুষ আর একবার মানুষকে হিংসার পথ থেকে অহিংসার পথে ফিরিয়ে আনবার সাধনায় মগ্ন। রাষ্ট্র তাঁর অনুকূল নয়; তাঁর সিদ্ধি আজিও মরীচিকাধর্ম্মী। তবু তাঁর আশা ও প্রয়াসের অন্ত নেই। কিন্তু তিনিও হাকস্‌লি-প্রার্থিত বিজ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন সাধু নন। তিনি Miracle-এ বিশ্বাসী, ভূমিকম্পের কারণ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের অনির্দ্দেশ্য পাপের সন্ধান পান।

তবে আমাদের গতি কি? প্রতীচ্য তার কেড়ে-খাওয়ার শিক্ষায় আস্থা রেখে আজও শান্তিহারা, সুখের সন্ধানে ব্যস্ত। প্রাচ্য না-খাওয়ার শিক্ষাকে দীর্ঘদিন পরীক্ষা করে আজ মরণোন্মুখ। হিংসার মধ্যস্থলে সোভিয়েট তন্ত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ভাগ-ক'রে-খাওয়ার শিক্ষার যে নববিধান নির্মিত করেছে তা শোষিত সম্প্রদায়ের পরম আশার বাণী বহন করলেও সত্ত্বপ্রধান সাধুপ্রকৃতি মানব-চিত্তের গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষতঃ যে ব্যবস্থায় সাধু সায় দেয় না ভারতবর্ষ তা কোন দিন ব্যাপকভাবে গ্রহণ করবে কিনা সন্দেহ। শিক্ষার এই তেমাথা পথসঙ্কটে দাঁড়িয়ে আমরা কি সেই সোনারপাথরবাটিকল্প মহাত্মা রের আবির্ভাব প্রতীক্ষা করতে থাকব—যিনি একাধারে পরম সাধু ও চরম বৈজ্ঞানিক?

কবিগুরু স্মরণে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভক্ত অগণ্য। এই বিরাট বিশ্বে এমন কোন সভ্য দেশ আছে কিনা সন্দেহ, যেখানে তাঁহার কবিপ্রতিভার পূজারী নাই। বিশ্বকল্যাণে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ গুরুদেব বিশ্বমানবের হাতেই নিজেকে অর্পণ করিয়া দিয়া মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের শেষ সঙ্গীতে তিনি এই আশাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন যে, বিরাট বিশ্ব যেন তাঁহাকে বাহু মেলিয়া গ্রহণ করে:

> "হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়,
> বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়।"

তাঁহার এই শেষ আশা পূর্ণ হইয়াছে, হইতেছে এবং আরও হইবে। জগতের বহু মনীষী মুগ্ধহৃদয়ে তাঁহার কাব্যের বিচার এবং বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে জগদ্বরেণ্য কবি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে কবিত্বের এবং ঋষিত্বের আশ্চর্য্য মণিকাঞ্চন যোগের জন্য তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ মহাজনদিগের নিকটেও গুরুদেব আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

বহুভাগ্যে আমি অল্প বয়সেই তাঁহাকে দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। তিনি আমার মাত্র আট বৎসরের অগ্রজ ছিলেন। তাঁহার পদধূলি পাইবার পূর্ব্বেই আমি তাঁহার পূজনীয় জনক অশেষ ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবের পদধূলি পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম।

বেশ মনে আছে, প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও মিষ্টার আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়দের সঙ্গে মহর্ষিদর্শনের উদ্দেশ্যে রবির উদয়তীর্থ জোড়াসাঁকো ভবনে গিয়াছিলাম। মহর্ষিদেব তখন অত্যন্ত বৃদ্ধ। একখানি সুন্দর পুষ্পমণ্ডিত আসনে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার রজতশুভ্র কেশশ্মশ্রু, দ্যুতিমান প্রশস্ত ললাট, প্রশান্ত দৃষ্টি, গৈরিক আচ্ছাদন ও দেহের অনুপম গৌর কান্তি—সমস্তের সমবায়ে তিনি তখন এমন অপূর্ব্ব-দর্শন হইয়াছিলেন যে, আমার মনে হইতেছিল যেন স্বর্গের কোন দেবতা আমাদিগকে কৃতার্থ করিতে মর্ত্যে নামিয়া

আসিয়াছেন। তাঁহার প্রস্ফুটিত শ্বেত শতদল তুল্য পরম সুন্দর পা দুখানি আসনের সম্মুখে প্রসারিত ছিল। বড়, ছোট, সকলেই আমরা তাহা স্পর্শ করিয়া ধন্য হইলাম। সেই পুণ্যস্পর্শ আজিও যেন আমার আঙ্গুলে লাগিয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে এবং সেই পবিত্র স্মৃতির অসীম পুলকে অঙ্গুলিগুলিকে চুম্বন করিতে ইচ্ছা হইতেছে। এই স্মরণীয় মুহূর্ত্তে মহর্ষিদেবের পুত্রেরাও কেহ কেহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অদূরে দণ্ডায়মান মনসিজমূর্ত্তি যুবক রবীন্দ্রনাথকে তখনই প্রথম দেখিলাম এবং মুগ্ধ হইলাম।

আমি তখন মফস্বল স্কুলের ছাত্র, মাঘোৎসব দেখিবার জন্য ব্রাহ্মবন্ধুদের সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। উৎসবান্তে স্বস্থানে ফিরিয়া গেলাম, কিন্তু স্মৃতিপটে যে ছবি অঙ্কিত হইয়া গেল, আজ জীবনের শেষ থেয়াঘাটে পৌঁছিয়াও তাহা অবিকৃতই দেখিতেছি।

তিন বৎসর পরে কলেজে পড়িতে যখন কলিকাতায় আসিলাম, তখনই রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হইল। কিন্তু এই পরিচয়ের মধ্যে একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি ইতিপূর্ব্বেই এমন সকল উৎকৃষ্ট সঙ্গীত ও কবিতা প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন যাহা রবীন্দ্রসাহিত্যে স্থায়ী গৌরব লাভ করিয়াছে। কিন্তু সে সকলের সঙ্গে পরিচিত হইতে আমার বিলম্ব হইয়াছিল। সমাজমন্দিরে রবিবাসরীয় উপাসনায় হয়ত তাঁহার রচিত গান শুনিয়া থাকিব, কিন্তু উহা কাহার রচনা তাহা আমি জানিতাম না। তাঁহার লেখার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায়. ঠিক মনে নাই, বোধহয় 'ভারতীর।' তিনি যখন কলিকাতার বাহিরে বেড়াইতে যাইতেন, তখন প্রিয়জনের কাছে হাল্‌কা ভাষায় পদ্যে যে সব পত্র লিখিতেন তাহা মাসিকে বাহির হইত। আমি অতি আগ্রহের সহিত তাহা পড়িতাম। উহা আমার বড় ভাল লাগিত। একখানি পত্রে এইরূপ পড়িয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে :—

* * * *

"কেদারার পরে চাপি, ভাবি শুধু ফিলজাফি,
নিতান্তই চুপিচাপি মাটীর মানুষ ;
লেখা ত লিখেছি ঢের, এখন পেয়েছি টের,
সে কেবল কাগজের রঙ্গীন ফানুস্।"

* * * *

"মনে পড়ে বরিষার, বৃন্দাবন অভিসার,
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ,
শ্যামল তমাল তল, নীল যমুনার জল
আর দুটি ছলছল নলিন নয়ন।
এ ভরা বাদর দিনে, কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে,
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়।" ইত্যাদি—

* * * *

অবশিষ্টাংশ আমার মনে নাই, কিন্তু ইহা বেশ মনে আছে যে, উদ্ধৃত দ্বিতীয় স্তবকটী পড়িয়া আমার চিত্ত এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব মধুর রসে বিভোর হইয়া গিয়াছিল। তখন পর্য্যন্ত আমি বৈষ্ণব সাহিত্যের কোন খবরই রাখিতাম না, কিন্তু তথাপি ভাবাবেগে আমার চক্ষুর পাতা ভিজিয়া উঠিতে লাগিল। সেই হইতে এ পর্য্যন্ত আমি অন্ততঃ হাজারবার বন্ধুজনের কাছে এই অভিসার কথাগুলি আবৃত্তি করিয়াছি। এক হিসাবে ইহা আমার জীবনে দীক্ষামন্ত্রের কাজ করিয়াছিল। স্বর্গগত কীর্ত্তন-কলানিধি ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের কথকতার গানে শুনিয়াছিলাম :—

"শ্রীগোবিন্দের নূপুর ধ্বনি দাস গোবিন্দ শুনিল রে।"

বৈষ্ণব পদাবলীকে যদি নূপুর-ধারী যশোদাদুলাল বলিয়া কল্পনা করা যায়, তবে এ কথা বলিতে আমার কিছুমাত্র দ্বিধা নাই যে, এই অভিসার কবিতাটুকুর মধ্য দিয়া আমার

সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সেই যশোদাদুলালের সুমধুর নূপুর-সিঞ্জন আমার মানস কর্ণে পৌঁছিয়াছিল। পরে মহাজন-পদাবলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছিল যে, কবিগুরু হয়ত সেই সুশীতল পবিত্র নির্ঝরে প্রাতঃস্নান সারিয়া তাঁহার জীবনের সুদীর্ঘ জয়যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন বাংলার সাহিত্য-সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কবি হেমচন্দ্রের মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ প্রায়, নবীনচন্দ্রের মধ্যাহ্ন সমাসন্ন। রবির দেউলে তখনও প্রভাত আরতির সানাই থামে নাই; যদিও ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ইতিপূর্ব্বেই নিজকণ্ঠের জয়মাল্য যুবক রবীন্দ্রকে পরাইয়া দিয়া তাঁহার উত্তরাধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

এই সময়ে ভারতবন্ধু মিষ্টার হিউম পরিচালিত ভারতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনে কলিকাতার শিক্ষার্থী যুবকদিগের চিত্ত সময় সময় বেশ আলোড়িত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, বাগ্মীশ্রেষ্ঠ দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথের বজ্রনির্ঘোষ কলিকাতার ছাত্রসমাজে এক অভিনব রাষ্ট্রচৈতন্যের সঞ্চার করিতেছে এবং ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক প্রচারিত সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী বাংলার শিক্ষিত সমাজে এক নূতন চিন্তা ধারা বহিয়া আনিয়াছে। হিন্দু সমাজের জীর্ণ প্রাচীরের ভাঙ্গন খুব দ্রুত গতিতে চলিতেছে, কিন্তু নূতন সংগঠনের কোন বিশেষ প্রয়াস দেখা দেয় নাই। হেমচন্দ্রের শিঙ্গা, নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ ও বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম-মুকুটধারী আনন্দমঠ বাংলার শিক্ষিত যৌবনকে একটা নূতন কিছুর জন্য চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

ইহা ছিল একটা যুগসন্ধিক্ষণ। বাংলার এক শ্রেষ্ঠতম অভিজাত পরিবারের দুলাল, "স্বভাবে শিশু, সুধাতে পালিত, কল্পনা হীরার খনি" স্বরূপ যুবক রবীন্দ্রনাথ তখন বিশ্বসাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্র রচনায় তপস্যামগ্ন। তখনও কেহ জানিত না যে, রবির জন্মকালে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি নারায়ণ তাঁহার কণ্ঠ এবং অন্তর নিখিলামৃতরসে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার মার্জ্জিতরুচি, সংস্কৃতি, চালচলন, আচারব্যবহার, বেশভূষা ও ভাববৈশিষ্ট্যে—সাধারণ বাঙ্গালী সমাজের প্রায় শত বর্ষ অগ্রবর্ত্তী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এবং এই জন্যই ঐ পরিবারের সহিত সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর অন্তরের যোগ ছিল সামান্য, যদিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিস্ময়-মিশ্রিত একটা শ্রদ্ধা যে ছিল না তাহা নহে। তাহারা ছিলেন সমাজ-দ্রোহী রাজা রামমোহন রায়ের পতাকাবাহী ব্রাহ্ম; কাজেই সাধারণ হিন্দুরা তাঁহাদিগকে বিশেষ সুনজরেও দেখিতেন না। তাহা ছাড়া শাশ্বত সত্য এবং সৌন্দর্য্যের উপাসক কবি রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার এবং উপভোগ করিবার মত রসানুভূতিসম্পন্ন অন্তরের সংখ্যাও ছিল খুব সীমাবদ্ধ। কাজেই প্রথম দিকটায় এই উদীয়মান বিরাট প্রতিভার সমজ্দার পাঠক মিলিয়াছিল অল্প, অসমজ্দার সমালোচক মিলিয়াছিল বহু। বলিতে কি রবীন্দ্ররচনার প্রতিকূল সমালোচনা করাই তখন এক শ্রেণীর লোকের অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

'পলাশীর যুদ্ধে'র অমরকবি নবীনচন্দ্রের নবরচিত মহাকাব্য 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'রৈবতকে'র নাম তখন সকলেরই মুখে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক বহু প্রশংসিত এই দুইখানি উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ বাঙ্গালী পাঠকসমাজে তখন বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল এবং সাহিত্য পত্রিকায় মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের লিখিত উচ্চাঙ্গের বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুসমালোচনাও বাহির হইয়াছিল। ফলে কবি হিসাবে নবীনচন্দ্র তখন রবীন্দ্রনাথকে একপ্রকার আড়াল করিয়াই বঙ্গসমাজের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রামায়ণ,

মহাভারতের দেশে মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার, কুরুক্ষেত্র ও রৈবতকের মতন মহাকাব্যের পক্ষে সুনাম অর্জ্জন করা ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু গীতিকবিতা যতই মনোরম, যতই প্রতিভাদীপ্তিসমুজ্জ্বল হউক না কেন, অনভ্যস্ত পাঠকের চিত্তে উহার রসানুভূতি সঞ্চারিত হইতে সময় লাগে। বিশেষতঃ, গতানুগতিকতাই মানুষের স্বভাব। নূতন সরণী যতই চিত্তাকর্ষক হউক না কেন, অনভ্যস্ত পথচারী সেদিকে পা ফেলিতে প্রথমটা দ্বিধা করিবেই। রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্যই ছিল নূতনত্ব, নূতন ছন্দ, নূতন ভাব, নূতন চিন্তা, নূতন আদর্শ, ভাষার এবং ব্যঞ্জনার নূতন ভঙ্গি। অথচ তাঁহার প্রতিভা ছিল এতই ব্যাপক, এতই সত্য, এতই উজ্জ্বল এবং এতই তীক্ষ্ণ যে, তাহা অস্বীকার করিবারও উপায় ছিলনা। কাজেই অক্ষম সফরীর দল এই গঙ্গাবাহনের বিরুদ্ধে নিষ্ফল পুচ্ছচালনা আরম্ভ করিল এবং অন্তর্নিহিত ঈর্ষা-বহ্নিতে নিজেরাই পুড়িয়া মরিতে লাগিল। দেশের লোকের কাছে এইরূপ অবাঞ্ছিত ব্যবহার পাইয়া কবি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। বলিতে লজ্জা হয় যে, বিশ্বের সাহিত্যিক দরবার তাঁহাকে 'নোবেল' পুরস্কারের তক্‌মা পরাইয়া দিবার পূর্ব্বে তাঁহার দেশবাসী তাঁহাকে কোনরূপে সম্মানিত করে নাই! বাঙ্গালার ইহা চিরপনেয় কলঙ্ক। নূতন সৃষ্টি করিতে যাইয়া মাইকেল মধুসূদনকেও প্রথম যথেষ্ট বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছিল; কিন্তু পরিণামে তিনি "অকাল কোকিল, মরুতরু তরু, অনীর দেশের বারি" রূপে অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। কবিগুরুর ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। রবীন্দ্রনাথকে শুধু কবি বলিলে অৰ্দ্ধেক মাত্র বলা হয়, কারণ তাঁহার সর্ব্বমুখী প্রতিভার আশ্চর্য্য সৃজনাশক্তি এবং তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব ছিল একটা অদ্ভুত ব্যাপার। দেশবাসী উপেক্ষা বা প্রতিকূল সমালোচনা তাঁহাকে ব্যথিত করিলেও কোনদিন দমাইতে পারে নাই। তাঁহার আত্মবিশ্বাস ছিল অপরাজেয়। তিনি ঐ সকল বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া অজস্র লিখিয়া চলিলেন,—কাব্য, উপন্যাস, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ, গীতিকবিতা, প্রেমসঙ্গীত, রসসঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, ব্রহ্মসঙ্গীত, আরও কত কি। আর একটী মজার ব্যাপার ছিল এই যে, তাঁহার কিছু নূতন লেখা বাহির হইলে, তাহার নিন্দুকেরাই সর্ব্বাগ্রে উহা পড়িত এবং নিশ্চয়ই উপভোগ করিত। কোন সভাসমিতিতে রবি ঠাকুর বক্তৃতা করিবেন বা প্রবন্ধ পড়িবেন, সংবাদ বাহির হইলে সভা-স্থল জনসমুদ্রে পরিণত হইত। তিনি ছিলেন কম্বুকণ্ঠ। শঙ্খধ্বনির গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য দুইই তাঁহার কণ্ঠস্বরে মিশ্রিত ছিল। তাঁহার প্রায় সকল সভাতেই আমি উপস্থিত থাকিতাম। বক্তব্য বিষয়ে তাঁহার বিচার এবং বিশ্লেষণের মধ্যে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রকাশভঙ্গির মৌলিকত্ব থাকিত, তাঁহার সমসাময়িকদিগের মধ্যে একমাত্র বার্নার্ডশ ব্যতীত আর কাহারও লেখায় তাহা দেখা যায় নাই। কোন কোন সভায় তাঁহার বক্তৃতা বা প্রবন্ধ আমাকে এতই মগ্ন করিত যে সে বিষয়ে আমার মনোভাব আমি তাহাকে পত্রদ্বারা না জানাইয়া স্থির থাকিতে পারিতাম না। সেই সকল পত্রের তিনি যে উত্তর দিতেন তাহা খব সংক্ষিপ্ত হইলেও বিনয়ে এবং সৌজন্যে অতুলনীয় ছিল। সামনাসামনি বসিয়া তাঁহার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলিবার আগ্রহ জানাইয়া একবার তাঁহাকে চিঠি দিয়াছিলাম। উহা পাইয়াই তিনি আমাকে জোড়া-সাঁকো ভবনে আহ্বান করিলেন। সেও অৰ্দ্ধশতাব্দী কি আরও কিছু বেশী আগের কথা। নীচের তলায় একখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কামরা স্বল্প আসবাবে

সুনিপুণ ভাবে সজ্জিত, সেখানে বসিয়া তিনি লিখিতেছিলেন। তিনি আমাকে অতিশয় আন্তরিকতা-পূর্ণ সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া তাঁহার পার্শ্বেই বসিবার আসন নির্দেশ করিয়া দিলেন। আমি বলিলাম, অনেক দিন হইতে আপনাকে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা অন্তরে জমিয়া আছে। তিনি বলিলেন, বেশ, জিজ্ঞাসা কর।

আমি—আপনি যে ইদানীং মিত্রামিত্র ছন্দে কবিতা রচনা করিতেছেন, উহা যদি অমিত্রের ছন্দেই পড়িতে হয়, তবে আর মিল রাখিবার প্রয়োজন কি? আমার মনে হয় যে, আপনি ঐ মিলের শাসন স্বীকার করায় আমাদিগকে যতটা দিতে পারিতেন তাহার চেয়ে কম দিতেছেন।

কবি—না, তোমার কথা ঠিক নয়। অমিত্রের ছন্দে পড়লেও পরপর মিলের ধাক্কাটা কানে না লেগে যায় না, আর কানে সেটা মন্দও লাগে না। ঝর্ণার জল যে খাতে বয়ে যায়, তা যদি মসৃণ হয় তবে স্রোতের গতিটা টেরই পাওয়া যায় না, কিন্তু ঐ খাতের বুকে মাঝে মাঝে উপলের বাধা থাকলে, তাতে ধাক্কা খেয়ে জলটা ওঠে নেচে নেচে, আর তখন তা দেখে চোখ বলে—বাঃ স্রোতটি চলেছে ত বেশ! আচ্ছা, আমি তোমাকে পড়ে শোনাই তা হলেই তোমার কাণ যা বলে তা থেকে তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে।

ইহার পরে তিনি তাঁহার অননুকরণীয় ভঙ্গিতে তিন চারি মিনিট আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন, আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাহা শুনিলাম।

কবি—আর একটা কথা তোমাকে আমি বলতে চাই। দেখো, ঐ যে মিলটি, ওকে বাণীর পদ্মাসনের সম্মুখে কবির কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি বলে জেনো।

আমি—আচ্ছা, কবিতা কি কেবল অক্ষরের গণা-গাথা সংখ্যা, ছন্দ, যতি এবং মিলের দ্বারাই স্থির হয়, না ওর আরও কোন কষ্টিপাথর আছে?

কবি—তুমি যে সবের নাম করলে, কবিতা রচনায় ঐগুলির প্রয়োজন থাকলেও ঐগুলিই কবিতার প্রাণ বা কষ্টিপাথর নয়। ওর বিচারক তোমার সমজদার অন্তর এবং তোমার সমজদার কাণ। তোমার রসগ্রাহী অন্তরে যে (Type) আদর্শ, বিদ্যমান আছে, সে যখন জয়ধ্বনি করে কোন রচনাকে কবিতা বলে রায় দেয়, তখন উহা যে কবিতা সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবসর থাকে কি? এই ধর যেমন ফরাসী বিপ্লবের সময়ে সেখানকার রাণীর নিদয় হত্যাব্যাপারে বার্ক বাকের খেদোক্তি:—Oh, what a revolution and what an heart must I have to contemplate without emotion, that elevation and that fall! একে কি তুমি পদ্য বলবে না গদ্য বলবে?

ইহার অল্পদিন পূর্ব্বে কবি নবীনচন্দ্র আমার কয়েক জন বন্ধুর কাছে রবিবাবুকে শ্লেষ করিয়া নাকি বলিয়াছিলেন—"রবি? ও ত, হরিদাসী বৈষ্ণবী, ও বলে যায়, ছুঁয়ে যায় না।" বন্ধুরা কবির এই দীন ভক্তকে অপ্রিয় কথাগুলি বেশ ফলাও করিয়াই শুনাইলেন এবং বিদ্রূপ করিয়া আরও বলিলেন—তোমার ঐ রবিবাবুটী যত বাজে চুটকি চাটকি কবিতা লিখিয়া বাহবা নিতে চান, লিখুন দেখি 'কুরুক্ষেত্রে'র মতন একখানা কাব্য। কথাগুলি আমার প্রাণে লাগিয়াছিল। সাক্ষাতের শেষ দিকে আমি একটু বেসামাল হইয়াই কবিকে ঐ কথা-গুলি বলিয়া ফেলিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম তিনি নিশ্চয়ই উত্তেজিত হইবেন। কিন্তু কবি ছিলেন অতি

রাশভারী গম্ভীরপ্রকৃতির লোক, সহজে বিচলিত হইতেন না। তিনি একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন—"না, না, ও কিছু নয়, নবীনবাবু আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করে থাকেন।" তারপরে অতি সহজ ভাবে বলিলেন—"দেখো, তোমরা যারা আমাকে ভালবাসো, তারা ঐ নিয়ে দুঃখ বা ঝগড়া কোরো না, আমার যাতে রুচি তাই আমি লিখে যাচ্ছি, মহাকাব্য রচনায় রুচি আমার নাই, হয়ত শক্তিও নাই।" তাঁহাকে যেমনটি দেখিব বলিয়া আশা করিয়া গিয়াছিলাম, তাহার চাইতে অনেক বড় দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহার পদধূলি লইয়া সেবারের মতন বিদায় নিলাম।

সুদীর্ঘ কাল পূর্ব্বের এই কথোপকথন ঠিক্‌ঠিক্‌ মনে রাখা এবং এতকাল পরে অবিকল ব্যক্ত করা খুবই শক্ত, তবু আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। ঐ দিনটা আমার জীবনের একটী স্মরণীয় দিন ছিল বলিয়া উহা আমি ভুলিতে পারি নাই।

সেদিনের সাক্ষাৎ বেশ দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল এবং আরও অনেক বিষয়ে তাঁহার মতামত জানিতে চাহিয়া সদুত্তর পাইয়াছিলাম। সে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন।

ক্রমে ক্রমে রবির প্রখর রশ্মিজাল সমস্ত বাধা এবং আবরণ ছিন্নভিন্ন করিয়া বাংলার সাহিত্য গগন উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। নিন্দুকের প্রগল্‌ভ রসনাও সংযত হইয়া আসিল। বাংলার অসীম দুর্ভাগ্যে বঙ্কিমচন্দ্র একপ্রকার অকালেই লোকান্তরিত হইলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শূন্য সিংহাসনে বসিলেন এবং আমরণ অক্ষুণ্ণ গৌরবে সেখানে উপবিষ্ট থাকিয়া উহাকে অসীম মহিমায় মণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। এখন আবার সে সিংহাসন শূন্য, আরও কতকাল শূন্য থাকিবে কে বলিতে পারে?

কবিগুরুর কাব্যসাধনায় সঙ্গীতের স্থানই বোধ হয় সকলের উপরে। প্রায় দুই সহস্র অতি উৎকৃষ্ট সঙ্গীত তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। স্বরচিত সঙ্গীতে সেই যাদুকর সুরশিল্পী নিজেই সুর যোজনা করিতেন এবং অমিয়কণ্ঠে উহা গাহিয়া যে শুনিত তাহাকেই মজাইতেন। ভীষণপ্রকৃতির বিষধর সাপও সঙ্গীতে মুগ্ধ হয় বলিয়া শুনিয়াছি। তাঁহার সঙ্গীতে মুগ্ধ হয় নাই এমন পাষাণ হৃদয় বাংলায় কেহ ছিল না, এখনও নাই। সঙ্গীতের প্রভাবেই তিনি সকল প্রতিকূলতা জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া আমি মনে করি।

আমাদের এই সোনার বাংলা গানেরই দেশ। এমন সুমধুর সঙ্গীত পৃথিবীর আর কোন দেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া শুনি নাই। বাংলার আগমনী-গান ও মা যশোদার গোপালবাৎসল্য-গীতি বিশ্বসাহিত্যে অনুপম। বাংলার 'বন্দেমাতরম্‌' এখন সারা ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। চতুঃষষ্টি-সুলক্ষণযুক্তা জননী বঙ্গভাষা একদিন জগতে ভাষার বাণীরূপে বন্দিতা হইবেন বলিয়া বিশ্বাস করি। সেই আশাতেই কবিগুরু সারাজীবন এমন অসীম বিশ্বাসে কঠোর তপস্যা করিয়া গিয়াছেন। সেই শুভদিন যখন আসিবে, তখনই রবীন্দ্র সাহিত্যের এবং সঙ্গীতের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে। রবীন্দ্রনাথের নিজের মুখে তাঁহার গান শুনিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছিল, তাঁহারা জানেন সে গানের প্রভাব ছিল কি গভীর, চিত্তে তার স্পর্শ ছিল কি মৃতসঞ্জীবন। মাঘোৎসবে তিনি যখন তাঁহার স্বরচিত ব্রহ্ম-সঙ্গীত তন্ময় হইয়া গাহিতেন এবং সুরের ও ভাবরসের অমৃত-ধারায় উপাসকমণ্ডলীর শ্রবণ মন প্লাবিত ও অভিষিক্ত করিয়া দিতেন, তখন সুপ্ত আত্মার ঘুম

ভাঙ্গিয়া যাইত। শুনিয়াছি তিনি যখন একদিন তাঁহার রচিত স্বর্গের বর্ণনাযুক্ত—

"ঐ যে দেখা যায় আনন্দ ধাম ভবজলধির পারে
অপূর্ব্ব শোভন জ্যোতির্ম্ময়"

গানটি গাহিতেছিলেন, তখন উহা উপাসনারত মহর্ষি দেবের শ্রুতিগোচর হইলে তিনি নাকি বিস্ময়ে ও আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন —"ওরে দেখেছে রে দেখেছে!"

স্বদেশী যুগে কবিগুরু যে সকল প্রাণ-মাতান জাতীয় সঙ্গীতে দেশমাতৃকার পূজার নৈবেদ্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সমগ্র বাংলায় যে অভূতপূর্ব্ব উন্মাদনা ও কর্ম্মপ্রেরণা আনিয়াছিল তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তিনি তাঁহার স্বদেশকে **বিশ্বদেবতার** মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে দেখিয়াছিলেন এবং "মিশে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা মোর সনাতন স্বদেশে" বলিয়া তাহার বন্দনা করিয়াছিলেন। অসীমের উপাসক গুরুদেব "এই ভারতের **মহামানবের** সাগর তীরে" তাহার চিত্তকে ধীরে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে তাঁহার স্বদেশ-প্রেম বিশ্বপ্রেমেরই অঙ্গীভূত ছিল। এই বিষয়ে মহাত্মা রাজা রামমোহনের সঙ্গে তাঁহার আদর্শ ছিল অভিন্ন। কবিগুরুর এই বিশ্বপ্রেম হইতেই তাঁহার বিশ্বভারতী জন্মলাভ করিল।

এতদিনের সাধনায় তাঁহার কাব্যভাণ্ডারে যে অমূল্য রত্নসম্ভার সঞ্চিত হইয়াছিল তাহারই সামান্য কয়েক খণ্ড হীরা মাণিক ইংরাজী ভাষার সূত্রে গ্রথিত করিয়া **গীতাঞ্জলি** রূপে তিনি বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উপস্থিত করিলেন। এই রত্নমালার স্নিগ্ধ জ্যোতি বিশ্বের কাব্য-রসিকদিগকে মুগ্ধ করিল। তিনি দুর্ল্লভ "নোবেল" পুরস্কার লাভ করিলেন। ইহার ফলে সমগ্র সাহিত্য-জগৎ যখন তাঁহার জয়বাদে মুখরিত হইয়া উঠিল, তখন আর তাঁহার দেশবাসীর সন্দেহ রহিল না যে রবীন্দ্রনাথ বাংলার তথা ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

এইবারে কবির সাহিত্যসাধনাকে নিষ্কৃতি দিয়া সমালোচকের দল তাঁহার বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে তাহাদের শরজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কবি-গুরু ছিলেন সব্যসাচী, একলাই দুহাতে উহা ঠেকাইয়া চলিলেন। এই সময় হইতেই বিশ্বভারতীর জন্য তাঁহার বিশ্বপরিভ্রমণ আরম্ভ হইল।

সভ্যজগতের প্রাচীন এবং নবীন সকল দেশ হইতেই তাহার সাদর আহ্বান আসিতে লাগিল এবং সর্ব্বত্র তিনি এরূপ বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ করিতে লাগিলেন যাহা পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যিকের ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই। তাঁহার মুখে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও আদর্শের বার্ত্তা শুনিয়া সভ্যজগৎ মুগ্ধ হইল। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া তিনি অদম্য উৎসাহে বিশ্বের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার "সনাতন স্বদেশের" বার্ত্তা এবং বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য এবং আদর্শ প্রচার করিয়া বেড়াইলেন। বার্দ্ধক্য বা ব্যাধি তাঁহার উদ্যমকে পরাভূত করিতে পারিল না। জগতের বহু মনীষী মহাজন তাঁহার বিশ্বভারতীর পুণ্যক্ষেত্র শান্তি-নিকেতনে আসিলেন এবং কবিগুরুর আদর্শনিষ্ঠা ও সংগঠনশক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। বিশ্বভারতীর কল্যাণে সারাজীবন প্রাণপাত চেষ্টা করিয়া তাঁহার সেই সাধনার পরমধন তিনি ইহলোক হইতে বিদায়কালে তাঁহার দেশবাসীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। আমাদের খুব ভরসা আছে যে, দেশবাসী গুরুদেবের ত্যক্ত পতাকা কোটিহস্তে তুলিয়া ধরিবে এবং বিশ্বভারতীকে জয়যুক্ত করিবে।

কবিগুরুর সংগীতসাধনার কথা বলিয়াছি, কিন্তু নৃত্যকলার প্রচারে তাহার অক্লান্ত নির্ভীক চেষ্টাও স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মানুষের সর্বাঙ্গে তিনি চির-সুন্দরের প্রকাশ দেখিয়া কিরূপ মুগ্ধ হইতেন তাহা তাঁহার জাপানের পত্র যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা নিশ্চই জানেন। নৃত্যের মধ্য দিয়া যে মানুষের সর্বাঙ্গের সঙ্গীত শ্রুত হয়, রসগ্রাহী জনের তাহা অবিদিত নহে। এই সুরনরবাঞ্ছিত বিশিষ্ট কলাটিই এই আত্ম-বিস্মৃত জাতির নারী সমাজে পুনঃ প্রচার করিতে যাইয়া গুরুদেবকে চতুর্দ্দিক হইতে কত যে নিন্দা, তিরস্কার, কুৎসা এবং গ্লানির পীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে চিত্ত অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠে। কিন্তু সমাজে সত্য, শিব এবং সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় তিনি কোন বাধা, কোন বিঘ্ন, কোন নিন্দা, কোন কুৎসা, কোন গ্লানি বা তিরস্কার গ্রাহ্যই করিতেন না। জীবনের অতি কঠোর পরীক্ষার দিনে তিনি কোথা হইতে চিত্তে এত বল এবং অভয় পাইতেন ভাবিলে বিস্মিত হইয়া যাই। এইখানে মনে পড়িতেছে জীবনের কল্যাণব্রত উদ্‌যাপন করিতে যাইয়া এতদপেক্ষায় বহুগুণে কঠোরতর পরীক্ষার মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহনের চিরস্মরণীয় বাণী : * * * * * * But these however accumulated I can tranquilly bear, trusting that a day will arrive, when mey humble endeavours will be viewed with justice, perhaps, acknowledged with gratitude. At any rate, whatever men many say, I cannot be deprived of this consolation that my motives are acceptable to that Being who beholds in secret and compensates openly.

'আমার বিরুদ্ধে আমার দেশবাসীর এই সমস্ত নিন্দা তিরস্কার ও উপদ্রব যতই পুঞ্জীভূত হউক না কেন, আমি উহা অক্ষুব্ধ চিত্তে সহ্য করিতে পারি এই বিশ্বাসে যে, এমন একদিন আসিবে যখন আমার এই সামান্য শুভ চেষ্টাগুলি ন্যায়বিচার লাভ করিবে, হয়ত কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইবে। তাহা হউক বা না হউক, মানুষ যাহাই বলুক না কেন, অন্ততঃ এই সান্ত্বনা হইতে আমাকে কেহই বঞ্চিত করিতে পারে না যে, আমার উদ্দেশ্য সকল সেই পরম দেবতার গ্রহণযোগ্য হইতেছে, যিনি গোপনে দেখেন এবং প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করেন।'

মহর্ষিদেবের পুত্র হিসাবে কবিগুরু রাজা রামমোহনের মানস-পৌত্র ছিলেন বলা যায়। সুতরাং আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি রাজার লোকোত্তর গুণসমূহের অধিকারী হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

কবিগুরু বলিতেন তাঁহার জীবনে যৌবনের অবসান নাই। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার জীবনে আনন্দের ও উৎসবেরও অবসান ছিল না। জগতের আনন্দ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি ধরায় আসিয়াছিলেন। সে যজ্ঞে তিনি নিজেও কম আনন্দ দান করিয়া যান নাই। উৎসব এবং আনন্দই ছিল তাঁহার কবিচিত্তের খোরাক। কত বসন্তোৎসবে ও কত শারদোৎসবে তিনি তাঁহার ছাত্র ছাত্রাদের হাত ধরিয়া নটরাজের ন্যায় বিহ্বলনৃত্য করিয়া গিয়াছেন,—তাহা কি ভোলা যায় ? কত অভিনয় করিয়া, কত গান গাহিয়া, কত আবৃত্তি করিয়া তিনি দর্শক এবং শ্রোতাদিগকে আনন্দ প্রবাহে ডুবাইয়া গিয়াছেন, তাহাও কি ভোলা যায় ? সেই অফুরন্ত যৌবনের, অফুরন্ত আনন্দের এবং অফুরন্ত উৎসবের অমর কবিকে আমরা নমস্কার করি।

চার বৎসর পূর্ব্বে এই ধারা শ্রাবণেরই এক সর্ব্বনাশা দিনে কলিকাতা মহানগরীর লক্ষলক্ষ নরনারীর অশ্রুধারার মধ্যে কবিগুরু তাঁহার সাধনোচিত আনন্দ-লোকে মহাপ্রস্থান করেন। আমাদিগকে অভয় দিয়া তিনি বলিয়া গিয়াছেন :—

"ওরে ভয় নাই, তোর ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ, যে করিবে দান,
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।"

তিনি বিশ্বজনহিতায় নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি অক্ষয়, তিনি মৃত্যুঞ্জয়। আমরা তাঁহাকে বারবার নমস্কার করি, এবং তাঁহার অতুলনীয় কবি মহিমার জয়ঘোষণা করি :—

জয় হে মরণজয়ী, তব জয়।

কা-না-চৌ

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

গ্রামের তরুণের দল হঠাৎ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। অধীর উৎসাহের সহিত সকলেরই মুখে সনৎ সেনের নাম ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল।

গ্রামের প্রান্তে, মাঠের ও-পারে, রেলওয়ে ষ্টেশন এবং তাহারই সংলগ্ন ষ্টেশন মাষ্টারের কোয়ার্টার। সনৎ সেন—ষ্টেশন মাষ্টার বঙ্কুবাবুর ভাগিনেয়। বছর দুই আগে সে একবার এখানে আসিয়াছিল। সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়াছে, দু'চারদিনের মধ্যে সে আবার এখানে আসিতেছে এবং এখন হইতে এইখানেই থাকিবে।

সনৎয়ের আকৃতি দীর্ঘ, দেহের হাড়গুলো মোটা-মোটা, রং গৌর, মাথায় একমাথা কোঁকড়া চুল। একজন নাম-করা স্পোর্টসম্যান সে। হাই জাম্প, লং জাম্প, দৌড় সাইকেল রেস্, সাঁতার, ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতিতে এ-অঞ্চলে তা'র জোড়া নাই। গ্রামের তরুণের দল এই কারণেই তাহাকে ভালবাসে এবং ভক্তি করে। সম্প্রতি তাহারা গ্রামে একটা ফুটবল, ক্লাব বসাইয়াছে। সনৎ সেন যখন এই মাহেন্দ্রক্ষণে আসিয়া পড়িতেছে, তখন তাহাকেই ক্লাবের ক্যাপ্টেন্ করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই এ তল্লাটে তাহাদের ক্লাবই যে শীর্ষস্থানে উঠিবে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

যথাদিনে সনৎ সেন আসিয়া পড়িল। পরের দিন অপরাহ্ণে ষ্টেশনের সামনেকার ফুটবল মাঠে একটা উৎসবের আয়োজন হইল এবং তরুণের দল তাহাকে মাল্য-চন্দনে ভূষিত করিয়া তাহাদের অন্তরের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিল। অভিনন্দনের উত্তরে সনৎ সেন সকলের অন্তরকে আশা উৎসাহে নাচাইয়া দিয়া অনেক কিছুই বলিল এবং তার মধ্যে এ কথাও বলিল যে, ক্লাবকে উন্নত করিতে হইলে অর্থের আবশ্যক এবং তজ্জন্য গ্রামবাসী সকলের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিয়া একটা ফণ্ডের সৃষ্টি করিতে হইবে।

নবীন উৎসাহ, যেমন কথা, সঙ্গে সঙ্গেই কাজ আরম্ভ। পরদিনই চাঁদার খাতা বাঁধা হইয়া নিম্নোক্তরূপে চাঁদা-আদায় চলিতে লাগিল :—

• জয়কালী বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্কবিহারী রায় ···	··	২৲
ভুজঙ্গ পাল ···	···	।০
রামরতন সিমলাই		॥০
মঞ্জুলা দাসী ··		১৲
জনৈক বন্ধু	··	॥০
পরিমল রক্ষিত ·	···	১৲
ত্রিদিবনাথ বসু ··		২৲—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সপ্তাহ-খানেকের চেষ্টায় এবং ঘোরাঘুরিতে চাঁদার খাতার টোট্যাল যোগ দিয়া দেখা গেল—১৩১৮/০। তখনো অনেকের কাছে যাওয়া বাকী। তার মধ্যে কালীনাথ চৌধুরী ·· ·· ·· ·· ··.... ·

সর্ব্বনাশ! এ কী ঘটিয়া গেল! যে নাম এ-গাঁয়ে ভুলেও কেহ কখনো মুখে আনে না, যে নামে ভাতের হাঁড়ি ফাটে, সারাদিন না খেয়ে উপবাসে কাটে, কলমের মুখে অসাবধানে সেই নাম বাহির হইয়া গেল। কিন্তু—যাহা হইয়া গেল তাহার আর চারা নাই। যাহা ভাগ্যে আছে তাহাই ঘটিবে। ঘটুক। কিন্তু আর ও নাম মুখে আনা হইবে না। যে নামে তাহাকে সকলে ডাকে আমরাও সেই নামে তাহাকে ডাকিব। সে নাম হইতেছে—কা-না-চৌ।

পরদিন ক্লাবের কয়েকজন চাঁদার খাতা লইয়া কানাচৌর কাছে গিয়া হাজির হইল। কানাচৌ কহিল—'চাঁদা! কিসের চাঁদা?'

সকলে বলিল—'ফুটবল ক্লাবের।'

হরিপদ বলিল—'দেখুন না, গ্রামের প্রায় সকলেই দিয়েছে।'

খাতার নামগুলা পড়িতে পড়িতে কানাচৌ কহিল—'তা ত দেখতে পাচ্চি, কিন্তু আমাকে মাপ করতে হবে, আমার এক পয়সাও দেবার ক্ষমতা নেই।'

রমেশ কহিল—'কিন্তু সকলেই যখন দিয়েছে, তখন আপনাকেও কিছু দিতে হবে, নইলে আমাদের ক্লাবের খরচা চলবে কেমন কোরে বলুন।'

একটা মস্ত হাই তুলিয়া কানাচৌ কহিল—ক্লাবের আবার খরচা কি, আমি ত বুঝতে পারি না। আমরাও ত এক কালে খেলেচি, আমাদেরও ক্লাব ছিল। গাছ থেকে পটা-পট্ বাতাবি লেবু ছিঁড়ে বল করতুম আর তাই নিয়ে সারা মাঠ ছুটোছুটি করতুম। তারপর এটুকখানি চুপ করিয়া কিছু একটা ভাবিবার পর কহিল—'তা' এসেচ যখন আশা কোরে, কিছুতেই ত আর ছাড়বে না, সাধ্যমত কিছু দি—নিয়ে যাও'—বলিয়া একটা ঘসা আনি বাক্স হইতে বাহির করিয়া হরিপদর হাতে দিল। হরিপদ লাফাইয়া উঠিয়া কহিল—এক আনা! চার পয়সা! আপনাকে অন্ততঃ পাঁচটা টাকা দিতেই হবে।'

দুই চোখ কপালে তুলিয়া কানাচৌ কহিল—'পাঁ-চ টা-কা! তাহোলে আমি পাঁচবার ধরে মরে যাব। যা দিলুম, ও-ই দেবার আমার সাধ্য নেই।',

রমেশ কহিল—"তা'ও ত দেখচি আনিটা ঘসা।"

কার্ত্তিক গোড়া হইতেই মনে মনে রাগিতেছিল; এক্ষণে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল—"আয়, আয়; ঐ ঘসা আনির দামই দশটাকা। চৌখুড়ো যা দিয়েছে, ঢের দিয়েছে!"

কানাচৌকে অনেকেই চৌখুড়ো বলিয়া ডাকিত, অর্থাৎ চৌধুরী খুড়া।

বৈকালে খেলার মাঠে সনৎ সেনের উপস্থিতিতে এই ব্যাপার লইয়া একটা হাস্যকর আন্দোলন আলোচনা চলিল।

রমেশ কহিল—"কার্ত্তিক বোলেচে, ঐ ঘসা-আনির দামই দশটাকা, সুতরাং চৌখুড়োর কাছ থেকে যেন-তেন প্রকারেই দশটা টাকা আদায় করতেই হবে। কার্ত্তিকের মুখের কথাটাকে সত্য করে ফেল্‌তে হবে।"

হরিপদ কহিল—"সে আশা আর করো না। ও-লোকের কাছ থেকে দশটাকা! সূর্য্যদেবের পশ্চিমে উদয় হওয়া যদিও সম্ভব হয়, কিন্তু চৌখুড়োর কাছ থেকে দশটাকা আদায় করা··· ··········অসম্ভব! অসম্ভব!"

রমেশ কহিল—"আলবৎ! দশটাকা ওর কাছ থেকে আদায় করতেই হবে।"

অনেকে অনেক কিছুই বলিল। সনৎ এ পর্য্যন্ত চুপ করিয়াই ছিল, এক্ষণে কহিল—"চুপ্ কর্ তোরা, একটা রাত আমায় ভাবতে দে যে কি উপায়ে ওর কাছ থেকে টাকা বার করা যেতে পারে। আজকের রাতটা ভেবে কাল মৎলব বার কোরব।"

পরদিন সকলে যথাসময়ে খেলার মাঠে আসিয়া জানিতে পারিল যে মৎলব ঠিক হইয়া গিয়াছে।

* * * *

ষ্টেশান থেকে কিছু দূরে একটা দীঘি আছে। স্থানটি গ্রামের বাহিরে। দীঘির চারি পাড়ের বড় বড় গাছগুলির জন্য সমগ্র স্থানটি ছায়াচ্ছন্ন। তন্মধ্যে বহু পুরাতন বিশালকায় একটা বটবৃক্ষ আছে। কিছুদিন হইতে সেই বটবৃক্ষমূলে এক নবীন সন্ন্যাসী প্রতি বৃহস্পতিবার আসিয়া আসন গ্রহণ করেন এবং ঘণ্টা চারি পাঁচ তথায় বসিয়া ধ্যান-ধারণা করিয়া চলিয়া যান। তরুণের দল সন্ধান পাইয়া সেই সন্ন্যাসীর কাছে যায়। তিনি তাহাদের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া বলেন—"তোমাদের ক্লাবের জন্য যে ১৩৮৲ টাকা চাঁদা উঠেচে, আমি তা ডবল কোরে দেবো, অর্থাৎ ১৩৮৲ টাকাকে আমি ২৭৬৲ টাকা কোরে দোবো।"

সকলে বিস্ময়ের সহিত তাঁর এই প্রস্তাবে রাজী হয় এবং তিনি মন্ত্রবলে চাঁদার ঐ ১৩৮৲ টাকাকে দ্বিগুণ—অর্থাৎ ২৭৬৲ টাকাতে পরিণত করিয়া দেন। সন্ন্যাসী সকলকে বলেন যে, এ কথা যেন গ্রামের কেহ জানিতে না পারে। এ সব গোপনীয় বিদ্যা মন্ত্র-তন্ত্র প্রচার নিষেধ।

তথাপি সেদিন সকালে হরিপদ এবং রমেশ কানাচৌর কাছে আসিয়া বসিল এবং একথা-সেকথার পর সন্ন্যাসী এবং তাহার অদ্ভুত শক্তির কথা পাড়িল।

কানাচৌ কহিল—"বলিস কিরে! এমন ক্ষমতা? নিশ্চয়ই তাহোলে কোন সিদ্ধ মহাপুরুষ-টুরুষ হবে।"

হরিপদ বলিল—"তার আর কোন ভুল আছে?"

"আশ্চর্য্য ব্যাপার ত! ১৩৮৲ টাকাকে ২৭৬৲ কোরে দিলে?"

"তাই ত দিলে, চৌখুড়ো। তবে, একথা কাউকে বলতে তিনি নিষেধ করে দিয়েছেন; তোমাকে আমরা বড্ডই ভালবাসি, তাই বল্লুম। এ সব কথা যেন আর কেউ না শোনে।

"আমার আর কে আছে যে শুনবে? সংসারে ত আমি একা। আর, গাঁয়ের লোকের সঙ্গে আমি ত বড় মিশি না, কোথাও যাইও না, সুতরাং ······ ···"

"সুতরাং, আর কেহ বলবার লোক তোমার না থাকলেও, চৌখুড়ো, তোমার টাকা আছে ঢের। সেই টাকাদের তুমি বল্‌বে, আর তারা ঝন্-ঝন্ কোরে বেজে উঠে পাড়াময় কথাটা জানিয়ে দেবে।" —বলিয়া রমেশ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কানাচৌ কিন্তু একমনে কি একটা ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ধরিয়া ভাবিবার পর কহিল—"হরিপদ, বাবা। আমায় একটিবার তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে হবে। তোদের আমি নিজের ছেলের মত মনে করি। একটিবার তাঁর সঙ্গে আমার . ..উঃ! অসাধারণ ক্ষমতা ত! যত টাকা, তার ডবল কোরে দেবে। বাবা রমেশ। বাবা হরিপদ। সেই মহাপুরুষের দর্শন একটিবার আমায় করিয়ে দিতে হবে, নইলে আমি তোদের পায়ে মাথা খুঁড়ে আত্মঘাতী হ'ব।" বলিয়া কানাচৌ উঠিয়া ঘরের মধ্যে গেল এবং একটি দুয়ানি হাতে বাহিরে আসিয়া কহিল—"হরিপদ, সেদিন ছিল না সঙ্গে দিতে পারিনি, আরও দু আনা তোদের চাঁদার খাতায় জমা কোরে নিস্ বাবা।"

অনেক কথার পর অগত্যা হরিপদ ও রমেশ নামনের বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে চৌধুড়োকে সন্ন্যাসীর কাছে লইয়া যাইতে রাজী হইল। রমেশ কহিল—"তাঁর পাদোদক খেয়ে দেখবেন চৌখুড়ো, সদ্য-ফোটা যুঁইফুলের গন্ধ, অথচ ঐ দীঘির একটু জল নিয়ে, তাঁর পায়ের বুড়ো আঙুলটা একটু ছুঁইয়ে দেবেন মাত্র।"

অতঃপর সন্ন্যাসী সম্বন্ধে আরো দু' একটা অদ্ভুত কথা জানাইয়া হরিপদ ও রমেশ বিদায় গ্রহণ করিল। কানাচৌ বিস্ময়, লোভ এবং আশা উৎসাহে অভিভূত হইয়া, তন্ময়চিত্তে বসিয়া-বসিয়া আকাশ-পাতাল কত-কি ভাবিতে লাগিল।

বৃহস্পতিবার। অপরাহ্ণ কাল।

দীঘির পাড়ের নির্জন বটবৃক্ষতলে সন্ন্যাসীকে ঘিরিয়া তরুণের দল নির্বাক হইয়া বসিয়া আছে। একধারে জোড়হাত বুকে ঠেকাইয়া কানাচৌ সজলনয়নে ভক্তিপ্লুত-মনে সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার দিকে তাকাইয়া সন্ন্যাসী কহিলেন—"যা বেটা কচুপাতায় কোরে দীঘির থোড়াসে পানি লে আয়, চরণামৃত কোরে দি, খা।"

শশব্যস্তে উঠিয়া কানাচৌ ফটাস্ করিয়া একটা কচু-পাতা ছিঁড়িয়া লইল এবং তাহাতে করিয়া একটুখানি দীঘির জল আনিয়া সন্ন্যাসীবাবার সম্মুখে ধরিল। তিনি তাহাতে দক্ষিণ পায়ের বুড়া আঙুলটি ঈষৎ ঠেকাইয়া দিয়া কহিলেন—"লে বেটা, খেয়ে ফ্যাল, মঙ্গল হবে।"

পরম আনন্দে এবং ভক্তিভরে কানাচৌ সেই কচুপাতার জলটুকু গলায় ঢালিয়া দিল। দিবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার আনন্দ এবং বিস্ময় শতগুণ বাড়িয়া গেল। তাঁর চরণামৃতে যুঁই নয়—প্রস্ফুটিত গোলাপের গন্ধ। গললগ্নীকৃতবাসে কানাচৌ সন্ন্যাসীবাবার পদমূলে প্রণাম করিয়া, তাঁহার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

সন্ন্যাসীবাবা তাহার অন্তরের কথা যেন বুঝিলেন, কহিলেন—"তোর যেন কিছু বলবার আছে, মনে হ'চ্চে।"

হাত দুটি জোড় করিয়া কানাচৌ কহিল—"হাঁ বাবা একটু গোপনেই আপনাকে তা ..."

তখন যুবকদের উদ্দেশে সন্ন্যাসী কহিলেন "তোমরা সব একটু দীঘির চারদিকে বেড়াও গে যাও, বিশ-পঁচিশ মিনিট পড়ে সব এসো।"

তাঁহার কথায় সকলে চলিয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গে কানাচৌ একেবারে সন্ন্যাসীবাবার পায়ে লুটাইয়া পড়িল; কাতর কণ্ঠে কহিল—"আমাকে বাবা, একটু দয়া করতেই হবে, নইলে আপনার পা আমি কিছুতেই ছাড়বো না।"

তাহার কাতরতা দর্শনে সন্ন্যাসীঠাকুর তাহাকে দুই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে তাহার মত গরীব আর কেহ নাই, তাহার যৎসামান্য যাহা পুঁজি আছে কৃপা করিয়া তাহা দ্বিগুণ করিয়া দিতে হইবে।

সমস্ত শুনিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরের তাহার প্রতি দয়া হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন—"কত টাকা তোর আছে?"

কানাচৌ মুসকিলে পড়িল। সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়—হাজার দশেক, কিন্তু একেবারে দশ হাজারের কথা বলিয়া ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। আগে যৎসামান্য কিছুর উল্লেখ করিয়া দেখা যাউক কিরূপ ফল হয়। প্রথম ক্ষেপে সুফল পাওয়া গেলেই, তখন হাতে-পায়ে ধরিয়া ঐ দশ হাজারকে বিশ হাজার করিয়া লইলেই চলিবে। সুতরাং একটু ঢোক গিলিয়া কানাচৌ কহিল—"বড় গরীব বাবা। কিছুই নেই! শ'দুই-আড়াই টাকা মাত্র আমার পুঁজি। তোমার পায়ে ধরি বাবা, দাও এটাকে ডবল কোরে, তুমি আমার ধর্ম্ম বাপ, বাবা, আমায় বাঁচাও।"

সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রাণ এই কাতরোক্তিতে খুবই গলিয়া গেল। তিনি আদেশ করিলেন—"কাল সন্ধ্যার পর টাকা নিয়ে এখানে আসবি। শুধু তোর জন্য কাল আমি এখানে থাক্‌বো। সমস্ত দিন অন্নাহার করবি না, শুধু ফল খেয়ে থাকবি। যা, আজ ঘরে যা।"

আর একবার ভাল করিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরের পায়ের ধুলা লইয়া কানাচৌ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, সন্ন্যাসী ঠাকুর তাহাকে কহিলেন—"এ কথা আর কা'কেও বলবি না, তা হোলে ও-সব কিছু আর হবে না। খুব সাবধান। যা, চলে যা।"

পরদিন শুধু দুইটা কলা আর একটা বেল খাইয়া কাটাইয়া সন্ধ্যার পর কানাচৌ আড়াইশো টাকার ছোট্ট একটা পুঁটুলি সমেত বটবৃক্ষ তলায় আসিয়া হাজির হইল। সন্ন্যাসী ঠাকুর ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তাঁহার সেই গভীর ধ্যান পায়ের শব্দে ভাঙ্গিল না। কানাচৌ অতি সন্তর্পণে একধারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পঞ্চমীর ক্ষীণচন্দ্রের সরু একখানা ফালি বড় বকুল গাছটার ফাঁকে দেখা যাইতেছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ—নিঝুম। সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শুধু একটানা ঝিঁঝিঁর রবে সমস্ত স্থানটা মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল।

কিছু পরেই সন্ন্যাসী ঠাকুরের ধ্যানভঙ্গ হইল। কানাচৌর দিকে চাহিয়া কহিলেন—"এসেছিস্? টাকা এনেছিস?"

প্রণাম করিয়া টাকার পুঁটুলিটা কানাচৌ তাঁর সামনে দিতে গেলে সন্ন্যাসী ঠাকুর হা—হা করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ওসব আর আমার সামনে বার করিসনি, আমাকে দেখাসনি। ওসব অর্থমনর্থং আমি দেখতে চাই না। সামনে—দীঘির ঐ কোণায় বড় আমগাছটা দেখতে পাচ্ছিস ত?"

সেইদিকে চাহিয়া কানাচৌ—"হ্যাঁ বাবা, পাচ্ছি।"

"আমি মন্তর বলতে থাকি, তুই তোর টাকার পুঁটুলিটা নিয়ে ঐখানে যা। গিয়ে, গাছতলায় পুঁটুলিটা রেখে দিয়ে চলে আয়। আসবার সময় পিছু ফিরে তাকাবি না। বরাবর এইখানে এসে বসবি। যা, ওঠ্।"

সানন্দে ও সোৎসাহে কানাচৌ তাহার আড়াইশো টাকার পুঁটুলিটা লইয়া সামনের অদূরবর্ত্তী সেই আম গাছের তলায় গেল এবং পুঁটুলিটা সেইখানে রাখিয়া সন্ন্যাসীবাবার কাছে আসিয়া বসিল। অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে পুঁটুলিটা সেখান হইতে আবছা দেখা যাইতেছিল। সন্ন্যাসীঠাকুর বলিলেন—"ঐদিকে তাকিয়ে থাক্, কি হয় ভাখ্"—বলিয়া তিনি মনে মনে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন, আর কানাচৌ একদৃষ্টে তাহার পুঁটুলির দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছু পরেই দেখা গেল, ছায়ার মত কোন অশরীরী প্রাণী গাছ হইতে নামিয়া আসিল এবং পুঁটুলিটা লইয়া আবার গাছের উপর উঠিয়া গেল।

চঞ্চল হইয়া উঠিয়া কানাচৌ কি বলিতে যাইতেছিল, সন্ন্যাসীবাবা বাধা দিয়া কহিলেন—"চুপ্! এখন বাড়ী চলে যা। এইবার গিয়ে অন্নাহার করতে পারিস্। কাল ঠিক এই সময়ে এখানে আসবি, ডবল টাকা পেয়ে যাবি। যা, তোর বরাত ভাল। কাকেও এসব কথা জানাবি না। যা, ঘরে ফিরে যা, কাল এলেই ঐ আমতলা থেকে ডবল টাকা পেয়ে যাবি। শিবের দ্বারী নন্দী ভৃঙ্গীকে মনে মনে ধ্যান করবি। যা।"

আশায়-নিরাশায়, আনন্দে-নিরানন্দে, উৎসাহে-সন্দেহে কানাচৌর অন্তরমধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিয়া গিয়াছিল। সে কম্পিত অন্তরে সন্ন্যাসীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া গ্রামের পথে ফিরিয়া আসিল।

* * * *

দিন-দুই পরের কথা।

আবার সেই খেলার মাঠ। আসন্ন সন্ধ্যায় আবার সনৎ সেনকে ঘিরিয়া সেই তরুণের দল।

হরিপদ কহিল—"ওঃ! কিপ্‌টের জাশু এইবার দম আটকে মরবে। আড়াইশো টাকার শোক ও সহ্য করতে পারবে না।"

রমেশ কহিল—"কিন্তু তোমাকে মানিয়েছে ঠিক সনৎদা, একেবারে হুবহু সন্ন্যাসীবাবা! সেদিন কিন্তু তোমার পাদোদকে ধুঁইয়ের বদলে গোলাপের গন্ধে আমি থতমত খেয়ে গেছলুম।"

মৃদু হাসিয়া সনৎ কহিল—'ধুঁইয়ের এসেন্সটা ফুরিয়ে গিয়েছিল, তাই 'এসেন্স অব্ রোজ' বুড়ো আঙ্গুলের মাথায় লাগিয়ে এসেছিলুম।'

রাজেন কহিল—'আমগাছটা থেকে নেবে এসে, টাকার পুঁটলিটা নিয়ে আবার উঠতে আমার এত হাসি পেয়েছিল যে, আর একটু হলেই হো হো করে হেসে ফেলেছিলুম।'

সনৎ সেন কহিল—"কিন্তু একটা কথা। হরিপদ যা বলে, আড়াইশো টাকার শোকেই হয়ত বেচারা মারা পড়বে। এক কাজ করা যা'ক, রমেশ বলেছিল—'যেন-তেন-প্রকারেণ দশটা টাকা ওর কাছ থেকে আদায় করতেই হবে'—আমি বলি, তাই করা যা'ক। ওর থেকে দশটা টাকা নিয়ে, বাকী ২৪০৲ টাকা ওকে ফেরত দেওয়া যাক।"

ইহা লইয়া কিছুক্ষণ আলোচনা হইবার পর সকলেই এই কথায় সম্মত হইল এবং স্থির হইল, আজই রাত্রে কোন অদ্ভুত উপায়ে কানাচৌর ২৪০৲ টাকার পুঁটুলি তাহাকে ফেরত দেওয়া হইবে। সে অদ্ভুত উপায় যে কি হইবে, সেই সম্বন্ধে সনৎ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

ঠিক ঐ সময়ে আর একজন জীবন্মৃত ব্যক্তি দুঃখে, ক্ষোভে, নিরাশায় সপ্তমীর আবছা আলো আঁধারের মধ্যে দীঘির পাড়ের সেই আমতলায় কিছু একটার আশায়, পাগলের মত ইতস্তত অন্বেষণ করিয়া ঘুরিতেছিল। আজ দুই দিন ধরিয়া সে অন্নাহার ভুলিয়া এইখানে এই ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আর মনে মনে শিবের দ্বারী নন্দী-ভৃঙ্গীর নাম জপ করিতেছে।

সে—কানাচৌ।

মৌচাক

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

যেখানে যখন হেরি আমি মৌচাক
ম্লান করে দেয় মানুষের যত জাঁক।
কোমল স্বর্ণে গঠিত কক্ষগুলি,
দেখিয়া রাজার প্রাসাদ যাই যে ভুলি।
মধু কারবার চলেছে অনুক্ষণ
মধুর রাজ্যে শুনি মধু গুঞ্জন।

২

কবি ও শিল্পী মিলেছে এখানে যেন
কোথা গুণীদের পরিমণ্ডল হেন?
কোথায় এমন হতে দেখেছে লোক
রূপদক্ষ ও স্বর-শিল্পীর যোগ?
কোথায় এমন রস রসিকের হাট?
এক সাথে কোথা এত কবি সম্রাট?

৩

রসে পরিপূর্ণ [illegible] নাকো উচ্ছলি,
[illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible]তাঞ্জলি।
[illegible] [illegible]। [illegible]সোনের দান যারা
রূপ কুসুমের দানেতে হয়েছে হারা।
শত-মাধুকরী করিয়া বিপুল শ্রম
রচিত হয়েছে এই যে মধুক্রম।

৪

রসের সঙ্গে মিলিয়াছে হেথা সুর
কর্মের সাথে সঙ্গীত সুমধুর।
দানেতে দাতার নামের গন্ধ নাই
অগর্বিতের পরিচয় শুধু পাই
যেথা হেরি আমি মৌমাছি মৌচাক
রই আনন্দে বিস্ময়ে নির্বাক।

তোমার বিরহ মোর এলো কাছে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বিরহগুণ্ঠনভরা কাজল প্রহরে অশ্রু ভাসে
নয়নে আমার, রজনীগন্ধার বনে ছুটে আসে
উদ্‌ভ্রান্ত সমীর, ঝরে পড়ে স্মরণের গন্ধরেণু
হৃদয় অঙ্গন তলে,—তুমি নাই, প্রাণে ব্যথা পেনু।
মেঘের মৃদঙ্গ বাজে, ধরণীর এলো পূর্ব্বদ্বারে
বরষার বরিষণ ধারা, বসে আছি অন্ধকারে।
নিশীথিনী চলে অভিসারে অরণ্যের অন্তরালে,
চমকে বিজলী ঘন ভাবাবেশে দিক্‌চক্রবালে।

বিষণ্ণ ছায়ার বুকে জোনাকির জ্বলে দীপশিখা,
সলাজ নয়নে রহে প্রতীক্ষায় কেতকী-যূথিকা
কার লাগি কেবা জানে! তুমি যে আসিবে বর্ষারাতে
বলেছিলে যাবার বেলায়! নিদ্রাহারা দৃষ্টিপাতে
সময় বহিয়া যায়, প্রত্যাশায় বাতায়নে একা,
ভাঙনের গান গাহে ভরা নদী, কাঁদে বনে কেকা।
তোমারি পরশ-রাগে এ জীবন ফুটায়েছি মম,
অগোচরে তুমি কোন্ পথ মাঝে বাউলের সম।

গগনের মেঘছায়া দোলে চিত্তে মোর,—শূন্য ঘরে
আমি সঙ্গহারা, বসে ভাবি,—তোমার স্বাক্ষরে
একদা করেছি পূর্ণ মোর মরমের কাব্যখানি,
ভুলেযাওয়া বাণী তব আজ সদা করে কানাকানি।
যে প্রেম ফাল্গুনে মোর এলো কাছে নিশীথ আহ্বানে
সাথে তব, ভাগ্যের দুর্যোগ রাতে তাহার কোনোখানে
পাই না খুঁজিয়া প্রিয়! তুমি নিয়ে গেছ চুপে চুপে
তোমার বিরহ মোর এলো কাছে বাদলের রূপে।

ষ্টার্লিং পাওনার কথা

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ

আজকাল ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে এদেশের পত্রিকা-সমূহ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ প্রায়ই বৃটিশ সরকারকে ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা পরিশোধের জন্য তাগাদা দিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের বিবৃতি ও মন্তব্য কতকটা গুরুগম্ভীর হয় বলিয়া প্রাথমিক তথ্যাদির অভাবে সাধারণ দেশবাসী সেইগুলি পাঠ করিয়া ষ্টার্লিং পাওনা নামক বস্তুটির সম্বন্ধে পরিষ্কার কোন ধারণা করিতে পারে না। অবশ্য সংবাদপত্রের দৌলতে উপস্থিত এদেশের সাধারণ শিক্ষিত সমাজ বুঝিয়া লইয়াছে যে, ষ্টার্লিং পাওনার সহিত ভারতের সাম্প্রতিক পণ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষের যোগ আছে এবং ব্রিটেন যদি যথাসত্বর এই ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা না করে তাহা হইলে ভারতসরকারের পক্ষে আর বেশীদিন ভারতীয় অর্থনীতিক ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। তবে ষ্টার্লিং পাওনা জমিল কেন, ভারতবর্ষ কোথা হইতে ব্রিটেনকে এত টাকা ঋণ প্রদানে সক্ষম হইল, উত্তমর্ণ হইয়াও ভারতবর্ষ কেন ভিক্ষুকের মত অধমর্ণ ব্রিটেনের নিকট ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে করুণাপ্রার্থী হইয়া আছে, এ সকল সংবাদ এখনও এ দেশের অনেকেই রাখেন না। বলা বাহুল্য আমাদের অন্নবস্ত্রের সমস্ত সমস্যার মূলে লণ্ডনের ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখায় সঞ্চিত এদেশের যে দেড় হাজার কোটি টাকার মত ষ্টার্লিং পাওনা জমিয়া রহিয়াছে তাহার ইতিহাস ও গুরুত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা ভারতের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে আগ্রহশীল প্রত্যেকেরই থাকা উচিত।

ষ্টার্লিং পাওনা বুঝিতে হইলে ব্রিটেনের সহিত ভারতের বহির্বাণিজ্যের সম্পর্কটিও ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। আজ ইংরাজ রাজা হইয়া এ দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইলেও আসলে সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর বণিকত্বের মোহ আজিও তাহারা ভুলে নাই। ইংরাজ প্রথমে আসিয়াছিল ভারতের বাণিজ্যবাজার গ্রাস করিতে, আজিও তাহারা ভারতে অবাধ বাণিজ্য চালাইবার অধিকার এবং ভারতের অপরিসীম কাঁচামাল সুলভে সংগ্রহ করিবার সুযোগ বজায় রাখিবার জন্যই বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রকার অসুবিধার মধ্যেও ভারতসাম্রাজ্য দখল করিয়া বসিয়া আছে। সকলেই জানেন যে, ব্রিটেন শিল্পজীবী দেশ হইলেও ব্রিটেনের নিজস্ব কাঁচা মাল নাই বলিলেই চলে এবং সেজন্য ব্রিটেনকে তাহার সাম্রাজ্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। ভারতবর্ষের প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ ব্রিটেন সস্তাদরে কিনিয়া লইয়া তাহাদ্বারা যে শিল্প পণ্য তৈয়ারী করে সেই পণ্যবিক্রয়েই সমগ্র ব্রিটিশ জাতির গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়। ভারতের বাজারেও ব্রিটিশ পণ্য যথেষ্ট পরিমাণে আসে এবং আমরা নিজেদের একগুণ দামের কাঁচামাল হইতে নির্ম্মিত পণ্য চতুর্গুণ দামে ব্রিটিশ বণিকের নিকট হইতে কিনিতে বাধ্য হই। ভারতের দারিদ্র্য অত্যন্ত তীব্র বলিয়া সাধারণতঃ ভারতবাসী তাহাদের প্রয়োজনানুরূপ সর্ব্ববিধ পণ্য যথেষ্ট পরিমাণে কিনিতে পারে না এবং ফলে ব্রিটেন ভারতের বাণিজ্যবাজার গ্রাস করিয়াও এ পর্য্যন্ত আশানুরূপ লাভবান হইতে পারে নাই। ব্রিটেন এদেশে চল্লিশ কোটি লোককে শিল্পপণ্য জোগায় বটে, কিন্তু সেই পণ্যের হিসাবে গড়ে এক চতুর্থাংশ মূল্যের কাঁচামাল ক্রয় করিলেও এ দেশ হইতে বৎসরে এত বেশী টাকার কাঁচা মাল ক্রয় করে যে,

প্রতিবৎসর ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্যিক গতি ভারতের অনুকূলেই থাকে। সাধারণ নিয়ম অনুসারে বাণিজ্যিক গতি ভারতের অনুকূলে থাকে বলিয়া ব্রিটেন হইতে ভারতে কিছু পরিমাণ স্বর্ণ আমদানী হওয়া স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যক্রমে যথেষ্ট সস্তায় জোগান দেওয়া এই কাঁচামালের মূল্যের দরুণ ন্যায্য প্রাপ্য সুবিধাটুকুও তাহার ভোগ করা হয় নাই। এই যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের বাণিজ্যিক আনুকূল্যজনিত পাওনা টাকা ভারত সরকার ব্রিটেনেই খরচ করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং শুধু এই টাকাই খরচ করেন নাই, প্রতি বৎসর আরও কিছু টাকার স্বর্ণ ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছেন। ভারতবাসী অবশ্য এই দুর্ভাগ্যের অসুবিধা ভোগ করিয়াছে অনেক, কিন্তু এতকাল ব্রিটেনে ভারত সরকারের প্রতি বৎসর যে বিরাট পরিমাণ অর্থ প্রেরণের বাধ্যবাধকতা ছিল, ভারতের আর্থিক শৃঙ্খলা ক্ষুণ্ণ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকিলেও তাহা পাঠাইতে ভারত সরকার কোনদিন ব্যতিক্রম করেন নাই। ব্রিটেনে ভারতের যে আর্থিক দায়িত্ব ছিল তাহার সৃষ্টি হইয়াছিল কতকগুলি ব্যয়ভার বহনের বাধ্যতা হইতে। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস এবং হাই কমিশনারের অফিসের সমূহ ব্যয় ভারতসরকারকে বহন করিতে হয়, ভারত হইতে যে সকল সামরিক ও বেসামরিক ব্রিটিশ কর্ম্মচারী বৃদ্ধবয়সে পেন্সন লইয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান তাঁহাদের পেন্সনের টাকা নিয়মিতভাবে ভারতসরকারকে পাঠাইতে হয় এবং রেলপথনির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে ভারত সরকার অতীতে নিজেদের জামিনে ব্রিটেনে যে ঋণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার সুদের দরুণ মোটা টাকাও প্রতি বৎসর ভারত সরকারের পাঠাইবার কথা। এই ভাবে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত নানা উপলক্ষ্যে ভারতসরকারকে এত অধিক পরিমাণ টাকা ব্রিটেনে পাঠাইতে হইয়াছে যাহা তাহার বাণিজ্য উদ্বৃত্ত অপেক্ষা বেশী। সুতরাং প্রতি বৎসর এই বাড়তি টাকার সম পরিমাণ সোনা ষ্টার্লিংয়ের হিসাবে ভারত হইতে ব্রিটেনে প্রেরিত হইবার ফলে শিল্পজীবী ব্রিটেনকে সস্তায় কাঁচামাল সরবরাহকারী ও সেই কাঁচামালে তৈয়ারী বিলাতী পণ্য ব্যবহারকারী ভারতবর্ষ অনুকূল বাণিজ্যগতির সকল সুবিধা লাভে বঞ্চিত হইয়া ব্রিটেনের নিকট দেনাদার ভারতবর্ষ রূপে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে।

তারপর ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ায় ব্রিটেন ও ভারতের আর্থিক সম্পর্কের মধ্যে গুরুতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। যুদ্ধের প্রথম দিকে ব্রিটেন অবশ্য নগদ মূল্যে পণ্যাদি ক্রয়ের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ক্রমে যুদ্ধ ঘোরালো হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের বিপুল খরচ চালানো তাহার পক্ষে অসম্ভব হওয়ায় ব্রিটেন আরম্ভ করে ধারে কারবার। এই সময় অর্থাৎ ১৯ ১ সনের শেষ হইতে জাপান হঠাৎ আমেরিকার সহিত যুদ্ধ বাধাইলে ব্রিটেনের যুদ্ধজয় ক্রমে আমেরিকার স্বার্থ হইয়া পড়ে এবং আমেরিকাও ঋণ ও ইজারা নীতির প্রবর্ত্তন দ্বারা ব্রিটেনকে ধারে পণ্য যোগাইয়া সাহায্য করিতে থাকে। বলা বাহুল্য অতঃপর ধারে পণ্যক্রেতা ব্রিটেন ভারতকে অতিমাত্রায় স্বকার্য্যে ব্যবহার করিতে থাকে এবং এইভাবে পণ্য যোগাইয়া ব্রিটেনের নিকট ভারতের প্রচুর পাওনা জমিয়া যায়। তাছাড়া ১৯৪০ সালের এক চুক্তি অনুযায়ী ভারতের সমরব্যয়ের একাংশ বহনে ব্রিটিশ সরকার যে প্রতিশ্রুতি দেন তজ্জন্যও ভারতের হিসাবে পাওনার পরিমাণ স্ফীততর হইতে থাকে। এইভাবে যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতকে বিলাতী আর্থিক দায়িত্ব পালনের জন্য যে

টাকা পাঠাইতে হইত, তাহা পাঠাইবার আর প্রয়োজন তো থাকেই না, অধিকন্তু ভারতবর্ষই দেখিতে দেখিতে যুধ্যমান ব্রিটেনের একটি বড় পাওনাদার হইয়া উঠে।

ভারতবর্ষের এই ক্রমবর্দ্ধমান পাওনা হইতে ক্রমে ক্রমে ব্রিটেনের নিকট ভারতের অনেক দেনা শোধ হইয়া যায়। এই দেনার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় ভারতীয় রেলপথ সমূহের জন্য প্রদত্ত ব্রিটিশ মূলধনের কথা। ১৯৩৯ সালে সুদ প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে ইংলণ্ডের নিকট ভারতীয় ঋণের সর্ব্বসমেত পরিমাণ ছিল ৪৮৯ কোটি ১২ লক্ষ টাকা, এই ঋণের প্রায় সবই এখন শোধ হইয়া গিয়াছে, যে সামান্য অংশ বাকী আছে তাহা সর্ব্বসাকুল্যে ৬৭ কোটি টাকার বেশী হইবে না। বলা বাহুল্য এইভাবে ৪ শত কোটি টাকার বেশী বিলাতী ঋণ পরিশোধিত হওয়ায় বৎসরে সুদের দরুণ ভারতের অন্ততঃ ২০ কোটি টাকা বাঁচিয়া গিয়াছে। এই বিলাতী দেনা শোধ হইবার পরও ভারতের পাওনা হিসাবে ব্রিটেনে এখন প্রায় দেড় হাজার কোটী টাকা জমিয়াছে। আর্থিক অনটনের অজুহাতে ভারতীয় পণ্যাদি গ্রহণের জন্য ব্রিটেন এখন নগদ মূল্য দিতেছে না, পাওনা স্বীকার করিয়া ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডন শাখায় জমা রাখিতেছে স্টার্লিং বণ্ড এবং এই স্টার্লিং সিকিউরিটি জামিন করিয়া ভারত-সরকার ভারতের জোগানদার বা পাওনাদারদের দিবার জন্য নোটের পর নোট ছাপিয়া চলিয়াছেন। ব্রিটিশ সরকার এখনও বলেন নাই কবে তাঁহারা এই স্টার্লিং সিকিউরিটির পরিবর্ত্তে নগদ মুদ্রায় দেনা শোধ করিবেন, অথচ এই প্রাপ্য পরিশোধের আশায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়াই ভারত সরকার ভারতে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথমে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭৮ কোটি টাকা, এই নোট এখন বৃদ্ধি পাইয়া ১১৩৬ কোটি টাকায় পৌঁছাইয়াছে, অথচ এই নোটের জন্য স্বর্ণজামিন ১৯৩০ সালের তুলনায় এখন কিছুই বাড়ে নাই। সকলেই জানেন যে, নোটের মূল্য কাগজখানি নয়, ইহাতে লিখিত মুদ্রাপ্রদানের প্রতিশ্রুতি, অর্থাৎ চাহিবামাত্র সমমূল্যে স্বর্ণ প্রদানের অঙ্গীকারটুকুই নোটের আসল মূল্য। ভারতের ১১ শত কোটি টাকার বেশী নোটের পরিবর্ত্তে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে আছে মাত্র ৪৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ এবং বাকী টাকা প্রদানের সমস্ত দায়িত্ব নির্ভর করিতেছে স্টার্লিং পাওনার রূপান্তরের সম্ভাবনার উপর; এখন ভারতের চলতি নোটের জামিন হিসাবে হাজার কোটি টাকার স্টার্লিং সিকিউরিটিকে ধরা হইয়াছে। যুদ্ধের সময় সহানুভূতিতে বা কাঁপাই টাকার স্বাচ্ছন্দ্য-লাভের মোহে ভারতীয় মুদ্রানীতির এই শিথিলতায় দেশবাসী আপত্তি করিতেছে না বটে, তবে একথা সত্য যে আর কিছুদিন পরেই অর্থাৎ যুদ্ধের অবসানে আর্থিক বাজারে মন্দাভাব দেখা দিলেই এসম্বন্ধে জনসাধারণ সজাগ হইয়া উঠিবে। এই জন্যই বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণ স্টার্লিং পাওনা পরিশোধের জন্য কড়া তাগাদা দিতে ভারত-সরকারকে উপদেশ দিতেছেন এবং যদি তাঁহাদের এই পরামর্শ ভারতসরকার কার্য্যে পরিণত না করেন, তাহা হইলে ভারতের অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় যে অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আগেই বলা হইয়াছে স্টার্লিং পাওনার পরিবর্ত্তে অযথা কাগজের নোট ছাপাইয়া ভারতসরকার এদেশে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করিয়াছেন। যুদ্ধের দরুণ অনেকের হাতে আসিয়াছে প্রচুর টাকা; অথচ এই টাকার অন্তর্দেশীয় মূল্য থাকিলেও তাহার বিনিময়ে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আনিয়া কলকারখানা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইতেছে না। কাগজী নোটে

পরিবর্তে ব্রিটেনের প্রদত্ত স্বর্ণ যদি ভারতসরকারের হাতে আসিত (নোটের পরিবর্তে জামিনস্বরূপ সেই স্বর্ণ যদি রক্ষিত হইত) তাহা হইলে ভারতের মুদ্রাবৃদ্ধির সঙ্গে শিল্পপ্রসার ঘটিয়া সাধিত হইত ভারতের স্থায়ী কল্যাণ, কিন্তু এক্ষেত্রে টাকা বাড়ার অর্থ হইয়াছে যুদ্ধকালীন পণ্যাভাবের দিনে অর্থবান ব্যক্তিদের যে কোন মূল্যে সেই পণ্যসংগ্রহের লোভ এবং ফলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রয়োজনীয় পণ্যাদির অভাবে রিক্ততার শেষপ্রান্তে দুঃখময় জীবনযাপনে বাধ্য হইতেছে। এমন কি এইভাবে সৃষ্ট পণ্যাভাবের দরুণই বাংলার দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। বলা বাহুল্য, দেশের বর্দ্ধিত পরিমাণ টাকা যদি অল্প সুদে বা বিনা সুদে ব্যাঙ্কের খাতায় আটক না থাকিয়া শিল্পাদি সংগঠনে ব্যয়িত হইত তাহা হইলে অন্ততঃ কিছু কিছু কর্ম্মের সংস্থান হইয়া এইসব হতভাগ্যের অনেকেরই জীবনরক্ষার সম্ভাবনা থাকিত। কাজে কাজেই একথা সত্য যে, একদিন ষ্টার্লিং পাওনা ভারতবর্ষ ফিরিয়া পাইলেও এই পাওনা সঞ্চয়ের পশ্চাতে এদেশে অভাব দারিদ্র্য ও মৃত্যুর যে করুণ ইতিহাস সৃষ্টি হইয়াছে, সে ক্ষতি কিছুতেই পূরণ হইবে না।

তাছাড়া এই ষ্টার্লিং পাওনা কবে আদায় হইবে সে সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত আমরা পাওনাদার হইয়াও কোন সঠিক সংবাদ পাই নাই। গত ব্রেটন-উডস সম্মেলনে ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে অর্থনীতিবিদ্ লর্ড কেনেস স্বীকার করেন যে, ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং যথাসত্বর ফিরাইয়া দেওয়া উচিত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ইহাও বলেন যে, বৃটেনের বর্ত্তমানে যেরূপ আর্থিক অবস্থা তাহাতে তাহার পক্ষে বহির্বাণিজ্য সংগঠন না করিয়া এই দেনা শোধ করা সম্ভব নয়, সুতরাং এজন্য নিরুপায় হইয়াই ইংলণ্ড ভারতকে অপেক্ষা করিতে বাধ্য করিতেছে। যুদ্ধের সর্ব্বগ্রাসী খরচ বহন করিতে ব্রিটেনকে সম্প্রতি তাহার বৈদেশিক সম্পত্তির বহুলাংশ হারাইতে হইয়াছে এবং তাহার একমাত্র বাঁচিবার উপায় রপ্তানিবাণিজ্য পর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এ অবস্থায় ইচ্ছা থাকিলেও ভারতের পাওনা বিরাট পরিমাণ ঋণ পরিশোধ বর্ত্তমানে ব্রিটেনের সাধ্যাতীত বলিয়াই মনে হয়। ভারতের অনেকে অবিলম্বে এই পাওনা ফিরিয়া পাইবার আশায় শিল্প-প্রগতির স্বপ্ন দেখিতেছেন বটে, তবে এইরূপ স্বপ্ন যে অবিলম্বে সার্থক হইবে এমন কোন লক্ষণ এখনও দেখা যায় নাই। বিগত প্যাসিফিক্ রিলেশনস্ কনফারেন্সে এসম্বন্ধে একজন বড় ব্রিটিশ সরকারী কর্ম্মচারী সোজাসুজি যে কথা বলিয়াছেন তাহা অনুধাবন করিলেও আশু ষ্টার্লিং পাওনা ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা কতখানি তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে। উক্ত কর্মচারী বলিয়াছেন—

"If Indians are basing their plans for the industrialisation of their country on their ability to get within an early period the repayment of their balances in London and the rest of the Empire, they will be disappointed."

এইত গেল ষ্টার্লিং পাওনা ফিরিয়া পাইবার সময়ের দিক। ইহা ছাড়া এই ঋণ ব্রিটেন যবেই পরিশোধ করুক সেই পরিশোধ তাহারা পূর্ণমাত্রায় করিবে কি না, অর্থাৎ ভারতবর্ষ তাহার পাওনা সম্পূর্ণভাবে আদায় করিতে পারিবে কি না, সে সম্বন্ধেও এখন অনেকের মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে। সম্প্রতি ব্রিটেনের একশ্রেণীর সংবাদপত্র এই পাওনার একাংশ ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে

প্রচার করিতে শুরু করিতেছে, ভারতবর্ষ যুদ্ধের সময় ব্রিটেনকে যে সকল মাল জোগাইয়াছে সেগুলির জন্য দাবী করিতেছে অত্যধিক মূল্য এবং এই মূল্য ন্যায্য ভাবে ধরিলে ভারতের প্রকৃত পাওনা অনেক কমিয়া যাইবে। বলা বাহুল্য অভিযোগটি সত্যই গুরুতর এবং ইহার সহিত মিত্রপক্ষীয় জাতিসমূহের পরস্পরের সম্বন্ধে সততাবোধের প্রশ্ন জড়ান আছে। তবে সুখের কথা শেষ পর্যন্ত এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের খরচপত্র সম্বন্ধে তদন্ত করিতে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ লইয়া একটি পার্লামেণ্টারী কমিটি বসিয়াছিল এবং কমিটি সম্প্রতি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতসরকার বরাবর ব্রিটিশ সৈন্যদের বা ব্রিটিশ সরকারকে নিয়ন্ত্রিত মূল্যেই পণ্যাদি সরবরাহ করিয়াছেন এবং মোটের উপর অনেক জিনিষ ব্রিটিশ সরকার ভারতে যে দরে পাইবার সুযোগ পাইয়াছেন, ভারতীয়েরা পর্য্যন্ত সে দরে সে সকল পণ্য কিনিতে পায় নাই। যুদ্ধের প্রথম তিন বৎসর যে দরে বাহির হইতে ভারতে ইস্পাত আমদানি হইয়াছিল ব্রিটিশ সরকারকে ভারতে ক্রীত ইস্পাতের জন্য তদপেক্ষা এক পয়সা বেশী দিতে হয় নাই এবং প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ তিন বৎসর চলিবার পর ভারতে ইস্পাতের চূড়ান্ত অভাব এবং মূল্য বৃদ্ধির সময়েও মোটের উপর শতকরা ২৭ ভাগের বেশী মূল্য বৃদ্ধির দায় ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপান হয় নাই। কাপড়ের সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। ভারতের জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়াও ব্রিটিশ সৈন্যগণকে ভারতসরকার যথাসম্ভব কাপড় যোগাইয়াছেন এবং এই সময় যখন ভারতের সাধারণ বাজারে কাপড়ের মূল্যবৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ৪০০ ভাগ, তখনও ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে ভারতবর্ষ শতকরা ১০০ ভাগের বেশী মূল্যবৃদ্ধি দাবী করে নাই। পরে আবার উহা হইতেও শতকরা ১৫ ভাগ মূল্যহ্রাসের ব্যবস্থা করিয়া ভারতসরকার যথেষ্ট সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন।

এইভাবে ভারতের পাওনা টাকার ন্যায্যতা সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ না থাকিলেও এই পাওনা কমাইবার চেষ্টা যখন ব্রিটেনের পক্ষে একবার দেখা দিয়াছে, তখন যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সম্পূর্ণ পাওনা টাকা ফিরিয়া পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অনেকেই আশ্বস্ত হইতে পারিতেছেন না। এই অপচেষ্টার প্রথম পরিচয় ব্যর্থ হইলেও পূরো টাকা ফিরাইয়া দিবার মতলব না থাকিলে ব্রিটেনের দিক হইতে ফাঁকি দিবার নূতন কোন চেষ্টা প্রকাশ পাওয়া অস্বাভাবিক নহে। প্রকৃতপক্ষে ষ্টার্লিং সিকিউরিটিতে ভারতের এই বিপুল অর্থ আটক থাকায় ভারতের ক্ষতি হইতেছে অসামান্য। যুদ্ধব্যয় এই টাকা হইতে চালান সম্ভব হইলেও ইহার অভাবে ভারতসরকার ঋণ সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের খরচ চালাইতেছেন এবং এই ঋণপত্র সমূহের জন্য মোটামুটি ভাবে সুদ প্রদান করিতেছেন শতকরা ৩ টাকা হারে। অথচ দুঃখের কথা এই যে ভারতের পাওনা ষ্টার্লিংয়ের জন্য আমরা সুদ হিসাবে অতি সামান্য পরিমাণ অর্থ পাইতেছি। ব্রিটেনেরই বাজারে যখন শতকরা ২ ভাগ ২½ ভাগ সুদের অজস্র ঋণপত্র রহিয়াছে তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই ষ্টার্লিং সিকিউরিটি ব্রিটিশ ট্রেজারী বিলে লগ্নী করিয়া উর্দ্ধপক্ষে সুদ পাইতেছে শতকরা ১ টাকা হারে; এবং বলা বাহুল্য, এই ভাবে ১২শত কোটি টাকার বেশী ষ্টার্লিং পাওনার জন্য ভারতের ঋণপত্রসমূহের জন্য দেয় সুদের বিবেচনায় ভারত সরকারকে প্রতি বৎসর অন্ততঃ ২৪কোটি টাকা ক্ষতিস্বীকার করিতে হইতেছে। এই

ভাবে অবারণে দরিদ্র ভারতবর্ষের যে লোকসান হইতেছে তাহা আরও তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে ষ্টার্লিং পাওনার পরিবর্ত্তে যন্ত্রপাতির আমদানি দ্বারা এ দেশে শিল্প প্রসার হইতেছে না বলিয়া। শুধু ইংলণ্ডকে জিনিষপত্র সরবরাহ করিয়া নয়, আমেরিকাকে জিনিষ-পত্র সরবরাহ করিয়াও ষ্টার্লিংয়ের মত ভারতের বহু পরিমাণ ডলার পাওনা হইতেছে কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের নির্দ্দেশে সেই ডলারের পরিবর্ত্তে ভারতে মার্কিণ শিল্প সামগ্রী না আনাইয়া ভারতসরকার সেই ডলার সমমূল্যের ষ্টার্লিং পাওনায় রূপান্তরিত করিতেছেন এবং ব্রিটিশ সরকার ভারতের পাওনা ডলারের বিনিময়ে আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে লইয়া যাইতেছেন নানাবিধ পণ্য। এইভাবে ষ্টার্লিং সিকিউরিটির পাহাড় জমিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে দেখা দিয়াছে ফাঁপাই টাকার বাহুল্য, পণ্যাভাব, এমন কি অসম্ভব পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য দুর্ভিক্ষ, অথচ ভারতের প্রভূত অসুবিধা সৃষ্টি হইলেও ব্রিটিশ সরকার স্বদেশে মুদ্রানীতির সমতা এবং পণ্যের চাহিদা ও জোগানের সামঞ্জস্য বরাবর রক্ষা করিয়া চলিতেছেন।

এই ভাবে দেখিতে গেলে ষ্টার্লিং পাওনা জমিয়া উঠা ভারতের পক্ষে কোনদিক হইতে সুবিধাজনক হয় নাই এবং পাওনাদার হইয়াও এই যুদ্ধের আমলে তাহাকে বহু দুর্গতি ভোগ করিতে হইয়াছে। এত দুঃখ সহিবার পরও যদি ভারত শতকরা একশত ভাগ পাওনা টাকা ফিরিয়া পায় তাহা নিঃসন্দেহে বহু ভাগ্য বলিয়া মনে করিবে। গত যুদ্ধের অবসানে ভারতের পাওনা ১৯০ কোটি টাকা ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ যুদ্ধতহবিলে ভারতসাম্রাজ্যের দান হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবারও অনুরূপ কিছু ঘটিবে কিনা এখনই বলা সম্ভব নয়।

লর্ড ওয়াভেল সম্প্রতি ভারতের শাসন-তান্ত্রিক সংস্কার সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে ভারতের রাজনৈতিক বনিয়াদের সহিত অর্থনৈতিক বনিয়াদ পুনর্গঠনের সম্ভাবনা সম্বন্ধেও অনেকে আশাবাদী হইয়া উঠিয়াছেন। লর্ড ওয়াভেলের আন্তরিকতায় আমাদের আস্থা আছে এবং আমরাও আশা করি যে, অতঃপর ব্রিটেনের দিক হইতে বর্ত্তমান নীতি পরিত্যক্ত হইবে। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই আশা সার্থক হইলে নবগঠিত ভারত সরকারের দিক হইতে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের একমাত্র অবলম্বন ষ্টার্লিং পাওনা যথাসম্ভব আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিবার উৎসাহ দেখা যাইবে।

ব্যঙ্গরসে কবিশেখর কালিদাস রায়

অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য এম্-এ

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ করুণ রসকে হাস্যরসের বিরোধী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ 'করুণা'ই এক হিসাবে হাস্যরসের প্রাণ। তাঁহারা বলেন বাক্য বেশ এবং ব্যব-হারের বৈকৃতিই হাস্যরসোৎপত্তির মূল উপায়। এ কথাটা মোটামুটি মানিয়া লইলেও করুণরসকে হাস্যরসের বিরোধী বলিয়া স্বীকার করা কঠিন। কারণ, বাক্য বেশ বা ব্যবহারের যে বিকৃতি—যে বিকৃতি হাস্যোদ্ভবের হেতু—তাহা আমাদের মনে বিশুদ্ধ আনন্দ সঞ্চার করিয়া আমাদের

মুখে হাসি ফুটায় না। বস্তুত তাহা আমাদের অন্তঃকরণে একপ্রকার বেদনার সঞ্চার করে এবং সেই বেদনার ফলেই আমরা হাসি। বেদনার ফলে আমরা হাসি—এই কথা শুনিয়া পাঠকের হাসি আসিতে পারে। তাহারও কারণ ঐ বেদনা। যে ধারণায় আমরা অভ্যস্ত তাহার বিপরীত কথা শুনিলে মন পীড়িত হয়। আমরা জানি আনন্দেই লোকে হাসে এবং বেদনায় কাঁদে, অন্ততঃ দুঃখ পায়। কিন্তু যদি যুক্তির দ্বারা বুঝিতে পারি বেদনা যেমন কাঁদাইতে পারে তেমনি তাহার হাসাইবারও শক্তি আছে, তাহা হইলে আমাদের পূর্বতন ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে এবং এই আপাতবিরোধী মন্তব্য হাস্যোদ্রেকের কারণ হইবে না।

হাস্যরসের হাসি ক্রন্দনেরই নামান্তর মাত্র। যে পীড়ার মাত্রা অধিক হইলে কাঁদায় তাহাই অল্পমাত্রায় প্রযুক্ত হইলে হাসায়। সর্বাঙ্গ কালো পোশাকে আবৃত করিয়া মুখে একটা বীভৎস মুখোস পরিয়া যদি আপনার কোনো বন্ধু আপনার সম্মুখে উপস্থিত হন তাহা হইলে বন্ধুর চাপল্যে আপনার হাস্যোদ্রেক করিবে। কিন্তু গভীর রাত্রে একাকী অন্ধকার পথে যাইতে যাইতে যদি সম্মুখে হঠাৎ এইরূপ একটা দৃশ্য চোখে পড়ে তাহা হইলে ভয়ে মূর্ছা যাওয়াও বিচিত্র নয়। উভয়তই মন পীড়া পায়। সে পীড়ার মাত্রা এক ক্ষেত্রে কম অন্য ক্ষেত্রে বেশী।

সাহিত্যিক হাস্যরসকে এইভাবেই বিচার করিতে হইবে। বাঙ্গালা সাহিত্যে হাস্যরসের পরিধি যতটা সংকীর্ণ বলিয়া বাঙ্গালীর ধারণা, উহা ততটা সংকীর্ণ নয়। প্রাচীন কাল হইতে অধুনাতন কাল পর্যন্ত বহু লেখকের রচনায় বাঙ্গালা সাহিত্য পুষ্ট হইয়াছে। ইঁহাদের অনেকের লেখায় উচ্চস্তরের হাস্যরস দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক যুগের সাহিত্যে তো কথাই নাই প্রাচীন সাহিত্যেও বিশুদ্ধ রসিকতার যথেষ্ট পরিচয় পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কথাই ধরা যাউক। তাঁহার সৃষ্ট ভাঁড়ুদত্তের চরিত্র আধুনিক যুগের মানদণ্ডেও বিচারসহ।

বর্তমান যুগে যাঁহারা হাস্যরসরচনায় বাঙ্গালা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়, পরশুরাম, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, সুকুমার রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি প্রতিভাশালী লেখকের নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। একান্তভাবে হাস্যরসাত্মক রচনা সকলে লিখেন না। কিন্তু যে সব সাহিত্যিক গল্পে উপন্যাসে নাটকে এমন কি প্রবন্ধের মধ্যেও মনোজ্ঞ হাস্যরস পরিবেশন করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যাই কি কম? শরৎচন্দ্রের রচনার প্রতি ছত্রে যে হীরকোজ্জ্বল হাস্যরস দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই তাঁহার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ বলিয়া আমি মনে করি।

হাস্যরসের গবেষণা বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে। হাস্যরস রচনায় যে সব লেখক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতিভা অথবা তাঁহাদের সকলের রচনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিবার জন্যও এ প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। বর্তমান প্রবন্ধে আধুনিক বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের হাস্যরসাত্মক কবিতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

কালিদাসবাবু একাধারে প্রবন্ধলেখক, সমালোচক, বৈয়াকরণ এবং সাহিত্য-ঐতিহাসিক। কিন্তু বাঙ্গালাদেশ অর্থাৎ বাঙ্গালার সাধারণ পাঠকসমাজের কাছে তিনি প্রধানতঃ কবি বলিয়াই পরিচিত। তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিধি যতই বিস্তৃত এবং গভীরতা যতই দূরগামী হউক,

কেহই তাঁহাকে শাস্ত্রী বলিয়া সকুণ্ঠ সম্ভ্রম করিবে না। সকলেই কবিশেখর বলিয়া সাদর সম্মান করিবে। বহুপত্নীক রাজার পাটরাণী একজনই থাকেন! অথচ আর সকল রাণীই যে পাটরাণীর অপেক্ষা রূপেগুণে নিরেস এমন নয়।

কিন্তু কবি বলিয়াও যে সম্মান সমাদর তাঁহার প্রাপ্য তাহারও সবটুকু তিনি পাইয়াছেন কি না তাহা অবশ্যই বিচার করিতে হইবে। আমার মনে হয় তাঁহার কবি-প্রতিভার একটা দিকই আমাদের চোখে পড়িয়াছে, আর একটা দিকে আমরা যথাযোগ্য দৃষ্টি দিই নাই। তাঁহার 'পর্ণপুট', 'বল্লরী' 'ব্রজবেণু' আমাদের যত পরিচিত তাঁহার হাসির কবিতা ততটা পরিচিত বলিয়া মনে হয় না। কালিদাসবাবুর হাসির কবিতাগুলি যে মর্যাদা পাইবার অধিকারী আমার মনে হয় সে মর্যাদা তাহারা পায় নাই।

তাঁহার কবিতার মধ্যে, বিশেষত ব্যঙ্গ কবিতার মধ্যে, অনেক স্থলেই একটু জ্বালা আছে। যে জ্বালা তিনি সারা-জীবনের অভিজ্ঞতায় নিজে লাভ করিয়াছেন সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাহাকে সর্বত্র সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন—পঞ্চশরকে ভস্ম করিয়া শিব যেমন তাহাকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। "যাহা কিছু ভুয়ো, ভাঁওতা, মেকি ও গুণ্ডামি এই রচনাগুলির অভিযান তাহারই বিরুদ্ধে।"

বাঙ্গালা ভাষার হালচাল দেখিয়া কবি যে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, সেই ক্ষোভ প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার 'পাগলা নাচে' কবিতায়। যদি হাতে আইন থাকিত তাহা হইলে যাহাদের পাগলাগারদে পুরিয়া খুশি হইতেন কবিতায় তাহাদেরই এক হাত লইয়াছেন :

পাগলা নাচে তাধেই তাধেই আগ্‌লাবে তোর বাংলাভাষা,
আর না বাচে তলিয়ে গেল তোদের গরব তোদের আশা।
কাব্যে নাচে নাট্যে নাচে গল্পে নাচে, পাঠ্যে নাচে
নটরাজের নৃত্য খাসা।

'সুখবর' কবিতায় এক শ্রেণীর সাহিত্যিকের প্রতি ইঙ্গিত আছে :

শিক্ষিতেরা লিখছিল সব কেবল দেশের চর্মকথা,
খাঁটি জিনিস এরাই দেবে, ফুটবে দেশের মর্মব্যথা।
তোল্ পিঠে তোল্ খোল পাখোয়াজ, বঙ্গবাণীর মণ্ডপে আজ
বাজবে মাদল চলবে কেবল স্বায়বেশে নাচ সঙ্‌ তামাসা।

অত্যাধুনিক সাহিত্যের বস্তুতান্ত্রিকতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কবি বিদ্রূপ করিয়াছেন :

হাঁড়ির খবর নাড়ীর খবর বাদ দিয়ে কি সাহিত্য হয়?
সাহিত্যিক যে দেশের সেবক কাজটা তাহার দায়িত্বময়।
দেখ সারা দেশটা খুঁজে ভরা বমন ঘায়ের পুঁজে,
ম্যালেরিয়া যক্ষ্মাকাশে বাদ দিলে কি চলে রে ভাই?

মলাট পড়িয়া যাঁহারা সমালোচনা করেন, দুর্ভাগ্যক্রমে এরূপ সমালোচকের অসদ্ভাব নাই, তাঁহাদের প্রতি কবির কটাক্ষ :

বইটা পড়ে লাগল কেমন জানতে তুমি চেয়েছিলে,
ভূমিকাতে যা লিখেছে তার সাথে মোর মতটি মিলে।
কি বলিলে? ভূমিকা নাই? ওঃ তা হবে। সেই কথাটাই
লিখত যদি ভূমিকা কেউ নিশ্চয়ইত লিখত ওরা।

পুস্তক-সমালোচকের উপর কবির ক্রোধটা কিছু বেশী। এই একই বিষয় অবলম্বনে কবি একাধিক কবিতা লিখিয়াছেন। সব কবিতা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই কারণ, বিষয়ের ঐক্যবশতঃ এগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব। তাহা ছাড়া ইহাদের অধিকাংশই এক ছন্দে রচিত।

সাহিত্যপ্রসঙ্গ ছাড়াও যে সব কবিতা আছে তাহাদের মধ্যে 'মুরুব্বি,' 'হিংসার অপবাদ,' 'কার্পণ্য,' 'ব্যর্থ হিংসা,' 'মিথ্যা অপবাদ,' 'নিজের কথা,' 'মাতৃভক্ত,' 'দাতা,' 'আদর্শ লোকবিচার'—এগুলি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। 'আদর্শ লোকবিচার' সাহিত্য সমালোচনারই রকমফের :

রমেশ রায়ের চাটগাঁ বাড়ী? তবে ত বদ হতেই হবে।
জয় ভাদুরী হাড়-বজ্জাৎ বারেন্দ্র হয় ভদ্র রবে?
গুপ্ত মাখন বদ্দি যখন
কখ্খনো সে নয় ক সুজন।
বাঙ্গাল নাকি উমেশ চাকী? লোক তো সোজা নয়ক তবে।

যে অসাধু সে যখন সাধুত্বের অহঙ্কার করে, যে মূর্খ সে যখন পাণ্ডিত্য দেখাইতে চায়, যে কৃপণ সে যখন দানের মাহাত্ম্য ঘোষণা করে তখন সে পরিহাসের পাত্র হয়। কবির লেখায় এইরূপ ভণ্ডামির প্রতি বিদ্রূপ অনেক স্থলেই খুব তীব্ররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। 'নিজের কথা' হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করি :

নিজের কথা ফলাও করে বলাও জেন একটা দোষ,
আপন কথা একটি দিনও বলেছি এই নন্দ ঘোষ?
এই যে আমার ছোট ছেলে
এম-এ, ল-য়ে বৃত্তি পেলে,
বলিছি কি কন্যা নিবে সাধছে হাকিম চন্দ্র ঘোস?

বিদ্রূপ মাত্রেরই মূলে থাকে একটা আঘাত দিবার চেষ্টা। কার্যতঃ ইহা আঘাতের প্রত্যাঘাত। যে ব্যক্তি স্বীয় কর্মের দ্বারা কবির মনে আঘাত দিয়াছে কবি তাহার প্রতিই বিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু বাণ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়াছে কি না বলা বড় কঠিন। যে বাণ একেকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করা যায় তাহা যেমন সহজে লক্ষ্যবেধ করে বহুকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলে তত সহজে করে না। কারণ, লক্ষ্যটা তখন অনেকটা অলক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। কবির বই না পড়িয়া যদি কোনো সমালোচক সমালোচনা লিখিয়া থাকেন কবি তো তাঁহার নাম ধরিয়া গালাগালি দিতে পারেন না, অন্ততঃ দিলে তাহা সাহিত্য হইত না। ব্যক্তির প্রতি যে বিদ্বেষ তাহা এখানে ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া শ্রেণীকে স্পর্শ করিয়াছে। তাই সাহিত্যে ইহা দুঃসহ হয় নাই।

আক্রমণ যত ব্যাপক হয় হাস্যরস ততই উদার এবং উপভোগ্য হইয়া উঠে, দাহ যত কমে হাস্যরসের মাধুর্য ততই বৃদ্ধি পায়। কালিদাসবাবুর রঙ্গ কবিতাগুলিই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। রঙ্গ ও ব্যঙ্গ কবিতায় পরিপূর্ণ "রসকদম্ব" গ্রন্থখানি যাঁহারা পড়েন নাই তাঁহারা কালিদাসবাবুর আংশিক পরিচয় মাত্র পাইয়াছেন।

"শ্রাবণ ঘন বরিষণ মেঘ"

শ্রীকিরণশঙ্কর গুপ্ত

শ্রাবণ ঘন বরিষণ—মেঘ
গরজে গগনে, গগনে
ওপারে উতলা কলাপী—এপারে –
মৌন ধরণী মগনে।
হৃদয় বাঁধন মানে না –
আপন খেয়ালে হারাতে সে চায় –
কোথায় সে তাও জানে না –

যে যায় তাহারে ডাকিছে বিমনা—
এ ঘরে এ মহালগনে।
সব আছে তবু কি যেন কি নাই—
আঁখির তিয়াষা কেন ?
সবার মাঝারে খুঁজিয়া ফিরিছে
আপন প্রিয়ারে যেন !
কে দেবে তাহারে কহি—
'যারে চাও আজ সব পাওয়া শেষে
আমি সে পথিক নহি।'

যায় নাকো ধরা সে সুরখানিরে—
যেথা—গান শেষে বাজে সঘনে।

বনফুল

শ্রীসাধনা গুহ বি-এ

দখিন বাতাস যবে এল ফুলবনে,
শুধাইল জনে জনে,—
সুন্দর আসিছে স্বর্ণ রথে,
বনপথে,
আজি তারে কিবা দিবে দান ?
কেহ কহে দিব শুধু গান,
কেহ বলে অশথ
কিশলয়ে সাজাইব পথ।

নিরালা কোণেতে ছিল ক্ষুদ্র বনফুল,
অনুরাগে উন্মত্ত আকুল,
দখিন বাতাস যবে আসি
শুধাইল তারে হাসি
তুমি তারে কিবা দিবে দান ?
"নাহি সাজ, নাহি কোন গান,
প্রেমের পরশ বুলাইয়া গায়
আশীষ্ মাগিয়া লইব মাথায়"
কহে বনফুল
আনন্দে আকুল।

রাজপরিবারের সংবাদ

মহারাজকুমারী রাণী ইলা দেবীর পরলোক গমনের সংবাদ পাইয়া শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুর ব্রহ্মরণক্ষেত্র হইতে এবং মহারাজকুমার শ্রীইন্দ্রজিতেন্দ্র নারায়ণ ও ঈশরাণী সাহেবা আহমেদনগর হইতে দার্জ্জিলিংএ শ্রীশ্রীমহারাণী সাহেবার সকাশে আসিয়া উপস্থিত হন। প্রায় এক সপ্তাহ মাতৃসকাশে অবস্থান করিবার পর তাঁহারা দার্জ্জিলিং পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মস্থলাভিমুখে যাত্রা করেন।

জয়পুরমহারাণী শ্রীশ্রীগায়ত্রী দেবী ও দেওয়াসমহারাণী শ্রীশ্রীমেনকা দেবী দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

৺মহারাজকুমারীর পুত্রকন্যাগণ, জামাতা কুমার ৺মহেন্দ্রনারায়ণ এবং মহারাজকুমারের পুত্র ও কন্যা সহ শ্রীশ্রীমহারাণী সাহেবা দার্জ্জিলিংএ অবস্থান করিতেছেন।

স্থানীয় সংবাদ

কুচবিহারে মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র—

ভারতবর্ষে শিশু-মৃত্যুর হার অত্যন্ত অধিক। ইহার প্রধান কারণ এই যে শিশুজন্মের পূর্ব্বে মাতাদের উপযুক্ত যত্ন লওয়া হয় না। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব এবং অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় বাসের ফলে মাতৃগণ যে সকল শিশুর জন্ম দেন তাহারা অধিকাংশই রুগ্ন দুর্ব্বল ও কগ্ন এবং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গর্ভিণী মাতাদের এবং নবজাত শিশুর সুচিকিৎসা দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য একান্ত আবশ্যক, সেজন্য দেশের অজ্ঞ জনসাধারণের সামাজিক চক্ষু জাগাইয়া তুলিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে কুচবিহার রাজসরকার সদর হাসপাতালের কেন্দ্রস্থলে একটি মাতৃমঙ্গল ও শিশুসদন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়াছেন। ১৯৩২ সালের আগষ্ট মাসে মহারাজা ভূপ বাহাদুর স্বয়ং এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনকার্য্য সম্পন্ন করেন, এবং সেই সময় হইতে এই প্রতিষ্ঠান [illegible] মাতৃ ও নবজাত শিশুগণের নানাবিধ সাহায্য করিয়া আসিতেছে।

বাহুল্যবর্জিত এই প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সরবরাহ করিয়াছেন এবং ইহার পরিচালনার ভার [illegible] সিভিল সার্জন ও [illegible] কারিয়াছেন। সদর হাসপাতালের লেডী ডাক্তার প্রত্যহ এই কেন্দ্রে উপস্থিত থাকিয়া মাতা ও শিশুদের প্রয়োজনীয় উপদেশ ও সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত একজন নার্স এখানে বাস করিয়া থাকেন, প্রয়োজনমত এই নার্স ও সদর হাসপাতালের ধাত্রী গৃহে গৃহে যাইয়া সন্তানসম্ভবা মাতাদের উপদেশাদি দেন এবং প্রসবকার্য্য সম্পন্ন করান। শিশুগণকে এই কেন্দ্র হইতে বিনামূল্যে দুগ্ধ প্রদান করা হয় এবং স্নান করাইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

এই প্রতিষ্ঠানের জন্য একজন নারী স্বাস্থ্য-পরিদর্শিকা (Lady Health Visitor) নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের নার্সকে সঙ্গে লইয়া গৃহে গৃহে ঘুরিয়া বেড়ান এবং সন্তানসম্ভবা নারীগণকে খাদ্য, ব্যায়াম, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দেন এবং প্রয়োজনবোধে তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠানে আসিয়া লেডী ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করাইতে উৎসাহিত করেন। নবপ্রসূতা মাতা ও নবজাত শিশুগণ সম্বন্ধেও তিনি প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দিয়া থাকেন।

কুচবিহার দরবারের আদেশে বিভিন্ন মহকুমা সহরের মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ স্ব স্ব এলাকায় ধাত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহারা প্রসবকার্য্য করান ব্যতীত আসন্নপ্রসবা ও নবপ্রসূতা মাতৃগণের ও শিশুগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনমত উপদেশাদি দিয়া থাকেন।

কুচবিহারে যক্ষ্মা-নিবারণ প্রচেষ্টা—

কুচবিহার রাজ্যে যক্ষ্মা নিবারণ প্রচেষ্টা ১৯৩৮ সালে আরম্ভ হয়, এই বৎসর লেডী লিনলিথগোর আবেদনে মহারাজা ভূপ বাহাদুর ভারতবর্ষে যক্ষ্মা-নিবারণ ও যক্ষ্মা রোগীদের সাহায্যকল্পে সম্রাট বাহাদুরের ভাণ্ডারে ৫০০০৲ টাকা এবং দার্জ্জিলিংএর যক্ষ্মানিবারণী ভাণ্ডারে ১০০০ টাকা চাঁদা প্রদান করেন। এই সময় কুচবিহার রাজ্যেও একটি যক্ষ্মা-নিবারণী ভাণ্ডার খোলা হয় এবং সরকারী কর্ম্মচারী ও স্থানীয় বেসরকারী ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। প্রচার কার্য্যের সুবিধার জন্য নানাবিধ পুস্তিকা ছাপাইয়া জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তৎপর

রাজ্যে একটি যক্ষ্মা-সমিতি State (Tuberculosis Association) স্থাপিত হয় এবং মহারাজা ভূপ বাহাদুর অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার পৃষ্ঠপোষক পদ গ্রহণ করেন। এই সমিতি স্থাপিত হইবার সময় মহারাজা ভূপ বাহাদুরের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়, জনসাধারণ যেরূপ উৎসাহের সহিত যক্ষ্মানিবারণ প্রচেষ্টায় যোগ দিয়াছেন তাহাতে মহারাজা আনন্দ প্রকাশ করেন এবং আশা করেন যে শীঘ্রই এই রাজ্য হইতে যক্ষ্মারোগ বিতাড়নের জন্য সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বিত হইবে।

যক্ষ্মা-সমিতি কুচবিহারে একটি যক্ষ্মা-হাসপাতাল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কিন্তু গৃহনির্ম্মাণের মালমশলার দুর্লভতার জন্য আপাততঃ এই সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়। ইহার পরিবর্ত্তে সদর হাসপাতালে যক্ষ্মারোগীদের পরীক্ষার জন্য একটি পৃথক চিকিৎসাগার খোলা হয় এবং হাসপাতালের রেডিওলজিষ্ট ডাক্তার এই সকল রোগীদের পরীক্ষা করিতে থাকেন। এক্ষণে কুচবিহার রাজ্যে এই রোগাক্রান্ত রোগীদের সংখ্যা নির্ণয়ের চেষ্টা চলিতে থাকে।

কুচবিহার নগর-সমিতির (Town Committee) স্বাস্থ্য পরিদর্শক যক্ষ্মারোগের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইতে থাকেন। ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতা প্রাচীর-পত্র প্রদর্শন প্রভৃতি দ্বারা এই রোগের কারণ, বিস্তার এবং নিবারণ সম্বন্ধে জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তোলা হইতে থাকে। এতদ্ব্যতীত স্বাস্থ্য-পরিদর্শক গৃহে গৃহে যাইয়াও গৃহস্থদিগকে এই রোগ সম্বন্ধে সতর্ক করিতে ও তাহাদিগকে নানাবিধ উপদেশ দিতে থাকেন।

মহারাজা ভূপবাহাদুর কসৌলীতে লেডী লিনলিথগো স্বাস্থ্যনিবাসে একটি কুটির নির্ম্মাণের জন্য ৩০০০৲ টাকা দান করেন, লেডী লিনলিথগো এই টাকা পাইয়া মহারাজা ভূপবাহাদুরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া এক চিঠি লেখেন এবং এই কুটিরের নাম "কুচবিহার কুটির" রাখেন। এই কুটিরে দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হইবে।

কুচবিহার রাজ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি—

কুচবিহার দরবার রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। চিকিৎসা বিভাগের কার্য্যকারিতা বাড়াইবার জন্য সম্প্রতি এই বিভাগের পুনর্গঠন করা হইয়াছে। চারি জন নূতন এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নিযুক্ত করা হইয়াছে, ইঁহাদের মধ্যে একজনকে ল্যাবরেটরীর ভার দেওয়া হইয়াছে। ঔষধ এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়ের বরাদ্দ উদারভাবে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

গ্রামাঞ্চলে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ডিস্পেন্সারী সমূহের অবস্থার বহুল উন্নতিসাধন করা হইতেছে। সহর ও গ্রামাঞ্চলে ম্যালেরিয়া, বসন্ত ও কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব নিবারণকল্পে বাস্তবে নানাবিধ রোগ-নিবারণ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। এইজন্য বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে।

সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে মেজর বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় এম-বি, ডি-পি-এইচ, ডি-টি-এম কুচবিহার রাজ্যের হেল্‌থ অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি সংক্রামকরোগের হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরূপেও কার্য্য করিবেন। মেজর মুখোপাধ্যায় শীঘ্রই তাঁহার পদে যোগদান করিবেন।

কুচবিহার নারীমণ্ডল শিল্পালয়—

স্থানীয় মহিলাগণের মধ্যে সূচী ও বয়নশিল্প শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে কুচবিহার দরবার স্থানীয় বালিকা

বিদ্যালয় সুনীতি একাডেমীতে একটি সেলাই-ক্লাস খুলিবার অনুমতি দিয়াছেন। ইহার নাম "কুচবিহার নারীমণ্ডল শিল্পালয়" রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক শনিবার স্কুলের পরে ৩টা হইতে ৬টা পর্যন্ত এই ক্লাস বসিবে। সুনীতি একাডেমির সেলাই শিক্ষয়িত্রী সেলাই ও দর্জ্জির কাজ শিক্ষা দিবেন এবং সরকারী শিল্পবিভাগের একজন ডিমন্সট্রেটার বয়ন কার্য্য শিখাইবেন। মহিলাগণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য বিনাভাড়ায় ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট বিভাগের মোটর বাস পাওয়া যাইবে। শিক্ষার্থী মহিলাগণকে কোনরূপ বেতন দিতে হইবে না। উন্নয়ন বিভাগ প্রয়োজনীয় সূতা, কাপড় প্রভৃতি ন্যায্যমূল্যে মহিলাগণকে সরবরাহ করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে প্রস্তুত দ্রব্যাদি উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

মাতৃশ্রী শ্রীশ্রীমহারাণী সাহেবার সভানেত্রীত্বে সুনীতি একাডেমি গৃহে "নারীমণ্ডল শিল্পালয়ের" প্রথম অধিবেশন হয়। শিক্ষালাভেচ্ছু মহিলাগণকে শিল্পালয়ের সম্পাদিকা মিসেস্ ইন্দিরা রায়ের নিকট আবেদন করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

কুচবিহারের উদ্বৃত্ত ধান্য ও চাউল—

বাংলার অভাবগ্রস্ত অঞ্চল সমূহের জন্য কুচবিহার দরবার বাঙ্গলা সরকারের নিকট দেড়লক্ষ মণ চাউল ও ধান বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই ধান ও চাউল কুচবিহারে উদ্বৃত্ত হইয়াছে। ভারতের পূর্ব্ব দেশীয় রাজ্যসমূহের মাননীয় রেসিডেন্ট বাহাদুরের বরাবরে এই সম্বন্ধে বন্দোবস্ত অবলম্বন করা হইতেছে।

সুনীতি একাডেমির ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল—

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে এই বৎসর স্থানীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় হইতে ১৭টি বালিকা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছিল এবং তাহারা সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে। সুনীতি একাডেমির পরীক্ষার ফল বরাবরই সন্তোষজনক, বর্ত্তমান বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের হার শতকরা মাত্র ৪৫ জন, এই দুর্ব্বৎসরেও যে সুনীতি একাডেমি হইতে পরীক্ষার্থী সকল বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে ইহা সংশ্লিষ্ট সকলেরই কৃতিত্বের পরিচায়ক।

দেশ-বিদেশের কথা

মহাযুদ্ধের গতি—

মহাযুদ্ধের গতি ক্রমশঃই মিত্রপক্ষের অনুকূলে চলিতেছে। ব্রহ্মযুদ্ধে মিত্রপক্ষ প্রায় সর্ব্বত্রই জয়লাভ করিতেছেন; তবে স্থানে স্থানে—যেমন সিতাং নদীর বাঁকে—জাপানীরা মরিয়া হইয়া সংগ্রাম করিতেছে। চীন-জাপান যুদ্ধ অষ্টম বর্ষ অতিক্রম করিয়া নবম বর্ষে উপনীত হইল; জাপান যত সহজে চীন জয় করিবে ভাবিয়াছিল তাহা পারে নাই, এখন ক্রমশঃ হটিয়া যাইতেছে। চীন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছে এবং চীনা সৈন্য ইন্দোচীন প্রবেশ করিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ফিলিপাইনের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ সম্পূর্ণরূপে জাপকবল-মুক্ত হইয়াছে। জাপানীরা সেখানে ২৩ ডিভিশন সৈন্য নিয়োগ করিয়াছিল, উহার প্রায় সমস্তই নিশ্চিহ্ন

হইয়াছে। জেনারেল ম্যাক্-আর্থার তাঁহার এক ঘোষণায় বলেন যে ফিলিপাইনের যুদ্ধে জাপানের বৃহত্তম ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে ; এই দ্বীপপুঞ্জ পুনরধিকারের ফলে মিত্রশক্তি একটি বিরাট স্থল, নৌ ও বিমান ঘাঁটি লাভ করিল। এই স্থান হইতে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালান অধিকতর সুগম হইবে।

খাস জাপানে আমেরিকার অতিকায় বিমানসমূহ প্রত্যহ বোমাবর্ষণ করিয়া জাপানের শিল্পাঞ্চল বিধ্বস্ত করিয়া দিতেছে। প্রত্যহ জাপানের বিরুদ্ধে তিন হাজার বিমান পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে এবং শীঘ্রই জাপান দ্বীপপুঞ্জে অভিযাত্রীবাহিনী প্রেরণের সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে। এক সংবাদে প্রকাশ যে জাপানে যুদ্ধনেতা ও শিল্পপতিগণের মধ্যে বিরোধের ভাব ক্রমশঃই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে এবং ইহার ফলে জাপানে এক অন্তর্বিপ্লব দেখা দেওয়াও অসম্ভব নহে।

অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রীর মৃত্যু ও নূতন প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ—

অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ জন কার্টিন গত ৫ই জুলাই ৬০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি কিছুদিন যাবত দুরারোগ্য হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন এবং ইহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। গত মে মাস হইতেই তিনি কার্য্যতঃ প্রধান মন্ত্রিত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্থলে মিঃ চিফ্‌লী অস্থায়ীভাবে প্রধান মন্ত্রীর কাজ করিতেছিলেন। মিঃ কার্টিনের মৃত্যুতে মিঃ চিফ্‌লী অস্থায়ীভাবে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।

মিঃ কার্টিন একজন বিখ্যাত ও যোগ্য সমরনেতা ছিলেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী হন ; জাপান আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি দেশকে সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন এবং সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধ চালাইয়া গিয়াছিলেন। সাম্রাজ্য রাষ্ট্র নীতিতেও তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল।

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতির পরলোকগমন—

গত ৬ই জুলাই রাত্রি সাড়ে ১১টার সময় কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯১ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার মধ্যে ১৯২৩ হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতির কার্য্য করেন। উকীল এবং বিচারক হিসাবে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সুনাম ছিল।

বাংলার লাট ও লাট-পত্নীর দক্ষিণেশ্বর মন্দির ও বেলুড় মঠ পরিদর্শন

বাংলার লাট মিঃ কেসী ও তাঁহার পত্নী মিসেস্ কেসী বাংলার সংস্কৃতির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। গত ৮ই জুলাই অপরাহ্ণে তাঁহারা প্রসিদ্ধ দক্ষিণেশ্বর মন্দির পরিদর্শন করেন। তাঁহারা মন্দিরের চারিদিক ঘুরিয়া দেখেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে ঘরে বাস করিতেন সেই ঘরও দেখেন। ইহার পর তাঁহারা বেলুড় মঠেও গিয়াছিলেন।

কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব—

গত ৮ই জুলাই নৈহাটি কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের ১০৭তম জন্ম-দিবসের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বাসগৃহের সম্মুখে সুসজ্জিত মণ্ডপ মধ্যে এক জনসভার অধিবেশন হয়। লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অমর প্রতিভা এবং সাহিত্যের

বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার অতুলনীয় দানের উল্লেখ করেন। খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, খ্যাতনামা নাট্যকার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রভৃতি বক্তা বক্তৃতা দেন।

রুশভাষায় তুলসীদাসী রামায়ণের অনুবাদ—

তুলসীদাসের রামায়ণ ("রামচরিতমানস") সমগ্র হিন্দুভারতের আদরের ও শ্রদ্ধার বস্তু। হিন্দীভাষাভাষী হিন্দু মাত্রেই এই গ্রন্থ ধর্মগ্রন্থরূপে ভক্তিভরে পাঠ করিয়া থাকেন বা ইহার পাঠ শ্রবণ করিয়া থাকেন। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে রুশভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে। রুশ বিজ্ঞানপরিষদের জনৈক সদস্য এই অনুবাদ করেন, এবং সম্প্রতি অনুষ্ঠিত উক্ত পরিষদের জুবিলী উৎসবে উক্ত অনুবাদের অংশবিশেষ পাঠ করিয়া শুনান। আমরা আশা করি এই অনুবাদের মধ্য দিয়া রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগ ঘনিষ্ঠতর হইবে।

১৯৪৮ সালের অলিম্পিক খেলা—

রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ যে সুইজারল্যাণ্ডের লসেন (Lausanne) সহরের মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন যে তাঁহারা ১৯৪৮ সালের অলিম্পিক খেলা লসেন সহরে আহ্বান করিবেন। বর্তমান মহাযুদ্ধের জন্য এই খেলা কয়েক বৎসর স্থগিত রহিয়াছে। শেষ অলিম্পিক খেলা ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল—

এই বৎসর (১৯৪৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রায় ৪২ হাজার ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে মাত্র ২৯।০ হাজার ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছে। গত বৎসর উত্তীর্ণের হার ছিল শতকরা ৬৭ জন, এই বৎসর হ্রাস করিয়া ৫৫এ দাঁড়াইয়াছে। প্রকাশ যে ইংরাজীতে অত্যধিক ফেলের জন্য পাশের হার এত কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং ইংরাজীতে এত অধিক ফেলের কারণ কি অনুসন্ধান আবশ্যক, প্রয়োজনমত উহার সংস্কার করাও দরকার।

ইন্দিরাদেবীর ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণ পদক লাভ—

বাংলার খ্যাতনামা লেখিকা ইন্দিরাদেবী এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণ-পদক লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষায় সাহিত্য বা বিজ্ঞানে যে মহিলার রচনা সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বিবেচনা করেন তিন বৎসর অন্তর তাঁহাকে এই স্বর্ণ পদক প্রদত্ত হইয়া থাকে। গত ১৯৩৫ সাল হইতে এই পদক প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। ইতিপূর্বে মানকুমারী বসু, নিরুপমা দেবী ও অনুরূপা দেবী এই পদক লাভ করিয়াছেন।

ইন্দিরা দেবী প্রথম ভারতীয় আই সি এস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ও বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর ('বীরবল') স্ত্রী। ইন্দিরা দেবীর রচনাবলী প্রধানতঃ মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁহার একখানি প্রবন্ধ সংগ্রহ "নারীর কথা" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা তাঁহার এই সম্মানলাভে আনন্দিত এবং মনস্বিনী মহিলাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বোম্বাইয়ে ভারতীয় রাজন্যবর্গের সভা—

গত ডিসেম্বর মাসে নরেন্দ্রমণ্ডলের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্যগণ পদত্যাগ করার ফলে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার অবসান হইয়াছে। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে রাজন্যবর্গের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি ও স্পেশাল কমিটির সভা হয়, এই উভয় সভায় ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্যগণের পদত্যাগ প্রত্যাহার করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইহার ফলে নরেন্দ্রমণ্ডলের স্বাভাবিক কার্য্য পরিচালন ব্যবস্থা পুনরায় ফিরিয়া আসিবে।

বোম্বাইয়ে রাজন্যবর্গ কতকগুলি জরুরী বিষয়ে আলোচনা করেন। ভারতসরকারের ভবিষ্যৎ শিল্পনীতির ফল দেশীয় রাজ্যসমূহের উপর কিরূপ হইবে, ভারতের শিল্পোন্নতিকল্পে বৃটিশভারতের সহিত দেশীয় রাজ্যসমূহের সহযোগিতা কিরূপ ধারণ করিবে ইত্যাদি বিষয় রাজন্যবর্গ আলোচনা করেন। নরেন্দ্রমণ্ডলের চ্যান্সেলার ভূপালের নবাব ব্যতীত নবনগরের জামসাহেব, গোয়ালিয়রের মহারাজা, বিকানীরের মহারাজা, পাতিয়ালার মহারাজা এবং রামপুরের নবাব রাজন্যবর্গের সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বোম্বাইয়ে নরেন্দ্রমণ্ডলের উপদেষ্টা সমিতিরও এক সভা হয়। এই সভায় এক বক্তৃতা প্রদান কালে ভূপালের নবাব লেঃ জেঃ ওয়াভেল প্রস্তাবের উল্লেখ করেন এবং বলেন যে ভারতীয় রাজন্যবর্গ একান্তমনে কামনা করেন যে ভারতীয় সমস্যার একটি সর্বজনসম্মত সমাধান হউক। ঘটনাবলী দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিতেছে, রাজন্যবর্গ সর্ব্বদাই এই অগ্রগতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে প্রস্তুত। ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের গভর্ণমেণ্টের সহিত ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সর্ত্তে আবদ্ধ হইবার আশা নবাব বাহাদুর পোষণ করেন। দেশীয় রাজ্যসমূহও ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে এবং প্রজাসাধারণ শাসনব্যবস্থার সহিত সংযুক্ত হইতেছে। নবাব বাহাদুর আবেগভরে বলেন, "ভারত আমাদের মাতৃভূমি; আমরা এক সুমহান সংস্কৃতির অধিকারী, সাম্প্রদায়িক বিভেদ আমাদের মধ্যে নাই, সমগ্র ভারতের অগ্রগতিতে সাহায্য করিতে আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত।"

অনেক সময় সংবাদপত্রাদিতে বলা হইয়া থাকে যে রাজন্যবর্গের মধ্যযুগীয় মনোভাবের জন্যই ভারতের অগ্রগতি অবরুদ্ধ হইয়া আছে। কিন্তু ইহা যে প্রকৃত সত্য নহে ভূপালের নবাব বাহাদুরের বক্তৃতা হইতে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

ওয়াভেল প্রস্তাবের ব্যর্থতা—

ভারতের অচল অবস্থা দূরীকরণের জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের যে প্রস্তাব বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের মারফৎ এদেশে করা হইয়াছিল তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কংগ্রেস, মুসলীম লীগ প্রভৃতি বিভিন্ন দলকে বড়লাটের শাসনপরিষদের সদস্যপদের জন্য নাম দাখিল করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। একমাত্র মুসলিম লীগ ব্যতীত অন্যান্য সকল ভারতীয় দলই বড়লাটের নিকট নাম দাখিল করিয়াছিলেন, কিন্তু মুসলিম লীগ নাম দাখিল করিতে সম্মত হন নাই। মুসলিম লীগ দাবী করেন যে শাসনপরিষদের সব কয়টি মুসলমান পদই মুসলিম লীগের মনোনীত ব্যক্তিগণকে দিতে হইবে। এই দাবী বড়লাট মানিয়া লইতে পারেন নাই। সুতরাং আপাততঃ লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব ব্যর্থ হইল। ১৪ই জুলাই নেতৃসম্মেলনে বড়লাট ঘোষণা করেন যে সম্মেলন ব্যর্থ

হইয়াছে ; কাহারও উপর দোষারোপ না করিয়া বড়লাট বলেন যে এই ব্যর্থতার জন্য তিনিই দায়ী ; নেতৃগণ যেন পরস্পরের প্রতি দোষারোপ না করিয়া সংযম অবলম্বন করেন।

রুশ বিজ্ঞান-পরিষদের জুবিলী উৎসব—

রুশ বিজ্ঞান-পরিষদের ২২০তম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মস্কো ও লেলিনগ্রাড সহরে বিশেষ জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে ডক্টর মেঘনাদ সাহা এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। গত পঁচিশ বৎসরে রুশিয়া বিজ্ঞানক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি করিয়াছে ; ইহার মূলে রহিয়াছে রুশ বিজ্ঞানপরিষদের সাধনা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা। রুশরাষ্ট্র বিজ্ঞানকে সর্ব্বতোভাবে শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিতে নিয়োগ করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞান-পরিষদের উপর ইহার ভার ন্যস্ত করেন। তাহার ফলেই রুশ দেশের বর্ত্তমান প্রগতি সম্ভব হইয়াছে। ডক্টর সাহা বলিয়াছেন যে, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে রুশ দেশ শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে বর্ত্তমান ভারতের মতই পশ্চাৎপদ ছিল, কিন্তু পঁচিশ বৎসরের সাধনার ফলে রুশিয়া আজ জগতের একটি প্রধান শক্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ডক্টর সাহা বলেন যে ৪০ কোটি ভারতীয় নরনারীর দারিদ্র্য, রোগ ও পুষ্টিহীনতা দূর করিতে হইলে ভারতবর্ষকে রুশিয়ার দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে।

বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক জুলিয়ান হাক্সলীও রুশিয়ার এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি বলেন রুশিয়ায় বিজ্ঞান যে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই তাহা হয় নাই। বিজ্ঞান কেবল যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহা নহে, বহুক্ষেত্রে বিজ্ঞানের যে বিপুল প্রয়োগ ও বিরাট সাফল্য রুশিয়ায় দেখা গিয়াছে বৃটিশ সাম্রাজ্যের কোথাও তাহা নাই।

বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে কাজে লাগাইতে না পারিলে বর্ত্তমান জগতে টিকিয়া থাকা কঠিন। আমরা আশা করি ভারতবর্ষে অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে নূতন রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। গত ১২ই হইতে ১৪ই জুলাই পর্য্যন্ত তিন দিন ধরিয়া এই উৎসব হয় এবং বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গ্রাজুয়েটগণকে উপাধি প্রদান করা হয়। তিন দিনই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর রাধাবিনোদ পাল গ্রাজুয়েটগণকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন এবং শেষ দিন চ্যান্সেলার বাংলার লাট মিষ্টার কেসী তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন। ডক্টর পাল গ্রাজুয়েট-গণকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে তাঁহাদিগের সম্মুখে মহান্ কর্ত্তব্যভার রহিয়াছে ; তাঁহাদিগকে ইহা বহন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যুদ্ধের ফলে এক নূতন জগৎ সৃষ্টি হইতে যাইতেছে, এই জগতে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে যোগ্যতার মান অতীত কালের মান হইতে অনেক উঁচু হইবে, প্রত্যেককে নিজ নিজ যোগ্যতাবলে স্বীয় ভাগ্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। ছাত্রজীবনে গ্রাজুয়েটগণ যে বিচারবুদ্ধি, কর্ম্মপ্রবণতা, সংযম ও অন্যান্য গুণের অধিকারী হইয়াছেন কর্ম্মজীবনে তাহাই তাঁহাদিগকে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে। ডক্টর পাল আশা করেন যে গ্রাজুয়েটগণ মাতৃভূমিকে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির অভিশাপ হইতে মুক্ত করিয়া

এক-ভারতীয় জাতি গঠনে সহায়তা করিবেন। মহিলা গ্রাজুয়েটগণকে সম্বোধন করিয়া ডক্টর পাল বলেন যে যদিও তাঁহারা পুরুষ ছাত্রদের মত একই প্রকার পাঠাভ্যাস করিয়াছেন এবং একই প্রকার ডিগ্রীলাভ করিয়াছেন তাহা হইলেও জীবনের যাত্রাপথে তাঁহাদিগের কর্ম্মক্ষেত্র পুরুষ গ্রাজুয়েটদের হইতে পৃথক। গৃহ ও সংসারকে অধিকতর আনন্দের আলোকে আলোকিত করিয়া গড়িয়া তুলিবার মহান্ প্রয়োজনেই তাঁহাদিগকে তাঁহাদের উচ্চশিক্ষা নিয়োজিত করিতে হইবে। বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রাজুয়েটগণকে সম্বোধন করিয়া ডক্টর পাল বলেন যে তাঁহারা যেন দেশের জীবনকে শান্তিময় করিবার মহান ব্রতে নিজেদিগকে নিয়োজিত করেন।

চ্যান্সেলার মিঃ কেসী বাংলার যুবকগণকে এবং উপাধিপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েটগণকে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি স্বর্গীয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের উপদেশাবলীর উল্লেখ করিয়া বলেন যে বাঙ্গালী যুবকেরা চেষ্টা করিলে অবশ্যই ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। বাংলার ব্যবসাবাণিজ্য অধিকাংশই পরদেশীর হাতে চলিয়া গিয়াছে, ইহা পুনরুদ্ধার করিতে হইবে।

আমরা গ্রাজুয়েটগণকে চ্যান্সেলার ও ভাইস-চ্যান্সেলারের উপদেশাবলীর প্রতি অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

খেলাধূলা

ফুটবল লীগ—

কলিকাতার ফুটবল লীগের খেলা নানা কারণে এবার ক্রীড়ামোদিগণের বিশেষ আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথম পরিক্রমার খেলায় ভবানীপুর দল যেভাবে খেলিতেছিল তাহাতে সকলেই কতকটা বিস্মিত হইয়াছিল। মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল প্রভৃতি দলগুলিকে পশ্চাতে রাখিয়া সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে ভবানীপুর লীগতালিকার শীর্ষস্থান অধিকার করে। কিন্তু দ্বিতীয় পরিক্রমার খেলায় ভবানীপুর দল তাহাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিতে পারে নাই। কিন্তু কোন দল শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবে তাহা লইয়াও বহু জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল দলের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে তাহা নির্ভর করিতেছে বেশীর ভাগ ভবানীপুর দলের খেলার উপর। কারণ ইষ্টবেঙ্গল বনাম ভবানীপুর খেলায় ইষ্টবেঙ্গলের জয়লাভ, ড্র, বা পরাজয়ের উপর লীগ খেলার মীমাংসা নির্ভর করিবে। কাজেই

ভবানীপুর লীগখেলার মোড় শেষ মুহূর্তেও ঘুরাইয়া দিতে পারে। মহমেডান দল এবার তাহাদের পূর্ব সুনাম অনেকাংশেই ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। এবং এই কারণে মহমেডান দলের সমর্থকদিগের অনেকেই বিশেষ নিরাশ হইয়াছেন।

লীগ খেলায় বর্ত্তমানে মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল ও ভবানীপুর দল যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। মোহনবাগান ২৪টি খেলায় ৩৮ পয়েন্ট, ইষ্টবেঙ্গল ২৩টি খেলায় ৩৭ পয়েন্ট এবং ভবানীপুর ২৩টি খেলায় ৩৫ পয়েন্ট লাভ করিয়াছে।

আই-এফ-এ শীল্ড খেলা—

আই-এফ-এ শীল্ড খেলায়ও এবার কিছু বৈচিত্র্যের সঞ্চার হইয়াছে। একদিকে বগুড়া দল কলিকাতার প্রথমশ্রেণীর ফুটবল দল ও একসময়ের শ্রেষ্ঠদল এরিয়ান্স দলকে পরাজিত করিয়া ইষ্টবেঙ্গলের সহিত কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার অধিকার অর্জ্জন করিয়াছে। অন্যদিকে ইষ্টবেঙ্গল দল পর পর দুইদিন হায়দ্রাবাদ পুলিশ দলের সহিত ড্র করিয়া তৃতীয় দিনে দুই গোলে ওয়াকওভার করিয়াছে। বগুড়াদলে কুচবিহার দলের দুইজন তরুণ খেলোয়াড় খেলিতেছেন। ঝান্টু দাশগুপ্ত ও কান্তি দত্ত —বগুড়াদলে বিশেষ সুনামের সহিত খেলিতেছেন। ঝান্টু দাশগুপ্তের বল লইয়া দ্রুত দৌড়ানো দেখিয়া কলিকাতার দর্শকগণ তাঁহাকে "দার্জ্জিলিং মেইল" আখ্যা দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় আহত হওয়ার দরুণ কান্তি দত্ত আর এই দলে খেলিতে পারিলেন না। আমরা এই দুইজন তরুণ খেলোয়াড়ের উত্তরোত্তর গৌরববৃদ্ধি কামনা করি।

বাহিরের দলগুলির মধ্যে আই-এফ-এ শীল্ডে একমাত্র বগুড়াদলই কোয়ার্টার ফাইনালে উঠিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

বি-এণ্ড-এ-আর দল এবার কতকটা অপ্রত্যাশিত ভাবেই প্রথমদিকে বিদায় লইয়াছেন।

স্থানীয় খেলাধূলা—

কুচবিহারে একমাত্র শ্মশানমাঠে একটী শীল্ড প্রতিযোগিতা চলিতেছে। শ্মশান "বি" ও পাটাকুড়া দল ভাল ভাবে খেলিয়া সেমিফাইনালে পরস্পর প্রতিযোগিতা করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে।

পুলিশদল জেনকিন্স স্কুল দল ও এস-এম-স্কুল দলের সহিত দুইটি প্রীতি-ফুটবল ম্যাচ খেলিয়া প্রথমোক্ত দলের নিকট পরাজিত হয় ও শেষোক্ত দলকে পরাজিত করে। খেলা দুইটিতে বহুদিন পর এস-বর্দ্ধন ও পঙ্কজ বিশ্বাসকে ফুটবল মাঠে দেখা যায়।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

কোচবিহার দর্পণের নিয়মাবলী।

১। কোচবিহার দর্পণের প্রতি সংখ্যার মূল্য চারি আনা ও বার্ষিক সডাক তিন টাকা। মূল্য অগ্রিম দেয়।

২। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লেখা কাগজের একপৃষ্ঠায় স্পষ্টরূপে লিখিয়া সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে। উৎকৃষ্ট লেখার জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

৩। অমনোনীত লেখা ফেরৎ লইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকেট সহ ঠিকানা লেখা খাম পাঠাইতে হয়, অমনোনীত কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৪। কোচবিহার দর্পণে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা ১০৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৬৲ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা। কভারে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার দ্বিগুণ।

৫। টাকাকড়ি সম্পর্কিত চিঠিপত্র ম্যানেজারের নিকট লিখিতে হইবে।

ম্যানেজার কোচবিহার দর্পণ,
ষ্টেটপ্রেস, কোচবিহার।

মহারাজকুমারী রাণী ইলা দেবী

কোচবিহার দর্পণ

অষ্টম বর্ষ { ভাদ্র ১৩৫২ সন, রাজশক ৪৩৬ } ৫ম সংখ্যা

ঔপন্যাসিক অন্নদাশঙ্কর রায়

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্, পি-এইচ্-ডি

অতি আধুনিক ঔপন্যাসিকের মধ্যে যাঁহারা ব্যক্তিজীবন বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে যে পৃথিবীব্যাপী জটিল চিন্তাধারা ও সমস্যাসঙ্কুলতা মানবমনকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিতেছে তাহার আলোচনাতেই মুখ্যভাবে ব্যাপৃত আছেন, অন্নদাশঙ্কর রায় বোধ হয় সেই শ্রেণীর শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার মননশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ও সক্রিয়। অতি সংজ্ঞ সবল কথায়, তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়া তিনি দুরূহ আলোচনার মর্ম্মভেদ করিতে পারেন। ইহা ছাড়া যে সমস্ত নরনারী আত্মকেন্দ্রিক জীবনে সীমাবদ্ধ নহে, বিশ্বব্যাপী বিক্ষোভ ও আন্দোলন যাহাদের বক্ষস্পন্দনকে দ্রুততর করিয়া ব্যক্তিজীবনকে সমৃদ্ধ করে, পৃথিবীকে নূতন করিয়া গড়িবার আকাঙ্ক্ষা, বিভ্রান্ত জগৎকে নূতন পথনির্দ্দেশের প্রেরণা যাহাদের ব্যক্তিগত কামনা ভালবাসার প্রকৃতি ও গতিবেগ নির্দ্ধারণ করে, অন্নদাশঙ্করের সুবৃহৎ উপন্যাস 'সত্যাসত্যে' তাহাদের বহিঃপ্রচেষ্টা ও অন্তরের আকুতি সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। আজকাল পাশ্চাত্য দেশসমূহের অধিবাসীর একটা বিশিষ্ট অংশ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহারা সর্ব্বদা একটা যুদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়ায় বাস করে, আপন আপন দলের মতপ্রতিষ্ঠা ও বিরুদ্ধমত খণ্ডন ইহাদের জীবনের মুখ্যতম প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টায় ইহাদের বক্ষোরক্ত, ইহাদের তীব্রতম অনুভূতি ও কাম্যতম আকাঙ্ক্ষা আলোড়িত হইয়াছে। ব্যক্তিজীবনের স্বাধীনতাকে ইহারা যথাসাধ্য সঙ্কুচিত করিয়া আনিয়াছে। প্রেম, বন্ধুতা, সমবেদনা প্রভৃতি সুকুমার হৃদয়বৃত্তিগুলি এই রণোন্মাদের তালে তালেই স্পন্দিত হইয়াছে, ইহার অনুমতি ব্যতীত এক পাও অগ্রসর হইতে সাহসী হয় নাই। জীবনকে লইয়া অশ্রান্ত পরীক্ষা চলিয়াছে—ইহাকে সর্ব্বদা নূতন নূতন আদর্শে যাচাই করা হইয়াছে, নব নব অনুভূতির স্পর্শে, নব নব সমস্যার প্রভাবে ইহার উদ্দেশ্য ও যাত্রাপথ নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে। রাজপথের ধূলিজালের মধ্যে ইহার চিন্তা ও কর্ম্মজগতের দ্রুতগামী

তরঙ্গোচ্ছ্বাসের কেন্দ্রস্থলে অন্তর-লোকের অভিনয়-লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

অবশ্য এই নূতন প্রণালীর সুবিধা অসুবিধা দুই আছে। পটভূমিকার বিস্তৃতির সঙ্গে সমপরিমাণে উপলব্ধির গভীরতা কমে। বহির্মুখী জীবনের বিক্ষেপ ইহার রসকে তরল করে, বাহ্যবস্তুর পুঞ্জীভূত চাপে অন্তরের স্বচ্ছন্দ বিকাশ কতকটা প্রতিরুদ্ধ হয়। জীবনের যে স্তরে আমরা তর্ক করি, জগতের কল্যাণ চিন্তা করি, দলগত প্রতিপত্তিবর্দ্ধনে যত্নবান, এমন কি জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন হই, আর যে স্তরে ভালবাসি, আত্মবিস্মৃত যৌবন-স্বপ্ন রচনা করি, সহজ আত্মীয়তার টানে আকৃষ্ট হই, হৃদয়ের প্রত্যক্ষ, যুক্তিতর্ক-নিরপেক্ষ অনুভূতির স্পর্শ পাই—এই দুই স্তর সমান গভীর নহে। কাজেই বাদল, সুধী প্রভৃতি চরিত্রগুলি যখন নানা অভিজ্ঞতার স্তর দিয়া, নানা লোকের সাহচর্য্যে ও মতবাদের সংঘর্ষে, বিচিত্র পরিবেষ্টনীতে নিজ আদর্শ খুঁজিয়া বেড়ায়, তখন যেন তাহাদের ব্যক্তিত্বের উপরিভাগের চাঞ্চল্য মননশক্তিতে ভাস্বর ও উত্তেজনায় বেগবান হইয়া উঠে, কিন্তু ইহার গভীরতম রহস্যটুকু ধরা পড়ে না। যে মন পরিবর্ত্তনের তরঙ্গে সর্ব্বদা দোলা খাইতেছে, তাহার আন্দোলনের অস্থির ঝিকিমিকি বিশ্লেষণশক্তির গভীরতাকে প্রতিহত করে। উজ্জয়িনী যতদিন তাহার একনিষ্ঠ হৃদয়বৃত্তি দিয়া বাদলের সহিত মিলন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে, ততদিনই তাহার গভীরতম পরিচয় আমাদের মনে মুদ্রিত হয়। যখন সে বিলাতে আসিয়া তাহার সহস্র চটুল বিক্ষেপ ও উদ্‌ভ্রান্তকারী মাদক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বাদলকে ভুলিতে ও নিজের কেন্দ্রচ্যুত মনের ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতেছে, তখন তাহার একটি সাময়িক, সংশয়জড়িত রূপই আমাদের চোখে ধরা দেয়। পক্ষান্তরে ইহাও সত্য যে ইহাদের প্রাণবেগচঞ্চলতা, এইরূপ মতসংঘর্ষের উন্মাদনা ও জনাকীর্ণ সমাজের বিচিত্র প্রভাব আকর্ষণের তির্য্যক্ পথ ধরিয়াই স্বাভাবিক বিকাশ খোঁজে। ইহারা আত্মার সমগ্রতাকে আবিষ্কার করে আদর্শ অনুসরণের প্রেরণায়, তার্কিকতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আলোকে, স্বপক্ষ-বিপক্ষের সমবেত সহযোগিতায় নিজ মানস অনিশ্চয়তার অপসারণে, পথ-চলার গতিবেগের ছন্দে। কাজেই এই সমস্ত কর্ম্মশীলতার সহিত ইহাদের প্রগাঢ়তম হৃদয়ানুভূতিগুলি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া পড়ে। তর্কের উত্তেজনায় ইহাদের হৃদয়বৃত্তি স্ফুরিত হয়, ইহার ঝড়ো হাওয়ায় ইহাদের অন্তর-যবনিকা অপসারিত হয়, তীক্ষ্ণ, শাণিত যুক্তি প্রয়োগের ফাঁকে ফাঁকে ইহাদের কণ্ঠস্বর হঠাৎ আবেগে ভারী হয়ে উঠে। বাদ-প্রতিবাদের কোদালি দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে ইহারা অকস্মাৎ হৃদয়ের গভীর স্তরশায়ী কোহিনুরের সন্ধান পায়। তর্ক ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তির আস্ফালন মাত্র নহে, ইহাদের সমস্ত প্রকৃতির আত্মানুশীলন। সেইজন্য ইহাদের যে চিত্তবিশ্লেষণের চেষ্টা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অগভীর নহে। এই পথেই ইহাদের সত্য পরিচয় মিলে। মানবজাতির উন্নয়ন ও ভবিষ্যতের পথসন্ধানই বাদলের গভীরতম হৃদয়াকূতিকে গ্রাস করিয়াছে—ব্যক্তিগত প্রেম ইহার সহিত তুলনায় নিতান্ত গৌণ। সুধীও তাহার আদর্শনিষ্ঠার বেদীমূলে তাহার ভালবাসাকে অবিচলিতভাবে বলি দিয়াছে। অবশ্য প্রেমের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই বৃহত্তর আদর্শের শ্রেষ্ঠতা কেবল তর্কে নহে, চরিত্রদিগের কর্ম্মে, ব্যবহারে ও অনুভূতির আন্তরিকতার দিক দিয়া নিঃসংশয়িতভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অন্যথা, melo-dramatic unreality

অতিনাটকীয়, অবিশ্বাস্য অবাস্তবতা আসিয়া পড়িবে। লেখক এই চেষ্টায় মুখ্যতঃ সফল হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহার উপন্যাসের উৎকর্ষ।

স্থানে স্থানে ঘটনা-প্রবাহের প্রাধান্যের নিকট চরিত্রস্ফুরণ যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহার নিদর্শনের অভাব নাই। বাদলকে পরিবর্ত্তনের এত ক্ষিপ্রগতি ঘূর্ণীপাকের মধ্যে ফেলা হইয়াছে যে তাহার চরিত্রের অগ্রগতি ইহাদের সহিত সমতা রাখিতে পারে নাই। তাহার অবিমিশ্র বুদ্ধিবাদ কি করিয়া সম্পূর্ণ আত্মবিলোপী সেবাব্রতনিষ্ঠায় রূপান্তরিত হইল তাহা অপরিস্ফুট রহিয়াছে। তাহার এই নেশাটিটার কারণও যথেষ্ট মনে হয় না। আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাদলের গভীর অনুসন্ধিৎসা তাহার অথবা লেখকের তীক্ষ্ণ মননশীলতার পরিচয়, কিন্তু এই দার্শনিক উপলব্ধি তাহার চরিত্রের সহিত একাঙ্গীভূত হয় নাই। তাহার শ্বশুরের মৃত্যুতে তাহার জীবিত থাকার অখণ্ডনীয় প্রমাণ আবিষ্কার হাস্যকর অসঙ্গতিরই সৃষ্টি করিয়াছে। বাদল যতই আত্মভোলা হউক না কেন, ইহাই যে তাহার মৃত্যুর সহিত প্রথম পরিচয় তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। উজ্জয়িনীর চরিত্রেও তাহার বৈষ্ণব-ভাব-বিহ্বলতা স্বভাব উপলব্ধি অপেক্ষা অনিচ্ছাকৃত ব্যঙ্গানুকরণের (parody) সহিতই সাদৃশ্যান্বিত। বিলাতে আসিয়া বাদলের সহিত পুনর্মিলনের সম্ভাবনা লুপ্ত হইবার পর তাহার অস্থির চিত্তচাঞ্চল্য নানা বিক্ষেপ ও পরিবর্ত্তনের ইঙ্গিত বহন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে কোনো স্থির পরিণতিতে সংহত হয় নাই। ঘটনা-প্রধান, তত্ত্বালোচনা-বহুল উপন্যাসের ইহাই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। লেখক তাঁহার সর্ব্বশেষ খণ্ডে উপন্যাসটিকে মহাকাব্যরূপে অভিহিত করিবার দাবী প্রত্যাহার করিয়া ইহার রসোপলব্ধিকে সহজ ও বাধাহীন করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের মহাকাব্যে বিশৃঙ্খলার সীমাহীন ব্যাপ্তি ও বিস্তার; প্রাচীন যুগের মহাকাব্যের সহিত ইহার একমাত্র সাদৃশ্য অতিকায়তায়, ইহার মর্ম্মগত ঐক্যবাণীতে নহে।

অন্নদাশঙ্করের প্রাথমিক রচনাগুলি নিষিদ্ধ প্রেম ও বিলাত প্রবাসীর অভিজ্ঞতা লইয়া লেখা—এগুলি অগভীর ও লঘুচপল—প্রায় প্রহসনের লক্ষণাক্রান্ত। 'সত্যাসত্যের' বিরাট ও গভীর তাৎপর্য্যের কোনও পূর্ব্বসূচনা ইহাদের মধ্যে মিলে না। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'অসমাপিকা' বুদ্ধদেব অচিন্ত্য গোষ্ঠীর মনোভাবের চিহ্নাঙ্কিত। সুচারু ও সুরুচির প্রেমের আবির্ভাব যেরূপ আকস্মিক, ইহার ভবিষ্যৎ পরিণতিও সেইরূপ খামখেয়ালী! সুচারু সুরুচির গর্ভে নিজ মানসকন্যার আগমনের জন্য অতিমাত্রায় উৎসুক। যখন সে আবিষ্কার করিয়াছে যে সুরুচি ইতিপূর্ব্বেই অন্তঃসত্ত্বা তখন তাহার প্রণয়িনীর এই অবাঞ্ছিত মাতৃত্বে তাহার দাম্পত্যজীবনে সামঞ্জস্যের আদর্শ রূঢ় আঘাত পাইয়াছে ও তাহাদের প্রণয়োচ্ছ্বাস নানারূপ সূক্ষ্ম, অনির্দ্দেশ্য অতৃপ্তির প্রভাবে মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত এই ক্রমবর্দ্ধমান চিত্তক্ষোভ তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে ও সুরুচি শিশুকন্যাসহ আবার পিতৃগৃহে ফিরিয়াছে। এই প্রণয়লীলার মনস্তাত্ত্বিক ও পারিবারিক দিকটা লেখক একেবারেই উপেক্ষা করিয়াছেন। গ্রন্থে ভাষার সৌষ্ঠব ছাড়া কোনওরূপ মনস্তত্ত্ব-কুশলতার পরিচয় নাই।

লেখকের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'আগুন নিয়ে খেলা' এক ইংরেজ তরুণীর সহিত বাঙ্গালী যুবক সোমের চটুল প্রেমাভিনয়ের কাহিনী। যুদ্ধোত্তর যুগে কর্ম্মভারাক্রান্ত, যান্ত্রিকতাপিষ্ট জীবনে নর-নারীর মধ্যে নৈতিক সংযম কত সহজে শিথিল হয় ও ক্ষণস্থায়ী প্রণয় বিকশিত হইয়া আবার

ঝরিয়া পড়ে, তাহাই ইহার বর্ণনীয় বিষয়। এ যেন গৃহ ছাড়িয়া পথেই বাসরশয্যা পাতা। এই সম্পর্কের ক্ষণিকতাই ইহাকে একটি করুণ, মধুর সৌন্দর্য্যে অভিষিক্ত করে—সপ্তাহান্তের সম্বন্ধটী জীবনে স্থায়ী করা যাইবে না বলিয়াই একটা ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস মধ্যে মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এই পলাতক প্রেম বিচিত্র-বর্ণ প্রজাপতির মত চোখের উপর একটা রংএর হিল্লোল খেলাইয়া অন্তর্হিত হয়। হাস্যপরিহাসপূর্ণ, রসিক কথাবার্তার মধ্য দিয়া সুনিপুণ প্রেম নিবেদন এই উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ। বিশ্লেষণ ও চরিত্র-সৃষ্টির কোন চেষ্টা নাই—সোম ও পেগি আধুনিক যে কোন তরুণ তরুণীর প্রতিনিধি। মাঝে মাঝে অভিমান ও প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়া এই আকর্ষণের ক্রমপরিণতির স্তর দেখাইবার চেষ্টা আছে, কিন্তু ইহার বিশেষ কোন মনস্তাত্ত্বিক মূল্য নাই। শেষ পর্য্যন্ত বিবাহের সম্ভাব্যতার আলোচনার মধ্যে গ্রন্থের আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। পথের রোমান্স ঘরের ধরাবাঁধা কটিনে পর্য্যবসিত হইবার পূর্ব্বেই ধূসর অনিশ্চয়তায় মিলাইয়াছে।

'পুতুল নিয়ে খেলা' 'আগুন নিয়ে খেলা'র শেষাংশরূপে গণ্য হইতে পারে। পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থের নায়ক সোম দেশে ফিরিয়া পাত্রী নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে কয়েকটী প্রহসনের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রত্যেক মেয়ের নিকট প্রেম নিবেদনের পূর্ব্বে সে নিজ অতীত ইতিহাস জানাইতে চাহিয়াছে কিন্তু কেহই এ সর্ত্তে তাহাকে গ্রহণ করিতে রাজি হয় নাই। নির্জ্জন সাক্ষাতের অবসর প্রার্থনা প্রত্যেক পরিবারেই তুমুল বিক্ষোভ জাগাইয়াছে। লজ্জাসঙ্কোচের জড়পিণ্ড শিবানী, সঙ্গীত-প্রিয়া সুলক্ষণা, হেডমাষ্টার-দুহিতা বি-এ-অনার্স অমিয়া, হিন্দুবঙ্গ-সমাজ বিদ্রোহিণী প্রতিমা ও অসহযোগ আন্দোলনে সংশ্লিষ্টা মায়া সকলেই কোন না কোন ভাবে নিজেদের অন্তর্নিহিত অনুদার রক্ষণশীলতা ও ইতর সন্দেহপ্রবণতার পরিচয় দিয়াছে। কেহই ভাবী স্বামীর চরিত্রস্খলনকে উদার সহানুভূতি ও সাহসিকতার সহিত গ্রহণ করিতে পারে নাই। কেহ বা চিরাচরিত নীতি, কেহ বা ভাবাবেশ, কেহ বা পিতার প্রতি একান্ত আনুগত্য, কেহ বা সুরুচি, আর কেহ বা শ্লীলতার দিক দিয়া সোমের এই খোলাখুলি স্বীকারোক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে। কোথাও কোথাও প্রহসনের আতিশয্যে সম্ভাব্যতা ও সুরুচির সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে। তথাপি বইখানির মধ্যে যথেষ্ট উপভোগ্য সরসতা ও লীলাচঞ্চল প্রাণপ্রবাহের পরিচয় আছে। বিবাহের নামে যে প্রকাণ্ড প্রহসন সমাজে চলিতেছে, যে পুতুল খেলার অভিনয় অনুষ্ঠিত হইতেছে বিভিন্ন শিক্ষাদীক্ষা ও আবেষ্টনের মধ্যে সেই নির্জ্জীব প্রথাদাসত্বের বন্ধ নৃত্য লেখক আবিষ্কার করিয়াছেন। ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জন সত্ত্বেও চরিত্রগুলি জীবন্ত ও ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট হইয়াছে।

'সত্যাসত্য' সুবৃহৎ উপন্যাস, ছয়টি খণ্ডে সম্পূর্ণ। ইহাতে আধুনিক যুগের সমস্ত জটিল সমস্যা, সমস্ত নূতন অনিশ্চয়তামূলক পরীক্ষা, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ, মানবকল্যাণের পরস্পরবিরোধী আদর্শ অতি সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের পুরাতন উদারনৈতিক নীতি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ও রাষ্ট্রনিরপেক্ষ স্বাধীন চেষ্টার জয়ঘোষণা, শ্রমিক কমিউনিষ্ট ও রুশদেশিক আদর্শের যুক্তিবিচার, গান্ধীবাদ ও অহিংস আন্দোলনের সার্থকতা ও সার্ব্বভৌম প্রয়োগ, বুদ্ধিবাদ ও হৃদয়ানুভূতির তুলনা, যুদ্ধবর্জ্জন ও শান্তিবাদ প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা, বিবাহ-বন্ধনের চিরন্তনতা ইত্যাদি যে সমস্ত চিন্তাধারা যুদ্ধোত্তর যুগের সমস্যাপীড়িত মানবমনকে

অহরহ আলোড়িত করিতেছে—তাহারা সকলেই এই উপন্যাসের অধ্যায়গুলিতে, মননশীলতা ও হৃদয়াবেগের সহিত যুক্ত হইয়া প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে। সুতরাং কেবল মননশীলতার মানদণ্ডে উপন্যাসটীর স্থান খুব উচ্চে। কিন্তু ব্যক্তিনিরপেক্ষ মতবাদ আলোচনা ঔপন্যাসিকের চরম উৎকর্ষের পরিচয় নহে। বর্তমান উপন্যাসে বাদল, সুধী ও উজ্জয়িনী এই তিনটি জীবনকে কেন্দ্র করিয়া এই সমস্ত সমস্যা আবর্তিত হইয়াছে। ইহারা এই সমস্ত মতবাদ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে। এই যুক্তিতর্ক, সর্বত্র না হইলেও অনেক স্থলে, বুদ্ধিগত আলোচনার স্তর ছাড়াইয়া হৃদয়ের গভীরতর প্রদেশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী অভিজ্ঞতার রূপ ও রঙকে বদলাইয়াছে। তা ছাড়া অশোকা তালুকদার, দে সরকার প্রভৃতি আরও কয়েকটি চরিত্র গৌণ হিসাবে প্রবর্তিত হইলেও হৃদয়াবেগের কৌলীন্য-মর্য্যাদার দাবীতে গ্রন্থমধ্যে প্রধানত্বের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। তাহারা তর্কে যোগ দেয় নাই, কিন্তু যুক্তিক্ষেপ-প্রতিক্ষেপের ঝড়ে চারিদিকের আবহাওয়ায় যে উত্তাপের সৃষ্টি হইয়াছে তাহারই সুবিধা গ্রহণ করিয়া অন্তরের কামনা স্ফুরিত ও আবেগ-তপ্ত করিয়াছে।

উপন্যাসের নায়ক বাদল যেন এই তর্কের ঝড়ে ও পথ অনুসন্ধানের প্রেরণায় সর্বাপেক্ষা বেশী দোলা খাইয়াছে। সুধী আত্মপ্রতিষ্ঠ, নানা অভিজ্ঞতার আলোড়নেও নিজ অন্তরের প্রজ্ঞানুভূতিতে স্থিরতর হইয়াছে। গ্রাম্য সমাজের সহিত একাত্মতা স্থাপন, কলকারখানার বিক্ষেপ হইতে কুটীরশিল্পের অবিক্ষুব্ধ শান্তি ও সন্তোষে প্রত্যাবর্তন, ভারতের সনাতন অধ্যাত্মবাদের পুনরুদ্ধার ও রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ—ইউরোপীয় সভ্যতা সংস্কৃতির সমস্ত বিভ্রান্তকারী মাদকতার মধ্যে তাহার লক্ষ্য এই আদর্শে অবিচলিত রহিয়াছে। অশোকার ব্যাকুল আবেদন, উজ্জয়িনীর পরমনির্ভরশীল আশ্রয় প্রার্থনা, সুজিতের নীরব প্রকাশকুণ্ঠ ভালবাসা—সমস্তই তাহার আদর্শবাদের লৌহবর্ম্মে ঠেকিয়া প্রতিহত হইয়াছে। বিলাত প্রবাসে তাহার পূর্ব্বসংকল্প দৃঢ়তর ও স্পষ্টতর হইয়াছে, তাহার অবলম্বিত পথ যে মানব-কল্যাণের একমাত্র উপায়—ইউরোপের নানামুখী চিন্তাধারা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার সহিত পরিচয় তাহার এই প্রতীতিকে আরও অসংশয়িত করিয়াছে। এক হিসাবে সুধীর কোনও পরিবর্তন হয় নাই—তাহার অভিজ্ঞতার পরিধির বিস্তার হইয়াছে কিন্তু তাহার মৌলিক প্রকৃতিটী অক্ষুণ্ণ আছে। লেখক সুধীকে সত্যের রূপক হিসাবে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। মনে হয় যে তাহার মানবতার, প্রীতি-স্নেহ-ভালবাসার অন্তরালে তাহার এই রূপক প্রতিভা নৈর্ব্যক্তিক শিখায় জ্বলিতেছে। সত্যের মতই তাহার মুখে অপার্থিব জ্যোতিঃ, সত্যের মতই তাহার অনমনীয় দৃঢ়তা। ইহাতে রক্তমাংসের মানুষ হিসাবে তাহার আকর্ষণ কিছু কমিয়াছে। একমাত্র উজ্জয়িনীর ব্যবহারের বিচারেই তাহার অমোঘ আদর্শনিষ্ঠা সাময়িকভাবে বিচলিত হইয়াছে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর সমাজনিয়ন্ত্রণই জয়লাভ করিয়াছে। এই সমুদ্রমন্থনের সবটুকু ফেনিল আলোড়ন বাদলের জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে। বাদলকে লেখক অসত্যের প্রতীক বলিয়া আঁকিবেন এইরূপ মনস্থ করিয়াছিলেন। পাঠকের সৌভাগ্যবশতঃ এই পরিকল্পনা কার্য্যতঃ ফলবতী হয় নাই। ফলে দাঁড়াইয়াছে যে বাদল অসত্যের নহে, মানবাত্মার মুক্তিসন্ধানের প্রতীক। লেখক অনেক স্থলেই তাহার ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়া তাহার এই রূপকাভাসকে প্রতিবিম্বিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাদলের সগর্ব্ব আত্মপ্রত্যয় চিন্তা-নায়কের অধিকার

ঘোষণা, ইতিহাসের বিবর্ত্তনধারার নিয়ন্ত্রণশক্তির দাবী, সর্ব্বোপরি তাহার অপরাজেয় আদর্শবাদ—সমস্তই এই রূপকেরই বিচ্ছুরিত জ্যোতিঃ। কিন্তু তথাপি বাদলের মানবতাই আমাদের নিকট তাহার মুখ্য আবেদন। তাহার দুর্ব্বলতা, ব্যাকুল আবেগ, অনুসন্ধানের দুর্দ্দম আগ্রহ, প্রতি চিন্তাধারা ও মতবাদ, সংঘর্ষের অভিঘাতে হৃদয়ের স্নায়ু-তন্ত্রীর তীব্র কম্পন—সবই তাহার মানবিকতার পরিচয়। সে বিশুদ্ধ আদর্শ বা রূপক নহে সুখদুঃখের অনুভূতিপূর্ণ, বেদনা-আনন্দে তরঙ্গায়িত মানবাত্মা। অবশ্য তাহার আবেগের উৎস ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিবর্ত্তে সমস্ত মানবজাতির কল্যাণ-কামনা ও মুক্তিপিপাসা। রবীন্দ্রনাথের গোরা যেমন মূর্ত্ত স্বদেশপ্রীতি, বাদল সেইরূপ মূর্ত্ত মানবহিতৈষণা—উভয়েরই আদর্শের বিশালতা তাহাদের উপর কতকটা নৈর্ব্যক্তিকতার অবগুণ্ঠন আনিয়া দিয়াছে।

'সত্যাসত্য' একখানি বিরাট গ্রন্থ। ইহার জন্য মহাকাব্যের দাবী লেখক নিজেই প্রত্যাহার করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি ইহার মধ্যে একটা মহাকাব্যোচিত বিস্তার ও বিশালতা বিদ্যমান। বিংশ শতাব্দীর মহাকাব্যে গ্রীক ও ট্রয় কিংবা রাম-রাবণ ও কৌরব-পাণ্ডবের যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি হইতে পারে না। ইহাতে সহস্র প্রকারের বাদ-বিসংবাদ, অসংখ্য মতবৈষম্যের সংঘর্ষ, পথ-অনুসন্ধানের অগণিত বিচিত্র পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা, মানবমনের অশ্রান্ত কর্ম্মশীলতা ও সমস্যাসমাধানের অসীম আকূতি, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আনিবার জীবনব্যাপী উদ্যম ও সাধনা—এই সকল মিলিয়া এক বিরাট, আপাতদৃষ্টিতে বিশৃঙ্খল ও অসংবদ্ধ, কিন্তু বস্তুতঃ কেন্দ্রাভিমুখী ও নিগূঢ় উদ্দেশ্য প্রণোদিত সমুদ্রমন্থনের সৃষ্টি করিয়াছে। উপন্যাসের পাতাগুলিতে সমস্ত পৃথিবীর প্রতিনিধি, সমস্ত মতবাদের মুখপাত্র ভিড় করিয়া আসিয়াছে। সেখানে সমবেত মানবকণ্ঠের কি বিপুল কোলাহল, শক্তির কি বিচিত্র আত্মপ্রকাশ, আকাঙ্ক্ষার কি অদম্য ঊর্দ্ধগতি, ভাঙ্গাগড়ার কি দুর্দ্দম ইচ্ছা ও দুর্জ্জয় দুঃসাহসিকতা দৃষ্টিভঙ্গীর কি বিস্ময়কারী অভিনবত্ব! এই বিরাটকায় উপন্যাসের স্বচ্ছ দর্পণে আমরা আধুনিক মানবের অন্তররহস্যের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই। সে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া চাহে সমগ্র মানবজাতির মুক্তি, সাম্য, সর্ব্ববিধ শোষণের বিলোপ, অনবদ্য সমাজব্যবস্থা, আত্মার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগের উপযুক্ত নিখুঁত, ন্যায়নীতি-নিয়ন্ত্রিত আবেষ্টন। এই নূতন ইচ্ছা তাহাকে নেশার মত পাইয়া বসিয়াছে—ইহার তীব্র আকর্ষণের নিকট তাহার পূর্ব্বতন আদিম সংস্কার ও প্রবৃত্তিগুলি গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। সঙ্কীর্ণ নীড়রচনা, শুদ্ধশান্ত একনিষ্ঠ প্রেম, অভ্যস্ত কর্ত্তব্যের কক্ষাবর্ত্তন, স্নেহপ্রীতির সহজ আদানপ্রদান, আত্মকেন্দ্রিক জগতে স্বপ্ন-রোমন্থন, বৃহত্তর পৃথিবীর সংস্রব এড়াইয়া গজদন্তের গম্বুজ (Ivory tower) আশ্রয়গ্রহণ—এই বহু শতাব্দীর সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনযাত্রার নিবিড় মোহ সে কাটাইয়া উঠিয়াছে। গত মহাযুদ্ধের যে অগ্নিবেষ্টন তাহাকে নিশ্চিন্ত আশ্রয় হইতে তাড়াইয়াছে, তাহার সৃষ্টিধ্বংসী অনলশিখরে সমাজের যে বিভীষিকাময় রূপ তাহার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়াছে, সেই নিদারুণ অভিজ্ঞতাই অতীতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথকে চিরকালের মত রোধ করিয়াছে। তাই আধুনিক মানুষ আর গৃহী নহে, পথিক, সুপ্রাচীন সভ্যতার অধিকারী নহে, রিক্ত; সর্ব্বস্বীকৃত আদর্শবাদের দ্বারা সুরক্ষিত নহে, নূতন অবলম্বনের অন্বেষণে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত, প্রেমিক নহে, রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা প্রেমের বিশুদ্ধিকরণে ও স্বাস্থ্যসংরক্ষণে বিব্রত। সে আর সমতলভূমিতে বিচরণ করে না—সর্ব্বদাই

সমাজের তলদেশ খুঁড়িয়া পাকা বনিয়াদ আবিষ্কার করিতে ব্যস্ত। বোমাবর্ষণের ভয়ে সে আর ঘর বাঁধে না, তাঁবুতে জীবন কাটায়; তাহার স্থাবরত্ব ঘুচিয়া যাযাবরত্বের পালা সুরু হইয়াছে। প্রেম, বন্ধুপ্রীতি, পারিবারিক বন্ধন রাজনৈতিক আনুগত্য—সমস্তই আজ তর্কবিতর্ক ও পরীক্ষার বিষয়, অনিশ্চয়তার বাষ্পে আবৃত ও কম্পমান ভিত্তির উপর টলমলভাবে দণ্ডায়মান। সমগ্র পাশ্চাত্য সমাজ সর্বনাশের বংশীরবে কানু-পাগলিনী শ্রীরাধিকার ন্যায় যেন ঘর ছাড়িয়া অভিসারে বাহির হইয়াছে। যে মহামন্ত্রে আবার পৃথিবী স্থির হইবে, বিচলিত ভারসাম্য ফিরিয়া আসিবে, মানুষ আজ তাহারই অনুধ্যানে বিভোর। অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসে এই বিপ্লবোন্মুখ, ভারকেন্দ্রচ্যুত, নবীনসৃষ্টির স্বপ্নাবিষ্ট পৃথিবীর সাময়িক উদ্ভ্রান্তরূপ স্মরণীয়ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—ইহা তাঁহার উপন্যাসের সর্বপ্রধান পরিচয়।

সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

শ্রীচৈতন্যের চরিতকারগণের রচনা পাঠে জানা যায়—সে সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে শুধু প্রেমের বন্যা নয়—একটা ভাবের বন্যাও আসিয়াছিল। ইহার ফলে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রচুর শস্যসম্পদের জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

"বর্ষাঋতুর মত মানুষের সমাজে এমন এক একটা সময় আসে যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুর পরিমাণে বিচরণ করিতে থাকে। চৈতন্যের পরে বাংলাদেশের সেই অবস্থা হইয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়াছিল। তাই দেশে সে সময় যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সকলেই সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব ভাষা এবং নূতন ছন্দে কত প্রাচুর্যে এবং প্রবলতায় তাহাকে দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল।" [সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ]

"মুক্তি কেবল জ্ঞানীর নহে, ভগবান কেবল শাস্ত্রের নহেন, এই মন্ত্র যেমনই উচ্চারিত হইল, অমনি দেশের যত পাখী সুপ্ত হইয়াছিল, সকলেই এক নিমেষে জাগরিত হইয়া গান ধরিয়া দিল। ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে, বাংলা দেশ আপনাকে যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছিল বৈষ্ণব যুগে। এই সময়ে একটা গৌরব সে লাভ করিয়াছিল যাহা অলোক-সামান্য, যাহা বিশেষরূপে বাংলা দেশের, যাহা এ দেশ হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া অন্যত্র বিস্তারিত হইয়াছিল।" [ঐ]

জাতীয় জীবনে এই রস-প্রাচুর্যের ফলে শুধু মৌলিক সৃষ্টি নয় অনুবাদ সাহিত্যেরও পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। কেবল বঙ্গ সাহিত্যের নয়, সংস্কৃত সাহিত্যেও একটা ভাববন্যার প্রবাহ আসে।

শ্রীচৈতন্যের ঘনিষ্ঠ অনুচর ও ভক্তগণের মধ্যে যাঁহাদের সংস্কৃতে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, তাঁহারা সংস্কৃতে চৈতন্যলীলা সম্বন্ধে, তাঁহার প্রচারিত প্রেমধর্ম সম্বন্ধে এবং শ্রীচৈতন্যপ্রবর্তিত আদর্শে নূতন করিয়া অলঙ্কার, রসতত্ত্ব ও দর্শনের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সঙ্গে ব্রজলীলা বিষয়ক গ্রন্থও অনেক রচিত হইয়াছিল।

ভাগবত ও অন্যান্য গ্রন্থের নূতন করিয়া টীকা, ভাষ্য ও টিপ্পনী রচিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থের গ্রন্থকারগণের মধ্যে রূপগোস্বামী, জীবগোস্বামী ও পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপুরের নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। রূপগোস্বামী রচনা করেন—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (রসশাস্ত্রের গ্রন্থ—ভক্তি-তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা), উজ্জ্বলনীলমণি (উজ্জ্বল বা মধুর রসের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং অলঙ্কার নির্ণয়), নাটকচন্দ্রিকা (নাটকসম্বন্ধীয় রসতত্ত্বের গ্রন্থ), বিদগ্ধমাধব (নাটক), ললিতমাধব (নাটক), দানকেলিকৌমুদী (রূপক নাট্য), উদ্ধবসন্দেশ (কাব্য), হংসদূত (কাব্য), পদ্যাবলী। জীবগোস্বামী রচনা করেন শ্রীগোপাল চম্পূ, হরিনামামৃত ব্যাকরণ, গোপাল ভট্টের ষট্‌সন্দর্ভের সর্ব্বসংবাদিনী টীকা। শ্রীগোপাল ভট্ট ও জীব গোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ বৈষ্ণব দর্শন-পুস্তক। মুরারি গুপ্ত রচনা করেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতম্ (কড়চা নামে প্রসিদ্ধ)। সনাতন গোস্বামী ভাগবতের টীকা রচনা করেন এবং হরিভক্তিবিলাস নামে বৈষ্ণব স্মৃতি-গ্রন্থ রচনা করেন। রায় রামানন্দ লেখেন জগন্নাথবল্লভ নাটক। কবিকর্ণপূর রচনা করেন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ, অলঙ্কারকৌস্তুভ (অলঙ্কারের ও রসতত্ত্বের পুস্তক) ও গৌরগণোদ্দেশদীপিকা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচনা করেন—শ্রীগোবিন্দলীলামৃত। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী রচনা করেন—শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত, গৌরগণচন্দ্রিকা।

এই সকল পুস্তকের অধিকাংশেরই বাংলায় অনুবাদ হইয়াছিল—কোন কোন গ্রন্থের ভাব লইয়া নূতন গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। প্রেমদাস চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের, লোচনদাস জগন্নাথবল্লভ নাটকের শ্লোকাবলীর, যদুনন্দন দাস গোবিন্দলীলামৃত, বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত ও রূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধবের অনুবাদ করেন। ভাগবতের অনুবাদ শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল। মালাধর বসু গুণরাজ খাঁ সর্ব্বাগ্রে ভাগবতের (১০ম-১১শ স্কন্ধের) অনুবাদ করেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য নামে প্রসিদ্ধ। প্রায় নিখুঁত পয়ারে ইহা রচিত। এই অনুবাদ আক্ষরিক নয়। দানলীলা ও নাবখণ্ড ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। ভাগবতে রাধা নাই—ইহাতে রাধার আবির্ভাব হইয়াছে।* বাঙ্গলার নিজস্ব ভাবধারা তাঁহার অনুবাদের পরিধিতে প্রবাহিত করিয়া কবি শ্রীকৃষ্ণবিজয়কে মৌলিক কাব্যের মর্য্যাদা দিয়াছেন। ইহা কেবল অনুবাদমাত্র হইলে শ্রীচৈতন্যদেব ইহা শুনিয়া আনন্দ পাইতেন না, কায়া থাকিতে তাঁহার ছায়ায় রতি হইত না।

রঘুনাথ পণ্ডিত পরে ভাগবতের ১২শ স্কন্ধের অনুবাদ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী নামে প্রকাশ করেন। ভাগবতের অনুবাদকদের মধ্যে মাধবাচার্য্যের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মঙ্গলকাব্যের ধারায় ইঁহার কাব্য শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল স্থান পাইতে পারে। ইনি ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই, ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণ চরিতাংশ গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত বিষ্ণুপুরাণ হরিবংশ

---

*শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের ভাষার নিদর্শন—

সবার হৃদয়ে কানু প্রবেশ করিয়া,
বেণুনাদে গোপী চিত্ত আনিল হরিয়া।
ছাওয়ালেরে স্তনপান করে কোন জন,
নিজপতি সঙ্গে কেহ করেছে শয়ন।
গাভী দোহায়েন্ত কেহ দুগ্ধ আবর্ত্তনে,
গুরুজন সমাধান করে কোহ্ন জনে।
হেনহি সময়ে বেণু করিল শ্রবণে,
চলিল গোপিকা সব যে ছিল যেখানে।

এবং অন্যান্য পুরাণের বহুভাব মিশাইয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচারের জন্য এই কাব্য রচনা করেন। কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল ভাগবতেরই অনুবাদ। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে মাধবাচার্য্যের শিষ্য অদ্বৈতপ্রভুর ভৃত্য কৃষ্ণদাস একখানি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনা করেন। তাহাতে ভাগবতের উপাখ্যানের সহিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ড সুভদ্রাহরণ পারিজাতহরণ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ইত্যাদি উপাখ্যান মিলাইয়া তিনি এই কাব্য রচনা করেন। ভাগবত অবলম্বনে যাঁহারা কাব্য রচনা করেন তাঁহাদের মধ্যে দেবকীনন্দন কবিশেখরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ইঁহার কাব্যের নাম গোপালবিজয় কাব্য। ইনি দানলীলায় ভাবে ও ভাষায় বড়ু চণ্ডীদাসের দানলীলার অনুসরণ করিয়াছেন। ইঁহার বড়াই চরিত্র অপূর্ব্ব। এইরূপ বহু গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে। অবশ্য ইহাদের অধিকাংশই দীপালিকার মহোৎসব আলোকিত করিয়া মৃন্ময়দীপের ন্যায় তুলসীতলার পাশে রাশীকৃত হইয়া আছে—তৈজস প্রদীপের মর্য্যাদা লাভ করিয়া অতি অল্পসংখ্যক গ্রন্থই দেবালয়ের কুলুঙ্গিতে রক্ষিত হইয়াছে। প্রকৃত তৈজসদীপের গৌরব লাভ করিয়াছে শ্রীচৈতন্যের কয়েকখানি জীবনচরিত সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

১। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২। বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত। ৩। লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল। ৪। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল। ৫। গোবিন্দদাসের কড়চা।

গোবিন্দদাসের কড়চা লইয়া অনেক কচাচি হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন উহা প্রাচীন গ্রন্থই নয়, উহা অর্ব্বাচীন গ্রন্থ। কেহ কেহ বলেন সম্ভবতঃ একটি খণ্ডিত পুঁথি ছিল—শান্তিপুরের জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় উহাকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলেন উহা একেবারেই জাল। দীনেশবাবু উহাকে আসল গ্রন্থই মনে করেন। আমাদের মনে হয় একটা 'খণ্ডিতমহাপ্রভুর' পুঁথি ছিল, গোস্বামী মহাশয় উহাকে ঢালিয়া সাজিয়াছেন।

এই সকল গ্রন্থ ছাড়া শ্রীচৈতন্যের লীলার ইতিহাস তাঁহার ভক্ত ও পার্ষদগণের জীবনচরিতের মধ্যেও পাওয়া যায়। সেই শ্রেণীর চরিতগ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উল্লেখযোগ্য :

১। যদুনন্দনদাসের কর্ণানন্দ। ২। নিত্যানন্দদাসের প্রেমবিলাস। ৩। প্রেমদাসের বংশীশিক্ষা। ৪। ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ। ৫। নরহরিদাসের অদ্বৈতবিলাস। ৬। হরিচরণদাসের অদ্বৈতমঙ্গল। ৭। নরহরি চক্রবর্ত্তীর (ঘনশ্যাম) ভক্তিরত্নাকর, শ্রীনিবাসচরিত ও নরোত্তমবিলাস।

এই সকল গ্রন্থকারদের মধ্যে ঈশান নাগর মহাপ্রভুর সমসাময়িক। হরিচরণদাসের অদ্বৈতমঙ্গলে মহাপ্রভুর দানলীলা অভিনয়ের কথা আছে। বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনের দানলীলা মহাপ্রভু যে উপভোগ করিতেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। বংশীশিক্ষায় মহাপ্রভুর জীবনকথা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। ভক্তিরত্নাকরে অনেক আজগুবি কথা থাকিলেও ইহার ঐতিহাসিক মূল্য কিছু আছে। ইহাতে পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারক ও আচার্য্যগণের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য শ্রীনিবাস শ্যামানন্দ ও নরোত্তম। এই গ্রন্থে রূপসনাতন জীব গোস্বামী লোকনাথ গোস্বামী ইত্যাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পরিচয় দেওয়া আছে। গ্রন্থে বহু শ্লোক উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গ্রন্থে সংগৃহীত পদগুলিও সুনির্ব্বাচিত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের ভগবত্তা প্রমাণের বহু প্রয়াস আছে।

একটি গল্প এই—মুরারিগুপ্ত একদিন বহু ভোজ্যদ্রব্য শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করেন। পরদিন চৈতন্যদেব মুরারির নিকট ঔষধ চাহিয়া বলিলেন—অতিরিক্ত ভোজনে তাঁহার অজীর্ণ হইয়াছে। মুরারি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় এত গুরুভোজন হইল?" প্রভু বলিলেন—"কেন? কাল অত ভোজ্যসামগ্রী তুমিই ত নিবেদন করিয়াছিলে, ভুলিয়া গেলে?" মুরারিগুপ্তকে গরুড় বানাইয়া শ্রীনিবাসের বাড়ীতে প্রভু মুরারির পিঠে চড়িয়া শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ধারণ করিয়া ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন—গ্রন্থে একথারও বর্ণনা আছে। অদ্বৈতপ্রভুর জীবনচরিত অনেকগুলি পাওয়া গিযাছে, এমন কি অদ্বৈতপত্নী সীতা দেবীরও জীবনচরিত আছে। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর কোন পৃথক জীবনচরিত নাই। চৈতন্যভাগবতেরই প্রায় অর্দ্ধাংশ নিত্যানন্দের জীবনচরিত। নিত্যানন্দদাস নিত্যানন্দপ্রভুর একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন—তাহা এখন আর পাওয়া যায় না।

এই সকল চরিতশাখার পুস্তক হইতে কেবল শ্রীচৈতন্যদেব নয়—তাঁহার ভক্ত ও অনুচরগণের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা ভক্তির ধূপধূমে সমাচ্ছন্ন। তাহার মধ্য হইতে প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধরণের প্রয়োজন আছে। চৈতন্যদেবের পার্শ্বচরগণ ও ভক্তগণ যে মহাপুরুষ ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, চরিতকারগণ তাঁহাদের চরিত্র মাহাত্ম্যকে এত বেশি অতিরঞ্জিত করিয়া না দেখাইলেও পারিতেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের মানবিকতা ইঁহারা একেবারে হরণ করিয়া লইয়াছেন। ফলে চৈতন্যদেব আর রক্তমাংসের মানুষ হইতে পান নাই। ইঁহাদের কাছে তিনি ভাব-বিগ্রহ। মানুষ হইয়াই তিনি কত বড়, দেবতাদের চেয়েও বড়, তাহা বুঝিবার জানিবার সুযোগ বা অবসর তাঁহারা দেন নাই। তাঁহারা বলিতে চাহিয়াছেন—মানুষ নহেন বলিয়াই তিনি এত বড়। নিমাই যে সুপণ্ডিত ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই, কিন্তু পাণ্ডিত্যই তাঁহার জীবনে বড় কথা নয়, জ্ঞান অপেক্ষা প্রেম যে অনেক বড় এই কথাই তাঁহার জীবনের মূল সূত্র। চরিতকারগণ তাঁহার জীবনে চরম পাণ্ডিত্য আরোপ করিয়াছেন। যে মহাজ্ঞান Revealed (আপ্ত) তাহার নিকট অনুশীলন বা অধ্যয়ন হইতে আহৃত জ্ঞান অতি তুচ্ছ। হজরৎ মোহাম্মদের জীবন-কথা স্মরণ করিলেই তাহা বুঝা যায়।

রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী, রঘুনাথ, নরোত্তম ইত্যাদি সাধকগণ প্রভূত ধনসম্পদ ও মান গৌরব ত্যাগ করিয়া চৈতন্যদেবের চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই তাঁহাদের মহাপুরুষত্ব ও মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের মহিমা সম্যক্‌ভাবেই উপলব্ধ হয়। অলৌকিক শক্তির বা ঐশ্বর্য্যের আরোপে মনুষ্যত্বের মহিমা ক্ষুণ্ণই হইয়াছে—বৃদ্ধি পায় নাই। চরিতকারগণ শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত ও সহযোগিগণকে দেবতার অবতার বলিয়া অথবা রুক্মিণী, সত্যভামা, ব্রজগোপী ও মঞ্জরীগণের অবতার বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহাদের আহারবিহার চালচলন সমস্তকেই অমানুষী ও অপ্রাকৃতলীলা বলিয়া মনে করিয়াছেন। ইহাতে মানুষের মাহাত্ম্য স্বীকার না করিয়া প্রকারান্তরে দেবতারই মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ও অনুচরগণ কেবল ঐহিকসম্পদ কেন—স্বর্গ, শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে জন্মের আকাঙ্ক্ষা—এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রার্থনা না করিয়া পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

চরিতগ্রন্থাবলীর ভাববিলাসের আতিশয্য ও স্তাবকতার উচ্ছ্বাসের মধ্যেও এই সত্যটি কোথাও হারাইয়া যায় নাই।

পরবর্ত্তী চরিতগ্রন্থাবলী হইতে ইহাও জানা যায়—এই আদর্শ শেষ পর্য্যন্ত রক্ষিত হয় নাই। ভক্তির অনুশীলন করিয়া বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তির কথা ভুলিয়া শেষে মানুষেরই ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মানুষকে জোর করিয়া বাড়াইতে বাড়াইতে তাহাকে দেবতার আসনে তুলিয়া দিয়াছিল। ভক্তের ভক্তিই দেবতার সর্ব্বনাশ সাধন করে—দেবতা ভক্তের পরিচর্য্যায় ক্রমে ভোগবিলাসী হইয়া পড়েন। শ্রীচৈতন্যদেব বিষয়ীর মুখদর্শন করিতেন না এবং জগদানন্দকে স্বাচ্ছন্দ্য ভোগে প্রবর্ত্তনার জন্য তিরস্কার করিতেন। কিন্তু কালক্রমে দেখা যায়, যাঁহারা যৌবনে কঠোর সংযম, ক্ষান্তি, শম ও ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা করিয়া নমস্য হইয়াছেন—পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহারা ভক্তের সেবায়, আগ্রহে ও পীড়াপীড়িতে বিষয়ভুঞ্জন করিয়া স্খলৎপাদ্ হইয়াছেন।

ক্রমে বাংলায় গৌরাঙ্গবাদের প্রচার হয়—তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের বদলে গৌরাঙ্গেরই উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়। বৈষ্ণবগণ তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া গুরুকেই ভগবান করিয়া তুলিলেন—ইহাতে চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত মহান্ আদর্শ নষ্ট হইল। আবার সেই চিরন্তন গুরুবাদ ফিরিয়া আসিল; সেই মীননাথ গোরক্ষনাথের পুনরভিনয় হইতে লাগিল। কর্ত্তাভজা দলের সৃষ্টি হইল, সহজিয়াবাদ নূতন আকারে দেখা দিল, বৈষ্ণবধর্ম্ম ও পদাবলীর ভোগানুকূল ব্যাখ্যার সূত্রপাত হইল। যে ধর্ম্ম বৈরাগ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার সহিত ভোগের ও ভোগী-মানুষের সর্বপ্রকার দুর্বলতার সন্ধি করিতে হইল।

সাহস

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

ফুলমাসিমারা যখন প্রথম আমাদের বাড়ীর নীচেকার ঘরে ভাড়া আসেন তখন বেশীদিন যে তাঁহাদের রাখিতে পারিব, এ আশা আমাদের কাহারও ছিল না। সে অনেকদিনের কথা, এখন থেকে অন্ততঃ দশ বছর আগে—কিন্তু একটু একটু করিয়া তাঁহারা রহিয়াই গেলেন, এবং এই দীর্ঘ দশ বৎসর পরে আজ এমন অবস্থায় ব্যাপারটা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাঁহারা চলিয়া যাইবেন এ সম্ভাবনাই কাহারও মনে আসে না। এমন কি, যে চেঁচামেচি কান্নাকাটি প্রভৃতির জন্য প্রতিবেশীরা আমাদের উপর নোটিশ জারি করিয়াছিলেন যে আমরা যদি সাতদিনের মধ্যে অমন লক্ষ্মীছাড়া ভাড়াটেকে তাড়াইয়া না দিই তাহা হইলে তাঁহারা আদালতের সাহায্য লইতে বাধ্য হইবেন, তাঁহারাই সেই বস্তুটির অভাবে কাল আমাদের কাছে খোঁজ লইতেছিলেন, হ্যাঁহে, বাড়ী তোমাদের নিস্তব্ধ কেন? ফুলদি (কাহারও বা ফুল পিসিমা) কি চলে গেলেন নাকি? কিম্বা ফুল বৌদির কি অসুখ করেছে নাকি হে? সাড়া শব্দ পাচ্ছিনা যে?

ইতিহাসটা তাহা হইলে খুলিয়াই বলি।

ঘরখানা আমাদের অন্দর মহলের মধ্যেই, কিন্তু জ্যাঠামশাই বুদ্ধি করিয়া বাগানের দিকে তাহার একটা জানালার পরিবর্তে দরজা বসাইয়া সামনে একফালি রক বাহির করিয়া দিয়া সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন। ঘরটা পড়িয়াই থাকিত, সুতরাং এই সামান্য খরচার পরিবর্তে ন-টা টাকা আয় বাড়িয়া যাইতে আমরা সকলেই খুসী হইলাম। ভাড়াটের সঙ্গে বন্দোবস্ত রহিল, তাহারা তোলা উনুন বাহিরে ধরাইয়া ভিতরেই রান্না করিবেন এবং বাগানের দিকের দরজাটা ব্যবহার করিবেন।

প্রথম যিনি ভাড়াটে আসিলেন তিনি এখানকারই পোষ্ট মাষ্টার, মাস-নয়েক থাকিবার পরই কোয়াটার পাইয়া উঠিয়া গেলেন। তাহার নাকি এখানে অসুবিধা হইতেছিল। তার পরই আসিলেন ভবেশবাবু বা ফুল মাসিমারা। ভবেশবাবু কী একটা বড় আফিসে কাজ করেন, বেশ লেখাপড়া জানা অমায়িক ভদ্রলোক। জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে খুব দ্রুত আলাপ জমিয়া উঠিল, শ্বশুর বাড়ীর সূত্রে বা একটা কুটুম্বিতাও বাহির হইয়া পড়িল বুঝি—ফলে তখনই একবারে একমাসের ভাড়া অগ্রিম লইয়া তিনি রসিদ লিখিয়া দিলেন।

সেইদিনই অপরাহ্ণে তাঁহারা আসিয়া পড়িলেন। স্বামী আর স্ত্রী, মাত্র দুটি লোক। পোষ্ট মাষ্টারের মত এক পাল ছেলে মেয়ে যে আসিল না ইহাতেই আমরা নিশ্চিন্ত হইলা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম, বাবা, বাচা গেল।

কিন্তু হায়রে। সে আশা যে আমাদের কত মিথ্যা তাহা বোঝা গেল তাঁহারা আসিবার দ্বিতীয় দিনেই। প্রথম দিনটা বোধ হয় চক্ষুলজ্জার খাতিরেই ভবেশবাবু সংযত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরেরদিন সন্ধ্যার পর তিনি অফিস হইতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে কী চেঁচামেচি, গণ্ডগোল, কান্নাকাটি! তখন ছোট ছিলাম, সব ব্যাপারটা বুঝি নাই—শুধু শুনিলাম ভবেশবাবু মাতাল হইয়া আসিয়া স্ত্রীকে মার ধোর করিতেছেন। পরে জানিয়াছিলাম যে ইহার আগে এইসব কারণেই কোন বাড়ীতে পাচ ছয় মাসের বেশী টিঁকিতে পারেন নাই।

সে যাহা হউক—ভবেশবাবুর মাতলামীর বেশ একটা বিশেষত্ব ছিল। যেদিন পেটে একটু বেশী মদ পড়িত সেদিন বাড়ী ঢুকিতেন তিনি কাঁদো কাঁদো হইয়া। আসিয়াই বাজারের পুঁটুলিটা নামাইয়া 'মেজবউ' বলিয়া একটা হাঁকের সঙ্গে সঙ্গে বড় বকমের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রকের উপরই বসিয়া পড়িতেন। বলা বাহুল্য ফুল মাসিমার এ সমস্ত লক্ষণই জানা ছিল—তিনি সে আত্তআহ্বানে কর্ণপাত মাত্র না করিয়া গম্ভীরভাবে বাজারের পুঁটুলিটা লইয়া ঘরে চলিয়া যাইতেন এবং যথারীতি নিজের কাজে মন দিতেন। কিন্তু ভবেশ মেসো ছাড়িবার লোক নন্। তিনি তারও পরে 'মেজবৌ-ওফ্!' বলিয়া গোটা দুইতিন আর্তনাদ করিতেন, তাহার পর ঘরে ঢুকিয়া মাসিমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া আকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিতেন। প্রথম বেগটা না কাটা পর্যন্ত শুধুই চলিত কান্না, সে ঝোঁকটা কাটিলে কথা ফুটিত। কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিতেন 'মেজবৌ আমার হাতে পড়ে কী কষ্টই পেলে, একটা দিনের জন্যও তোমাকে সুখী করতে পারলুম না। ওফ্!' কিংবা 'মেজবৌ, আমি তোমার অযোগ্য স্বামী, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে বিষ এনে দাও—

খেয়ে তোমাকে অব্যাহতি দিয়ে যাই। আর কত সহ্য করবে।' ইত্যাদি—

ইহার উত্তরে যদি বা ফুল মাসিমা বলিতেন যে, না তিনি সুখেই আছেন, তাহার কোন অশান্তি নাই তাহা হইলেও অব্যাহতি ছিল না—ভবেশ মেসো প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিবেনই যে তিনি ফুল মাসিমার অযোগ্য স্বামী। তিনি ইনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেন, 'মেজবৌ তুমি আমাকে স্তোক দিও না—মেজবৌ, তুমি আমার মুখ চেয়ে মিথ্যে কথা বলছ—মাইরি বলছি বিশ্বাস করো, আমি পিশাচ, আমি চামার, আমি জানোয়ারের অধম' ইত্যাদি।

এ সব ক্ষেত্রে বিরক্ত হইয়া ফুল মাসিমা হয়ত মানিয়া লইতেন যে মেসোমহাশয়ের কথাই ঠিক তখন আবার চলিল অন্য আক্রমণ।

'মেজবৌ মার্জ্জনা কি নেই? তোমার পায়ে পড়ি এবারকার মত মাপ করো—আমি পশু, তুমি ত দেবী —এইবারটি মাপ করো—'

'মাপ করিয়াছি' বলিলেও নিস্তার নাই। 'মেজবৌ সত্যি বলছ মাপ করেছ? মাইরি? ....না তোমার মনে রাগ রয়েছে। ওঃ কী করব রে? গলায় দড়ি দেব? আপিং খাব? মেজবৌ কী হ'লে তুমি খুসী হও বলো, আমি তাই করছি।'

এ সব কথা শুনিতে ফুল মাসিমার ভাল লাগিত কিনা আমাদের ঠিক জানা নাই তবে ফুলমাসিমা প্রত্যহই খানিকটা করিয়া এই প্রলাপ সহ্য করিতেন, তাহার পর ছাড়িতেন তাঁহার অব্যর্থ অস্ত্র। জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া মাথায় এক বালতি জল ঢালিয়া দিতেন—ব্যাস্, যেন জোঁকের মুখে নুন পড়িত। আর সে মানুষই নন। নিজেই মাথা মুছিয়া ঘরে আসিবেন, সহজ ভাবে কথা কহিবেন, বাজারের দরদস্তরের কথা আলোচনা করিবেন, চা খাইবেন—শেষ পর্য্যন্ত হয়ত বা আমাদের ডাকিয়া গল্পই শুরু করিবেন।

কিন্তু বিপদ ছিল যেদিন পয়সা কম থাকিত বা কোন কারণে বেশী মদ খাওয়ার ইচ্ছা হইত না সেই দিনই। বাড়ী ফিরিতেন একেবারে রুদ্রমূর্ত্তিতে। জিনিষ পত্র ফেলিয়া ভাঙ্গিয়া ছড়াইয়া, ফুলমাসিমাকে গালাগালি দিয়া বাড়ী যেন মাথায় করিতেন। তাহার পর, ফুলমাসিমা কোন জবাব দিন বা না দিন, কোন একটা ছুতা ধরিয়া তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া প্রাণপণে ঠেঙ্গাইতেন; প্রথম প্রথম দুই একদিন আমাদের বাড়ীর মেয়েরা উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন (কারণ সে সময়ে আমাদের বাড়ীর পুরুষরা প্রায় কেহই বাড়ী থাকিতেন না) কিন্তু ভবেশবাবুর রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া আর কেহ কাছে যাইতে সাহস পান নাই। ইদানীং আবার তাঁহাকে ঐ ভাবে ফিরিতে দেখিলেই ফুলমাসিমা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিতেন।

তবে ভরসার কথা এই যে, ফুলমাসিমাকে খানিকটা মারিবার পর আপনা আপনিই তাঁহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিত। নিজেই কলতলায় গিয়া মাথায় জল দিয়া আসিতেন, ফুলমাসিমার পায়ে ধরিয়া মাপ চাহিয়া লইতেন, তাহার পর বাহিরে গিয়া ব্রাণ্ডি কিংবা কেরোসিন তেল সংগ্রহ করিয়া একটা মালসাতে গুলের আগুণ করিয়া মাসিমার কালসিটা পড়া জায়গাগুলিতে মালিস ও সেক করিতে বসিতেন। তারপর সারারাত ধরিয়া চলিত মাসিমার সেবা ও তোয়াজ। সে মানুষই নয় আর। এমন কি মাত্রাটা যেদিন একটু বেশী হইয়া

পড়িত সেদিন হোটেলে গিয়া মাসিমার জন্য চপ্ কাটলেটও কিনিয়া আনিতেন।

অবশ্য এ ত গেল ভিতরের কথা—কিন্তু পাড়ার লোকে এ সব ইতিহাসের ধার ধারিতেন না, তাঁহারা শুনিতেন শুধু ঐ চেঁচামেচি কান্নাকাটি। ফলে তাঁহারা অত্যন্ত গোলমাল শুরু করিলেন, একদিন তিন চার জনে মিলিয়া আমাদের জানাইয়াই গেলেন যে সাতদিনের মধ্যে এই লক্ষ্মীছাড়া মাতাল ভাড়াটে উঠাইয়া না দিলে তাঁহারা আদালতের সাহায্য লইতে বাধ্য হইবেন। বাড়ীর লোকরাও যে অত্যন্ত উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয় কিন্তু বিপদ বাধিয়াছিল ফুলমাসিমাকে লইয়া, তিনি দুই তিন দিনের মধ্যেই এমন ভাবে সকলের অন্তরঙ্গ ও প্রিয় হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার কল্পনাও হইয়া উঠিল কষ্টকর। মা-ত নিজের বোনের মতই তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, জ্যাঠামশাই তাঁহাদের উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলেই তাঁহার চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিত। আর শেষ পর্য্যন্ত পাড়ার লোককে ফুলমাসিমাই ঠাণ্ডা করিলেন। নিজে যাচিয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া মেয়েদের সঙ্গে ভাব করিতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। পুরুষরাও কেহ তাহার ভাই, কেহ বোন-পো, কেহবা বাবা হইয়া উঠিলেন, সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহাদের তাড়াইবার কথাটা আপনিই চাপা পড়িয়া গেল।

ফুলমাসিমার কথাবার্ত্তায় সব চেয়ে যেটা বিস্ময়কর ছিল সেটা স্বামী সম্বন্ধে তাঁহার সহজ মনোভাব। ভবেশ বাবুর ব্যবহারে তাঁহার যে কোন লজ্জা পাইবার কারণ আছে, অন্য মেয়েরা যে এ ব্যাপারে তাঁহাকে করুণা ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিতে পারে—এ কথাটা একবারও তাঁহার মাথায় যাইত না। বরং কেহ সেই ধরণের কথা তুলিলে তিনি যেন একটু বিস্মিত দৃষ্টিতেই তাহার দিকে তাকাইতেন। অপরপক্ষ তাহাতেও নিরস্ত না হ'লে তিনি নিজেই বিরক্ত হইয়া উঠিয়া যাইতেন।

একদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। দুপুর বেলা মেয়েদের আড্ডা বসিয়াছে, ছেলে মানুষ বলিয়া আমরাও সেই ঘরে আছি, কেহ নিষেধ করে নাই। তাহার আগের দিন রাত্রে ভবেশ মেসো একটু বেশী বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহার ফলে আজ সকালে আর ফুলমাসিমা উঠিতে পারেন নাই, অনুতপ্ত মেসোমশাই নিজেই রান্না করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া গিয়াছেন—সেই কথাটাই মাসিমা সগর্ব্বে গল্প করিতেছিলেন। আমার মা শুনিতে শুনিতে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বলিয়া উঠিলেন, 'তুই থাম ফুল! ও কথা আর বাহাদুরি ক'রে গল্প করিস্ নি। ......তুই বলে তাই ঐ জানোয়ারটার ঘর করিস্, আমি হ'লে অমন স্বামীর সঙ্গে ঘর করার আগে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম্!'

মা সাধারণতঃ এ ধরণের কথা কখনও ফুলমাসিমাকে বলিতেন না—সেদিন বোধ হয় অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই আর নিজেকে সামলাইতে পারেন নাই, কিন্তু মাসিমা এই রূঢ়তায় একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ বিবর্ণ মুখে বসিয়া থাকিবার পর বার-দুই ঢোক গিলিয়া বলিয়া উঠিলেন: ভালবাসে বলে তাই, আপনার বলে তাই, নইলে কে কাকে মারে দিদি!'

তাহার পর আর উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে নীচে চলিয়া গেলেন।

মা-ত কথাটা বলিয়া ফেলিয়া অপ্রস্তুত হইয়াছিলেনই। ঘর সুদ্ধ সকলেই আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমরা

সকলেই ভাবিলাম যে ফুলমাসিমা বোধ হয় কিছু দিন আর আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিবেন না। কিন্তু দেখিলাম যে স্বামীর অপরাধ সহজে ক্ষমা করার অভ্যাস থাকায় সমস্ত অপরাধই তিনি ক্ষমা করিতে শিখিয়াছেন। একটু পরেই কী একটা ছুতায় তিনি উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যেন কিছুই হয় নাই এমনি ভাবেই কথাবার্তা শুরু করিয়া দিলেন। আমরা সকলেই নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম, যদিও সেইদিন হইতে মা বা আমাদের বাড়ীর অন্য কেহ ভবেশ মেসো সম্বন্ধে আর কোন কটূক্তি তাঁহার কাছে করেন নাই। যে মানুষ কাহাকেও কখনও আঘাত ফিরাইয়া দেয় না তাঁহার নিঃশব্দ বেদনার কারণ হইয়া লাভ কি?

এ হেন ফুলমাসিমার সংসার কয়দিন হইতে নিস্তব্ধ হইয়া আছে বিস্ময়ের কথা বৈ কি। ব্যাপারটার কারণ সম্বন্ধে অতি সন্তর্পণে অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানা গেল তাহা আরও বিস্ময়কর। ভবেশ মেসো মাতাল হইয়া যাহাই করুন না কেন, প্রকৃতিস্থ অবস্থায় তিনি ফুলমাসিমাকে অত্যন্ত ভয় করিয়া চলিতেন। এই দীর্ঘদিনের মধ্যে আমরা কখনও তাঁহাকে মাসিমার কথায় প্রতিবাদ করিতে ত শুনিই নাই—কখনও তাঁহাদের কোন বিষয়ে মতভেদ হইয়াছে এমনও শুনি নাই। হঠাৎ সেদিন কি একটা ব্যাপারে বোধ হয় বাজার যাওয়া লইয়াই, দুজনের একটু মনান্তর হইয়াছিল এবং মেসোমশাই একটু চড়া গলায় কী জবাব দিয়াছিলেন। তাহার ফলে মাসিমা মুখ অন্ধকার করিয়া ছিলেন এবং বাজার হইতে ফিরিবার পরে কথা কহেন নাই এমন কি আহারের সময়েও প্রশ্ন করেন নাই আর কিছু চাই কি না। ফলে, ভবেশ বাবু যখন অফিসে যান তখন খুবই মুহ্যমান অবস্থাতেই বাহির হইয়াছিলেন।

ফুল মাসিমার আশা ছিল যে, সেদিন ভবেশ বাবু একটা ভাল রকমের কিছু উপহার লইয়া বাড়ী ঢুকিবেন এবং সন্ধির প্রস্তাব স্বরূপ মদ না খাইয়া ফিরিবেন। কিন্তু ভবেশবাবু সে সব কিছুই করেন নাই, অফিসের বেয়ারা দিয়ে খবর পাঠালেন যে তিনি দিন তিনেকের ছুটি লইয়া তাঁহার দাদার কাছে আসানসোলে চলিয়া যাইতেছেন—ফুলমাসিমা যেন না ভাবেন।

কথাটা সামান্য, কিন্তু সংবাদটা শুনিবার পর ফুলমাসিমার মুখের যে অবস্থা হইল তাহা অবর্ণনীয়। তিনি দুঃখিত হইয়াছেন, কিম্বা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহা বিরহ কিংবা ক্ষোভ কিছুই বোঝা গেল না শুধু অপরিসীম একটা বেদনার ছবি তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে রাত্রি তিনি রান্না করিলেন না, মায়ের অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে আমাদের এইখানেই সামান্য কিছু মুখে দিলেন মাত্র—পরের দিনও তাঁহার সে দিকে কোন চেষ্টা দেখা গেল না, মা অবশ্য নিজেই তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুই আর এ কদিন রাঁধিসনি ফুল, ভবেশ যতদিন না আসে আমার এখানেই খাস। ফুলমাসিমা তখন একবার বিষণ্ণ উদাস দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে তাকাইলেন কোন জবাব দিলেন না, প্রতিবাদও করলেন না। কিন্তু সেদিন আহারে বসিয়া প্রায় কিছুই খাইলেন না, খানিকটা নাড়াচাড়া করিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

বলা বাহুল্য এতটা বাড়াবাড়ি আমাদের সকলেরই অত্যন্ত খারাপ লাগিল। ফুলমাসিমা কচিখুকী নহেন, ভবেশ মেসোরও চল্লিশ পার হইয়াছে। তা ছাড়া তাঁহারা নাকি একুশ বৎসর বিবাহিত জীবন যাপন করিতেছেন, এ অবস্থায় স্বামী যদি দুই তিন দিনের জন্য বাহিরে গিয়াই থাকেন ত এত হা-হুতাশ করিবার কি আছে। মা কিন্তু মনে মনে বিরক্ত হইলেও, মুখে তাঁহাকে সান্ত্বনা

দিবারই চেষ্টা করিলেন—কাকীমা-বৌদির দল আড়ালে হাসাহাসি করিতে লাগিলেন প্রচুর।

কিন্তু বিরক্তিটা ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল ফুলমাসিমার রকম দেখিয়া। মেয়েলি ভাষায় 'আদিখ্যেতা'রও একটা সীমা থাকা দরকার। অন্য দিন বারোটা বাজিলেই নিজের কাজ করিয়া ফুলমাসিমা উপরে আসিয়া মেয়ে মজলিসে যোগ দিতেন, বেলা চারটার আগে আর নীচে নামিতেন না—ঘুম পাইলে উপরেই কোথাও পড়িয়া গড়াইতেন। অথচ আজ, উপরে খাওয়ার ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও, কোনমতে থালার কাছ হইতে উঠিয়া একেবারে নীচে নামিয়া গেলেন এবং সারাদিন আর ঘর হইতে বাহির হইলেন না। একেবারে সন্ধ্যার পর মায়ের ডাকাডাকিতে কাপড় কাচিয়া যখন উপরে চা খাইতে আসিলেন তখনও মুখ তেমনি থমথমে, তেমনি উদাস। চা খাওয়া হইয়া গেলে খালি পেয়ালাটা হাতে নাড়াচাড়া করিতে করিতে অস্বাভাবিক রকম মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, দিদি, একটা কথা বলব ?

মা একটু বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিলেন, 'অত ভণিতা ক'রে আবার কি বল্‌বি?' আজ আর আমার আটা মাখবেন না, আমার একদম খিদে নেই। আমার আমার শরীরটা বড় খারাপ করেছে।'

ইহার পর আর মায়ের ধৈর্য্য রাখা সম্ভব হইল না। এতদিন ঘনিষ্ঠতাটা প্রায় আত্মীয়তায় দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া মা আর ইদানীং কথা বিশেষ হিসাব করিয়া বলিতেন না, আজও মুখে লাগাম রাখিলেন না। একেই অপ্রিয় সত্যভাষণের জন্য পাড়ার মধ্যে তাঁহার খ্যাতি ছিল, তাহার উপর দুইদিন ধরিয়া মনের মধ্যে তাঁহার ক্রোধ ধূমায়িত হইয়া আজ সকল ধৈর্য্যের সীমা লঙ্ঘন করিল। তিনি কিছুক্ষণ ধরিয়া যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া যখন থামিলেন তখনও কিন্তু ফুলমাসিমা একটি প্রতিবাদের কথা উচ্চারণ করিলেন না, বা উঠিয়াও গেলেন না, শুধু তাহার দুই চোখ প্লাবিয়া গণ্ড বাহিয়া ধারায় ধারায় জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। মা সেই জল দেখিয়াই হউক বা নিজের রূঢ়তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপই হউক—হঠাৎ অত্যন্ত কোমল হইয়া পড়িলেন, কাছে বসিয়া মাসিমাকে একেবারে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, কেন অমন কচ্ছিস বল দেখি ফুল—সত্যি কথা বলবি।'

এবার ফুলমাসিমা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। মায়ের গলাটা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া মুখ বুকে রাখিয়া আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে নিজেই একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন, 'তোমরা যা ভাবছ দিদি তা নয়। এ আমার কপাল পোড়ার কথা যে। আমার আর কিছু কি ভাল লাগছে?'

'সে কিরে। কী বল্‌ছিস পাগলের মত!'

'ঠিক বলছি দিদি'—আর একবার কান্নার জোয়ার আসিল—'এতদিন বিয়ে হয়েছে দিদি, মারুক আর ধরুক, যাই করুক, আমি সত্যি সত্যি রাগ করেছি বুঝতে পারলে ও দুই চোখে অন্ধকার দেখত—পাগলের মত চেষ্টা করত যাতে আমার রাগ ভাঙ্গে, যাতে আমার মুখে হাসি ফোটে—। যতক্ষণ না আমি আবার হেসে কথা কইতুম, ততক্ষণ যেন জ্ঞান থাকত না। এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি দিদি, যত মাতালই হোক না কেন, আমি বিরক্ত হচ্ছি বুঝতে পারলে ওর নেশা পর্য্যন্ত ছুটে যেত। আর সেই লোক কিনা, আমি মুখ ভার করে আছি দেখেও স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে গেল, কেন রাগ করলুম একবার জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করলে না, উলটে একটা চাকর দিয়ে চিরকুট পাঠিয়ে সটান বিদেশে চলে গেল। কী বলছ দিদি, আমার বুকের মধ্যে যে কি আগুন জ্বলছে তা শুধু অন্তর্যামীই

জানেন। এত সাহস ওর আসে কোথা থেকে, অন্যদিকে যদি টান না থাকবে?

শেষের কথাগুলি আমার কান্নায় জড়াইয়া গেল। মা যে কী কষ্টে গম্ভীর হইয়া রহিলেন তা তিনিই জানেন। কোনমতে কণ্ঠস্বরে সহানুভূতি ও সান্ত্বনা টানিয়া আনিয়া কহিলেন, এই কথা। পাগলী কোথাকার, আমি বলি না জানি কি। এ যে চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলছিস ফুল। ...শোন্, মুখ তোল, আমার দিকে চা—ওরে, আমার ঢের বয়স হয়েছে, অনেকদিন ধরে এই এত বড় সংসার চালাচ্ছি, লোক ও ঢের দেখলুন—আমি বলছি তোর কপাল অত সহজে পুড়বে না, ভবেশ সে রকম লোক নয়। তোর ওপরে ওর যা ভালবাসা সে কি এতই ঠুন্‌কো ভাবিস। আ আমার কপাল, এতদিনেও বিশ্বাস করতে শিখলি না।

ফুলমাসিমার ললাটের মেঘ কাটিয়া যেন এক ঝলক আলো ফুটিয়া উঠিল। তিনি সাগ্রহে মুখ তুলিয়া কহিলেন, 'তুমি সত্যি কথা বলছ দিদি, আমার ভয় নেই? না, আমাকে স্তোক দিচ্ছ?'

'না, রে, সত্যিই বলছি।'

'তবে ও অমন করলে কেন?'

'সে যখন তোদের ঝগড়া মিটে যাবে তখন তাকেই জিজ্ঞাসা করিস।'

আবারও ফুলমাসিমার মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল। কহিলেন, 'তা ঝগড়াই বা করলে কেন দিদি, এতদিনের মধ্যে ত কখনও আমাদের মনান্তর হয় নি।'

মা কোন মতে ঠোঁট কামড়াইয়া মুখভাব শান্ত রাখিলেন। বলিলেন, 'ওকে কি মনান্তর বলে রে পাগ্‌লী? ও হ'ল ঠোকাঠুকি লাগা! নে, নে, ওঠ্—মরদাটার জল দে দিকি, কাজ কর।'

ফুলমাসিমা উঠিলেন বটে, সেদিন আহারও করিলেন স্বাভাবিক ভাবেই কিন্তু তাঁহার মনের দ্বিধা বা সংশয় যে একেবারে কাটে নাই তা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আর কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। কথার ফাঁকে ফাঁকে অকারণ দীর্ঘশ্বাস তাঁহার পড়িতেই রহিল।

হঠাৎ সে মেঘ কাটিল আরও দিন-দুই পরে। ঘোড়ার গাড়ীর শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি ভবেশবাবুর সহিত একটি প্রায় প্রৌঢ়া মহিলা নামিতেছেন, সঙ্গে গুটি-দুই ছেলে মেয়ে। আরও ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে চিনিতে পারিলাম, ইনি ভবেশবাবুর বৌদি। আসানসোলে থাকেন, এতকালের মধ্যে বছর-পাঁচেক আগে একবার মাত্র আসিয়াছিলেন দিন কয়েকের জন্য।

ভদ্রমহিলা গাড়ী হইতে নামিয়া একেবারে ফুলমাসিমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। সস্নেহে হাসিয়া কহিলেন, 'বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত বুঝি তোদের পাগ্‌লামী ঘোচে না। কী বলেছিলি ওকে?'

কণ্ঠস্বর অতি কষ্টে ফোটে। অভিমানরুদ্ধকণ্ঠে মাসিমা বলেন, কী বলেছি?'

'তা জানিনে বাপু। গিয়ে বলে লাইফ ইন্সিওরের টাকা কটা তোমাদের হাতে দিয়ে যাচ্ছি, তোমরাই ওকে দেখো, এই আমার ব্যাঙ্কের বই, এই সব কাগজ এ—আমি আর এসব কিছু জানি না, আমি আত্মহত্যা করব—'

ফুলমাসিমা জায়ের আলিঙ্গনের মধ্যেই শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে আরও নিবিড়ভাবে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, 'হ্যাঁ, শোন্‌না। সে কিছুতে থামাতে পারি না, বলে আর আমি কিছুতেই এ জীবন রাখব না, আমি মরবই। যত বলি ব্যাপার কি, সব খুলে

বলো ওত ঐ এক কথা, ওকে তোমরা দেখো, আব ও কেউ নেই, মোদ্দা আমি মবরই। অনেক মাথার দিব্যি টিব্যি দেবার পর শু'ন যে তুই নাকি শুধু শুধু ওর সঙ্গে ঝগড়া কবেছিস, আবাব ওব ওপরই রাগ ক'রে মুখ ভার ক'রে আছিস - এমন কি ভাত দিযে একবার খোঁজ পর্য্যন্ত করিস্ নি যে আব কিছু ওর চাই কিনা—এই বাবুর একেবাবে মাথায় আগুন জলে গেছে, এ ছাব প্রাণ আর রাখ্‌বে না। ঠাণ্ডা করতে কি পাবি—কোন কথা শুন্‌তে চায় না। .. . যত সব পাগলেব কাণ্ড ত, কী ক'বে বসবে তা কি জানি, তাই আবার নিজেকে আস্‌তে হ'ল। নাও ভাই তোমার জিনিষ বুঝে নাও, আমার সেখানে ঘর-কন্না সব আতান্তরে ফেলে এসেছি!'

এতক্ষণে মেঘ সত্য-সত্যই কাটিল। কণ্ঠস্বরে কৃত্রিম কোপ টানিয়া আ'নিয়া স্বামীর দিকে কটাক্ষ হানিয়া হাসিহাসি মুখে ফুলবাসিনী কহিলেন, 'আ !, ন্যাকামি!'

জন্মাষ্টমী

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন

মথুবার রাজপথে আজ সমারোহের অন্ত নাই। শূর-বংশীয় বসুদেব দেবককন্যা দেবকীকে বিবাহ ক'রিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। মথুরাধিপতি উগ্রসেনপুত্র কংস পিতৃব্যকন্যাব বিবাহে উৎসাহাধিক্যে নবদম্পতিব সাবথ্যে ব্রতী হইয়াছে। শঙ্খ, মৃদঙ্গ, তুরী, দুন্দুভি প্রভৃতি মঙ্গল বাদ্য বাজিতেছে। দেবকীর পিতা সুসজ্জিত রথ হস্তী অশ্ব দাসী প্রভৃতি যৌতুক প্রদান কবিয়াছেন, সেই সমস্ত উপায়নও শোভাযাত্রাব শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। কাতারে-কাতারে নরনারী এই উৎসব দর্শনে সমবেত হইয়াছে। সকলেই আনন্দিত. অকস্মাৎ সমবেত জনতাকে চমকিত কবিয়া কংসের উদ্দেশে কে যেন বলিয়া উঠিল, 'অরে অবোধ, যাহাকে বহিয়া বেড়াইতেছিস্ তার অষ্টম গর্ভ তোকে বধ করিবে।' শুনিবামাত্র কংসের ভাবান্তর ঘটিল, সেই ভোজকুলপাংশন কোষ হইতে তরবারী আকর্ষণ পূর্ব্বক দেবকীর কেশে ধরিয়া তাহার বধসাধনে উদ্যত হইল। খলেব স্বভাবই এইরূপ—এই এখনই অত্যন্ত সন্তুষ্ট, পরক্ষণেই ভীষণ রুষ্ট! ইহাদের প্রসাদও ভয়ঙ্কর। বসুদেব অকস্মাৎ এই বিপৎপাতে বিচলিত হইলেন না। সেই নৃশংস নির্লজ্জ খলকে এই নিন্দিত কর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। ব'ললেন লোকে তোমার প্রশংসা করে, তুমি বীর, তুমি কেন এই বিবাহ উৎসবে ভগিনীহত্যায় উদ্যত হইয়াছ। মৃত্যু তো দেহধারীর দেহের সঙ্গেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আজই হউক আর শতবৎসর পরেই হউক প্রাণীগণকে মরিতে হইবে, ইহা সুনিশ্চিত। সুতরাং আত্মহিতা-কাঙ্ক্ষী জীবের কাহারো অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। যে হেতু পরের অনিষ্ট করিলে নিজেরও ভয় উপস্থিত হয়। অতএব এই মৃত্যুভয়বিহ্বলা, কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অচেতন প্রায় তোমার অনুজা এই বালিকাকে হত্যা করিও না। কিন্তু কংস প্রতিনিবৃত্ত হইল না।

বসুদেব তাহার নির্ব্বন্ধ দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—দেবকী হইতে তো তোমার ভয়ের কারণ নাই। তুমি দেবকীকে বধ করিও না। দেবকীর পুত্র হইতেই তোমার প্রাণের আশঙ্কা, অতএব দেবকীর গর্ভজাত পুত্রগুলি আমি তোমাকে সমর্পণ করিব। বসুদেব মিথ্যা কথা বলেন না তাহা জানিত বলিয়া কংস ভগিনীবধে বিরত হইল। বসুদেব দেবকী সহ গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই কংসের মত অত্যাচারী রাজারাই ভারতবর্ষের ইতিহাসে একই মহাসত্যকে পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত করিয়াছে। সে সত্য,—অত্যাচারীর মৃত্যুবীজ তাহার অত্যাচারের মধ্যেই নিহিত থাকে। মগধের জরাসন্ধ কংসের শ্বশুর, শাল, শিশুপাল, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, কাল যবন, শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি দুষ্ট রাজগণ ছিল জরাসন্ধের অকৃত্রিম বন্ধু, সুতরাং কংসের স্পর্দ্ধার সীমা ছিল না। সর্ব্বপ্রথম কংসের অত্যাচারই বোধ হয় চরমে উঠিয়াছিল। পৃথিবী আপনার যে দুঃখ কাহিনী ব্রহ্মাকে নিবেদন করিতে গিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বপ্রধান কথা হইল এই রাজগণের অত্যাচার। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

'ভূমির্দৃপ্ত নৃপব্যাজ দৈত্যানীক শতায়ুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ॥'

যাহারা রাজা নয়, প্রকৃতি রঞ্জন ও রাজ্য পালন যাহাদের উদ্দেশ্য নয়, যাহারা দৈত্য, রাজার ছলে পৃথিবীকে শাসন ও শোষণ করিতেছে, তাহাদের জন্যই পৃথিবীর এই অভিযোগ। রাজ্য হইতে সত্য অন্তর্হিত হইয়াছে, সাধুব্যক্তিগণ আত্মগোপন করিয়াছেন, প্রতিবাদকারী সাহসীর দল নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, রমণীর সতীত্ব বিপন্ন, যুবকের জীবন নিরাপদ নয়, এমন কি নিষ্পাপ শিশুর প্রাণ রক্ষারও কোন উপায় নাই। গৃহে গৃহে পূতনা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই অত্যাচার নিবারণের জন্যই ভগবান প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, আমি আবির্ভূত হইব। শীঘ্রই আমার সাক্ষাৎ পাইবে। এই ভারতে দেহ-সর্ব্বস্ববাদ সে দিন এমনই প্রবল হইয়া ছিল যে, "দেবকীর অষ্টম গর্ভ তোমাকে বিনষ্ট করিবে" এই দৈববাণী শুনিয়া কংস দেবকীকেই হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। যেন দেবকীর মৃত্যুতেই কংস অমরতা লাভ করিবে। এই মনোবৃত্তি পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হইতেছিল। জীবনের অধিকাংশ দিন শ্রীকৃষ্ণ সান্নিধ্যে অতিবাহিত করিয়াও উগ্রসেন এই মনোবৃত্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই। কুলনাশন মুষল দেখিয়া তিনিও যাদব যুবকগণকে আদেশ করিয়াছিলেন যে 'ঐ মুষলটাকেই ঘষিয়া ঘষিয়া নিশ্চিহ্ন কর।' অর্থাৎ ঐ মুষল নষ্ট হইলেই যেন যাদবগণ মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইবেন। ইহারা অভয়ের সন্ধান জানিত না, ইহারা ভীরু, ইহারা জীবন্মৃত। অথচ ইহারাই অত্যাচারী, নৃশংস, নির্লজ্জ।

কালে দেবকী এক পুত্র প্রসব করিলেন। সত্যসন্ধ বসুদেব সদ্যোজাত শিশুকে লইয়া কংসের নিকট উপস্থিত হইলেন। এরূপ আচরণ অপ্রত্যাশিত, কংস বিস্মিত হইল। শিশুকে ফিরাইয়া দিয়া খুসী হইয়া কহিল—ইহাতে আমার প্রয়োজন নাই। ইহা হইতে আমার অনিষ্ট হইবে না, দেবকীর অষ্টম পুত্রই আমাকে বধ করিবে দৈববাণীতে এই কথাই শুনিয়াছি। বসুদেব শিশুকে লইয়া ফিরিলেন, কিন্তু মনে শান্তি পাইলেন না, খলকে বিশ্বাস নাই, কি জানি কখন কি মতি হইবে। বসুদেবও কংসের চক্ষুর অন্তরাল হইয়াছেন, অমনি মহর্ষি নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, কংস, নন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসী গোপগণ, তাঁহাদের পত্নীগণ, বসুদেব প্রভৃতি যাদব ও দেবকী আদি যাদব রমণীগণ এবং তাঁহাদের

জ্ঞাতি বন্ধু ভৃত্যগণ সকলেই দেবতাপ্রায়। এদিকে দেবতাগণও দৈত্যবধের জন্য গোপনে উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন। কথা কয়টী বলিয়া নারদ অন্তর্হিত হইলেন। কংসও বসুদেবকে ফিরাইয়া আনিয়া সেই সদ্যোজাত শিশুকে বধ করিলেন। বসুদেব ও দেবকীকে লৌহ শৃঙ্খলে বাঁধিয়া কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। পিতা উগ্রসেনকে এবং সেই সঙ্গে যদু ভোজ অন্ধকগণকে নিগৃহীত করিয়া স্বয়ং শূরসেনের রাজাসনে উপবেশন করিলেন। কংসেরও পাপের ভরা পূর্ণ হইতে চলিল। দেবকীর পুত্রের শাপ মোচনের জন্য এইরূপ মৃত্যুর আবশ্যকতা ছিল। বসুদেবের পুত্রার্পণের কথায় শ্রীশুকদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে কংসের প্রকৃতিরও পরিচয় আছে।

কিং দুঃসহং নু সাধূনাং বিদুষাং কিমপেক্ষিতম্।
কিমকার্য্যং কদর্য্যানাং দুস্ত্যজং কিং ধৃতাত্মনাম্॥

সাধুগণের দুঃসহ কি আছে? পণ্ডিতগণ কিসেরই বা অপেক্ষা রাখেন? কদর্য্যগণের অকার্য্য কি আছে? ধৃতাত্মাগণ কি না ত্যাগ করিতে পারেন?

কংস বসুদেবের ছয়টী সদ্যোজাত শিশুপুত্রকেই হত্যা করিল। সপ্তম গর্ভে বলদেব আবির্ভূত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যোগমায়া এই গর্ভ আকর্ষণ করিয়া ব্রজস্থিতা বসুদেবের অপরা পত্নী রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিলেন। কারারক্ষিগণ সংবাদ দিল দেবকীর সপ্তম গর্ভ অকালে নষ্ট হইয়া গেল। এদিকে প্রলম্ব, বক, চাণুর, তৃণাবর্ত্ত, অরিষ্ট, দ্বিবিদ, পূতনা, কেশি ধেনুক প্রভৃতি অসুর ও বাণ নরক প্রভৃতি অসুরপতিগণের সহিত মিলিত হইয়া মগধরাজ জরাসন্ধের সহায়তায় কংস যাদবগণের উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিল। যাহারা পারিল পলাইয়া বাঁচিল। কেহ কেহ কংসের অনুবর্ত্তী হইয়া মথুরাতেই বাস করিতে লাগিল।

শ্রীভগবানের আবির্ভাবকাল এইবার নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। বিশ্বাত্মা সর্ব্বান্তর্যামী ভক্তগণের অভয়দাতা শ্রীভগবান বসুদেবের মনে প্রকাশিত হইলেন। দেবকী বসুদেব কর্তৃক সমাহিত সর্ব্ব সর্ব্বজীব সুখপ্রদ, যোগধারণাদি ব্যতীত স্বয়ং আবির্ভূত ভুবনমঙ্গল সর্ব্বাংশে পরিপূর্ণ শ্রীভগবানকে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক অবরুদ্ধ অগ্নিশিখার প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। কংস বুঝিতে পারিল আমার প্রাণহারী হরি এবার আসিতেছেন।

আষাঢ়ের মেঘ দেখিলে যেমন কৃষক, চাতক, ময়ূর ও দাবদগ্ধ পশু ভিন্ন ভিন্ন কারণে হইলেও সমান আনন্দে উল্লসিত হয়, তেমনই দেবকী গর্ভে ভগবান আবির্ভূত হইয়াছেন জানিয়া দেবগণের সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মা, নারদ, শিব ও ইন্দ্র আদি কংসকারাগারে আসিয়া শ্রীভগবানের জয় উচ্চারণ করিলেন। কৃষক জানে এই মেঘের জল আমার জীবন ধারণোপায় শস্যকে রক্ষা করিবে, নূতন শস্যের হেতুভূত হইবে ব্রহ্মাও সেইরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন, এই কৃষ্ণ মেঘের কৃপাবারি আমার সৃষ্ট সৃষ্টিকে রক্ষা করিবে, সৃষ্টিকে নূতন রূপ দান করিবে। চাতক যেমন বৃষ্টিবারি ভিন্ন বাপী, কূপ, নদী, তড়াগের জল পান করে না, নারদাদি ভক্তগণও তেমনই শ্রীভগবান পদারবিন্দ ভিন্ন অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারেন না। মেঘ দেখিলেই ময়ূরের আনন্দ, মেঘের সঙ্গে ময়ূরের এই অহৈতুকী আনন্দেরই সম্বন্ধ। মহাদেবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধও তদ্রূপ। আর দাবদগ্ধ পশু যেমন মেঘ দেখিয়া আশ্বস্ত হয়, দৈত্যভয়ভীত দেবরাজ ইন্দ্রও শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের সম্ভাবনায় আশ্বস্ত হইয়াছেন। দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের যে স্তব করিয়াছেন, তাহার প্রথম শ্লোকেই তাঁহাদের সমগ্র বক্তব্যের সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। দেবগণ বলিয়াছেন—অমরা সত্যসংকল্প,

সত্যসাধ্য লভ্য, ত্রিকালসত্য, জগৎকারণ, অন্তর্যামী ও পরমতত্ত্ব, সত্য বাক্য ও সমদর্শনের প্রবর্ত্তক, সত্য-স্বরূপ শ্রীগোবিন্দের শরণাপন্ন হইলাম। দেবদৃষ্টি এবং ঋষিদৃষ্টি ভিন্ন শ্রীভগবানের এই সত্যরূপ দর্শন অপরের পক্ষে অসম্ভব। মানুষ ভগবৎ কৃপায় এই দৃষ্টি লাভ করিতে পারে।

অথ সর্ব্বগুণোপেতঃ কালঃ পরম শোভনঃ। শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের সেই পরম শোভন সর্ব্বগুণোপেত কাল—ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীর অর্দ্ধ রাত্র উপস্থিত হইল। দশদিক সুপ্রসন্ন হইল, আকাশে সমুজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া উঠিল, পৃথিবীর সমস্ত নগর গ্রাম, মঙ্গলসজ্জায় সজ্জিত হইল। সুখসেব্য পুণ্য গন্ধবহ পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণের নির্ব্বাপিত প্রায় হোমাগ্নি বিনা আহুতিতে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। নদীর জল নির্ম্মল হইল। হ্রদবক্ষে শতদল বিকশিত হইল, বনরাজি কুসুমে শোভিত হইল, পক্ষিগণ গান করিতে লাগিল, অলিকুল ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। সাধুগণের অন্তর প্রসন্ন হইল। স্বর্গে দেব-বাদ্য বাজিতে লাগিল, কিন্নর, গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিল, বিদ্যাধরী ও অপ্সরাগণ নৃত্য আরম্ভ করিল। দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। জলধর সাগরের অনুকরণে মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে লাগিল। যেন ত্রিভুবন ব্যাপিয়া উৎসবের সমারোহ পড়িয়া গেল। বিশ্বেশ্বর আসিতেছেন, বিশ্বের হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিল। কিন্তু মথুরা যেন নিদ্রিত। বিশ্বের মহোৎসবে মথুরায় কোন সাড়া জাগাইল না। মথুরার দ্বারে দ্বারে কেহ মঙ্গল কলস স্থাপন করিল না, গৃহে গৃহে উৎসবের আলোক প্রজ্জ্বলিত হইল না। কেহ শঙ্খধ্বনি করিল না কোন পুরনারী উলুধ্বনি দিল না। অত্যাচারিতের আর্ত্তনাদ সেখানে স্তব্ধ, কাহারো কাঁদিবারও সেখানে সাহস নাই, অহিংস সত্যপ্রতিজ্ঞ সাধু বসুদেব অনুকম্পা অর্দ্ধাঙ্গিনী সহ—নির্য্যাতিতা নারীগণের প্রতীক স্থানীয়া দেবকীর সঙ্গে সেখানে কারারুদ্ধ, অত্যাচারী কংসের মৃত্যুস্বরূপ ভগবান সেই উত্তুঙ্গ কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অন্ধকার অবরোধ-কক্ষে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। লৌহনিগড়ে আবদ্ধ জনক জননী ভিন্ন সে দিন তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইবার জন্য কংসভয়ে ভীত মথুরাবাসী কেহ উপস্থিত হইতে পারে নাই। হয়তো বা কংস রাজ্যে—কংসের রাজধানীতে এই আবির্ভাবের কথা কেহ জানিতেও পারে নাই।

পূর্ব্বাকাশে উদিত পূর্ণচন্দ্রের মত দেবকীর কোল আলো করিয়া পূর্ণব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং আসিয়া উদিত হইলেন বসুদেব দেবকীকে তাঁহাদের পূর্ব্ব পরিচয় জানাইয়া আপনার পরিচয় দিলেন। সদ্যোজাত ছয়টী পুত্র মৃত, একটী পুত্র গর্ভ হইতে স্থানান্তরিত। আবার এই সদ্যোজাত পুত্রের আদেশেই বসুদেব তাঁহাকে কংস কারাগার হইতে নন্দালয়ে রাখিয়া আসিলেন। তাঁহার অদৃষ্টই এইরূপ। ভাগ্য ফলিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। তথাপি তিনি সহ্য করিলেন।

সুদীর্ঘ পঞ্চ সহস্র বৎসর পরে—আবার সেই ভাদ্র মাস, সেই ভাদ্র মাসের রোহিণীসংযুক্ত কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি আসিয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই তিথি আসিয়াছে গিয়াছে, আবার আসিয়াছে। মথুরায় সে দিন উৎসব করিতে পারি নাই স্বাগত জানাই নাই? আজো কি জন্মাষ্টমীর উৎসবের অধিকার অর্জ্জিত হয় নাই? আজও কি সেই পূর্ণব্রহ্মের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণের শক্তি লাভ করি নাই—

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

মানবের মনোরাজ্য যেন কংসরাজ্যে পরিণত হইয়াছে। সমস্ত সাধু প্রবৃত্তি যেন তাহার যাদুদণ্ড স্পর্শে অন্তর্হিত হইয়াছে। পশ্চিমের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আপন আত্মঘাতী প্রকৃতি ভীষণ ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছে। দগ্ধীভূত অস্থি মজ্জা বসা মাংসের পূতিগন্ধময় ধূমরাশি দিগন্তকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। হতাহতের আর্ত্ত চীৎকার, শোকক্লিষ্টা বিয়োগবিধুরা রমণীগণের কাতর ক্রন্দন, পিতা পুত্র ভ্রাতা বন্ধুর মর্ম্মন্তুদ বেদনা-ব্যথা অসহনীয় জ্বালাময়ী যাতনায় আকাশ বাতাস পর্য্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। পশ্চিমের বিষ-বাষ্প পৃথিবীর পূর্ব্ব প্রান্ত সংক্রামিত হইয়াছে। মানুষ মানুষের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া আপন বিশ্বগ্রাসী লালসার লেলিহান অগ্নিশিখার ইন্ধন জোগাইতেছে। মানুষের খাদ্যে বিষ মিশাইয়া সেই বিষবিক্রয় লব্ধ অর্থে মানুষ আপন বিলাস ব্যসনের উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, ঔষধ নাই, শ্মশানে প্রেতের তাণ্ডব, পিশাচের অট্টরোল, অস্থিমাংস-লোভী শৃগাল কুক্কুরের কোলাহল, নিরুপায়ের ক্রন্দন আচ্ছন্ন করিয়াছে। ভূরীভারপ্রপীড়িতা ধরিত্রী পবিত্রাহি চীৎকার করিতেছেন। ভগবান কি ভাবাবতরণে অবতীর্ণ হইতেছেন? আজিও বোধ হয় কোন উৎসব হইবে না। অন্ধকারে আবৃত আকাশ, শ্মশান-ধূমে অবলুপ্ত দিগ্‌দৃশ্য। কোথায় কোন্ রুদ্ধ মনোগৃহে, কোন্ ভাগ্যবতীর অন্ধকার অন্তঃকরণ আলোকিত করিয়া তিনি আবির্ভূত হইবেন কেহ জানেনা। নবজলধর-শ্যাম শিশু, শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গসুশোভিত উন্নত চতুর্ভুজ, মস্তকে বৈদূর্য কিরীট, উদ্ভাসিত জ্যোতিমণ্ডলে প্রফুল্লিত অনিন্দ্যসুন্দর বদন কমল, অঙ্গে মণিমাণিক্যের ভূষণ-রাজি, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্নিত চরণ কমলে পৃথিবী স্পর্শ করিয়া অভয় কণ্ঠে উচ্চারণ করিতেছেন—"অয়মহং ভো" আমি আসিয়াছি। যেন শুনিতে পাইতেছি—

যদাযদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

কবিধর্ম ও যুগধর্ম

ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশ গুপ্ত এম্-এ, পি-আর-এস্, পি-এইচ-ডি

সাহিত্যের আলোচনা করিতে গিয়াও একটি বিশ্বাস আজকাল বহু চিন্তাশীলের মন অধিকার করিয়া আছে,—সে বিশ্বাসটি এই যে, আমাদের ব্যক্তিসত্তা আমাদের সমাজ-সত্তারই অন্তর্ভূত! ইতিহাসের ক্রমবিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চলিতেছে এই সমাজ-সত্তার ক্রম-বিকাশ। সাহিত্য বা অন্যান্য শিল্পকলার ভিতর দিয়া এই সমাজসত্তাই বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিসত্তার ভিতর দিয়া কেন্দ্রীভূত ভাবে প্রকাশ লাভ করে। সুতরাং এই বৃহত্তর সমাজ-সত্তাকে জুড়িয়া যে ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্ত্তনের ধারা প্রবাহিত হয় আসলে তাহাই নিয়ামক। সকল সাহিত্য এবং শিল্পের নিয়ামক হইয়া দাঁড়ায়। এই বিশ্বাসের উপরেই প্রতিষ্ঠিত আর একটি মতবাদ,—

আমরা বলি, কবিধর্ম স্বসম্পূর্ণ আত্মনিষ্ঠ কোন ধর্ম নহে, উহা তাহার সকল উপজীব্য গ্রহণ করে যুগধর্ম হইতে, অতএব সে যুগধর্মেরই অঙ্গীভূত।

কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ব্যক্তিজীবন ও সমাজ-জীবনের ভিতরকার এই অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ এবং ব্যক্তিজীবনের ক্রমবিকাশের উপরে ইতিহাসের নিয়ন্ত্রণকে অনেকখানি মানিয়া লইলেও প্রতিভার ক্ষেত্রে ইতিহাসের এই নিয়ন্ত্রণকে সম্পূর্ণ মানিয়া লইতে প্রস্তুত নই। সাহিত্য-সৃষ্টির পশ্চাতে এইজন্য আমরা দুইটি শক্তিকে স্বীকার করিতে চাই,—একটি ইতিহাসের আবর্ত্তন—যাহা সাধারণ ব্যক্তিজীবনগুলিকে বৃহত্তর সমাজজীবনের সহিত একটা বিশেষ প্রবাহে বিশেষ পরিণতির দিকে টানিয়া লইতেছে, অপরটি প্রতিভা—যাহা এই বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রবাহের মাঝখানে একান্ত একটা খাপছাড়া কিছু না হইয়াও নিজের স্বাতন্ত্র্যের মহিমা প্রকাশ করে। ইতিহাসের সহিত প্রতিভার যোগ অনেক রহিয়াছে, কিন্তু তাহার স্বাতন্ত্র্য এইখানে যে সে ইতিহাসের সহিত যুক্ত থাকিয়াও ইতিহাস ছাড়াও অনেকখানি।

সকল যুগের সকল বিরাট প্রতিভাকেই যে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে মাপিয়া তোলা যায় একথা স্বীকার্য নহে। রবীন্দ্রনাথের সকল সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতর দিয়া যে ব্যক্তিপুরুষটি নিজেকে অজস্রভাবে প্রকাশ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বাঙালীর সমাজ-জীবনের কোন যোগ নাই, এমন কথা কেহই বলিবে না। ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে হয়ত দেখিতে পাইব, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর বৃহত্তর সমাজ-জীবনের অনেক ধর্ম কেন্দ্রীভূত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের কবি ধর্মের ভিতর দিয়া, কিন্তু সেইগুলি রবীন্দ্রনাথের সবটা, একথায় মন কিছুতেই সায় দিতে চায় না। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন,—"আমরা যে ইতিহাসের দ্বারাই একান্ত চালিত, একথা বারবার শুনেছি, এবং বারবার ভিতরে ভিতরে খুব জোরের সঙ্গে মাথা নেড়েছি। এ তর্কের মীমাংসা আমার নিজের অন্তরেই আছে, যেখানে আমি আর কিছুই নই কেবলমাত্র কবি। যেখানে আমি সৃষ্টিকর্ত্তা, সেখানে আমি একক, আমি মুক্ত। বাহিরের ঘটনাপুঞ্জের দ্বারা জালবদ্ধ নই।...... .....

.. আমি মনে ভাবতুম সকালবেলার এই আনন্দের অভ্যর্থনা সকল বালকেরই মনে আগ্রহ জাগাত। এই যদি সত্য হত তাহলে সর্বজনীন বালকস্বভাবের মধ্যে এর কারণের সহজ নিষ্পত্তি হয়ে যেত। আমি যে অন্যদিক থেকে—এই অত্যন্ত ঔৎসুক্যের থেকে বিচ্ছিন্ন নই, আমি যে সাধারণ, এইটে জানতে পারলে আর কোন ব্যাখ্যার দরকার হত না.........।

স্কুল থেকে এসেছি সাড়ে চারটের সময়। এসেই দেখেছি আমাদের বাড়ীর তেতালার ঊর্ধ্বে ঘন নীল মেঘপুঞ্জ, সে যে কী আশ্চর্য দেখা। সে একদিনের কথা আমার আজও মনে আছে কিন্তু সেদিনকার ইতিহাসে আমি ছাড়া কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই মেঘ সেই চক্ষে দেখেনি এবং পুলকিত হয়ে যায় নি। এইখানে দেখা দিয়েছিল একলা রবীন্দ্রনাথ। ......আমি একদা যখন বাঙলা দেশের নদী বেয়ে তার প্রাণের লীলা অনুভব করেছিলুম তখন আমার অন্তরাত্মা আপন আনন্দে সেই সকল সুখদুঃখের বিচিত্র আভাস অন্তঃকরণের মধ্যে সংগ্রহ করে মাসের পর মাস বাঙলার যে পল্লীচিত্র রচনা করেছিল তার পূর্বে আর কেউ তা করেনি। কারণ, সৃষ্টিকর্তা তাঁর রচনাশালায় একলা কাজ করেন।"

কিন্তু তাই বলিয়া সাহিত্যরচনায় রবীন্দ্রনাথ যে একেবারেই একক, ইতিহাস যুগধর্মের সহিত তাঁহার কবিধর্মকে যুক্ত করিয়া তাঁহার কবিপ্রতিভাকে যে কোথাও নিয়ন্ত্রিত করে নাই একথাও সত্য নহে। তাহার প্রমাণ মিলিবে রবীন্দ্রনাথেরই একটি কবিতার ভিতরে—

আমি নারব মহাকাব্য-সংরচনে
ছিল মনে,
ঠেকল কখন তোমার কাকন কিংকিনিতে
কল্পনাটি গেল ফাটি হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে কানায় কানায়।
আমি নারব মহাকাব্য-সংরচনে
ছিল মনে।

—ক্ষণিকা, ক্ষতিপূরণ।

ইহাকে শুধু কবিধর্মের বৈশিষ্ট্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে চলিবে না; সেই কবিধর্মের সহিত যুক্ত হইয়া রহিয়াছে যুগধর্ম।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন ওঠে। প্রথম প্রশ্ন এই আমরা আজকাল সাহিত্যের ভিতরে যে যুগধর্মের কথা বলিতেছি এই যুগধর্ম কাহাকে বলিব? আমাদের যুগের বাহন উড়োজাহাজ, তাহার গতি বাড়িয়াই চলিয়াছে। রাষ্ট্রিক, আর্থিক এবং সামাজিক বিপর্যয় এবং তাহার ফলে বৃহত্তর সমাজ-জীবনের বিক্ষোভ লাগিয়াই আছে। এই বিক্ষোভের ছোটবড় প্রত্যেকটি আলোড়নের নিরন্তর দোলা এবং তাহার ফলে যে ফেনায়িত বাক্যবিচ্ছুরণ তাহাকেই কি যুগ-সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? তাহা হইলে যুগের পরিমাণ সীমা এবং ধর্ম নির্ণীত হইবে কি প্রকারে? অত্যাধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজ এই প্রশ্নটাই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে, কারণ আমাদের কঠোর যুগানুগত্যের ফলে আমাদের সাহিত্য যে যুগ-সাহিত্য না হইয়া ক্ষণভঙ্গুর সাময়িক সাহিত্য হইয়া উঠিতেছে না, এ জিনিষটি সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

ইতিহাস-নিয়ন্ত্রিত যুগধর্ম কথাটার ভিতরেই স্বভাবত একটা অস্পষ্টতা এবং অপরিচ্ছন্নতা রহিয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহার কোন লাক্ষণিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা সহজ নয়। এখানে আমাদের সহায়ক প্রতিভা, তাহার এমন একটা শক্তি আছে যে বুদ্ধিগ্রাহ্য কোন লাক্ষণিক সংজ্ঞা ব্যতীতই সে যুগধর্মকে চিনিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইতে পারে, অথবা বলা যায় যে, সে সর্বদা এত জাগ্রত এবং অবহিত যে যুগধর্মের স্পন্দনগুলিকে সে আপনা হইতেই সর্বদা গ্রহণ করিতে পারে। এই স্পন্দন যে পর্যন্ত কবিচিত্তের ভিতর দিয়া কবি বিবক্ষারূপে কোন একটা বিশেষ রূপ গ্রহণ না করে সে পর্যন্ত সে একটা সাময়িকতার মত্ততাকেই বহন করে,—সেই সাময়িক মত্ততাকে আধুনিকতা বলিয়া ভুল করিবার একটা আকাঙ্ক্ষা সব সময়েই রহিয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, সাহিত্যের আকৃতি এবং প্রকৃতি যদি দেশ-কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এতখানি পরিবর্তনশীল হয়, তবে কি সাহিত্যের শাশ্বত স্বরূপ বলিয়া কোন জিনিস নাই?

সাহিত্যের এই শাশ্বত স্বরূপ বলিতে আমরা কি বুঝি? তাহা দ্বারা যদি এই কথাই বলা হয় যে, প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক সাহিত্যেরই দেশকালপাত্র-নিরবচ্ছিন্ন একটি সর্বজনীন এবং সর্বকালিক রূপ রহিয়াছে তবে সে কথা কেহই অস্বীকার করিবে না।

সাহিত্যের সাধারণীকৃতির ভিতরেই এই সর্বজনীনতা এবং সর্বকালিকতার লক্ষণ নিহিত রহিয়াছে, ইহা যেখানে নাই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের—যুগের সহিত যুগের যোগের অভাবে 'সাহিত্য'ই গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু সাহিত্যের শাশ্বত-স্বরূপ কথাটার পশ্চাতে প্রায়ই আমাদের গতিবিরোধী স্থিতিশীল মনোবৃত্তির পরিচয় মেলে। আমরা সাহিত্যের শাশ্বতরূপ আবিষ্কার করিয়াছি কথার দ্বারা যখন ইহাই মনে করিয়া থাকি যে সাহিত্যের অনড় স্বরূপ সত্যটিকে আমরা একেবারে পাকিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছি, তখন বলিব,— সেখানে আমরা সাহিত্যের মৃত্যুবাণ আবিষ্কার করিয়াছি। এক্ষেত্রে আমরা বের্গসঁর (Bergson) মতন সম্পূর্ণরূপে গতিবাদী। মানুষের জীবনের সত্য যেমন কোথাও স্থির হইয়া দেখা দেয় না, জীবন-ধারার নিরন্তর আবর্তনের ভিতর দিয়া সে-সত্য যেমন নিরন্তর "হইয়া" উঠিতেছে, সাহিত্যের সত্যও তেমনি নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথ্বীর বুকে নিত্য নব সৃষ্টির ভিতর দিয়া "হইয়া" উঠিতেছে। এই অখণ্ড প্রবাহের সহিত যুক্ত হইয়া জাগে যে সমগ্র দৃষ্টি তাহার কাছেই ধরা পড়ে সত্যের সন্ধান, আর কোন বিশেষ দেশকালে দাঁড়াইয়া যা কিছু খণ্ডদৃষ্টি তাহাই মিথ্যা। এই জন্যই সাহিত্যের শাশ্বত সত্য "এই"—এবং যুগে যুগে দেশে দেশে তাহার "এইই" হওয়া উচিত তাৎপর্যক্রিয়া এমন কথা বলিতে যাইবার কোন সার্থকতা নাই। সাহিত্যের মন্দিরে কোনদিন কোন অচল দেবতার প্রতিষ্ঠা চলিবে না, তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে গেলেই সে মন্দিরের বাহিরে আসিয়া মহাকালের রথে নিরুদ্দেশ যাত্রা আরম্ভ করিবে,—দুর্বার তাহার সেই আনন্দ-যাত্রা; প্রাণহীন পাষাণ প্রতিমাকেই মন্দিরের স্বর্ণাসনে অচল করিয়া বাঁধা চলে, প্রাণ-চঞ্চল দেবতাকে নহে।

বাহন

অধ্যাপক শ্রীশুকদেব সেন গুপ্ত এম-এ

উত্তর ও পশ্চিম ভারতে ভ্রমণের সময়ে দেখিয়াছি ও দেশের লোকেরা মহাবীর বা হনুমানজীর পূজা করে। অনেক জায়গায় দেখিয়াছি প্রায় প্রতিগ্রামেই একটি হনুমানের মন্দির। বীর্য ও বিনয়ের সুন্দর সমন্বয় হনুমানের ভিতর পাওয়া যায়, সুতরাং তিনি পূজা পাইবার অযোগ্য নহেন। কিন্তু তবু তখন এই পূজার ব্যাপারটি একটু অদ্ভুত লাগিত। মনে ভাবিতাম হনুমান ত দেবতা নন, হনুমানকে ভগবান রামচন্দ্রের বাহন বলা যাইতে পারে। দেবতার পূজা স্বাভাবিক কিন্তু দেবতার বাহনের পূজার সার্থকতা কি? বাহনপূজার রহস্য তখন ঠিক বুঝি নাই। কিন্তু এখন মনে হয় বাহনপূজা খুবই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। বাহনতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব মূলে প্রায় একই।

বাহন বলিতে আমাদের মনে হয় সরস্বতীর বাহন হংস, দুর্গার বাহন সিংহ, কালীর বাহন স্বয়ং মহাদেব শিব। সরস্বতী, দুর্গা প্রভৃতির বাহনরূপে কেন হংস সিংহ প্রভৃতির কল্পনা করা হইল সাধারণতঃ সকলের ধারণায় ব্যাখ্যা

দিয়া থাকেন। আমরা উহার ভিতরে এখন প্রবেশ করিব না। যাহাদ্বারা কোন কিছু বাহিত বা প্রকাশিত হয় আমরা তাহাকেই সেই জিনিষের বাহন বলিতে পারি। ইংরাজী তর্জমায় বাহনের অর্থ 'Medium of expression'; যে তত্ত্ব বা যে দেবতা যাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হন তিনিই সেই দেবতার বাহন। তাই যে সাধক যে দেবতার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে চান, যে দেবতাকে নিজের ভিতরে প্রকাশিত দেখিতে চান, তাহাকে সেই দেবতার উপযুক্ত বাহনরূপে নিজেকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। মলিন কাচের মধ্য দিয়া আলোর প্রকাশ সুন্দর হয় না। প্রকাশের যন্ত্রটি, বাহনটি যত সুন্দর হইবে ভিতরের দেবতার প্রকাশও ততটা সুন্দর ও সার্থক হইবে। অন্তরের দেবতা ত আবির্ধর্মী; তিনি ত প্রকাশ পাইতে চান, ভিতরের 'সোনার আলোর কমল কলিকাটি' সহস্রদলের মত ফুটিয়া উঠিতে চায়, কিন্তু আমরা যে তাহাকে গভীর কালো পদায় ঘিরিয়া রাখিয়াছি। এই আবরণ যত দূর হইবে, হৃদয় যত স্বচ্ছ হইবে দেবতাও তত প্রকাশিত হইবেন।

সবরকমের সঙ্গীত একই যন্ত্রে ভাল ফোটে না। আবার সুরের তারতম্যের জন্য যন্ত্রটিকে বিভিন্ন ঘাটে বাঁধিয়া নিতে হয়। তেমনি বিভিন্ন দেবতাতত্ত্বের প্রকাশের জন্য বিভিন্ন রকমের হৃদয়যন্ত্রের আবশ্যক। যিনি যে তত্ত্বের সাধনা করিবেন তাহাকে সেই তত্ত্ব প্রকাশের অনুকূল করিয়া নিজেকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। সব রকমের কামনা বাসনা সব 'অহং' 'মম' ভাব একেবারে দূর করিয়া মনকে শূন্যে শ্মশানে পরিণত করিতে পারিলেই শ্মশানবাসিনী শ্যামার আবির্ভাব সম্ভব হয়। চিত্তভূমি শ্মশানে পরিণত হইলে আত্মা শবরূপে, স্থির অচঞ্চল শিবরূপে দেখা দেন। স্থির শিবের আধারেই শিবানীর প্রকাশ। সকল ক্রিয়া সকল শক্তির মূল কারণ সেই ইচ্ছাময়ীকে জানিতে হইলে সাধককে শিবত্বলাভ করিতে হইবে। শিব না হইলে শিবানীকে পাওয়া যায় না। শ্রীরামচন্দ্র বীর ও ত্যাগী, সত্যনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ, প্রেমিক ও ভক্ত; রামচরিত্রে বজ্রের কঠোরতা ও কুসুমের কোমলতা উভয়ই পাওয়া যায়। রামচন্দ্রের উপযুক্ত বাহন মহাবীর হনুমান। হনুমান তেজস্বী, হনুমান বীর—সাগর পর্ব্বত রাক্ষস কাহারও কাছে তিনি নত হন নাই। আবার হনুমান সাধক, হনুমান ভক্ত, যেখানে যেখানে 'রঘুনাথ-কীর্ত্তন' সেখানে সেখানেই তিনি 'কৃতমস্তকাঞ্জলি বাষ্প-বারিপূর্ণলোচনে' উপস্থিত। যে সাধক সর্ব্বক্ষণ শ্রীরামচন্দ্রকে নিজের বুকের ভিতরে নিজের অন্তরে উপলব্ধি করিতে চান তাহাকে ঐ মহাবীরের মত উপযুক্ত বাহন হইতে হইবে। মহাবীরের পূজা তাই রামচন্দ্রের সাধকের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

এ সব সাধন জগতের কথা, সাধন জগতের তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করা এখানে সম্ভব না, এবং সে ক্ষমতাও আমার নাই। ভাবিয়া দেখিলে মনে হয় সাধকই যে শুধু দেবতার বাহন তাহা ত নয়. এই বিশ্বজগতই যে বিশ্বদেবতার বাহন। নন্দনদাগিরিবনশোভিত এই বিচিত্র ধরণী, এই জীবজগত, মানুষ, মানুষের সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতি, মানুষের ভাষা সাহিত্য শিল্পধর্ম—এই সকলের ভিতর দিয়াই যে এক বিশ্বদেবের বিচিত্র প্রকাশ। এই ধরণীর ধূলিকণা, ঐ অসীমপ্রসার আকাশের নক্ষত্ররাজি—এই ভূর্ভুবঃস্ব এই সব ব্যাপিয়া ও সব অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন এক সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ সহস্রপাদ বিরাট পুরুষ। আকাশের তারাগুলি তাঁহারই দীপালি রচনা করে, বাতাসের তরঙ্গ তাঁহারই গান গায়। সরিৎ সমুদ্রে তাঁহারই গতির প্রকাশ; পাষাণের স্তূপের

মধ্যে তাঁহারই জমাটবাঁধা শক্তি, জীব জগতের মধ্যদিয়া তাঁহারই অফুরন্ত জীবনধারা অবিরাম ঝরিয়া যাইতেছে। মানুষের মন—তাহার জ্ঞানবিজ্ঞান সাহিত্যকলা—ইহার মধ্যদিয়া সেই অসীম ধীশক্তির ঈষৎ স্ফুরণ। ফুলের সুষমা ও শিশুর হাসিতে তাঁহারই স্নিগ্ধ কান্তি। মাতৃহৃদয় গোমুখী হইতে তাঁহারই করুণাগঙ্গার ধারা। আবার যাহা কিছু ভীষণ ও রুদ্র তাহাও তাঁহার অমঙ্গল নাশের রূপ মাত্র। যাঁহার এক হাতে খড়্গ তাঁহারই অন্যহাতে বরাভয়। রুদ্রের দক্ষিণমুখ কল্যাণপ্রদ মুখখানি দেখিয়া লইতে পারিলে রুদ্রকে চিনিয়া লইতে ভুল হয় না। এই *বিরাট বিচিত্র জগত সেই জগন্নাথের রথ।* বিশ্ব বিশ্বদেবের বাহন। কিন্তু এই রথ, এই বাহন ত পূর্ণাঙ্গ নয়। কত অপূর্ণতা কত ত্রুটি কত বেদনা ব্যর্থতার গ্লানি ইহার সর্ব্বাঙ্গে। অপূর্ণতা আছে বলিয়াই ত জগতের গতি। জগতের সব গতি সব পরিবর্ত্তনের লক্ষ্যই জগতকে উপযুক্ত রূপে উপযুক্ত বাহনে পরিণত করা। সব পরিবর্ত্তন বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া জগত ঐ এক লক্ষ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে।

মনের জগত ও বস্তুর জগত যেন হাত ধরাধরি করিয়া চলে। যাহা মনোজগতে ঘটে তাহারই অনুরূপ ঘটনা বস্তু জগতে ঘটে, যাহা বস্তু জগতে ঘটে তাহারই ছবি যেন মনোজগতে ফুটিয়া ওঠে। ভাব জগতের ইতিহাস ও বাস্তব জগতের মূল সুর যেন একই। ভাবের গতি সত্যের দিকে, কিন্তু এই গতি চলে আঁকাবাঁকা পথে, নানা বিরুদ্ধাত্মক অদ্ধ সত্যের সমন্বয় সাধনের ভিতর দিয়া পূর্ণ সত্যের দিকে ইহার অভিযান। জীবননদীর আঁকাবাঁকা ঘাটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব ঘাটের কড়ি কুড়াইয়া সত্যের থলিটি পূর্ণ হয়। কোন ঘাটই মিথ্যা নয়, কোন কড়িই তুচ্ছ নয়। এই পথ চলাই জীবন, এই কড়ি কুড়াইবার ইতিহাসই সত্যের ইতিহাস। বাস্তব জগতের ইতিহাসও তাই। বিশ্বের বিবর্ত্তনও চলিয়াছে আঁকাবাঁকা পথে, ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যদিয়া অপূর্ণ হইতে পূর্ণের দিকে। মানস জগতের ও বাস্তব জগতের মূলসুর যেন একই ঘাটে বাঁধা। ভাবের প্রকাশ রূপে বাস্তবে; আবার বাস্তবের আত্মার সন্ধান পাই ভাবে। ভাব হইতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসাই ইতিহাস। কবির দৃষ্টিতে সাধকের মানসপটে যে রামতত্ত্ব দেখা দিল তাহাই রূপ নিল ঐতিহাসিক রামচন্দ্রের ভিতরে। ভক্তহৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব ও লীলারই প্রকাশ যেন ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে। এ যুগে দক্ষিণেশ্বরের সাধক সর্ব্বধর্মসমন্বয়ের যে ছবি দেখিলেন *ধ্যাননেত্রে তাহাই বোধহয় রূপ নিতেছে বর্ত্তমান কালে।* যুগনেতার দৃষ্টিতে যুগের ছবি ফুটিয়া ওঠে। মানবমনের গতি ও পরিণতির ইতিহাসের মধ্যেই বিশ্বের ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায়। ইতিহাসের তাৎপর্য্য তত্ত্বে, তত্ত্বের বাস্তব রূপ ইতিহাসে।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন আমাদের এই ধরণী নাকি একদিন এক নীহারিকার বক্ষে লীন হইয়া ছিল। মানুষ তাহার সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি লইয়া নিদ্রিত ছিল ঐ নীহারিকারই বুকে। নীহারিকাসাগরে শুরু হইল শক্তির খেলা; তরঙ্গ উঠিল, কত বুদ্বুদ সৃষ্টি হইল, ছড়াইয়া পড়িল দিকে দিকে। এমনি একটি বুদ্বুদে গড়া আমাদের এই ধরিত্রী-মাতা। ধরিত্রীর বুকে ধীরে ধীরে দেখা দিল জল ও পাষাণ। ঐ নীহারিকা ব্যাপিয়া ও অতিক্রম করিয়া যে বিশ্বদেবের অধিষ্ঠান ধরিত্রীর ছোট আঁচলখানিতেও তাঁহারই আসন। ধরণীর পাষাণ আসনে ও প্রশস্ত সাগরশয্যায় নারায়ণ নিদ্রিত থাকিলেন বহুকাল। কিন্তু এই জল ও পাথর যে নিতান্তই অন্নময়, বিশ্বদেবের অপূর্ণ বাহন,—বিশ্বদেবের অনন্ত সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য প্রকাশে অক্ষম। অন্নময়ের পরে আসিল প্রাণময় বাহন। পর পর দেখা

দিল মীনকূর্মবরাহ নানারকমের জীব। জীবজগতে কত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইল। মদোন্মত্ত হস্তী, গর্বিত কেশরী, রঙীন প্রজাপতি, শিস্ দেওয়া দোয়েলশ্যামা। বিচিত্র, সুন্দর। কিন্তু এও অপূর্ণ। পাখী তাঁহারই গান গায়, কিন্তু জানে না সে কাহার গান গায়—প্রজাপতি তাঁহার পোষাক পরে, কিন্তু জানে না সে কাহার পোষাক। বিশ্বদেব তাঁহার লীলায় চাহিলেন এমন বাহন যে জানিবে এবং বুঝিবে সে কে এবং কি করিতেছে। তাই আসিল মনোময় সত্তা নিয়া মানববাহন। পশু চলিত চার পায়ে, দৃষ্টি তাহার মাটির দিকে, খাবারের অন্বেষণেই সে ব্যস্ত। মানুষ তাহার নূতন সম্পদ মন লইয়া দু'পায়ে দাঁড়াইল, তাহার দৃষ্টি গেল সম্মুখে বহু দূরে অসীম আকাশে। সে বিস্মিত চোখে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, এই জগতের অর্থ খুঁজিল। কিন্তু শুধু বাহিরে তাকাইয়া অর্থ মিলিল না। চোখ বুজিল, চিন্তা করিল। ধ্যানে সন্ধান পাইল সেই পরম দেবতার—বুঝিল নিজের অন্তর্যামীর সঙ্গে জগতের নিবিড় যোগ। প্রথম সন্ধানের প্রথম মিলনের আনন্দে গাহিয়া উঠিল জয়গান। ঋকসামের ছন্দে ভরিয়া তুলিল দশদিক। সেই প্রথম মিলনের দিন হইতে আজ পর্যন্ত মানবমনের এক চেষ্টা—জগতের তাৎপর্য্য খুঁজিয়া বাহির করা, বিশ্বের আত্মার সন্ধান করা।

নীহারিকা হইতে যে যাত্রা সুরু হইয়াছিল তাহার পরিসমাপ্তি কি মানবমনে? মানবমনও ত অপূর্ণ। পশুর বিবর্তন হইয়াছে মানুষে। মানুষ চলিয়াছে দেবত্বের দিকে। সাধারণ মানবীয় মন সেই অসীম শক্তি, অসীম জ্ঞান প্রকাশ করিতে অক্ষম। মাটির পৃথিবী গঙ্গার প্রপাত ধারণ করিতে পারে না। মাথা পাতিয়া ঐ বেগ ধারণ করিতে মহাযোগী মহাদেবের প্রয়োজন। মহাশক্তির নৃত্যলীলা মহাদেবের বুকেই সম্ভব হয়। বিশ্বদেবের অসীম জ্ঞান অসীম শক্তি প্রকাশের উপযুক্ত বাহনরূপে নিজেকে গড়িয়া তুলিতে চাই মানুষের সাধনা। বিধাতা গড়িয়াছেন মানুষ, এখন মানুষকেও এই ভাঙ্গাগড়া কাজে যোগ দিতে হইবে—নিজের সাধনাদ্বারা মানব নিজেকে গড়িয়া তুলিবে 'অতিমানবে' (Superman) সেই সত্যময় জ্ঞানময় আনন্দময়ের উপযুক্ত বাহনরূপে। মানুষও এখানে বিশ্বদেবের খেলার সাথী। তাহার লীলার, প্রকাশের রহস্যটি বুঝিয়া লইয়া মানুষও যোগ দিবে এই জগতের খেলায়।

শুধু মানুষের প্রাণ ও মন নয়, মনের যাহা কিছু বিকাশ—সমাজ সভ্যতা, ভাষা সাহিত্য, শিল্পকলা, ধর্ম দর্শন—এই সকলের ভিতর দিয়াই সেই একের সত্য, মঙ্গল ও সুন্দররূপের প্রকাশ। এই পৃথিবীর বুকে কত ধরণের সমাজ, কত রকমের সভ্যতার উত্থান পতন হইল, কত রাজ্য সাম্রাজ্য ভাঙ্গিল গড়িল। বাহ্য ভাবে তাহা বিশ্ব একেবারেই ভাঙ্গিয়া যায় না। তাহার সত্যটুকু সে দিয়া যায়। পুরাতন সভ্যতার সত্য নিয়া নূতনের আবির্ভাব হয়। কিন্তু সে নূতনেও অপূর্ণতা থাকে, কালে তাহাতেও ভাঙ্গন ধরে, শেষ হয়, আবার নূতন আসে। এই ভাবে পুরাণ ও নূতনের ভাঙ্গাগড়ার মধ্যদিয়া সমাজ আগাইয়া চলে পরিণতির দিকে, পূর্ণতার দিকে। পশুর বিবর্তন হইয়াছে মানুষে, মানুষ চলিয়াছে দেবতার দিকে। মনুষ্যসমাজের আদর্শ দেবসমাজে পরিণত হওয়া। সেই সমাজ সেই সভ্যতা ততখানি উন্নত, তাহা দেবতার আবির্ভাবের পক্ষে যতখানি অনুকূল। দেবত্ব-বিকাশের অনুকূল সমাজগঠন খুব সহজ কথা নয়। সমাজকে চলিতে হয় সকলকে লইয়া। সকল স্তরের সকল লোকের প্রকৃত কল্যাণের ব্যবস্থা করিতে হইবে, সকলকে অগ্রগতির পথ দেখাইয়া দিতে হইবে, চলিবার সুযোগ করিয়া দিতে

হবে। সকলকে লইয়া চলিতে হয় বলিয়াই সমাজের গতি মন্থর। ব্যক্তিবিশেষের পূর্ণতালাভ যত শীঘ্র হইতে পারে, সমাজের পক্ষে ততটা সম্ভব নয়, সমাজদেহের পূর্ণতা বহুকাল বহুযুগসাপেক্ষ।

সভ্যতার ইতিহাসের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করিলেই ব্যাপারটি বেশ বোঝা যায়। সেই আদিম প্রস্তরযুগের কাহিনী। যার জোর তারই জয়। বাহুবলের শাণিত প্রস্তরখণ্ড যত প্রখর তাহার জয়ও তত বেশী। নখদন্তের পরিবর্তে পাথর এই যা প্রভেদ। ক্রমে লৌহযুগে মানুষ কিছুটা শৃঙ্খলা ও নিয়মের অধীন হইতে শিখিল, ভাগিতে শিখিল—কিন্তু তবু তার গতি উদ্দাম। উদ্দামগতিতে যাযাবর বেদুইনের দল ছুটিয়া চলিত ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া অস্ত্র হাতে। এখানেও সেই বলেরই জয়। তারপরে আসিল কৃষি-সভ্যতা। কৃষি-সভ্যতায় নারীর দান যথেষ্ট। নারীর স্বভাব স্থিতি, যেমন পুরুষের স্বভাব গতি। নারী প্রথমে গাছ চিনিল, গাছের বীজ ছড়াইল—ছোট ছোট গাছগুলিকে শিশুর মত করিয়া পালন করিল। স্থির গাছগুলি মানুষের উদ্দাম গতিকে রোধ করিল। নদীর তীরে উর্বর ক্ষেত্রে গাছের পাশে মানুষ ঘর বাঁধিল। তারপরে নদীর তীরে শ্যামল ক্ষেত্রে বহুকাল কৃষি সভ্যতার যুগ চলিল। মানুষ সুন্দরকে বরণ করিতে শিখিল, সাহিত্য সৃষ্টি করিল, দর্শন ও ধর্মের আস্বাদ লাভ করিল। মানুষ পশুত্ব হইতে আসিয়া মনুষ্যত্বে যেন একটু স্থিতিলাভ করিল। কিন্তু ইহাতেও অপূর্ণতা রহিয়া গেল। কৃষি সভ্যতায় মানবমনের পূর্ণ বিকাশ হইল না, শক্তির পূর্ণ পরিচয় লাভ করিল না। বুদ্ধির আরও বিকাশ হইল, জড় জগতে নূতন শক্তি লাভ করিল—আসিল যন্ত্রসভ্যতার যুগ। কিন্তু যন্ত্রসভ্যতা যে শক্তি দিল তাহা ব্যবহারের সংযম মানুষ এখনও লাভ করে নাই। নূতন শক্তি পাইয়া মানুষের সুপ্ত পশুত্ব জাগিয়া উঠিল। যন্ত্রসভ্যতা হইয়া উঠিল জগদ্দলা সব কিছুকে গ্রাস করিয়া সে বাঁচিতে চায়। তাই চারিদিকে রক্তের স্রোত। ইহাও টিকিবে না। ভাঙন সুরু হইয়াছে। কৃষি-সভ্যতা ও যন্ত্রসভ্যতার যাহা শ্রেষ্ঠ যাহা সত্য তাহা লইয়া গড়িয়া উঠিবে নূতন সভ্যতা। এ ভাবে চলিবে সভ্যতার ধারা ক্রমশ পরিবর্তনের ভিতর দিয়া অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার দিকে, হিংসা হইতে প্রেমের দিকে, দ্বেষ হইতে শান্তির দিকে। আমরা আজিকার এই সঙ্কটের দিনে শুধু প্রার্থনা জানাই—"বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব, যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।"

তাহাদের সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম ও দর্শনের ভিতর দিয়াও সেই এক সত্য শিব ও সুন্দরের বিকাশ। শিল্প ও সাহিত্য সুন্দরের বাহন, রসের পরিবেশক। আর "রসো বৈ সঃ"; তিনি ত রসস্বরূপ, রসময়। তিনি যে "মাধুর্য্যলাবণ্য-রসৈকসিন্ধু।" তাঁহারই রসের অনন্তধারা আকাশে বাতাসে অবিরাম ঝরিয়া যাইতেছে। "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।" যদি এই আকাশ বাতাস এই বিশ্বনিখিল তাঁহারই আনন্দময় সত্তায় অধিষ্ঠিত না থাকিত তবে আমাদের জীবনের রস আমরা কোথা হইতে পাইতাম? তাঁহারই স্পর্শে বাতাস মধুময়, তাঁহারই স্পর্শে সিন্ধুর তরঙ্গ মধুময়, তাঁহারই স্পর্শে উষা সন্ধ্যা মধুময় তাঁহারই স্পর্শে ধরণীর ধূলি মধুময়। এই অনন্ত রসময় সত্তার যেটুকু শিল্পীর চোখে, কবির হৃদয়ে ধরা পড়ে তাহাই তাঁহারা রূপায়িত করিয়া তোলেন বর্ণেচ্ছন্দে গানে। সাহিত্য ও শিল্পের সার্থকতা এই রসের প্রকাশে ও পরিবেশনে।

দর্শন ও ধর্মের প্রধান লক্ষ্যই বিশ্বের আত্মাকে খুঁজিয়া পাওয়া। দর্শন তাঁহাকে বুঝিতে চায় বুদ্ধি দিয়া, ধর্ম তাঁহাকে পাইতে চায় সমস্ত জীবন দিয়া। মানুষ যে দিন

প্রথম বিস্মিতনয়নে জগতের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছে— ইহার অর্থ খুজিয়াছে ও জীবনে বিশ্বাত্মার অনুভূতি চাহিয়াছে সেইদিন হইতেই মানুষ দার্শনিক ও ধার্মিক। কিন্তু আংশিক অর্থ ও সামান্য অনুভূতি লইয়া দর্শন ও ধর্ম খুসী নয়। দর্শন চায় তাঁহাকে পূর্ণভাবে বুঝিতে, ধর্ম চায় তাঁহাকে পূর্ণভাবে জীবনে লাভ করিতে। এই পূর্ণভাবে জানার ও পাওয়ার সাধনা বড়ই কঠিন। কত ব্যর্থতা, বেদনার কাহিনী ইহার সঙ্গে জড়িত। কত ভ্রান্ত মত, কত অন্ধ সংস্কার, কত মিথ্যা কাহিনী মন ভুলাইয়াছে। কিন্তু আবার সে ফিরিয়া আসিয়াছে, আবার সাধনা করিয়াছে। কত আজীবনের সাধনা, কত ত্যাগ বৈরাগ্য, কত ভক্তহৃদয়ের ব্যাকুল ক্রন্দন আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু জীবনের অসমাপ্ত পূজা কিছুই ব্যর্থ যায় না। জীবনের কোন ধনই ফেলা যায় না। পূর্ণের দিকে যাহার যাত্রা পূর্ণই তাঁহার পুণ্যস্পর্শে তাহার সব অপূর্ণতা দূর করেন ; এক জীবনে না হউক, জীবনান্তরে তাহার সাধনা সিদ্ধ হয়। পূর্ণের স্পর্শ যাহারা পাইয়াছেন তাহারা আমাদের ডাকিতেছেন, পথের ইঙ্গিত দিতেছেন—আমরা সে পথে যাইব কি? বিশ্বে যে দেবতার প্রকাশ আমার অন্তরেও ত তিনি। হে মোর অন্তরদেবতা তুমি জাগো, আমাকে বাহন করিয়া তুমি প্রকাশিত হও—'পূর্ণা ভবত্বনুদিনং ময়ি তে শুভেচ্ছা।'

মাথাধরা

(নাটিকা)

শ্রীযামিনীমোহন কর

(মিঃ রজত রায় সিগারেট হাতে একটা সোফায় আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। মনে ঝড় বইছে। সিগারেট পর্য্যন্ত জ্বালতে ভুলে গেছে। দূরে আর একটা সোফায় মিস্ নন্দিতা দাস গুপ্তা একটা রুমাল নিবিষ্ট চিত্তে দেখছে। যেন রুমালটা অপূর্ব্ব, পৃথিবীতে এর জোড়া আর নেই।)

রজত—(দু'বার কেসে একটু হেসে) নন্দিতা, সিনেমা যাবে বলেছিলে চল। দেরী হয়ে যাচ্ছে যে।

নন্দিতা—সরি, কাল সকালে যখন কথা দিয়েছিলুম তখন আজ বিকেলে মাথা ধরবে সেটা জানতুম না।

রজত—মাথা ধরেছে? বাড়ীতে অ্যাস্পিরিন আছে?

নন্দিতা—থাকতে পারে। ঠিক জানি না।

রজত—আমি এখুনি গিয়ে কিনে আনছি। কি বল?

নন্দিতা—ধন্যবাদ। কোন দরকার নেই। আপনিই সেরে যাবে।

রজত—না, না। অনর্থক কষ্ট পাবে, শরীর খারাপ করবে—

নন্দিতা—আমার জন্য যে আপনি এতটা মাথা ঘামাচ্ছেন সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

রজত—বারবার কি যে ধন্যবাদ, ধন্যবাদ—

নন্দিতা—ওঃ! ধন্যবাদ জানানো যে ব্যাড্ ফর্ম সেটা জানতুম না।

রজত—আহা, আমিতো তা বলিনি—

নন্দিতা—আপনি তা বলেন নি। তবে আমারই ভুল হয়েছে।

রজত—অনর্থক কষ্ট পাবে তাই বলছিলুম—

নন্দিতা—অনর্থক! মানে আমার মাথাব্যথা মিথ্যা!

রজত—মাইগড। কি বলছ? আমি শুধু জানতে চাইছি যে তোমার মাথা ধরেছে—

নন্দিতা—ভুল বকছি বুঝি। মাথা ধরেনি মিথ্যে করে বলেছি—

রজত—না না, তা কেন? জিজ্ঞেস করছি চটকরে গিয়ে দুটো এস্পিরিন এনে দেব।

নন্দিতা—আপনার যখন চট করে যেতে ইচ্ছে করছে তখন আমি জোড় করে আটকে রাখব কেন?

রজত—সব কথায় আজ ও রকম করছ কেন?

নন্দিতা—কি রকম করছি?

রজত—কি হয়েছে?

নন্দিতা—জানি না।

রজত—সমস্ত বিকেলটা পেঁচার মত মুখ করে বসে আছ। কথা কইছ না।

নন্দিতা—কি করব বলুন। ভগবান যদি পেঁচার মত মুখ দিয়ে থাকেন। বড়ই দুঃখিত যে আপনার অমূল্য সময় আমার জন্য নষ্ট হচ্ছে। ফরগুড্‌নেস সেক বোর্ড (bored) ফীল করেও এখানে বসে থাকবেন। যেখানে আনন্দ পাবেন সেইখানে যান।

রজত—বোর্ড হতে যাব কেন? অন্য কোথাও আমি যেতে চাই না।

নন্দিতা—কিন্তু পেঁচামুখীরা তো আপনাকে আনন্দ দিতে পারবে না।

রজত—আমি তো তা বলিনি। কি হয়েছে বলনা।

নন্দিতা—কি বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না। কিসের কি হবে?

রজত—বুঝতে বিলক্ষণ পারছ। আমি কিছু অন্যায় করেছি?

নন্দিতা—আপনার কার্য্যের বিচার করবার অধিকার আমার নেই।

রজত—ওরকম ভাবে কথা কইছ কেন?

নন্দিতা—কি রকম ভাবে?

রজত—আজ সকালে টেলিফোন করতে তুমি ঠিক এইরকম ফোঁস করে উঠলে।

নন্দিতা—কি বল্লেন? আমি ফোঁস করি—সাপ—

রজত—না, না, আমি তা মীন করিনি।

নন্দিতা—ওঃ আপনি যা বলেন তা মীন করেন না। দেখুন আমার পেঁচা সাপ ইত্যাদি মধুর সম্বোধন শোনার অভ্যাস নেই।

রজত—আমি তো বলছি আমি তা মীন করিনি। সরি, ক্ষমা কোরো—

নন্দিতা—ক্ষমা চেয়ে অপরাধী করবেন না। তা ছাড়া আমার কাছে আপনি ক্ষমা চাইবেন কেন? ইট ডজ্‌ন্ট মেক এনি ডিফারেন্স আট অল।

রজত—তুমি আমার উপর রাগ করেছ।

নন্দিতা—কেন?

রজত—আমিও তো তাই জানতে চাই, কেন? আমি কি করেছি? টেলিফোন ধরে একটা কথাও না বলে তুমি রেখে দিলে।

নন্দিতা—আমার কিছু বলার ছিল না। অনর্থক আপনার কাজের এবং সময়ের ক্ষতি করাটা আমি অনুচিত মনে করলুম। শেষে শুনতেই হত যে আমার জন্য আপনার কাজকর্ম্মের ব্যাঘাত হয়।

রজত—আমি তা কোন দিন বলেছি?

নন্দিতা—বলতে কতক্ষণ?

রজত—আমার কোন কথাই তোমার ভাল লাগছে না। আমাকে কি তুমি চলে যেতে বল?

নন্দিতা—আমি কিছুই বলি না; আপনার যা ইচ্ছে আপনি করতে পারেন। অন্য কোন বেটার (better) জায়গায় যেতে ইচ্ছে হলে আমি নিশ্চয়ই আপনাকে বাধা দেবো না। মিস রমলা দাসের বাড়ী যান না। সেও আপনাকে পাবে, আপনিও পাবেন।

রজত—আমি সেখানে যেতে চাই না। সে মেয়েটা যা —

নন্দিতা—ওঃ!

রজত—আই হেট হার।

নন্দিতা—কাল মিসেস দে'র বাড়ীতে সে রকম কোন পরিচয় তো পাইনি। ঘৃণা আর ভালবাসার মধ্যে তফাৎটা বড্ড কম।

রজত—কাল ওর সঙ্গে কেন কথা বলছিলুম জান?

নন্দিতা—ভাল দেখতে বলে।

রজত—ভাল খারাপ জানি না। তার ভাই, যে মারা গেছে, সে আমার ক্লাস ফ্রেণ্ড ছিল। সেই সূত্রে সে যখন কথা কইতে এল —

নন্দিতা—তখন আপনিও গলে গেলেন।

রজত—তখন আমারও কথা বলতে হ'ল। তাছাড়া তখনও তুমি এসে পৌঁছওনি। তুমি আসতে আমি যখন গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম—'নন্দিতা, কখন এলে?" তুমি শুধু "এক্ষুণি" বলে অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে গেলে।

নন্দিতা—সত্যি কথাই বলেছিলুম। আর আপনার নাইস টাইমটাকে ইনট্রুড করে নষ্ট করতে চাইনি।

রজত—নাইস টাইম না ছাই। পালাতে-পারলে-বাঁচি-ভাব।

নন্দিতা—পালাবার বিশেষ চেষ্টা করছিলেন বলে তো আমার মনে হয় নি।

রজত—সে যে ছাড়তে চায় না। শী ইজ এ ফুল।

নন্দিতা—ফুল তা যে একটু বোঝবার বুদ্ধি আপনার আছে। তার সম্বন্ধে আমার তো [illegible] একটি ধারণা। লোকেও তাই বলে।

রজত—তুমি যে পার্টিতে যাবে, রমলাকে সেখানে আর কেউ সুন্দরী বলতে পারবে না।

নন্দিতা—ওর কি রকম থ্যাবড়া নাক দেখেছেন? বেচারীর জন্য দুঃখ হয়।

রজত—হাঁ, একেবারে খাঁদা। তোমার নাকটি কিন্তু ভারী চমৎকার।

নন্দিতা—যান, কি বাজে কথা কইছেন।

রজত—না, সত্যি। যেমন চোখ পটল-চেরা তেমনি টিকোলো নাক, তুলি দিয়ে আঁকা ভ্রূ, পাতলা গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁট—

নন্দিতা—আঃ কি যাতা বকেন।

রজত—পৃথিবীতে কে সব চেয়ে সুন্দরী জান?

নন্দিতা—না। কে? রমলা?

রজত—রমলা না ছাই। রমলা তোমার পায়ের নখের সমকক্ষ নয়। আমার চোখে তুমি পৃথিবীর সেরা। কাল সমস্ত রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। সকালে উঠেই টেলিফোন করলুম, তুমি চটে আছ দেখে আপিসে কোন কাজ ঠিক মত হল না। সোজা সেখান থেকে তোমার কাছে এসেছি, আর তুমি—

নন্দিতা—(দাঁড়িয়ে) ছটা যে বাজে। কখন সিনেমা যাবেন।

“জ্বালো আগুন জ্বালো”

ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম-এ, পি-এইচ্-ডি. ডি-লিট; সি-আই-ই

এই হয়েছে ভালো
জ্বালো আগুন জ্বালো,
ভুবনখানি ভস্ম করে
অগ্নিধারা ঢালো।
লক্ষপতির প্রাসাদ যত
হোক্ না ভস্ম পড়ে,
যাক্ না পুড়ে দীনহীনের
লক্ষ কোটি কুড়ে।
যাক্ না পুড়ে বৃদ্ধ যত
পুড়ুক শিশু সদ্য,
পুড়ুক পোচ, পুড়ুক নবীন
মহাকালের বধ্য।
পুড়ুক যত বেদবেদান্ত
পুড়ুক সর্ব্বশাস্ত্র,
পুড়ুক যত প্রাচীন প্রমাণ
বুদ্ধ-স্মরণ-পাত্র।
ভূগর্ভেরই তৈল পুড়ুক
কয়লাভরা খনি,
ভুবনভরা শস্য পুড়ুক
পুড়ুক হীরক মণি।
বিজ্ঞানেরই যন্ত্রশালা
যাক্ না বোমায় উড়ে,
লাইব্রেরী আর শিল্পশালা
বিশ্ব ভুবন জুড়ে।

লক্ষ লক্ষ মানুষ মরুক
হোক্ না খোঁড়া নুলো,
রাজধানী আর হর্ম্ম্য কানন
হোক্ না ধূলোর ধূলো।
রসাতলে যাক্ না ডুবে
সঞ্চিত সব খাদ্য,
জগৎ জুড়ে বাজুক শুধু
ভীষণ রণবাদ্য।
এই ভুবনে হয়নি কভু
এমনতর যুদ্ধ,
মানুষ কভু হিংসা দ্বেষে
হয়নি এত ক্রুদ্ধ।
এত বড় যুদ্ধ হোল
কি ফল হোল লব্ধ,
ধ্বংস হোল সবাই মিলে
সবাই হোল জব্দ।
কি ফল হোল এ যুদ্ধেতে
থাক্ সে কথা রুদ্ধ,
হয়নি কভু ইতিহাসে
এমন বড় যুদ্ধ।
জেতা-হারার প্রশ্ন নিয়ে
ইতিহাসের বক্ষে,
হবে এমন ভীষণ তর্ক
থাকবে না ক রক্ষে।

ডুবলে ডুবুক এ সভ্যতা
ডুবুক জগৎশুদ্ধ,
ইতিহাসে হয়নি ত আর
এমন বড় যুদ্ধ।
এ সংগ্রামে কি উপকার
কেনই বা এ যুদ্ধ,

এ প্রশ্নই নয়ত কাজের
হোল ভীষণ যুদ্ধ।
সবাই ছিল হিংস্র ভীষণ
ছিল দারুণ ক্রুদ্ধ,
ইতিহাসে হয়নি ত আর
এমন বড় যুদ্ধ।

লতার ব্যথা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মুকুল ঝরে মুকুল ঝরে হায় রে
লতার বুকে কি দাগ রেখে যায় রে।
কত বেদন যায় সে দিয়ে
কত সোহাগ যায় সে নিয়ে
বিষাদেতে গোটা কানন ছায় রে!

২

ওই মুকুলই কুসুম হয়ে ফুটতো
হিয়ার সুবাস দুর-সুদূরে ছুটতো।
ভেঙ্গে গেল কতই আশা
কতই রুচি ভালবাসা,
ভাবতেও হায় কান্না আমার পায় রে।

৩

ছোট মুকুল—নেহাৎ ছোট হয় ত
ব্যথা তাহার কিন্তু ছোট নয় ত!
সকল ফুল ও মুকুল মাঝে
সদাই তাহার অভাব জাগে
বনস্থলী কাতর সে ব্যথায় রে।

৪

লতার কাছে কুঁড়ির নাহি জাত রে
সকল কোরক—কোরক পারিজাত রে।
এমনি মধুর মায়ের স্নেহ
সকল ছেলেই কার্ত্তিকেয়,
রূপে গুণে তিন ভুবন মাতায় রে।

আমার মা

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

সেই যে কবে প'রে'ছিলে ছিন্ন নরমুণ্ডহার—
সে ত' পচে' শুকিয়ে গেছে কবে ;
আবার তোমার নূতন পরাব, নূতন মালা পরাব,
দুরন্ত সাধ কবে পূরণ হবে?
তোমারো কি ঘটেছে, মা, শ্রান্তি অসুখ শিথিল জরার?
তৃষ্ণা কেন জাগ্‌ছে নাকো উষ্ণ শোণিত পান করার?
ফুরিয়েছে ইচ্ছা, কি, মা?
পেয়েছ কি নিজের সীমা?
তুষ্ট আছ পাপীর কপট স্তবে?
যে-আনন্দে আকাশব্যাপী হয়েছিল তোমার শরীর—
যে-আনন্দে খড়্গ তোমার চেয়েছিল সদ্য রুধির,
যে-আনন্দে বিরাট কালো
বিচ্ছুরিয়া বিদ্যুতালো
নেমেছিল মূর্চ্ছাহত কবি মানবে··
সে-আনন্দ সম্বরিয়া কেন তুমি নিষ্ক্রিয়, মা?
সরিয়ে রাখা খড়্গখানা লহ তুলে', শিবরমা ;
উড়িয়ে কেশ আকাশ ছেয়ে
এস আবার এস ধেয়ে
অনর্থকের হত্যামহোৎসবে।

যে-আনন্দে চোখের আগুন বেরিয়েছিল ছুটে' ছুটে'
যে-আনন্দে খড়্গ তোমার নেচেছিল করপুটে ;
যে-আনন্দে জিহ্বা তোমার
পিয়েছিল শোণিতধার
সে-আনন্দ নাই কি তোমার তবে?
ছিন্ন দেহের মুণ্ডমালা পরে'ছিলে তখন গলায়—
খুশী তখন হওনি' ত', মা, পূজার রক্তজবার মালায়।
অনাদির সেই আনন্দটা
জাগিয়ে আবার দেখাও ঘটা—
শেষ করার ভার আর কে বলো লবে?
সঙ্গিনী ত' অনেক তোমার, জানে তারা তোমার ধারা
সংহারিণী মূর্ত্তি তোমার পূর্ণতম ক'র্‌বে তারা ;
যোগ দেবে সেই কোলাহলে,
বিভীষিকার কুতূহলে
হত্যারঙ্গে নাচবে তারা সবে।
পরবে তুমি নূতন মালা, পুরণোটা দেবে ফেলে'—
মুণ্ড হ'তে রক্তধারা পায়ে তোমার পড়বে ঢেলে'.
পান করো' মা, আমার রুধির,
মালায় নিও আমারো শির—
মিশে যাবো শিবে এবং শবে।

☞ আগামী আশ্বিন সংখ্যা হইতে খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অনিলকুমার ভট্টাচার্য্যের উপন্যাস "উপনদী" ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে।

"হে মরণজয়ি, তোমারে প্রণাম করি"

শ্রীশৈলেশচন্দ্র রায় বি-এ

বাইশে শ্রাবণ এসেছিল একদিন—
ক্রন্দনময়ী প্রকৃতির সাথে সাথে,
কেঁদেছিল যত নিখিলের নরনারী।
মূক মানবের মর্মের বাণী, কবি,
ঝঙ্কৃত তুমি করিলে বীণায় তব,
মর্ত্তে বহালে কাব্যের সুরধুনী—
ছন্দে ও গানে ভরিলে গগনতল।
যৌবন হ'ল চঞ্চল মধুরসে,
অমৃত তুমি ক'রেছিলে বিতরণ
অকৃপণ হাতে ছোট বড় সকলেরে,
গরল যা কিছু উঠেছিল মন্থনে
নীলকণ্ঠের মত ক'রেছিলে পান।
মনের গহনে যে আঁধার ছিল জমা,
রবির কিরণে অবসান হ'ল তার।

* * *

বাইশে শ্রাবণ আজো আসিয়াছে ফিরে,
বরষে বরষে এমনি করিয়া আসে,
বার বার ক'রে স্মরণ করায়ে যায়
তুমি বেঁচে আছ। রুদ্রের কোপানলে
মদন ভস্ম হয়েছিল এক দিন—
নিখিল বিশ্বে দিকে দিকে ফুলশর
ছড়ায়ে পড়িল নর ও নারীর মনে।
মৃত্যু যে তার নাই। সময়ের বুকে
রেখে গেছ তুমি চরণ-চিহ্ন তব,
ভাস্বর হ'য়ে রবে যাহা চিরকাল।
অনাগত যুগে আসিবে ধরায় যারা,
তাদেরো নয়নে তুমি হয়ে রবে, কবি,
রহস্যে ঘেরা অনন্ত বিস্ময়!
হে মরণজয়ি, তোমারে প্রণাম করি।

রাজপরিবারের সংবাদ

স্থানীয় কলেজেব ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকগণের উপব মিলিটারিদেব অত্যাচাবেব খবর পাইয়া মাতৃশ্রী শ্রীশ্রীমহাবাণী সাহেবা দার্জ্জিলিং হইতে কুচবিহাবে আসিয়া স্বয়ং বিদ্যালয়সমূহের প্রধানশিক্ষকগণ, কলেজেব অধ্যক্ষ, জনসাধাবণেব প্রতিনিধি স্থানীয়ভদ্রমহোদয়গণ, লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভ্যবৃন্দ প্রভৃতিব নিকট হইতে ঘটনার বিববণ শ্রবণ কবেন এবং হাসপাতালে যাইয়া আহত ছাত্রগণকে পবিদর্শন কবেন। সংবাদ পাইয়া মহাবাজকুমাব শ্রীশ্রীইন্দ্রজিতেন্দ্র নারায়ণ ও শ্রীঈশবাণী সাহেবাও কুচবিহাবে আসিয়া উপস্থিত হন। পবে তাঁহাবা সকলেই দার্জ্জিলিংএ গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমহাবাজা ভূপবাহাদুব এখনও ব্রহ্মবণাঙ্গনেই অবস্থান করিতেছেন।

দেশবিদেশের কথা

মহাযুদ্ধের অবসান—

প্রায় ছয়বৎসব কাল পৃথিবীর ভীষণতম যুদ্ধ চলিবার পর সম্প্রতি তাহার অবসান ঘটিয়াছে। গত মে মাসে জার্মানীর আত্মসমর্পণেব পরই বুঝা গিয়াছিল যে মহাযুদ্ধ আর বেশীদিন চলিবে না। জাপান বিভিন্ন রণাঙ্গনে ক্রমশঃই হটিয়া যাইতেছিল। ব্রহ্মদেশে, প্রশান্তমহাসাগরে, পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জাপান উপর্য্যুপরি বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইতেছিল। গত জুলাই মাসে পটসডাম হইতে আমেরিকা, ব্রিটেন ও চীন এই ত্রিশক্তি মিলিয়া জাপানের নিকট বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ দাবী করিয়াছিল; অন্যথায় জাপানকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হইবে এই ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল, কিন্তু জাপান তাহাতেও কর্ণপাত করে নাই। কিন্তু জাপান ভিতরে ভিতবে রুশিয়াব মাবফৎ এই তিন শক্তির সহিত সান্ধ কবিবাব প্রস্তাব করে, রুশিয়া মধ্যস্থতা করিতে অস্বীকৃত হয়। তৎপব ৮ই আগষ্ট রুশিয়া স্বয়ং জাপানেব বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে। ইতি পূর্ব্বে ৬ই আগষ্ট আমেরিকা কর্ত্তৃক জাপানের হিরোসিমা বন্দরে একটী আণবিক বোমা (atomic bomb) নিক্ষেপের ফলে সমগ্র সহর একরূপ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এবং অগণিত নবনাবী, জীবজন্তু অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রুশিয়া মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া সাখালিন দ্বীপ প্রভৃতি স্থানে ব্যাপক আক্রমণ চালাইতে থাকে। ৯ই আগষ্ট আমেরিকা জাপানের নাগাসাকি সহরে দ্বিতীয় আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। এই বারে জাপান আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। জাপ-সম্রাটের

অস্তিত্ব যাহাতে অক্ষুণ্ণ রাখা হয় জাপান মিত্রপক্ষের নিকট এই আবেদন জ্ঞাপন করে, মিত্রপক্ষ হইতে জাপানের এই আবেদন গৃহীত হয় এবং জেনারেল ম্যাকআর্থারের উপর জাপান সম্পর্কে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করা হয়। গত ২রা সেপ্টেম্বর মার্কিণ যুদ্ধজাহাজ "মিসৌরিতে" বসিয়া জাপানের আত্মসমর্পণ পত্র আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরিত হইয়াছে। সকল রণাঙ্গণে যুদ্ধবিরতি হইয়াছে এবং পৃথিবী শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে।

বিলাতী নির্ব্বাচন—

বিলাতে সম্প্রতি সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া গেল। বিগত নির্ব্বাচন হইয়াছিল ১৯৩৫ সালে। যুদ্ধের দরুণ ইতিমধ্যে বিলাতে কোন নূতন নির্ব্বাচন হয় নাই। বর্ত্তমান সাধারণ নির্ব্বাচনে শ্রমিকদল অনুনিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান পার্লামেন্টে শ্রমিকদলের সদস্যসংখ্যা ৩৯০ এবং রক্ষণশীল দলের সদস্যসংখ্যা ১৯৫, অন্যান্য দলের সদস্যসংখ্যা হাতের আঙ্গুলে গণিয়া শেষ করা যায়। রক্ষণশীল দলের নেতৃগণের মধ্যে মাত্র মিষ্টার চার্চ্চিল ও মিষ্টার ইডেন ছাড়া কেহই নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই। প্রাক্তন ভারত সচিব মিষ্টার আমেরী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছেন। শ্রমিকদলের নেতা মিষ্টার এটলী ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। মিষ্টার বেভিন পররাষ্ট্র সচিব এবং মিষ্টার পেথিক লরেন্স (ইনি এক্ষণে লর্ড হইয়াছেন) ভারত-সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন।

ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাসমূহের সাধারণ নির্ব্বাচন—

ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলির সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় অনেকদিন অতীত হইয়া গিয়াছে যুদ্ধের জন্য যথাসময়ে নির্ব্বাচন হইতে পারে নাই। এক্ষণে গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে যথাশীঘ্র সম্ভব আইন সভা-সমূহের নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইবে। বিভিন্ন আইন সভা-সমূহের ভোটার তালিকা প্রণীত হইতেছে, এবং আশা করা যায় যে আগামী শীত ঋতুতে নূতন নির্ব্বাচন হইবে এবং ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে নূতন আইন সভা-সমূহের প্রথম অধিবেশন হইবে।

লর্ড ওয়াভেলের পুনরায় বিলাত গমন—

ব্রিটিশ সরকারের আহ্বানে ভারতীয় সমস্যার আলোচনার জন্য বড়লাট লর্ড ওয়াভেল পুনরায় বিলাত গিয়াছেন। বিলাতে পৌছিয়াই বড়লাট ভারতসচিব ও প্রধানমন্ত্রীর সহিত আলোচনা করেন। আমরা আশা করি এই বারের আলোচনার ফলে ভারতের অচল অবস্থা দূরীভূত হইবে এবং ভারতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হইবে।

বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যের হতাহত, যুদ্ধবন্দী ও নিরুদ্দিষ্টের সংখ্যা—

নয়াদিল্লীর এক খবরে প্রকাশ যে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত মিত্রপক্ষের যুদ্ধে ১৪৯২২৫ জন ভারতীয় হতাহত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১৫২৯১ জন মৃত, ৫০৭০৫ জন আহত এবং ১০৩৭১ জন নিরুদ্দিষ্ট। ৫১৮০২ জন যুদ্ধবন্দী হইয়াছে, ইহাদের সংখ্যা হয়ত আরও ২১০৫৬ জন বেশী হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ভারতীয় হতাহত ও বন্দী হয় মালয়ে, তাহার পরেই ব্রহ্মদেশের স্থান।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা ডি-এস্-সি—

বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতার ব্র্যাবোর্ণ কলেজের অধ্যাপিকা অসীমা মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-এস্-সি ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। ইনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা ডি-এস্-সি। আমরা অধ্যাপিকা মুখোপাধ্যায়কে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

ভারতে বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজের দান—

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কোম্পানি ভারতবর্ষের ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্সের হাতে রসায়ন, জড়বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানে গবেষণা বৃত্তির জন্য ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই বৃত্তিগুলির দ্বারা ভারতে বিজ্ঞান চর্চ্চার আরও উন্নতি হউক, ইহাই দাতাকোম্পানীর ইচ্ছা। প্রত্যেকটি বৃত্তির পরিমাণ মাসিক ৪০০৲ টাকা হইবে। প্রথমতঃ দুই বৎসরের জন্য বৃত্তি দেওয়া হইবে, কিন্তু বৃত্তির কাল পরে বাড়াইয়া তিন বৎসরও করা যাইতে পারিবে। বৃত্তিধারী গবেষকগণের আবশ্যক যন্ত্রপাতি প্রভৃতির জন্যও টাকা দেওয়া হইবে। বৃত্তিধারী ব্যক্তিগণের বিজ্ঞানে বিশেষ দক্ষতা থাকা চাই এবং বয়স ৩৫ বৎসরের কম হওয়া চাই। জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক নরনারী এই বৃত্তি পাইতে পারিবেন

লর্ড অরুণ সিংহ—

প্রসিদ্ধ লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের পুত্র লর্ড অরুণ সিংহ সম্প্রতি প্রথমবার লর্ড সভায় আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি লর্ড সভায় আসন গ্রহণ করিতে পারিবেন কিনা তাহা লইয়া অনেক প্রশ্ন উঠিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে সকল বাধা দূর হইয়া লর্ড সভায় তাঁহার আসন গ্রহণের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

বঙ্গের গভর্ণরের ছুটি—

বঙ্গের গভর্ণর মিষ্টার কেসী ১২ই সেপ্টেম্বর হইতে ৯ই অক্টোবর পর্য্যন্ত বিদায় লইয়া ভারতের বাহিরে যাইবেন। প্রকাশ যে তিনি ব্যক্তিগত কারণে ইংলণ্ডে যাইতেছেন। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে স্যার হেনরী টোয়াইনাম বাংলার গভর্ণরের কাজ করিবেন। স্যার হেনরী বর্ত্তমানে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের গভর্ণর। তিনি প্রথমে আসামে বাংলাদেশে ছিলেন এবং এক সময় কুচবিহার রাজ্যের ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

পরলোকে স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার—

গত ১২ই আগষ্ট রবিবার বেলা ১২টার সময় বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার কলিকাতায় তাঁহার বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল। আইনে স্যার নৃপেন্দ্রনাথের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ১৯২৮ সালে তিনি বাংলার এডভোকেট জেনারেল হন এবং ১৯৩৩ সালে বড়লাটের শাসনপরিষদের আইন সচিব নিযুক্ত হন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি বাঙ্গালী হিন্দুদের প্রতিনিধিরূপে তৃতীয় ভারতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন।

পরলোকে সরলাদেবী চৌধুরাণী—

গত ১৮ই আগষ্ট শনিবার অপরাহ্নে শ্রীযুক্তা সরলাদেবী চৌধুরাণী তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। সরলাদেবী মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী ও রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী ছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার অবদান তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তিনি বহুদিন "ভারতী" পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বহু প্রবন্ধ, কবিতা, গান সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। তাঁহার রচিত "অতীত গৌরববাহিনী মম বাণী" এবং "বন্দি তোমায় ভারত-জননি" গান দুইটি প্রচুর খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

খেলাধূলা

ফুটবল লীগ—

ক্রীড়ামোদিগণের সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান করিয়া বেঙ্গল দল ভবানীপুর দলকে পরাজিত করিয়াছে এবং মোহনবাগান দল হইতে এক পয়েন্ট বেশী পাইয়া (মোট ২৪ টি খেলায় ৩৯ পয়েন্ট পাইয়া) লীগ-বিজয়ী হইয়াছে।

আই-এফ-এ শীল্ড—

ইষ্ট বেঙ্গল দল লিগ-বিজয়ীর সম্মান লাভ করিবার কিছু পূর্ব্বেই আই-এফ-এ শীল্ড বিজয়ী হয়। ফাইনাল খেলায় মোহন বাগান দল এক গোলে পরাজিত হইয়াছে। ইষ্ট বেঙ্গল দল এইরূপ গৌরবের অধিকারী হইলেও, বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের গর্ব্বের কিছু নাই। কারণ ইষ্ট বেঙ্গল বাঙ্গালী টিম হইলেও বহু অবাঙ্গালী খেলোয়াড় লইয়া দল গঠন করিয়াছিল।

স্থানীয় খেলাধূলা—

বিজয়দিবস উপলক্ষ্যে পুলিশমাঠে কুচবিহার ষ্টেট মিলিটারি একাদশ ও অবশিষ্ট দলের একটি প্রীতি-ফুটবল খেলা হয়। অবশিষ্ট দলে কুচবিহারের তরুণ খেলোয়াড় কান্তি দত্ত দলপতি নির্ব্বাচিত হন। খেলাটিতে অবশিষ্ট দল ১ গোলে জয়লাভ করেন। মিলিটারি দল এইদিন খুব ফাউল করিয়া খেলে এবং রেফারী একজনকে বেফাঁস সতর্ক করিয়া দেন। অবশিষ্ট দলে মেঘা, পটলা, চৈতন্য বেশ ভাল খেলেন। কান্তি দত্তের দলপরিচালনা ও খেলা ভাল হয়, কিন্তু শেষের দিকে 'বলটি' ধরিবার (খেলার শেষে যিনি বল ধরেন তিনিই এইরূপ খেলায় বলটি লাভ করেন) দিকে বেশী ব্যস্ত থাকায় ভাল খেলিতে পারেন নাই।

শ্রীভগবতী বসু খেলাটি পরিচালনা করেন।

আকবর আলি শীল্ড ফাইনাল—

বৃষ্টির জন্য উক্ত খেলা শ্মশান মাঠে না হইয়া পুলিশ মাঠে হয়। ফ্রেণ্ডস একাদশ শ্মশান 'বি' দলকে ৫-০ পরাজিত করিয়া শীল্ড বিজয়ী হইয়াছেন। প্রধান বিচারপতি রায় বাহাদুর সুবোধচন্দ্র দত্ত পুরস্কার বিতরণ করেন।

স্থানীয় সংবাদ

কুচবিহারে প্রচুর বারিপাত—

এই বৎসর আষাঢ় মাসে কুচবিহারে তেমন বৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু সমগ্র শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস ধরিয়া অনবরত বৃষ্টি হইতেছে। এত বারিপাতে ধান্যচাষের অসুবিধা হইতেছে; এ বৎসর হয়ত পুরা ফসল পাওয়া যাইবে না। সমগ্র উত্তর বঙ্গ হইতেই প্রচুর বারিপাতের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। রংপুরের গাইবান্ধা ও নীলফামারী অঞ্চলে এবং বগুড়া ও পাবনা জেলার স্থানে স্থানে প্রবল বন্যা দেখা দিয়াছে।

মেখলিগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট জানাইতেছেন যে অতি বৃষ্টির ফলে মেখলিগঞ্জ সহরের নিম্নে প্রবাহিত তিস্তানদীতে ভাঙ্গন সুরু হইয়া নদীর তীরে অবস্থিত কতগুলি বসতবাটি নদী গর্ভে বিলীন হইয়াছে। বর্তমানে এই ভাঙ্গন বন্ধ হইয়াছে। হলদিবাড়ী অঞ্চলেও তিস্তানদীর প্লাবনে অধিবাসিগণের ও কৃষির যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

সামরিক ব্যবহারে লৌহ ফুসফুস—

কুচবিহার সদর হাসপাতালে একটি "লৌহ ফুসফুস" (Iron lungs) ছিল। আমরা জানিতে পারিলাম যে পার্ব্বতীপুরে সামরিক হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য কুচবিহার দরবার এই লৌহ ফুসফুস ধার দিয়াছেন। এই লৌহ ফুসফুসটি বিলাতের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও মানব-প্রেমিক লর্ড ন্যাফিল্ডের আনুকূল্যে পাওয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষে এই জাতীয় "লৌহ ফুসফুস" মাত্র অল্প কয়টিই আছে।

সুইডিস মিশন স্কুলের ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল—

আমরা স্থানীয় সুইডিস মিশন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে এই বৎসর এই স্কুল হইতে ২৩টি বালক ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল: তন্মধ্যে ১৫টি বালক উত্তীর্ণ হইয়াছে। উত্তীর্ণ বালকগণের মধ্যে একজন প্রথম বিভাগে এবং দুইজন দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করিয়াছে। এই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের হার শতকরা মাত্র ৪৫ জন; কিন্তু সুইডিস মিশন স্কুল হইতে শতকরা ৬৫ জন পাশ করিয়াছে। আমরা স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষ সকলকে এই জন্য অভিনন্দিত করিতেছি।

স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজের বি-এ পরীক্ষার ফল—

এই বৎসর স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজ হইতে ৩৭ জন ছাত্রছাত্রী বি-এ পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে ১৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। উত্তীর্ণগণের মধ্যে একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স ও চারিজন ডিষ্টিংশন পাইয়াছে। এই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের হার শতকরা ৪১ জন; কিন্তু ভিক্টোরিয়া কলেজ হইতে শতকরা ৪৬ জন পাশ করিয়াছে। আমরা জানিতে পারিলাম যে এই বৎসর বি-এ ক্লাসের কোন ছাত্রকেই আটকাইয়া রাখা (detain) হয় নাই; অধ্যক্ষ মহাশয় সকল ছাত্রছাত্রীকেই পরীক্ষা দিবার অনুমতি দিয়াছিলেন; তৎসত্ত্বেও যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের হার অপেক্ষা কলেজের পাশের

হার উচ্চতর হইয়াছে ইহা প্রশংসার কথা। আমরা আরও জানিতে পারিলাম যে অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীগণের মধ্যে ৮ জন কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইয়াছে।

মিষ্টার এ-সি দত্তের নিয়োগ—

আসাম গভর্ণমেণ্টের ট্রেড্ কমিশনার মিষ্টার এ-সি দত্ত কুচবিহার রাজ্যের কণ্ট্রোলার অফ সেপারেট রেভিনিউ নিযুক্ত হইয়াছেন। মিষ্টার দত্ত পূর্ব্বেও এই পদে কাজ করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি রাজ্যের অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী (Financial Secretary) মৌলভী আনসার উদ্দীন আহ্মেদ ছুটিতে যাওয়ায় মিষ্টার দত্ত নিজ কার্য্য ছাড়াও অর্থ বিভাগের সেক্রেটারীর কার্য্য করিতেছেন।

হলদিবাড়ীতে নাট্যাভিনয়—

আমরা জানিতে পারিলাম যে হলদিবাড়ী ক্লাবের উদ্যোগে হলদিবাড়ীতে বিগত ৩০শে জুলাই ও ১লা আগষ্ট পরপর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত দ্বীপান্তর নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। অভিনয় উৎকৃষ্ট হইয়াছিল এবং স্থানীয় জনসাধারণের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। প্রকাশ যে কালীচরণের ভূমিকায় রণজিৎ বাবুর অভিনয় চমৎকার হইয়াছিল।

রবীন্দ্র মৃত্যুবার্ষিকীতে ভিক্টোরিয়া কলেজে সভা—

গত বাইশে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুবার্ষিকী দিনে স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজে ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকগণের এক সভা হয়। সভায় কলেজের অধ্যক্ষ শ্রযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন ধর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় ছাত্রছাত্রীগণ রবীন্দ্র সঙ্গীত গান করেন এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন। রবীন্দ্র প্রতিভার বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা প্রদান করা হয়। কলেজ ইউনিয়নের উদ্যোগে ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারের জন্য চাঁদা তোলা হয়।

জাপানজয়ে কুচবিহারে বিজয়োৎসব—

জাপান মিত্রপক্ষের নিকট বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে এই সংবাদ কুচবিহারে পৌঁছা মাত্র সর্ব্বত্র আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। মিত্রশক্তির বিজয় উপলক্ষ্যে উৎসব করিবার নিমিত্ত কুচবিহার দরবার ১৬ই, ১৭ই এবং ২০শে আগষ্ট রাজ্যময় ছুটি ঘোষণা করেন। ১৯শে আগষ্ট রবিবার যুদ্ধজয়ে ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য রাজ্যের সকল মন্দিরে, মসজিদে ও গির্জ্জায় বিশেষ পূজা ও উপাসনার ব্যবস্থা করা হয়। ঐদিন প্রাতে মদনমোহন ঠাকুরবাড়ীতে বিশেষ সংকীর্ত্তন হয়। ১৬ই হইতে ২০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত রাজবাড়ী এবং সকল সরকারী গৃহে কুচবিহার রাজ্যের ও সম্মিলিত জাতিসমূহের পতাকা উড্ডীন রাখা হয়।

২০শে আগষ্ট বিজয় উপলক্ষ্যে রাজ্যময় নানারূপ আনন্দ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮-৩০ মিনিটের সময় রাজ্যের সৈন্যবাহিনী, পুলিশ ও স্কাউটদল টিলারায় সেনানিবাসে একত্রিত হয় এবং সেখান হইতে সহরের প্রধান প্রধান রাস্তাসমূহে শোভাযাত্রা করিয়া বেড়ায়। বিকাল ৩টার সময় কলেজে ও সহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীগণকে মিষ্টান্ন খাওয়ান হয়; রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী, কলেজের অধ্যক্ষ এবং বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক মহাশয়গণ এই কার্য্যের তদারক করেন। বিকাল ৪টার সময় মদনমোহন ঠাকুরবাড়ীতে দরিদ্রনারায়ণের সেবা হয়। ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত পুলিশ মাঠে রাজ্যের সৈন্যবাহিনী

এবং অন্যান্যের মধ্যে ফুটবল ম্যাচ্ খেলা হয়। এই খেলায় অন্যান্য দল ৫-১ গোলে বিজয়লাভ করে।

১৯শে আগষ্ট সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় কুচবিহার সহরে ল্যান্সডাউন হলে রাজস্বমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হয়। এই সভায় সম্মিলিত জাতিসমূহের জয়ের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। বিভিন্ন বক্তা এতদুপলক্ষ্যে বক্তৃতা প্রদান করেন। রাজ্যের মহকুমা সহরগুলিতেও এইরূপ জনসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

কুচবিহারে বস্ত্রবণ্টন—

কুচবিহারে বস্ত্রের রেশনিং প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দুর্গাপূজা ও ঈদ সমাগত; এই উপলক্ষ্যে জনসাধারণের বস্ত্রের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আপাততঃ মাথাপিছু ৮৷৷ গজ কাপড়ের বরাদ্দ স্থির করিয়াছেন। ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে ১০ই অক্টোবর পর্য্যন্ত এই বরাদ্দ অনুযায়ী অনুমোদিত দোকানসমূহ হইতে রেশন কার্ড দেখাইয়া বস্ত্র ক্রয় করা যাইবে। ৮৷৷ গজ কাপড়ের মধ্যে প্রত্যেকে একখানি ধুতি কিম্বা সাড়ী এবং ৩৷৷০ গজ অন্য কাপড় (লংক্লথ, মার্কিন, ভয়েল, ছিট প্রভৃতি) লইতে পারিবেন। বর্ত্তমান সময়ে এই কাপড় পাওয়ায় জনসাধারণের অনেক সুবিধা হইবে। মফঃস্বলেও বস্ত্র বণ্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

স্থানীয় কলেজে সৈনিকদের অনাচার—

গত ২১শে আগষ্ট মঙ্গলবার বেলা প্রায় এগারটার সময় কুচবিহার সৈন্যবাহিনীর দুইজন সিপাহী একটি সাইকেলে চড়িয়া কলেজ হোষ্টেলের সম্মুখের রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। সিপাহী দুইটির সাইকেলের সহিত বিপরীত দিক হইতে আগত এক ভদ্রলোকের সাইকেলের সংঘর্ষ হয়। ইহাতে সিপাহী দুইটি ভদ্রলোককে মারপিট করিতে থাকে; ইহা দেখিয়া হোষ্টেল হইতে কয়েকজন ছাত্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত [illegible] এবং সিপাহীদিগকে নিরস্ত করে। হোষ্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং ছাত্রদিগকে হোষ্টেলে ফিরাইয়া আনেন; একটি পুলিশ কনষ্টেবল সিপাহীদিগের সাইকেলটি থানায় লইয়া যায়।

ইহার পরে দুপুর প্রায় বারোটার সময় দুইজন সৈনিক কর্ম্মচারী কলেজে আসিয়া অধ্যক্ষ মহাশয়ের খোঁজ করেন; অধ্যক্ষ মহাশয় তখনও কলেজে আসেন নাই; কলেজের একজন কেরাণী তাঁহাদিগকে একটু অপেক্ষা করিতে বলেন কিন্তু তাঁহারা অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া যান। পরে বেলা প্রায় দুইটার সময় একজন মিলেটারী সুবেদার আসিয়া অধ্যক্ষের সহিত দেখা করেন এবং বলেন যে হোষ্টেলের ছাত্রেরা একখানি মিলিটারী সাইকেল হোষ্টেলে আটক করিয়া রাখিয়াছে এবং সেইজন্য সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর সাহেব তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন। অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহাকে বলেন যে ছাত্রেরা সাইকেল হোষ্টেলে আনে নাই, একজন পুলিশ কনষ্টেবল উহা থানায় লইয়া গিয়াছে; মেজর সাহেব ইচ্ছা করিলে অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহার সম্মুখে হোষ্টেল খানাতল্লাস করাইতে প্রস্তুত আছেন। সুবেদার তখন চলিয়া যান।

ইহার পর বেলা চারিটার সময় স্থানীয় কলেজ, জেন্‌কিন্স স্কুল ও কলেজ হোষ্টেলে এক শোচনীয় কাণ্ড ঘটে। কুচবিহার সৈন্যবাহিনীর শতাধিক সিপাহী অতর্কিতে কলেজ, স্কুল ও হোষ্টেলে প্রবেশ করিয়া ছাত্র ও শিক্ষকগণকে প্রহার করে। হোষ্টেলের ছাত্রগণের উপর বেশী আক্রমণ হয়। সৈনিকগণ সেখানে নিঃসহায় ছাত্রগণের উপর অত্যাচার করে। দুইটি ছাত্রকে তাহারা দোতলা হইতে

নীচে ফেলিয়া দেয়। প্রায় আধ ঘন্টাকাল অত্যাচার করিবার পর সৈনিকগণ চলিয়া যায়।

আহতদিগের মধ্যে ৫৭ জন হাসপাতালে চিকিৎসার্থ প্রেরিত হয়; তন্মধ্যে ১৭ জন বাদে আর সকলকে প্রাথমিক সাহায্য দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ১৭ জনকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হয়। হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষের অসামান্য তৎপরতা এবং জনসাধারণ ও ছাত্রছাত্রীগণের সেবাশুশ্রূষা ও সাহায্যের ফলে তাহারা সকলেই সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে।

দার্জ্জিলিংএ মহারাণী সাহেবা, প্রধান মন্ত্রী মহোদয় ও হাউসহোল্ড মন্ত্রীমহোদয়কে টেলিগ্রামে ও টেলিফোনে ঘটনার সংবাদ দেওয়া হয়। ২২শে আগষ্ট বুধবার সন্ধ্যায় হাউসহোল্ড মন্ত্রীমহোদয় মোটরযোগে দার্জ্জিলিং হইতে কুচবিহারে উপস্থিত হন এবং ঘটনাসম্বন্ধে সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা করেন। তিনি ছাত্রদিগকে তাহাদের নিরাপত্তা ও অপরাধীদের শাস্তি সম্বন্ধে আশ্বাস প্রদান করেন। শতাধিক সিপাহী ও দুইজন সৈনিক কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থাও তিনি করেন।

মহারাণী সাহেবা এবং প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ও দার্জ্জিলিং হইতে কুচবিহারে উপস্থিত হন। তাঁহারা হাসপাতালে আহতদের অবস্থা পরিদর্শন করেন। প্রধানমন্ত্রী মহোদয় অসুস্থ; কিন্তু অসুস্থতা সত্ত্বেও ঘটনার সংবাদ পাইয়া তিনি দার্জ্জিলিং হইতে কুচবিহারে উপস্থিত হন। দুই দিন কুচবিহারে থাকিয়া তিনি চিকিৎসার জন্য কলিকাতা যান। সেখানে এসোসিয়েটেড প্রেসের নিকট এক বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ভারত সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের সহিত পরামর্শ করিয়া অভিযুক্ত সৈনিকগণের বিচারের জন্য শীঘ্রই একটি বিশেষ নিরপেক্ষ আদালত গঠিত হইবে।

শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুর বর্ত্তমানে সামরিক কার্য্যে ভারতের বাহিরে আছেন। তাঁহার নিকটও এই ঘটনার সংবাদ পাঠান হইয়াছে।

এই ঘটনায় সহরবাসিগণ অত্যন্ত উত্তেজিত ও আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে দুষ্কৃতকারীদের দণ্ডবিধানের আশ্বাস পাইয়া সহরবাসীর আতঙ্ক দূর হইয়াছে এবং সহর শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। সহরের কাজকর্ম্ম যথানিয়মে চলিতেছে।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

নর্থবেঙ্গল আয়ুর্বেদিক ফার্মেসীর
TRADE MARK
রেজিষ্টারীকরা
শ্রীরাধাগোবিন্দ সাহার
আবিষ্কৃত
ধন্বন্তরী পাচন
সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া, প্লীহা, যকৃতের মহৌষধ।
DHANWANTARI PACHAN
মূল্য ১৷৷৹
দেড় টাকা
কুচবিহার, কাইয়াপট্টি

কোচবিহার দর্পণের নিয়মাবলী।

১। কোচবিহার দর্পণের প্রতি সংখ্যার মূল্য চারি আনা ও বার্ষিক সডাক তিন টাকা; মূল্য অগ্রিম দেয়।

২। পত্রিকার প্রকাশের জন্য লেখা কাগজের একপৃষ্ঠায় স্পষ্টরূপে লিখিয়া সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে। উৎকৃষ্ট লেখার জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

৩। অমনোনীত লেখা ফেরৎ লইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকেট সহ ঠিকানা লেখা খাম পাঠাইতে হয়, অমনোনীত কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না। অমনোনয়নের কারণ দর্শাইতে সম্পাদক অক্ষম।

৪। মনোনীত লেখা কখন প্রকাশিত হইবে সে সম্বন্ধে সম্পাদক কোনরূপ নিশ্চয়তা দিতে পারেন না।

৫। কোচবিহার দর্পণে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা ১০৲ টাকা; অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৬৲ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা। কভারে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার দ্বিগুণ।

৬। টাকাকড়ি সম্পর্কিত চিঠিপত্র ম্যানেজারের নিকট লিখিতে হইবে।

ম্যানেজার কোচবিহার দর্পণ
ষ্টেট্‌প্রেস, কোচবিহার।

কোচবিহার রাজপ্রাসাদ

কোচবিহার দর্পণ

অষ্টম বর্ষ { আশ্বিন ১৩৫২ সন, রাজশক ৪৩৬ } ৬ষ্ঠ সংখ্যা

রবীন্দ্রপ্রতিভার এক দিক

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নহেন, তিনি ভারতের সর্ব্বযুগের চিন্তানায়কগণের প্রতিনিধি। বৈদিক কবির আর্যদৃষ্টি তাঁহার মানসনয়নে, উপনিষদের ঋষির ব্রহ্মোপলব্ধি তাঁহার সৃষ্টিতে এবং পৌরাণিক বীর ও তাপসের সত্যনিষ্ঠা ও তেজস্বিতা তাঁহার সাধনায়। বৌদ্ধ মহাস্থবিরদের মত গতানুগতিকতার বিরোধী স্বাধীন চিন্তার প্রচারক তিনি, মধ্যযুগের ধর্ম্মবিপ্লবের সামঞ্জস্য সম্পাদক মরমী সাধকদের বাণী তাঁহার সাহিত্যে মূর্চ্ছিত, এবং অর্বাচীনযুগে সংস্কৃতি সংঘর্ষের সন্ধিস্থলে যাঁহারা অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ও সত্যপিপাসু তাঁহাদের সর্ব্বশক্তির মিলনভূমি তাঁহার সাধনা। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রতীক রবীন্দ্রনাথ। আধ্যাত্মিক ভারতীয় সাধনার যে তপঃশক্তি যাজ্ঞবল্ক্য, জাবালি, বিদুর, মৌদ্গলায়ন, কালিদাস, নাগার্জ্জুন, রামানুজ, নানক, অদ্বৈত, চাঁদসদাগর, গোবিন্দমাণিক্য ও রামমোহনে পরিমূর্ত্ত হইয়াছে—সেই শক্তি যেন কেন্দ্রীভূত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথে। ভারতের বীরের বিক্রমে, সাধকের সাধনায়, কবির বাণীতে কবি আপন মহত্তর সত্তার ধারাবাহিকতা অনুভব করিয়া বলিয়াছেন—

> "এই আমি যুগে যুগান্তরে
> কত মূর্ত্তি ধরে
> কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করি পারাপার
> কত বারংবার।"

কেবল কবিতার মধ্য দিয়া আমরা পূর্ণ রবীন্দ্রনাথকে পাই না—তাঁহার জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন সাধনা, তাঁহার ব্রত, বাণী ও চিন্তার মধ্যে তাঁহাকে আমরা সমগ্রভাবে পাই। একাধারে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সাধনার সঙ্গে যাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে—তিনিই এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কবির নিজের কথায়—

> যেথানেই যে তপস্বী করেছে দুষ্কর যজ্ঞযাগ
> আমি তার লভিয়াছি ভাগ।

মোহবন্ধ মুক্ত যিনি আপনারে করেছেন জয়
তার মাঝে পেয়েছি আপন পরিচয়।
যেখানে নিঃশঙ্ক বীর মৃত্যুরে লঙ্ঘিল অনায়াসে
স্থান মোর সেই ইতিহাসে।

ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন সাধনার ধারার মহামিলন নিজের সত্তার মধ্যে অনুভব করিয়া কবি বলিয়াছেন—

লোকালয়ের বাইরে পেয়েছি আমার নির্জ্জনের সঙ্গী
যারা এসেছে ইতিহাসের মহাযুগে
আলো নিয়ে অস্ত্র নিয়ে মহাবাণী নিয়ে
তারা বীর, তারা তপস্বী, তারা মৃত্যুঞ্জয়,
তারা আমার অন্তরঙ্গ আমার সবর্ণ সগোত্র
তাদের নিত্য শুচিতায় আমি শুচি
তারা সত্যের পথিক, জ্যোতির সাধক, অমৃতের অধিকারী।

যুগে যুগে ভারতীয় সংস্কৃতি যবদ্বীপে সংক্রামিত হইয়াছিল। যুগে যুগে ভারত তাহার সংস্কৃতির দূত যবদ্বীপে প্রেরণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কবিরূপে সেখানকার শেষ দূত। সাগরিকা নামক কবিতায় কবি আপনাকে ভারতের সর্ব্বযুগের সংস্কৃতির প্রতিনিধি বলিয়া কল্পনা করিয়া লিখিয়াছেন—

এবার মোর মকরচূড় মুকুট নাহি মাথে
ধনুক বাণ নাহি আমার হাতে।
এবার আমি আনিনি ডাকি দখিণ সমীরণে
সাগর কূলে তোমার ফুল বনে
এনেছি শুধু বীণা
দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কিনা।

অর্থাৎ বার বার যুগে যুগে কতরূপে তোমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি—এবার কবিরূপে আসিয়াছি। তুমি কি আমারে চিনিতে পার?

রবীন্দ্রনাথের প্রধান স্বাতন্ত্র্য তাঁহার নিজস্ব কবি-দৃষ্টিতে। যে রসদৃষ্টিতে তিনি বিধাতার সৃষ্টিকে দেখিয়াছেন তাহা অনন্যসাধারণ। কোন সাধারণ লোকের দৃষ্টির সহিত তাহার মিল নাই—অন্যে পরে কা কথা, ভারতের কোন কবির দৃষ্টির সহিতও তাহার মিল নাই। একমাত্র মেঘদূতের কবির দৃষ্টির সঙ্গে তাহার আংশিক মিল আছে। এই দৃষ্টি যেন আর্ষদৃষ্টি—বেদ বা উপনিষদের ঋষিদের দৃষ্টি অনেকটা যেন এই শ্রেণীর। কবি যে দিব্যদৃষ্টি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সে দিব্যদৃষ্টি কাহারও জীবনের অঙ্গীভূত নয় বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ জীবন ও মনের বিশিষ্ট অবস্থায় বিশ্ব-প্রকৃতির বিশিষ্ট পরিবেষ্টনার মধ্যে এই দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য প্রাপ্ত হয়। মাঝে মাঝে এইরূপ দৃষ্টি আমরা লাভ করি। মাঝে মাঝে আমাদের গুহ্য তৃতীয় নয়নের পল্লব একটু একটু উন্মীলিত হয় বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমরা উপভোগ করি। এই দৃষ্টি আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত নয়—এই দৃষ্টি লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করি নাই বলিয়া আমরা উপভোগ করিতে পারি, কিন্তু সৃষ্টি করিতে পারিনা।

রবীন্দ্রনাথ এই দিব্য দৃষ্টি লইয়া—বিকসিত তৃতীয় নয়ন লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই দৃষ্টি অমৃতময়ী দৃষ্টি—এই দৃষ্টিতে বিশ্বসৃষ্টিকে দেখিয়াছেন বলিয়া বিধাতার সৃষ্টি তাঁহার কাছে মধুময়ী। সৃষ্টির মাধুরী সম্ভোগেই এই দৃষ্টির কাজ ফুরায় নাই—তাহা হইলে কবি আদর্শ রসজ্ঞ হইতেন সন্দেহ নাই—কিন্তু আদর্শ রসস্রষ্টা হইতেন না। ঐ দিব্যদৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টির বাসনা ও শক্তি নিহিত আছে—বিধাতার সৃষ্টিকে ভাঙ্গিয়া গড়িবার প্রবৃত্তি জড়িত আছে। বিধাতার সৃষ্টি কবির চোখে সুন্দর—তাহাকে সুন্দরতর করিয়া দেখাইবার বাসনা ঐ দৃষ্টিরই অঙ্গ। বিধাতার

সৃষ্টি সুন্দর—কিন্তু আমাদের চোখে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়—তাহাতে অঙ্গহানিও অনেক। কবি তাই বিধাতার সৃষ্টির অঙ্গহানি দূর করিয়া তাহাকে আমাদের জন্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া গড়িতে চাহিয়াছেন। কবির দিব্য-দৃষ্টির পরিণতি তাই দিব্যসৃষ্টি। ইহাই রবীন্দ্রনাথের রসসৃষ্টি। বিধাতার সৃষ্টির পরিপূরক কবির সৃষ্টি। কবি যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহার অর্দ্ধেক বিধাতার—অর্দ্ধেক কবির নিজস্ব। কবি তাঁহার দিব্য দৃষ্টি ও দিব্যসৃষ্টির দ্বারা বিধাতার সৃষ্টিকে একদিকে যেমন আমাদের উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন অন্যদিকে তেমনি বিধাতার সৃষ্টির অনেক অঙ্গকে ভাঙ্গিয়া আপন মনের মাধুরী দিয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছেন। কবিমাত্রই নূতন সৃষ্টি করেন—কিন্তু এমন করিয়া বিধাতার সৃষ্টিকে নব কলেবর দান রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ভারতের আর কোন কবি করেন নাই। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রকৃত রসজ্ঞের কাছে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি অঙ্গ, মানব জীবনের প্রত্যেক তথ্য, বিশ্বরহস্যের প্রত্যেক তত্ত্বটি মেঘদূতকাব্যের উপভোক্তার চোখে নববর্ষার মেঘমালার ন্যায় অভিনব রূপ লাভ করিয়াছে।

কথাটাকে অন্যভাবে প্রকাশ না করিলে তৃপ্তি হইতেছে না। আগে রসময়ী দৃষ্টি, তারপর বিধাতার সৃষ্টির সংস্কার সাধন করিয়া সৃষ্টি—ইহা যেন কেহ মনে না করেন। ছন্দোভাষায় রূপ দানটা উপসৃষ্টি,—প্রকৃত সৃষ্টি দৃষ্টির নিজস্ব ক্রিয়ারই অঙ্গ। কবি যে দৃষ্টিতে বিশ্বজগৎকে দেখিয়াছেন সেই দৃষ্টিই বিশ্বজগৎকে নবকলেবরে তাঁহার নয়নে উপস্থাপিত করিয়াছে। এই নবকলেবর দৃষ্টিরই সৃষ্টি। আমি এই দৃষ্টিকে অমৃতময়ী বলিয়াছি—ইহাকে বিস্ময়ময়ীও বলা যাইতে পারে। বিস্ময়ই সকল দর্শন তত্ত্বের নিদান—বিস্ময়ই সৎকাব্যেরও মূল উৎস। অলঙ্কারশাস্ত্রে বিস্ময়কে অদ্ভুতরসের স্থায়ী ভাব বলা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতাকে প্রকৃতপক্ষে কোন রসপর্য্যায়ে ফেলিতে হইলে অদ্ভুতরসের কবিতাই বলিতে হয়। কবির বিস্ময়ময়ী দৃষ্টি এই সৃষ্টির যে অঙ্গেই পড়িয়াছে তাহাতেই বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে। এই বিস্ময়সঞ্চারেই তাঁহার কবিতার জন্ম। জগৎ ও জীবনের এই বিস্ময়ঘনরূপই নূতন সৃষ্টি। ইহাকেই বলিয়াছি আমাদের দেখা বিধাতার জগৎকে ভাঙ্গিয়া গড়া।

কবির সেই বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিই ছন্দে ভাষায় বাণীরূপ লাভ করিয়া কবির বাঁশীতে ধরা পড়িয়া আমাদের হৃদয় বিস্ফারিত করিতেছে। কবি নিজে তাঁহার এই বিস্ময়ময়ী দৃষ্টি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করিনি, আমি চোখ মেলে যা দেখলুম, চোখ আমার তাতে ক্লান্ত হলো না,—বিস্ময়ের অন্ত পাই নি। প্রতিদিন উষাকালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছি এই কথাটি উপলব্ধি করার জন্য যে—যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।"

"আলোকিত ভুবনের মুখপানে চেয়ে নির্ণিমেষ
বিস্ময়ের পাই নাই শেষ।
যে লক্ষ্মী আছেন নিত্য মাধুরীর পদ্ম উপবনে
পেয়েছি তাহার স্পর্শ সর্ব্ব অঙ্গ মনে
যে নিঃশ্বাস তরঙ্গিত নিখিলের অশ্রুতে হাসিতে
তারে আমি ধরেছি বাঁশীতে॥"

যাঁহারা দেশের চিন্তাগুরু ও দার্শনিক—যাঁহারা সত্য প্রচারক তাঁহারা কবির কাব্যে দেন প্রেরণা ও উপাদান।

তাহারা যাহা তত্ত্বের আকারে সূত্রনিবদ্ধ করেন বা তথ্যের রূপে প্রচার করেন কবি সেগুলির মধ্যে করেন জীবন সঞ্চার—সেগুলি কবির কাব্যে রসরূপ লাভ করিয়া সাধারণের অধিগম্য ও উপভোগ্য হয়। অন্যান্য দেশে দেখা যায় বড় বড় চিন্তাগুরু ঋষিকল্প মহাপুরুষদের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই কবিগণ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের তত্ত্বচিন্তাকে সাহিত্যে রূপ দান করিয়াছেন। আমাদের দেশে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরে বৌদ্ধ-সাহিত্য ও জাতক-সাহিত্যের জন্ম হইয়াছে। এই সাহিত্যের মধ্য দিয়া বুদ্ধদেবের বাণী সরস হইয়া দেশে প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর যে সকল কবির আবির্ভাব হইয়াছিল—তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীকে সঙ্গীত ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া আমাদের অধিগম্য করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে উপনিষদের ঋষিদের বাণী কোন সংস্কৃত কবি বা প্রাদেশিক ভাষার কবির রচনায় রসরূপ ধারণ করে নাই। উপনিষদের ঋষিদের অমৃতবাণী এতকাল রবীন্দ্রনাথের প্রতীক্ষায় দেশের ভাবগুহায় ধ্যানমগ্ন ছিল বলিয়া মনে হয়। কেবল শ্রেষ্ঠ ঋষিদের বাণী নয়, কবিদের স্বপ্ন ও রসাদর্শও পরবর্ত্তী কবিদের কাব্যে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় প্রাচীন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের রসাদর্শ আমরা পরবর্ত্তী সংস্কৃত কবিদের এবং প্রাদেশিক কবিদের রচনার মধ্যে দেখিতে পাই না। কালিদাসের রসাদর্শও এই বর্ত্তমান যুগের মহাকবি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিতেছিল। রবীন্দ্রনাথ কেবল কালিদাসের রসাদর্শে যৌবনে আবিষ্ট হন নাই—রসবিচারচ্ছলে তাঁহার কাব্যের অভিনব সার্থকতা (Interpretation) দান করিয়া তাহাতে নব জীবনের সঞ্চার করিয়াছেন। কালিদাসের নিজস্ব রসাদর্শ দেশে বিলুপ্ত হওয়ায় তাঁহার কাব্যের রসোপযোগ সেই আদর্শে সম্পাদিত হইত না,—প্রচলিত আদর্শেই সম্পাদিত হইত। তাহার ফলে মহাকবির প্রতি অবিচারই হইত। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের নিজস্ব রসাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কালিদাসের রচনার রসবিচার করিয়াছেন। ইহার দ্বারা ভারতীয় সাহিত্যজগতের তিনি যে কি উপকার করিয়াছেন তাহা রসজ্ঞ ব্যক্তিরাই জানেন। নিশ্চয়ই তিনি এজন্য অমর কবি কালিদাসের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন এবং নিশ্চয়ই তিনি সেই সঙ্গে ভবভূতিকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছেন—"ঠিকই বলিয়াছিলে বৎস, উৎপৎস্যতেঽস্তি কোঽপি সমান-ধর্ম্মা কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী।"

রবীন্দ্রনাথের যে রসদৃষ্টি বিশ্বপ্রকৃতিকে কাব্যে নব নব কলেবর দান করিয়াছে—সেই রসদৃষ্টিই প্রাচীন ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সাহিত্য, আর্ষবাণী ও জীবনধারাকে অভিনব সার্থকতা (Interpretation) দান করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাই ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন সংস্কৃতিধারার অভিনব ব্যাখ্যাতা।

শ্যামদেশে ভারতীয় সভ্যতা

ডক্টর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী এম্-এ, ডি-লিট্

এ কথা এখন অনেকেই জানেন যে প্রাচীনকালে ভারতীয় সভ্যতা নানা দূরদেশে প্রসার লাভ করেছিল। উত্তরে হিমালয়ের পরপারে, সমগ্র মধ্য এসিয়া, মঙ্গোলিয়া চীন, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ ভারতীয় সভ্যতার নানা উপাদান গ্রহণ করে নিজেদের সভ্যতার পরিপুষ্টি সাধন করেছিল। দক্ষিণে, সমুদ্রপথ বেয়ে ভারতীয় সভ্যতার ধারা ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোচীন, যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ প্রভৃতি দেশ পর্য্যন্ত পৌঁছেছিল এবং স্থানীয় সভ্যতাগুলির পরিপুষ্টি ও উন্নতিতে সহায়তা করেছিল। ফলে ভারতের প্রত্যন্তভূমিভাগ হতে বহুদূরে এই সমস্ত দেশে ভারতীয় ঔপনিবেশিক রাজ্যসমূহ গঠিত হয়। ভারতীয় সভ্যতার এই দিগ্বিজয়ের ইতিহাস অতি বিচিত্র এবং বিরাট। এই প্রবন্ধে সেই সুদীর্ঘ ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র বিবৃত করব। প্রাচীনকালে শ্যামদেশে ভারতীয় সভ্যতা কি ভাবে এবং কি পরিমাণে প্রসার লাভ করেছিল তাই হবে এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

শ্যামদেশের পৃথক ইতিহাসের আরম্ভ মাত্র খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে। তৎপূর্ব্বে এদেশ ছিল প্রাচীন কম্বুজ বা Cambodia রাজ্যের একটি অংশ মাত্র। কম্বুজ বা Cambodia বর্ত্তমানে ইন্দোচীনের অন্তর্গত একটি স্বতন্ত্র রাজ্য—মেকং নদীর উপত্যকা নিয়ে গঠিত। কিন্তু প্রাচীন কম্বুজ রাজ্য ব্রহ্মসীমান্ত হতে আনাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল—মেনাম ও মেকং এই উভয় নদীর জনবহুল ও উর্ব্বর উপত্যকা এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ভারতীয় ঔপনিবেশিক রাজ্যগুলির মধ্যে কম্বুজ রাজ্য প্রায় এক সহস্র বৎসরের উপর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল।

কম্বুজ রাজ্যের প্রথম সূত্রপাত হয় খৃষ্টীয় প্রথম শতকে কিংবা আরও কিছু পূর্বে। এই সময়ে ভারতীয় বণিকগণ ভারতবর্ষ হতে সমুদ্রপথে পূর্বাঞ্চলে যাতায়াত আরম্ভ করেন এবং মালয় উপদ্বীপের নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করেন। মালয় উপদ্বীপের অগ্রভাগে, বঙ্গোপসাগর ও শ্যাম-উপসাগরের মধ্যে যে ক্রা (Kra) নামক যোজক আছে এই যোজকের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে সেকালে তক্কোল নামক একটি বৃহৎ বন্দর স্থাপিত হয়। ভারতবর্ষের উপকূলে অবস্থিত নানা বন্দর হতে জাহাজগুলি মৌসুমী বায়ুর সাহায্যে সোজাসুজি তক্কোল বন্দরে পৌঁছুতে পারিত। তক্কোল নগর হতে ভারতীয় বণিকেরা স্থল পথে মেনাম ও মেকংএর উপত্যকা পর্য্যন্ত যাতায়াত করতেন। বর্ত্তমান যুগের শ্যামদেশের রেলপথ এই প্রাচীন স্থলপথ বরাবরই স্থাপিত হয়েছে।

এই প্রাচীন পথ বেয়েই ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ মেনাম ও মেকং নদীর উপত্যকায় খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকের মধ্যেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই সমস্ত উপনিবেশ অল্পকালের মধ্যেই একটি ক্ষমতাশালী রাজ্যে পরিণত হয়। প্রাচীন চীনা ইতিহাসে এই রাজ্যের প্রথম পরিচয় পাই। সে ইতিহাসে বলা হয়েছে যে কৌণ্ডিণ্য নামক এক ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষ হতে গিয়ে এই প্রথম হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে এ রাজ্যের নাম ছিল "ফু-নান্"। "ফু-নান্"—"ভোম"

বা "প্রোম" নামের রূপান্তর। স্থানীয় ভাষায় এ নামের অর্থ হচ্ছে পার্বত্যদেশ। এ রাজ্যের প্রথম রাজধানী কোথায় ছিল তা অনুমান করবার উপায় নাই। খুব সম্ভব একদিন শ্যামদেশের অরণ্যে মেনাম নদীর উপত্যকার উত্তরাংশে কোন স্থানে এই প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যাবে।

ফু-নান্ রাজ্য-স্থাপনার কয়েক শতকের মধ্যেই আর এক দল ভারতীয় কম্বুজ রাজ্য স্থাপনা করেন। এ রাজ্য স্থাপিত হয় মে-কং নদীর উপত্যকায়, বর্তমান কাম্বোডিয়া অঞ্চলে। প্রথম যুগে কম্বুজের প্রতিষ্ঠাতাগণ ফু-নান্ রাজ্যের আধিপত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে কম্বুজের রাজা চিত্রসেন মহেন্দ্র-বর্ম্মণ ফু-নান্ রাজ্য জয় করে কম্বুজ রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধি করেন। অল্পকালের মধ্যেই ফু-নান্ নাম ও সে রাজ্যের স্বাধীনসত্তা বিলুপ্ত হয়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতক হতে ত্রয়োদশ শতক পর্য্যন্ত কম্বুজের হিন্দু রাজারা ব্রহ্ম সীমান্ত হতে আনাম পর্য্যন্ত ভূমিভাগের উপর নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখেন। এ যুগে প্রতিষ্ঠিত বহু হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ শ্যামদেশের নানা স্থানে পাওয়া গিয়েছে। তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সে যুগে শ্যামদেশ ও কম্বুজ অভিন্ন ছিল। কম্বুজের হিন্দু সংস্কৃতই শ্যামদেশের অধিবাসীরা গ্রহণ করেছিল।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে থাই নামক এক দুর্দ্ধর্ষ জাতি চীনদেশের সীমান্ত হতে বিতাড়িত হয়ে ব্রহ্মদেশ, আসাম ও শ্যামদেশে প্রবেশ করে। এই থাইদের আক্রমণেই প্রাচীন কম্বুজ রাজ্য ধ্বংস হয় এবং মেনাম নদীর উপত্যকায় স্বাধীন "থাই" রাজ্যের স্থাপনা হয়। থাইদের ছোট ছোট শাখা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক হতেই এ অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং কম্বুজের অধীনে দু'টি খণ্ডরাজ্য স্থাপনা করে। এই দুই রাজ্যের নাম—"শ্যাম" ও লো"। এই দুই নামই পরে সংস্কৃতভাষায় রূপান্তরিত হয়ে শ্যাম ও লবপুরিতে পরিবর্তিত হয়। দুটি নাম মূলতঃ সংস্কৃত নয় এবং "শ্যাম" নাম সংস্কৃতে কৃষ্ণকায়-অধিবাসীদের নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল একরূপ মনে করবার কোন কারণ নাই। শ্যাম ও লো, এ দুটি নাম থাই জাতির দুটি বিশিষ্ট শাখার নাম বলেই অনুমান হয়। প্রাচীন অহোম বা অসাম নামটিও এই শ্যাম নামেরই অন্য রূপ। শ্যামরাজ্য স্থাপিত হয় মেনাম নদীর উপত্যকার উত্তর ভাগে এবং লবপুরি স্থাপিত হয় ঐ নদীর উপত্যকার দক্ষিণ ভাগে।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে যখন শ্যাম স্বাধীন রাজ্যে পর্য্যবসিত হল তখন তার নূতন নামকরণ হল—সুখোথাই বা সুখোদয়। রাম কাম্হেং নামক থাইদের এক রাজার চেষ্টাতেই এই রাজ্য স্বাধীন হয়। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সুখোদয়ের আধিপত্য অটুট থাকে। খৃষ্টীয় ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণে লবপুরির রাজারা প্রাধান্য লাভ করেন এবং অল্পকালের মধ্যে সুখোদয় রাজা লবপুরির অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। লবপুরি রাজ্যের নূতন রাজধানী অযুথিয়া বা অযোধ্যা খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতক পর্য্যন্ত শ্যামদেশের রাজধানী ছিল। এর পর নূতন রাজধানী হয় ব্যাঙ্কক।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বর্ত্তমান শ্যামরাজ্যের সৃষ্টি মাত্র খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে। তার পূর্বে এ প্রদেশ ছিল প্রাচীন হিন্দু ঔপনিবেশিক রাজ্য কম্বুজরাষ্ট্রের একটি অংশ মাত্র। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে 'থাই' (Thai) জাতির আক্রমণে কম্বুজরাষ্ট্র বিধ্বস্ত হলে একদিকে স্বাধীন শ্যাম-রাজ্য ও অন্যদিকে কাম্বোডিয়া রাজ্যের সৃষ্টি হয়।

ইন্দোচীন ও শ্যামরাজ্যের উত্তর ভাগের পার্বত্য অঞ্চলেও নানা স্বাধীন রাজ্যের সূত্রপাত হয়।

থাই জাতি নূতন স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করল বটে কিন্তু কোন নূতন সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করতে পারল না। তার কারণ তাদের কোন উন্নত সভ্যতা ছিল না। দক্ষিণ চীনের পার্ব্বত্য প্রদেশ আশ্রয় করে তারা নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিল বটে, কিন্তু নিজেরা কোন উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি করতে পারে নাই। সেই কারণে তারা শ্যামদেশের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সেই সংস্কৃতিকেই তারা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট করে নিজস্ব করে নেয়। তাই আজও শ্যামদেশের লিপি ভারতীয় লিপির একটি বিশিষ্ট রূপ। প্যালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্রই হচ্ছে তাদের একমাত্র ধর্ম্মশাস্ত্র। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রই তাদের Code of Law। শিল্প ও স্থাপত্যের ধারাও প্রাচীন পন্থাই অনুসরণ করে।

শ্যামদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন যুগের নানা নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। বিষ্ণুমন্দির ও শিবমন্দিরের সংখ্যাও কম নহে। দেবদেবীর মূর্ত্তির মধ্যে বিষ্ণু, শিব, গণেশ এবং লিঙ্গমূর্ত্তিও পাওয়া যায়। হিন্দুমন্দিরগুলি কম্বুজ ও চম্পার হিন্দুমন্দিরগুলির অনুরূপভাবে নির্ম্মিত। দেবমূর্ত্তি ও মন্দিরগুলি হতে বুঝতে পারা যায় যে প্রাচীনকালে কম্বুজের আধিপত্যকালে শ্যামদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্যাকরণ, তন্ত্রশাস্ত্র প্রভৃতি কম্বুজে অধীত হত। শ্যামদেশের হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই সমস্ত হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচলন ছিল এ কথা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। প্রাচীনযুগের একটি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের একটি শেষ নিদর্শন এখনো শ্যামদেশে আছে। এঁদের "ব্রুম" বা ব্রহ্ম বলা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে তারা বিশেষ পারদর্শী। রাজদরবারে বরাবরই তাদের কিছু প্রতিপত্তি আছে, কারণ রাজা বৌদ্ধ হলেও অভিষেকের সময় এই "ব্রুম" বা ব্রাহ্মণদের বিশেষ প্রয়োজন হয়। আরও অনেক ছোট খাটো অনুষ্ঠানেও তাদের ডাকা হয়। "ব্রুম"দের এই আধিপত্য হতে বুঝতে পারা যায় যে প্রাচীন যুগে এ দেশে ব্রাহ্মণের বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল।

শ্যামদেশ যখন কম্বুজের অন্তর্গত ছিল সেই যুগেই এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়। কিন্তু সে বৌদ্ধধর্ম্ম ছিল কম্বুজ ও যবদ্বীপে প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম। মহাযানী বৌদ্ধ দেবদেবীর যে সব মূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছে তা থেকেই এ কথা অনুমান করা যায়। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল বলে এ বৌদ্ধধর্ম্ম শ্যাম ও কম্বুজে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে নি। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে শ্যাম রাজ্য স্বাধীন হবার পর এবং থাই জাতির রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মদেশ হতে হীনযান বৌদ্ধমত শ্যামদেশে প্রচারিত হল। সেই সঙ্গে পালি ভাষার অনুশীলন এবং পালি ত্রিপিটকের অধ্যয়ন আরম্ভ হয়। এবং খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকে শ্যামদেশের রাজা সূর্য্যবংশ রামের আমন্ত্রণে সিংহল হতেও বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ শ্যামদেশে যান এবং বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিকল্পে নানা সহায়তা করেন।

পূর্ব্বেই বলেছি যে শ্যামদেশের Code of Law বা ব্যবহারশাস্ত্র হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র হতে সংগৃহীত। মনুসংহিতার সঙ্গে শ্যামদেশের প্রচলিত ব্যবহারশাস্ত্রের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। অনুমান হয় যে মনুসংহিতার কোন প্রাচীন অনুবাদ অবলম্বন করেই শ্যামদেশের ব্যবহারশাস্ত্র রচিত হয়েছিল।

স্বর্গবাস

(গল্প)

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

শ্যামবাজারের খালধারে কুণ্ডুবাবুদের প্রাসাদতুল্য বৃহৎ বাড়ী। একদিন জ্যৈষ্ঠের দুপুর বেলায় সুপ্রশস্ত বৈঠকখানা ঘরে 'ফ্যান্'-এর নীচে বসিয়া বাবুদের মেজকর্ত্তা তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গো লইয়া বর্ত্তমান যুগের অবস্থা সম্বন্ধে নানারূপ গাল-গল্প করিতেছিলেন। পাশের বাড়ীর সন্তোষবাবু বলিলেন—"দেওঘর থেকে সুবোধের ভাগনে একটা ছোটখাটো বাসার জন্যে লিখেছিলো। আজ এক মাস তন্ন-তন্ন কোরে খুঁজেও কোন কিনারা কোরে উঠতে পারলুম না। কি সাংঘাতিক ব্যাপার একবার বোঝ। বেলগেছের বাজারের কাছে একটা ধ্যাড্-ধেড়ে ভাঙ্গা .. .. কি চাই আপনাদের ?" মেজকর্ত্তা মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, খোলা দরজার সামনে, বাহিরের বারান্দায়, দুইটি যুবক দাঁড়াইয়া। সন্তোষবাবুর জিজ্ঞাসার উত্তরে একজন একটু আগাইয়া আসিয়া কহিল—"আপনাদের বাড়ীর ওই কোণের ঘরের দেয়ালের গায় 'টু-লেট্' মারা রয়েচে ; তাই দেখে আমরা আসচি। যদি

অসমাপ্ত কথার উপর মেজকর্ত্তা বলিয়া উঠিলেন—"জল-বিষ্টি-রোদে লেখাটা ত প্রায় উঠেই গেছে, তবুও ওটা পড়তে পেরে এসেচেন ! বছর পাঁচ-ছয় আগে ঐ টীন-প্লেট্খানা লাগানো হোয়েছিল। এমন শক্ত কোরে ওখানা পেরেকমারা যে কিছুতেই ওখানা ওঠাতে পারা যায় নি। আমাদের খান্-কুড়ি ভাড়া দেবার মত বাড়ী আগে ছিল বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে একখানিও আর নেই, আছে শুধু ঐ ভাঙ্গা-চোরা অস্পষ্ট টিন্-প্লেট্খানা।"

হেমবাবু মৃদু হাসির সহিত কহিলেন—"গান থেমে গেছে, আছে তার রেশটুকু , মানুষ চলে গেছে, আছে শুধু স্মৃতিটুকু।"

মেজকর্ত্তা কহিলেন—ঠিকই তাই। প্লেট্খানাতে আলকাতরার একটা পোঁচ্ড়া টেনে দিতে হবে।" তারপর অদূরে দণ্ডায়মান ভৃত্যের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"সুবো, আজই একটা পোঁচ্ড়া টেনে দিস্ ত। রোজ কতলোক যে ওইটে দেখে আসে। উঃ, কী জ্বালাতন রে বাবা।"

আগন্তুক যুবকদ্বয়ের একজন কহিল—"আমাদের একখানা শোবার আর ছোট্ট একখানা . ...

সন্তোষবাবু কহিলেন—"আরে মশাই, আধখানা, সিকিখানা, এমনকি একখানা ইঁট পর্য্যন্ত পাবার উপায় নেই। এঁদের ঐ কুড়িখানা বাড়াতে ৬৩টা 'ফ্যামিলী' গুঁতো-গুঁতি কোরে আছে। কোন কোন বাড়ীর ছাদও কেউ কেউ ভাড়া নিয়েচে।"

ম্লানমুখে যুবক দুইটি চলিয়া গেল। ইহাদের একজনের নাম গুণময়, অপরজনের নাম—জ্ঞানময়। দুইজন সহোদর ভ্রাতা। যশোর জেলায় বাড়ী। কলিকাতায় চাকুরীর 'হরিরলুট' হওয়াতে দেশ থেকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া দুই ভ্রাতা দুইটি চাকুরী দখল করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু চাকুরী দখল করিয়া ফেলিলেও, এপর্য্যন্ত সুবিধা মত বাসা দখল করিয়া উঠিতে পারে নাই। কালীঘাটে যাত্রী-তোলা একটা বাড়ীতে ছোট্ট

একখানা ঘর দৈনিক ভাড়া হিসাবে লইয়া, তাহাতেই কোনরকমে দিন কাটাইতেছে। কিন্তু একবতি সেই ঘরখানার দৈনিক ভাড়া—তিন টাকা। বড় ভাই গুণময় ম্যাট্রিক পাশ, সে বেতন পায়—১০৫ টাকা, ছোট জ্ঞানময় ক্লাস ফাইভ্ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল—তাহার বেতন ৭০ টাকা। এই ১৭৫ টাকার মধ্যে প্রতি মাসে ৯০ টাকা করিয়া ঘরভাড়া দিয়া বেতনের টাকারও 'হরিবলুট' হইয়া যাইতেছে। তাই উঠিয়া পড়িয়া দুই ভ্রাতায় ঘরের সন্ধান করিয়া ঘুরিতেছে, কিন্তু কোথাও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। গুণময় বিবাহিত সুতরাং সঙ্গে তাহার স্ত্রীও আছে। জ্ঞানময়—অবিবাহ ।

সন্ধ্যার পর তিনজনে বসিয়া চা খাইতে খাইতে ঘরের সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছিল। মেনকা—অর্থাৎ বউটি বলিল—"অত টাকা মাইনে পেয়েও ত কোন সুখ নেই। যা আসচে, তা'র সবই বেরিয়ে যাচ্ছে অথচ দেশে এর চেয়ে ভাল থেকে, ভাল খেয়ে দিন যাচ্ছিলো। আমি তাই তখনি বারণ কোরেছিলাম যে তাড়াতাড়ি কোনও .. ...

গুণময় কহিল—"পাড়াগাঁয় পড়ে থাকার চেয়ে, কোলকাতায় ত থাকা যাচ্ছে, সেইটেই ত মহালাভ' —বলিয়া গুণময় সিগারেটের প্যাকেট্ হইতে একটা সিগারেট্ বাহির করিয়া ধরাইল। জ্ঞানময়ও একটা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ইহার কিছু পরে একটা দালাল-গোছের লোক আসিয়া দরজার সামনে দাঁড়াইল। গুণময় কহিল—"কি খবর হে, কিছু সন্ধান করতে পারলে?"

লোকটি উৎসাহপূর্ণ স্বরে কহিল—"আমি, বাবু, না পারি কি? খুঁজে খুঁজে বের কোরে ফেলেছি। দুখানা ঘর, এই শ্যামবাজারে। যারা আছে, তারা পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই কাশী চলে যাবে। ভাড়াও বেশী নয়, ২৮ টাকা। পঞ্চাশ টাকা বকসিস্ আমার বরাতে রয়েচে, কে মারে?"

এই লোকটাকে পঞ্চাশ টাকা বকশিসের লোভ দেখাইয়া দুইখানা ঘরের জন্য বলা হইয়াছিল। লোকটির নাম যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠির কহিল—"তাহোলে কাল সকালে একবার চলুন, ঘরদু'খানা দেখে আসবেন, আর বাড়ীওলার সঙ্গে কথা পাকাপাকি করে আসবেন।

গুণময় বলিল—"তাহোলে ঠিক কাল আটটার সময় এসো, যাবো।"

এতদিনে গুণময় অকূলে কূল পাইল এবং পরম পরিতৃপ্তির সহিত আর একটা সিগারেট্ ধরাইয়া হাল্কা মনে হাল্কা ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।

* * *

পরদিন সকালে গুণময় যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ঘর দেখিতে বাহির হইল। ভিতরে গিয়া দেখবার সুবিধা হইল না; কারণ—ভদ্রগৃহস্থ যিনি এখন আছেন তাঁর মেয়ে-ছেলেরা সব রহিয়াছে। সুতরাং বাহির হইতেই যুধিষ্ঠির গুণময়কে একবার ঘুরাইয়া আনিল এবং বলিল—"এই চারটে জানালাওলা দুখানা পাশাপাশি ঘর, পূর্বদিকে রান্নাঘর আছে, তা'ছাড়া কল, পাইখানা, লাইট্—সবই সুবিধে। আপনার পক্ষে দিব্বি হবে। চলুন এইবার বাড়ীওলার কাছে যাওয়া যাক।"

বড় রাস্তা ধরিয়া কিছুদূর গিয়া একটা গলির মধ্যে টীনের বাড়ীতে বাড়ীওলা থাকেন। তিনি কহিলেন—"তিন মাসের ভাড়া য়্যাড্‌ভান্স্ দিতে হবে, নইলে বাড়ী ধরে রাখতে পারবো না। ভাড়াটে এখনো ওঠেনি, এরি মধ্যে রোজ পঞ্চাশজন কোরে লোক বাড়ীখানার

জন্যে আসচে। এই ত এখনিই দুটি বাবু এসেছিলো, আপনাদের আসার মিনিট পাঁচ সাত আগে।"

যুধিষ্ঠিরকে একটু আড়ালে লইয়া গিয়া গুণময় কহিল—"এক মাসের ভাড়া আমি য়্যাডভান্স দোবো এখন, এইটে বোলে বোয়ে বাড়ী করিয়ে দাও। তোমার বকশিস্ পঞ্চাশ তো পাবেই।"

যুধিষ্ঠির কহিল—"এ বাজারে ৩ মাস কেন, ৬ মাসের ভাড়াই অনেকে য়্যাডভান্স দিতে রাজী হ'বে। কিন্তু এ বাড়ী ফস্কালে আর মেলা দায় হবে। ভাড়া ত সেই দিতেই হবে, দিয়ে দিন বাবু, নইলে হয় ত আজই আর কেউ এসে বন্দোবস্ত করে ফেলবে।"

গুণময় ভাবিল, কথাটা ঠিক, বলিল—"দেখ, তোমার বকশিসের টাকাটা না হয় আজই দিয়ে দোবো এখন, তুমি একটু বোলে বুঝিয়ে এক মাসের ভাড়া য়্যাডভান্স' ....

কথাটা শেষ হইতে না দিয়া যুধিষ্ঠির কহিল 'শুনুন'। তাহপর মনে মনে যেন একটু মৎলব ভাবিয়া লইয়া কহিল—"বাড়ীতে আমার স্ত্রীর বড্ড অসুখ, আজ আমার খুবই টাকার দরকার। আমার বকশিসের টাকাটা আজ আমাকে দিয়ে দিন, আমি যেমন কোরে হোক বোলে বুঝিয়ে, ৩ মাসের জায়গায় যা'তে অন্ততঃ দু'মাসের য়্যাডভান্সেই কাজ হয় তার জন্য·· ·· ··আমার সঙ্গে অনেক দিনের প্রণয় কি না তাই · ..... ছেলেবেলায় নিতাই গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় একসঙ্গে পড়েচি ·· ··· ···তারপর ধরুন গিয়ে · ····· যা'ক, এ সুবিধে ছাড়া কিছুতেই হবে না, ঐ দু'মাসেরই 'য়্যাডভান্স' আজই দিয়ে দিন।"

তাহাই হইল, এবং ইহাছাড়া উপায়ও নাই। গুণময়ের ভাগ্য ভাল যে এত অল্প, এই বাজারে এরকম একটা বাসা তাহার মিলিয়া গেল। অতঃপর যুধিষ্ঠির অনেক বলিয়া কহিয়া বাড়ীওলাকে দুই মাসের 'য়্যাডভান্সে' সম্মত করাইল। ভদ্রলোক কহিলেন—"তাহোলে আর দেরী করবেন না। যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে এখনি দু'মাসের ভাড়া পাঠিয়ে দিন, ওর হাত দিয়েই আমি রসিদ পাঠিয়ে দো'বোখন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ঘর আপনারই রইলো; ডাল টাকা দিলেও আর কেউ পাবে না। আজ হোল ১৯ই, ওরা ২০শে উঠে যাবে। ২১শে থেকে আপনি দখল করতে পারবেন।"

বাসায় ফিরিয়া গুণময় জ্ঞানময়কে সব কথা বলিল। জ্ঞানময় কহিল—"খুব পাওয়া গেছে! এ আর হাতছাড়া করতে আছে?"

যুধিষ্ঠির আনন্দ এবং শঙ্কামিশ্রিত মৃদুহাস্যের সহিত বলিল—"বাবু, আমি যখন লেগেছি, তখন খুঁজে বার বোরবোই জানবেন। উঃ। কী ঘোরাটাই না ঘুরেচি! সকাল, বিকেল, দুপুর বাড়ীতে স্ত্রীর অসুখ, তার দিকে চেয়েও দেখিনি, তাই ত অসুখটা তার বেড়ে গেল। আজকে ১৬ ডাক্তার ওবে। আসবে, অনেকগুলি টাকা আজ খরচ।"

গুণময় যুধিষ্ঠিরের হাতে দুমাসের 'য়্যাড্ভান্স' ৫৬ টাকা ও তাহার বকশিস ৫০ টাকা একুনে ১০৬ টাকা দিয়া একটা মস্ত দায় থেকে যেন উদ্ধার পাইল। মেসকার উদ্দেশে কহিল—"ভাল কোরে এক কাপ চা কর, ভাল করে খাই একবার।"

যুধিষ্ঠির ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

* *

২১শে তারিখ।

আজ গুণময়দের নতুন বাসায় যাইবার দিন। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে দেখা গেল, সকাল বেলায় ঘরের

একধারে গুণময় গালে হাত দিয়া আর অন্যধারে জ্ঞানময় হাতে গাল রাখিয়া, নীরবে যেন ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছে।

হিন্দুর দেশ হিন্দুস্থানে 'তিন' সংখ্যার প্রভাব বড়ই বেশী। ত্রিশূল, ত্রিফলা, ত্রিপত্র, ত্রিবেদ, ত্রিভুবন প্রভৃতি তাহার উদাহরণ। সুতানুটী, গোবিন্দপুর এবং কলিকাতা—এই তিন স্থানের একত্র মিলনে যে সহর সৃষ্ট হইয়াছে, যাহার মাহাত্ম্য ও রহস্য ত্রিলোকেরও অজ্ঞাত, গুণময় ও জ্ঞানময়ের চিরজীবনের ধ্যানেও সে স্থানের লীলা বুঝিবার সাধ্য হইবে না, যেহেতু তাহা সদগুণের ও সর্ব্বজ্ঞানের অতীত। রূপকথা ছাড়িয়া দিয়া সোজা কথায় বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, শ্রীযুক্ত যুধিষ্ঠির সেদিন উক্তপ্রকারে একশত ছয় মুদ্রা হস্তগত করিয়া, আর এ-পথ মাড়ায় নাই। কোন্ মহাপ্রস্থানের পথে সে চলা-ফিরা করিতেছে তাহা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এই 'যশুরে' জমজদ্বয় তাহার কোন সন্ধান করিতে পারে নাই। শুধু সন্ধান পাইয়াছে যে তাহার কোন স্ত্রী নাই, সুতরাং 'মাথা নেই তার মাথাব্যথা'র মতই তাহার স্ত্রীর অসুখ হইয়াছিল। আর সন্ধান পাইয়াছে যে সানগরের সেই ঘর দুখানাতে যিনি ছিলেন—তিনিই আছেন, কাশী যান নাই এবং তিনিও বাড়ীর ভাড়াটিয়া নহেন, তিনিই বাড়ীর মালিক। আর যিনি ১৭ই তারিখের সকালেও সেই বাড়ীর মালিক ছিলেন এবং নিকটের কোন টীনের বাটীতে বাস করিতেন, নিতাই গুরুর পাঠশালায় যুধিষ্ঠিরের সেই মাণিকজোড় সহপাঠীটিরও কোন সন্ধান তাহারা করিতে পারে নাই। এইসব ব্যাপারের ফলে আজ ২১শে তারিখের প্রভাতে গুণময় গালে হাত দিয়া ও জ্ঞানময় হাতে গাল দিয়া ধ্যানস্থ অবস্থায় বসিয়াছিল।

কিছু পরে মেনকা দুইজনের জন্য দুই কাপ চা আনিয়া কহিল—'এ বাজারে শত চেষ্টা করেও কেউ কোথাও ঘর পাচ্চে না, আর তোমরা জোচ্চোরের কথায় ভুলে গেলে! বেশ হয়েছে! এখন—লোকটার যদি কখনো দেখা পাও ত তাকে আর দুটো টাকা দিয়ে দিও।"

চায়ে একটা চুমুক দিয়া গুণময় জিজ্ঞাসা করিল—তার মানে ?

"তার মানে, একশ ছ টাকাটা বড্ড বেখাপ্পা গোছের। ১০৮ সংখ্যাটাই হল আমাদের হিঁদুর ঘরে—শুভ সংখ্যা। ভবিষ্যতে কোনও দিন তাঁর দেখা—থুড়ি!—দর্শন পেলে, আর দুটো টাকা দিয়ে ওটা পূরণ কোরে দিও। দিয়ে, সকাল সন্ধ্যা দু'ভাই বোসে বোসে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত অর্থাৎ ১০৮ নাম জপ কোরো, ইহকাল পরকাল সুখে কাটবে।"

জ্ঞানময়ের হাতে সেদিনেরই একখানা দৈনিক কাগজ ছিল। দাদা-গুণময়ের মুখের দিকে চাহিয়া ভাই-জ্ঞানময় বলিল—"তা হোলে এই বাড়ীটার খবর আজ নেওয়া যাক, কি বল ?"

গুণময় কহিল—"আজ মানে ? এখনই—এই দণ্ডেই ওখানে যেতে হবে। তা'ও হয় ত গিয়ে শুনবি যে ভাড়া হোয়ে গেছে।"

কাগজখানায় একটা ছোট বাড়ীভাড়ার বিজ্ঞাপন ছিল। বাড়ীটা টালীগঞ্জে। গুণময় কহিল—"মোটেই আর দেরী করা নয়, এখনি বেরিয়ে পড়্। আমাদের মত হাজার-হাজার লোকের দৃষ্টি বিজ্ঞাপনটার ওপর পড়বে; আর পড়বা মাত্রই ছুটবে। বুঝলি না ?"

জ্ঞানময় তখনি শার্টটা গায়ে চড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং টালীগঞ্জের সেই ঠিকানায় পৌঁছিয়া দেখিল,

হাজার-হাজার না হইলেও ৫০।৬০ জন লোক সেই বাড়ীর সামনে ভীড় জমাইয়া ফেলিয়াছে। ভীড়ের মধ্যে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, ওড়িয়া, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী—সকল জাতিই আছে, একধারে একজন চীনাকেও দেখিতে পাওয়া গেল।

ভীড়ের ঠিক মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান বাড়ীওয়ালাকে সহজেই চিনিতে পারা গেল। তাঁর আলু-থালু বেশ, দর-দর ধারে সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতেছে। পরণের আটহাতি কাপড়খানা তাঁহার নাতিবৃহৎ ভুঁড়ি প্রদেশে আবদ্ধ থাকিতে ক্রমাগতই আপত্তি জানাইতেছে। এইরূপ অবস্থায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে তিনি সককে জোড়হাত করিয়া জানাইতেছেন—"মশাইরা, সব মিথ্যা। সব মিথ্যা। আমার কোন এক শত্রু আমাকে ভোগাবার জন্যে, নিজের পকেট থেকে পয়সা খরচ কোরে এই বিজ্ঞাপন দিয়েচে। ভাড়া দেবার মত আমার বাড়ী নেই। আপনারা

ভীড়ের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল—"তা হোলে কি আপনি বলতে চান, যে,

"আজ্ঞে হ্যাঁ, শুধু বলা নয়, এই জোড়হাত কোরে আপনাদের বলচি এ আমার কোনও শত্রুর কাজ। গোটা দু'-চ্চার টাকা বিজ্ঞাপন-খরচা কোরে আজ সারাদিন আমাকে নাকানি-চোবানি খাওয়াবার ফন্দি!" তারপর যেন একটু দম পাইয়া আবার বলিতে লাগিলেন—"এই সবে সকাল। কাগজখানা বেরুতে-না-বেরুতে এই আপনাদের একশো লোকের ভীড়, এখনো সারা দিন পড়ে রয়েছে। ঐ দেখুন, এইটুকু সময়ের মধ্যেই বৈঠকখানা ঘরের সাসির কাঁচ তিনখানা ভেঙ্গে গেছে, ধাক্কার চোটে দরজার খিলটা ছুটে গেছে। এখনো সারাদিন বাকী। আপনারা দয়া কোরে আমার কথা বিশ্বাস করুন। ভাড়া দেবার মত আমার কোনও বাড়ী নেই। মহাশত্রু আমার ভাগনে নেড়ার এই কাজ। আমার অপরাধের মধ্যে, সাতশো টাকা চেয়েছিল, তিনি 'রেস' খেলবেন বলে, আমি তা দিতে পারিনি। আপনারা দয়া করে

কিন্তু বেলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃই লোকের ভীড় আরও বাড়িয়া চলিল। জ্ঞানময় একধারে দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিল, তারপর উৎসাহহীন পদক্ষেপে বাসার দিকে প্রত্যাবর্তন করিল।

* * *

"মশাই গো। কি হয়?"

সকালবেলা গুণময় ও জ্ঞানময় ঘরের মধ্যে বসিয়াছিল যাত্রী-তোলা এই বাড়ীর মালিক নটবর বিশ্বাস দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। জ্ঞানময় কহিল—"কি খবর বিশ্বাস মশাই?"

নটবর একটু কাসিয়া গলাটা দোরস্ত করিয়া লইয়া কহিল—"খবর আর কিছুই নয়, ঘরখানার জন্য দিন দিন খদ্দেরের হুড়োহুড়ি পড়ে যাচ্চে। কি করি বলুন ত? এই দুর্দ্দিনে ত আর আপনাদের উঠে যান বলতে পারি না।

গুণময় কহিল—"তবে কি বলতে পারেন, সেইটে বলুন।"

"আপনাদের আর বেশী কি বলবো, আপনারা ভদ্রলোক। গেরস্তকে ভাড়া দেবার ত এ বাড়ী আমার নয় এ হোল যাত্রীতোলা বাড়ী। তা

জ্ঞানময় এতক্ষণ একদৃষ্টে বিশ্বাসের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, কহিল—"তা', কি করতে হবে বলুন।"

"দেখুন, যাত্রীদের আমি আর জায়গা দিতে পারচি না।—এই ঘরখানার জন্যে এখন রোজ কমপক্ষে পাঁচটা কোরে টাকা অক্লেশে পাওয়া যায়। তা, আপনারা হলেন ভদ্র-

লোক,— আপনাদের ত চলে যেতে বলতে পারি না। তা—পাঁচ টাকা থাক্, আপনারা ভালো লোক, আমিই না-হয় একটু লোকসান খাই, রোজ আর একটা কোরে টাকা না দিলে ত

"অর্থাৎ রোজ চার টাকা! তার মানে ১২০, এই এ বাড়ি একখানা ঘরের জন্যে।"—গুণময় চোখে কপালে তুলিয়া নটবরের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল; রাগে তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া পড়িল।

নটবর অত্যন্ত বিনয়ের সহিত কহিল—"কি করব বলুন, কোথাও একরত্তি স্থান পাবার যো নেই। ঘরের অভাবে কত যাত্রী আমাকে ফিরিয়ে দিতে হয়। তা, দৈনিক চারটে কোরে টাকা আমি চাইছি বিশেষ অন্যায় কিছু চাইনি।'

অত্যন্ত বিরক্তির ভাবে গুণময় কহিল—'না, খুবই ন্যায় কথা বলছেন। তবে, এই একখানা একরত্তি ঘরের জন্যে রোজ ৪ টাকা ভাড়া আমরা দিতে পারব না। আমরা চারদিকেই ঘরের সন্ধান করছি শীগগিরই আপনার ঘর ছেড়ে দেবো। কোথাও না পাই, ত যমের বাড়ী গিয়েও থাকবো।

নটবর অস্ফুটে কি বলিতে বলিতে চলিয়া গেল।

মেনকা আজ আদিগঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছিল ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"দেখ, মা-গঙ্গার দয়ায়, তোমাদের একটা সুন্দর বাসার সন্ধান নিয়ে এলুম। জ্ঞান ঠাকুরপো এ বাসায় গিয়ে বাস করলে রোজ ৩ টাকার বদলে একটা কোরে টাকা দিলেই বোধ হয় চলবে, কিম্বা তার কমেও হতে পারে। তা ছাড়া—তোমরা আনন্দ পাবে ষোল আনা, আর পুণ্যলাভ হবে—আঠারো আনা।"

জ্ঞানময় কহিল—"কোথায় বৌদি?"

"নাইতে গিয়ে দেখে এলুম, প্রকাণ্ড একখানা ভাঙ্গা নৌকো। গঙ্গার পাড়ের ওপর পড়ে রয়েছে। ঐটে ভাড়া নিয়ে, দিব্বি ওতে থাকা চলে। দিনরাত গঙ্গা হাওয়া তো বা খেতে পারবে, আর একেবারে মা-গঙ্গার বুকের ওপর বাস, পুণ্যি বাড়বার অত জায়গা হবে না।"

গুণময় কহিল—"যুধিষ্ঠিরকে পঞ্চাশ টাকা বকশিস্ কোরেছিলুম, তোমাকে দেখছি এরজন্যে হাজার টাকা বকশিস্ করবার দরকার।"

প্রত্যুত্তরে মেনকা কিছু একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কাহাকেও আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে সরিয়া পড়িল। যিনি আসিতেছিলেন, তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই কহিলেন—"এতদিন পরে জমিটা পরশু রেজেষ্ট্রি হোয়ে গেল।"

জ্ঞানময় কহিল—"বাঃ ক্ষিতীশবাবু, কোলকাতা সহরে দিনকাঠা জমি তো কিনে ফেল্লেন, বড় কম কথা নয়। এ বার বাড়ী একখানা তুলে ফেলুন আর কি।"

ক্ষিতীশবাবু ইহাদের দূর আত্মীয়, কহিলেন—"বাড়ী তোলা এখন অনেক দূরের কথা। বছর পাঁচেকের আগে তা আর ঘটে উঠবে না, তবে আসল জিনিস—জমিটা ত কেনা থাকলো।"

গুণময় জিজ্ঞাসা করিল—জমিটা কোথায় বলুন ত?"

"টালীগঞ্জ ফাঁড়ীর পাশ দিয়ে উত্তর দিকে যে রাস্তাটা গিয়েছে ঐ রাস্তায় খান পাঁচ-সাত বাড়ীর পরেই। জমিটার ওপর একখানা দোতলা ভাঙ্গা 'বাস্' দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাওয়া যাবে।"

"বাস্? কার বাস্?"

"যার জমি, সেই লোকটারই বাস্। তবে তাতে কিছু আর পদার্থ নেই। কলকব্জা সব খুলে নিয়ে গেছে, শুধু

'বডি'টা খাড়া হোয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জমির সঙ্গে ওখানা শুদ্ধু কিনে নিয়েছি—৭২ টাকায়।"

"দোতালা বাস্? কল-কব্জা কিছুই নেই?"

"কিছু না কিছু না। ঐ যে বল্লুম, খালি 'বডি' খানা দাঁড়িয়ে আছে; সাটগুলো পর্য্যন্ত সব খসে নিয়ে গেছে। ও বাস্ নিয়ে আর কোন কাজে লাগানো যাবে না। কিছু তক্তা-কাঠ খুলে বিক্রী করা যেতে পারে, আর বড়জোর উনুন ধরাবার কাজে লাগবে।"

"ওর জন্যে কত দিতে হোল আপনার?"

"পঁচাত্তর টাকা। তা, চেষ্টা-চরিত্তির করলে, শ'খানেক টাকায় ওটা বিক্রী করে দেওয়া যেতে পারে। দেখি, যদি খদ্দের পাই, ..

অতঃপর তিনজনে প্রায় ঘণ্টা-খানেক ধরিয়া নানারূপ আলাপ আলোচনা করিবার পর, গুণময় বাটীর পথে দিয়া ক্ষিতীশ বাবুর সহিত বাহির হইয়া গেল।

ইহারই দিন চার-পাঁচ পরে পাড়ার লোকে দেখিল, ক্ষিতীশ বাবুর জমীর উপরে অস্থি কঙ্কাল 'বাস'খানা নূতন রংয়ে রঞ্জিত হইয়া জ্বল জ্বল করিতেছে। উপরন্তু তার একপাশে খানিকটা স্থান দরমা দিয়া ঘিরিয়া রান্নার ব্যবস্থা হইয়াছে, বাকী অংশটা—হাওয়াখানা এবং শয়ন মন্দির। নীচের তলাটাকে—একযোগে বৈঠকখানা এবং শয়নঘরে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। বাসখানাকে ঘিরিয়া চারিদিকে দুই দশটা 'পাম' ও পাতাবাহারের টবও শোভা পাইতেছে।

পাড়ার লোক সহসা এই পরিবর্ত্তনে বিস্মিত হইয়া যখন থমকিয়া দাঁড়াইয়া 'বাস'খানার দিকে দেখিতেছিল, তখন হাওয়াখানার শয্যার উপর কাত্ হইয়া শুইয়া গুণময় জ্ঞানময়কে বলিল—"একশো টাকা খরচ করে এবার যে আরামে যে থাকতে পারবো, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। এ ক বছরের জন্যে বাড়ীভাড়ার হাত থেকে নিস্তার।"

তোলা নামে ডাক সাঁইতলানোর ছাঁদ—কল্ কল্ শব্দের মধ্যে নবা দরমার ও পাশ থেকে বলিয়া উঠিল— "এ আমাদের যেন স-শরীরে স্বর্গবাস ঘটলো।"

জ্ঞানময় খবরের কাগজখানা হইতে মাথা তুলিয়া কহিল—"কথাটা মিথ্যা নয় বৌদি।"

বাসখানার পূর্ব্বনাম ছিল—'স্বর্গ বথ'।

পরদিন সকালে দেখিল, স্বর্ণাক্ষরে তাহাতে লেখা রহিয়াছে—

'স্বর্গবাস'

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ

মা আসিয়াছেন। কেমনে জানিলে মা আসিয়াছেন? কৈ মা?—কেন, ঐ দেখ না কাশপুষ্পগুলির কত শুভ্র হাসি। সেফালি মায়ের চরণে লুটিয়া পড়িবার জন্য আনন্দে আত্মহারা, পদ্মগুলির ত কথাই নাই। প্রাবৃটের ঘনগর্জ্জনের গাম্ভীর্য্য ও বিষণ্ণতা, কৈ আর ত নাই।—দিগ্বসনের ওখানে সেখানে এক খানা মাত্র শুভ্র মেঘ আগমনী অগ্রদূত রূপে যেন গগনের ঐ এককোণে উদিত হইয়াছেন। ধ্যানীর অচঞ্চল চিত্তের ন্যায় নক্ষত্রখচিত স্থির

আকাশের গাঢ় নীলিমা চন্দ্রালোকের স্বর্ণাভ ভরপুর। শিশিরসিক্ত তৃণরাজি। সদ্যস্নাতা শস্য-শ্যামলা সমুদ্রমেখলা ধরিত্রী ভক্তির অশ্রুপুলকে ভাবগম্ভীরা ও হাস্যময়ী মায়ের সাড়া পাইয়া পাখীগুলি মনের আনন্দে প্রাণ খুলিয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্রোতস্বিনীর সে কলুষপ্রবাহ আর নাই, বেগও বড় মন্দ, সাধুলোকের চিত্তের ন্যায় জলও কত স্বচ্ছ, তবুও এখন ক্ষীণা,—মৃদু কল্লোল করিতে করিতে মায়ের আগমনীবার্ত্তা দেশে দেশে প্রচার করিয়া চলিয়াছে — মা যে আসিতেছেন। দুর্দ্দান্ত পবন কাননে কাননে বাগান কান্তারে কত কি সুগন্ধ পরাগ গায় মাখিয়াছে, মা আসিয়াছেন জানিয়া। শিষ্ট শিশুটির মত ঐ কুলনাদিনীর বক্ষে মায়ের অঞ্চলে মুখ লুকাইতে গিয়া অঞ্চলখানিকে কুসুমপরাগলাঞ্ছিত করিতেছে।

মা ত আসিয়াছেন, কৈ আমরা ত মায়ের আগমনে কোন সাড়াই বুঝিতে পারিতেছি না।—বুঝিব কেমন করিয়া? বাহিরের অনল অনিল, সলিল নদী তোমার আমার চক্ষে অচেতন। বৃক্ষলতা, পশু পক্ষী তোমার আমার দৃষ্টিতে অর্দ্ধচেতন, অজ্ঞানী। ওদেরও কিছু সংজ্ঞা আছে। চিন্ময়ী মা যে আবার জগন্ময়ী। মানুষের মন যেমন দম্ভ অহংকারের কালিমায় ঢাকা, বাহিরের প্রকৃতিতে তেমনটি নাই। উহারা সাড়া পায়, আমরা পাই না। সর্ব্বব্যাপিনী মা আমার, সকলের হৃদয় গুহার গভীরতম প্রদেশে স্বমহিমায় চিরপ্রকাশিতা আছেন। আমরা কর্ম্মের ফেরে বাহিরের দিকে মুখ করিয়া জগৎ দেখিয়া ভুলিয়া আছি,—মাকে দেখি না। সূর্য্য মেঘে ঢাকা পড়িয়া, এবং পুকুরের জল পানার আবরণে যেমন অদৃশ্য হয়, দুষ্কৃতির কালিমায়, আলস্য অনিচ্ছার আবরণে, অবিশ্বাসে যুক্তিতর্কের কুজ্ঝটিকায়; নিজের প্রাণের প্রাণ যিনি ("প্রাণস্য প্রাণোযৎ" শ্রুতিঃ)—যাহা হইতে জন্মিয়া যাহাতেই আছি ("যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি"—শ্রুতি)—তাঁহাকে আর দেখিতে পাই না। কত দূর মনে করিতেছি। উচ্চ প্রাণী বলিয়া অভিমানী আমরা—আমরা ত তাঁর প্রকাশ অনুভব করিতে পারিতেছি না। আবার মত সকলেই কি মায়ের আগমনে মায়ের সাড়া পায় না? —তা হবে কেন? ঐ শোন দিকে দিকে বাজে বোধনবাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে। 'গৌরী আমার আসবে ঘরে'। মেনকা ত গৌরীর জন্য কত আয়োজন করিতেছেন। নন্দনন্দা গিরিবরনে শরৎশ্রীর অপূর্ব শোভা। গৃহস্থ সাজিয়াছে ঐ ত আমার আদরিণী মা এলো। অঙ্গন সুপরিস্কৃত বিচিত্র আলেপনে গৃহভিত্তি কত সুন্দর, মণ্ডপের দ্বারে দ্বারে ধ্বজপতাকার অপূর্ব বিন্যাস, গৃহে গৃহে ফুলেফলে পত্রেমাল্যে পবিত্র নানা দ্রব্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ। কত রকম বিচিত্র মাল্যানুলেপনপরিচ্ছদে দেহ পবিত্র করিয়া গৃহস্থ আজ মায়ের পূজার জন্য কত ব্যস্ত,—কত ব্যগ্র।

কে এ মা? মা কি সত্য সত্যই আসেন?—তা আবার জিজ্ঞাসা কর? এ মা—তোমার আমার, দেবদানবগন্ধর্ব্ব, যক্ষরাক্ষস, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা জল বাতাস, সকলের মা।—অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী—জগজ্জননী ভুবনেশ্বরী। দেখ দেখি চণ্ডীমণ্ডপ আলোকিত করিয়া মুকুটোজ্জ্বল জটাজুটধারিণী, ত্রিনয়না, দশপ্রহরণধারিণী দশভুজা, অতসীপুষ্পবর্ণাভা ঐ যে মা দাঁড়াইয়া। ভক্তের প্রাণের ব্যাকুলতায় মা কি না আসিয়া থাকিতে পারেন? মা আমার পরব্রহ্ম-স্বরূপিণী। দেব্যুপনিষদে মাই বলিতেছেন, "অহং-ব্রহ্মস্বরূপিণী"। মা আমার নিরাকারা হইয়াও সাকারা, —অমূর্ত্তা হইয়াও, নিত্যা হইয়াও, জগন্মূর্ত্তি ("নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।" শ্রীশ্রীচণ্ডী)। মা আবার

বিরাটে জগন্মূর্ত্তি—দ্যৌকিরীটিনী, নক্ষত্রমেখলা, চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি-নয়না হইয়াও, দেবতাদের কার্য্য সাধন করিতে, দুষ্কৃতের দমন করিয়া তাঁহার একান্ত ভক্তজনগণকে রক্ষা করিতে,—সর্ব্বশক্তিময়ী মা আমার—নিজ অলৌকিক মায়াশক্তি অবলম্বন করিয়া দেহীর মত হইয়া আবির্ভূতা হয়েন। ("দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং আবির্ভবতি সা যদা। উৎপন্নেতি তদা লোকে নিত্যাপি সাপ্যভিধীয়তে।"—শ্রীশ্রীচণ্ডী।) ভক্ত চায় তার নিজের মত করিয়া তাঁকে পাইতে, নিজের মত করিয়া সব দিয়া সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সেবা করিতে। তাই মা ভক্তের জন্য ভক্তের মনের মত হইয়া আসেন। গোড়ার এরই তাঁকে মাই বল আর বাবাই বল, তিনি আসেন। ("ভক্ত চিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবান্ অজঃ।") আসিয়া ভক্তের প্রাণভরা সেবা গ্রহণ করিয়া ভক্তকে কৃতার্থ করেন। রাজাবাণীর প্রাণের ডাকে বিশ্বজন-মোহিনী বিশ্বরাণী গৌরী মা আমার গিরিরাজমহিষী মেনকার গর্ভ সম্ভূতা। অহঙ্কারদৃপ্ত ইন্দ্রাদিদেবগণের সম্মুখে মা আসিলেন,—"উমা হৈমবতী" আকাশে আবির্ভূতা হইয়া দেবগণের বিজয়গর্ব্ব চূর্ণ করিলেন; অম্ভৃর্ণঋষির কন্যা,—বাক্; মা তাহার আত্মার আত্মস্বরূপে স্বরূপ প্রকাশ করিলেন। ঋষিকন্যা বুঝিলেন স্বরূপে তিনি মাই। (দেবীসূক্ত)। যখনই জীব বিপন্ন হইয়া, অনন্যশরণ হইয়া মায়ের শরণ লয় তখনই মা আসেন। মায়ের সন্তানের প্রতি এত করুণা—এত অনুগ্রহ। বড় বিপন্ন রাজ্যভ্রষ্ট রাজা সুরথ। বড়ই লাঞ্ছিত স্বজনপরিত্যক্ত বৈশ্য সমাধি। মাতৃতত্ত্বজ্ঞ মহামুনি মেধস বলিলেন, তোমরা মায়ের শরণ লও। ভোগের জন্য তাঁকে ডাকিলে যাহা চাও তাহাই পাইবে। আর চিরতরে দুঃখের হাত হইতে মুক্তি চাও ত মা তাহাই দিবেন। ('সৈষারাধিতা নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা" শ্রীশ্রীচণ্ডী)। মধুকৈটভভীত্যাতুর ব্রহ্মার ডাকে মা মহাকালী মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া ব্রহ্মাকে রক্ষা করিলেন। মহিষাসুরলাঞ্ছিত স্বর্গভ্রষ্ট দেবতাগণের দুঃখে করুণাময়ী মা প্রত্যেক দেবদেহ হইতে আবির্ভূতা অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী মহিষমর্দ্দিনী। মা দেবতাদিগকে অসুরের হাত হইতে রক্ষা করিলেন। শুম্ভ নিশুম্ভের অত্যাচারে প্রপীড়িত দেবগণের স্তবে কৌশিকী রূপে মনোমোহিনী মূর্ত্তিতে অসুরদল ধ্বংস করিলেন। মা যে ভক্ত সন্তানের জন্য নিজেই রণোন্মাদিনী হইয়া ভক্তকে রক্ষা করেন। ('সমদং রুণোম্যহং" শ্রীশ্রীদেবীসূক্ত)। আর উন্মার্গগামী, জগতের অকল্যাণকারী মায়ের অসুর সন্তানগণকে—শস্ত্রাঘাতে তাহাদের অসুর দেহ ধ্বংস করিয়া—পবিত্র করিয়া লয়েন। মা যে পরম কল্যাণকারিণী কল্যাণময়ী সর্ব্বমঙ্গলা। আজ সেদিনও মা আমার 'তনয়ারূপেতে বামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া। মা আমার দক্ষিণেশ্বরের ব্রাহ্মণসন্তানের সঙ্গে কত না কথা কহিয়াছেন। আরও কত শত সহস্র ভাগ্যবান কত শত সহস্ররূপে মাকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। কয়জনের কথা বা জানা যায়, কয়জনে বা প্রকাশ করে। নানা জাতিতে নানারূপে মা স্বীয় লীলা প্রকাশ করেন।—মা সত্যসত্যই আসেন। সমকালে স্বরূপে নিরাকারা, স্বীয় মায়াশক্তিতে জগন্মূর্ত্তি মা—অবতীর্ণ হইয়া দুর্গা, কালী নানারূপে জগৎ রক্ষা করেন। আবার প্রতি জীবহৃদয়ে মাই আত্মস্বরূপা। শ্রুতি, পুরাণ, ইতিহাস ভক্তগণ সকলেই বলিতেছেন—সাক্ষ্য দিতেছেন—মা আসেন, সত্যসত্যই আসেন। আসিয়া জীবের দুঃখ দূর করেন।—আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য, এমন মা থাকিতে আমাদের দুঃখ দৈন্য যায় না। আমরা মাকে ডাকি না, মায়ের পূজা ঠিক ঠিক করি না। তাই মায়ের কৃপায় বঞ্চিত আমাদের দুঃখের অবধি নাই।

ঐ বোধনের বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে, এস না সকলে প্রাণমন ঐক্য করিয়া, গোবৎস যেমন গাভীকে ডাকে, শিশু যেমন জননীর জন্য কাঁদিয়া আকুল হয়, তেমনটি করিয়া প্রাণ মন বাক্য সব এক করিয়া – মাকে ডাকিয়া মাকে জাগাও দেখি। বল 'বড় দুঃখে বড় জ্বালায় ভুগিতেছি, অন্ন নাই বস্ত্র নাই স্বাস্থ্য নাই, নাই বলিতে কিছুই যে নাই। মা এস ; এস মা দুঃখ দূর কর। সন্তানের দুঃখ মা ছাড়া কে [illegible] করিবে ? বড়ই অসহায় আমরা। যার কেহ নাই তুমি আছ তার। চিন্ময়ী আদ্যাশক্তি মা জাগ। অন্তর্য্যামিণি, প্রকাশিতা হও। তিথি নক্ষত্র যোগে কালস্বরূপিনী মা মহাসপ্তমী মহাঅষ্টমী মহানবমীরূপে সমাগতা। কল্যাণময়ীর করুণা লাভ করিতে চাওত এই শুভমুহূর্ত্তে মায়ের শরণ লও। চিৎসাগরে মিশিতে চাও ত এই শুভলগ্নে কালস্রোতের টানে আপনাকে মিশাইয়া দাও। পৃথিবীব্যাপী ধ্বংস-লীলা, পৃথিবীব্যাপী হাহাকার। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কত শত দুঃখ আজ জীবের। এস, আমরা সর্ব্বশক্তিময়ী মাকে ডাকি। মায়ের কৃপায়—জগতে শান্তি আসিবেই। যাঁর ইচ্ছায় লোকক্ষয়কারী ধ্বংসলীলা, তাঁরই ইচ্ছায় শান্তি আসিবে।

ডাকিতে ত ইচ্ছা করে, ডাকিতে ত পারি না। আমার বাক্য মনপ্রাণ ত কলিকল্মষকলুষিত। নিজের কাছে ত আর কিছু গোপন নাই। প্রাণে মনে ব্যাকুল হইয়া ডাকার মত যোগ্যতাও ত আমার নাই। বড় দীন আমি। কেমন করিয়া মাকে ডাকিব ? কেমন করিয়া মাকে পূজা করি তাহাত জানিনা ; কি দিয়া পূজা করি ? আমার যে কিছুই সম্বল নাই। – তাতে তোমার চিন্তা কি ? মা যে অকিঞ্চন ধন রে। যারা ভাবে, 'আমরা পূজা করি বা পূজা করিতে পারি,' তাদের বৃথা দম্ভ। দেহ মন বুদ্ধি—'আমিত্ব" পর্য্যন্ত সবই মায়ের দেওয়া। সন্তানের নিজস্ব বলিতে কি আছে বলত ? যেটুকু শক্তি তিনি দিয়াছেন সেই টুকু দিয়াই এস মাকে ডাকি। মা যে আমার বিশ্বরাণী। মায়ের অফুরন্ত ভাণ্ডারে কিসের অভাব ? রাজকোষের নানারত্নের আভরণে দাসদাসীগণ রাজরাণীকে নানা সাজে সজ্জিত করে, রাজভাণ্ডারের চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় খাদ্যদ্রব্যে রাজদম্পতির তৃপ্তি বিধান করে, রাজপ্রাসাদের অপূর্ব্ব শয্যারচনায় নানা উপচারে রাজরাণীর মনোরঞ্জন করে। এই প্রকারে সেবাদ্বারা রাজদম্পতির প্রসন্নতা লাভ করিয়া রাজকৃপায় তাহাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ হয়। জগন্মাতা বিশ্বেশ্বরীর সন্তান আমরা ; এস, আমরাও মায়ের দ্রব্যে মায়ের পূজা করিয়া কৃতার্থ হই।

মাকে পূজা করিতে বল, আমিত মাকে দেখি নাই পূজা করিব কেমন করিয়া ? —আরে, মাকে পাবার জন্যইত পূজা। যাঁহারা মাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের দেওয়া মায়ের রূপের অপূর্ব্ব বর্ণনা, অপূর্ব্ব লীলার অমৃতময়ী কথা—শাস্ত্রমুখে, মহাজনমুখে জানিয়া লও। অচিন্ত্যমূর্ত্তি, অচিন্ত্যশক্তি মা, অব্যক্ত হইয়াও ভক্তের আকুল আহ্বানে শুদ্ধসত্ত্বের চিন্ময়ীমূর্ত্তিতে ভক্তজন-মনমোহন করিয়া প্রকটিত হয়েন। কায়মনোবাক্য পবিত্র করিয়া সর্ব্বজনহৃদবিহারিণীকে আপনার হৃদয়-কন্দরে ধ্যাননেত্রে নিরীক্ষণ কর। মানসকল্পনায় মন যাহা দিতে চায়, মন যতদূর দিতে পারে তত তত উপচারে মনে মনে মায়ের অর্চ্চনা কর। বাহিরে মায়ের মৃন্ময়ীমূর্ত্তিতে ভাবের তীব্রতায় ধ্যানের গাম্ভীর্য্যে মায়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া মায়ের দেওয়া পত্রেপুষ্পে, ফলেজলে, নানা উপচারে মায়ে পূজা কর। রাজা সুরথ, বৈশ্য সমাধি,— মহামুনি মেধসের অনুগ্রহে মায়ের তত্ত্ব অবধারণ করিয়া,

মায়ের মৃন্ময়ীমূর্ত্তি রচনা করতঃ—কখন নিরাহারে, কখন মিতাহারা হইয়া, সর্ব্বদা তন্মনস্ক থাকিয়া,— মনেপ্রাণে মায়ের ভাবে বিভোর হইয়া—পত্রপুষ্প, ফলজল, ধূপ দীপ নানা উপাচারে—তিন বৎসর ব্যাপিয়া অনন্যমনে মায়ের অর্চ্চনা করিতে করিতে মায়ের প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিল। সুরথ ও সমাধির ভাগ্যে মায়ের দেখা মিলিয়াছিল। তুমিও তেমনি ভাবে কায়মনোবাক্য পবিত্র করিয়া এই শুভ মুহূর্ত্তে মাকে ডাক দেখি। মায়ের প্রসন্নতা মিলিবেই।

মায়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে ভক্তের হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে, হৃদপদ্মে জগদম্বার ধ্যেয় মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভক্ত দেখিতেছেন,—জ্যোতিচ্ছটায় চিত্তাকাশের দশদিক্ আলোকিত করিয়া হাস্যময়ী জটাজুটধারিণী ত্রিনয়না সিংহবাহিনী অসুরমর্দ্দিনী করুণার্দ্র নয়নে ভক্তের প্রতি চাহিয়া আছেন। আনন্দ বিহ্বল সাধক শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ তন্মাত্রায় মাকে সাজাইয়া তৃপ্ত করিয়া 'মনঃ'পুষ্প মায়ের শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "মা, জন্ম জন্ম কত দুঃখে জ্বলিয়াছি। বড় সাধ, তোর স্বরূপে স্থিতিলাভ করিয়া মায়ের কোলে চির বিশ্রাম লাভ করি। এই আমার "অহং"কার তোমার সঙ্গে চিরব্যবধান করিয়া রাখিয়াছে। অন্তর্যামিনী মা আমার, এই 'অহং'টিকে তুমি গ্রহণ কর। আমি তোমার হইয়া ধন্য হইয়া যাই।" —মায়ের অপূর্ব্বস্পর্শে ভক্তের অন্তঃকরণ আপ্যায়িত হইয়াছে। পুলকে রোমরাজি কণ্টকিত, ভক্তের চক্ষে অশ্রুধারা। ভক্তের দৃষ্টি বহির্মুখে প্রবাহিত হইতেই দেখে চণ্ডীমণ্ডপ আলো করিয়া মা সম্মুখে। "মা আসিয়াছ, 'কি দিয়া পূজিব তোমায় কি আছে আমার'? ছেলে খেলার মত আমি তোমার বিশ্বভাণ্ডারের তোমার দেওয়ার ফলমূল পত্রপুষ্প যৎকিঞ্চিৎ যাহা কিছু, তোমার দেওয়া শক্তিতে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি; মা, করুণাময়ি, তোমার ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়া তাহা তুমি গ্রহণ কর। এতই আমাদের দুর্ভাগ্য দুর্দ্দশা, একটু বিশুদ্ধ ঘৃত, শর্করা, মধু যে তোমাকে দিব তাহারও উপায় নাই। মহামূল্য রত্নরাজি কোথায় পাইব। সামান্য বসন ভূষণ আজ সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। তুমি ত সবই জান, সবই দেখ। মা প্রসন্ন হও। মা তুমি মহামহিমময়ী; অবোধ ছেলের পূজাত ধূলাখেলা। হে মায়ের কৃতী সন্তানগণ, তোমরা আমার সহায় হও। তোমরা যুগে যুগে মাকে দেখিয়াছ, মাকে ডাকিয়াছ; আজিও দেখ, আজিও ডাক। হে ব্রহ্মা বিষ্ণুরুদ্র, দেবদানব-গন্ধর্ব্ব, যক্ষরাক্ষসকিন্নর, মনুঋষিদেবর্ষিসিদ্ধগণ, সূর্য্যচন্দ্র-মাসঋতুসংবৎসর, নদীপর্ব্বতসাগর, যে যেখানে আছ তোমরা আসিয়া আমার মাকে স্নান করাও, মাকে সাজাও, মায়ের আরতি কর, মায়ের অর্চ্চনা কর। ক্ষুদ্র আমি, তোমাদের অর্চ্চনা দেখিয়া দেখিয়া কৃতার্থ হই। আর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আমার যৎকিঞ্চিৎ উপচারে মায়ের অর্চ্চনা করিয়া দুর্লভ মানব জন্ম সার্থক করি। 'মা, আমি অকিঞ্চন, তোমার দেওয়া মনপ্রাণ দিয়া, তোমার দেওয়া উপচারে, তোমারই প্রতিমা অবলম্বনে তোমার এই পূজা মা, তুমি গ্রহণ কর। আমি ত আর কিছু পারি না। আমার অপরাধ ক্ষমা কর।' চতুরানন ব্রহ্মা, ভাগ্যবান্ ঋষিগণ, শরণাগত দেবগণ তোমার কত কত স্তব করিয়াছেন। মূর্খ আমি। আমি তোমার মাহাত্ম্য কি শুনাইব তোমাকে। আমি তোমারই দেওয়া বাক্যে তোমারই বড় প্রিয় সপ্তশতী মহামন্ত্রে (শ্রীশ্রীচণ্ডী) তোমার লীলা তোমার কাছে পাঠ করিতেছি। তুমি শ্রবণ কর, তুমি প্রসন্ন হও। 'দেবি, প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ। প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।" মা, আমাকে

তোমার করিয়া লও। তোমার শ্রীচরণে প্রপন্ন হইবার প্রবৃত্তি, প্রপন্ন হইবার শক্তি দেও মা। মা মহাবিদ্যে, তোমার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ আমরা, তোমার মহাদেবী ভাব বিস্মৃত হইয়া, তোমার আসুরীমূর্ত্তির সেবা করিয়া বড়ই দুর্দ্দশাগ্রস্ত। তুমি ত সকল দুঃখ দূর কর মা। "দুর্গোত্তারিণী দুর্গে ত্বং"। "মাতঃ প্রসীদ"। হিংসা-দ্বেষে জর্জ্জরিত পৃথিবীর কামোপভোগপরায়ণ নরনারী-কলহের বহ্নিস্তূপে পতঙ্গের ন্যায় ধ্বংসমুখে ছুটিয়াছে। দম্ভদর্পের প্রপীড়নে লোক সকল "ত্রাহি" "ত্রাহি" আর্ত্তনাদ করিতেছে। এই দুর্দ্দিনে, সর্ব্বকল্যাণকারিণী সর্ব্বমঙ্গলা তুমি, তুমি ছাড়া কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? মা ত্রাণ কর, বিশ্বকে রক্ষা কর। 'ত্রাহি দুর্গে বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বম্।' যে তোমার শরণ লয় সেই দীন সন্তানকে, সেই আর্ত্তজীবকে, তুমি ত্রাণ কর; ইহাই তোমার স্বভাব। আমাদের আর্ত্তি, সকলের আর্ত্তি হরণ কর মা। অক্ষম আমরা কি আর করিতে পারি মা? আমাদের বুদ্ধি শুদ্ধদিকে পরিচালিত কর। তোমার শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতেছি। মা তুমি প্রসন্ন হও।

"শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোহস্তুতে॥"

উপনদী

(উপন্যাস)

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

(১)

নদী তাহাকে বলা যায় না। উপনদী বা শাখানদী—শীর্ণজলধারায় তাহার উদ্দাম চঞ্চলতা জাগে না। গতির মাঝে তাহার কোন তরঙ্গোচ্ছ্বাস নাই। একই ধারায় শীর্ণ নদীটি বহিয়া চলিয়াছে কিন্তু ইহারই বুকে নাকি একদিন জোয়ার ভাঁটার গতিপ্রবাহ ছিল। পূর্ণিমার জোয়ারে প্লাবনের ঢেউ জাগিত। বন্যাপ্রবাহে অনেকবার নাকি গ্রাম ভাসাইয়াছে—ভাঙ্গনের ক্ষুধায় অনেক ঘরবাড়ি গ্রাস করিয়াছে।

সে কথা এখন উপকথা! বর্ত্তমানে সে নদী মজিয়া আসিয়াছে।

সুলেখার জীবন কথাও তাহাই। নারী—অথচ নারীর আদর্শ সংস্কার তাহার নাই। হৃদয়াবেগের যে চঞ্চলগতি উদ্দাম থাকিলে আজ তাহাকে ঘর সংসারের মাঝে আদর্শ ঘরণীরূপে মানাইত, ছেলেপুলের মাঝে সংসারধর্ম সাজাইয়া স্বামীকে অনুশাসনে বশ্যতা স্বীকার করাইতে পারিত—সোনাদানায় বাড়ি-গাড়িতে বহু নারীর ঈর্ষার কারণ হইতে পারিত—স্বেচ্ছায় সে সুখ সৌভাগ্যকে সে বর্জ্জন করিয়া যৌবনের প্রান্তসীমায় আসিয়া আজ সে এই উপনদীরই সামিল হইয়াছে। তাহার রুদ্ধ জীবনস্রোতে এখন আর জোয়ারের প্লাবন জাগে না। তবুও সন্ধ্যার

ধূসরতায় এই মজিয়া-আসা নদীর তটরেখায় বসিয়া দিগন্তের সূর্য্যাস্তের পানে তাকাইয়া মনটী তাহার বিষণ্ণ হইয়াই ওঠে।

তবুও এই একটিক্ষণই তাহার দৈনন্দিন জীবনের একটি বিশেষ মুহূর্ত। গোধূলির রক্তরাগে এইখানে আসিয়া দিনান্তে একবার সে আত্ম-উপলব্ধির বিশেষ একটা আমেজকে উপভোগ করে। মন তাহার কারুণ্যে ভরিয়া উঠে; উঠুক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; তবুও তাহার মাঝে যেন একটা প্রচ্ছন্ন দুঃখ বিলাস আছে। তাহার ব্যর্থ জীবনের বিশেষ একটি করুণ সুর-মূর্চ্ছনা বিষণ্ণ চিত্তকে তাহার মধুর তৃপ্তির আমেজে ভরাইয়া তোলে।

সুলেখার এই সেণ্টিমেণ্ট্যালিটিকে লইয়া আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক এবং জড়বাদী সাহিত্যের যুগে এমন করিয়া রঙ ফলাইবার প্রয়োজন কি? হয়ত সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিবে। সুলেখার সম্পূর্ণ পরিচয় জানিতে হইলে এগুলি বাদ দিলে চলিবে না। অতীতের পটভূমির উপর না আঁকিলে তাহার বর্ত্তমান রূপও পরিস্ফুট হইবে না।

সুলেখা শিক্ষিতা—হ্যাঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী তাহার আছে—ইচ্ছা করিলে এই বয়সেও তাহাকে স্মার্ট সাজাইয়া আলোকোজ্জল দু'একটি নাগরিক ড্রইংরুমে বসাইয়া দু'একখানি উদাসী রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ানো চলে—তাহার এ্যানিমিক্ দেহযষ্টি ঘিরিয়া এখনও হয়তো মধুপের গুঞ্জনধ্বনি গুঞ্জরিয়া উঠিতে পারে। পঁয়ত্রিশ বছরের ঘুণধরা মন এবং অবসাদক্লিষ্ট পরিশ্রান্ত অন্নজীর্ণ দেহের মাঝেও হয়ত [illegible] এখনও নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিতে পারে—পুরাতন পৃথিবীকে অবজ্ঞা করিয়া নতুন সভ্যতার সংজ্ঞা দিতে পারে—"Chastity means passion—chastity means neurasthenia. And passion and neurasthenia means instability. And instabilitty means the end of civilization. You can't have a civilization without plenty of pleasant vices".

বুদ্ধিপ্রধান সমাজে সুলেখার এইরূপ হওয়াই উচিত ছিল—হ্যাঁ আমিও মনে করি সুলেখা এইরূপ হইলে আমার অন্ততঃ কিছু সুবিধা হইত। সুলেখার জীবনকাহিনী আঁকিতে অনেকটা স্বস্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করিতাম—কিংবা সুলেখা যদি কোন সিনেমা অভিনেত্রী হইত—পঁয়ত্রিশ বছরের বিগতযৌবনা নারী সুলেখাকে লইয়াও তাহা হইলে রঙিন কোন কাহিনীর অবতারণা করিতে পারিতাম—কিন্তু আমার নিতান্তই দুর্ভাগ্য সুলেখা ইহাদের কোনটিই হইল না।

অথচ সুলেখা এতদিন নাগরিক জীবনই যাপন করিয়াছে, বহু ঈর্ষিত দৃষ্টির মাঝে চলাফেরা করিতে করিতে বহু দীর্ঘশ্বাসের বোঝা কুড়াইয়া নারীগর্ব অনুভব করিয়াছে। চেহারায় যত না হোক্ বেশভূষায় ছিল তাহার অতি মাত্রায় স্মার্টনেস। চারবছর কলেজী জীবনে বহু তরুণ সহপাঠীকে সে শুধু তাহার শাড়ীর রঙে ঘায়েল করিয়াছে। ইহার পর আবার সংগীতকলায়ও ছিল তাহার পারদর্শিতা। ইনাইয়া বিনাইয়া রবীন্দ্রসংগীত গাহিতে এবং পূরবী ও মুলতানে সেতারের সুরঝংকারে পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করিতেও এমন কিছু অক্ষমতা তাহার ছিল না। সে বয়সটা সুলেখার কাছে ছিল যেন একটা হালকা হাওয়ার ঝলক—আকাশের গায়ে সঞ্চরণশীল একটুকরো রঙিন মেঘ। প্রেম! হ্যাঁ প্রেমেও পড়িয়াছে সে কত নতুন ঢঙে—প্রেমকরা, মন দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার সুলেখার সমাজে ছিল একটা অত্যন্ত সাধারণ রীতি—কিংবা তাহাকে বলা যায় একটি বিশেষ ভঙ্গী বা ষ্টাইল্। অসংখ্য

প্রমপত্র সে লিখিয়াছে এবং পাইয়াছে; শেষকালে এমনতর ব্যাপার ঘটিয়াছিল যাহাকে এককথায় বলা চলে অত্যন্ত "হ্যাক্‌নিড্"।

কিন্তু সে গেল পূর্বেকার সুলেখা। সেদিন জীবনে তাহার ছিল বন্যার প্লাবন—জীবননদীতে তখন তাহার জোয়ার ভাটাব গতি ছিল—আজ কিন্তু সে নদী মজিয়া আসিয়াছে।

সুলেখাকে লইয়া আজ আর সে কথা বলা যায় না। ম্যাটাহরি দেখিয়া যে সুলেখা সন্দীপকে বলিয়াছিল একদিন—One day you will know me something more than a woman. হারিৎ চ্যাটার্জির বিবাহের প্রস্তাবকে যে সুলেখা ঘৃণা প্রকাশ করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল—Marrige! How silly!

হারিৎ বলিয়াছিল, কিন্তু সু, বিয়েই ত হচ্ছে প্রেমের বিকাশ!

সুলেখা ভ্রূকুঞ্চনের মাঝে সে কথা উড়াইয়া দিয়াছিল, what rot!

হারিৎ একটু উচ্ছ্বাসপ্রবণ এবং সেকেলে কবি। অক্ষর গুণিয়া কবিতা লিখিয়া ছন্দ বৈচিত্র্যে প্রাচীন-পন্থীদের মাঝে তখন সে বেশ নাম কিনিয়াছে এবং বাপের লোহার ব্যবসায়ের অংশীদাররূপে ধনীমহলে কিছুটা সুনামও অর্জন করিয়াছে—কিন্তু তাই বলিয়া বিবাহ? ওইরূপ একটা ইডিয়টিক্ চেহারা যাহার তাহাকে কিনা সুলেখা করিবে বিবাহ? তাহার চেয়ে বরঞ্চ আত্মহত্যা সহজ।

হারিতের 'উইলিস্ নাইট'টার প্রতি বরঞ্চ সুলেখার লোভ আছে—জার্মান 'এ্যালসেসন এলাভনকে'ও সে সহ্য করিতে পারে—কিন্তু ওই রিপালসিভ্ কবি হারিৎ—অসহ্য!

সে কথা থাক্, সে হইতেছে নয়েটোর পড়া নতুন-যুগের তরুণী তন্বী সুলেখা। সে সুলেখার সহিত আজিকার সুলেখার কোন মিল নাই।

আমি বর্ত্তমান গ্রাম্যস্কুলের হেডমিষ্ট্রেস্ সুলেখার কথা বলিতেছি। বয়স যাহার পনের হইতে আজ পঁয়ত্রিশে পৌছাইয়াছে—দেহনদীতে জোয়ারের প্লাবন যাহার রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে—চোখের কোণে নামিয়াছে যাহার ক্লান্তির গাঢ় অবলেপ—দেহমনে অবসাদের বোঝা—আমি সেই সুলেখার কথা বলিতেছি।

সুলেখা শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে—নগরীর পিচঢালা রাজপথ ছাড়িয়া গ্রমের রাঙামাটির পথে শান্তপদক্ষেপে বিচরণ করে—দিন পাঁচ ছয় ঘণ্টা ধরিয়া ইংরাজী গ্রামার এবং ইতিহাস, ভূগোল পড়াইয়া দিনের অন্ন সংগ্রহ করে। অতীত তাহার জীবনের এক বিস্মৃতির অংশ। শান্ত সন্ধ্যায় কর্মান্তে প্রতিদিন সে শুধু একবার এই মজানদীর তীরে আসিয়া বসে। বর্ত্তমান জীবনের শুধু এই একটি মুহূর্ত—এই মুহূর্তটুকুর মাঝে সে নিজের সত্তাকে অনুভব করিবার চেষ্টা করে শুধু।

গ্রামটিকে সুলেখার মন্দ লাগে নাই। পল্লীগ্রাম বলিতে যে কুৎসিত আবহাওয়ার কথা মনে হয়—এ গ্রামটি সেরূপ নয়। অন্ততঃ আজ কয়েকটি বছর ধরিয়া বহু জায়গায় ঘুরিয়া ফিরিয়া সুলেখার এই জায়গাটিকে অপেক্ষাকৃত ভালোই লাগিয়াছে।

বহুস্থানে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিবার কালে বহু অভিজ্ঞতা সুলেখা অর্জন করিয়াছে। কোথাও সেক্রেটারীর সহিত হাসিয়া কথা না কহিলে শিক্ষয়িত্রীর অনেক গলদের অনেক ত্রুটির কথা বিশ্লেষণ করা হয়—কোথাও প্রেসিডেন্টের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে না গেলে,

চাকরি রাখা দায় হয়—কোথাও বা অধিকবয়স পর্যন্ত অবিবাহিত জীবনের প্রতি হীন কটূক্তি প্রকাশ করা হয়—এমনি বহুতর জীবন-সংগ্রামের সহিত সুলেখা ঠোকর খাইয়াছে—কিন্তু ছ'মাসের কর্মজীবনে এখানে তেমন কিছু দুর্ঘটনা ঘটে নাই।

তবে এখানে ঘনিষ্ঠভাবে কাহারও সহিত সুলেখার পরিচয় নাই—পরিচিত হইতেও সে চাহে না আর। কিন্তু সেদিন কেমন করিয়া না জানি সুলেখার পঁয়ত্রিশ বছর জীবনের গতিরও আবার মোড় ঘুরিল। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াই আজিকার সুলেখার জীবনের নূতন আখ্যায়িকা সুরু হইল।

(২)

সেদিন সন্ধ্যায় সুলেখা নদীর ধার হইতে বেড়াইয়া বাড়ি ফিরিতেছিল, পথে একজন আসিয়া অত্যন্ত আকস্মিকভাবে তাহার সহিত যাচিয়া আলাপ করিল।

প্রথমে সুলেখা খানিকটা বিস্মিত হইয়াছিল এবং শুধু ভদ্রতা প্রকাশ করিয়াই তাহাকে এড়াইতে চাহিয়াছিল—কিন্তু লোকটির যে কী স্বভাব চট্ করিয়া এত সপ্রতিভতা প্রকাশ করিয়া বসিল যে সুলেখার পক্ষেও তাহাকে এড়াইয়া চলা দুষ্কর হইয়া উঠিল।

—নমস্কার—আমাকে চিন্‌তে পারেন লেখা দি? লোকটি সুলেখার পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল।

সুলেখা অবশ্যই প্রতিনমস্কার জানাইল। বিস্মিত হইল সুলেখা।

—লেখাদি? স্মরণের গ্রন্থি ইদানিং তাহার এতই শিথিল হইয়া আসিয়াছে যে বহু চেষ্টা করিয়াও চিনিতে সে কিছুতেই পারিল না। অপরিচিত কহিল—আমি সঞ্জয়ের বন্ধু—সহপাঠী—অশোক মিত্তির—মনে পড়েছে আপনার?

সুলেখা ক্ষীণ হাসিয়া বিস্মৃতির কথা স্মরণ করিল। সঞ্জয় তাহার ছোট ভাই—ডাক্তারী পড়িত। সঞ্জয় আজ ছয় বছর গত হইল মারা গেছে। হ্যাঁ—মনে পড়িতেছে বটে, ছেলেটি বার কয়েক তাহাদের বেলতলার বাড়িতে আসিয়াছে। সেই ফুটফুটে ছেলেটি—অশোক মিত্তির—হ্যাঁ বেশ মনে পড়িতেছে তাহার। বয়সের গাম্ভীর্যে যদিও আজ তাহার অনেকখানি পরিবর্তন ঘটিয়াছে—তবু মুখখানির কমনীয়তা আজও যেন সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা রাখে।

সুলেখা কহিল—হাঁ মনে পড়ছে বটে—অনেকদিনের কথা—আর চেনবার উপায় নেই। কিন্তু আপনি এখানে? আপনি তো সুইন্‌হো ষ্ট্রীটে থাকতেন না?

অশোক মিষ্টি হাসিয়া স্বীকৃতি জানাইল।

—কিন্তু আপনি আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করছেন কেন? আমি আপনার ছোট ভাইয়ের বন্ধু—আমাকে অশোক বললেই খুসি হবো।

সুলেখা আপত্তি প্রকাশ করিল না।

—তুমি এখানে? এটা কী তোমার দেশ নাকী?

অশোক কহিল—না—এখানে নতুন চাকরি নিয়েছি। ইউনিয়নবোর্ডের ডাক্তার—এখানে বদ্‌লি হয়ে এসেছি। কাল আপনার প্রিয় ছাত্রীর মুখে আপনার নাম শুনলুম—আর পরিচয় পেলুম। আমার কিন্তু চিনতে একটুও কষ্ট হয় নি।

—আমার প্রিয় ছাত্রী?

—হ্যাঁ—আমার পেসেণ্ট মৃদুলা!

—ওঃ—সুলেখা আর একবার হাসিল—সত্যি বড় চমৎকার মেয়ে—স্কুলের ভেতর ওর জোড়া আর কেউ নেই।

—ও কিন্তু আপনার ভাবী ভক্ত।

—বটে!

—আমি কিন্তু আপনার বাড়ির কাছেই থাকি—ওই দত্তদের বার বাড়িটা হচ্ছে আমার কোয়ার্টার।

—এখানে আর কে আছেন?

—কে আবার থাকবে? একেবারে একা। বহুদিন এমন বোর্ডিং লাগ্‌ছিল।

—বিয়েথা করো নি বুঝি?

সুলেখার এ প্রশ্নে অশোক যেন একটু লজ্জা অনুভব করিল—পরক্ষণেই বেশ শান্তস্বরে কহিল—না—ও বন্ধন আমার ভালো লাগে না—তার চেয়ে এই বেশ আছি। কিন্তু আপনি এমন নির্বাসনদণ্ড নিলেন কেন? একা এই অজ পাড়াগাঁয়ে কেমন করে কাটাচ্ছেন?

সুলেখা এ প্রসঙ্গে একটু অস্বস্তিবোধ করিল। এ কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিল—চলো, যাওয়া যাক্। কাজ নেই তো এখন?

না—কেন বলুন তো?

আমার বাড়ী একটু চা খেয়ে যাবে।

অশোক বিশেষ আপ্যায়িত হইল। বলিল—বেশ—চলুন যাই।

তারপর দু'জনে চুপচাপ। সুলেখার মধ্যে কোন চাঞ্চল্য নাই। দীর্ঘদিন এই একক নিরবচ্ছিন্নতার মাঝে আকস্মিক অশোকের এই আবির্ভাব, ইহাতে তাহার কিছুমাত্র বৈষম্যের কিম্বা বৈচিত্র্য বোধের ভাব নাই প্রতিদিন যেমন একলা বেড়াইয়া বাড়ি ফেরে আজও যেন ঠিক তাহাই। অশোকের অস্তিত্বকেই সে অনুভব করিতে পারিতেছে না।

আর অশোক—এই নির্বান্ধব পুরীর মাঝে দু'দিনেই যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। তাহার সামাজিক জীবন অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করিতেছিল—হঠাৎ পুরাতন পরিচয়ের ক্ষীণ সূত্রটি ধরিয়া লেখাদির সহিত নূতন করিয়া আত্মীয়তা পাতাইতে এখন যেন তাহার আর উৎসাহের সীমা নাই।

সুলেখা নীরব—গম্ভীর পদক্ষেপে পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে।

অশোক মনে মনে কেবল নূতন কথার মালা গাঁথিতেছে আর কোন্ কথা কেমন করিয়া বলিলে শোভনতর হইবে—কোন্ কথার মাঝে আজিকার সম্পর্কের ভিত্তি ভবিষ্যতের দৃঢ়তা এবং আত্মীয়তার সৃষ্টি করিবে তাহার পরিকল্পনা করিতেছে।

হাঁ—অশোকের মনে পড়িতেছে—বেশ স্পষ্টভাবে মনে পড়িতেছে লেখাদির সাহিত্য-প্রীতি অতিমাত্রায় ছিল—অতি আধুনিক সাহিত্যের প্রতি লেখাদির অনুরাগ খুবই বেশী। সঞ্জয় তাহার প্রথম পরিচয় দিয়াছিল তাহার দিদির নিকট—সাহিত্যিক এবং কবি বলিয়া।

লেখাদি তাহার লেখা পড়িতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। অশোক আবিষ্কার করিয়াছে—সাহিত্য-প্রসঙ্গে লেখাদি'কে আবার সে আপন জন করিয়া লইবে। খুসির আমেজে অশোকের মন ভরিয়া উঠিল।

ক্রমশঃ

পদার্থের রূপান্তর

শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্-এস্-সি

প্রাচীনকালে যাঁহারা কিমিয়া বিদ্যা আলোচনা করিতেন তাঁহাদের চেষ্টা ছিল কি উপায়ে লৌহকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা যায়। এমন একটা কিছুর সন্ধানে তাঁহারা ছিলেন যাহার স্পর্শে নিকৃষ্ট ধাতু স্বর্ণে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু এই "পরশ-পাথর" তাঁহারা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে এই "পরশ-পাথর" জন্মলাভ করিয়াছে। ইহার নাম সাইক্লোট্রন। ইহার দ্বারা লৌহকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করা সম্ভব। এখানে একথা বলা আবশ্যক যে লৌহ হইতে স্বর্ণ উৎপাদন করাই এই যন্ত্রের সার্থকতা নহে।

জড় বস্তুর উপাদান সম্বন্ধে ভারতীয় দার্শনিকগণ সর্ব্বপ্রথম চিন্তা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে মাটি, জল, তেজ ও বায়ু এই চারিটি জড়ের উপাদান এবং কার্য্যকারণের বশে ইহাদের মিলনে বিচিত্র বিশ্ব সৃজিত হইয়াছে। এই চারিটি উপাদানের পরমাণুসমূহ নিত্য এবং অবিভাজ্য।

গ্রীক দার্শনিকগণের মতেও জড় পদার্থ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণাসমূহ দ্বারা গঠিত। সেই জন্য এই কণার নাম Atom (যাহা ভাগ করা যায় না) বা পরমাণু। পরমাণুর মিলনের ফলেই জড়জগতের উদ্ভব হইয়াছে। অবশ্য গ্রীকদার্শনিকদের এই তত্ত্বের পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ছিল না। ইহা তাঁহাদের অনুমান মাত্র।

এ বিষয় সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত হইতেছে জন ডালটনের পরমাণুবাদ। ডালটনের মতে পরমাণু অবিভাজ্য এবং দুই বা ততোধিক পরমাণুর মিলনের ফলে অণু (Molecule) গঠিত হয়। যদিও পরমাণু খালি চোখে এমন কি সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও দেখা যায় না (কারণ আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা পরমাণুর আকার ক্ষুদ্রতর) তবুও পরমাণুর অস্তিত্ব একটা অবিসংবাদী সত্য। ইহার ভর (Mass) স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং বিভিন্ন মৌলিক পদার্থে পরমাণুর অবস্থান কিরূপ তাহাও জানা গিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগে স্যার উইলিয়ম ক্রুক্স, অধ্যাপক জে, জে, টমসন প্রভৃতি বিজ্ঞানীর পরীক্ষার ফলে জানা গেল যে পরমাণুও অবিভাজ্য নহে এবং পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন নামে এক অতি সূক্ষ্ম কণিকা বর্ত্তমান। সুতরাং পরমাণুই যে জড়ের সূক্ষ্মতম উপাদান, ডালটনের এই মত উঠিয়া গেল। এ সম্বন্ধে একটি মজার গল্প আছে। ইংলণ্ডের কোন একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক তাঁহার ছাত্রদের সমক্ষে পরমাণু বিষয় এক বক্তৃতা দিতেছিলেন। তাঁহার বক্তব্য বিষয় ছিল এই যে পরমাণু অবিভাজ্য। একজন ছাত্র হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "মহাশয়! জানেন কি যে পরমাণু ভাঙ্গা হইয়াছে; ইহা আর অবিভাজ্য নহে?" অধ্যাপক উত্তর দিলেন, "অসম্ভব! তাহা হইতে পারে না। Atom এই গ্রীকশব্দের অর্থ যাহা অবিভাজ্য এবং পরমাণুকে atom বলা হয়। সুতরাং পরমাণুকে কি প্রকারে ভাঙ্গা যাইতে পারে?" ছাত্রটি উত্তর দিল, "মহাশয়! গ্রীকভাষা জানিবার উহাই বিপদ।"

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে হেন্‌রি বেকোরেল য়ুরেনিয়ম নামক খনিজ পদার্থের তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান পান। তিনি দেখিতে পান যে য়ুরেনিয়মকে অন্ধকার ঘরে ফটোপ্লেটের নিকটে রাখিলে ফটোপ্লেটে আলোক রশ্মির ন্যায় রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে। ইহার পর কুরী দম্পতি পিচ্‌ব্লেণ্ড নামক এক প্রকার খনিজ প্রস্তর পরীক্ষা করিয়া য়ুরেনিয়মের অনুরূপ একটি পদার্থ পান। ৮ টন পিচ্‌ব্লেণ্ড হইতে পাঁচ বৎসর পরিশ্রমের ফলে তাঁহারা এক গ্রাম পরিমাণ ঐ পদার্থ পাইলেন। তাঁহারা ইহার নাম দিলেন রেডিয়ম। ইহার তেজস্ক্রিয়তা (radio activity) য়ুরেনিয়ম হইতে বহুগুণে বেশী। অধ্যাপক রাদারফোর্ড রেডিয়ম দ্বারা পরীক্ষা করিয়া রেডিয়ম হইতে নির্গত তিন প্রকার রশ্মির সন্ধান পাইলেন। ইহাদিগকে আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি বলা হয়। আলফা রশ্মিকে রশ্মি না বলিয়া কণা বলা উচিৎ। প্রত্যেক আলফা কণিকায় ৪টি প্রোটন ও ২টি ইলেকট্রণ আছে। প্রোটনের বিদ্যুৎ ধনাত্মক (positive) এবং ইলেকট্রণের বিদ্যুৎ ঋণাত্মক (negative) কিন্তু বিদ্যুতের পরিমাণ সমান। প্রোটনের ভর ইলেকট্রণের ভর অপেক্ষা প্রায় দুই হাজার গুণ বেশী। এক একটি প্রোটনের ভর এক ধরা হয় এবং ইলেকট্রণ ভরশূন্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। সুতরাং একটি আলফাকণিকার ভর ৪, কারণ ইহাতে ৪টি প্রোটন আছে এবং ইহার বিদ্যুৎ ধনাত্মক (৪টি প্রোটনের ধনাত্মক বিদ্যুতের পরিমাণ ৪ এবং দুইটি ইলেকট্রণের ঋণাত্মক বিদ্যুতের পরিমাণ ২, সুতরাং আলফাকণিকার বিদ্যুতের পরিমাণ ২ এবং বিদ্যুৎ মোটের উপর ধনাত্মক)। প্রত্যেকটি বিটা কণিকা এক একটি ইলেকট্রণ। এই ইলেকট্রণ প্রতিসেকেণ্ডে লক্ষ মাইল বেগে রেডিয়ম হইতে নির্গত হইতেছে। গামারশ্মি রঞ্জনরশ্মির মতই একপ্রকার তরঙ্গ কিন্তু ইহা অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন। ১২ ইঞ্চি পুরু লৌহ-পাতকে এই রশ্মি অনায়াসে ভেদ করিয়া যায় এবং ইহার গতি আলোর গতির সমান। রেডিয়মের পরমাণু এইরূপে আপনা হইতেই নিজকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে এবং প্রতি সেকেণ্ডে সংখ্যাতীত প্রোটন ও ইলেকট্রণ তীব্র বেগে নির্গত হইয়া আসিতেছে। ঐ সঙ্গে গামা রশ্মিও বাহির হয়। এইরূপে তেজ বিকীরণ করিয়া রেডিয়ম সীসকে পরিণত হয়। রেডিয়ম, য়ুরেনিয়ম বা যে কোন তেজস্ক্রিয় (Radio-active) পদার্থের পরমাণু এরূপভাবে গঠিত যাহার ফলে এই সমস্ত পরমাণু আপনা হইতে ভাঙিয়া যায়। এবং আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানীর হাতে এমন কোন ক্ষমতা আসে নাই যাহা দ্বারা ইহাদের তেজস্ক্রিয়তা বাড়ান বা কমান যায়।

প্রায় ১৩ বৎসর পূর্ব্বে আর একটি কণিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বোথে এবং গাইগার নামক দুইজন পদার্থবিদ্‌ তেজস্ক্রিয় পোলোনিয়ম হইতে নির্গত কণিকা দ্বারা বেরিলিয়ম ধাতুকে আঘাত করিয়া দেখিলেন যে বেরিলিয়ম পরমাণু হইতে এমন একপ্রকার কণিকা বাহিরে আসিতেছে যাহার ভর প্রোটনের সমান কিন্তু এই কণিকা তড়িৎবিহীন। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে প্রোটন ও ইলেকট্রণের ন্যায় ইহা মৌলিক কণিকা নহে। একটি প্রোটন এবং একটি ইলেকট্রণের অত্যন্ত সন্নিহিত অবস্থানের ফলে একটি নিউট্রণের জন্ম হয়। সেই কারণে ইহা তড়িৎশূন্য এবং ইহার ভর প্রোটনের সমান।

পৃথিবীতে মোট ৯২টি মৌলিক পদার্থ বর্ত্তমান এবং প্রত্যেক পদার্থই কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি। এই

পরমাণুসমূহের গঠনবৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া জানা যায় যে তিন প্রকার কণিকা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার পরমাণু গঠিত। এই তিন কণিকা হইতেছে—প্রোটন, নিউট্রণ ও ইলেকট্রণ। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে একটি প্রোটন এবং প্রোটন হইতে কিছু দূরে একটি মাত্র ইলেকট্রণ নির্দ্দিষ্ট কক্ষে তীব্রবেগে প্রোটনকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সুতরাং হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন এক এবং ইহা তড়িৎশূন্য। কোনরূপে পরমাণু হইতে ইলেকট্রণ সরাইয়া নিলে ইহার বিদ্যুৎ ধনাত্মক হয়—অপর পক্ষে যদি বাহির হইতে একটি ইলেকট্রণ পরমাণুতে প্রবেশ করে তবে ইহার বিদ্যুৎ হইবে ঋণাত্মক। হাইড্রোজেনের পরবর্ত্তী গুরুতর পদার্থ হিলিয়ম। ইহার কেন্দ্রক (Neucleus) দুইটি প্রোটন ও দুইটি নিউট্রণ দ্বারা গঠিত এবং বিভিন্ন কক্ষে দুইটি ইলেকট্রণ কেন্দ্রককে প্রদক্ষিণ করে। সুতরাং হিলিয়ম পরমাণুর ভর ৪ এবং বিদ্যুৎপরিমাণ শূন্য। এইরূপে বিভিন্ন পরমাণু বিভিন্ন সংখ্যক প্রোটন, নিউট্রণ ও ইলেকট্রণ লইয়া গঠিত। পরমাণুর মূল উপাদান এই তিন প্রকার কণিকা। প্রত্যেকটি পরমাণুতে যত সংখ্যার প্রোটন ঠিক তত সংখ্যায় ইলেকট্রণ থাকে। পরমাণুর অধিকাংশ স্থানই ফাঁকা। অতি সামান্যমাত্র স্থান প্রোটন, নিউট্রণ ও ইলেকট্রণ অধিকার করিয়া আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে একজন সাধারণ মানুষের শরীরের সমস্ত প্রোটন, নিউট্রণ ও ইলেকট্রণ যদি এমনভাবে ঠাসিয়া একত্র করা যায় যাহাতে ইহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র ফাঁক না থাকে তবে ইহারা একত্রীভূত হইয়া এত ক্ষুদ্র হইবে যে অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হইবে না।

পরমাণুর ভর প্রোটন ও নিউট্রণের সংখ্যার উপর নির্ভর করে—বহিঃস্থ ইলেকট্রণ শুধু পরমাণুর বিভিন্ন গুণ বা ধর্ম্ম স্থির করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পারদ ও স্বর্ণের তুলনা করিয়া দেখা যায় যে পারদের পরমাণুতে কেন্দ্রকের বাহিরে অর্থাৎ বহিঃস্থ ইলেকট্রণের সংখ্যা ৮০টি এবং স্বর্ণে ৭৯টি। এখন যদি কোনরূপে পারদ হইতে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রণ সরাইয়া লওয়া হয় তবে পারদ স্বর্ণে রূপান্তরিত হইতে পারে। ইলেকট্রণকে সহজেই উত্তাপ বা বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রের সাহায্যে সরান যায় কিন্তু মুস্কিল হইতেছে কেন্দ্রস্থ প্রোটন সরান। ইহাকে স্থানচ্যুত করাই ছিল বিজ্ঞানীর সমস্যা। সম্প্রতি ইহার সমাধান অনেক সহজ হইয়া পড়িয়াছে।

সাধারণতঃ আমরা যে সমুদয় মৌলিক পদার্থ দেখিতে পাই তাহার কেন্দ্রকের প্রোটন আপনা হইতে কখনও স্থানচ্যুত হয় না। কিন্তু য়ুরেনিয়ম, রেডিয়ম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় ধাতুর কেন্দ্রকের প্রোটন, নিউট্রণ আপনা হইতে তীব্রবেগে বাহির হইয়া আসিতেছে এবং ফলে ধাতুর রূপান্তর ঘটিতেছে। কেন্দ্রকের প্রোটনের সংখ্যা ৮৪টির বেশী হইলেই প্রোটন আপনা হইতে কেন্দ্রক ত্যাগ করে। প্রায় সমস্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থে ৮৪ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক প্রোটন আছে। কেন্দ্রে প্রোটন সংখ্যা যত বেশী হয় ততই প্রোটনগুলি পরস্পরের বিকর্ষণের ফলে কেন্দ্রকচ্যুত হইতে চাহে, স্থায়ী ভাবে থাকিতে পারে না। সেই জন্য ৯২টির বেশী প্রোটন লইয়া কেন্দ্রক গঠিত হইলে বিকর্ষণ এত প্রবল হয় যে এরূপ কেন্দ্রক স্বল্প সময়ের জন্যও টিকিতে পারে না। এই কারণে কেন্দ্রকে ৯২টির বেশী প্রোটন আছে এরূপ কোন পরমাণু জানা নাই। ৮৪ হইতে ৯২টি প্রোটন থাকিলে সেরূপ পরমাণুর কেন্দ্রকে ভাঙ্গন লাগিয়াই থাকে। কেন্দ্রকে অবস্থিত প্রোটন ও ইলেকট্রণ (পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কেন্দ্রকে প্রোটন ও নিউট্রণ থাকে

কিন্তু প্রোটন ও ইলেকট্রণের একত্র সন্নিবেশের ফলে নিউট্রণ উৎপন্ন, সুতরাং কেন্দ্রকে ইলেকট্রণ আছে একথা বলা চলে) প্রচণ্ড শক্তিবলে একত্রিত থাকে। যখন ভাঙ্গিয়া যায় তখন ইহারা প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় লক্ষ মাইল গতিতে ছুটিয়া বাহির হয়। সেই জন্যই এই ধাবমান প্রোটন কোন পরমাণুর উপর গিয়া পড়িলে পরমাণু কেন্দ্রক ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। এই গতিশক্তিই রেডিয়ম বা অন্য কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজস্ক্রিয়তার কারণ। প্রোটন এবং ইলেকট্রণ নির্গত হইবার ফলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ রূপান্তরিত হয় এবং নির্গত প্রোটন এবং ইলেকট্রণ কোন পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে সেই পরমাণুরও এইরূপে ভর এবং ধর্ম্ম বদলাইয়া যায় অর্থাৎ ইহা অন্য পরমাণুতে পরিবর্ত্তিত হয়। এইরূপে এক পদার্থকে অন্য পদার্থে পরিণত করা যাইতে পারে।

কেন্দ্রকে প্রোটন আছে বলিয়া ইহার বিদ্যুৎ ধনাত্মক। একটি অমিত বেগশালী প্রোটন যখন কোন পরমাণুর কেন্দ্রকের দিকে ছুটিয়া নিকটে যায় তখন উভয়ের মধ্যে বিকর্ষণ ঘটিবে, কাজেই প্রোটনের কেন্দ্রক পর্য্যন্ত পৌঁছিবার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। রেডিয়ম হইতে নির্গত আলফাকণিকা দ্বারা রাদারফোর্ড এলুমিনিয়ম, নাইট্রোজেন প্রভৃতি পরমাণুর কেন্দ্রক ভাঙ্গিয়াছেন বটে, কিন্তু রেডিয়ম বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় না এবং ইহা অত্যন্ত মূল্যবান। আবার রেডিয়ম হইতে যদি ১০০ কোটি কণিকা নির্গত হয় তবে হয়ত একটি কণিকা পরমাণুর কেন্দ্রকে আঘাত করে। যদি নির্গত প্রোটনের বেগ বৃদ্ধি করা যায় তবেই অধিক সংখ্যক প্রোটন কেন্দ্রকে আঘাত করিবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বোথে এবং গাইগার নামক দুইজন বৈজ্ঞানিক নিউট্রণ আবিষ্কার করেন। এই নিউট্রণকে বেগযুক্ত করিতে পারিলে কেন্দ্রক ভাঙ্গা সহজ, কারণ ইহা তড়িৎশূন্য। কাজেই বিকর্ষণ ঘটিবে না। কিন্তু নিউট্রণ পাইতে হইলে আগে কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ দ্বারা বেরিলিয়ম ধাতুর পরমাণুকে ভাঙ্গিতে হইবে (বেরিলিয়ম ধাতু হইতে নিউট্রণ অপেক্ষাকৃত সহজে পাওয়া যায়)। সুতরাং নিউট্রণ পাওয়া গেলেও সমস্যার সমাধান হইল না।

কয়েক বৎসর হইল ব্যোমরশ্মি (cosmic rays) নামে একপ্রকার রশ্মি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা রঞ্জনরশ্মির মতই, তবে লক্ষ লক্ষ গুণ শক্তিশালী। এমন কোন বস্তু নাই যাহা ভেদ করিয়া এই রশ্মি চলিয়া যাইতে না পারে। সম্ভবতঃ সূর্য্য এবং উত্তপ্ত নক্ষত্রে এই রশ্মির জন্ম। সেখান হইতে ইহা পৃথিবীতে আসিতেছে। বৈজ্ঞানিক মিলিকান অনুমান করিয়াছিলেন যে সম্ভবতঃ নিউট্রণ দ্বারা এই রশ্মি গঠিত। বৈজ্ঞানিক জীনসের মত ইহা কোন একপ্রকার তরঙ্গ। এক ব্যক্তি মিলিকানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কোন্ মতবাদটি খাঁটি তাহা জানিতে চাহেন। মিলিকান একটু চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর দিলেন, "তিনি (অর্থাৎ জীন্স্) একরকম বলেন, আমি আর একরকম বলি। আসলে আমরা কেহই কিছু জানিনা।"

উপরের আলোচনা হইতে বোঝা গেল যে যদি কোন উপায়ে প্রোটনের বেগ বৃদ্ধি করা যায় তবে পরমাণুর কেন্দ্রক ভাঙ্গা সহজ হইবে। অধ্যাপক ই, ও, লরেন্স তাঁহার উদ্ভাবিত সাইক্লোট্রণ যন্ত্রে এমন প্রবলগতিসম্পন্ন প্রোটন উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছেন যাহা দ্বারা শুধু পদার্থবিজ্ঞানই নহে, চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানেও যুগান্তর আসিয়াছে।

এই আবিষ্কারের জন্য ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

চারপাঁচটি লোহ খণ্ড পরস্পর সাজাইয়া একটি বিদ্যুৎচুম্বক প্রস্তুত করা হয়। লৌহখণ্ডগুলিকে বাঁকাইয়া ইংরাজি C অক্ষরের মত আকৃতি দেওয়া হয় যাহাতে দুই প্রান্তের মধ্যে প্রায় ১০ ইঞ্চি পরিমাণ ফাঁক থাকে। এই লৌহখণ্ড কয়টির ওজন ৬০।৭০ টন। চুম্বকের দুই প্রান্তে বাক্সের ঘেরাটোপে তামার তারের কুণ্ডলী রাখা হয়। এই তারের ওজন ৯ টন। সাধারণতঃ তেলের মধ্যে এই তার বসান থাকে। এই তারে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলিলে লৌহখণ্ডটি চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। চুম্বকের দুই প্রান্ত বা মেরুর মধ্যস্থানের ফাঁকা জায়গায় একটি ফাঁপা বাক্স আছে। এই বাক্সের মধ্যে ইংরাজী D অক্ষরের ন্যায় দুইটি অর্দ্ধবৃত্তাকার ফাঁপা বাক্স বসান আছে। বাক্স দুইটি এরূপে বসান যে ইহাদের সরল পার্শ্ব পরস্পরের সম্মুখীন থাকে এবং উভয়ের মধ্যে সামান্য ফাঁক থাকে। যে বাক্সের মধ্যে এই D বাক্স দুইটি আছে তাহা হইতে বাতপাম্পের সাহায্যে সমস্ত বাতাস বাহির করিয়া ফেলা হয়।

একটি ইলেকট্রণকে যদি দুই প্লেটের মধ্যবর্ত্তী তড়িৎক্ষেত্রের মধ্যে রাখা হয় তবে ইহা ঋণাত্মক প্লেট হইতে ধনাত্মক প্লেটের দিকে ছুটিবে। ক্ষেত্রটি ৪ ভোল্ট বিভবযুক্ত হইলে ইলেকট্রণের গতিবেগকে বলা হয় ৪ ইলেকট্রণ ভোল্ট। সেইরূপ ১০০ ভোল্ট বিভবযুক্ত ক্ষেত্রে ১০০ ইলেকট্রণ ভোল্ট বেগযুক্ত ইলেকট্রণ পাওয়া যায়। পরমাণুর কেন্দ্রক ভাঙ্গিবার জন্য প্রায় কোটি ইলেকট্রণভোল্ট বেগসম্পন্ন কণিকা প্রয়োজন। সোজাসুজি উপায়ে এত বেশী ভোল্টের বিদ্যুৎ উৎপাদান করা যায় না। লরেন্স তাঁহার সাইক্লোট্রণ যন্ত্রে ধাপে ধাপে একটি প্রোটন বা ইলেকট্রণকে কোটি বেগ ভোল্ট দিতে সমর্থ হইয়াছেন।

D বাক্স দুটিকে দশসহস্র ভোল্ট বিভবের পার্থক্যে রাখা হয়। মনে করা যাক যে একটি প্রোটন কণিকাকে দুই D বাক্সের মাঝের ফাঁকা জায়গায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে আছে বলিয়া প্রোটনটি ধনাত্মক D বাক্স হইতে ঋণাত্মক D বাক্সের দিকে দশসহস্র ভোল্ট বেগে ছুটিবে। বাক্স দুইটি আবার শক্তিশালী চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে রহিয়াছে। প্রোটনটি একটি D বাক্সের অভ্যন্তরে যাওয়া মাত্র বাক্সের একপ্রান্ত হইতে বৃত্তাকারে ঘুরিয়া অন্য প্রান্ত দিয়া বাহিরে আসিবে এবং পুনরায় দুই বাক্সের মাঝের ফাঁকা জায়গায় উপস্থিত হইবে (তড়িৎগ্রস্ত কণিকা চুম্বকের আকর্ষণে বৃত্তাকারে ঘুরে এবং D বাক্স দুটির ভিতর ফাঁপা বলিয়া সেখানে তড়িৎ-ক্ষেত্রের কোন প্রভাব নাই)। যে মুহূর্ত্তে কণিকাটি ফাঁকা জায়গায় আসে সেই মুহূর্ত্তেই বাক্স দুটির তড়িৎবিভব উল্টাইয়া দেওয়া হয়। ফলে আগে যে D বাক্সটি ঋণাত্মক ছিল তাহা এখন ধনাত্মক এবং ধনাত্মকটি হইল ঋণাত্মক। ফলে প্রোটন কণিকাটি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেগে আবার D বাক্সে প্রবেশ করে এবং চুম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে বৃহত্তর বৃত্তে ঘুরিয়া আসিয়া পুনরায় ফাঁকা জায়গায় উপস্থিত হয়। পুনরায় তড়িৎবিভব উল্টাইয়া দেওয়া [illegible] এবং কণিকাটি আরও অধিক বেগে D বাক্সে প্রবেশ করে। এইরূপে প্রতি ধাপে ধাপে কণিকাটিকে বেগসম্পন্ন করা হয়। হিসাবে মোটামুটি দেখা গিয়াছে যে কণিকাটির বেগ একবার ঘুরিয়া আসিলে ২ গুণ, দুইবারে ৪ গুণ, তিন বারে ৬ গুণ হয় এবং যে বৃত্তে ইহা ঘুরে তাহার ব্যাসও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অবশেষে বাক্সের শেষপ্রান্তে একটি জানালার (window) মধ্যদিয়া

প্রায় কোটি ইলেক্‌ট্রণভোল্ট বেগে বাহিরে আসে। এখন ঐ জানালার নিকট যদি কোন পদার্থ রাখা যায় তবে এই প্রচণ্ডগতিসম্পন্ন প্রোটন ঐ পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রকে আঘাত করিয়া ইহার রূপান্তর ঘটাইতে পারে এবং ইহাকে তেজক্রিয় করিতে পারে। সাইক্লোট্রণ সাহায্যে যেমন তড়িৎগ্রস্ত কণিকার বেগ বৃদ্ধি করা যায় তেমনি অগণিত কণিকাও পাওয়া যায়।

আমেরিকার ওয়াশিংটনে অবস্থিত কার্ণেগি ইনষ্টিট্যুশনে যে সাইক্লোট্রণ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম সাইক্লোট্রণ। এই সাইক্লোট্রণের ওজন ২২৫ টনের বেশী, উচ্চতা ১২ ফিট, দৈর্ঘ্য ৩০ ফিট এবং প্রস্থ ২০ ফিট। ৪টি লৌহখণ্ডে ইহার চুম্বক নির্ম্মিত এবং সম্পূর্ণ চুম্বকটির ওজন ১২০ টনের কাছাকাছি। D বাক্সের ব্যাস প্রায় ৬০ ইঞ্চি এবং ইহাতে ১৩৪ অশ্বশক্তির বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালনা করা হয়। মাটির দশফুট নীচে একটি ঘরে এই যন্ত্র বসান হইয়াছে যাহাতে ইহা হইতে নিক্ষিপ্ত কণিকা লোকের গায়ে না পড়ে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে ইঁদুরের গায়ে এই কণিকা সমূহ আঘাত করিলে ইঁদুর মরিয়া যায়। যাঁহারা এখানে কাজ করেন তাঁহারা এক বিশেষ প্রকার পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত হইয়া এই ঘরে প্রবেশ করেন। অত্যন্ত শক্তিশালী বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করা হয় বলিয়া দরজার সঙ্গে এরূপভাবে সুইচ্ সংলগ্ন থাকে যে সাইক্লোট্রণে কাজ চলিবার সময় যদি কেহ বাহির হইতে দরজা খোলেন তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়। যন্ত্রটির নির্ম্মাণকার্য্যে ৪ বৎসর সময় লাগিয়াছে এবং যে ঘরে ইহা স্থাপন করা হইয়াছে সেই ঘর নির্ম্মাণের খরচা, সাইক্লোট্রণের মূল্য এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যাপারে মোট ব্যয় হইয়াছে পনের লক্ষ টাকা। কলিকাতায় বিজ্ঞানকলেজে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার তত্ত্বাবধানে এরূপ একটি যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে।

সাইক্লোট্রণ সাহায্যে সাধারণ অনেক পদার্থকে তেজক্রিয় করা হইয়াছে। অবশ্য এই তেজক্রিয়তা অতি সামান্য সময় ধরিয়া থাকে। অঙ্গার, সোডিয়ম, আয়োডিন, ফস্‌ফরাস্, লৌহ, গন্ধক, ক্যালসিয়ম প্রভৃতির পরমাণুকে সাইক্লোট্রণ হইতে নির্গত কণিকাদ্বারা আঘাত করিয়া তেজক্রিয় করা যায় এবং ফলে এই সমস্ত পদার্থ হইতে গামা রশ্মি ও ইলেকট্রণ নির্গত হয়। এইরূপে তেজক্রিয় করিয়া এই পদার্থসমূহ আমাদের নানা কাজে লাগান যাইতে পারে।

সোডিয়ম ধাতুকে প্রোটন কণিকাদ্বারা আঘাত করিলে সোডিয়ম তেজক্রিয় হয় এবং ইহাকে রেডিও-সোডিয়ম বলা হয়। ইহা যেন "কৃত্রিম রেডিয়ম"। কিন্তু রেডিয়ম দুই হাজার বৎসর ধরিয়া তেজ বিকীরণ করে, আর রেডিও-সোডিয়মের তেজক্রিয়তা পনের ঘণ্টায় অর্দ্ধেক পরিমাণ হ্রাস পায়। তাহা হইলেও ইহার ব্যবহারিক সার্থকতা আছে। কোন ব্যক্তিকে যদি তেজক্রিয় রেডিয়ম ঘটিত কোন খাদ্য খাওয়ান যায় তবে তাহার দেহের যে কোন অংশে কণামাত্র রেডিও-সোডিয়ম থাকিলেও যন্ত্রদ্বারা সেই অংশে তাহার অবস্থান ধরা যাইবে। এই উপায়ে দেহাভ্যন্তরে খাদ্যের ক্রিয়া কিরূপে ঘটিতেছে তাহা জানা যায়। তেজক্রিয় সোডিয়মফস্‌ফেট্ আহার করাইয়া পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে প্রাণীদের এমন কি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রাণীদেরও মস্তিষ্কের অণুকোষ সমূহ ক্রমাগত নূতন করিয়া গঠিত হইতেছে। তেজক্রিয় ক্যালসিয়ম শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে আমাদের শরীরের অস্থি নিয়তই ক্ষয় এবং পূরণ হইতেছে। তেজক্রিয় লবণ আহার করিলে সেই লবণ দশমিনিটের

মধ্যে শরীরের সমস্ত অণুকোষগুলিতে ছড়াইয়া পড়ে। এক কথায় দেহের অভ্যন্তরের কার্য্যপ্রণালী যেন চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

রেডিয়মদ্বারা ক্যানসার রোগ আরোগ্য হয়। ইহার কারণ জীবাণুদুষ্ট তন্তু বা অণুকোষসমূহ রেডিয়ম-নিঃসৃত কণিকার আঘাতে দোষমুক্ত হয়। এই চিকিৎসার দুইটি প্রধান অসুবিধা। প্রথমতঃ এই প্রণালীতে চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ দেহের বহিরাংশে ক্যানসার হইলে তাহার উপর রেডিয়ম প্রয়োগ করা চলে। দেহের অভ্যন্তরে ক্যানসার হইলে যদি খানিকটা রেডিয়ম দেহের মধ্যে রাখা হয় তবে ক্যানসার রোগ সারিয়া যাইতে পারে কিন্তু রেডিয়ম বেশী সময় ধরিয়া শরীরের মধ্যে থাকিলে নিঃসৃত কণিকাসমূহ দেহের সুস্থমাংসপেশী ক্ষত-বিক্ষত করিয়া রোগীর মৃত্যু ঘটাইতে পারে এইরূপ রোগীকে যদি খানিকটা রেডিও-সোডিয়ম সেবন করান যায় তবে রেডিও-সোডিয়ম তেজ বিকীরণ করিয়া (অর্থাৎ ইলেকট্রণ ও গামারশ্মি নির্গত করিয়া) ক্যানসার আরোগ্য করিবে এবং কয়েক ঘণ্টা পর আপনা হইতে ম্যাগনেসিয়মে পরিণত হইবে। ম্যাগনেসিয়ম শরীরের কোন ক্ষতি করে না এবং রেডিও-সোডিয়মও যে কয় ঘণ্টা ধরিয়া তেজ বিকীর্ণ করে তাহাতে দেহের সুস্থ অংশের কোন ক্ষতি হয় না। রেডিও-সোডিয়মদ্বারা চিকিৎসায় খরচও কম। একমাত্র অসুবিধা এই যে ইহার তেজক্রিয়তা কয়েক ঘণ্টা মাত্র থাকে। সুতরাং রেডিও-সোডিয়ম প্রস্তুত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর উপর প্রয়োগ করিতে হইবে।

সাইক্লোট্রণ দ্বারা পদার্থের রূপান্তর ঘটাইতে পারা যায় এবং ইহার সাহায্যে লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করা সম্ভব। কিন্তু ইহাতে খরচ এত বেশী পড়িবে এবং উৎপাদনের হার এতই কম হইবে যে এই উপায়ে কেহ স্বর্ণ উৎপন্ন করিতে চাহিবে না।

শক্তি জড়ের রূপান্তর মাত্র। সাধারণতঃ যে উপায়ে আমরা জড় হইতে শক্তি পাই তাহাতে জড়ের অতি সামান্যমাত্র অংশই শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হয়। যদি একটু করা কয়লার সমস্তটাই শক্তিতে পরিণত করা যায় তাহা হইলে তদ্দ্বারা একটা বড় জাহাজ আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করাইতে পারে। বিজ্ঞানী এখনও এমন কোন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই যাহার দ্বারা জড়ের সমস্তটাই শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। পরমাণুকেন্দ্রকে প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তি রহিয়াছে। কেন্দ্রক ভাঙ্গিয়া গেলে এই শক্তি বাহির হইয়া আসে। তাপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি যেরূপ কাজে লাগান যায় কেন্দ্রকের শক্তিকে এখনও সেইরূপ ইচ্ছামত ব্যবহারোপযোগী করিবার উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই। সাইক্লোট্রণের মধ্যে সেই সম্ভাবনা নিহিত আছে এবং হয়ত ভবিষ্যতে জড়কে সম্পূর্ণরূপে শক্তিতে পরিবর্ত্তিত করা যাইবে।

পরিচয়

(গল্প)

শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল

চিত্রকর ভাস্করের বয়সের চেয়ে তার খ্যাতি তাকে অনেকখানি জীবনের পথে এগিয়ে দিয়েছিল। তার জীবনের পথ রাজপথের মতোই বিস্তৃত ও জনবহুল। ভাস্করের বয়সের যারা তাদের অনেকেই এখনো সে পথের সন্ধান জানে না।

সে শিল্পী। সৃষ্টির আনন্দে সে প্রভাত হ'তে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সমাহিত হ'য়ে থাকে। সেই তার জীবনের আনন্দ, সঞ্চয় ও অপচয়। জীবনের অপচয় সে করতে পারে কিন্তু খ্যাতি বা ঐশ্বর্য্যের জন্য শিল্পের ব্যভিচার সে করেনি কোনদিন। সে জাতশিল্পী, সে সাধক। অন্ধকারের অতলে ব'সেও তার সাধনার নিয়মনিষ্ঠার ব্যত্যয় ঘটেনি কোনদিন।

তার ছিপ্ ছিপে লম্বা গড়নের চেহারা, বয়স কুড়ি হ'তে বাইশের মধ্যে, নবযৌবনের দীপ্তি ধারালো ইস্পাতের মতো ঝক্‌ঝক্ করছে তার সারা দেহে। মুখচোখের দৃঢ়তা বয়সের চেয়ে তার গাম্ভীর্যকে বাড়িয়ে তুলেচে। তার ইঙ্গিতে আভাসে, কটাক্ষে হাসিতে প্রতিভা স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে।

কাজ, কাজ, কাজ! সারাদিন সে নিজেকে কাজের মাঝে ডুবিয়ে রাখতে চায়: কাজের মাঝে ডুবে যেন সে বিশ্বসংসারকে ভুলতে চায়। নিজের সৃষ্টির গভীরে সে নিজেকে ও নিজের আসন্ন যৌবনকে ডুবিয়ে দিতে চায়।

ভাস্করের বিগত জীবনের ইতিহাস অত্যন্ত অস্পষ্ট ও ঘোলাটে। বিস্মৃতির ধ্বংসস্তূপে তা চাপা পড়ে আছে। স্মৃতির আবর্জনা সরিয়ে সে লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করবার সময় তার প্রচুর নয়। পূর্ণ পরিস্ফুট শিল্পীর মন নিয়ে সদাই সে নিজের ধেয়ানে মগ্ন হ'য়ে থাকে। কী যে সে ভাবে, সে নিজেই জানে না। বাইরের কাজ ছাড়া সে সর্বক্ষণই নিজেকে ষ্টুডিওর মাঝে আবদ্ধ ক'রে রাখে। আত্মীয় স্বজন নেই, বন্ধু বান্ধব নেই, সংসারে আপন জন বলতে তার কেউ নেই। প্রয়োজন ভিন্ন সে কথা বলে কম। মডেল বা সহকারীরা তার গাম্ভীর্য্যকে সম্মান করে। তরুণী মডেলরা মুগ্ধবিস্ময়ে তার প্রিয়দর্শন মুখের পানে অপলকে চেয়ে থাকে। রহস্যালাপ করতে সাহসে কুলোয় না।

জ্ঞান হ'য়ে পর্য্যন্ত ভাস্কর এম্‌নি নিঃসঙ্গ, এম্‌নি একা। নিঃসঙ্গতার সমুদ্রে গা ভাসিয়ে সে শিল্পীর চোখ দিয়ে সূর্য্যোদয় দেখেচে—আকাশের বুকে নবারুণের বিকাশ দেখেচে। জীবনে সঞ্চয় ক'রেচে অফুরন্ত আলো, জীবনের সকল প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করবার মতো অজস্র শক্তি। জীবনের প্রথম হ'তেই সে অভাবনীয় পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে নিজের শক্তিতে স্বচ্ছন্দে বড় হ'য়ে উঠেচে। যার প্রভাবে, যার অনুকম্পায় সে মানুষ হ'য়ে উঠেচে তিনি সংসারী হ'য়েও সন্ন্যাসী, তিনি অসাধারণ প্রকৃতির মানুষ। তিনি দেশসেবক, দরিদ্রের বন্ধু, তিনি রামকৃষ্ণ চৈতন্যের মতো সাধক, তিনি গান্ধীভক্ত, তিনি দুঃসাহসী বিপ্লবী! তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ভাস্কর নিজের জীবনকে গড়ে তুলেছিল।

তাই এই নিঃসঙ্গতার মাঝে তার উদ্দাম যৌবন অনিয়ম উত্তেজনায় উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে ওঠেনি। শিল্প ছাড়া তাকে আর সংসারের কোন আকর্ষণই পথভ্রষ্ট করতে পারেনি। কোন আসক্তিই তাকে জীবনের উন্মাদ আস্বাদে বিভ্রান্ত ক'রে তুলতে পারেনি ব'লেই আজ সে জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পেরেছে।

তার এই একাকিত্বে ব্যর্থতার বেদনা ছিল কিনা তার অন্তর্যামীই জানেন, তবে তার অবসর সময়টুকুতে তার জীবনের আঙিনায় কারুর মৃদু কঙ্কণঝংকার উঠ্‌তো কিনা কিংবা কারুর গোপন অভিসারের সন্তর্পিত চরণপাতে নূপুরধ্বনি হতো কিনা আমাদের জানা নেই। কারুর বিরহব্যথায় তার কর্ম্মশ্রান্ত মনকে দীর্ঘশ্বাসে ভারী করে তুলতো কিনা তার ইতিহাস জানা নেই। গভীর রাত্রিতে বিছানা আশ্রয় করে সে গাঢ় ঘুমে অসাড় হ'য়ে পড়তো।

এই ছিল ভাস্করের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা!

সেদিন বিকেলের দিকে মডেলকে সাম্‌নে বসিয়ে ভাস্কর যখন কাজের মাঝে গভীর ভাবে মগ্ন, দরজার মাথায় ইলেকট্রিক বেলটা ঘঙ্‌ ঘঙ্‌ ক'রে বেজে উঠ্‌তেই ভাস্কর চম্‌কে উঠে দাঁড়াল। গভীর বিরক্তিতে মুখখানা ভ'রে গেল। আবার বেল্‌ বাজ্‌লো। মডেলকে ইঙ্গিতে বস্‌তে বলে, ভাস্কর বাইরে গেল।

দরজা খুলতেই ভাস্করের বিস্ময়ের অবধি রইল না। সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এক সুবেশা সম্ভ্রান্ত-মহিলা!

বিহ্বল-বিস্ময়ে ভাস্কর বলে উঠ্‌লো, মিস্‌ দাশ? আপনি?

মিস্‌ দাশ স্মিত হাসিতে মুখ ভরে বল্‌লেন, হ্যাঁ, নমস্কার! খুব আশ্চর্য হ'চ্চেন না? আপনাকে দেখ্‌তে এলুম। কী হ'য়েছে আপ্‌নার?

—কিছু না। আমি তো ফোন্‌ ক'রে আপনাকে জানিয়ে ছিলুম আজ আর যেতে পারবো না—

তেম্‌নি হাসিতে মুখ ভরে মিস্‌ দাশ বল্‌লেন, তাইতো দেখ্‌তে এলাম, কী হলো আপনার? অসুখ-বিসুখ করলো নাকি?

হঠাৎ ভাস্করের ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে মিস্‌ দাশ বললেন, কিন্তু এইখানে এম্‌নি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমায় বিদেয় দেবেন নাকি? চলুন তো ভেতরে যাই—

অপ্রস্তুতের ভঙ্গীতে মাথা নীচু ক'রে ভাস্কর দরজাটা খুলে দিয়ে বললে, মাপ করবেন। আসুন, ভেতরে আসুন—

মিস্‌ দাশ সশব্দে হেসে উঠ্‌লো।

ভিতরে এসে ভাস্কর বললে, অসুখবিসুখ কিছু না, আপনি মিছে কষ্ট করলেন মিস্‌ দাশ। একখানা আব্‌জেক্ট ছবির কাজ পেয়েছি এক রাজবাড়ী হ'তে। পৌরাণিক ছবি, তাই বাধ্য হ'য়ে আপনার কাছে ক'দিনের ছুটি নিতে হলো—

দেওয়ালে-ঝোলানো ছবিগুলোর পানে সতৃষ্ণ নয়নে চাইতে চাইতে মিস্‌ দাশ বললেন, কী ছবি? পৌরাণিক?

মিস্‌ দাশের অন্যমনস্ক মুখের পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে ভাস্কর বললে, হাঁ। কৃষ্ণলীলার ছবি—

তাই নাকি? কতটা হলো?

প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলে মিস্‌ দাশ ভাস্করের মুখের পানে তাকালেন।

ভাস্কর হাসলে। এই তো আজ সবে মডেল সেলেক্ট ক'রে আরম্ভ ক'রেচি।

—মডেল? কই?

ভাস্কর ডাকলে, প্রতিমা!

ভিতরে পর্দার আড়াল ঠেলে, জড়োসড়ো হ'য়ে তাদের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো একটি তরুণী। মিস্ দাশ নির্নিমেষে তার মুখের পানে তাকালেন, ব্যথাভরা দৃষ্টি দিয়ে। মেয়েটির মুখখানি সত্যই ছাঁচে-গড়া প্রতিমার মুখের মতই নিখুঁত। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে ও ব্যথার বেদনায় সে মুখের জ্যোতি গেছে নিভে, ঝরা ফুলের মতই সে মুখ করুণ, নিষ্প্রভ ও বর্ণমলিন! অলক্ষ্যে একটা দীর্ঘশ্বাসে মিস্ দাশের বুকখানা দুলে উঠ্‌লো।

ভাস্কর ড্রয়ার হ'তে একখানা দশটাকার নোট বের ক'রে মেয়েটার হাতে দিয়ে বললে, আজ তুমি যাও। কাল সকালে কিন্তু ঠিক দশটার সময় আসা চাই। রিক্‌সা নিয়ে চলে আস্‌বে।

মেয়েটি নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে। মেয়েটি চ'লে গেলে মিস্ দাশ জিগ্‌গেস করলেন, এদের কোথা হ'তে আনেন?

ভাস্কর ম্লান হাসিতে মুখ ভ'রে বললে, এদেরও মিডিলম্যান (Middleman) আছে, তারাই জোগাড় ক'রে আনে।

মিস্ দাশ কপালে চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কী আবার ওর টাকা হ'তে বখ্‌রা নেয় নাকি?

—সার্‌টেন্‌লি (Certainly), দশটাকার আড়াইটাকা তো নেবেই। নতুন হ'লে বেশীও আদায় করে।

কী সর্ব্বনাশ! আহা!—মিস্ দাশ আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ভাস্কর হাসলে, আপনারা বড়লোক মিস্ দাশ, আপনারা ঠিক বুঝ্‌বেন না ওদের ব্যথা। ব্যথার পাহাড় বুকে ব'য়ে সকাল হ'তে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত পাথরের মতো নিশ্চল হ'য়ে ব'সে থাক্‌বে আমার সুমুখে, আর আমি ওর অনাবরিত দেহ হ'তে রূপ নিংড়ে নিয়ে ক্যান্‌ভাসের গা রাঙিয়ে দেব। অনাহারের জ্বালা, আমি কিছু কিছু জানি মিস্ দাশ—আপনারা বুঝ্‌বেন না। ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

মাথা নীচু ক'রে অনেকক্ষণ মিস্ দাশ নিঃশব্দে ব'সে রইলেন। ভাস্কর লক্ষ্য করলে তার চোখদুটি জলে ভারী হয়ে উঠেছে।

ভাস্কর কথার মোড় ফিরিয়ে বললে, এ ক'টা দিন দয়া ক'রে আমায় ছুটি দিতেই হবে। কাজটা শেষ হ'য়ে গেলেই আবার নিয়মমত আপনার কাজে আমি মন দোব।

মিস্ দাশের ঠোঁটের ওপর আল্‌গোছে একটু হাসি ভেসে উঠ্‌লো। বললেন, তা আমি জানি। বেশ তো এ কাজ শেষ হ'লেই যাবেন। আমার ছবি শেষ হ'তে আর ক'দিন লাগ্‌বে?

ভাস্কর অপলকে তার মুখের পানে চেয়ে বললে, বেশী দিন নয়।

ভাস্কর হঠাৎ মাথা নীচু ক'রে ঢোঁক গিলে বললে, তবে যতো দেরী হয় আমার পক্ষে ততই ভালো—

—কেন?

বিস্ময়ের আতিশয্যে ভাস্করের মুখের পানে বিহ্বল দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে মিস্ দাশ প্রশ্ন করলেন, কেন, দেরী হ'লে আপনার লাভ কিসে? আপনি তো ফুরিয়ে নিয়েচেন।

ভাস্কর পরিপূর্ণ সশ্রদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে তার মুখের পানে চেয়ে বললে, আমার লাভ, আমি আপনাকে দেখ্‌তে পাবো, কাছে পাবো।

সহসা মিস্ দাশের অন্তরের অন্তরতম দেশে কে যেন সবেগে প্রচণ্ড আঘাত করলে। মুহূর্ত্ত চোখ বুজে ধাক্কার প্রথম বেগটা সামলে নিয়ে ভাস্করের প্রদীপ্ত মুখের পানে

চাইলেন। অপরূপ সে মুখের জ্যোতি। অবারিত আকাশের মতো আনীল, মেঘশূন্য। তার কণ্ঠস্বর সকাতর কান্নার আবেগে তার বুকের মাঝে আছড়ে পড়ল। মিস্ দাশ সাগ্রহে ভাস্করকে সস্নেহে বুকের মাঝে টেনে নিতে চাইলেন। একটা প্রচণ্ড আলোড়নে তার বুকখানা সমুদ্রতরঙ্গের মতো উদ্বেল হয়ে উঠ্‌লো। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে তার মুখের পানে চেয়ে থেকে মিস্ দাশ প্রশ্ন করলেন, আমায় আপনার ভালো লাগে মিষ্টার রায়?

ভাস্কর বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চেয়ে ধরা-গলায় বললে, ভালো লাগে? এতো রূপ আমি জীবনে দেখিনি, অথচ অনন্তকাল হ'রে এই রূপই আমি কল্পনা করেচি, ধ্যান করেচি। আমি শিল্পী, আমি রূপের উপাসক, রূপের সাম্‌নে আমি অঞ্জলি পেতে দাঁড়াই।

মিস্ দাশ সশব্দে উঠ্‌লেন, নিজেকে সামলাবার চেষ্টায়। ভাস্কর চাইল তার পূর্ণ পরিস্ফুট দৃপ্ত রূপরাশির পানে বিকশিত শতদলের মতো পরিপূর্ণ তার মাধুরী!

আর্টিষ্ট কিনা!

মিস্ দাশ দাঁতে ঠোঁট্ চেপে হাসলেন।

ভাস্কর বাধা দিয়ে উত্তেজিতস্বরে বললে, না না। এ আর্টিষ্টের অন্ধ আবেগ নয়। রঙের লালিমা নয়। এ নগ্ন স্নেহভুখারীর বুভুক্ষা। এ তার অন্তরের কাতর কান্না। এ আপনি বুঝ্‌বেন না। বুঝ্‌বেন না পিপাসাতুর আত্মার এই চিরন্তন হাহাকার!

ভাস্করের গলা ভিজে উঠে রুদ্ধ হ'য়ে গেল। আয়ত চোখ দুটি সজল হয়ে এলো।

মিস্ দাশ হঠাৎ অস্থির হ'য়ে উঠে দাঁড়ালেন। আগ্রহ-কম্পিত কণ্ঠে ডাকলেন, রায়!

তার কণ্ঠের ঝংকারে ভাস্কর কেঁপে উঠ্‌লো। সেও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

মিস্ দাশ বললেন, চলো তোমার ষ্টুডিও দেখি, তোমার পৌরাণিক ছবি—

ষ্টুডিয়োর মাঝে মিস্ দাশ হঠাৎ বজ্রাহতের মতো একখানা লাইফ্ সাইজ্ ছবির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে পাথর হ'য়ে গেল। একটী আধাবয়সী মাঝারী সাইজের পুরুষের প্রতিকৃতি। রোগা দেহ, প্রশান্ত মুখ, কপাল চওড়া, সাম্‌নের চুলগুলো পাতলা হ'য়ে এসেচে। গায়ে ঢিলে হাতা সাদা পাঞ্জাবীর ওপর জহর কোট। চোখে মুখে অন্যমনস্ক গাম্ভীর্য্য। পায়ের নীচে একটা দো-আঁস্‌লা সাদা কুকুর। মিস দাশ অপলক স্থির দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে আছে ছবির মুখের পানে, আর ভাস্কর চেয়ে আছে নির্নিমেষে মিস্ দাশের পাংশু মুখের পানে। মিস্ দাশের ঈষৎ-ভিন্ন পাতলা ঠোঁট্ দুখানি কাঁপচে হাওয়ার জরে, কী যেন বল্‌তে চায়, বল্‌তে পারচে না।

ভাস্কর হঠাৎ ব'লে বস্‌লো, চেনেন্ নাকি? তা' হ'লে বল্‌তেন ওখানা ছবি নয়, জীবন্ত—

উত্তেজিত স্বরে মিস্ দাশ প্রশ্ন করলেন, কে? কে ইনি? তুমি এঁকে চেনো?

ভাস্কর একখানা টুলের ওপর ব'সে পড়ে বললে, চিনি? চিনি শুধু চোখ দিয়ে নয়, আমার দেহের প্রতি বিন্দুটি রক্ত দিয়ে, সমস্ত চেতনা দিয়ে!

কে? কে তোমার উনি রায়? ভীরু কম্পিতকণ্ঠে মিস্ দাশ প্রশ্ন করলেন।

ভাস্করের প্রোজ্জ্বল চোখদুটি কৌতুকে স্নেহে ছল্‌ছল্ ক'রে উঠ্‌ল। সে নিতান্ত বালকের মতো ভাঙা ভাঙা স্বরে বললে, উনি আমার সব। আমার প্রতিপালক, আমার গুরু। উনিই আমায় জীবনের আলো দেখিয়েচেন, আঁধারের অতল হ'তে তুলে এনে। আমার ওপর ওঁর করুণার অন্ত নেই।

ভাস্কর থামল'। মিস্ দাশ চিৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন, ত'র পর?

বিমূঢ় বিস্ময়ে প্রতিহত হ'য়ে ভাস্কর বললে, না, আর কোন সম্বন্ধ আমাদের নেই—

মিস্ দাশ অধীর উত্তেজনায় হঠাৎ নত হ'য়ে ভাস্করের একখানা হাত চেপে ধ'রে কাকুতি ক'রে ব'লে উঠলেন, কোন সম্বন্ধ নেই? আমার কাছে লুকিয়ো না ভাস্কর, সত্যি বলো, কোন সম্বন্ধ নেই?

ভাস্কর কেঁপে উঠলো। কেঁপে উঠলো মিস্ দাশের তপ্ত স্পর্শে! অজানা পুলকের রোমাঞ্চ জাগলো তার দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। রক্তের মাঝে বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল।

মিস্ দাশ তার হাতে ঝাঁকানি দিয়ে উদ্দাম ঝড়ের বেগে আর্ত্তস্বরে ডাকলেন,—ভাস্কর! ভাস্কর!

·· বাইরে হ'তে কে ভারী গলায় ডাক দিল, ভেতরে আস্‌বো ভাস্কর?

সচকিত ভাস্কর উঠে দাঁড়াল, মিস্ দাশের শক্ত মুঠোর নীচে হ'তে তার হাতখানা আলগা হ'য়ে খসে পড়ল। ভাস্কর ব'লে উঠলো, ওই যে উনি এসেচেন। ভাস্কর এগিয়ে যাচ্ছিল, বাধা দিলেন মিস্ দাশ।

কে এসেচেন? কে এসেচেন, রায়?

বাইরে হ'তে যিনি ডাক দিলেন, তিনি তখন ঘরের মাঝে এসে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েচেন। ভাস্করের আঁকা প্রতিকৃতি যেন রূপ পরিগ্রহ ক'রে দেওয়াল হ'তে নেমে এসে মেঝের ওপর দাঁড়িয়েছে।

কারুর মুখে কোন কথা নেই। বিস্ময়ের ভাবে ঘরখানা থম্ থম্ করচে। আগন্তুকের বিস্ফারিত বিস্মিত দৃষ্টির নীচে দুজনেই মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়েচে। অশরীরীর ছায়া দেখে যেন তারা মূক হ'য়ে গেছে।

আগন্তুক ধীরে ধীরে তাদের কাছে স'রে এসে দাঁড়াল। অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় মিস্ দাশ ভাস্করের একখানা হাত চেপে ধরে তার দেহের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল।

আগন্তুক সহসা সশব্দে হেসে উঠে বললে, আশ্চর্য্য! তোমায় এখানে কে নিয়ে এলো মমতা? কোন্ অদৃশ্য মহাশক্তি? আমি যে সারাপথ আজ তোমার কথাই ভাব্‌তে ভাব্‌তে আস্‌চি। কিন্তু এখানে এসে যে তোমার দেখা পাবো, এ যে আমি কল্পনা করতেও পারিনি।

ভাস্কর মাথা তুলে আগন্তুকের মুখের পানে তাকাল।

আগন্তুক বললেন, তোমার কথা ভাবছিলুম কেন জানো মমতা, আজ তোমার ছেলেকে তার পরিচয় জানিয়ে যাবো বলে। আমি আজ আবার যাচ্ছি কিনা, ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট (Defence of India Act)। যদি আর না ফিরি, তাই ঠিক্ ক'রেছিলুম, ওর পরিচয় ওকে জানিয়ে যাবো। কিন্তু তার প্রয়োজন হলো না। তোমার ভাস্করকে আজ তোমার হাতেই দিয়ে চললুম।

আগন্তুক ডাকলেন, ভাস্কর!

ভাস্কর কাছে এলো। আগন্তুক তাকে বুকের মাঝে টেনে নিয়ে বললেন, ভাস্কর, মমতা তোমার মা। সতেরো বছর আগে একদিন ওর কোল হ'তে তোমায় ছিনিয়ে নিয়েছিলুম, আজ ফিরে দিলুম।

সবিস্ময়ে ভাস্কর প্রশ্ন করলে, মিস্ দাশ?

আগন্তুক সশব্দে হাসলেন, হাঁ মিস্ দাশ। বিধির বিধানে তিনি মিসেস্ অমর রায়, কিন্তু আইনের বিধানে

নয়। জানোইতো চিরদিন বিধির বিধানকেই মেনে এসেছি আর আইনকে অমান্য ক'রেচি—

ভাস্কর সহসা মমতাকে দুহাতে শিশুর মত জড়িয়ে ধবে চিৎকার কারে উঠলো, মা, মা আমার—

—আর এই বিপ্লবী অমর রায়ই তোমার পিতা। আমি চললুম, বাকিটুকু তোমার মার কাছে শুনো। বাইরে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে।

ভাস্করের আলিঙ্গনের নীচে মমতা তখন মূর্চ্ছা গেছে।

স্বভাবোক্তি

অধ্যাপক শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত এম্-এ

অলঙ্কারাচার্য্য দণ্ডী সমুদয় অলঙ্কারকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি। যাহা স্বাভাবিকতায় পরিস্ফুট, তাহা স্বভাবোক্তি, যাহা বক্রতা অর্থাৎ বৈদগ্ধ্যময় ভঙ্গীদ্বারা পরিস্ফুট, তাহা বক্রোক্তি। অলঙ্কার শব্দ শুনিয়া চিন্তিত হইবার কারণ নাই, কেন না প্রাচীনদের মতে বাক্-সৌন্দর্য্যই অলঙ্কার। আমরা সহজ করিয়া বলিতে পারি আচার্য্য দণ্ডীর মতে কাব্য দুই প্রকার,—স্বভাবোক্তিকাব্য ও বক্রোক্তিকাব্য।

প্রত্যেক নিসর্গবস্তু ও মানবীয় বস্তুর একটি নিজস্ব মহিমা আছে, সেই নিজস্বত্বে তাহারা সৃষ্টির মধ্যে অতুলনীয়। কবিচিত্তের অনুরঞ্জনদ্বারা বস্তু রঞ্জিত হইয়া যেন বিকৃত হয়, বর্ণনার অলঙ্কার, শ্রী ও ভঙ্গী-সৌষ্ঠব যেন তাহার স্বরূপকে আবৃত করে। অলকানন্দার সুনির্ম্মল জলধারা কোন কিছুর স্পর্শে আসিলেই, এমন কি ঊর্দ্ধগগনের সুনীল ছায়াপাতেও যেন অম্লান সৌন্দর্য্যলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়। মোহমুক্ত কবির প্রসন্নচিত্তে সাধারণভাবে অধিবাসিত হইয়া কখন কখন এই বস্তু বিধাতার সৃষ্টির পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য লইয়া ফুটিয়া উঠে। যে ভাষায় বিহঙ্গ গান গায়, নদী নির্ঝর ছুটিয়া চলে, প্রভাতের আলোক পুষ্পবালার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিয়া শুভ্রশ্রীতে তাকে বিকসিত করে, সেই ভাষায় কখন কখন কবি-কণ্ঠে স্বভাবের সৌন্দর্য্যস্তোত্র রচিত হয়। ইহাই সত্যকার স্বভাবোক্তি। রসধর্ম্মে প্রবল হইলে রচনা হইয়া যায় রসোক্তি, তাহা চিত্তকে করে ভাবসিক্ত। বর্ণনার সজ্জাবাহুল্যে ভূষিত হইলে রচনা হয় বক্রোক্তি। এই উভয় সীমা পরিহার করিয়া বস্তুর অবলম্বনে কবিচিত্তকে উদ্বুদ্ধ না করিয়া কবিচিত্তের অবলম্বনে বস্তু স্ব-মহিমায় দ্যোতমান হইলে রচনা হইবে স্বভাবোক্তি। যে রম্যতা ইহার প্রাণ, সে রম্যতা সর্ব্বদা রসের নয়, বক্র-বর্ণনারও নয়; সে রম্যতা বস্তুর প্রাণধর্ম্মের অভিনব স্পন্দন, তাহারই সজীব চিন্ময় স্পর্শ। মত তাতে মুগ্ধ হয়, আবিষ্ট হয়, বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে একবার অন্তরে একবার বাহিরে দৃষ্টিপাত করে।

এই বর্ণনা চিত্তকে দীপ্ত করা অপেক্ষা বিগলিত করে বেশী। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই রচনা সম্বন্ধে বলা যায়,—

আমার এ গান ছেড়েছে তা'র
সকল অলঙ্কার;
তোমার কাছে রাখেনি আর
সাজের অহঙ্কার।
অলঙ্কার যে মাঝে পড়ে
মিলনেতে আড়াল করে,
তোমার কথা ঢাকে যে তার
মুখর ঝঙ্কার।

—গীতাঞ্জলি

ভাবের, সাজের এবং অহঙ্কার ও অলঙ্কারের মুখর ঝঙ্কার স্বভাবোক্তির স্বভাবরূপ প্রাণটিকে একেবারে বিনষ্ট না করিলেও তাহাকে আচ্ছন্ন করে এবং সহৃদয়ের হৃদয়ের সহিত তাহার পূর্ণ মিলন ঘটিতে দেয় না।

অলঙ্কারাচার্য্য দণ্ডী স্বভাবোক্তিকে আদি বা প্রথম অলঙ্কার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং পরে অন্যান্য অলঙ্কারের কথা বলিয়াছেন। দণ্ডী বলিয়াছেন,—

নানাবস্থাং পদার্থানাং রূপং সাক্ষাদ্ বিবৃণ্বতী।
স্বভাবোক্তিশ্চ জাতিশ্চেত্যাদ্যা সালঙ্কৃতির্যথা॥

—কাব্যাদর্শঃ, ২।৮

—পদার্থসমূহের নানা অবস্থার স্বরূপ যাহাতে সাক্ষাৎভাবে বিবৃত হয়, তাহাই স্বভাবোক্তি বা জাতি, তাহাই আদ্য অলঙ্কার। মূলের 'রূপ' শব্দের অর্থ টীকাকারেরা করিয়াছেন,—

'স্বরূপ-বিশেষম্ অসাধারণ-ধর্ম্মম্''—স্বরূপ বিশেষ, যাহা বস্তুর অসাধারণ বা বিশিষ্ট ধর্ম্ম। এই অর্থই অভিপ্রেত সন্দেহ নাই।

জাতি শব্দের ব্যাখ্যায় কথিত হয়,—

নানাবস্থাসু জায়ন্তে যানিরূপাণি বস্তুনঃ।
স্বেভ্যঃ স্বেভ্যো নিসর্গেভ্য তানি 'জাতি' প্রচক্ষতে॥

—নিজ নিজ নিসর্গ হইতে বস্তুর নানা অবস্থায় যে সকল রূপ জাত হয়, তাহাদিগকেই জাতি বলে। দণ্ডী স্বভাবোক্তিকে আদ্য অলঙ্কার বলিয়া স্বভাবোক্তি-কাব্য যে মনুষ্য সমাজের আদি কাব্য, তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বক্রোক্তি মানুষের শিক্ষার আভিজাত্য প্রকাশ করে, তাহা যে পরবর্ত্তী সভ্যতার সৃষ্টি, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বভাবোক্তি মানুষের প্রীতি-সিক্ত চিত্তে আপন প্রসন্নতায় ফুটিয়া উঠে; তাহা কেবল আদ্যকালের নয়, তাহা নিত্যকালের; তাহার সহিত অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে সহজ মানুষটির। জেম্স্ হেনরি লী হাণ্ট্ কাব্য কি বুঝাইতে যাইয়া এক জায়গায় বলিয়াছেন—

"Nay the simplest truth is often so beautiful and impressive of itself, that one of the greatest proofs of his genius consists in his leaving it to stand alone, illustrated by nothing but the light of its own tears or smiles, its own wonder, might or playfulness."

—What is Poetry ?

—"শুধু তাই নয়, সহজতম সত্যটি অনেক সময়ে এত সুন্দর এবং নিজেই এত হৃদয়গ্রাহী যে, কবির প্রতিভার একটি সব চাইতে বড় প্রমাণ হইতেছে ইহাকে কেবল নিজ স্বভাবে থাকিতে দেওয়ায়; ইহা নিজ অশ্রু বা হাসির প্রভা, নিজ বিস্ময়-শক্তি এবং লীলাময়ত্বে নিজেই প্রকাশ পাইবে; আর কিছুতে নহে।"

স্বভাবোক্তি কাব্য সম্বন্ধে ইহার পর আর কিছু বলিবার নাই।

স্বভাবোক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। নিসর্গ-কবিতা ও প্রাণি-কবিতা। নিসর্গ শব্দে সংস্কৃতে সর্গ বা সমগ্র সৃষ্টি বুঝাইলেও বাঙ্গলায় বৃক্ষ-লতা, নদী-পর্ব্বত, মেঘ-রৌদ্র প্রভৃতি প্রত্যক্ষ প্রাণ-স্পন্দ-হীন মূক বা দৃশ্যমান প্রকৃতি অর্থাৎ Nature অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই নিসর্গ বা Nature আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের এক প্রধান অবলম্বন। প্রাচীন নাট্য বা কাব্যেও তাহার অনাদর ছিল না। অভিজ্ঞান-শকুন্তল বা বিক্রমোর্ব্বশী অথবা উত্তরচরিত নাটকে নিসর্গের অপূর্ব্ব বিশিষ্টতার কথা কাব্য-রসিক মাত্রেই অবগত আছেন। রবীন্দ্রনাথ যথার্থ মন্তব্য করিয়াছেন,—"অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে অনসূয়া প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্মন্ত যেমন, তপোবন প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র।"

(প্রাচীন সাহিত্য, শকুন্তলা)।

আধুনিক গীতিকাব্যের যুগে নিসর্গ-সুন্দরী কবির আরাধ্যা দেবীতে পরিণত হইয়াছেন। কবি ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থ নিজেকে 'A worshipper of Nature' প্রকৃতির পূজারী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বাস্তবিকই প্রকৃতি এখন কবির চক্ষে এক স্বতন্ত্র সত্তায় দীপ্যমান, কবির সহচরীরূপে কখন তাহাকে বশ করে, কখন তাহার বশীভূত হয়। প্রাণি-জগতের কাব্যে সহজেই ভাব ও রসের সঞ্চার হয়; কিন্তু কখন কখন বর্ণনায় স্বভাব-সৌন্দর্য্যই সমধিক পরিস্ফুট হয়, রস ও ভাব থাকিলেও তাহা স্বভাবোক্তি বলিয়াই সর্ব্বাগ্রে চিত্তকে চমৎকৃত করে।

শারদীয়

শামসুদ্দীন

আলোর দিগন্ত রেখা চলে ছুটে আরো দূর পথে,
দৃষ্টি নয় ক্ষীণ শুষ্ক, দীপ্ত আরো আগার মায়ায়;

দুরন্ত কালের স্রোত তরঙ্গিত দিনের পাখায়
এলোমেলো তীরে তীরে চলিয়াছে অরুণিমা রথে।
আকাশে উল্লসি' ওঠে তারকায় কামনা মনের,
বিমুগ্ধ ধরণী আঁখি দেখিছে তা' আকুল বিস্ময়ে;
বাসনার বৃন্তগুলি মেলি' দল শষ্প-কিশলয়ে
উষর মরুতে খুঁজে পারিজাত অস্ফুট পথের।

স্বচ্ছন্দ মনের তটে নিরিবিলি জলের ধারায়
সে সাধ বাঁধিছে বাসা রোমাঞ্চিত জীবন বেলাতে;
সহস্র মধ্যাহ্ন সূর্য হাজারো সে রাতের তিমির
পারিবে না ভেঙ্গে দিতে সেই সুর ক্ষণিক ছায়ায়;
উজ্জ্বল প্রদীপ্ত রবে রক্তরাঙ্গা স্মৃতির ছায়াতে
সংগ্রামের ইতিহাসে স্বাতন্ত্র্যের সংকীর্ণ প্রাচীর।

শ্যামসুক

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বৈষ্ণব শ্যামসুক,
দিবানিশি তার   দেহ মন প্রাণ—
হরি সেবা উন্মুখ।
আপনারে ভাবে সবাকার নীচু,
হরিকথা ছাড়া শোনে না ক কিছু,
হরি তার ধ্যান, হরি তার জ্ঞান,
হরি তার সুখ দুখ।

(২)

গ্রাম থেকে দূরে রয়,
করে কাঞ্চন কামিনীকে সে যে
সর্পের চেয়ে ভয়।
বলে 'পিচ্ছিল কঠিন এ পথ,
প্রতি পদে পদে বিঘ্ন বিপদ,'
রুক্ষ নীরস জীবন তাহার
তবু কি অমৃতময়!

(৩)

হরি শোনে তার ডাক,
প্রতি কথা তার হয় যে সফল
সত্যসিদ্ধ বাক্।
বুকে তার মহাভাবের জগৎ,
বাহিরেতে থাকে শুধু জড়বৎ
রাগের পথের প্রেমিক পথিক
সংসারে বীতরাগ।

(৪)

একদা পর্য্যটনে
চলেছেন সাধু, থমকি দাঁড়ান
বালকের ক্রন্দনে।
হারায়ে ফেলেছে পয়সাটী তার—
কাঁদিয়া আকুল খুঁজিয়া বেড়ায়,
হাতে দেন তার খুঁজে পেয়ে সাধু
অনেক অন্বেষণে।

(৫)

একি এ অকস্মাৎ!
সাধুর গাত্র শিহরি উঠিল,
অবশ হইল হাত।
অর্থের বিষ তীব্র কি এত?
পশে দেহে মনে গরলের মত,
দেবের দেউলে এ যেন হঠাৎ
হল রে বজ্রপাত।

(৬)

স্বপ্নে সাধুর মনে
পয়সার ছাপ, শিশুর বদন
জাগে যে ক্ষণে ক্ষণে।
জাগে আশ্রমবিরোধী কি ভাব
সাংসারিকের ক্ষতি আর লাভ
অসহ বেদনা—কাঁদিয়াও তাহা
যায়না যে জাগরণে।

(৭)

লক্ষ্য করে নি কেহ
পরদিন হতে জ্যোতিঃহারা হলো
সাধুর পুণ্য দেহ।
আশীর্বাদের ফলেনাক ফল,
সাধু ম্লান মুখ—চোখ ভরা জল,
মমতা দেখালে—এই অপরাধে
পতন হওয়া কি শ্রেয় ?

(৮)

কহিছে দৈববাণী
কেন হুঁসিয়ার হলে নাক সাধু
পিচ্ছিল পথ জানি ?
সেনাদল যারা রণে ছুটে যায়
কোনো দিকে তারা ফিরে কি তাকায় ?
সাগরে কি ঘটে দেখিয়া দেখেনা
মুকুতার সন্ধানী।

(৯)

হে কঠোর সন্ন্যাসী,
রাগের এ পথে সদাই বাদল
পিচ্ছিল বারমাসই।
দয়া মায়া আছে আগুলিয়া পথ,
মিশিলে পতন—দেখিলে বিপদ,
ব্যাকুল হৃদয়ে ছুটে যেতে হবে
যেখানে ডাকিছে বাঁশী।

ওরে যাযাবর মন

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

এই নিখিলের পথে প্রান্তরে ওরে যাযাবর মন !
নিশিদিন ধরে দরবেশ সম চলেছ বাজায়ে বাঁশী ,
তোমারে তো জয় করেনি এখনো ঘুম-কিশোরীর হাসি,
বিজন প্রাণের মুক্তি স্বপন তবুও চিরন্তন !
মরুণের ছায়া মরীচিকা হয়ে তোমারে দিয়েছে দেখা,
রমণীর মায়া রহস্যজালে জড়ালো তোমারে লাজে ,
অসীমকালের কত মোহানায় দেখেছ তোমার কাছে
বিরহবিধুর দয়িতার মতো ধরার ছন্দ-রেখা।

কামনার পরী ভালোবাসা নিয়ে গেয়ে গেছে আশাবরী,
ভাব-বিহ্বল শুনেছ ক্ষণিক মীড়টানা তার গীতি,
মেয়েলি হাতের হাতছানি পেয়ে ক্ষণযৌবন প্রীতি
মরুর কানন রচিয়াছে বৃথা আকাশ কুসুম বল্লি।
কত রজনীর তারকার বাণী আসিয়াছে অভিসারে,
তোমারে ভোলাতে ঝরেছে অশ্রু-বিফলে ফিরেছে তারা ;
যুগে যুগে তব চলার সাধনা চির আশ্রয়হারা,—
সীমার ওপারে কখন তুমি কি লভিবে মুক্তিটারে !

অজানার সাথে গানের খেলাতে আসে যায় দিনধেনু
ভুলের কুসুম কুড়ায়ে কুড়ায়ে চির পথিকেরা যায়।
তোমার অতীত ভুবনে নীরব স্মরণের বেদনায়,—
পরিচয়হীন বিস্ময় লয়ে তোমারে দেখিয়া গেনু।

রাজপরিবারের সংবাদ

শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপবাহাদুর সমরকার্য্যে ভারতের বাহিরেই অবস্থান করিতেছেন। রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে, সিঙ্গাপুরে জাপানীদের আত্মসমর্পণের দলিল সম্পাদনের সময়ে তিনি লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনের সহিত তথায় উপস্থিত ছিলেন। বর্ত্তমান যুদ্ধে শত্রুপক্ষের আত্মসমর্পণের সময় আর কোথাও কোন ভারতীয় নৃপতি উপস্থিত ছিলেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

মাতৃশ্রী শ্রীশ্রীমহারাণী সাহেবা বর্ত্তমানে দার্জ্জিলিংএ আছেন।

স্থানীয় সংবাদ

প্রধান মন্ত্রীর পীড়া—

কুচবিহার রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় সর্দ্দার ডি, কে, সেন এম-এ, বি-সি-এল, এল্-এল্-বি, ব্যার-এট্-ল মহোদয় কিছুদিন যাবত অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ রোগে ভুগিতেছিলেন। গত জুন মাসে তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পায় এবং তখনই অস্ত্রোপচারের কথা হয়। কিন্তু ডাক্তারগণের পরামর্শে তখন অস্ত্রোপচার স্থগিত রাখা হয়। সম্প্রতি গত ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতার এক নার্সিং হোমে তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে তিনি ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন। কুচবিহার হইতে তাঁহার সাময়িক অনুপস্থিতি কালে রাজ্যের রাজস্বমন্ত্রী রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত করালীচরণ গাঙ্গুলী মহোদয় নিজ কার্য্য ছাড়াও প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করিতেছেন।

স্থানীয় কলেজের নূতন অর্থনীতির অধ্যাপক—

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গুহ এম্-এ স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। অধ্যাপক গুহ ইতিপূর্ব্বে বগুড়া কলেজে কাজ করিতেন।

সদর হাসপাতালের বেসরকারী পরিদর্শক

কুচবিহার দরবার নিম্নলিখিত মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণকে এক বৎসরের জন্য স্থানীয় সদর হাসপাতালের বেসরকারী পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়াছেন—(১) রায় সাহেব সুরেন্দ্রকান্ত বসু মজুমদার; (২) খাঁ চৌধুরী আমানতউল্যা আহমদ; (৩) শ্রীযুক্ত চুনীলাল মুখোপাধ্যায়; এবং (৪) শ্রীযুক্তা ইন্দিরা রায়।

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের মৃত্যুবার্ষিকী—

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর স্বর্গগত মহারাজা স্যার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের বার্ষিকী শ্রাদ্ধদিবস গিয়াছে। ঐ দিবস সকাল সাড়ে নয় ঘটিকার সময় কেশব আশ্রমে মৃত মহারাজার সমাধিমন্দিরের সন্নিকটে এক বিশেষ উপাসনা হয়। কলিকাতা হইতে আগত ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার লোধ মহাশয় উপাসনা পরিচালনা করেন। রাজ্যের রাজস্বসচিব এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ কেশব আশ্রমে উপস্থিত হইয়া মৃত মহারাজার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

বৈকালে সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় মহারাজার মর্ম্মর-মূর্ত্তির সন্নিকটে হাইকোর্টগৃহের বারান্দায় এক স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। মাননীয় রাজস্বসচিব মহোদয়ের প্রস্তাবে আচার্য্য লোধ মহাশয় এই স্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় সঙ্গীত, প্রার্থনা ও বক্তৃতাদি হয়। মাননীয় শিক্ষাসচিব শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় সিংহ সরকার, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবাপ্রসাদ সেন এবং শ্রীযুক্ত জানকী বল্লভ বিশ্বাস মহাশয় সভায় বক্তৃতা করেন।

স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে উভয় অনুষ্ঠানই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল।

দেশবিদেশের কথা

আন্দামানে নির্ব্বাসন ব্যবস্থা রহিত—

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ বহুদিন যাবত ভারত সরকার কর্ত্তৃক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদিগের কারাবাসস্থল রূপে ব্যবহৃত হইতেছিল। জাপানের হস্ত হইতে এই দ্বীপপুঞ্জ পুনরুদ্ধারের পর ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে তাঁহারা আর ভারতীয় বন্দীগণকে আন্দামানে পাঠাইবেন না। আন্দামানে বন্দী প্রেরণের জন্য ভারতে যে রাজনৈতিক অসন্তোষের সৃষ্টি হইত ভারত সরকারের বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের ফলে তাহা দূরীভূত হইবে।

বৃদ্ধা মহিলার জ্ঞানস্পৃহা—

এই বৎসর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এক বৃদ্ধা বাঙ্গালী মহিলা বাংলায় এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া জ্ঞানস্পৃহার এক নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন। মহিলার নাম শ্রীযুক্তা মৃণালিনী ঘোষ; তাঁহার এগারোটি নাতিনাতনী বর্ত্তমান। তাঁহার স্বামী পরলোকগত মিষ্টার এল্, কে, ঘোষ বিহার ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে ১৯৪১ সালে শ্রীযুক্তা ঘোষ আই-এ পরীক্ষা দেন। ১৯৪৩ সালে তিনি বি-এ পরীক্ষা দেন; এবং সেই বৎসরই তাঁহার বড় নাতনী ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়।

কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের নূতন অধ্যক্ষ—

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে শ্রীযুক্ত মুকুল দে অবসর গ্রহণ করায় প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অতুল বসু মহাশয় কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের নূতন অধ্যক্ষ

নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসু কৃতী শিল্পী; প্রথম জীবনে বাংলার বাঘ (Bengal Tiger) নামে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একখানি ছবি আঁকিয়া তিনি প্রভূত যশোলাভ করিয়াছিলেন। পরে তিনি লণ্ডনের Royal Academy of Artsএ শিক্ষালাভ করেন এবং ইউরোপের বিভিন্ন শিল্পাগার পরিদর্শন করেন। নয়া দিল্লীতে রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদে তাঁহার অঙ্কিত কয়েকখানি ছবি আছে।

অধ্যাপক জ্ঞান মুখার্জ্জির নূতন পদ—

ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদিগের অন্যতম। ভারত সরকার ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যে বিজ্ঞান মিশন প্রেরণ করিয়াছিলেন ডক্টর মুখোপাধ্যায় তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়াছে যে ভারত সরকার তাঁহাকে Imperial Agricultural Research Council এর ডিরেক্টর নিযুক্ত করিয়াছেন। ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের এই নূতন পদলাভে আমরা আনন্দিত এবং তাঁহাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইতেছি।

আমেরিকার ভারতস্থিত অতিরিক্ত যুদ্ধ সম্ভার বিক্রয়—

আমেরিকার যে সকল অতিরিক্ত যুদ্ধসম্ভার ভারতে পড়িয়া আছে সেইগুলি শীঘ্র ভারতবর্ষেই বিক্রয় করিয়া ফেলা হইবে। এই সকল যুদ্ধসম্ভারের মধ্যে এরোপ্লেন, মোটরগাড়ী প্রভৃতি ব্যতীত গৃহনির্ম্মাণের সাজসরঞ্জাম, খাদ্যদ্রব্য এবং বস্ত্রাদিও আছে। শেষোক্ত দ্রব্যগুলির বিক্রয়ে ভারতবাসীর অনেক সুবিধা হইবে।

আসন্ন নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

সম্প্রতি পুণা সহরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা হইয়া গেল। এই সভায় স্থির হইয়াছে যে ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের নির্ব্বাচনে কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। এই জন্য সর্দ্দার প্যাটেল, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতিকে লইয়া একটি পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠিত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিতকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বান—

ডক্টর জোয়াড ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত দর্শনের অধ্যাপক; তাঁহার খ্যাতি পৃথিবীর নানা দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ১৯৪৬ সালে "ষ্টিফানোস্ নির্ম্মলেন্দু" বক্তৃতামালা দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। ডক্টর জোয়াড এই আহ্বান গ্রহণ করিলে বিশ্ববিদ্যালয় উপকৃত হইবেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা—

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হইয়াছে। বিভিন্ন রণাঙ্গনে জাপান মিত্রপক্ষের নিকট চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ করিয়াছে। এখন মিত্রপক্ষের সম্মুখে জগতে শান্তিপ্রতিষ্ঠার সমস্যা মুখ্য হইয়া দেখা দিবে। পৃথিবীতে যাহাতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় জগৎবাসী তাহাই কামনা করে। শক্তিশালী সম্মিলিত জাতিসমূহকে এই জন্য সাহসের সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। সঙ্কীর্ণ স্বার্থ ও ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র জগতের কল্যাণচিন্তায় তাহাদিগকে অবহিত হইতে হইবে। সবল যাহাতে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতে না পারে, বৃহৎ যাহাতে ক্ষুদ্রকে গ্রাস করিবার লোভে মত্ত হইয়া না উঠে সেই দিকে সকলের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রপ্রতিষ্ঠার আদর্শ লইয়া এই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল; সেই আদর্শ যাহাতে কার্য্যকরী হয় সম্মিলিত জাতিসমূহকে তদ্বিষয়ে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। ইতিমধ্যেই বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ঈর্ষা ও অবিশ্বাসের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। রুশিয়া বল্কান রাষ্ট্রসমূহের সহিত একক চুক্তি সম্পাদন করিতেছে বলিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকা অভিযোগ করিতেছে; পক্ষান্তরে রুশিয়ার অভিযোগ এই যে ইংলণ্ড ও আমেরিকা পশ্চিম ইউরোপে রুশিয়ার বিরুদ্ধে দল পাকাইবার চেষ্টা করিতেছে। সম্মিলিত জাতিসমূহের মধ্যে পরস্পরের প্রতি এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব জগতে স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠার অনুকূল নহে। জগতের রাষ্ট্রনায়কগণের অন্তরে শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইয়া পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক, আমরা ইহাই কামনা করি। অন্যথায় এত রক্তপাত, মৃত্যুবরণ, ধ্বংসলীলা সকলই ব্যর্থ হইয়া যাইবে!

আণবিক বোমা—

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নানাবিধ নূতন আবিষ্কার হইয়াছে; [illegible] বৎসরে বিজ্ঞানের অগ্রগতি শত বৎসর আগাইয়া গিয়াছে—কোন কোন বিজ্ঞানীর ইহাই অভিমত। বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার নবতম অবদান আণবিক বোমা; ইহার ধ্বংসকারী শক্তি জাপানের হিরোসিমো ও নাগাসাকি বন্দরে অনুভূত হইয়া গিয়াছে। এতদিন মানুষ তড়িৎ, তাপ, এবং রাসায়নিক শক্তির সহিতই পরিচিত ছিল; এই সকল শক্তির সাহায্যে সে অসাধ্য সাধন করিয়াছে। পরমাণুর মধ্যে এক মহাশক্তি লুক্কায়িত আছে, মানুষ তাহাও জানিত; কিন্তু এই শক্তি নিষ্কাশন করিয়া কিভাবে কাজে লাগান যাইতে পারে তাহার সন্ধান এতদিন মানুষ পায় নাই। আজ সেই সন্ধান পাইয়া মানুষ শক্তিমদে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমেরিকা কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত দুইটি আণবিক শক্তিসম্পন্ন বোমার আঘাতে জাপানের দুইটি প্রকাণ্ড বন্দর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রাণ হারাইয়াছে। বিজ্ঞানসাধনার এই ভয়াল মূর্ত্তি দেখিয়া বিশ্বমানব সভয়ে প্রশ্ন করিতেছে, ইহার পরিণাম কি? মানুষের অন্তর হইতে যদি হিংসা, দ্বেষ, লোভ, অহঙ্কার দূরীভূত না হয় তাহা হইলে বিজ্ঞানের এই অপপ্রয়োগে গোটা পৃথিবীটাই একদিন নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইয়া এই আণবিক শক্তি কিভাবে বিশ্বকল্যাণে নিয়োজিত হইতে পারে বিজ্ঞানীদের এবং রাষ্ট্রনেতাদের সেইদিকে

রাজপরিবারের সংবাদ

শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপবাহাদুর সমরকার্য্যে ভারতের বাহিরেই অবস্থান করিতেছেন। রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে, সিঙ্গাপুরে জাপানীদের আত্মসমর্পণের দলিল সম্পাদনের সময়ে তিনি লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনের সহিত তথায় উপস্থিত ছিলেন। বর্ত্তমান যুদ্ধে শত্রুপক্ষের আত্মসমর্পণের সময় আর কোথাও কোন ভারতীয় নৃপতি উপস্থিত ছিলেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

মাতৃশ্রী শ্রীশ্রীমহারাণী সাহেবা বর্ত্তমানে দার্জ্জিলিংএ আছেন।

স্থানীয় সংবাদ

প্রধান মন্ত্রীর পীড়া—

কুচবিহার রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় সর্দ্দার ডি, কে, সেন এম-এ, বি-সি-এল, এল্-এল্-বি, ব্যার-এট্-ল মহোদয় কিছুদিন যাবত অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ রোগে ভুগিতেছিলেন। গত জুন মাসে তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পায় এবং তখনই অস্ত্রোপচারের কথা হয়। কিন্তু ডাক্তারগণের পরামর্শে তখন অস্ত্রোপচার স্থগিত রাখা হয়। সম্প্রতি গত ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতার এক নার্সিং হোমে তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে তিনি ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন। কুচবিহার হইতে তাঁহার সাময়িক অনুপস্থিতি কালে রাজ্যের রাজস্বমন্ত্রী রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত করালীচরণ গাঙ্গুলী মহোদয় নিজ কার্য্য ছাড়াও প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করিতেছেন।

স্থানীয় কলেজের নূতন অর্থনীতির অধ্যাপক—

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গুহ এম্-এ স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। অধ্যাপক গুহ ইতিপূর্ব্বে বগুড়া কলেজে কাজ করিতেন।

সদর হাসপাতালের বেসরকারী পরিদর্শক

কুচবিহার দরবার নিম্নলিখিত মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণকে এক বৎসরের জন্য স্থানীয় সদর হাসপাতালের বেসরকারী পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়াছেন—(১) রায় সাহেব সুরেন্দ্রকান্ত বসু মজুমদার; (২) খাঁ চৌধুরী আমানতউল্যা আহমদ; (৩) শ্রীযুক্ত চুনীলাল মুখোপাধ্যায়; এবং (৪) শ্রীযুক্তা ইন্দিরা রায়।

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের মৃত্যুবার্ষিকী—

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর স্বর্গগত মহারাজা স্যার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের বার্ষিকী শ্রাদ্ধদিবস গিয়াছে। ঐ দিবস সকাল সাড়ে নয় ঘটিকার সময় কেশব আশ্রমে মৃত মহারাজার সমাধিমন্দিরের সন্নিকটে এক বিশেষ উপাসনা হয়। কলিকাতা হইতে আগত ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার লোধ মহাশয় উপাসনা পরিচালনা করেন। রাজ্যের রাজস্বসচিব এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ কেশব আশ্রমে উপস্থিত হইয়া মৃত মহারাজার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

বৈকালে সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় মহারাজার মর্ম্মর-মূর্ত্তির সন্নিকটে হাইকোর্টগৃহের বারান্দায় এক স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। মাননীয় রাজস্বসচিব মহোদয়ের প্রস্তাবে আচার্য্য লোধ মহাশয় এই স্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় সঙ্গীত, প্রার্থনা ও বক্তৃতাদি হয়। মাননীয় শিক্ষাসচিব শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় সিংহ সরকার, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবাপ্রসাদ সেন এবং শ্রীযুক্ত জানকী বল্লভ বিশ্বাস মহাশয় সভায় বক্তৃতা করেন।

স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে উভয় অনুষ্ঠানই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল।

দেশবিদেশের কথা

আন্দামানে নির্ব্বাসন ব্যবস্থা রহিত—

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ বহুদিন যাবত ভারত সরকার কর্ত্তৃক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদিগের কারাবাসস্থল রূপে ব্যবহৃত হইতেছিল। জাপানের হস্ত হইতে এই দ্বীপপুঞ্জ পুনরুদ্ধারের পর ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে তাঁহারা আর ভারতীয় বন্দীগণকে আন্দামানে পাঠাইবেন না। আন্দামানে বন্দী প্রেরণের জন্য ভারতে যে রাজনৈতিক অসন্তোষের সৃষ্টি হইত ভারত সরকারের বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের ফলে তাহা দূরীভূত হইবে।

বৃদ্ধা মহিলার জ্ঞানস্পৃহা—

এই বৎসর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এক বৃদ্ধা বাঙ্গালী মহিলা বাংলায় এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া জ্ঞানস্পৃহার এক নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন। মহিলার নাম শ্রীযুক্তা মৃণালিনী ঘোষ; তাঁহার এগারোটি নাতিনাতনী বর্ত্তমান। তাঁহার স্বামী পরলোকগত মিষ্টার এল্, কে, ঘোষ বিহার ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে ১৯৪১ সালে শ্রীযুক্তা ঘোষ আই-এ পরীক্ষা দেন। ১৯৪৩ সালে তিনি বি-এ পরীক্ষা দেন, এবং সেই বৎসরই তাঁহার বড় নাতনী ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়।

কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের নূতন অধ্যক্ষ—

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে শ্রীযুক্ত মুকুল দে অবসর গ্রহণ করায় প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অতুল বসু মহাশয় কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের নূতন অধ্যক্ষ

নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসু কৃতী শিল্পী, প্রথম জীবনে বাংলার বাঘ (Bengal Tiger) নামে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একখানি ছবি আঁকিয়া তিনি প্রভূত যশোলাভ করিয়াছিলেন। পরে তিনি লণ্ডনের Royal Academy of Artsএ শিক্ষালাভ করেন এবং ইউরোপের বিভিন্ন শিল্পাগার পরিদর্শন করেন। নয়া দিল্লীতে রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদে তাঁহার অঙ্কিত কয়েকখানি ছবি আছে।

অধ্যাপক জ্ঞান মুখার্জ্জির নূতন পদ—

ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদিগের অন্যতম। ভারত সরকার ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যে বিজ্ঞান মিশন প্রেরণ করিয়াছিলেন ডক্টর মুখোপাধ্যায় তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়াছে যে ভারত সরকার তাঁহাকে Imperial Agricultural Research Council এর ডিরেক্টর নিযুক্ত করিয়াছেন। ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের এই নূতন পদলাভে আমরা আনন্দিত এবং তাঁহাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইতেছি।

আমেরিকার ভারতস্থিত অতিরিক্ত যুদ্ধ সম্ভার বিক্রয়—

আমেরিকার যে সকল অতিরিক্ত যুদ্ধসম্ভার ভারতে পড়িয়া আছে সেইগুলি শীঘ্র ভারতবর্ষেই বিক্রয় করিয়া ফেলা হইবে। এই সকল যুদ্ধসম্ভারের মধ্যে এরোপ্লেন, মোটরগাড়ী প্রভৃতি ব্যতীত গৃহনির্ম্মাণের সাজসরঞ্জাম, খাদ্যদ্রব্য এবং বস্ত্রাদিও আছে। শেষোক্ত দ্রব্যগুলির বিক্রয়ে ভারতবাসীর অনেক সুবিধা হইবে।

আসন্ন নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

সম্প্রতি পুণা সহরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা হইয়া গেল। এই সভায় স্থির হইয়াছে যে ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের নির্ব্বাচনে কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। এই জন্য সর্দ্দার প্যাটেল, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতিকে লইয়া একটি পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠিত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিতকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বান—

ডক্টর জোয়াড ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত দর্শনের অধ্যাপক; তাঁহার খ্যাতি পৃথিবীর নানা দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ১৯৪৬ সালে "ষ্টিফানোস্ নির্ম্মলেন্দু" বক্তৃতামালা দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। ডক্টর জোয়াড এই আহ্বান গ্রহণ করিলে বিশ্ববিদ্যালয় উপকৃত হইবেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা—

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হইয়াছে। বিভিন্ন রণাঙ্গনে জাপান মিত্রপক্ষের নিকট চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ করিয়াছে। এখন মিত্রপক্ষের সম্মুখে জগতে শান্তিপ্রতিষ্ঠার সমস্যা মুখ্য হইয়া দেখা দিবে। পৃথিবীতে যাহাতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় জগৎবাসী তাহাই কামনা করে। শক্তিশালী সম্মিলিত জাতিসমূহকে এই জন্য সাহসের সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। সঙ্কীর্ণ স্বার্থ ও ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র জগতের কল্যাণচিন্তায় তাহাদিগকে অবহিত হইতে হইবে। সবল যাহাতে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতে না পারে, বৃহৎ যাহাতে ক্ষুদ্রকে গ্রাস করিবার লোভে মত্ত হইয়া না উঠে সেই দিকে সকলের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রপ্রতিষ্ঠার আদর্শ লইয়া এই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, সেই আদর্শ যাহাতে কার্য্যকরী হয় সম্মিলিত জাতিসমূহকে তদ্বিষয়ে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। ইতিমধ্যেই বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ঈর্ষা ও অবিশ্বাসের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। রুশিয়া বল্কান রাষ্ট্রসমূহের সহিত একক চুক্তি সম্পাদন করিতেছে বলিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকা অভিযোগ করিতেছে; পক্ষান্তরে রুশিয়ার অভিযোগ এই যে ইংলণ্ড ও আমেরিকা পশ্চিম ইউরোপে রুশিয়ার বিরুদ্ধে দল পাকাইবার চেষ্টা করিতেছে। সম্মিলিত জাতি-সমূহের মধ্যে পরস্পরের প্রতি এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব জগতে স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠার অনুকূল নহে। জগতের রাষ্ট্রনায়কগণের অন্তরে শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইয়া পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক, আমরা ইহাই কামনা করি। অন্যথায় এত রক্তপাত, মৃত্যুবরণ, ধ্বংসলীলা সকলই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

আণবিক বোমা—

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নানাবিধ নূতন আবিষ্কার হইয়াছে, ছয় বৎসরে বিজ্ঞানের অগ্রগতি শত বৎসর আগাইয়া গিয়াছে—কোন কোন বিজ্ঞানীর ইহাই অভিমত। বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার নবতম অবদান আণবিক বোমা; ইহার ধ্বংসকারী শক্তি জাপানের হিরোসিমো ও নাগাসাকি বন্দরে অনুভূত হইয়া গিয়াছে। এতদিন মানুষ তড়িৎ, তাপ, এবং রাসায়নিক শক্তির সহিতই পরিচিত ছিল; এই সকল শক্তির সাহায্যে সে অসাধ্য সাধন করিয়াছে। পরমাণুর মধ্যে এক মহাশক্তি লুক্কায়িত আছে, মানুষ তাহাও জানিত; কিন্তু এই শক্তি নিষ্কাশন করিয়া কিভাবে কাজে লাগান যাইতে পারে তাহার সন্ধান এতদিন মানুষ পায় নাই। আজ সেই সন্ধান পাইয়া মানুষ শক্তিমদে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমেরিকা কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত দুইটি আণবিক শক্তিসম্পন্ন বোমার আঘাতে জাপানের দুইটি প্রকাণ্ড বন্দর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রাণ হারাইয়াছে। বিজ্ঞানসাধনার এই ভয়াল মূর্ত্তি দেখিয়া বিশ্বমানব সভয়ে প্রশ্ন করিতেছে, ইহার পরিণাম কি? মানুষের অন্তর হইতে যদি হিংসা, দ্বেষ, লোভ, অহঙ্কার দূরীভূত না হয় তাহা হইলে বিজ্ঞানের এই অপপ্রয়োগে গোটা পৃথিবীটাই একদিন নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইয়া এই আণবিক শক্তি কিভাবে বিশ্বকল্যাণে নিয়োজিত হইতে পারে, বিজ্ঞানীদের এবং রাষ্ট্রনেতাদের সেইদিকে

দৃষ্টি দিতে হইবে। "Peace hath her victories no less renowned than war. যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, নবলব্ধ বিজ্ঞান শক্তির প্রয়োগ দ্বারা শান্তির কল্যাণক্ষেত্রে মানব নব নব জয়লাভ করুক ইহাই কামনা করি।

গত দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলার শিক্ষার ক্ষতি

ভারতীয় সংখ্যাতত্ত্ব পরিষদ (Indian Statistical Institute) কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত একটি সাম্প্রতিক জরিপের ফলে গত দুর্ভিক্ষে বাংলা দেশে শিক্ষার কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে তাহার একটা আভাস পাওয়া যায়। গত ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ এবং ১৯৪৪ সালের মহামারী দ্বারা বিধ্বস্ত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ৩১০টি গ্রামে শিক্ষার অবস্থা জরিপ করা হয়। ইহাতে দেখা যায় যে ঐ সকল গ্রামের বিদ্যালয়সমূহে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ২৮০০৩ জন ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করিত; ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ইহাদের সংখ্যা কমিয়া ১৮৫২৬ হয়; ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে এই সংখ্যা আরও কমিয়া ১৭৮৪৯এ দাঁড়ায়। এই জরিপলব্ধ সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া সংখ্যাতত্ত্ব পরিষদ সারা বাংলার গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার কি ক্ষতি হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বাংলার গ্রাম্যবিদ্যালয়সমূহে ২১ লক্ষ ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করিত; ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে এই সংখ্যা বাড়িয়া প্রায় ৩২ লক্ষ হয়; কিন্তু ১৯৪৪ সালে এই সংখ্যা কমিয়া ২৬৷৹ লক্ষের একটু উপরে দাঁড়ায়। এই সংখ্যা অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে ১৯৩০ হইতে ১৯৪০ পর্য্যন্ত যে হারে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়িতেছিল সেই হারে বাড়িতে থাকিলে ১৯৪৪ সালে বাংলার গ্রাম্য বিদ্যালয়সমূহে (জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধরিয়া) ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় চল্লিশ লক্ষ হইত। অর্থাৎ, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর ফলে ১৯৪৩ এবং ১৯৪৪ এই দুই বৎসরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১৪ লক্ষ কমিয়া গিয়াছে। জরিপের ফলে আরও দেখা গিয়াছে যে গ্রাম্যবিদ্যালয় সমূহে শুধু ছাত্রসংখ্যাই কমে নাই; শিক্ষার মানদণ্ডেরও যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে।

দুর্ভিক্ষ ও মহামারী যে আমাদিগকে কত রকমে মারিয়া রাখিয়া গিয়াছে তাহার শেষ নাই। শিক্ষার যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়; বাংলার ভবিষ্যদ্বংশীয়গণকে ইহার ফলভোগ করিতে হইবে।

ভারতীয় শিল্পপতি মিশনের ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন—

ভারতের দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে এদেশে নানাবিধ শিল্পের প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক। যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতে শিল্পপ্রতিষ্ঠায় বিদেশ হইতে কিরূপ সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত কয়েকজন ভারতীয় শিল্পপতি কিছুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ড ও আমেরিকা ভ্রমণে গিয়াছিলেন। এই দলে জে, আর টাটা; জি, ডি বিরলা; এন্, আর সরকার প্রভৃতি ছিলেন। ইহারা সম্প্রতি দেশে ফিরিয়া একটি রিপোর্ট প্রচার করিয়াছেন। এই রিপোর্টে তাঁহারা বলিয়াছেন যে নিকট ভবিষ্যতে ইংলণ্ড বা আমেরিকা হইতে কারখানা স্থাপনোপযোগী কলকব্জা বা যন্ত্রপাতি পাইবার সম্ভাবনা নাই। আমেরিকা হইতে এইরূপ যন্ত্রপাতি পাইতে বহুদিন লাগিবে; ইংলণ্ড হইতেও দুই বৎসরের পূর্ব্বে কোন সরবরাহ পাইবার ভরসা নাই। সুতরাং শিল্পপতিগণের মতে বর্ত্তমান অবস্থায় তাড়াহুড়া করিয়া যন্ত্রপাতি কিনিবার চেষ্টা করা সঙ্গত হইবে না। তাহা করিতে গেলে একদিকে পুরাতন যন্ত্রপাতি কিনিতে হইবে এবং অন্যদিকে তজ্জন্য অত্যধিক চড়া মূল্য দিতে

হইবে। বছর দুই গেলে ঐ সকল দেশে উন্নততর যন্ত্রপাতি নির্ম্মিত হইবে এবং তাহাদের মূল্যও কমিবে। পুরাতন যন্ত্রপাতি কিনিয়া উৎপাদনে নামিলে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় শিল্পের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং শিল্পপতিগণের উপদেশমত বর্ত্তমানে বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠার দিকে জোর না দিয়া আপাততঃ ভারতে ছোটখাট শিল্প প্রসারের জন্য চেষ্টা করাই সঙ্গত হইবে। তবে ইতিমধ্যে, বিদেশী মালে বাজার ছাইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে; কিন্তু সরকারী সাহায্য পাইলে ইহাতে পরিণামে শিল্প-প্রতিষ্ঠার ব্যাঘাত হইবে না।

খেলাধুলা

কুচবিহার কাপ ফাইন্যাল—

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার কলিকাতায় কুচবিহার কাপের ফাইন্যাল খেলা হইয়া গিয়াছে। ইষ্টবেঙ্গল দল মহমেডান স্পোর্টিং দলকে ৩—০ গোলে পরাজিত করিয়া কাপ বিজয়ী হইয়াছে। ইষ্টবেঙ্গল দলের পক্ষে মহাবীর একাই তিনটি গোল করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমাদের মনে হয় কুচবিহার হইতে একটি দল এই খেলায় প্রতিযোগিতা করিলে ভাল হয়। আমরা এ বিষয়ে মহারাজার ক্রীড়া-সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ইলিয়ট শীল্ড ফাইন্যাল—

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর এই শীল্ডের ফাইন্যাল খেলা হইয়া গিয়াছে। সিটি কলেজ দল কার্মাইকেল মেডিকেল কলেজ দলকে এই দিন ২—১ গোলে পরাজিত করিয়া এই বৎসর শীল্ডবিজয়ীর সম্মান অর্জ্জন করে। পূর্ব্বে উভয় দল ১—১ গোল করায় খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

এই খেলাটি কেবল ছাত্রদলের ভিতরই সীমাবদ্ধ। কুচবিহার ছাত্রদলও একবার এই শীল্ডবিজয়ীর সম্মানঅর্জ্জন করিয়াছিল। কিন্তু আজকাল আর কুচবিহার হইতে ছাত্রদল এই শীল্ডে প্রতিযোগিতা করিতে যায় না। আবার এই শীল্ড খেলায় যোগদান করা যায় কিনা ছাত্রগণ ও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

স্থানীয় খেলাধুলা—

মণীন্দ্রমেমোরিয়াল শীল্ড খেলার উদ্যোগ আয়োজনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে কিন্তু এবার বোধ হইতেছে খেলাটি আর হইবে না। ফুটবল মরশুমও প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

পূজাবকাশের পর বিদ্যায়তন ও অফিসাদি খুলিলেই ক্রীকেট খেলার ধুম পড়িয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে কুচবিহার ক্রীকেট ক্রীড়ামোদী ও খেলোয়াড়গণকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে গতবার কুচবিহারদলের ক্রীকেট খেলা দলের পূর্ব্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ হয় নাই। এবারের খেলায় যাহাতে সেই সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকে প্রথম হইতেই খেলোয়াড়গণ যেন সে বিষয়ে অবহিত হন।

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে ক্যাপ্টেন এস, রায়, এ-ডি-সি মহাশয় রাজবাড়ীর খেলাধূলার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা আশা করি তাঁহার ও মহারাজার ক্রীড়া-সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজেশ গুহের যোগ্য নেতৃত্বাধীনে কুচবিহার দল খেলাধুলা বিষয়ে ক্রমেই অধিকতর গৌরব অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব।

পরগণা মাথাভাঙ্গার অধীন বড় শিমুলগুড়ী, ভেলাকোবা, নবীনের দোলা, পুঁঠিমারী ও খোপাডুবী গ্রামের হিন্দুগণ একতাবদ্ধ হইয়া গত ১৩৫১ সালের মাঘী পূর্ণিমায় ভেলাকোবা নিউ প্রাইমারী স্কুল প্রাঙ্গণে 'পঞ্চগ্রামীর হরিবাসর' এই আখ্যা দিয়া একটী হরিমন্দির স্থাপিত করেন। মন্দিরে প্রতি সোমবার হরিরলুট ও সংকীর্ত্তন হয়। গত ১৩ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার তথায় সকলে সমবেত হইয়া রাত্রে জন্মাষ্টমী ব্রত করতঃ পরদিন মহোৎসব অর্থাৎ দধিকাদো বা নারিকেল খেলা করেন। অন্যূন ৫০০ জন লোক প্রসাদ গ্রহণ ও আনন্দ কোলাকুলী করিয়াছিলেন।

এসেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ,
ইলা
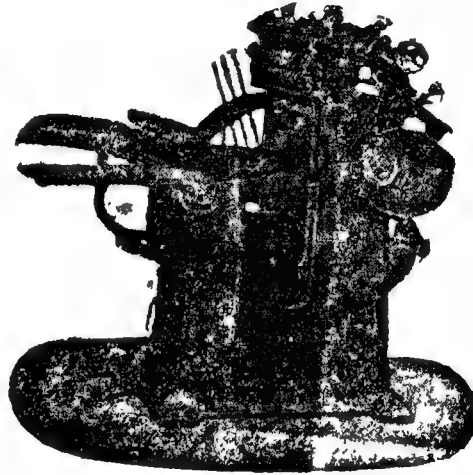
প্রেস

সূচীপত্র

সূচীপত্র

কোচবিহার দর্পণের নিয়মাবলী।

১। কোচবিহার দর্পণের প্রতি সংখ্যার মূল্য চারি আনা ও বার্ষিক সডাক তিন টাকা; মূল্য অগ্রিম দেয়।

২। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লেখা কাগজের একপৃষ্ঠায় স্পষ্টরূপে লিখিয়া সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে। উৎকৃষ্ট লেখার জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

৩। অমনোনীত লেখা ফেরৎ লইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকেট সহ ঠিকানা লেখা খাম পাঠাইতে হয়; অমনোনীত কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না। অমনোনয়নের কারণ দর্শাইতে সম্পাদক অক্ষম।

৪। মনোনীত লেখা কখন প্রকাশিত হইবে সে সম্বন্ধে সম্পাদক কোনরূপ নিশ্চয়তা দিতে পারেন না।

৫। কোচবিহার দর্পণে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা ১০৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৬৲ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা। কভারে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার দ্বিগুণ।

৬। টাকাকড়ি সম্পর্কিত চিঠিপত্র ম্যানেজারের নিকট লিখিতে হইবে।

ম্যানেজার কোচবিহার দর্পণ
ষ্টেট্‌প্রেস, কোচবিহার।

Photo & Block by
Universal Art Gallery

VICTORIA COLLEGE
Cooch Benar

কোচবিহার দর্পণ

অষ্টম বর্ষ { কার্ত্তিক ১৩৫২ সন, রাজশক ৪৩৬ } ৭ম সংখ্যা

নাথগীতিকা

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এম্-এ, ডি-লিট্

বাংলাদেশ তিনযুগে তিনটী ধর্ম্মমত সমস্ত ভারতকে দিয়েছে। প্রাচীন যুগে মীননাথের নাথধর্ম্ম, মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং বর্ত্তমান যুগে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সেবা ধর্ম্ম। নাথধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ দক্ষিণবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। বাংলা দেশের যোগী বা নাথ সম্প্রদায় আদিতে এই নাথপন্থাবলম্বী ছিল। এই নাথপন্থা বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান শাখার শূন্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই নাথপন্থাকে বৌদ্ধধর্ম্মের একটি উপশাখা বলা যেতে পারে। সে যা হোক বাংলার পালরাজাদের সময় থেকে নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি অর্দ্ধঐতিহাসিক কাহিনী প্রচলিত আছে। নাথগুরুদের অবদান এই কাহিনীগুলির বিষয়বস্তু। এইগুলিকে নাথগীতিকা বলা হয়। অবশ্য আমরা যে নাথগীতিকাগুলি পেয়েছি সেগুলির উৎপত্তি প্রাচীন হলেও ভাষা তত প্রাচীন নয়। বাংলাদেশের নাথগীতিকাগুলি নিম্নলিখিত কয়েকটি পুস্তকে পাওয়া যায়।

১। গ্রিয়ার্সন সংগৃহীত— মাণিকচন্দ্রের গান।
২। গোবিন্দচন্দ্র গীত— দুর্ল্লভ মল্লিক কৃত।
৩। গোরক্ষবিজয়— ফয়জুল্লা কৃত।
৪। মীনচেতন— শ্যামদাস সেন বিরচিত।
৫। ময়নামতীর গান— ভবানীদাস কৃত।
৬। গোপীচন্দ্রের গান—বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত।
৭। গোপীচন্দ্রের গীত— শুকুর মামুদ প্রণীত।

এই সকল ছাপান বই ছাড়া আরও অনেক হাতের লেখা পুঁথির পরিচয় পাওয়া গেছে (দ্রষ্টব্য, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা)।

এই সকল বাংলা পুঁথি ছাড়া হিন্দী, মারাঠি, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় নাথগীতিকা পাওয়া যায়। এমন

কি তিব্বতী ভাষাতেও নাথগীতিকা পাওয়া গেছে। নাথগীতিকার বিষয়বস্তুগুলি এই :—

(ক) মীননাথ ও গোরক্ষনাথের জীবনকথা।
(খ) জালন্ধরী পা ও কানুপার বৃত্তান্ত।
(গ) মাণিকচাঁদ ও ময়নামতীর কথা।
(ঘ) গোপীচাঁদের সন্ন্যাস।
(ঙ) চৌরঙ্গীনাথের কথা।

(ক) মীননাথ ও গোরক্ষনাথের জীবন কথা।

প্রথমে কেবল শূন্য ছিল। বিশ্বচরাচর কিছুই ছিল না। এক প্রভু করতার নিরঞ্জন বিরাজ করতেন। নিরঞ্জনের হাই থেকে জন্ম নিল উল্লুক পাখী। সেই পাখী হ'ল নিরঞ্জনের বাহন। তারপর ক্রমে ক্রমে চাঁদ সূর্য্য পৃথিবী গ্রহতারা সব সৃষ্টি হল। নিরঞ্জনের গায়ের ঘাম থেকে জন্মিলেন আদ্যাশক্তি। এই আদ্যার শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ থেকে জন্মেন শিব, মীননাথ, জালন্ধরীপা, কানুপা, চৌরঙ্গীনাথ, গোরক্ষনাথ আর গৌরী। জালন্ধরী পার নামান্তর হাড়িপা, চৌরঙ্গীনাথের অন্য নাম গাভুর সিদ্ধা। নিরঞ্জনের আজ্ঞায় শিব গৌরীকে স্ত্রীরূপে লাভ করলেন। প্রথমে হরগৌরী এবং মীননাথ গোরক্ষনাথ প্রভৃতি সিদ্ধগণ একত্র ছিলেন। একদিন হরগৌরী একত্র ব'সে লোকসৃষ্টির কথা আলাপ করছিলেন। গৌরী বললেন, সিদ্ধগণ গৃহবাস করুন। মহাদেব বললেন, তাঁদের কামক্রোধলোভমোহ নেই, কিরূপে তাঁদের দ্বারা গৃহবাস হবে? তখন ভবানী তাঁদের পরীক্ষা করবার জন্য শিবকে বললেন। শিব সকল সিদ্ধকে নিমন্ত্রণ করলেন। সিদ্ধগণ এসে খেতে বসলেন। পার্ব্বতী ভুবনমোহিনীরূপ ধ'রে পরিবেশন করতে লাগলেন। তখন এক গোরক্ষনাথ ছাড়া—

"দেবীর সে রূপ দেখি যত সিদ্ধগণ।
কামবাণে ভেদিলেক স্থির নহে মন॥"

দুর্গা তাঁদের সকলকে শাপ দিলেন। মীননাথের সম্বন্ধে—

"এবমস্তু বলে দেবী পাইলা এহি বর।
কদলীর দেশে তুমি চলহ সত্বর॥
ষোলশয় নারী লয়ে তুমি কর কেলি।
কদলীর রাজা হইয়া ঝাটে যাও চলি॥"

আমরা পরে দেখিব কদলীর দেশ বা কাছাড় প্রদেশে গিয়ে মীননাথের কি অবস্থা ঘটেছিল। কানুপাকে শাপ দিলেন, ডাহুকার গড়ে কোন নারীর ঘরে তাঁর ঘাড় কাটা যাবে। হাড়ীপাকে শাপ দিলেন, মেহেরকুলে ময়নামতীর ঘরে তিনি হাড়ির কাজ করবেন। আর রাজা গোপীচাঁদ তাকে ঘোড়ার আস্তাবলে মাটীর নীচে পুঁতে রাখবেন। চৌরঙ্গীনাথ সম্বন্ধে—

"আজ্ঞা দিলা ভবানী পাইলা তুমি আশ।
বর পাইলা চল তুমি সৎমায়ের পাশ॥"

গোরক্ষ দেবীর রূপে ভুলেন নাই। তবুও গোরক্ষ নাথের শাপ হ'ল তাঁকে গরু চরাতে হবে। এই পরীক্ষাভোজের পর সিদ্ধগণ আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলে গেলেন।

মীননাথ এর আগেও শিবের শাপ পেয়েছিলেন যে তিনি তাঁর শোনা সব তত্ত্বজ্ঞান ভুলে যাবেন। এর কারণ হচ্ছে—এক সময় মহাদেব ক্ষীরোদ সাগরের এক টঙ্গীর মধ্যে পার্ব্বতীকে তত্ত্বজ্ঞান বলছিলেন। সেই সময় মীননাথ টঙ্গীর নীচে থেকে মাছের রূপ ধ'রে সব কথা শুনেছিলেন।

কদলীর দেশে গিয়ে মীননাথ সে দেশের রাজা হয়ে বসলেন। সেটা স্ত্রীরাজ্য। মঙ্গলা কমলা তাঁর রাণী হল। ষোলশ'নারী নিয়ে মীননাথ রঙ্গরসে দিন কাটাতে লাগলেন। মীননাথ গেলেন জপতপ সব ভুলে।

বহুদিন পরে গোরক্ষনাথ গুরুকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন; এমন সময় কানুপার সঙ্গে তার হঠাৎ সাক্ষাৎ। তাঁর মুখ থেকে তিনি শুনলেন তার গুরুর দুর্দ্দশার কথা। গোরক্ষনাথও কানুপাকে তাঁর গুরু জালন্ধরা হাড়িপার বন্দীদশার কথা শোনালেন।

নর্ত্তকী বেশে গোরক্ষনাথ কদলীতে গিয়ে একেবারে মীননাথের দরবারে হাজির হলেন। কোন পুরুষ লোকের প্রাণ নিয়ে সেখানে যাওয়ার যো ছিলনা। সেই রাজসভায় গিয়ে—

"নাচেন্ত গোর্খনাথ তালে বরি ভর।
মাটিতে না লাগে পদ আলগ উপর॥
নাচেন্ত সে গোর্খনাথ ঘাঘরীর রোলে।
কায়া সাধ কায়া সাধ মাদল হেন বোলে॥
হাতের ঠমকে নাচে পদ নাহি নড়ে।
গগনমণ্ডলে যেন বিজুলি সঞ্চরে॥"

তারপর গুরুশিষ্যে পরিচয় হ'ল। গোরক্ষনাথ গুরুকে নানা মতে বুঝিয়ে সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করলেন। সেখানে মীননাথের একটি ছেলে হয়েছিল, তার নাম বিন্দুনাথ। এর পরের বৃত্তান্ত নাথদের কোন পুঁথিতে পাওয়া যায়না। কিন্তু নেপালীদের মধ্যে প্রসিদ্ধি আছে যে মীননাথ কামরূপ হয়ে শেষবয়সে নেপালে এসেছিলেন। পরে তাঁর সন্ধানে গোরক্ষনাথও সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

মীননাথের সম্পর্ক ছাড়া গোরক্ষনাথের সম্বন্ধেও একটা কথা নাথ-গীতিকায় পাওয়া যায়। একবার পার্ব্বতী গোরক্ষনাথের মন ভুলাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁর মন টলাতে পারেননি। গোরক্ষনাথের ঠেলায় দেবী কোমরভাঙ্গা হ'য়ে রাঢ় দেশে মানুষ খেয়ে বেড়াতে লাগলেন। পরে গোরক্ষনাথ রাঢ়দেশে কালীমূর্ত্তি বেথে দুর্গাকে নিয়ে মহাদেবকে দেন। অন্য এক সময় গন্ধর্ব্ব-রাজকন্যা বিরহিণী শিবের বরে গোরক্ষনাথকে স্বামীরূপে পান, কিন্তু গোরক্ষনাথ শিশুরূপ ধরে তাঁকে 'মা' 'মা' ব'লে ডাকতে থাকেন। অবশেষে গোরক্ষের বরে বিরহিণী একটি সন্তান লাভ করেন; তার নাম হয় শ্রীকর্পটীনাথ।

(খ) জালন্ধরীপা ও কানুপার বৃত্তান্ত।

কানুপা গোরক্ষনাথের মুখে নিজের গুরু জালন্ধরী হাড়িপার খবর পেয়ে মেহেরকুলে এলেন। রাজা গোপীচাঁদ হাড়িপাকে ভণ্ড যোগী মনে করে ঘোড়ার আস্তাবলে পুঁতে রেখেছিলেন, কানুপা তাঁকে মাটি খুঁড়ে বের করলেন। তখন হাড়িপা যোগে ছিলেন। যোগভঙ্গ হ'লে গোপীচাঁদের আর রক্ষা থাকবেনা, তাই আগে থেকেই কানুপা গোপীচাঁদের সোনার মূর্ত্তি তৈরী ক'রে রেখেছিলেন। হাড়িপার সক্রোধ হুঙ্কারে গোপীচাঁদের সোনার মূর্ত্তি পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল। তারপর কানুপার অনেক সাধ্যসাধনায় হাড়ীপা গোপীচাঁদের উপর প্রসন্ন হ'লেন। কিছুদিন পরে গোপীচাঁদ হাড়িপার কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন। নাথগীতিকায় এর পর হাড়িপার কার্য্যকলাপ গোপীচাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। আমরা পরে গোপীচাঁদের সন্ন্যাস বৃত্তান্তে তা বলছি।

পার্ব্বতীর শাপ থেকে বুঝতে পারি কানুপা ডাহুকার গড়ে গিয়েছিলেন। হাড়িপাও কানুপাকে এইরূপ শাপ দিয়েছিলেন। কারণ গোপীচাঁদের সোনার মূর্ত্তি দিয়ে তিনি হাড়িপাকে ঠকিয়েছিলেন

"সেবক হইয়া বেটা ভাণ্ডিলা আমারে।
তোমার কন্দ কাটা পড়িবে ডাহুকার গড়ে॥"

ময়নামতীর অনেক অনুনয় বিনয়ে হাড়িপা তার উপরে প্রসন্ন হয়ে তাঁর শাপমোচন ব'লে দিয়েছিলেন।

"হাড়িপা বলেন শুন ময়নামতী রাই।
উদ্ধার করিবে পুত্রক বাইল ভাদাই ॥"

এতে করে আমরা বুঝতে পারি ডাহুকার গড়ে কানুপার স্কন্ধ কাটা পড়ার যোগাড় হয়েছিল। পরে তাঁর শিষ্য বাইল ভাদাই বা ভাদ্রপাদ তাঁকে রক্ষা করেন। আমরা কানুপার বারটী প্রাচীন বাংলার চর্য্যাপদ পেয়েছি। তাঁর লেখা অপভ্রংশ দোহাকোষও পাওয়া গিয়েছে। এগুলি ছাড়া তিনি অনেক সংস্কৃত বই লিখেছিলেন। ভাদ্রপাদের বা ভাদেপার একটি প্রাচীন বাংলার চর্য্যাপদ পাওয়া গিয়েছে। এসকল সংবাদ অবশ্য নাথগীতিকায় কিছুই নেই।

(গ) মাণিকচাঁদ ও ময়নামতীর বৃত্তান্ত।

মাণিকচাঁদ ছিলেন যোলবঙ্গের রাজা। ত্রিপুরার মেহেরকুল ছিল তাঁর রাজধানী। তিনি বুড়া বয়সে তিলকচাঁদ রাজার কন্যা ময়নামতীকে বিবাহ করেন। ময়নামতী শিশুকালেই গোরক্ষনাথের কৃপায় মহাজ্ঞান লাভ করেছিলেন। মাণিকচাঁদের রাজ্যে প্রজাদের সুখের অবধি ছিলনা। কিন্তু এক দক্ষিণদেশী লোক রাজার নূতন দেওয়ান হলেন। তাঁর অত্যাচারে প্রজাদের দুর্দ্দশার একশেষ হল। প্রজারা সকলে মিলে ধর্ম্মপূজা ক'রে রাজাকে অভিশাপ দিলে। রাজার আঠার বছরের পরমায়ু ছ মাসের হয়ে গেল। চিত্রগুপ্ত তাঁর দপ্তর খুললেন। গোদা যম রাজার প্রাণ নিয়ে আসতে আজ্ঞা পেলে। ময়নামতী রাজার কাছ থেকে দূরে থাকতেন। তিনি এই বিপদের সময় স্বামীকে রক্ষা করতে এলেন। তিনি রাজাকে মহাজ্ঞান দিয়ে অমর করতে চাইলেন। কিন্তু স্ত্রীর নিকট জ্ঞান গ্রহণ! মাণিকচাঁদ কিছুতেই তাতে রাজি হতে পারলেন না।

অগত্যা ময়নামতী নানা প্রকারে কখন লোভ দেখিয়ে, কখন ভয় দেখিয়ে, যমদূতকে বিদায় করতে চাইলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। যমদূত কৌশলে ময়নামতীকে স্থানান্তরে পাঠিয়ে দিয়ে রাজার প্রাণ নিয়ে চলল।

ময়নামতী সকল বৃত্তান্ত গঙ্গার কাছে জানতে পেরে একবারে যমালয়ে উপস্থিত। যমদূতেরা তাঁর হাতে খুব নাকাল হ'ল। গোরক্ষনাথ মধ্যস্থ হ'য়ে ময়নামতীকে পুত্রবর দিয়ে তবে নিবৃত্ত করলেন।

ময়নামতীর পুত্র গোপীচাঁদ। বিধাতা তাঁর আয়ু লিখলেন আঠার বছর। তবে হাড়িপার কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হ'লে সে হবে অমর।

অল্প বয়সেই গোপীচাঁদের বিয়ে হল। হরিচন্দ্র রাজার দুই কন্যা অদুনা পদুনা। তাঁরা হলেন দুই প্রধান রাণী। ক্রমে গোপীচাঁদ যোলবঙ্গের রাজা হলেন। ময়নামতী গোপীচাঁদকে হাড়িপার কাছে সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষা নিতে বললেন। গোপীচাঁদ মায়ের মহাজ্ঞানের পরীক্ষা করতে চাইলেন; তাঁকে ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে ফেলা হল। ছয় দিন ছয় রাত কড়াই জলন্ত চুলার উপর রইল। তাতেও ময়নামতী মরলেন না। আরও কয়েকটী পরীক্ষা নেওয়া হল। সবটাতেই ময়নামতী অক্ষতভাবে উত্তীর্ণ হলেন। অবশেষে গোপীচাঁদ সন্ন্যাস নিতে স্বীকার করলেন। হাড়িপা তাঁকে মন্ত্র দিলেন। কিন্তু রাজার মনে মন্ত্র ভুল হয়ে গেল। মন্ত্রগুণে শুকনো পুকুরে জল পূরল না। গোপীচাঁদ হাড়িপাকে ভণ্ডযোগী স্থির ক'রে ঘোড়ার আস্তাবলে পুঁতে রাখলেন। বার বছর পরে কানুপা এসে হাড়িপাকে উদ্ধার করেন। গোপীচাঁদের

আয়ু মাত্র এক বছর বাকী আছে। ময়নামতী গোপীচাঁদকে নানা উপদেশ বললেন—

'রাজ্যপাট ছাড় রাজা মুখে মাখ ছাই।
মায়ে পুত্রে যোগী হইয়া চারি যুগ বেড়াই ॥'

অবশেষে গোপীচাঁদ হাড়িপাকে গুরু বরণ করলেন। রাণীদের কাঁদিয়ে প্রজাদের কাঁদিয়ে গোপীচাঁদ সন্ন্যাসী হয়ে রাজ্যপাট ছেড়ে চললেন।

(ঘ) গোপীচাঁদের সন্ন্যাস।

গোপীচাঁদ গুরু হাড়িপার সঙ্গে সন্ন্যাসী হয়ে বেরুলেন। হাড়িপা গোপীচাঁদকে নানা প্রকারে কষ্ট দিয়ে, বিপদে ফেলে পরীক্ষা করতে লাগলেন। হাড়িপা পথে এক গহন বন সৃষ্টি করলেন। কাঁটায় রাজার সর্ব্বশরীর রক্তাক্ত হতে লাগল। অন্ধকার বনের মধ্যে গোপীচাঁদ কাতর হয়ে সূর্য্যের মুখ দেখতে চাইলেন। হাড়িপা জঙ্গল উড়িয়ে দিয়ে মরুভূমির সৃষ্টি করলেন। ভীষণ গরম বালিতে গোপীচাঁদ ছটফট্ করতে লাগলেন। এইরূপে অবশেষে গুরুশিষ্য কলিঙ্গ নগরে উপস্থিত হলেন। সেখানে হাড়িপা গোপীচাঁদকে এক গণিকার বাড়ীতে বাঁধা রাখলেন। সেখানে প্রথমে নানা প্রলোভন, তারপর নানা লাঞ্ছনা গঞ্জনার মধ্যেও গোপীচাঁদ নিজের চরিত্র রক্ষা করেন। গোপীচাঁদের যোগের পরীক্ষা শেষ হল। তারপর হাড়িপা তাকে উদ্ধার করে বার বছর পরে আবার রাজধানীতে ফিরিয়ে আনলেন। ক্রমে যোগীবেশী রাজাকে রাণীরা চিনে ফেললেন। ময়নামতী পুত্রের যোগসিদ্ধি দেখে আহ্লাদিত হলেন। মায়ে ছেলে মিলন হল। রাজধানীতে আনন্দের স্রোত বইতে লাগল। রাজার হাতী রাজাকে সিংহাসনে নিয়ে বসালে। আনন্দ উৎসবে দেবতারা এসে যোগ দিলেন। প্রজাদের সুখের দিন আবার ফিরে এল।

(ঙ) চৌরঙ্গীনাথের কথা।

এই বৃত্তান্ত আমরা এ পর্য্যন্ত বাংলা দেশে কোন নাথগীতিকায় পাইনি। তবে দুর্গাদেবীর শাপবৃত্তান্ত থেকে তাঁর জীবনের কিছু আভাস পাওয়া যায়। এখানে একখানি তিব্বতী বই থেকে তার বৃত্তান্ত দিচ্ছি। এই বইখানা জার্ম্মাণ পণ্ডিত আলবার্ট গ্র্যুন্‌ভেডেল (Gruenwedel) জার্ম্মাণ ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

ভারতের পূর্ব্ব দেশে দেবপাল নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল এক ছেলে। ছেলেটীর বয়স যখন বার বছর, তখন তার মা রাণী মারা গেলেন। রাজা আবার নূতন সংসার করলেন। রাজা শিকারে গেছেন, এই সুযোগে নূতন রাণী যুবরাজকে প্রলোভিত করতে চেষ্টা করেন। যুবরাজ তাঁর কথায় কান দিলেন না। রাজা ফিরে এলে রাণী তাঁর কাছে যুবরাজের বিরুদ্ধে মিছামিছি দোষ লাগালেন। রাজা দুই জল্লাদকে হুকুম দিলেন যেন তারা নগরের বাহিরে গিয়ে তাঁর হাত পা কেটে ফেলে। জল্লাদেরা তাঁকে নগরের বাহিরে নিয়ে গেল। কিন্তু তারা রাজার হুকুম পালন করতে চাইলে না। অবশেষে যুবরাজের জেদে পড়ে তারা তাঁর হাত পা কেটে দিলে। এইজন্য তাঁর নাম হল চৌরঙ্গী। চার হাত-পা-কাটা লোককে বলত চৌরঙ্গী। এদিকে মীননাথ নানা দেশ ভ্রমণ করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি চৌরঙ্গীকে দীক্ষা দিলেন। তাঁর আদেশে এক গরুর রাখাল অসহায় চৌরঙ্গীকে সেবা করতে লাগল। এই রাখাল পরে গোরক্ষনাথ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। চৌরঙ্গী বার বছর ধ'রে সেই একই স্থানে থেকে যোগ অভ্যাস করেন। তারপর যখন তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন, তখন তাঁর নূতন করে হাত পা আবার গজাল। যোগের প্রভাবে চৌরঙ্গীনাথ অমর হয়ে গেছেন।

আমরা এখানে নাথগীতিকা শেষ করলুম। তিব্বতীতে এবং একখানা হিন্দী বইয়ে গোপীচাঁদ ও ময়নামতী সম্বন্ধে একটি নূতন পরিচয় আছে। তাতে বলা হয়েছে ময়নামতী মালব দেশের রাজা ভরথরী বা ভর্তৃহরির ভগ্নী ছিলেন। ময়নামতীর বিবাহ বাংলা দেশের রাজার সঙ্গে হয়েছিল। গোপীচাঁদ তাঁহাদেরই পুত্র।

চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং এক ভর্তৃহরির কথা বলেছেন। তিনি অনুমান ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন ফরাসী পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভীর মতে ৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মীননাথ নেপালে গিয়েছিলেন। ভর্তৃহরির সময়ের সঙ্গে বেশ খাপ খাচ্ছে। কাজেই মীননাথ গোপীচাঁদ প্রভৃতিকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলতে হয়। গৌতমবুদ্ধের ন্যায় তরুণ বয়সে গোপীচাঁদের সন্ন্যাস লোকের মনে একটা দরদের সঞ্চার করেছিল। তাই নাথপন্থার সঙ্গে গোপীচাঁদের গীতও ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছিল।*

*ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সৌজন্যে।

কথাসাহিত্যে আধুনিকতা

অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী এম্‌-এ

কথাসাহিত্যকে উপলক্ষ্য করে যে অভিমতটা সম্প্রতি সাহিত্যক্ষেত্রে নিতান্ত প্রবল এবং মুখর হয়ে উঠেছে, সেটা হচ্ছে এই যে, উপন্যাসের ভিতর দিয়ে আমরা বাস্তব জীবনকে পেতে চাই,—তা সে যত রূঢ় এবং অপ্রিয় হোক না কেন।

সত্যকার মানবজীবনের মধ্যে তৈরি-করা সাজানো কাহিনীর চোখঝল্‌সানো চাকচিক্য নেই বটে, কিন্তু সত্যের সুদৃঢ় কঠিন পৌরুষ এবং মহিমা আছে।

সত্যকে চাপা দিয়ে যে গল্প-কাহিনী গড়ে ওঠে, তা আমাদের সেকেলে গল্পলোলুপ অতৈরি কাঁচা মনকে সৌখিন হাল্কা স্ফূর্তি দিতে পারে বটে, কিন্তু আমাদের আধুনিক বিচারনিষ্ঠ, জীবনবাদী, সত্যসন্ধানী তৈরি মনকে স্থায়ী গভীর আনন্দ দিতে পারে না। আমাদের মনের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রসচেতনারও বিবর্তন হচ্ছে।

শিশুচিত্ত যে গল্প পড়ে আনন্দ পায়, সংসারাভিজ্ঞ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সত্যনিষ্ঠ, বিচারনিষ্ঠ তৈরি মন তার মধ্যে সে আনন্দ পেতে পারে না। ঠিক সেই মত, আজকের যুগের মানুষের মন আর সেকেলে উপন্যাস পাঠ করে আগেকার পাঠকদের মত আনন্দ পেতে পারে না।

এ কথার মধ্যে সত্য আছে। তা যদি না থাকতো তাহলে রোমান্সের সৌখিন পথ ছেড়ে কথাসাহিত্য আজ উপন্যাসের বন্ধুর দুর্গম পথ ধরত না।

কিন্তু কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে মানুষ এখানেও তার সারস্বত যাত্রা শেষ করে নি। এখানেও প্রশ্ন উঠেছে—সেকেলে ধরনের লেখা উপন্যাস আর চলবে কি না? উত্তরে আধুনিক যুগ বলছে—না চলবে না।

আমাদের উপন্যাসের মধ্যে জীবন বড় হয়ে উঠেছে সত্য, কিন্তু এই সব উপন্যাসের ভিতর দিয়ে জীবনকে

আমরা দেখছি যে চোখে, সে চোখে আজও লেগে রয়েছে সেকেলে গঠন-সংস্কারের সৌখিন মোহ।

আমাদের উপন্যাসের ভিতর দিয়ে যে জীবনকে আমরা পাচ্ছি, তা হচ্ছে সাজানো কৃত্রিম জীবন, যার মধ্যে আমাদের সত্যকার জীবনের সেই এলোমেলো খাপছাড়া ছন্দহীন অনিশ্চয়তা নেই; আছে উপন্যাসের সুসম্বদ্ধ সুদৃঢ় ঐক্যবন্ধন।

জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষণ হচ্ছে এই যে, তার মধ্যে কোথাও কোন বাঁধন খুঁজে পাই না আমরা। আমাদের সত্যকার মানবজীবন এত এলোমেলো, এত অনিশ্চিত এবং আকস্মিকতার অত্যাচারে এত অসহায় যে তাকে কোন একদিক থেকে বাঁধতে গেলেই তার খাঁটি সত্যকার রূপটি যায় নষ্ট হয়ে। অথচ আর্ট তো আর জীবনের মত এলোমেলো হতে পারে না। তার মধ্যে একটা সঙ্গতি, একটা বাঁধন, একটা ছন্দ থাকবেই থাকবে। এবং উপন্যাস যখন আর্টেরই একটা রকমফের মাত্র, তখন তা প্রত্যক্ষ জীবনের মত একেবারে বেপরোয়া এবং খাপছাড়া হতেই পারে না।

এইখানেই বেধেছে মুস্কিল, এবং আধুনিক কথাসাহিত্যের অগ্রগতির পথে আজ এই নূতন সমস্যা এসে দেখা দিয়েছে।

একেবারে এলোমেলো ছন্নছাড়া ঘটনাবলী পরপর সাজিয়ে কখন উপন্যাস গড়ে তোলা যায় না, যদিও মানুষের জীবন ছন্নছাড়া কতকগুলো এলোমেলো ঘটনার সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়।

উপন্যাসের মধ্যে একটা না একটা বাঁধন থাকবেই থাকবে, নৈলে তা রসসৃষ্টি হয়ে উঠতে পারে না। কেন না, রসসৃষ্টি করবার সময় মানুষ শুধু জগৎব্যাপারকে প্রত্যক্ষ করে না, তার ভিতর দিয়ে নিজের দেখার বিশেষ ভঙ্গিটিকে ফুটিয়ে তোলে। এই ভঙ্গিটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। সুতরাং ঔপন্যাসিকের এই ব্যক্তিত্ব উপন্যাসের ভিতরকার ঘটনাবলীর মধ্যে আপনা হতেই এনে দেবে একটা ঐক্য, একটা ছন্দ, একটা বন্ধনসূত্র।

আধুনিক কথাসাহিত্যিকরা একথা অস্বীকার করেন না,—করতে পারেন না। এঁরা বলতে চান যে, উপন্যাস লেখবার সময় সত্যকার মানবজীবনকে আমরা অনুসরণ করব উপন্যাসের আকৃতিধর্ম্মের দিক থেকে। অপর পক্ষে রসসৃষ্টির চাহিদা আমরা মেটাবো পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিত্ব-সঞ্জাত ছন্দসামঞ্জস্যের সাহায্যে। অর্থাৎ আমাদের উপন্যাস আকৃতিধর্ম্মের দিক থেকে হবে জীবনের মতই এলোমেলো এবং অগোছালো। তার ঘটনাসন্নিবেশ বা প্লটের মধ্যে সেকেলে উপন্যাসের বাঁধাধরা কৃত্রিম সৌখিন ঐক্যবন্ধন থাকবে না। —ঐক্যবন্ধনের সূক্ষ্ম সূত্রটি থাকবে উপন্যাসের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ভাবে। অর্থাৎ আধুনিক উপন্যাসের মধ্যে থাকবে ঘটনাগত স্থূল ঐক্যের পরিবর্ত্তে ভাবগত বা চিন্তাগত ঐক্য। এক কথায় ঐক্যবন্ধনটা মৃন্ময় না হয়ে হবে চিন্ময়, objective না হয়ে হবে subjective.

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসখানির দিকে একটু ভাল করে নজর দিলেই আমার বক্তব্য কতকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এই উপন্যাসটি প্লট বা ঘটনাসন্নিবেশের দিক থেকে একেবারেই এলোমেলো এবং খাপছাড়া। একটা ঘটনার সঙ্গে আর একটা ঘটনার বিশেষ কোন ক্রমসম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না। বইখানি পড়ে মনে হয় যেন একটি লোক তার ব্যক্তিগত জীবনে যা কিছু দেখেছে এবং

শুনেছে তাই হুবহু লিখে গেছে। অর্থাৎ মানুষটা জীবনকে একবারে অন্ধভাবে অনুসরণ করে গেছে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, এই সব এলোমেলো বিচ্ছিন্ন ঘটনার ভিতর দিয়ে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত নৈতিক ও সামাজিক ধারণা নানা দিক থেকে নানাভাবে আপনাকে ব্যক্ত করে চলেছে। সমগ্র উপন্যাসখানির অন্তরালে রয়েছে একটি মানুষের জীবনকে দেখার ও বিচার করার একটি সুসম্বদ্ধ চিন্তাধারার অখণ্ড যোগসূত্র।

সোনালী স্বপন

শ্রীঅখিল নিয়োগী

গ্রামে আজ মহাসমারোহ। জমিদার তার অষ্টমবর্ষীয়া একমাত্র মেয়েকে 'গৌরী'-দান করেছেন।

বিবাহ আসর গম্‌গম্ করছে। মেয়ের এক দূরসম্পর্কের খুড়ো কালীবাবু বরযাত্রীদের আদবআপ্যায়নের ভার নিয়েছেন! তিনিই সবাইকে সরবৎ সেধে সেধে বেড়াচ্ছেন।

মেয়ে সোনালীকে চমৎকার করে কনে সাজিয়ে দোতলার একটা জানালার ধারে বসিয়ে রাখা হয়েছে। চাঁদের আলো এসে পড়েছে সোনালীর চোখে মুখে লাল চেলীতে। হঠাৎ ওড়নায় টান পড়তে সোনালী অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে দেখলে জান্‌লার ওপাশে তার ভাবী বর হিহি করে হাসছে। সোনালী বল্‌লে, একি! মাণিক দা। তবে যে ওরা বল্লে, বিয়ের আগে এখন বরের সঙ্গে কথা বল্লে লোকে নিন্দে করবে।

মাণিক কলা দেখিয়ে দেখিয়ে জবাব দিলে, বলুকগে ওরা, বয়ে গেল! আমার সঙ্গে যারা এসেছে ...তারা লুচি মণ্ডা ওড়াচ্ছে। এই ফাঁকে দেখতে এলাম তোকে কেমন মানিয়েছে।

সোনালী বল্লে, না না তুমি পালাও মাণিক দা। এক্ষুণি কেউ দেখে ফেল্লে আমায় বক'বে।

মাণিক জবাব দিলে, দূর বোকা! আজ রাত্তিরেই ত তুই আমার বৌ হতে যাচ্ছিস, ঠাকুমা বলেছে। তখন দুজনে মিলে সেনেদের বাড়ী লিচু চুরি করে খাবো। তোদের বাড়ীর কেউ আর বারণ করতে পারবে না। সোনালীও উল্লসিত হয়ে উঠ্‌লো। বল্লে,—তা-হোলে ভারি মজা হবে, না মাণিক দা? মাণিক বিজ্ঞের মত বল্লে, এই সোনালী এখন থেকে আমায় আর মাণিকদা বল্‌তে পারবি না—ঠাকুমা বারণ করে দিয়েছে...... আমি যে তোর বর হব।

হুঁ। আমার মা-ও বলে দিয়েছে—একদম্ ভুলে গিয়েছিলাম মাণিকদা! সোনালী বল্ল।

মাণিক বল্লে, ফের আবার মাণিকদা!

দুজনেই খিল খিল করে হেসে ওঠে! মাণিক বল্লে—সোনালী একটা গান গা না ভাই—

সোনালী ভয়ে ভয়ে চারিদিকে তাকিয়ে বল্লে, কিন্তু কেউ যদি এসে পড়ে আমায় বকবে।

মাণিক বল্লে—পাগল! কেউ জানতে পারলে তো! সব গণ্ডা গণ্ডা মণ্ডা ওড়াচ্ছে—বল্লুম তো তোকে!

সত্যি তাই। দেখা গেল—বিরাট জমিদার বাড়ীর অন্দদিকে সবাই ভোজে মহাব্যস্ত। লুচি আন, পোলাও পোলাও এই দিকে—ভাজাটা গরম দেখে দিও—এই সব নিয়ে মহাব্যস্ত। মেয়ের দূরসম্পর্কের খুড়ো খাওয়া দাওয়ার তদারক করে বেড়াচ্ছেন।

মাণিক বল্লে,—এখন তুই গান গা দেখি—

সোণালী এদিকে ওদিকে তাকিয়ে গান ধরলে—

মাণিকও মহা-উল্লাসে তার সঙ্গে যোগ দিলে।

ও দিকে ভোজের আসর।

বরযাত্রেব একজনের পাতে পোলাও দেওয়া হয়েছে।

সে ভদ্রলোক তাতে একবার হাত দিয়েই হাকলো ও ঠাকুর এ ঠাণ্ডা পোলাও মুখে দেয়া যাবে না··· · গরম দেখে নিয়ে এসো। এই বলে তিনি পাতের পোলাওগুলো ঠেলে ফেলে দিলেন।

ঠিক সেই সময় মেয়ের খুড়োব আবির্ভাব; মুখে বিষ মিশিয়ে করালীবাবু বল্লেন, বাড়ীতে কে কত পোলাও খান জানা আছে। এমন করে জিনিষ নষ্ট করা—!

কন্যাপক্ষের তরফ থেকে এই কথায় মৌচাকে যেন ঢিল ছোঁড়া হল। বরযাত্রদের মধ্যে প্রথমে মৃদু কাণাকাণি। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠেছেন; চিৎকার করে বল্লেন, কী। বাড়ীতে নেমতন্ন করে এনে অপমান। আমরা জীবনে পোলাও খাইনি। না হয় জমিদারেরই মেয়ে!

বরযাত্রেরা সবাই সায় দিয়ে বল্লে, ঠিক কথা। এখানে আজ জল গ্রহণ করা উচিত নয়।

হা [illegible] করে ছুটে এলেন জমিদার রামসদয় বাবু নিজে... ...ছুটে এলেন মাণিকের বাপ তারিণী বাবু। কিন্তু কার কথা কে শোনে। পাতা উল্টে পা দিয়ে জলের গেলাস ঠেলে ফেলে দিয়ে একটা দক্ষযজ্ঞের কাণ্ড বাধিয়ে বরযাত্রের দল বেরিয়ে এল।

গোলমাল শুনে মাণিকও তাড়াতাড়ি দোতলার সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে আসছিল। পড়বি তো পড় সে একেবারে সেই ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল যিনি পোলাও ঠেলে ফেলে দিয়ে এই গোলযোগের সৃষ্টি করেছিলেন।

মাণিককে দেখে তার দুচোখ আনন্দে নেচে উঠ্‌ল। তিনি লাফিয়ে উঠে বল্লেন, এই যে মাণ্‌কে—তুইও বরের আসন থেকে উঠে এসেছিস?—বেশ করেছিস! চল আমার সঙ্গে—

মাণিককে কোনো কথা বলবার ফুরসুৎ না দিয়ে তিনি ওকে পাঁজা কোলে করে তুলে নিয়ে দলের সঙ্গে জমিদার বাড়ীর ফটক পেরিয়ে চলে এলেন। জমিদার-বাড়ীর সানাই হঠাৎ আর্ত্তনাদ করে থেমে গেল।

দেখা গেল বাসরের সমস্ত আলোই নিভে এসেছে ....ফুলের মালা, চাঁদমালা এদিক ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে······ ···দু'একটা কুকুর খাবারের লোভে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—

সেই আলো-আঁধারের মধ্যে দাঁড়িয়ে জমিদার রামসদয় বাবু ও তারিণী বাবু—

তারিণীবাবু বল্লেন, দাদা আমি যে তোমার মুখের দিকে চাইতে পারছিনে। এত বড় অঘটন আমার তরফ থেকে হবে এযে আমি ভাব্‌তেই পারি নে!—

রামসদয় বাবু বল্লেন, ভেবে লাভ নেই ভাই। আমি জানি আমার ঐ গোঁয়ারগোবিন্দ ভাই করালীই

এই কাণ্ড বাধিয়েছে। যাক্ সবই ভবিতব্য। শুভ কাজে বাধা পড়ল…… ……লগ্ন উৎরে গেছে। কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি—মাণিকের সঙ্গেই সোনালীর বিয়ে আমি দেব। তবে এখন নয়—ওরা দু'জনে বড় হোক ………মাণিক মানুষ হোক—তারপর। গৌরীদান করবার সখ আমার ঘুচে গেছে।

তারিণী বাবু কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন—রামসদয় বাবু তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্‌লেন,—কিছু তোমায় বল্‌তে হবে না ভায়া; যারা এই কাণ্ড করেছে তারা তোমার সংসারের কেউ নয়—আমার সংসারেরও কেউ নয়। প্রাণের টান তাদের নেই। তুমি আমার ছোট ভায়ের মত…… …তোমায় এই কথাটাও জানিয়ে রাখ্‌ছি—মাণিককে লেখা পড়া শেখাবার সমস্ত ভার আমার।

পরদিন মাণিক আর সোনালী সবাইকে লুকিয়ে লিচু বাগানে এসে মিলেছে।

সোনালী বল্লে, তুমি তো বেশ মজার লোক মাণিকদা। ঠাকুমা বল্‌ছিল বরের আসন থেকে বর উঠে পালিয়ে গেছে তাই বিয়ে হোলো না। মা কত কাঁদছিল কাল।

মাণিক বল্লে, দূর পাগলি, তাই বুঝি? আমি কেন পালিয়ে যাবো? হারাধন মামা আমায় পাঁজ-কোলে কোরে নিয়ে গেল যে। আমি কত হাত-পা ছুঁড়লুম কিছুতে আমায় ছাড়লে না—নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে আটকে রাখলে। সবাই পেটভরে লুচি সন্দেশ খেলে, আমি কিছুটি খেতে পেলাম না।

সোনালী বল্লে, বলকি মাণিকদা। তোমায় না খাইয়ে রেখেছিল। এই যে নাও। কাল বরের জন্যে যে সব সন্দেশ তৈরী করেছিল আমি লুকিয়ে নিয়ে এসেছি………এই খাও—

মাণিক বল্লে, দে। তারপর গপাগপ্ সন্দেশ গুড়াতে লাগ্‌লো। খাওয়ার মাঝখানে হিহি করে হেসে উঠে বল্লে, বর হবার আগেই বরের সন্দেশ খেয়ে নিলাম—ভারী মজা নারে?

সোনালী খুসী হয়ে বল্লে, একটা কিন্তু ভারী সুবিধা হয়েছে। মাণিক শুধোলে, কিরে কি?—

সোনালী বল্লে, এখন তোমার নাম ধরে ডাক্‌লে কেউ কিছুই বলবে না—বিয়ে তো আর হয়নি!

দুজনে মনের আনন্দে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠ্‌ল্।

সোনালী যখন মাটিতে আঁচল লোটাতে লোটাতে বাড়ী গিয়ে পৌছল তার ঠাকুমা ডেকে বল্লেন,—হাঁরে সোনালী, তোর কি এতটুকু লজ্জা সরম নেই? কাল এই কেলেঙ্কারিটা হয়ে গেল আর তুই আঁচল লুটিয়ে পাড়া বেড়াতে বেড়িয়েছিস্! করালী খুড়ো এসে ফোড়ন্ দিয়ে বল্লে, পাড়া বেড়ানতেই তুমি আপত্তি তুল্‌ছ, কিন্তু তোমার গুণের নাত্‌নী যে কালকে ভেঙ্গে যাওয়া বরকে সন্দেশ খাইয়ে এলো—আমি নিজ চক্ষে দেখে এলাম।

ঠাকুমা গালে একটা আঙ্গুল রেখে বল্লেন, এঁ্যা তুই বলিস কি করালী? নাঃ। আজকালকার মেয়েরা পেটে থেকে পড়েই সেয়ানা হয়।— করালী বল্লে, শুধু কি তাই জেঠাইমা! দু'জনে গলাগলি ধরে সেকি হাসাহাসি!

সোনালী শুধু বল্লে, কেন তুমি আমার পেছনে লাগ করালী খুড়ো? আমি তোমার কি করেছি? সে আর কিছু বলতে পারলে না। তার দু'চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌ল।

এই সময় রামসদয় বাবু সেখানে এসে হাজির হলেন। সোনালীর সেই অবস্থা দেখে তাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে

বল্লেন, না! তোমরা আমার মাকে কিছু বোলো না। ওর চোখের জল আমি দেখতে পারিনা।

আড়াল থেকে সোনালীর মা ব'ল্লেন, উনিই তো আদর দিয়ে দিয়ে মেয়েটার মাথা খেলেন। রামসদয় বাবু একটু মুচ্‌কি হেসে মেয়েকে নিয়ে চলে গেলেন। সোনালী তখন বাপের বুকে মুখ লুকিয়েছে।

এর সপ্তাহ খানিক পরের ঘটনা।

গ্রামের খুড়ো ভট্‌চাজ মশাই রামসদয় বাবুর কাছে এসে উপস্থিত। তিনি বল্লেন, দেখ ভায়া তুমি গ্রামের জমিদার, তুমি যদি তোমার মেয়েকে শাসন না কর তবে আমরা ক'ঘর গরীব মারা যাই—। রামসদয় বাবু বল্লেন, কেন কি হয়েছে? ভট্‌চাজ মশাই বল্লেন, তোমার মেয়ের নিত্য নতুন দৌরাত্ম্য। আর তার দোসর হয়েছে তারিণীর ছেলে মাণ্‌কে। জমিদারের মেয়ে বলে কেউ কিছু বলতে পারে না। সবাই আমায় উস্কাচ্ছে—আপনি একবার বলে দেখুন। তাই বলছিলাম ভায়া, বিয়েটাও দিলে না—আবার গ্রামের ওপর বসে ধিঙ্গীপানা—

রামসদয় বাবু একটু বিরক্ত হয়ে বল্লেন, ভণিতা শুন্‌তে চাইনা, ভট্‌চাজ মশাই,—আমার মেয়ে কি করেছে তাই খুলে বলুন।

ভট্‌চাজ মশাই একটু আমতা আমতা করে বল্লেন, আচ্ছা, নিজে যখন শুন্‌তে চাইছ·· তখন বল্‌ব বৈ কি! শোনো ভায়া—দেখলাম—

ভট্‌চাজ মশাই যে কাহিনী শোনালেন তার সার মর্ম্ম এরূপ।

সন্ধ্যে উৎরে গেছে—ভট্‌চাজ মশাই তাঁর খালি ঘরে পিদিম জালিয়ে রামায়ণ পড়ছেন, এমন সময় সোনালী এসে উপস্থিত। ভট্‌চাজ মশাই বল্লেন, আয় মা বোস্।

সোনালী বল্লে ভট্‌চাজ জেঠা তোমার মাথার পাকা চুল বেছে দেব? ভট্‌চাজ মশাই বল্লেন তা দিবি দে—সোনালী পাকাচুল বাছতে বাছতে ভূতের গল্প ফেঁদে বস্‌ল। ভট্‌চাজ মশাই একা বাড়ীতে থাকেন—তার ওপর তিনি আবার অত্যন্ত ভীত, সন্ধ্যার পর আর বেরুবার নামটি নেই!

সোনালী যত ভূতের গল্প শোনায় ভট্‌চাজ মশাই তত গুড়িশুড়ি মেরে বসেন। চোখ দুটো হয়ে ওঠে বড় বড়। ওদিকে দেখা গেল—ভট্‌চাজ মহাশয়ের বাগানে মাণিক একগাছা দড়ি বাগিয়ে নিয়ে উঠ্‌ছে নারকেল গাছে—। চাঁদের আলোয় দেখা গেল বড় বড় সব ডাব আর নারকেল গাছ ভর্ত্তি ঝুল্‌ছে, মাণিকের দায়ের কোপে এক একটা ডাব মাটিতে পড়ে আর ভট্‌চাজ মশাই চম্‌কে চম্‌কে ওঠেন। সোনালী বলে, ভট্‌চাজ জেঠা তোমার বাড়ীতে ভূতের দৌরাত্ম্য সুরু হোলো নাকি? ভট্‌চাজ মশাই ভয় পেয়ে নাম জপেন রাম! রাম! রাম! যখন সমস্ত গাছ নিঃশেষ হয়ে গেল আর কোনো শব্দ শোনা যায় না—সোনালী দুষ্টুমী করে বল্লে—জ্যাঠা, আমার বড্ড ভয় করছে···আমায় একটু এগিয়ে দাও না—ভট্‌চাজ মশাই আলোর কাছে সরে গিয়ে বল্লেন, তুই একাই যা না মা, তোদের আবার ভয় কি? বাইরে দিব্যি জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে।

হাসতে হাসতে সোনালী বাইরে বেরিয়ে এলো। মাণিক তার জন্য অপেক্ষা করছিল—অতগুলো ডাব দুজনে কি টেনে আন্‌তে পারে, তবু তাদের অদম্য উৎসাহ—গায়ে যেন হাতীর বল। খানিক দূরে গিয়ে জঙ্গলের মাঝখানে নিরিবিলি একটি জায়গা। এইটিই বোধ করি মাণিক আর সোনালীর নিভৃত ভবন। মাণিক বল্লে, দেখেছিস সোনা—কেমন জ্যোৎস্না·· ঠিক যেন রোদ্দুর উঠেছে। সোনালী বল্ল—ভট্‌চাজ মশায়ের সঙ্গে বকে বকে আমার তেষ্টা পেয়ে গিয়েছে একটু ডাবের জল দাও,

মাণিক বল্লে—একটা গান না শোনালে দেবো না··· সোনালী বল্লে—তেষ্টা পেলে বুঝি গান গাওয়া যায়? মাণিক জবাব দিলে—ডাবের জল খেলে যে গলা চ্যাপ-চেপে হয়ে যাবে…তখন মোটে গান বেরুবেই না… সোনালী গান ধরে···মাণিক সঙ্গে গলা মেশায়। হাসির গান। গান শুনে পাড়ায় ন্যাপ্‌লা ছোঁড়া এসে হাজির। বল্লে—ও—তোমরা দুজন এই কর্‌ছ; যাচ্ছি আমি ভট্‌চাজ মহাশয়ের কাছে—।

মাণিক বল্লে—ওরে ন্যাপলা, শোন্ শোন্ তোকেও না হয় ভাগ দিচ্ছি। ন্যাপলা সে কথা শুনতে পেলে না—হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল। সোনালী বল্লে যাক না। ভট্‌চাজ জ্যাঠার যে ভূতের ভয় কথাটা বিশ্বাসই করবেন না। আর যদিই বা কবেন তবে ঘর থেকে বেরুবার সাহস তাঁর নেই—দুজনে খিল খিল করে হেসে ওঠে।

গল্প শেষ করে ভট্‌চাজ মশাই বল্লেন, ন্যাপলার কাছে শুনে আমি ছুট্‌তে ছুট্‌তে আস্‌ছি, তোমার বিচার কর্‌তে হবে ভায়া।

রামসদয় বাবু 'গুরুক গুরুক' করে তামাক টানছিলেন। বল্লেন,—কোথায় তারা আমায় দেখিয়ে দেবে চল—

ভট্‌চাজ মহাশয়ের সঙ্গে রামসদয় বাবু বেড়িয়ে চলে গেলেন। সোনালী আর মাণিক তখন মহানন্দে ডাব নারকেল আর বাতাসা চিবুচ্ছে। রামসদয় বাবু গিয়ে হাঁক দিলেন সোনা—মাণিক এদিকে এস—

দুজনের মুখে তখন আর বাক্যি নেই। রামসদয় বাবু আবার গম্ভীর স্বরে বল্লেন আমি কোনোদিন তোমাদের উঁচু কথা বলিনি। কিন্তু আজ আমি তোমাদের আদেশ করব। শোনো মাণিক তোমাকে লেখা পড়া শিখতে হবে। এই আমার ইচ্ছা। আর কেউ না জানুক—তোমার বাবা তারিণী তা জানে। আর সোনা তুমিও শুনে রাখ—যতদিন মাণিক সত্যিকারের মানুষ হোয়ে না ওঠে—ততদিন পর্য্যন্ত তোমাদের দেখা শোনা একেবারে বন্ধ।

ক্রমশঃ দশ বছর কেটে গেল। রামসদয় বাবু, ভট্‌চাজ মশাই সোনালী আর মাণিক আবার সেই বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে। সোনালী এখন তরুণী, মাণিক নব্য যুবক। রামসদয় বাবু আরো বৃদ্ধ হয়েছেন, ভট্‌চাজ মশাই একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন বল্লেই চলে।

রামসদয় বাবুই প্রথমে কথা কইলেন, বল্লেন, দশবছর আগে তোমাদের যে আদেশ করেছিলাম, তা তোমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছ। মাণিক বৃত্তি পেয়ে আই-এ পাশ করল। এইবার আমার প্রতিশ্রুতি আমি পালন করবো। ভট্‌চাজ মশাই সাক্ষী। এই যে সামনে দেখতে পাচ্ছেন—দু'হাজার বিঘে পতিত জমি ওটা আমি দান মাণিককে দেব। আমার ইচ্ছা ও পুণায় গিয়ে কৃষি-বিদ্যা শিখে আসুক—তারপর ফিরে এসে যদি এই জমি চিনে নিতে পারে, তবে গাঁয়ের চাষীদের আর দুঃখ থাকবে না।

ভট্‌চাজ মশাই বল্লেন, আর ভায়া বিয়ের কথাটা—রামসদয় বাবু বল্লেন, সে তো আমার মনে মনেই রইল ভট্‌চাজ মশাই।

সোনা আর মাণিক পরস্পরের দিকে তাকালে। সেইদিন সন্ধ্যা বেলায় সোনালী লুকিয়ে এল মাণিকের কাছে।

মাণিক বল্লে হঠাৎ এতদিন পরে দর্শন যে—

সোনালী বল্লে বাবার নিষেধ তো আর নেই—শোনো দশ বছর ধরে তোমার জন্যে সেলাই করেছি এই রুমাল—। ঢাকাই বুটিতে তৈরী। এর প্রতিটি সূঁচের ফোঁড় আমার প্রতিটি দিনের ইতিহাস। তাই এ শুধু রুমাল নয়। আজ আমি এটা তোমার হাতে তুলে দিলাম। ওটা থাকবে তোমার

বুক পকেটে আর আমি থাকবো তোমার মনের পকেটে—কেমন ? মাণিক বল্লে মঞ্জুর। তবে এক সর্ত্তে—

সোনালী বল্লে, কি ?

মাণিক বল্লে, দশবছব তোমার গান শুনিনি। সোনা মাণিককে গান শোনালে। এ সেই গান, যে গান শুনলে—যে গায় তার চোখে আসে জল—আর যে শোনে তার পায় ঘুম !

রামসদয় বাবু রোগ-শয্যায়! পুণায় মাণিক সসম্মানে কৃষিবিদ্যায় সাফল্য লাভ করেছে।

তার এসেছে আজ মাণিকের ফিবে আসার দিন। জমিদার বাড়ীতে তাই আজ একটু উৎসবেব আয়োজন হয়েছে; সোনালীর মনেও কি আজ সকাল থেকে রং ধরেছে ? আজ তার মুখে গুণ গুণ গান লেগেই আছে।

রামসদয় বাবু কিন্তু আজ বড় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। তাঁর ধারণা হয়েছে তিনি আর ওদের দুটির দু'হাত এক করে দিয়ে যেতে পারবেন না। শরীর আব মন অত্যন্ত দুর্ব্বল। তিনি আজ সমস্ত দিন সেই জন্য উৎকর্ণ হয়ে রয়েছেন···কখন দোর-গোড়ায় গাড়ীর শব্দ শোনা যাবে। সোনালী ঠাট্টা করে বল্লে,—বাবাব কিন্তু সবতাতেই বাড়াবাড়ি—

রামসদয় বাবু জবাব দেন,—তুই যখন ছেলেপেলের মা হবি—তখন বুঝতে পারবি। সোনালী মুখ টিপে হেসে পালিয়ে যায়।

অবশেষে সত্যি গরুর গাড়ী এসে থামল জমিদাব বাড়ীর দোর-গোড়ায়। আনন্দের আতিশয্যে বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে রামসদয় বাবুর হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল !

অতি বড আনন্দের ভেতর জমিদার বাড়ীতে একটা ম্লান বিষাদের ছায়া এসে পড়ল।

খবর পেয়ে করালী খুড়ো ছুটতে ছুটতে এসে সংসারের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব নিজের হাতে নিলেন।

প্রথমে বাড়ীতে ঢুকতেই তিনি রায় প্রকাশ করলেন—ঐ মাণকে ছেলেটাই অপায়া—দাদা যে ওর ভেতর কি দেখেছিলেন—তিনিই জানেন। গৌরীদান করতে গেলেন।···কেলেঙ্কারির একশেষ। জলের মত টাকা পয়সা খরচ করে, লেখা পড়া শিখিয়ে আনলেন, ফল কি হল ? নিজের প্রাণ-টুকুই বেবিয়ে গেল—। আমি শেষ কথা বলে দিচ্ছি—আমার দেহে প্রাণ থাকতে আমি আমার ভাইঝির সঙ্গে ওই বাউণ্ডুলে ছেলেটার বিয়ে দিতে পারব না। করালী খুড়োর কথা শুনে সোনালী চুপ করে গেল—একটি কথারও প্রতিবাদ করলে না।—মাণিক কৃষিবিদ্যা শিখে এসেছে···কিন্তু তার আসল কাজে বিঘ্ন ঘটালেন করালী খুড়ো—বল্লেন খেপেছ তোমরা। দু' হাজার বিঘে জমি অমনি দিয়ে দিলেই হোলো। দাদার না হয় শেষবয়সে ভীমরতি হয়েছিল—আমি তো খুড়ো হয়ে মেয়েটার এমন সর্ব্বনাশ করতে পারি না।

সেই দিন পুকুব ঘাটে মাণিকের সঙ্গে সোনালীর দেখা—। মাণিক বল্লে আমি কলকাতায় যাওয়াই স্থির করলাম সোনা—একটা যাহোক চাকরিবাকরি যোগাড় করে নিতে হবে তো—?

সোনালী বল্লে, —ও। এরই মধ্যে কথাটা কানে গিয়েছে বুঝি ? করালী খুড়োর কথাই বুঝি সব, আমার ইচ্ছেটা বুঝি কিছুই নয়, আমি বলছি তুমি নালিশ কর—

মাণিক অবাক হয়ে বলে, নালিশ করে আমি কি করবো ?

সোনালী বল্লে, তোমার জিনিষ তুমি ফিরে পাবে। তোমার সোনা মিথ্যা কথা বলে না—দেখে নিও—বলে সোনালী চলে গেল।

মাণিক কি ভাবলে সেই জানে! একবার সোনালীর হাতের তৈরী রুমালটা বের করে দেখলে। তার পর দিনই সদর মহকুমায় নালিশ করে বস্‌লে দু'হাজার বিঘে জমির দখলী স্বত্ব নিয়ে।

আদালত লোকে লোকারণ্য—কিন্তু মাণিকের মামলা জয়ের কোনই আশা নাই—করালী খুড়োর উকিলের বক্তৃতার তোড়ে—মাণিকের সমস্ত দাবী ভেসে গেল। এমন সময় সবাই অবাক হয়ে দেখলে—সোনালী নিজে এসেছে মাণিকের পক্ষে সাক্ষী দিতে—সে রামসদয় বাবুর ডায়েরী কোর্টে জমা দিয়ে প্রমাণ করে দিলে যে, স্বয়ং জমিদার বহুকাল পূর্ব্বেই এই জমি মাণিককে দান করে গেছেন—বিচারক মাণিকের পক্ষে রায় দিলেন।

মুখ চুণ করে করালী খুড়ো মামলা হেরে ঘরে ফিরে এলেন। বাড়ীতে এসে চিৎকার করে জানিয়ে দিলেন এমন ভাইঝির মুখ তিনি আর দর্শন করবেন না। আজই তিনি চলে যাবেন।

মুখে বল্লেন বটে চলে যাবেন, কিন্তু মনে মনে স্থির করে ফেল্লেন, "এ যৌবন জল তরঙ্গ" রোধ করতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক ঘটক নিযুক্ত করলেন। শুধু তাই নয়—গোপনে নির্দ্দেশ দিলেন যে—এমন একটি পাত্র খুঁজে বের করতে হবে—যার অগাধ সম্পত্তি; অর্থাৎ কিনা—করালী খুড়োর আন্তরিক বাসনা হল এই রকম একটা জামাই বেছে নিয়ে তারও অভিভাবক সেজে 'একসঙ্গে দুটি সম্পত্তি নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নেওয়া। দু'দিন পরে মাণিক জানতে পারলে সোনালীর বিয়ের জন্য জমিদার বাড়ী ঘটক আনাগোনা করছে।

সে সব কিছু ভোলবার জন্যে নিজেকে আরো বেশী করে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিলে, ইতিমধ্যে সে গাঁয়ের চাষীদের সব নিজের দলে টেনে নিয়েছে। খানিকটা পতিত জমিতে সবাই মিলে একযোগে লাঙ্গল দেওয়া হয়েছে; ধীরে ধীরে কচি ধানের শীষ মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, বাতাসে দুল্‌তে থাকে। মাণিক একটি গাছের ছায়ায় বসে স্বপ্ন দেখে। কি স্বপ্ন দেখে তা সেই জানে।

এক নিঝুম দুপুর। হঠাৎ সোনালী এসে উপস্থিত মাণিকের কাছে। বল্লে এদ্দিন ইচ্ছে করেই আসিনি নিজের জিনিষের ওপর যে তোমার মায়া নেই তা জানতাম না। জমি যেমন করে কেড়ে নিলে—নিতে পার না কি আমারও তেমনি করে তোমার কাছে টেনে—?

বাবার কি মনে-মনে এই বাসনা ছিল না যে, যখন এই পতিত জমিতে লাঙ্গল পড়বে ফসল ফলবে··· তখন আমি তোমার পাশে থাকবো?

মাণিক খানিকক্ষণ চুপ করে তারপর জবাব দেয়—কিন্তু তোমার করালী খুড়ো যে ঘটক লাগিয়েছেন—তোমার বিয়ের জন্যে—।

সোনালী বল্লে—সেই জন্যেই তো আমার তোমাকে বেশী করে দরকার। তা কি তুমি বুঝতে পারো না?

মাণিক হয় তো অন্ধকারে আলো দেখে। বলে, কি করতে হবে আমায় বল সোনালী।

সোনালী মাণিকের কানে-কানে কি যেন বলে—। ছেলেবেলাকার ভুলে যাওয়া একটা দুষ্টুমীর গন্ধ পেয়ে, মাণিক বহুদিন পর পুলকিত হয়ে ওঠে।

মাঠের কাজের পর চাষীর দল যখন ফিরে যাচ্ছিল মাণিক একজনকে নিরালায় ডেকে বল্লে, ওরে পঞ্চা, তোর ঐ ক্ষেতে কাজ করা ময়লা ধুতিগুলি আর কাস্তেটা আজ আমায় দিতে হবে।

পঞ্চা অবাক হয়ে বল্লে কি হবে বাবু। মাণিক মুচকে হেসে জবাব দিলে, একটু থিয়েটার করতে হবে রে।

পঞ্চা বল্লে, ও—গাঁয়ের বাবুরা থিয়েটার করবে বুঝি? আর তুমি বুঝি বাবু চাষা সাজবে?

মাণিক হাসি গোপন করে মাথা নেড়ে বল্লে, হুঁ।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—করালী খুড়োর কাব-সাজিতে কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন সোনালীকে দেখতে—সোনালী তাই চুপি চুপি জানিয়ে গেল—ভদ্রলোককে ভাংচি দিতে হবে। এই জাতীয় একটা অদ্ভুত কিছু কাজ পেলে মাণিক আর কিছু চায় না।

কলকাতার ভদ্রলোক সন্ধ্যার দিকে করালী খুড়োর সঙ্গে গ্রামের সড়ক দিয়ে বেড়াতে বেড়িয়েছেন, এমন সময় চাষার বেশে মাণিক এসে খবর দিলে, বাড়ীতে গিন্নিমা বিশেষ কাজে তাঁকে নাকি ডাকছেন—কলকাতার ভদ্রলোক বল্লেন, বেশ তো আপনি যান না—আমি এদিক সেদিক একটু গ্রামটা দেখে নিয়ে এক্ষুণি ফিরে যাচ্ছি। করালী খুড়ো তাড়াতাড়ি ফিরে গেলেন—। ভদ্রলোক তখন চাষাটিকে বল্লেন—ওহে তুমি আমায় একটু গ্রামটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিতে পার না।

মাণিক একটু নিরিবিলিই চায়, খুশী হয়ে, হাত জোড় করে বল্লে, আজ্ঞে কর্ত্তা—এ আর বেশী কথা কি? আমরা তো জমিদারের খেয়েই মানুষ—চলুন ঐ মাঠের দিকটায়—। ভদ্রলোক কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলেন, জমিদারের মেয়ে কেমন?—মাণিক জিবকেটে জবাব দিলে আজ্ঞে কর্ত্তা, ছোট মুখে বড় কথা কি ভালো শোনাবে? ভদ্রলোকের কেমন সন্দেহ হ'ল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা তো এই জমিদারেরই প্রজা... মেয়েটি কেমন, তোমরা তো জান, আমি আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাই কিনা। মাণিক ভণিতা করে বল্লে, আজ্ঞে ও হচ্ছে বড় ঘরের বড় কথা।

ভদ্রলোকের সন্দেহ বেড়ে গেল। তিনি মাণিকের হাতে একটা টাকা গুঁজে দিয়ে বল্লেন, এইবার সত্যি কথা বলতো বাপু—তোমার কোন ভয় নেই—। চাষা খুশী হয়ে বল্লে—শুনুন বাবু মেয়েটা বড্ড চলানী—কি বলব আমরা মুখ্যু মানুষ—এই গাঁয়েরই একটা ছেলের সঙ্গে বড্ড গায়ে-পড়া ভাব! পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে, বুঝতেই তো পারছেন।

এই কথা শুনে ভদ্রলোকের মুখখানা একেবারে গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি বেড়ান বন্ধ করে ফিরে চল্লেন। চাষা শুধালো, এরি মধ্যে ফিরে চললেন যে বাবু—। ভদ্রলোক জবাব দিলেন শরীরটা ভালো লাগছে না।

চাষা মুচকি হেসে নিজের পথ ধরলে।

পরদিন দুপুর বেলা সোনালী সেই ছায়া-শীতল গাছ-তলায় এসে উপস্থিত। মাণিক বল্লে, কি গো জমিদার-নন্দিনী, তোমার শ্বশুর মশাই গেলেন কোথায়? সোনালীর মুখে আর হাসি ধরে না—তোমার দাওয়াইয়ে বেশ কাজ হয়েছে মাণিক দা। আজ সকালে আমার রূপ পরীক্ষা করার কথা ছিল; কিন্তু শরীর খারাপের অজুহাতে অতি ভোরেই লম্বা!

মাণিক বল্লে,—কিন্তু তোমার শ্বশুরের একটা টাকা রয়ে গেছে যে আমার কাছে, তুমি তার ভাবী পুত্রবধূ। রেখে দিও তোমার সিন্দূরের কৌটোতে। সোনালী মুখ ভার করে বল্লে—যাও বাজে বকো না। তারপর হঠাৎ মুখখানিকে ঝলমল করে বল্লে—এই যে নাও,—নকল শ্বশুরের জন্তে তৈরী করা খাবার, না হয় আসল শ্বশুর-নন্দনের মুখেই উঠুক—সোনালী খাবারের পুঁটুলী এগিয়ে দেয়।

মাণিক বলে,—ওতে আমার অরুচি নেই কোনদিন। সে তাড়াতাড়ি পুঁটুলি খুলে তাতে বিশেষ করে মনোযোগ দেয়।

এর মধ্যে একটি চাষা তামাক খেতে গাছতলায় এসে হাজির—জমিদারের মেয়েকে দেখে, প্রণাম করে বল্লে, পেন্নাম হই দিদিমণি—কাল তোমায় দেখতে এসেছিল বুঝি। সোনালী মাণিকের দিকে একবার কটাক্ষ করে বল্লে,‘হ্যাঁরে পছন্দ হয়নি সাফ জবাব দিয়ে চলে গেল। এমন লক্ষ্মী প্রিতিমে; না দিদিমণি ভদ্র-লোকের তা হোলে চোখ নেই—। মাণিক বল্লে, দু-দুটো চোখেই কাণা। তার পর হো হো করে হেসে উঠল।

এই সময় যুদ্ধের দরুণ গোটা দেশে চালের দাম ধাপে ধাপে বেড়ে যেতে লাগল, আমাদের বাঁশপাপড়া গ্রামে তার ছোঁয়াচ্ এসে লাগ্‌ল! চাষীরা পেটপুরে খেতেই পায় না তো মাণিকের পতিত জমিতে খাটবে কি? খানিকটা জমিতে ফসল উঠেছে বটে কিন্তু অধিকাংশ জমিই পতিত রয়ে গেছে—। সেই সব জমীতে ফসল দেখতে হলে চাষীদের আগে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

ওদিকে করালী খুড়ো গোপনে গাঁয়ের সমস্ত আড়তদারদের টাকায় হাত করে সমস্ত গাঁয়ের জমানো ধান নিজের গোলাজাত করে ফেল্লে। চাষীরা যখন সেই খবর শুনতে পেলে—সবাই কেঁদে কেটে একেবারে মাণিকের পায়ের উপর গিয়ে পড়ল। বল্লে, বাবু এইবার সব বাচ্চা নিয়ে পেটের জ্বালায় শুকিয়ে মারা যাবো। প্রাণে বেঁচে থাকলে তবে ত তোমার সঙ্গে মাঠে খাটতে পারবো।

মাণিক এর কোন উপায় খুঁজে পায় না। দু'হাজার বিঘে পতিত জমি—মাত্র দু'শ বিঘেতে ফসল উঠ্‌ছে। এদের পেটের অন্নের সংস্থান করতে পারলে এই দু'হাজার বিঘে পতিত জমিতে ফসল ফলত। তখন গোটা গাঁয়ের লোকের অভাব দুর হতো; রামসদয় বাবুর সোনালী স্বপ্নকে বুঝি মাণিক সফল করতে পারে না। একা একা প্রেতের মত গভীর রাত্রে সে মাঠের চার পাশ দিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

এমনি এক নির্জ্জন রাতে সোনালী মাণিকের সঙ্গে ক্ষেতের পাশে এসে দেখা করলে। মাণিক বল্লে, এত সাহস তোমার ভাল নয় সোনা। তোমার ভয় করে না? সোনালী বল্লে, তোমার কাছে আসব তাতে আবার ভয় কি? জানত বাবাই আমার মনে বল দিচ্ছেন? মাণিক বল্লে, এ কয় রাত শুধু আমি তাঁর স্বপ্নের কথাই ভাবছি। বুঝি তাঁর কল্পনাকে আমি রূপ দিতে পারলাম না। সোনালী বল্লে, তুমি হঠাৎ ক্ষেতের কাজ বন্ধ করে দিলে কেন? মাণিক জবাব দিলে—ইচ্ছে করে কি আর দিলাম সোনা—চাষীর দল ক্ষিদের চোটে পেট-ভাতায় এখানে ওখানে কাজে লাগছে—হয়তো জমিদার বাড়ীতেই দলে দলে জন খাটতে গেছে। পতিত জমি আবাদ করলে এখন তাদের খোরাকীর ধান যোগাবে কে? দৃপ্ত কণ্ঠে সোনালী বল্লে, জোগাবো আমি। মাণিক সোনালীর কণ্ঠস্বরে অবাক্ হয়ে যায়। বল্লে—তুমি যোগাবে? সোনালী বল্লে—হ্যাঁ—এ আমার বাবার কল্পনা, সে কল্পনা আমাকেই সার্থক করে তুলতে হবে। তুমিতো শুনেছ মাণিকদা যে, করালী খুড়ো গোটা গাঁয়ের ধান মজুদ করে ফেলেছে, সে তো আমার বাবারই টাকায়। ঐ ধান আমি চাষীদের বিলিয়ে দেব। তারা পেটে খেয়ে বাঁচুক, আর আমার বাবার স্বপ্নকে সার্থক করে তুলুক। তুমি আমার সহায় হও মাণিকদা—মাণিক বল্লে,—তোমার কথা শুনে মনে হয়—এই কালনিশার অবসান হবে—আবার নূতন সূর্য্য উঠ্‌বে! সোনালী ধানে ক্ষেত ভরে যাবে, কিন্তু সোনা তোমার খুড়ো

মশাই ঐ ধান বিলিয়ে দিতে দেবেন কেন? সোনালী জবাব দেয়, বিলিয়ে আমার দিতেই হবে—নইলে রাত্তিরে আমার ঘুম হয় না। মনে হয় বাবা আমার কানে কানে বল্‌ছে—ওরে, চিরদিন আমি ওদের বাঁচিয়েছি, আজ ওদের পেটের ক্ষিদে দূর করে নতুন করে সোনার ফসল ফলিয়ে ওদের বাঁচবার সুযোগ দে—।

মাণিক বল্লে, কিন্তু কি করে আমরা ঐ ধান পাবো। করালী খুড়োর সঙ্গে দাঙ্গা তো করতে পারিনে।

সোনালী জবাব দিল—দাঙ্গা কেন করবে? শোন—কাল অমাবস্যা রাত—সূচিভেদ্য অন্ধকার—রাত দুটোর সময় তুমি যাবে আমাদের ওখানে। আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে গোলা খুলে দেব—চাষীরা এক এক করে যাবে আর আমার কাছ থেকে ধামা ভর্ত্তি ধান নিয়ে আসবে। মাণিক বল্লে কিন্তু করালী খুড়ো।

সোনালী মৃদু হেসে জবাব দিলে খুড়ামশায়ের কুম্ভকর্ণের ঘুম, খাওয়াদাওয়ার পরে নিদ্রা এলে পরদিন বেলা ন'টার আগে কিছুতেই ভাঙ্গে না। বাজেই তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

পরদিন গভীর রাত্রে কালীবাড়ীর পেটা ঘড়িতে টংটং করে দু'টো বাজল। মাণিক ততক্ষণ চাষীদের নিয়ে ক্ষেতের পাশে জড় হয়েছে। সে বল্লে—প্রথমটা আমি একা যাবো—তারপর আমি শব্দ করলে তোরা এক এক করে যাবি। সাবধান, গোলমাল করিসনে যেন। চাষীর দল মাথা নেড়ে সম্মত জানালে।

নিস্তব্ধ নিঝুম রাত। যেখানে তার সকল রকম অধিকার থাকবার কথা, মাণিক আজ বহুদিন পর সেই বাড়ীতে যাচ্ছে চোরের মত।

ঝিঁঝিঁ পোকা একটানা ডেকে চলেছে। মাণিক কি আজ অন্ধকারে অভিসারে বেরিয়েছে?

মৃদু প্রদীপ জ্বালিয়ে গোলাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সোনালী নিজে। সোনালীও আজ অভিসারে বেরিয়েছে। এই আলো আঁধারের মাঝখানে এত চেনা সোনাকে মাণিকের আজ রহস্যময়ী বলে মনে হচ্ছে। সোনাই প্রথম কথা কইল; বল্লে, অবাক হয়ে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রয়েছ কি? এই নাও চাবি........ গোলাঘর খুলে দাও—

মন্ত্রমুগ্ধের মত মাণিক হাত থেকে চাবি নিয়ে গোলাঘর খুলে দিল......তারপর হাততালি দিয়ে ইসারা করতেই একে একে চাষীর দল এসে ঢুকতে লাগলো। এলো—কুঞ্জ, এলো পঞ্চা, এলো জাফর আলি, এলো পরাণে মাঝী ... সবাই নিঃশব্দে ধান নিয়ে দিদিমণিকে আশীর্ব্বাদ করে যেতে লাগলো।

এই সময় হঠাৎ দেখা গেল—মশাল হাতে স্বয়ং করালী খুড়ো এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে বিষ মেখে তিনি বল্লেন—ও! সেই কথা বল্লেই হব। জমিদারের বাড়ীর মেয়ে আজ লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে দেবী চৌধুরাণী হয়ে উঠেছেন! তা ব্রজেশ্বরটি জুটিয়েছো ভালো। সোনালী আগুনের মত জ্বলে উঠল। বল্লে, আপনার বহু অত্যাচার আমি ভুল করে সহ্য করেছি করালী খুড়ো, কিন্তু দশজনের মুখের অন্ন এমন করে ছিনিয়ে এনে লুকিয়ে রাখার অধিকার করো নাই। এ আমি বিলিয়ে দেব। এ সম্পত্তি আমার। করালী খুড়ো ঠোঁট বাঁকিয়ে বল্লেন, হুঁ। যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। তারপর হঠাৎ মরিয়া হয়ে হুকুম দিলেন—এই রামসিং, গোলাঘরের ফটক বন্ধ কর—

সোনালী পথ রোধ করে বল্লে তা হোলে আমায় মেরে ফেলে সে কাজ করতে হবে। চাষীরা চঞ্চল হয়ে ওঠে—

মাণিক বল্লে, সোনালী সরে যাও—

সোনালী বল্লে—না আজ শেষ মীমাংসা হয়ে যাক—বাবার সম্পত্তির মালিক আমি—না করালী খুড়ো।

করালী খুড়ো নিজের দুর্ব্বলতা বোধ হয় বুঝতে পারলেন। তাই বল্লেন, আচ্ছা যাচ্ছি আমি বৌ-ঠাকুরণের কাছে—দেখি এর কি বিচার করেন। সোনালী সেদিকে দৃক্‌পাত না কোরে রাণীর ভঙ্গিমায় বল্লে—এসো তোমরা ধান নিয়ে যাও।—চাষীর দল একে একে এগিয়ে এলো। ধান্য বিতরণ সমভাবেই চলতে লাগল। পর দিন সকাল বেলা সোনালীর মা সোনালীকে ডেকে বল্লেন, ঠাকুরপোর কাছে সব শুনলাম। কিন্তু তুমিতো আর ছোটটি নও। মাথার ওপর তিনিও নেই—এই জমিদার বাড়ীর কি তুই নাম ডোবাবি ?

সোনালী বল্লে, তোমার ঠাকুরপোর বুদ্ধিতে জমিদারবাড়ীর নাম তোমরাই ডোবাচ্ছ মা ; বাবা বেঁচে থাকলে এমনটি হতে পারত না। মা বিরক্ত হয়ে বল্লেন, না-না—এ ত ভালো কথা নয়। মেয়ে ছেলের এত বাড় ভাল নয়। এখন থেকে তোমার আর মাণিকের সঙ্গে মেলামেশা চলবে না। ছোঁড়াটার ঘর ভাঙবার মতলব। আর এমন কি ও ভাল পাত্র শুনি ? ঠাকুরপো কোন জমিদার ঘরের একমাত্র ছেলের খোঁজ পেয়েছেন—সেখানেই আমি তার বিয়ে দেব। সোনালীর মা এই রায় দিয়ে রাগ করে চলে গেলেন। কথাটা যথা সময়ে প্রতিবেশিদের দৌলতে মাণিকের মার কানে উঠল। তিনি ছেলেকে ডেকে পাঠিয়ে বল্লেন, দেখ বাপু আজ আমাদের কর্ত্তাও নেই, জমিদার বাবুও নেই ; তাঁদের সঙ্গে তাঁদের কথারও আর দাম কেউ দেয় না—আমি বহুদিন মুখ বুজে অপেক্ষা করেছি ; এমন করে আর আমি সংসার আগলে থাকতে পারব না ; তোকে বিয়ে করতে হবে। আমি আমার গঙ্গাজলের মেয়ের সঙ্গেই তোর বিয়ে দেব। না-না কোনো অমতই আমি শুনব না। গঙ্গাজলকে আমি চিঠি লিখে দিয়েছি তোর মেসো দু'দিনের মধ্যেই এখানে এসে তোকে আশীর্ব্বাদ করে যাবেন।

মাণিক মহা মুস্কিলে পড়ল—এইখানেই ওর দুর্ব্বলতা—মায়ের কথার অবাধ্য ও কোনোমতেই হতে পারে না। ওর দুখিনী মায়ের কোনো সাধআহ্লাদই ও জীবনে পূর্ণ করতে পারেনি। আজ কি করে তাকে বিমুখ করবে ? অনেক ভেবেচিন্তে মাণিক জমিদারবাড়ীর খিড়কীর পুকুরের পাড়ে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইল। জানতো সন্ধ্যা বেলায় গা ধুতে সোনালী একবার এদিকে আসবেই। ওকে খুব বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হোলো না—কলসী ভাসিয়ে সোনালী এসে জলে নামল। হঠাৎ টুন্ করে একটা ঢিল সোনালীর পেতলের কলসীর ওপর এসে পড়ল। সোনালী এদিক ওদিক তাকাতেই—দুজনার চোখা-চোখি হয়ে গেল। সোনালী বল্লে, আজ আমার এত ভাগ্যি মেঘ না চাইতেই জল ?

মাণিক বল্লে, সোনা চেঁচিয়ে কথা বলতে পারব না—সাঁতরে এই পারে এস, সোনালী কলসী ধরে সাঁতরে তার কাছে গেল, বল্লে ভয় নেই। এই সময়টা এই পুকুরে কেউ আসবে না। যতক্ষণ না আমার স্নান হয়—। জমিদারী হুকুম কি জানতো ?

ঠোঁট উল্টে মাণিক বল্লে জানবার আর সুযোগ পেলাম কৈ ? সোনালী বাঁকা হাসি হেসে বল্লে তপস্যা করো। মাণিক জবাব দিলে, কিন্তু তপস্যায় যে বিঘ্ন উপস্থিত হয়েছে। সোনালী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চাইল। মাণিক সব কথা খুলে জানালে সোনালীকে। তার পর বল্লে, এইবার তোমার পালা। সোনালী খিল খিল করে হেসে উঠে জবাব দিলে—এইবার আমার

অভিনয় করতে হবে এই তো—ভেবেছ জমিদারের মেয়ে একেবারে হাবাগোবা কিচ্ছুটি জানে না। দেখে নিও তোমার মেসোকে যদি ঘোল খাওয়াতে না পারি আমার নাম পাল্টে রেখো।—মাণিক বল্লে তবে আমি নিশ্চিন্ত? সোনালী যাত্রার রাণীর ধরণে জবাব দিলে—দূত, তুমি নির্ভয়ে যেতে পারো—। ওদিকে দু'দিন বাদে সত্যি সত্যি মাণিকের মেসো এসে উপস্থিত—মাণিককে আশীর্ব্বাদ করতে। মা তার গঙ্গাজলের বরকে বেয়াই আদরে ঘরে ডেকে নিলেন। বল্লেন, এখন থেকে আপনাকেই ওর মুরুব্বী হতে হবে, ওর পেছনে দাঁড়াবার তো আর কেউ নেই। মেসো বল্লেন সে জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। ওর চাষার মত গাঁয়ে পড়ে থাকার দরকার কি, আমি সহরে ওর ভালো চাকুরি যোগাড় করে দেব। মেয়ে আমার সহরে থেকেই মানুষ; তার ত এ অজ পাড়াগাঁয়ের জল সহ্য হবে না। কথাটা শুনে মাণিকের মায়ের ভালো লাগ্‌লো না।

সন্ধ্যাবেলা মেসো বাবু মাণিকের বাড়ীর সামনের রাস্তায় পায়চারি করে সিগারেট টান্‌ছিলেন—এমন সময় অল্পবয়সী একটি বিধবা স্ত্রীলোক লম্বা ঘোমটা টেনে তার সামনে এসে হাজির হল।

মেসো বাবু শুধোলেন, কি চাই—তোমার। মেয়েটী বল্লে, আমি বাগদীদের মেয়ে গো—এটি কি মাণিক বাবুর বাড়ী? মেসো বাবু একটু বিরক্ত হয়ে বল্লেন, হঁ্যা। কিন্তু তোমার কি চাই তাই বল না। মুখ ঝামটা দিয়ে মেয়েটা বল্লে,—আমি আর কি চাইব? মাণিক বাবু রোজ রাতে আমার দিদির কাছে যায়...তাকে কত গয়না দিয়েছে। ছদিন হ'ল যাচ্ছে না—তাই দিদি আমায় পাঠিয়ে দিলে কি হয়েছে দেখতে। তা হাঁ্যা—গা বাবু তুমিই বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছ; আমি মাণিক বাবুকে সুধোব আমার দিদির দশা কি হবে।

মেসো বাবু গর্জ্জে উঠলেন, যা—যা হোটেলের মাগী দিক করিস্ নে। সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাগে গর গর করতে করতে তিনি আর একদিকে চলে গেলেন। তারপর আপন মনে বিড় বিড় করে বল্লেন—তখনই বলেছিলাম—এতদিন পর্য্যন্ত যখন ছেলে আইবুড়ো হয়ে আছে নিশ্চয়ই তার স্বভাব চরিত্রের দোষ আছে। না!—গিন্নির একেবারে ধনুকভাঙা পণ গঙ্গাজলের ছেলের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিতে হবে—যত সব—পাড়াগেঁয়ে কাণ্ড। ওদিকে ঝোপের আড়ালে সোনালীর হাসিখুসি মুখখানা দেখা গেল, তারপর সে প্রকাণ্ড একটা ঘোমটা টেনে তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে ফিরে চলল। এই সময় মাণিক গাঁয়ের পথ ধরে বাড়ী ফিরছিল। ঘোমটাটানা অচেনা মেয়ে লোক দেখে সে পথের একধারে সরে দাঁড়ালো। ঘোমটাটানা মেয়েটি হন্ হন্ করে চলে যেতে যেতে রসিকতা করে বলে গেল, যাও গো হবুবর—এবার বাড়ী গিয়ে মেসোর পায়ে ধরে সাধাসাধি করলেও মেয়ে দিচ্ছেন না। মাণিক অবাক হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইল, তার পর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

ইতিমধ্যে গোটা গাঁয়ে একটা থমথমে ভাব জেগে উঠেছে। পথেঘাটে চাষীদের চোখে মুখে একটা লোলুপতার ছাপ, কাঁচা টাকা আর ধানের জন্য কখন যে তারা জমিদার বাড়ীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কেউ বলতে পারে না—। মাণিক সবাইকে বুঝিয়েসুজিয়ে অনেক করে ঠাণ্ডা করে রেখেছে—কিন্তু পেটের খিদে তো কারো কথায় বুঝ মানতে চায় না।

করালী খুড়ো ভয় পেয়ে দারোয়ানের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছেন। তবু তাঁর রাতে ঘুম হয় না। মশাল নিয়ে

একা একা গভীর রজনীতে যখের মত তাঁকে ঘুরে বেড়াতে গাঁয়ের অনেকেই দেখেছে। নানা রকম ফসলের বীজ সংগ্রহ করে নিয়ে আসবার জন্য মাণিককে দিন কয়েকের জন্য একবার কলকাতায় যেতে হ'ব। চাষের জন্য কিছু যন্ত্রপাতিও তার দরকার। মাণিকের ইচ্ছা ছিল যাবার আগে একবার সোনালীর সঙ্গে দেখা করে যায়—কিন্তু কিছুতেই তার সে সুযোগ ঘটল না। বোধ হয় ভেতরে ভেতরে করালী খুড়োর এতে হাত ছিল। মাণিক গ্রাম ছেড়ে চলে যেতেই করালী খুড়ো সোনালীর মাকে ডেকে বল্লেন, শোনো বৌঠাকরুণ, এতদিন কথাটা কারো কাছে ভাঙিনি। সোনালীর জন্যে রাজপুত্রের মত বর ঠিক করে রেখেছি। অগাধ সম্পত্তি কিন্তু মাথার উপর দেখবার কেউ নাই। শুভ মাণকে ছেড়ার চষার দলকে আমার ভারি ভয় ছিল; আজ ও গ্রামের বাইরে গেছে আর আমি কাউকে ভয় করি না। এই সামনের বিয়ের তারিখেই ঐ হাত এক করে দেবো।

সোনালীর মা বল্লেন, তাই করো ঠাকুরপো, ... খুড়োর কাজ করে। মেয়েটা যে এমন ধিঙ্গী হযে থাকবে তা আমি চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতে পারিনে. হাজার হোক জমিদার বাড়ীর একটা নাম ডাক আছে তো! তাঁর মুখের কথা লুফে নিয়ে করাল খুড়ো বল্লেন, ঠিক কথা পূর্ব্বপুরুষের নাম বজায় রাখতেই হবে। দাদার শেষ বয়সে ভীমরতি হয়েছিল। তোমার কোন ভাবনা নাই বউঠাকরুণ, শুভ কার্য্য আমি সমাধা করে দেবই। কথায় বলে গোবধের সময় খুড়ো কর্তা... এত সামান্য বিয়ের ব্যাপার। করালী খুড়ো নিজের রসবত্তায় নিজেই বোকার মত হাসতে লাগলেন।

আড়াল থেকে সোনালী সব কিছুই শুনতে পেলে। সোনালী এবার বিয়েতে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করলে না, শুধু গোপনে বিমল বলে গ্রামের একটি ছেলেকে ডেকে পাঠাল। বিমল মাণিকের নিত্য সহচর মাণিকের ছায়া বল্লেও বেশী বলা হয় না। সোনালী সেই বিমলের কানে কানে কি যেন সব বল্লে।

বিমল জবাব দিলে, এ আর বেশী কি কথা সোনালীদি; আমি আজই রওনা হয়ে যাচ্ছি।

এদিকে চাষার দল গোপনে জড় হয়ে শলা-পরামর্শ করেছে। দলের নেতা জাফর আলি আর পঞ্চা। জব্বর আলি বল্লে, ভাই সব, এদ্দিন মাণিকবাবুর মুখের দিকে চেয়েই আমরা করালী খুড়োর বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করিনি। কিন্তু আর আমরা কিছুতেই চুপ করে থাকবো না।

পঞ্চা বল্লে, আমরা ত পাথর নই; আমাদের কিদে আছে, তেষ্টা আছে। আমাদের আপনার ধান মারা গেলে আমরাও বুক চাপড়ে কাঁদি। করালী খুড়ো গাঁয়ের সব ধান মজুত করে ফেলেছে! চাষীরা একমুঠি খেতে পায় না। কচু সেদ্ধ আর একমুঠ জোয়াড খেয়ে মানুষ কদিন বেঁচে থাকতে পারে? আমাদের চোখের সামনে জাফর আলির মেয়েটা ছটফট করে মারা গেল। আমার বুড়ো বাপও এবার সনিপাতে ভাত ভাত করে কেঁদে গেছে। এ অত্যাচার আমরা আর কদিন মুখ বুজে সহ্য করবো! জাফর আলি বল্লে ও শুধু আমাদের দুষমণ নয় গাঁয়ের দুষমণ। ভাই সব তোমরা অনুমতি দাও আজ রাত্রেই খতম করে ফেলি। পঞ্চা বল্লে, ভাই জাফর আলি, রক্তারক্তি করে কোন লাভ নেই। তোমার অনেক কাচ্চা বাচ্চা আছে, তাদের মুখ চেয়ে তোমার বেঁচে থাকতে হবে। নইলে তাদের মুখে দুমুঠো দিয়ে বাঁচিয়ে

রাখবে কে? চল আমরা দুজনে আজই সহরে চলে যাই। থানার বড়বাবু আমাদের চেনা। মাণিকবাবুর সঙ্গে অনেকবার তাঁর কাছে গেছি। তাঁকে আমাদের দুর্দ্দশার কথা সব খুলে বল্লে নিশ্চয়ই একটা বিহিত হবে। দশজনের পেট মেরেই যার ভুঁড়ি ফুলছে—তাকে আগুন দিয়েই বলি দিতে হবে।

সমবেত কৃষকদল পঞ্চা'র এই প্রস্তাব সমর্থন করল। জাফর আলি আর পঞ্চা সহরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল।

বিমল কলকাতায় পৌঁছেই প্রথমে হাজির হল একটি প্রেসে। বল্লে, একটা বিয়ের চিঠি ছাপিয়ে দিতে হবে। প্রেসের ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করলেন কত কপি ছাপা হবে? বিমল হেসে বল্লে, কত কপি আবার— শুধু এক কপি। বনে নেমন্তন্ন করেছে তার বন্ধুকে।

ম্যানেজার অবাক হয়ে বল্লেন, এক কপি! পাগল নাকি? একখানা চিঠিতে কি হবে? এটা ত এপ্রিল মাস নয় যে এপ্রিলফুল করবেন। বিমল বল্লে, এপ্রিলফুল মশাই? শুধু বরকেই নেমন্তন্ন করতে হবে। না হয় হাজার খানারই চার্জ নেবেন। নিন চটপট ছাপিয়ে দিন। চিঠি ছাপিয়ে নিয়ে বিমল মাণিকের মেসে যেয়ে হাজির।

চিঠি পেয়ে মাণিক বল্লে ও তা হলে সোনালী আজ তার বিয়েতে নেমন্তন্ন করলে। খানিক চুপ করে থেকে বল্লে, যাব বই কি—সোনালীর বিয়েতে যাব না—নিশ্চয় যাব। এখন বুঝতে পারছি গাঁ থেকে চলে আসবার সময় বহু চেষ্টা করেও কেন তার দেখা পাই নাই। বিমল বল্লে, মাণিকদা আমার অনেক কাজ। আমি আর বসতে পারছি না; সোনালাদির বিয়েতে আমাকেই জিনিষপত্র কিনতে হবে। মাণিক বল্লে, তুই বিয়ের সওদা করে ফিরে যা। সোনালীকে বলিস আমি ঠিক বিয়ের দিন গিয়ে হাজির হব। বিমল বল্লে, হুঁ। সোনালাদি বিশেষ করে বলে দিয়েছে। পরিবেশনের ভার তোমার হাতে নিতে হবে।

বিমল সেইদিনই জিনিষপত্র কেনাকাটা করে নিজের বাড়ী এসে হাজির।

বিয়ের আর দিন কতক বাকী আছে। করালী খুড়ো সোনালীর মাকে ডেকে বল্লেন, বৌঠাকরুণ তুমি সব আয়োজন কর। মাণিক ছোঁড়া ফিরে আসার আগেই আমি দিন স্থির করছি। তবে আরও কিছু নগদ টাকা দরকার। আমি কাছারি মহলগুলো একবার ঘুরে আসি। কালই যাচ্ছি। বিশেষ দেরী হবে না।

সোনালীর মা কপালে দুহাত জোড় করে বল্লেন, যা ভালো বোঝো ঠাকুরপো। দুহাত এক হয়ে গেলে আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি।

বিয়ের দিন সকাল বেলা করালী খুড়ো ফিরে এলেন। তার কি আর নিঃশ্বাস ফেলবার সময় আছে? বরকে নিয়ে আসবার বিরাট মিছিল যাবে। আর সব চাইতে মজার কথা এই যে, মাণিকের চাষার দল সব এসে সেই মিছিলে যোগ দিতে রাজি হয়েছে। করালী খুড়ো খুসী হয়ে বল্লেন, এইতো তোদের সুবুদ্ধি হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। জমিদার তোদের চিরকাল বাঁচিয়েছে—এবারও বাঁচাবে। শুধু সেই বাউণ্ডুলে ছোঁড়াটার কথা শুনেই তোরা মাততে বসেছিলি।

বিকেলে বাদ্যভাণ্ড নিয়ে করালী খুড়ো নিজে গেলেন ষ্টেশনে। মিছিল রওনা হবার আগে বিমল চাষীদের কানে কানে কি কথা বলে গেল কে জানে। চাষীর দল মহা খুসী। সেই গাড়ীতে কলকাতা থেকে মাণিকও এসে নামল।

বিমলের আর চাষীর দলের কারসাজিতে বর আর করালী খুড়োকে বাদ্যভাণ্ড সহযোগে অন্য রাস্তায় নিয়ে যাওয়া হল। আর পালকিতে চাপিয়ে তাড়াতাড়ি মাণিককে নিয়ে আসা হল সোজা বিমলদের বাড়ী।

কিছুক্ষণ বাদে করালী খুড়ো বুঝতে পারলেন তিনি চাষীদের পাল্লায় পড়ে ভুল রাস্তায় চলে এসেছেন। তখন তাঁর রাগ দেখে কে? এমন সময় তাঁর একটি চর ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলে—জমিদা রর মেয়ের আসল বিয়ে হচ্ছে বিমলদের বাড়ীতে আর বর স্বয়ং মাণিক।

করালী খুড়ো তেলে বেগুনে জলে উঠে বরের গাড়ী ফেরাতে হুকুম দিলেন। কিন্তু তখন কে কার কথা শোনে। চাষীদের তখন কি উল্লাস! করালী খুড়ো চোখে সরষে ফুল দেখলেন! মরিয়া হয়ে গাড়ী থেকে লাফিয়ে মাঠে নামলেন। সামনেই পেলেন মিছিলের একটি ঘোড়া। সেই ঘোড়ায় চেপে তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে রওনা হলেন বিমলদের বাড়ীর দিকে।

দেখা গেল বিমলদের ভিতর বাড়ীতে তখন বিয়ে সুরু হয়েছে। বিমল আজ একাধারে বরকর্ত্তা আর কন্যাকর্ত্তা। কন্যা সম্প্রদান করছে সে নিজে। করালী খুড়োর ঘোড়া এসে বিমলদের বাইরের উঠোনে থামলো। তিনি ঘোড়া থেকে নামলেন। চিৎকার করে উঠলেন। বন্ধ, বন্ধ কর—বন্ধ কর—সব শয়তানি; আমি সব বেটাকে আজ সায়েস্তা করবো। এমন সময় দুজন পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে বল্লে—আপনিই করালী বাবু? করালী বাবু উৎফুল্ল হয়ে বল্লেন, থানার লোক আপনারা? আপনারা এসেছেন খুব ভালো হয়েছে, এরা জোর করে আমার ভাইঝির বিয়ে দিচ্ছে এক জোচ্চোরের সঙ্গে...সব নিয়ে হাজতে পুরুন—। পুলিশ অফিসার বল্লেন—কিন্তু আপনার নামে ওয়ারেন্ট আছে। প্রয়োজনের বেশী ধান রাখা আর খুচরা পয়সা মজুদ করার জন্য সরকারের আদেশে আমরা আপনাকে গ্রেপ্তার করছি—।

ওদিকে বাসর ঘরের দৃশ্য দেখা যাক। সোনালী মাণিককে ফিস ফিস করে বল্লে, কি বিয়ের নেমতন্ন খেতে এসেছিলে বুঝি? বোকচন্দর। দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বরের গল্প শোনোনি। এই ভাবে জাল না ফেল্লে যে নলকে ধরা যায় না।

মাণিক বল্লে, কিন্তু এ খেলায় তোমারই হার হলো। গজমতির মালা নিয়ে ওদিকে রাজপুত্তুর যে তেপান্তরের মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সোণালী মুখ টিপে জবাব দিলে,—কিন্তু আসল রাজপুত্র ঠিক পথ খুঁজে পেয়েছে।

মাণিক ও সোনালী জ্যোৎস্না-ধোওয়া রাত্রে সোনালী ধানের ক্ষেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সোনা-মাণিকের কণ্ঠে আজ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে সোনালী ফসলের গান। ওদের সোনালী স্বপন এত দিনে সফল হোলো—।

কুচবিহার রাজকীয় দুর্গোৎসবের বৈশিষ্ট্য

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ

বঙ্গদেশে সাধারণতঃ লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণপতি পরিবৃতা অতসীপুষ্পবর্ণাভা গৌরবর্ণা দুর্গা প্রতিমা সম্পূজিত হইয়া থাকে। কুচবিহার ৺মদন মোহান ঠাকুর বাড়ীতেও প্রচলিত বিধানানুযায়ী প্রসিদ্ধ শিল্পীনির্ম্মিত রাজকীয় প্রতিমা পূজিত হয়, কিন্তু রাজভবনের দক্ষিণে দেবীবাড়ী নামক স্থানে বর্ত্তমান রাজবংশের প্রাচীন কুলপ্রথানুযায়ী যে মহাপূজার অনুষ্ঠান হয় সে প্রতিমা রক্তবর্ণা সুবিশাল, আকারে ও ভঙ্গিমায় অনেক বিভিন্ন। এ মূর্ত্তির সহিত জড়িত আছে পুণ্যশ্লোক রাজবংশের এক অলৌকিক সাধন-কাহিনী। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বালক-সাধক শিশু ও বিশু ধূলিখেলার ছলে শুষ্ক ময়না বৃক্ষের শাখায় দেবী কল্পনা করিয়া পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে—শিশু-সাধকের অকৃত্রিম ভক্তি আকর্ষণে ময়না-শাখায় আবির্ভূতা হইয়াছিলেন লীলাময়ী জগদম্বিকা!—শুষ্ক ময়নাশাখা হইয়াছিল নব পত্রপল্লবে সুশোভিত। সেই হেতু ময়নাশাখায় শক্তি স্থাপন করিয়া এই প্রতিমা অদ্যাপি নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

কথিত আছে একদা বালক শিশু ও বিশু তাঁহাদের ক্রীড়াসঙ্গীগণসহ অরণ্য মধ্যে একটি শুষ্ক ময়নাবৃক্ষের মূলকে দেবী প্রতিমা কল্পনা করিয়া অরণ্যজাত ফলপুষ্পাদি সংগ্রহ করণান্তর পূজায়োজন করেন। কেহ পূজারী, কেহ বাদ্যকর, কেহ পাঁঠা, প্রভৃতি নির্ব্বাচন করিয়া বিশু (বিশ্বসিংহ) স্বয়ং বলিদানকারীরূপে বীরণ অর্থাৎ বেণাগাছের পাতার (মতান্তরে কুশপত্র) খড়্গ দ্বারা সঙ্গী ছাগকল্পিত বালকের গলদেশে আঘাত করিবামাত্র মহামায়ার মায়ায় বালকের মস্তক দেহবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে! উষ্ণ শোণিতধারে ময়নামূল সিক্ত হয়—সদ্যছিন্ন বালকেরমুণ্ড বিশ্বসিংহ কর্ত্তৃক ময়নামূলে প্রদত্ত হইবামাত্র শুষ্ক ময়নাবৃক্ষ নবপত্রপল্লবে সুশোভিত হইয়া পড়ে!—আদ্যাশক্তি আবির্ভূতা হয়েন ময়নাবৃক্ষে!—'পুরুষ পরম্পরা রাজা হও বৎস!'—অভয়া অভয়বরে আশীর্ব্বাদ করণান্তর অন্তর্হিতা হইলেন।

অতঃপর সেই দেবীমূর্ত্তি প্রকট হইয়াছিলেন অপর এক শুভ মহামুহূর্ত্তে—আমাদের এই পবিত্র রাজবংশের মহাভাগ্যবান রাজানুজ শুক্লধ্বজের নয়নে।—নরশ্রেষ্ঠ নরনারায়ণ কনিষ্ঠ মহাবীর শুক্লধ্বজের (চিলারায়ের) সহায়তায় দেশমাতৃকার মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন—একবৃন্তে প্রস্ফুটিত পুষ্পযুগলবৎ এই দৈবীশক্তিসম্পন্ন ভ্রাতৃদ্বয় আদ্যাশক্তি দশভূজা প্রদত্ত অসিধারণ করিয়া যে রাজ্য আক্রমণ করিতেন, তথাকার রাজলক্ষ্মী সহাস্যবদনে বীর ভ্রাতৃযুগলের গলে বিজয়মাল্য পরাইয়াদিতেন!—পূর্ব্বদিকে আসাম, কাছাড়, মণিপুর; দক্ষিণে—বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমি; পশ্চিমে—মিথিলা; উত্তরে—হিমাচলের পাদমূল পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় প্রায় অর্দ্ধশত সামন্ত নৃপতির করগ্রাহীরূপে কুচবিহারের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন এবং মহানন্দের সেই পূর্ণ বিকাশকালে লীলানন্দময়ী মহামায়ার এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব লীলার যে অবতারণা করিয়া পবিত্র রাজবংশের পুরুষ-পরম্পরা—"বর্ষে বর্ষে বিধাতব্যং স্থাপনঞ্চ বিসর্জ্জনম্" রূপ মহাপূজার চিরপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা কল্পনাতীত কাহিনী—সংসারের পঙ্কিল বক্ষে পূত অলকনন্দা প্রবাহের সে এক অমর ইতিহাস!

সেনানায়ক যুবরাজ বীরশ্রেষ্ঠ শুক্লধ্বজ অমিত বলস্পর্দ্ধী হইলেও রামানুজ লক্ষ্মণ সদৃশ ভ্রাতৃগতপ্রাণ ছিলেন, কিন্তু মহামায়ার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াবলে এহেন মহাশক্তিধর মহাপুরুষের হৃদয়ে একদা ঘোর ভাবান্তর উপস্থিত হয়। তদীয় হৃদয় নিহিত পবিত্র ভ্রাতৃপ্রেমকে নির্জ্জিত করিয়া জাগিয়া উঠে নিষ্কণ্টক রাজ সিংহাসন লাভের অদম্য পিপাসা! দেবীপ্রদত্ত যে তরবারি অগ্রজের সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বদা কোষমুক্ত রাখিতেন আজ তদ্দ্বারা সেই চিরপূজ্য অগ্রজের মুণ্ড দেহবিচ্ছিন্ন করিয়া—নির্ব্বিরোধ রাজ্যভোগের বাসনা তাহার বলবতী হইয়া উঠিল!—সেনানায়কের কৃপাণ অস্ত্রধারণ করে তখন কার সাধ্য!—সুতরাং বীরসাজে সজ্জিত হইয়া রাজানুজ ভ্রাতৃহত্যা মানসে রাজসভায় উপনীত হইলেন।

কিন্তু এ কী! রাজ্যলোলুপ শুক্লধ্বজ সভাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া সিংহাসনে সমাসীন অগ্রজের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ মাত্র চমকিত হইলেন!—দেখিলেন—'দশভুজে দশপ্রহরণ ধারিণী জগজ্জননী মহারাজকে অভয় ক্রোড়ে ধারণ করিয়া অভয়ারূপে বিরাজমান! মায়ের বহ্নিজ্বালা-প্রদীপ্ত ভ্রূকুটি-কুটিল নেত্রপ্রান্তে পুঞ্জীভূত বিদ্যুচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইয়া যেন শুক্লধ্বজকে নিমেষ মধ্যেই অভিভূত ও নিস্তেজ করিয়া ফেলিল। শিথিল হস্ত হইতে দেবীপ্রদত্ত অসি সশব্দে ভূপতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বাত্যাহত বৃক্ষের ন্যায় তাঁহার মোহাবিষ্ট বিশাল বীরদেহ ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

এবম্বিধ আকস্মিক দুর্ঘটনায় মহারাজ ও সভাসদবর্গ নিতান্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। মহারাজ তৎক্ষণাৎ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ভূলুণ্ঠিত ভ্রাতার মস্তক ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া শুশ্রূষায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। চৈতন্য লাভের পর মহারাজের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে এই আকস্মিক মূর্চ্ছার কারণ যাহা অগ্রজ সদনে অকপট চিত্তে আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিলেন—তাহা শ্রবণ করিয়া মহারাজ পরম বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে বলিলেন - ভাই তুমিই এই রাজসিংহাসনের যথার্থ সুযোগ্য পাত্র। মহাভাগ্যবান্ তুমি—অমর-বাঞ্ছিত মাতৃমূর্ত্তি নর-নয়নে দর্শন করিয়া ধন্য হইলে—আর মাতৃ-ক্রোড়ে অবস্থান করিয়াও আমি সে সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত হইলাম। অতএব রাজ্য ধন সমস্ত তোমার রহিল, অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া আমি এই পাপ জীবনের অবসান করিব।

রাজসভা ত্যাগ করিয়া মহারাজ গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ভিতর হইতে দ্বারের অর্গল বন্ধ করিলেন। নিরবচ্ছিন্ন তিনদিন অনাহারে চিন্তামণীর চরণ চিন্তায় অতিবাহিত করার পর ক্লিষ্ট দেহমন লইয়া নিশাযোগে ঈষৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন হইবামাত্র তদীয় শয়নকক্ষ সহসা যেন স্বর্গীয় বিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল!—মহারাজ অর্দ্ধোন্মীলিত নয়নে দেখিতে পাইলেন,—চণ্ডিকা রক্তবর্ণা দশভুজা রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সুস্মিত মধুর স্বরে বলিলেন,—বৎস! তুমি আমার পরম প্রিয় একনিষ্ঠ সাধক,—তোমার পবিত্র বংশে আমার পূজা প্রবর্ত্তনের জন্যই আমার এই লীলার অবতারণা। আজ আমাকে যে মূর্ত্তিতে দর্শন লাভ করিলে, অবিকল এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তুমি ও তোমার বংশধরগণ বর্ষে বর্ষে আমার অর্চ্চনা করিবে।

সৌন্দর্য্যের সহিত বিভীষিকার কী অপূর্ব্ব সমাবেশ সে মাতৃমূর্ত্তিতে! মৃত্যুর অভিনয়ে অমৃত-নিস্যন্দিনী হাস্যরেখা মায়ের অধরপ্রান্তে—বিশ্বধ্বংসী শূলের সহিত বরাভয়করের কী মমতাময়ী পরিকল্পনা! সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণপতি নাই—শক্তিভূতা সনাতনী

কুচবিহার রাজকর্তৃক পূজিত দেবীমূর্ত্তি।

জগজ্জননীর নিত্যসহচরী জয়া ও বিজয়া নাম্নী সখীদ্বয় উভয়পার্শ্বে দণ্ডায়মানা।—মোহ-মহিষাসুরের কণ্ঠ-বিনিষ্ক্রান্ত অসুরের দক্ষিণ বাহু সিংহবাহিনীর সিংহকর্তৃক আক্রান্ত। মুক্ত বামহস্ত দর্শনে মহারাজ ভীত হওয়ায় উহা একটি অনুরূপ ব্যাঘ্র-দংষ্ট্রায় আবদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান করিয়া অনন্তরূপিণী অন্তর্দ্ধান হইলেন।

শ্রাবণ মাসের শুক্লা অষ্টমীতে রাজকীয় জায়গীরদার কর্ম্মচারী একটি সুলক্ষণাক্রান্ত ময়নাবৃক্ষের শাখা আহরণ করিয়া পরিমিত মাপে ছেদন করে, ইহাকে শক্তি বা কীলক বলে।* উহা নব বস্ত্রাবৃত করিয়া রাজপুরোহিতের বাড়ীর সন্নিকটে পূজার্চ্চনা দ্বারা অভিমন্ত্রিত করা হয়। সন্ধ্যা সমাগমে সেই যুগ রাজগুরুর বাটীর সম্মুখে আনীত হইলে দ্বার বক্সী মহাশয় ৺মদনমোহন ঠাকুরবাড়ী হইতে রাজৈশ্বর্য্য পরিবৃত শোভাযাত্রা সহকারে তথায় উপনীত হইয়া যুগ স্পর্শ করেন, অনন্তর বংশ-নির্ম্মিত দোলায় বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া বাহকদ্বারা সেই যুগ ৺মদনমোহন ঠাকুর বাড়ীতে আনয়ন করা হয়। তথায় এক মাস প্রত্যহ অর্চ্চনা করিয়া মাসান্তে রাধাষ্টমীর দিন প্রত্যুষে মঙ্গল বাদ্যাদি সহযোগে উহা দেবীবাড়ীতে দুর্গামন্দিরে আনীত হইয়া থাকে। তৎপর দিবা আট নয় ঘটিকার সময় দ্বারবক্সী মহাশয় সমভিব্যাহারে এক বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে ৺মদনমোহন ঠাকুরবাড়ী হইতে 'হনুমান দণ্ড' তথায় আনীত হয়, অনন্তর যুগকে মহাস্নান করাইয়া 'কর্ত্তাকুমারের' দ্বারা উহা পাদপীঠে সন্নিবদ্ধ করা হইয়া থাকে। শিমুল কাষ্ঠ নির্ম্মিত এই পাদপীঠকে 'ধরম পাট' বা ধর্ম্মপাট বলে। যুগ স্থাপনান্তর মাল্যচন্দন দান, পূজা বলি প্রভৃতি সুসম্পন্ন হইলে 'হনুমান দণ্ড' পুনর্ব্বার শোভাযাত্রা সহ ৺মদনমোহন ঠাকুরবাড়ীতে প্রেরিত হয়। যুগ স্থাপনের পর তথায় প্রত্যহ অর্চ্চনা এবং ত্রিরাত্র পর তদুপরি প্রতিমা নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইয়া থাকে। বংশপরম্পরা প্রচলিত জায়গীরদার চিত্রকর দ্বারা প্রতিবৎসর একই মাপে, একই ভাবে, একই বর্ণ ও গঠন ভঙ্গিমায় দেবীর মৃন্ময়ী বিরাট মূর্ত্তি প্রথমাবধি নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে।

স্বর্গীয় পুণ্যব্রত মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে দেবীবাড়ীতে বর্ত্তমান ইষ্টক নির্ম্মিত সুবৃহৎ দুর্গামন্দির নির্ম্মিত হয়। তৎপূর্ব্বে তথায় প্রতিবৎসর পূজাগৃহ নির্ম্মাণ করা হইত, তাহাতে উড়ুন বৃক্ষের একটি থাম প্রাচীন প্রথানুযায়ী স্তম্ভ রোপণ করিয়া তদুপরি গৃহারম্ভ করা হইত; উহাকে 'দেও-পোয়া' বলা হয়; সেই প্রাচীন প্রথা রক্ষার নিমিত্ত এখনও যুগ স্থাপনের পূর্ব্বে মন্দির মধ্যে 'দেওপোয়া' স্তম্ভ স্থাপন করা হয়।

মহালয়া অমাবস্যার পর শুক্লা প্রতিপদের দিন হইতে দেবীর কল্পারম্ভ অর্চ্চনা আরম্ভ হয়। দ্বিতীয়ার দিন প্রাতে বিপুল জনসমাগমে রাজৈশ্বর্য্য ভূষিত রাজছত্র, চামর, ব্যজন, হনুমান দণ্ড প্রভৃতি এবং নাগড়া, নিশান, হস্তী, অশ্ব, পদাতি সম্মিলিত শোভাযাত্রা ৺মদনমোহন ঠাকুরবাড়ী হইতে দেবীবাড়ীতে উপনীত হয়। দ্বারবক্সী কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত রাজগণমণ্ডলী রাজকীয় হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া এই সময় পূজাক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েন। পূজান্তে বিশিষ্ট রাজপরিবার কর্ত্তৃক পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করার প্রথা ছিল, বর্ত্তমানে পুরোহিত কর্ত্তৃক উহা সম্পন্ন হয়। অনন্তর প্রতিমাকে মাল্যচন্দন উৎসর্গ করিয়া দ্বারবক্সী মহাশয় কর্ত্তৃক সমাগত রাজগণবর্গকে এবং চোপদার কর্ত্তৃক রাজ অমাত্যগণকে মাল্যচন্দন প্রদত্ত হইয়া থাকে। অদ্যকার এই অনুষ্ঠানে প্রতিমার সম্মুখে স্থাপিত তাম্রকুণ্ডস্থ জলে প্রতিবিম্বিত দেবীমূর্ত্তি দর্শন করাই মুখ্য-প্রক্রিয়া,

*জনসাধারণ ইহাকে যুগ বলে।

তজ্জন্য ইহাকে **দেওদেখা** বলে। বর্তমানে এই প্রথা লোপ পাইলেও অনুষ্ঠানটির নাম তাহাই রহিয়াছে। দ্বিতীয়ার দিন হইতে এখানে অষ্টাহব্যাপী বৃহৎ মেলা বসে। এই রাত্রিতে রাজগণ এবং নিমন্ত্রিত 'কার্জী' 'কুমর' প্রভৃতির ভোজ হইত, দ্বারবক্সী মহাশয় তাহার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, ভোজন শেষে দধি, সন্দেশ তিনিই স্বহস্তে পরিবেশন করিতেন। গত তিন বৎসর হইতে এই ভোজের প্রথা রহিত হইয়াছে। রাত্রিযোগে হনুমান দণ্ড শোভাযাত্রা সহ পুনরায় ৺মদনমোহন ঠাকুরবাড়ীতে প্রেরণ করা হয়।

ষষ্ঠীতে বিল্ববরণ অনুষ্ঠানে 'জায়গীরদার' এক বৃন্তে যুগ্ম বিল্বফল কয়েকটি সংগ্রহ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাজগুরুর বাড়ীর সম্মুখে আনয়ন করিলে ৺মদনমোহন ঠাকুরবাড়ী হইতে শোভাযাত্রা সমভিব্যাহারে দ্বারবক্সী মহাশয় তথায় উপস্থিত হইয়া যুগ্ম বিল্বফল স্পর্শ করেন, অনন্তর উহার একযোড়া ফল ৺মদনমোহন ঠাকুর বাড়ীতে দেবীপূজার জন্য প্রেরিত হয়, অবশিষ্ট ফল দেবীবাড়ীতে লইয়া গিয়া বিল্ববরণ ও সায়ং আমন্ত্রণাধিবাসাদি অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ অথবা বৃহন্নন্দিকেশ্বরোক্ত দুর্গাপূজাপদ্ধতি হইতে এই পূজাপদ্ধতির কথঞ্চিৎ ইতরবিশেষ আছে। মহামহোপাধ্যায় সভাপণ্ডিতগণ পরিবেষ্টিত কলির বিক্রমাদিত্য জ্ঞানবীর মহারাজ নরনারায়ণ তদীয় পণ্ডিতমণ্ডলী সহ মীমাংসা পূর্ব্বক পুরাণ ও তন্ত্রাদির সুসমঞ্জস মত গ্রহণ করিয়া যে পদ্ধতি প্রণয়নের আদেশ করিয়াছিলেন তদনুযায়ী অদ্যাবধি মায়ের অর্চনা হইয়া আসিতেছে।

সপ্তমী পূজার পূর্ব্বে প্রাচীন প্রথা রক্ষার জন্য পূজাবেদীতে প্রতিমা কিঞ্চিৎ স্থানান্তরিত করা হয়, যেহেতু বর্তমান ইষ্টক নির্ম্মিত দেবীমন্দির নির্ম্মাণ হইবার পূর্ব্বে অন্য একটি গৃহে প্রতিমা নির্ম্মিত হইত, সপ্তমী পূজার দিন প্রতিমা তথা হইতে আনয়ন করিয়া পূজা বেদীতে স্থাপন করার প্রথা ছিল। বর্তমানে দেবী মন্দিরেই প্রতিমা নির্ম্মিত হয় সুতরাং প্রথা রক্ষার জন্য কিঞ্চিৎ স্থানের পরিবর্তন করা হইয়া থাকে। অতঃপর সপ্তমী পূজার অনুষ্ঠান রাজসিক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। পূজার ধ্যানমন্ত্র ধ্বনিত হয়ঃ—

'জটাজূটসমাযুক্তা, অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা, ত্রিনয়না, তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা, পদ্মেন্দুসদৃশাননা, নবযৌবনসম্পন্না, সর্ব্বাভরণভূষিতা, সিংহবাহনা, দশবাহুসমন্বিতা, ত্রিশূল-খড়্গ-চক্র-বাণ-শক্তি-খেটক-ধনু-পাশাঙ্কুশ-পরশু-বিভূষিতা-উগ্রচণ্ডাদি নায়িকাবেষ্টিতা মহিষাসুর মর্দ্দিনী।' স্বরূপা জগজ্জীব বিজয়োন্মাদিনীরূপের অনুরণনা। (১)

মহাষ্টমীতে অষ্টপ্রহর পূজা ও অগণিত বলিদান হইয়া থাকে। অদ্যকার দিনেও শোভাযাত্রা সহযোগে ৺মদনমোহন ঠাকুরবাড়ী হইতে হনুমান দণ্ড দেবীবাড়ীতে আনীত হয় ও তিথিবিহিত সন্ধিপূজা, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বিধানে সুসম্পন্ন হয়। সন্ধ্যারাত্রির পর অদ্যও এখানে রাজগণ প্রভৃতির একটি ভোজ প্রথা প্রচলিত ছিল, ইহাও তিন বৎসর হইতে রহিত হইয়াছে। অতঃপর মহানিশা-মুহূর্তে 'নিশাপূজা' বা 'গুপ্তপূজা' নামক একটি আনুষঙ্গিক পূজানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। কামসেনাইত নামক পদবীধারী এই পূজার আয়োজন শেষ করিয়া দিয়া বাহিরে

---

(১) দ্বারবক্সী মহাশয়ের সৌজন্যে কতকগুলি প্রথা ও জেঙ্কিন্স স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত অজিতনাথ চক্রবর্তী এম-এ মহাশয় হইতে এই ধ্যানমন্ত্রটি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

যায়, পূজাবালে কেবল পুরোহিত ও ঝারবক্সী এই দুইজন মাত্র উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য সম্পন্ন করেন। পূজাকালে মণ্ডপের চতুর্দ্দিক বস্ত্রাবেষ্টনে পরিবেষ্টিত করা হয়। সেই সময় পার্শ্ববর্ত্তীস্থানে জায়গীরদারদ্বারা 'চালিয়াবাড়িয়া' নামক অপর একটি আনুষঙ্গিক পূজা প্রাচীন প্রথানুযায়ী সম্পন্ন হয়। এই দিনে হনুমান দণ্ড, ছত্র ও নিশান পূজা হইয়া থাকে; অনন্তর রাত্রিতেই শোভাযাত্রাসহ হনুমানদণ্ড ৺মদনমোহন ঠাকুরবাড়ীতে প্রেরিত হয়। জগজ্জননীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ মহাষ্টমীতে রাজসিংহাসন রাজ-প্রাসাদ হইতে দেবীবাড়ীতে আনীত হইয়া থাকে।

মহানবমীতে রাজসিক বিধানে মহাপূজা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

দশমীর দিন অতি প্রত্যুষে দেবীবাড়ী হইতে প্রতিমার সম্মুখস্থ ঘট রাজপ্রাসাদের পুরোভাগে লইয়া গিয়া পূজামণ্ডপে স্থাপন করা হয় অপরাজিতা পূজাদি সম্পন্ন করা হয়, সুতরাং দেবীবাড়ীতে দশমীবিহিতপূজানুষ্ঠান হয় না। অপরাজিতা পূজান্তে 'যাত্রা' দর্শন উপলক্ষ্যে উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারীবর্গকে নিমন্ত্রণ করা হয়। সুসজ্জিত হস্তী, অশ্ব, পদাতিক সৈন্য প্রভৃতি সমবেত হইয়া 'যাত্রা' দর্শন স্থানকে সৌষ্ঠবসমৃদ্ধ করিয়া তোলে। পূজান্তে রাজকোষাগারে (তোষাখানায়) রক্ষিত আদিমকালের ঢাল, তরবারি, স্বর্ণনির্ম্মিত দোয়াত, কলম, দর্পণ ও বিবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্য সুসজ্জিত ভাবে স্থাপিত ও অর্চ্চিত হইয়া থাকে। অনন্তর রাজকর্ম্মচারীবর্গকে সেই সকল দর্শন করিতে হয়। এই সময়ে রাজপুরোহিত কর্ত্তৃক মন্ত্রপূত খঞ্জন পক্ষী অতি সাবধানে ছাড়িয়া দেওয়া হয়; কাড়িপদবীধারী জায়গীরদার দ্বারা উক্ত খঞ্জন পক্ষী ধৃত ও আনীত হইয়া থাকে। অতি প্রাচীনকালে স্বয়ং মহারাজ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মন্ত্রপূত খঞ্জন ছাড়িয়া দিতেন। খঞ্জন যে দিকে উড়িয়া যাইত মহারাজ সেই দিকেই দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া সফলকাম হইতেন। তৎপরে বহুকালাবধি ঝারবক্সী মহাশয় দ্বারা উক্ত প্রথা রক্ষিত হইয়া আসিত; সম্প্রতি দুই বৎসর হইতে স্বয়ং মহারাজ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া এই প্রথা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এই সময় কিরীচ দ্বারা একটী কুষ্মাণ্ড বলি প্রদত্ত হয়। রাজজ্যোতিষী খঞ্জনের গতিবিধি হইতে ভবিষ্যৎ ফলাফল নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

অতঃপর মায়ের বিসর্জ্জন। সহরের অন্যান্য প্রতিমাগুলি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে রাজনগরীর উপকণ্ঠস্থ তোর্ষানদীতে নৌকায় তুলিয়া সপ্তপ্রদক্ষিণ অন্তে বিসর্জ্জন করা হয় কিন্তু দেবীবাড়ীর উক্ত বিশাল প্রতিমা দশমীর দিন অতিপ্রত্যুষে খণ্ডে খণ্ডে কর্ত্তন করিয়া পূজা মন্দিরের সান্নিধ্যে তোর্ষা নদীতে নিমজ্জিত করা হইত ও সেই সময় জায়গীরদার কর্ত্তৃক নদীর ঘাটে একটি পূজাও দেওয়া হইত, কিন্তু গত বৎসর হইতে সেই বিরাট প্রতিমা বিপুল শোভাযাত্রা সহকারে বিসর্জ্জনের প্রথা শ্রীশ্রীমহারাজের ইচ্ছানুসারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দশমীর দিন প্রাতঃকাল হইতেই তোর্ষা নদীতীরে মেলা বসে ও দিবাশেষে প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখার জন্য নদীর উভয় তীরস্থ মেলাস্থানে বহু নরনারীর সমাগম হইয়া থাকে।

শ্যামলী

আবদুল করীম

কমল দীঘির কাজল জলে কলমী শাকে ভরা,
খেলার ঘরের শাক তুলতে শ্যামলী চলে ত্বরা।
আজকে তাহার মেয়ের বিয়ে বিনীর ছেলের সাথে
ওদের পাড়া এদের পাড়ায় নেমন্তন্ন তাতে।
অনেক রকম রান্না হবে অনেক রকম গান,
খেতে এসে অনেক জনে অনেক দেবে দান।
শ্যামলী চলে ভাব্‌ছে মনে বিনী বড়ই পাজী,
প্রথম প্রথম অনেক কয়েও হয়নি'কো সে রাজী।
ভা-রী তো, ইস্ হ'তো যদি সত্যি ছেলে ওটা
চেয়েই বোধ হয় বসত বিনী রাজ্য দু এক গোটা।
কোনো মতে যাক তো আগে পুতুল বিয়ে চুকে,
তার পরেতে বিনীর মাথা নোড়ায় দেব ঠুকে।
শ্যাম্‌লী চলে ঝুম-ঝুমা-ঝুম্ মলটি বাজে পায়ে,
নতুন কেনা লাল্ শাড়ীটা দুল্‌ছে পুবাল বায়ে।
মাঝ গগনে সুরুজ বাতি শ্যাম্‌লী চলে নেচে,
আ'লের পথের ভুঁই-চাপালী গায়ের পরশ দেছে।
ঠুন্-ঠুনা-ঠুন্ কাঁচের চুড়ি দুই হাতে তার বাজে,
শ্যাম্‌লী মেয়ের গান শুনে ওই কোকিল মরে লাজে।
আন্‌মনে সে গাইছিল গান বদ্যি পাড়ার মেয়ে
ওঠে তাহার গানের কলি মিষ্টি চিনির চেয়ে।
শাম্বু মামার বাড়ীর পাশের বড় বটের তলে,
দুলু, তুলু মীর্ণা সবাই আস্‌ছে দলে দলে।
হয়তো সবাই রকম রকম তরকারিতে ভরে,
বরণডালা ভর্তি ক'রে দিচ্ছে উজার ক'রে।

শ্যাম্‌লী একাই চল্‌ছে পথে কল্‌মী শাকের তরে,
পরাণটা তার শংকা ভরা দুর্-দুর্ দুর্ করে।
ভয়ের কি আর দুপুর বেলা ভয়তো ছোট ছেলের
ছিঃ ভয় কি করে শাড়ী পরা এতো বড় মেয়ের।
শ্যাম্‌লী ভাবে শ্যাম্‌লী চলে শ্যাম্‌লী গাহে গান,
গাঁয়ের ছোট আ'লের পথে জাগিয়ে রূপের বান।
কতো জনে কতো কিছুই আন্‌বে বটে সাঁচা,
মায়েরে দিয়ে করিয়ে নেয়া তৈরী কোটা-বাছা।
কলমী বোধ হয় আনবে না কেউ কেই বা জানে তাহা
সবের সেরা তরকারী সে আমিই নেব যাহা।
দীঘির ঘাটে নামলো মেয়ে ইস্ যে ভারী কাদা
শ্যাওলা পিচ্ছল পিছলে পড়ে নাম্‌তে গিয়েই বাধা।
ভিজ্‌লো শাড়ী ভাঙলো চুড়ি কাট্‌লো হাতের জোড়া
ভ্রূক্ষেপও নাই ডাল ধরে সে টান্‌লো ডালের গোড়া।
কই—আসে তা—এতো টানেও এগিয়ে এলো মেয়ে
কানের গোড়ে পূবের বাতাস একটু গেল গেয়ে।
যা-ই এগুলো ওমনি মেয়ে কাদার মাঝে পড়ে
একটি পা'রে ছাড়তে গিয়ে আরেকটিরে ধরে।
লতার সাথে যুদ্ধ করে জলের সাথে কতো,
দুলু, তুলু কেউ পারে না যুঝ্‌তে তাহার মতো।
শ্যাম্‌লী মেয়ের মুখ শুখাল—হ'লো কেমন ধারা,
উঠ্‌তে গিয়ে তলায় শুধু যায় বুঝি সে মারা।
যুদ্ধ যতোই করলো মেয়ে বিফল গেল সবি,
একটু দেখে লুকায় মেঘে দুপুর বেলার রবি।
জান্‌লো না কেউ দেখলো না কেউ দিন দুপুরের মাঝে
শ্যাম্‌লী মেয়ের বিশ্বখানি কোন অতলে রাজে।

উপনদী

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৩)

সুলেখার ঘরখানি একেবারে আড়ম্বরহীন। ওপাশে একখানি ক্যাম্প খাট, তাহাতে অতি সাধারণ শয্যা—মাঝখানটা একদম ফাঁকা। আর আসবাবের মধ্যে একখানি ডেকচেয়ার, গোটা দুই বেতের মোড়া। আর ওদিকে ছোট একটি রাইটিং টেবিল, আর সামনে শুধু মাত্র একটি কুশন চেয়ার। সেই টেবিলের 'পর ছোট একটা টাইমপিস্—দেওয়ালে কোন ফটোর বালাই নাই শুধু রবীন্দ্রনাথ আর বার্নার্ডশএর দু'খানি প্রতিকৃতি, আর মুকুল দের আঁকা একখানি মাত্র ল্যাণ্ডস্কেপ। হ্যাঁ—আর একটু বৈচিত্র্য আছে—লক্ষ্য করিবার আর একটি বস্তু হইতেছে ঘরের কোণে ছোট একটি বুকসেল্‌ফ—তাহাতে খানকয়েক দেশী এবং বিদেশী বই।

অশোক দৃষ্টির এক লহমায় এগুলি দেখিয়া লইল।

সুলেখা ডেক চেয়ারটি ছড়াইয়া দিয়া কহিল—বসো অশোক একটু চায়ের ব্যবস্থা করি আগে।

সুলেখা ওপাশের ঘরে চলিয়া গেল সেটা রান্না ঘর।

অশোক দেখিল সুলেখার পদক্ষেপে ক্লান্তির রেশ জড়ানো। আর অত্যন্ত ফিকে পাতলা ধোঁওয়াটে রঙের একখানি শাড়িতে সেদিনের লেখাদিকে আজ যেন অত্যন্ত করুণ বলিয়া বোধ হইতেছে।

সুলেখা ষ্টোভ আর চায়ের সরঞ্জাম লইয়া পুনরায় এঘরে ফিরিয়া আসিল।

ষ্টোভে পাম্প করিতে করিতে সুলেখা কহিল—চায়ের সঙ্গে একটা ডিম ভেজে দিই—কেমন?

অশোক খুসি মনে স্বীকৃতি জানাইল। পরক্ষণেই আবার লৌকিকতা প্রকাশ করিয়া কহিল—কিন্তু আপনাকে ভারী ক্লান্ত দেখাচ্ছে লেখাদি। কেন আবার মিথ্যে মিথ্যে এসব হাঙ্গাম করতে গেলেন?

—ছোট ভাইয়েদের জন্যে একটু আধটু হাঙ্গাম করতে হয় বৈকি!

সুলেখা আর একবার ক্লান্তির হাসি হাসিল।

অশোক ঘর সংসারের প্রসঙ্গ তুলিল—রান্নাবান্না কী সব স্বপাকেই করেন নাকি?

সুলেখা কহিল—না, অতখানি নিষ্ঠা এখনও অবিশ্যি আনতে পারিনি। রান্নার একটা লোক আছে, তবে রান্না ছাড়া আর সব কাজে সে বেশ স্মার্ট।

অশোক হাসিল।

—কিন্তু এমনিভাবে কেমন করে থাকেন? এমনি একা? এখানকার আর সব মিস্‌ট্রেস্ তাঁরা তো শুনি খুব সোশ্যাল। আপনার সম্বন্ধে এ বিষয়ে কিন্তু এখানে সকলেই অভিযোগ প্রকাশ করেন যে আপনি কারুর সঙ্গেই মেশেন না

—সেটা বদনাম না হয়ে আমার কাছে কিন্তু সুনামের সামিল হয়েছে। সত্যিই আমি কারুর সঙ্গে মিশিনে। আর সেই জন্যেই আমার নামে এখনও পর্যন্ত কোন উড়ো চিঠি এসে পৌঁছায়নি। এমন কি সেক্রেটারীর ছেলের অন্ন-প্রাশনে যোগদান না করলেও কোন হাঙ্গাম বাধেনি।

অশোক কহিল—আপনি ক্লান্তি বোধ করেন না? 'বোরিং' লাগে না আপনার এমনি একা একা?

—না, বেশ লাগে আমার। এইতো বেশ ভালোই আছি। কোন অসুবিধেই বোধ করিনে।

তারপর উভয়েই খানিকক্ষণ চুপচাপ রহিল সুলেখা ষ্টোভে চায়ের জল চাপাইয়া দিয়া একটি কাপে ডিম ভাঙ্গিয়া পিঁয়াজ, আদা এবং কাঁচালঙ্কার কুচি দিয়া নিবিষ্ট চিত্তে ওমলেট্ তৈয়ারী করিতে লাগিল

অশোক দেখিতেছিল—যৌবনের উচ্ছ্বাস বয়সের গাম্ভীর্যে তাহার এখনও একেবারে মরিয়া যায় নাই। লেখাদিকে তরুণী নারীর এই ভঙ্গীতে যে চমৎকার মানাইয়াছে।

বাহিরে ঘন সন্ধ্যার নিবিড়তা। জানালা দিয়া যে দিগন্তের ছবি চোখে পড়ে সেখানে শুধু অস্পষ্ট অন্ধকার। অদূরে ঝিল্লীর একটানা ঝঙ্কারকে ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে শৃগালের দু'একটা ডাক শোনা যায়

অশোকের যেন কবিত্ব করিতে ইচ্ছা করিতেছে।

চায়ের কাপে উত্তপ্ত 'লিকার' ঢালিতে ঢালিতে সুলেখা প্রশ্ন করিল—মৃন্ময়ীকে আজ দেখতে গিয়েছিলে? কেমন আছে সে?

—ভালোই। আর দু'একদিনের মধ্যেই অন্নপথ্য করবে।

—ভারী ভোগে মেয়েটা। এই ছ'মাসেই দেখলুম তিনবার অসুখে পড়লো।

—হ্যাঁ, ভারী ছেলেমানুষ আর অসাবধানী মেয়ে। শরীরের প্রতি একটুও যত্ন নেয় না। জ্বর হয়েছে, অথচ শুনলুম কাল নাকি কুল চুরি করে খেয়েছে!

সুলেখা হাসিয়া উঠিল।

রাইটিং টেবিলটার 'পর চায়ের কাপ আর ওমলেটের প্লেটটা রাখিয়া সুলেখা অশোককে আহ্বান জানাইল—এখানে এসো, টিপয় আমার কিন্তু নেই—এখানে বসেই খেতে হবে।

তারপর সে নিজের জন্য আর এক পেয়ালা চা লইল মাত্র।

অশোক আপত্তি প্রকাশ করিল—একযাত্রায় পৃথক ফল কেন?

ওমলেটের প্লেটটি আগাইয়া দিয়া সে কহিল—Let's share it!

সুলেখা কহিল—গেষ্ট আর হোষ্ট-এ একটু বৈষম্য থাকা উচিত এটা আমাদের প্রাচীন সভ্যতা। অতিথির প্রতি এটুকু সম্মান দেখানো কর্ত্তব্য।

অশোক হাসিয়া বলিল অতিথি অল্পেই খুসি! No formality please! আসুন, ভাগাভাগি করে খাওয়া যাক্। আর সুখাদ্যের এত ■ কার গন্ধ বেরিয়েছে তাতে একা খাওয়াটা নিতান্তই স্বার্থপরতা হবে।

সুলেখা বাধা দিল—খাওয়া সম্বন্ধে আমার ভারী বাধ্যবাধকতা। ডিসপেপ্‌টিক্ রুগী, এই চা খাওয়াটাই এখন আমার নিয়মের বাইরে। এই সময় আমি ওভ্যালটিনই খাই—অতিথি সৎকারে এটুকু ব্যতিক্রম করলুম তবু।

অশোক কহিল—তা ডিস্‌পেপসিয়ার চিকিৎসা করান না কেন?

—ডিস্‌পেপসিয়ার চিকিৎসা কিছু আছে নাকি?

—নেই? আচ্ছা আমার কথা শুনে চলুন তো দেখি কেমন না আপনাকে সারিয়ে তুলতে পারি!

—অনেক নিয়মপালন, অনেক ওষুধ-বিষুধ আর অনেকের কথা শুনেই দেখেছি ও কিছুই হয় না। তবুও তো এখন আমি অনেক বেশ ভালো। রোজ মিক অব ম্যাগনেসিয়া

খাই। কিছুদিন শুধু ডিস্টিল্ড ওয়াটারই খেতুম। দুধ খাওয়া একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি, আর সোডা খেয়ে খেয়ে হয়রান হয়ে গেছি।

সুলেখার কথায় অশোক হাসিয়া কহিল—এতো একেবারে রাজসিক চিকিৎসা করিয়েছেন। আচ্ছা আমি কিছু মুষ্টিযোগ দেবো। এক্সারসাইজ করেন? খুব ভোরে উঠে একটু ছুটুন তো দেখি!

সুলেখা হাসিয়া অস্থির—আমাকে দিয়ে তুমি একটা এক্জিবিশন খুলতে চাও কেমন? বয়েসটা কত হয়েছে জানো? এরপর বলনা কেন—আর একটু স্কেটিং করুন, আর মুগুর ভাঁজতে কষ্ট [illegible] ফ্রি হ্যাণ্ড এক্সারসাইজ

অশোক বলিল—এইতো আপনি সিরিয়স্ হচ্ছেন না। তবে দেহে রোগ পুষেই রাখতে চান?

—কি করবো বল? রোগ যদি ছাড়তে না চায় তবে তাকে একটু আশ্রয় দিতেই হয়।

—কিন্তু রোগের নিয়ম জানেন তো? ও হচ্ছে অশ্বত্থগাছের শিকড়। একবার গেড়ে বসলে সহজে তোলা যায় না!

—আচ্ছা রোগতত্ত্ব থাক! কলকাতার খবর কিছু বলো। সুইনহো ষ্ট্রীটে তোমাদের তো নিজের বাড়ী ছিল না?

—হ্যাঁ এখনও আছে।

—দক্ষিণের দাক্ষিণ্য ছেড়ে তবে এ বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছো কেন?

—পেটের দায়ে, সখ করে নিশ্চয়ই নয়।

—তোমাদের পাড়ায় আজকাল অনেক নতুন রাস্তা হয়েছে না?

—এখন আর পুরোণো দৃষ্টি দিয়ে ওসব জায়গা চেনাই যায় না।

—আজকাল আর লিখছো টিখছো না? তোমার কিন্তু গদ্য ছন্দে হাত ছিল ভালো। সঞ্জয় তোমার কবিতার খুব ভক্ত ছিল। আমাকে গোটা কয়েক কবিতা পড়িয়েছিল বটে। তোমার কি একখানা কবিতার বইও ছিল—কাগজে তার বেশ ভালো সমালোচনা দেখেছিলুম।

অশোক ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল—হাঁ। জীবনে তখন মিল ছিল তাই গদ্য ছন্দ লিখতুম। আজকাল জীবন সংগ্রামে ঠোক্কর খেতে খেতে গদ্য ছন্দ তো লিখতেই পারিনে; বরঞ্চ মাঝে মাঝে দু'একটা লঘু মিষ্টিছন্দের কবিতা লিখি বটে।

সুলেখাও হাসিল। একটুকরা ফ্যাকাশে হাসি।

অশোকের কথার মাঝে কোথায় যেন একটু ব্যথার সুর মোচড় দিয়া উঠিতেছে—সুলেখার অন্তরের গভীর তলদেশে তাহা পাক্ খাইয়া গেল, তাহার ব্যর্থ-জীবনের কারুণ্য ইহার সহিত বুঝিবা মিল খুঁজিয়া পাইতেছে।

দুজনে আবার কিছুক্ষণ চুপ্ চাপ্ বসিয়া রহিল। এত চুপ্‌চাপ্ যে সুলেখার ঘরের টাইম্‌পিস্‌টার টিক্‌টিক্ শব্দ তাহাদের সেই গভীর নীরবতার মাঝে শুধু মুখর হইয়া উঠিল।

অশোক উঠিয়া দাঁড়াইল—আজ চলি লেখাদি, বিরক্ত না হন তো মাঝে মাঝে আসবো।

সুলেখা কহিল—বেশতো, এসো না। সন্ধ্যের দিকে আমি ফ্রি থাকি। অশোক দেওয়ালে টাঙ্গানো একখানি ছবির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল—মুকুল দের 'ষ্টাডি'টা কিন্তু চমৎকার। জলের 'কলার'টা এত সুন্দর—এত স্বাভাবিক এত 'ভিভিড্' হয়েছে—কোত্থেকে ছবিটা পেলেন?

—ওটা আমার এক বন্ধু আমাকে উপহার দিয়েছিলেন।

—মুকুল দের ছবি কিন্তু আমার কাছে ভালো লাগে। বিশেষ করে ওঁর নেচার ষ্টাডি গুলি এত নীট।

সুলেখা মাথা নাড়িয়া নীরবে সম্মতি প্রকাশ করিল।

অশোক কহিল—এককালে রবি বর্ম্মার ছবির কিন্তু খুব প্রচলন ছিল।

সুলেখা বলিল—ওঁর পৌরাণিক ছবিগুলো আমার ভালো লাগে।

—আচ্ছা শ'এর পোজ টা কোথায় পেলেন? কপালের রেখাগুলিতে বুদ্ধিদীপ্ততার কি অভিব্যক্তি! লোকটা জিনিয়াস—আদর্শ পুরুষ!

সুলেখা প্রতিবাদ জানাইল—আদর্শ হয়ত না হতে পারেন তবে জিনিয়াস্—ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল জায়েন্ট। বুদ্ধির জগতে অদ্বিতীয় মানুষ।

—আর কি প্রশান্ত মূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথের। স্বপ্নবিলাসী অথচ সত্যদ্রষ্টা ঋষি। ছবিটার সমস্ত রেখায় রেখায় যেন কোমলতা মাখানো। কবি রবীন্দ্রনাথের আসল প্রতিকৃতি। আধুনিক কালে ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল রবীন্দ্রনাথের অনেক ছবি দেখি—কিন্তু এ' পোজ'টা ইউনিক্।

—হ্যাঁ, ছবিটায় কবি এবং সাধক রবীন্দ্রনাথের ছায়া আছে।

হাতঘড়িটার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অশোক কহিল—যাই, রাত হয়ে গেল। আপনাকে আর বিরক্ত করবো না। বইগুলো কিন্তু আজ আর দেখা হল না। আর একদিন দেখবো এবং পড়তে নিয়ে যাবো।

সুলেখা বলিল—নতুন বই কিছু নেই, ওসব পুরোণো। এককালে বই কেনার যখন খুব বাতিক ছিল ওগুলি তখনকার। আধুনিক জগতের সঙ্গে ওদের হয়ত তেমন মিল নেই। আর তোমার ওগুলো সব পড়া বই বোধ হয়।

অশোক কহিল—পড়াশুনা আমার বিশেষ নেই। আর যে বই ভালো তা পড়া থাকলেও আবার পড়তে ভালো লাগে। রবীন্দ্রনাথের "গোরা" যে কত বার পড়েছি "শেষের কবিতা" আজও নতুন লাগে। বই-এর অযত্ন কি বিশ্রী আমার কাছে হবে না এবং আপনি ফেরৎও পাবেন ঠিক।

—না, না! আমি সে ভেবে বলিনি। যে বই ইচ্ছে তোমার নিয়ে যাও। আর বই রাখা মানে তো পাঁচজনকে পড়িয়ে আনন্দ পাওয়া।

—হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের দেশের লোক ঘরসংসারের তুচ্ছ খুঁটিনাটি জিনিষের প্রতিও যেমন যত্ন নেয়, একখানি বইএর প্রতি তাদের সে মমতা বোধ থাকে না। ধরুন, কেউ যদি একটা কাঁচের বাসন আপনার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যায়, সেটাকে যত্ন করে যেমন ভাবে রাখবে একখানি বই নিয়ে গিয়ে সে যত্ন করবে না। বইএর ব্যাপারে অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন আমরা। পড়ে হয়ত ফেরৎ দিতেই ভুলে যাই! চাইলে হয়ত বলি—সেতো অনেক দিন হল দিয়ে দিয়েছি। কিংবা এতখানি নির্জলা মিথ্যা ভাষণে যদি আটকায় তবে হারিয়ে ফেলার জন্য লজ্জা এবং কষ্ঠা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হই। আর বই পড়ে যখন ফেরৎ দেওয়া হয় তখন দেখবেন—বই এর পাতাগুলি হয় ঠিক নেই না হয় রান্নাঘরের তেল হলুদের দাগ পড়েছে কিংবা পোকায় কেটেছে। সুলেখা হাসিয়া কহিল—তুমি এই নিয়ে একটা গল্প লেখ না কেন? বেশ ভালো স্যাটায়ার হবে'খন।

—না, না, আপনি হেসে উড়িয়ে দেবেন না—I am serious! আমার নিজের সম্বন্ধেই বলছি—এককালে অনেক লিখেছি এবং অনেক লেখা ছাপা হয়েছে। কিন্তু

একখানি কপিও আজ আর খুঁজে পাইনে। এমন ভক্তের মুখোস পরে আসে সব লেখা পড়বার জন্ম—এসে বই কাগজ নিয়ে যায়—তারপর তাদের আর পাত্তাই পাওয়া যায় না। এমনি করে আমার লেখাগুলো একে একে প্রায় সবই হারিয়ে গেছে।

—হয়ত তারা তোমার লেখার সত্যিকারের ভক্ত নয়। সে লেখা নিশ্চয়ই তাদের এমন ভালো লাগে না যায় প্রতি পড়া শেষ হয়ে গেলে তারা যত্ন নিতে পারে।

অশোক উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল—একথা লেখাদি আপনার অবিশ্যি আমি সমর্থন করি। কিন্তু আমার নিজের কাছে আমার লেখাগুলির কিছু দাম নিশ্চয়ই আছে যার জন্তে আমার মমতা বোধ তাদের প্রতি বেশি। এবং সে লেখাগুলি লিখতে আমাকে কিছু শ্রম স্বীকারও করতে হয়েছে, অনেকক্ষণ সময় কাটাতে হয়েছে।

—হ্যাঁ, তা অবিশ্যি ঠিক।

—এটা হচ্ছে সাহিত্যের প্রতি আমাদের অনুরাগের অভাব।

কথায় কথায় অশোক ঘরের বাহির হইয়া আসিল। সুলেখা আলো লইয়া দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিল।

বাহিরে অমাবস্যার অন্ধকার—পল্লীগ্রামের রাস্তায় কোন আলোর ব্যবস্থা নাই।

সুলেখা কহিল—বাইরে বেশ অন্ধকার, সঙ্গে আলো না নিয়ে যাবে কেমন করে? দাঁড়াও টর্চটা এনে দিই।

অশোক আপত্তি প্রকাশ করিল—না থাক, দরকার নেই। এইটুকু তো মাত্র রাস্তা, পায়ে পায়ে বেশ এগিয়ে যেতে পারবো।

—কেন, কষ্ট করবার দরকার কী? আজ রাত্রে টর্চের আমার কোন দরকার নেই। আর টর্চ আমি ব্যবহার করি নে বড়, সন্ধ্যে হলেই তো ঘরে এসে ঢুকি। তুমি নিয়ে যাও, কাল সময়মত ফেরৎ দিয়ে যেও।

অশোকের এবার আর আপত্তি করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। সুলেখার নিকট হইতে টর্চ লইয়া সে বাহিরের পথে পা বাড়াইল।

সুলেখা ঘরে ফিরিয়া আসিল। আজ যেন তাহার ক্লান্তি বোধ হইতেছে অত্যন্ত বেশী। হয়ত অশোকের সহিত অনেকক্ষণ বাক্যালাপে তাহার মস্তিষ্কের দুর্বল শিরাতন্ত্রী পরিশ্রান্ত হইয়াছে। অনেকদিন পরে আজ সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছে—এত কথা বলার অভ্যাস তাহার নাই।

ক্লান্ত দেহটিকে সুলেখা তাহার সুকোমল শয্যার অঙ্গে ডুবাইয়া দিল। আঃ, এতক্ষণে যেন তাহার আরাম এবং স্বস্তি বোধ হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

মনোবিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ

অধ্যাপক শ্রীপরেশনাথ ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ

মনোবিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী। প্রাণিজীবনের প্রত্যেক প্রান্তকে মনোবিদ্যা স্পর্শ করিয়াছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মনোবিদ্যাকে কিরূপ কাজে লাগানো যাইতে পারে তাহার সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব।

ফ্রয়েডের গবেষণা হইতে যে সকল যুগান্তরকারী সত্যের সন্ধান মিলিয়াছে তাহাদের মধ্যে "যাহা একবার শিক্ষা করা হয় তাহা একেবারে ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব"—এই সত্য একটি। অনেক কিছুই ভুলিয়া গিয়াছি—ইহা আপাতদৃষ্টিতে মনে হইলেও, আসলে কিছুই ভুলি নাই। বিস্মরণ মানে স্মরণের অবলুপ্তি নয়—বিনা প্রচেষ্টায় স্মরণের অসম্ভাব্যতা অর্থাৎ বিস্মৃতবস্তু নিজের অথবা বিশেষজ্ঞের চেষ্টায় স্মরণগোচর করা যায়। যাহা শিখিয়াছি অথচ মনে আসিতেছে না, তাহা মন হইতে নির্ব্বাসিত হয় নাই, মনেই রহিয়াছে। সজ্ঞান ভাবে নাই—কিন্তু মনের এমন একটি গহন কোণে রহিয়াছে যাহার ঠিকানা মিলিতেছে না। অবচেতন অথবা নির্জ্ঞান মনের মধ্যে রহিয়াছে, সজ্ঞান মনের অন্তরাল হইয়াছে; সুতরাং তাহাকে জ্ঞানের আলোকে লইয়া আসিতে পারিতেছি না, অথবা স্মরণ করিতে পারিতেছি না। কোথায় এবং কি ভাবে আপাতবিস্মৃত বিষয়গুলি অবস্থান করে সেই তত্ত্ব এস্থলে আলোচ্য নয়; তথাপি সংক্ষেপে এইটুকু বলিয়া রাখি যে আপাতবিস্মৃত বস্তুগুলি মনের দুইটি স্তবকে অধিকার করিয়া অবস্থান করে—তন্মধ্যে একটি অবচেতন এবং অপরটি অবচেতন ও সচেতন মনের মধ্যবর্তী। প্রথম স্তরে যে বিস্মৃত বস্তুগুলি অবস্থান করে তাহারা সচেতন মনে আসিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট কিন্তু যে কারণে তাহারা সচেতন মনের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অবচেতনে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল, ঠিক সেই কারণে তাহারা অবচেতনের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সচেতনে পৌঁছাইতে অক্ষম। ফ্রয়েড্ বলেন আমাদের বিস্মৃতি স্বেচ্ছামূলক অর্থাৎ ইচ্ছা করিয়াই আমাদের অধিগত জিনিষগুলি আমরা ভুলিয়া যাই। যেরূপ আমরা আমাদের দেনা ভুলিয়া যাই কিন্তু পাওনা ভুলিনা। অথবা ফ্রয়েডের ভাষায় আমাদের চেক্ প্রায়ই বিলম্বিত হয় কিন্তু বিল ত্বরান্বিত হইয়া থাকে।

অবচেতনে আশ্রিত বস্তুগুলি আমাদের অজ্ঞাতসারে নানাপ্রকারে সচেতনে প্রকাশিত হয়—কিন্তু সেই প্রকাশে তাহাদের স্বরূপ লুক্কায়িত থাকে এবং তাহারা বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়। তাহাদের স্বরূপ কদাচিৎ—যেমন শিশুর স্থলে—সচেতন মনে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। অবচেতনের আশ্রিত বস্তুগুলির স্বরূপ জ্ঞানই প্রকৃত আত্মজ্ঞান। এই জ্ঞান সম্যগ্‌ভাবে নিজের চেষ্টায় লাভ করা সহজসাধ্য নয়, বরং অসম্ভব। মনঃসমীক্ষণকারী অথবা সাইকোএ্যানালিষ্টের সাহায্যে তাহাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় এবং মানুষ আত্মজ্ঞান ও আত্মশক্তি লাভ করিয়া সার্থক হয়।

পক্ষান্তরে অবচেতন ও সচেতন মনের মধ্যবর্তী স্তরটি—ফ্রয়েড যাহার নাম দিয়াছেন 'প্রিকনসাচ'—এমন সব সদ্যবিস্মৃত বস্তুর আশ্রয়স্থল যাহারা সামান্য মাত্র চেষ্টায়ই স্মৃত হইতে পারে। পাঁচবৎসর বয়সের পূর্ব্বের শৈশবের ঘটনাগুলি আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই, এই ঘটনাগুলি মনে করিতে হইলে আমাদের চেষ্টা যথেষ্ট নয়, কিন্তু

বিশেষযত্নের চেষ্টা অথবা সাহায্যসাপেক্ষ। কিন্তু এইমাত্র যাহা ঘটিয়া গেল অথবা কাল যাহা ঘটিয়াছে তাহা বর্ত্তমানে সচেতন মনে অবস্থান না করিলেও সামান্য চেষ্টায়ই আমরা ঐ ঘটনা স্মরণ করিতে পারি।

উপরোক্ত তথ্যগুলি গভীর গবেষণা এবং মননসাপেক্ষ। কিন্তু শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের শিক্ষালব্ধ বিষয়গুলি ভুলিয়া যাওয়া সর্ব্বাপেক্ষা পীড়াদায়ক। শিক্ষালব্ধ বিষয়গুলির বিস্মৃতি ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। যেমন কেহ কেহ তারিখ ভুলিয়া যান, আবার কেহ কেহ বা নাম—ব্যক্তিবিশেষেরই হউক বা স্থানবিশেষেরই হউক—ভুলিয়া যান।

নাম ভুলিয়া যাওয়া বর্ত্তমান লেখকের একটি বিশেষ দুর্ব্বলতা। এই কারণে কিছুদিন ধরিয়া অবসর পাইলে বিস্মৃতনামের উদ্ধার আমার নিকট একটি কৌতুকে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বিস্মৃতি বলিয়া কোন জিনিষ নাই, বিস্মৃতি মানেই আপাতবিস্মৃতি; স্মরণের পথ বাহিয়া ধৈর্য্য সহকারে অগ্রসর হইলে সেই পথ গন্তব্যস্থানে লইয়া যায় এবং বিস্মৃত নাম অথবা অন্যবস্তু অনায়াসে স্মরণে আসে। শিক্ষার্থীরা যদি স্মৃতির এই সংরক্ষণ-শীলতা অথবা 'কনজারভেশন অফ্ মেমরি' সম্বন্ধে বিশ্বাসী হইয়া বিস্মৃত বস্তুকে স্মরণপথে লইয়া আসিবার মনোবিদ্যা প্রদর্শিত উপায়ে চেষ্টা করেন তবে তাঁহারা যে কৃতকার্য্য হইবেন এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নিজের অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষালব্ধ কয়েকটি উদাহরণ দিয়া বক্তব্য বিষয়টি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি।

১। ১লা অক্টোবর '৪৪ তারিখে বৈকাল ৫টায় বৌবাজার ষ্ট্রীটের দক্ষিণ ফুটপাথ দিয়া কলেজ ষ্ট্রীটে অগ্রসর হইতেছি। আমার অন্য ফুটপাথ দিয়া বিপরীতগামী একটি ইয়োরোপীয় বেশধারী ভদ্রলোকের মুখ আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিল। আমাদের এমন ভাবে দৃষ্টি বিনিময় হইল যেন আমরা কতকাল ধরিয়া পরিচিত। যেন বহুপরিচিত মুখ—অথচ কোনক্রমেই স্মরণ করিতে পারিতেছি না ঐ ভদ্রলোকটি কে এবং কোথায়, কোন্ সূত্রে, কবে তাঁহাকে দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার দর্শনমাত্র আমার এমন একজনের কথা স্মরণ হইল যাঁহাকে আমি শ্রদ্ধা করিয়াছি এবং যাঁহার সঙ্গ আমার জীবনের পরম স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া মনে করিয়াছি। আমার গন্তব্যস্থানে অগ্রসর হইতেছি কিন্তু অতীতের বিস্মৃতিগহ্বর হইতে এই লোকটিকে উদ্ধারের চেষ্টা অবিশ্রান্ত চলিতেছে। ঘণ্টা-খানেক পরে বাড়ীতে ফিরিয়াছি; তখনও থাকিয়া থাকিয়া এই চেষ্টার বিরাম নাই। প্রায় ২ ঘণ্টার চেষ্টায় ভদ্রলোকের ইতিবৃত্ত মনে আসিয়া গেল।

যেভাবে এই লুপ্তস্মৃতি উদ্ধার করিলাম তাহা এই। মুখখানিতে মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়া মনকে ছাড়িয়া দিলাম—আমার কোনপ্রকার কর্তৃত্ব রাখিলাম না—এইটুকু আশ্রয়ে ভর করিয়া বিস্মৃতিসাগরে ভাসিয়া চলিলাম। স্মৃতির ক্রম ও ঘটনার ক্রম ঠিক বিপরীত হইয়া গেল—উঁহাকে যে পরিবেষ্টনীতে ও যেভাবে প্রথম দেখিয়াছিলাম তাহা সর্ব্বশেষে স্মরণে আসিল এবং যে পারিপার্শ্বিকে সর্ব্বশেষ দেখিয়াছিলাম তাহাই সর্ব্বপ্রথমে স্মরণে আসিল—এই ব্যতিক্রম ছাড়া ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্য স্মরণে অক্ষুণ্ণ থাকিল।

প্রথমেই দেখিলাম কতকগুলি কাঠের আসবাবপত্র—কতকগুলি চেয়ার, বেঞ্চ—তারপরে একটি অস্পষ্ট বারান্দা শেষ হইল একটি দরজায়, যাহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল একটি প্রকাণ্ড হল—সেই হলের মধ্যে বহু লোক। একটি আদালত কক্ষের দৃশ্য। তারপর বাকী অংশগুলি অতি অল্পসময়ে সহজেই আসিয়া গেল।

এই ভদ্রলোকটি কে। তিনি একজন উকিল যিনি আমার কোন কমিউনিষ্ট বন্ধুর পক্ষে দাঁড়াইয়াছেন—এই উকিলটি নির্য্যাতিতের বন্ধু—কোন ফি না লইয়া অনেক সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করিয়া আমার নির্য্যাতিত বন্ধুকে রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট। তারপর এই ভদ্রলোকটি যেখানে বাস করেন—তাঁহার ঠিকানা ও বাড়ী—সংক্ষেপে তাঁহার সম্বন্ধে সকল স্মরণীয় বিষয় মনে আসিয়া পড়িল। এখন মনে হইল যে এই ত্যাগী উকিলটির উপর আমার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল।

ঐ ভদ্রলোকটির নাম উদ্ধার করা হয় নাই কিন্তু আমার কোনই সন্দেহ নাই যে চেষ্টা করিলে ঐ নামটিও উদ্ধার করা যাইবে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে এই স্মৃতিউদ্ধারের ঘটনাটি প্রায় ৪ মাস পরে লেখা হয় অতএব এই সময়ের ব্যবধানে লেখাটা নিখুঁত নাও হইতে পারে। আরও মনে রাখিতে হইবে ঐ ভদ্রলোকটির সহিত আমার পরিচয় ঘটিয়াছিল ১৯৪০ সালে।

২৩৩। নাম বিস্মরণে আমি সিদ্ধহস্ত একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু বিস্মৃত বস্তুর স্মরণ সম্ভাব্যতা সম্বন্ধেও আমি নিঃসন্দিগ্ধ। কেন নাম ভুলিয়া যাই তাহার বিশ্লেষণ নাই বা করিলাম তবে এই ইঙ্গিতটুকু মাত্র করিতে চাই যে আমার নিজের নামটি আমায় কোনদিনই পছন্দ হয় নাই; হয়ত অন্য নামগুলি ভুলিয়া যাওয়ার অন্তরালে নিজ নামের প্রতি বিতৃষ্ণাই কারণরূপে বিরাজিত।

যে ঘটনাদ্বয় এস্থলে বিবৃত হইবে তাহাদের তারিখও ১লা অক্টোবর, ১৯৪৪।

হঠাৎ আমার আশঙ্কা হইল যে একটি ভদ্রলোকের নাম ভুলিয়া গিয়াছি। নামটি যাহাতে না ভুলিয়া যাই তজ্জন্য নাম পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়াছিলাম—তৎসত্ত্বেও ভুল! বুঝি এই ভুলরোগের আর প্রতীকার নাই; কিম্বা প্রতীকার থাকিলেও সেটা আমার হাতে আর নাই।

নামটি মনে করিতে পারিলাম না। ভদ্রলোকটির নাম কি—এই প্রশ্নটি আমার ভাই সতীশের নাম ও তাহার ধাম—যেখানে আমি ২৮।৯।৪৪ তারিখে গিয়াছিলাম—তাহার কথা স্মরণ করাইয়া দিল। হঠাৎ আবার আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম—হায় হায়! সতীশের ভগ্নীপতির নামটিও যে ভুলিয়া গিয়াছি অথচ এই নামটি মনে রাখিবার জন্য যে কত বার আবৃত্তি করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। ভদ্রলোকের চেহারাটি স্মরণ করিয়া তাহাতে মন স্থির করিলাম। প্রথম যে নামটি মনে হইল তাহা 'বিনোদ'। এবং ঠিক পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তে ঠিক নামটি আসিয়া গেল 'বিনয় বাবু'।

কেন বিনোদ নামটি মনে আসিল। 'বি' এবং 'ন' 'বিনয়' নামেও আছে অতএব বুঝিতে হইবে যে প্রথম যাহা স্মরণে আসিল তাহা প্রকৃত স্মরণীয় নামের সহিত সাদৃশ্যবান্। কেন বিনয় নামটি ভুলিলাম এবং ভুলিয়া যাইব বলিয়া সর্ব্বদা আশঙ্কা করি? কারণ খুঁজিয়া দেখিলাম যে ঐ নামধারী কোন ভদ্রলোকের স্মরণ মাত্রই আমার পক্ষে অপ্রীতিকর; অতএব ঐ নামটি যে ইচ্ছা করিয়া ভুলিয়া যাই সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—যদিও এই ইচ্ছাটা সজ্ঞান ইচ্ছা নয়, কিন্তু অজ্ঞান এবং অবচেতন ইচ্ছা।

প্রধান সমস্যার কথা ভুলিয়া যাইবেন না। যে নামটি স্মরণ করিতে গিয়া সতীশের নামধাম মনে হইয়াছিল সেই নামটি কি ভাবে উদ্ধার হইল। সতীশের বাড়ীর পর ঠিক চলচ্চিত্রের ছায়াবৎ আমার আর কোন আত্মীয়ের বাড়ীর চিত্র সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—এই বাড়ীতে আমি সতীশের বাড়ীর পূর্ব্বে গিয়াছিলাম। এই স্থানে মন

মুহূর্ত্তমাত্র থাকিল না। এই দুইটি বাড়ী স্মরণের মধ্যবর্ত্তী সময়ে আমার বন্ধু 'ম' এর বাড়ীর একটি অতি অস্পষ্ট ছায়া দেখিলাম যেখানে খালি গায়ে আমার বন্ধু বসিয়াছিলেন এবং যে ভদ্রলোকটির নাম লইয়া আমি বিপদে পড়িয়াছি তিনি আমার সহিত কথা বলিতেছেন—কিন্তু সব কিছু অতি অস্পষ্ট, যেন দেখাই যায় না।

হঠাৎ পট পরিবর্ত্তন হইল। আমি যে ঘরটিতে ভদ্রলোকটির সহিত কথায় নিযুক্ত ছিলাম সেই ঘরটিতে যেন বাহিত হইয়া চলিয়া আসিলাম। ভদ্রলোকটির গোঁফজোড়া আমার চোখে আসিয়া ঠেকিল—যে মুখখানি দেখিলাম তাহার মত আর একখানি মুখ যেন অতি শৈশবে দেখিয়াছিলাম। নামটি তৎক্ষণাৎ মনে আসিয়া গেল—প্রভাস বাবু।

কেন এই নামটি ভুলিলাম? বিশ্লেষণ করিয়া দেখি নাই। যে মুখখানি শৈশবে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় তাহারও ঠিক এই রকম এক জোড়া গোঁফ ছিল এবং তাহাকে যমের মত ভয় করিতাম—তিনি পাঠশালার গুরু মহাশয় কি স্কুলের প্রবল পরাক্রান্ত গণিতশিক্ষক মহাশয় তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না—বোধ হয় এই দুজনের মধ্যে একজন হইবেন। যদি তাহাই হয় তবে এই নাম ভুলিয়া যাওয়া অস্বাভাবিক নয়, ইহা এমন একটি নাম যাহা কোন বিশেষ গোঁফের স্মারক, এই গোঁফটি আবার এমন কোন লোকের কথা মনে করিয়া দেয় যাহার স্মরণে আমি অদ্যাপি ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়ি। গণিত শিক্ষক আমাকে নির্য্যাতন করিতেন, কারণ আমি গণিত পারিতাম না; আর পাঠশালার গুরু মহাশয় আমার প্রতি নিষ্করুণ ব্যবহার না করিলেও, অন্যের প্রতি তাঁহার নির্দ্দয় ব্যবহারের দরুণ আমার মানসনেত্রে ভয়াল ও করালমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। অতএব এই ভদ্রলোকের নামটির বিস্মৃতি যে অজ্ঞান ইচ্ছামূলক তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই প্রকারের উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তাহা এখন থাক। বিস্মৃত বস্তুর স্মরণ চেষ্টায় এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে বস্তুটিতে মনোযোগ নিবদ্ধ করা চাই। বস্তুটির যতটুকু স্মরণ হইতেছে তাহাই প্রকৃত স্মরণীয় বস্তুর অগ্রদূত, আমাদের স্মরণপথে যাত্রা করিবার একমাত্র সম্বল। ঐ টুকুর মধ্যে নিজেকে ছাড়িয়া দিলে স্মরণক্রিয়া আপনা আপনি অগ্রসর হইতে থাকে এবং এমন স্থানে আসিয়া অবসর নেয় যেখানে লক্ষ্যবস্তু মিলিয়া যায়। আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে যতটুকু মনে আসিতেছে তাহা প্রকৃত বস্তুর ছদ্ম অথবা বিকৃত বেশ হইলেও তাহাই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং তাহা প্রকৃত বস্তুর আবিষ্কারে একমাত্র সহায়। মনের বিচিত্র ক্রিয়া পদ্ধতি, বিশেষ করিয়া অবচেতনের সক্রিয়তা এবং সমগ্র সচেতন মনকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে যতই আলোচনা করা যায় ততই বিস্ময়বিমূঢ় হইতে হয়।

একশ্চন্দ্রঃ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সাওতাল ভীল কোলে ঘেরা চারিপাশ
সেথা হেরি একঘর বাঙালীর বাস।
কোন্ সে খেয়ালী আমি ভাবি মনে মনে
বসালে অপরাজিতা মউলের বনে।
দেখিয়া লাগিছে মোর বিস্ময়কর,—
ভিখারীর ঝুলিতে এ 'রাজরাজেশ্বর'।
চীনা পালি তিব্বতী পুঁথির কি চাপ্
লামাদের মঠে এ যে বাঙলা কেতাব।

আভীরী পল্লীতে কেন সপ্ততীর্থ টোল?
রাজপুতানায় এযে জাহ্নবী-কল্লোল!
সত্যই বড় মোর লাগিছে মধুর—
বুনোদের বাঁশরীতে 'দাশুরায়ী' সুর।
চারিদিকে মাদলের ধিতাং ধিতাং
তার মাঝে কে গাইছে আগমনী গান?
খামালো এমন করে বুঝিতে না পারি
কে নিশানী, ইষ্টাসিনে নীল ডাকগাড়ী?

বাহিরে এলো না, গড়ে বনেতেই ঘর
চেনা টিয়া শিরে দিয়া সোনার টোপর।

ফাঁসি

শ্রীবিনয় সেন

স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী। আলোড়ন উঠেছে— রাজধানীর জনবহুল মাঠ, ঘাট, পিচের রাস্তা মথিত করে। দেড়শত বছর ধরে যে রীতি, সংস্কৃতি চলে আসছিল তা আজ নূতন রূপ হতে রূপান্তরিত হতে চলেছে। দুর্দান্ত ডাকাত জীয়ল মিঞার ফাঁসি হবে। শত বছর পরে ফাঁসিকে আবার শাস্তির চরম অস্ত্র বলে স্বীকার করা গেল। সহরের আশেপাশে নিরীহ অধিবাসীদের উপর এই নির্মম মনুষ্যত্বহীন লোকটি দীর্ঘ বছর ধরে করেছে ডাকাতি, অত্যাচার, খুন। নিঝুম রাত্রির জড়তাকে ছিন্নভিন্ন করে ঘরে ঘরে হানা দিত ও টাকা পয়সা গহনার লোভে। দা বসিয়ে দিত মানুষের গলায়। অশিক্ষিত নির্বোধ অধিবাসীরা হাঁটুর উপর কাপড় উঠিয়ে একটা ফতুয়া গায় দিয়ে কাটিয়ে দেয় বছরের পর বছর, কিন্তু মাটির তলে পুঁতে রেখে দেয় কলস ভর্তি টাকা, হাড়ভাংগা খাটুনির জমান রক্ত। নিজেরা কাটিয়ে দেয় দুঃখ-দৈন্যের মাঝ দিয়ে। বোকা ওরা তাই পার্থিব সুখকে অবহেলা করে নিজেদের ধ্বংস করে তিলে তিলে দারিদ্র্যের কঠোরতার মধ্য দিয়ে। জীয়ল ওদেরই একজন, একটু ভিন্ন প্রকৃতির। ওর ভীষণতা, নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতা তফাৎ করে রেখেছে ওকে ওদের মাঝ থেকে। পাঁচ বছর ও জেলও খেটেছিল কিন্তু তবুও জীয়লের শিক্ষা হয় নাই। নররক্তে হাত কলুষিত করতে জীয়লের দ্বিধা বোধ হয় নাই।

২৫শে অক্টোবর হরিরামকে খুন করার অপরাধে জীয়ল মিঞার ফাঁসি হবে।

রাজধানীতে লোকের মুখে জীয়ল মিঞার ফাঁসি ছাড়া আর কোন আলোচনা নেই। রাজনৈতিক আলোচনা, সিনেমার বক্রোক্তি সব কিছু বন্ধ করে কেবল নতুন আলোচ্য বিষয়ে সকলে মেতেছে। অনেক দিন পর সহরে যেন বেশ চঞ্চলতা প্রকাশ পাচ্ছে। সকলে বলাবলি করছে,—কোলকাতা থেকে দুজন জল্লাদ এসেছে—বিশাল ফিগার, মিশমিশে কালো চেহারা; মুখে চোখে একটা Crimeএর ছাপ সুস্পষ্ট। চাক্ষুষ কিন্তু পাঁচশতের মধ্যে একজন দেখেছে—অথচ সকলেই জাহির করছে নিজের চাক্ষুষ প্রমাণের বহর।

আশ্চর্য্য রকম ভাবে আমার কিন্তু সুযোগ হয়ে গিয়েছিল জল্লাদ দর্শনের। যদিও সেটা ফাঁসির পরে। অপরিহার্য্য কোন কারণে ধাঙড় পাড়ায় যেতে হয়েছিল। গিয়ে দেখি চারদিকে হৈ-হল্লা মাতালের মাতলামি। একটা ফাঁকা মত জায়গায় ছোকরা মত দুটি লোক মাটিতে জোড়াসন করে বসে নানারূপ ফুল নিয়ে নাড়াচাড়া করে কি যেন মন্ত্রের মতন আওড়াচ্ছে আর পাশে একটা পাত্রে ফুলগুলি ভিজাচ্ছে। পাত্রের মধ্যে মুরগীর রক্ত আছে। কাছেই দেখলাম তিন চারটা মরা মুরগী মুণ্ডহীন অবস্থায় নিঃসাড় হয়ে আছে। ওদের চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে বহু স্ত্রী-পুরুষ। মুখেচোখে Crimeএর ভাব কিছুই দেখলাম না। একজনকে বয়স আন্দাজে বেশ ছোট দেখায়। আর একজনের মাথায় রাশি রাশি চুলই মুখকে যা একটু বিসদৃশ করেছে। তবে কালো বটে। মনে হল যেন ইটালিয়ান পাথর দিয়ে তৈরী ওদের দেহ। Crimeএর ভাব না থাক কিন্তু

ওদের চোখে মুখে দৃঢ়তার ভাব সুস্পষ্ট। নিটোল বাহুদ্বয় যেন কিছু সংযত। মদ খেয়ে ওরা দুজনই চুর হয়ে আছে। যেতেই বলে উঠল আমাকে—নমস্কার সার্। আমিও একটুখানি হাত উঠালাম। স্ত্রী পুরুষ নানালোক ওদের কাছ থেকে ফুল চেয়ে নিচ্ছে, কেউ কুৎসিত ব্যধি হতে নিস্তার পাবার জন্যে—কেউ নিচ্ছে সন্তান লাভের আশায়। নির্ব্বিকারভাবে জল্লাদদ্বয় দিচ্ছে ওদের হাতে মুরগীর রক্তমাখা বাসী ফুল। ধাঙর পাড়ায় তারা আজ অতিথি। আমি ওদের মুখ বেশ তীক্ষ্ণভাবেই লক্ষ্য করছিলাম। কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না শিল্পীর গড়ার মতন মসৃণ হাত দিয়ে কি করে' করে যাচ্ছে ওরা মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা? শুধু টাকার লোভেই তো করছে। হঠাৎ চমক ভাঙ্গল। ওদের মধ্য একজন বলে উঠল: বাবু হাজার চারেক টাকা দিলে আমরা ওকে বাঁচিয়ে দিতে পারতাম। পরিষ্কার চলতি ভাষায় বলল: শুধু একটা দড়ির কায়দা। হয়তো ও বুঝতে পেরেছিল আমার মনের অবস্থা। গা ঝাড়া দিয়ে উঠলাম। ও বলেই চলল: যদিও আমাদের অনেক বিপদ হবে তবুও টাকার চেয়ে কি বড় আছে পৃথিবীতে, কি বলেন। এই বলে কি রকম অদ্ভুতভাবে যেন হেসে উঠল। প্রকৃতিস্থ ওরা মোটেই নয়। কাঁচা তাড়ির তীব্র গন্ধ আমার নাকটা যেন পুড়িয়ে দিল। তাড়াতাড়ি সরে এলাম ওখান থেকে। এই জল্লাদ সম্বন্ধে কত সব বিভীষিকা পূর্ণ তথ্য রাস্তায় রাস্তায়। যদিও ওদের পুরোপুরি মানবতা আছে তা স্বীকার করা যায় না, তবুওতো ওদের এইটে ব্যবসা। নানারূপ মানুষের নানান রকম অর্থোপার্জ্জন পদ্ধতি। তবুও ফাঁসিটা চিরকালই নিন্দনীয় সুতরাং জল্লাদবৃত্তিও। ফাঁসির যে কেন আবার পুনঃ আবির্ভাব হল? এটা কি একজনের উপর দিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করে সমস্ত ডাকাত সম্প্রদায়কে সন্ত্রস্ত করে দেওয়া। কিন্তু শাস্তির যে রূপ ব্যাখ্যা হওয়া দরকার তাতে মানুষের মনের অপকীর্ত্তির বৃত্তিগুলি যদি নতুন ভাবে সু-পথে চালিত করতে সক্ষম না হয় তা হলে এই শাস্তিরতো কোন উপকারই নাই। এইরূপ শাস্তিতে দিনের পর দিন অত্যাচার বেড়েই চলবে। শাস্তি দিতে হবে বলেই যে তার শরীরের উপর দিয়ে অনুরূপ জঘন্য অত্যাচার করতে হবে এর কোন অর্থ নেই। অনেক সময় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাংস্কারিক শাস্তিতে এর চেয়ে বেশী উপকার হয়। তবে কঠিন শাস্তিও দেওয়া দরকার। কিন্তু এদেশের এই পাশবিক রীতিপূর্ণ ফাঁসি চিরকালই নিন্দনীয়।

এইদিকে এইরূপ জল্পনা আলোচনা আর ঐ দিকে কঠিন লৌহ খাঁচায় বসে জীয়ল মিঞার কানে মৃত্যুর তরঙ্গধ্বনি বাজছে। ফাঁসির দড়ি যেন দাগ কেটে জড়িয়ে ধরেছে জীয়লের গলায়। জীয়ল কম্বল থেকে লাফিয়ে উঠে—গলায় হাত বুলায়—না কিছুই না তো। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বের হয় না কেন? চীৎকার করে ওঠে জীয়ল—লালসিং জল দে আও।

অন্ধকার কঠিন আবরণে যেন একটি ক্রুদ্ধ পশু গর্জ্জন করে উঠল। ক্ষণিকের জন্যে শিকের বাইরে বুটের আওয়াজ থেমে যায়। একটু এগিয়ে আসে লালসিং। দেখে মেঝেতে গড়িয়ে জীয়ল ফুলে ফুলে কাঁদছে।

লালসিং বলে: কোণে জল আছে খেয়ে নিস্।

জলের পাশে ঠোঙ্গা করে অনেকগুলি মিষ্টি রয়েছে। জেলরের অর্ডারে দিয়েছে ওকে। জেলর ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল: কি কি খেতে চাস জীয়ল। জীয়ল মিঞার মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল। এক এক করে যত নাম জানা ছিল বলল জীয়ল: রাবড়ী, সন্দেশ, পানতোয়া, চমচম্, রসগোল্লা

জেলর নাম শুনে চলে যায়; কিন্তু মিষ্টিভরা ঠোঙা যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে আছে। জীয়ল স্পর্শও করে নাই—ওদিকে ওর খেয়ালই নাই। কাল ভোর পাঁচটায় ওর ফাঁসি হবে। মাঝখানে মাত্র ঘণ্টা ছয়ের ব্যবধান। ওপারের নিষ্ঠুর ডাক জীয়ল কান পেতে শোনে,—অভিভূতের মত ঘরময় ছুটোছুটি করে। মাঝে মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে মোটা শিকের উপর, পায়ে তো গুঁড়িয়ে দেয় কঠিন দরজার লৌহ শিক। লালসিং সম্মুখে এসে বলে:

—ঘুমারে জীয়ল, এখনও অনেক রাত।

জীয়ল মুখ খেঁকিয়ে উঠে: ভাগ্, ভাগ্, বদমাস। হাতের মুষ্টি ওর দৃঢ় হয়ে উঠে। অন্ধকারে জীয়লের চোখ বাঘের মত জ্বলে উঠে। কালো রাত্রির বুক চিরে ও যেন ছুটে চলেছে লোকের বুকে ছুরি বসাতে। আঘাতের পর আঘাত করে কঠিন দরজায়। মাথা কেমন যেন গোলমেলে হয়ে যায়। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে জীয়ল।

লালসিং ওর এই মত অবস্থা দেখে আপন মনেই বলে: শালা লট্‌কানের আগেই সাবাড় হবে। মরগে শালা।

পরেই আরম্ভ করে বন্দুক কাঁধে করে, লেফট, রাইট, লেফট।······

·····জীয়ল জীবনের পেছনের দিকে মনকে ঘুরিয়ে ধরে। এই মাংসল হাত দিয়ে কত জীবন অবলীলাক্রমে সে নষ্ট করে দিয়েছে। অথচ এবার ও ধরা পড়ল। জীয়লের নিজেরই আশ্চর্য্য লাগে; টাকার লোভে ও এবার খুন করেনি, করেছে শুধু ভালবাসার উত্তেজনা সইতে না পেরে। আজ এসেছে ওর পালা। ওর সমস্ত শক্তিকে জীর্ণ করে দিতে এই আয়োজন। জেলখানার মাঝে নতুন ফাঁসিকাঠের ঘনঘটা জীয়ল অনুভব করতে পারে। অনুভবশক্তি এখনও নষ্ট হয়নি। ৪টাও বাজে নাই অথচ কেমন যেন পায়ে হাঁটার শব্দ আসছে। সময় আর নেই। জীয়ল চীৎকার করে উঠে। কিছুক্ষণ পর জীয়ল শান্ত হয়।

·········জীয়লের মানসপটে সবই ভেসে আসে—দাসীইতো আমাকে বাঁচাতে পারতো। তবে কেন ও নালিশ করে এলো, হরিরামকে আমি খুন করেছি।

কতদিন দাসী আমাকে বলেছে:—জীয়ল, তোকেই আমি ভালবাসি। অথচ ও কেন আমার কাছে আত্ম-সমর্পণ করল না। হিন্দু বলে, ছোঃ, তবে ওই ভালবাসার মূল্য কি? দাসীর উপর জীয়লের সব রাগ গিয়ে পড়ে। যদি ও একবার ছাড়া পেত মুহূর্তের জন্য তবে দেখিয়ে দিত জীয়লের প্রতিহিংসাবৃত্তি কত ভীষণ।

জীয়লের চোখটা অন্ধকারের মধ্যে ক্রুদ্ধ শ্বাপদের মত জ্বলতে থাকে। হাজার দোষ করলেও কেন জানি দাসীকেই জীয়লের ভালবাসতে ইচ্ছে হয়। সে দিন দাসী দেখা করতে এসেছিল, জীয়ল দেখেছিল ওর চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়্‌ছে। কিন্তু জীয়লের মন তাতে নরম হয় নি, জীয়ল আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল।

কঠিন স্বরে বলেছিল জীয়ল, যা যা ফাঁসিতে লটকিয়ে আর সোহাগ দেখাতে হবে না।

দাসী কোন কথা বলে নি, করুণ নয়নে কেবল জীয়লের দিকে মিনতি মাখানো দৃষ্টি নিয়ে নিঃশব্দে কেঁদেছিল—কোন প্রতিবাদ করে নাই। জীয়ল মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘরের কোণে ফোঁস ফোঁস করেছিল অকারণে। খানিক পরে ফিরে দেখে দাসী চলে গেছে। চোখ দুটি জলে ভরে ওঠে এতক্ষণ পর জীয়লের। অসহায় ভাবে চলে গেল দাসী। হ্যাঁ, যাবেই না বা কেন? আর নালিশই বা করবে না কেন? স্বচক্ষে ও দেখল ওর বাবাকে আমি খুন করলাম, আর দাসী তাই মুখ বুজে সহ্য করবে।

জীয়ল অন্ধকারের মধ্যে উসখুস্ করতে থাকে। তীব্র একটা বেদনা অনুভূত হয় শরীরের প্রত্যেক শিরায় শিরায়।

বাইরের নির্ব্বাক রাত্রি কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কাছেরই কোনো গাছে একটা কালো পেঁচা অমঙ্গলের নিশানা দিচ্ছে। জীয়ল দৃষ্টি প্রখর করে অকন্ধার মহাকালের দিকে তাকিয়ে থাকে।

জীয়ল কিছুতেই বুঝতে পারে না দাসী যদি আমাকে ভালইবাসে—না, ভাল নিশ্চয়ই বাসে, না হলে দেখা করতে এল কেন?

দাসীকে পাবার জন্যেই জীয়ল হরিরামকে খুন করেছিল। হরিরাম হিন্দু, সে বেঁচে থাকতে কিছুতেই দাসীকে জীয়লের হাতে তুলে দেবে না, তাই ওর পথের বাধা নিজ হাতে সরিয়ে দিল ধরণীর বুক থেকে। দাসী এটা কেন বোঝে না।

জীয়ল অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট্ করতে থাকে। সব ঘটনা মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়িয়ে একবার বিচার করে দেখতে চায় কিসের থেকে কি হয়ে গেল, আর কোথায় বা এর পরিণতি। জীয়লের চোখের সম্মুখে স্থির হয়ে দাঁড়ায় সেই রাত্রি, যে রাত্রিতে জীয়ল হরিরামকে খুন করেছিল।

······ নির্ব্বাক রাত সম্মুখে দাঁড়িয়ে। জীয়ল ঘর থেকে বেরিয়ে এল ক্রুদ্ধ শুয়োরের মত।

জীবনের চল্লিশটা বছর পেরিয়ে গেল। পুরুষ-মেয়েমানুষ নির্ব্বিশেষে খুন করেছে কেবল টাকার লোভে। বংশ পরম্পরায় ওরা ডাকাত। কিন্তু দাসীর বাবা হরিরামকে খুন করতে চলছে টাকার লোভে নয়, কামনার বন্ধনে। দাসীকে পাবার জন্য ডাকাতি ব্যবসা পর্য্যন্ত ছাড়তে রাজি হয়েছিল, তবুও দাসীর এক কথা।

দাসী বলে, হয়না জীয়ল বাবা কিছুতেই মত দেবে না। তুমি যাও জীয়ল।

জীয়ল যায় নাই। হেসে উত্তর দিয়েছিল, যদি জোর করে নিয়ে যাই, কি করবে?

দাসী কেবল একটু হেসে বলেছিল, তা পারবে না জানি।

জীয়লের মুখে উত্তর জোগায় নাই, চুপ করেছিল। দাসী কেবল ওর দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

মনের আসল উদ্দেশ্য জীয়ল তখন প্রকাশ করেছিল। বল, তোর বাবাকে আমি খুন করব, না হলে হবে না। এই বলে সে দ্রুত চলে গিয়েছিল।

দাসীর বুকটা তখন সত্যই কেঁপে উঠেছিল। দাসী জানে জীয়ল যা বলে গেল তা সঠিকভাবেই করে যাবে। ঘাটের থেকে জল না নিয়েই দাসী বাড়ী ফিরেছিল। দাসীকেই যেন কেউ খুন করতে এসেছে এই ভাবে সে দ্রুত বাড়ীর পথে রওনা হয়েছিল। রাস্তার আশেপাশের কাঁটা বনে ও ভয়চকিত দৃষ্টি হান্‌ছিল।

জীয়ল যায় নাই। কিছু দূরে গিয়ে লুকিয়ে দাসীর ভাবান্তর লক্ষ্য করছিল।

· · সেই অশুভদিন উপস্থিত। জীয়ল খানিকটা কাঁচা মদ গিলে নিয়েছে। যদি দাসীর মুখ দেখে জীয়ল কাজ হাসিল করতে না পারে। উঃ সে দিনের সেই ঘটনা জীয়লকে মৃত্যুর দ্বারে এগিয়ে দিল। কাঁচা মদে নেশাটা বেশ ধরেছিল। হরিরামের বাড়ীতে সাড়াশব্দ নাই—সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন। এই নিঃশব্দতার আড়ালে জীয়ল আস্তে আস্তে ঢুকে হরিরামের বুকে বসিয়ে দিয়েছিল এক হাত লম্বা বাঁকান ইস্পাত। হরিরামের আকুল আর্তনাদে পাশের ঘরে দাসীর ঘুম ছুটে যায়। দৌড়িয়ে এই ঘরে এসে দেখে জানলা দিয়ে জীয়ল পালাচ্ছে। দাসী নিঃসন্দেহ

ভাবেই সেই প্রেতময়ী রাত্রিতে চিনতে পেরেছিল জীয়লকে। দাসী পিতার শোকে উন্মত্তপ্রায় হয়ে পুলিশে এজাহার দিয়ে এল। উঃ, জীয়ল আর ভাবতে পারে না .... বুকের ভেতর থেকে একটা ব্যথা গলা পর্যন্ত উঠছে। ওর মাথার রগটা যেন দপ্‌দপ্‌ করে এবারই ছিঁড়ে যাবে। কানের মধ্যে কেমন অস্পষ্ট ভোঁ ভোঁ শব্দ। মৃত্যুর ছায়া জীয়লের চোখে মুখে ভেসে ওঠে। অসহায় করুণ ভাবে জীয়ল আর্তনাদ করে ওঠে। সেই চীৎকার ছোট্ট কুঠরীর চারিপাশে প্রতিধ্বনিত হয়ে রাত্রিকে খান্‌খান্‌ করে দেয়। ক্ষণিকের জন্য লালসিংএর পদধ্বনি স্তিমিত হয়।

দূরে গাছের মাথায় আলোর সাড়া জেগেছে। তবে কি ভোর হয়েছে। সূর্য্যের আলোও মনে হয় না। যতদুর দৃষ্টি যায় জীয়ল অনুসন্ধানী চোখ নিয়ে তাকায়, না আর কোনখানে আলোর আভা নেই। ঐ আলো নিশ্চয়ই কাছের কোন লাইট-পোষ্টের আলো। পাশে কোথাও বাল‌ব্‌ জ্বলে উঠেছে, তারি ক্ষীণ রেখা ছড়িয়ে পড়েছে আমলকি গাছটার মাথায়।

জীয়লের কাছে সবই স্বচ্ছ হল। সময় এগিয়ে এসেছে। লোকজনের সাড়া পড়ে গেছে। একটা মোটরের শব্দও শোনা গেল বাইরের গেটের ধারে। জীয়ল আর একবার শেষ চেষ্টা করল। ঝাঁপিয়ে পড়ল লৌহশিকের উপর।

.. ..নিষ্ফল—অসাড় ভাবে পড়ে থাকে জীয়ল। কানে শুধু প্রতিধ্বনিত হয়—আল্লা আছে, আল্লা আছে।

ছোট বেলা বাবার কাছে দীক্ষা নেওয়ার সময় বাবা প্রথমেই বলেছিল আল্লা বলে কিছুই নেই, আমাদের এই পথে আল্লার বালাই নেই।

কিন্তু দাসী বলত ঈশ্বর নিশ্চয়ই আছে। দাসীর সেই কথা মনে পড়ে। দাসী একদিন বলেছিল জীয়ল আর পাপ করিস না। উপরে ভগবান আছেন, এর প্রতিফল তিনি কিন্তু তোকে দেবেনই।

জীয়লের চোখে জল ভরে আসে। ভুল করেই এতদিন কাটিয়ে দিল জীয়ল। যেদিন জীয়ল হরিরামকে খুন করে জানলা দিয়ে পালাচ্ছিল হরিরামের আর্তনাদের সাথে আর কয়টি কথা তার কানে ধাক্কা দিয়েছিল—উপরে ভগবান আছেন। বহুবার নিস্তার পেয়েছ এবার আর না।

দুঃখের মধ্যেও জীয়লের চোখে মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠে। জীয়ল বুঝতে পারে আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তার গলায় ফাঁসির দড়ি পরান হবে, অথচ জীয়ল তো বেশ নির্বিকার ভাবেই আছে। মাথা তো খারাপ হলনা জীয়লের। জীয়ল মিঞা বীভৎস হাসি হেসে উঠে, সেই হাসি সমস্ত জেলখানার ঘরে ঘরে ছুটে বেড়ায় প্রতিধ্বনিত হয়ে। মনে হয় যেন একটা শকুন ক্রন্দন করছে আকুল ভাবে।

রাজপরিবারের সংবাদ

শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুর কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। শ্রীশ্রীমহারাণী সাহেবাও গত ৭ই নভেম্বর কলিকাতা রওনা হইয়া গিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই কুচবিহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

মহারাজকুমার ও শ্রীঈশরাণী সাহেবা পিথাপুরমে অবস্থান করিতেছেন।

স্থানীয় সংবাদ

কুচবিহার রাজ্যে অধিক ফলের চাষ—

"অধিক ফসল ফলাও" আন্দোলনের প্রচারকল্পে কুচবিহার দরবার উন্নয়ন বিভাগের তত্ত্বাবধানে একজন স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন। রাজ্যমধ্যে কোথায় কোন্ ফল কিভাবে উন্নত প্রণালীতে চাষ করা যায় তিনি তজ্জন্য নানা স্থানীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া ফলের চাষ সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা দরবারে পেশ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য হইলে স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়াও বাহিরে ফল রপ্তানী করা যাইবে। স্পেশাল অফিসার মহাশয় রাজ্যময় সফর করিয়া বেড়াইতেছেন এবং কৃষকদিগকে উপযুক্ত উপদেশাদি দিয়া উৎসাহিত করিতেছেন।

কুচবিহারে মৎস্যচাষের উন্নতিমূলক ব্যবস্থা—

কুচবিহার রাজ্যে মৎস্যচাষের উন্নতিমূলক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য রাজদরবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক মৎস্যবিভাগের ডাইরেক্টার মহোদয়ের নির্দ্দেশমত একটি পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। উন্নয়ন বিভাগের তত্ত্বাবধানে সহরের দীঘি সমূহে উন্নত ধরণে মৎস্যের চাষকার্য্য পরীক্ষামূলকভাবে আরম্ভ হইয়াছে। মৎস্যচাষের ক্রমশঃ উন্নতি হইলে, আশা করা যায় কুচবিহারে মৎস্যের অভাব দূরীভূত হইবে।

জোতদারদিগের আংশিক খাজনা মকুব—

রাজ্যের প্রধান জোতদারদিগের আবেদনক্রমে মহারাজা ভূপ বাহাদুর আদেশ দিয়াছেন যে, যে সকল জোতদার ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে (বাঙ্গালা ১৩৫২, ১লা মাঘ) তাঁহাদের সকল বাকী খাজনা পরিশোধ করিবেন তাঁহাদিগকে টাকায় দুই আনা করিয়া আংশিক খাজানা মকুব করা হইবে। যে সকল খাজনা আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট হইয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণ আদায় দিলে উপরোক্ত হারে খাজনা মকুব হইবে এবং কোনওরূপ সুদ বা খরচা দিতে হইবে না। মহারাজ ভূপ বাহাদুরের এই আদেশে জোতদারদিগের অনেক সুবিধা হইবে।

কুচবিহারে ম্যালেরিয়া নিবারণের প্রচেষ্টা—

কুচবিহার রাজ্যে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য কুচবিহার দরবার রাজ্যের হেল্থ অফিসারের অধীনে কয়েক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাদের সহায়তায় রাজ্য হইতে ম্যালেরিয়া দূর করার চেষ্টা হইতেছে। এই কর্ম্মচারীগণের মধ্যে একজন সাব-এসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন, একজন ল্যাবরেটরি এসিষ্ট্যান্ট, একজন মশককীট সংগ্রাহক, একজন কেরাণী প্রভৃতি আছেন। বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে এই জন্য কুড়ি হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

সৈনিকগণের বিচারার্থে নিযুক্ত বিশেষ আদালত—

স্থানীয় কলেজে হাঙ্গামাকারী বলিয়া অভিযুক্ত সৈনিক কর্ম্মচারী ও সৈনিকগণের বিচারার্থে মহারাজা ভূপ বাহাদুর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি বিশেষ ফৌজদারী আদালত গঠনের আদেশ দিয়াছেন—(১) কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মিষ্টার জষ্টিস্ এস্ এন্ গুহ, (২) বাংলার অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা

জজ এবং কুচবিহার হাইকোর্টের বর্ত্তমান প্রধান বিচারপতি মিষ্টার জাষ্টিস এস, সি, দত্ত এবং (৩) কুচবিহার হাইকোর্টের বিচারপতি মিষ্টার জাষ্টিস্ টি, পি, মুখোপাধ্যায়। বিচারপতি গুহ এই আদালতের প্রেসিডেন্টের কার্য্য করিবেন।

স্থানীয় দুর্গাপূজা—

এই বৎসর দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছে। গত কয়েক বৎসর যুদ্ধজনিত অবস্থার চাপে মানুষ যেন মনমরা হইয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় দেবীবাড়ীতে দেবীপূজা ও মদনমোহন ঠাকুরবাড়ীতে দুর্গাপূজা সরকারী দেবোত্তর ডিপার্টমেণ্টের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জোতদারদিগের মধ্যে রায় চৌধুরী শ্রীসুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী ও শ্রীঅমূল্যকুমার বকসী মহোদয়ের বাটীতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় দুর্গোৎসব হয়। সহরের কয়েকটি পল্লীতে সর্ব্বজনীন দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তন্মধ্যে হাজরাপাড়া, গুড়িয়াহাটী ও পুরাতন পোষ্টাফিস পাড়ার দুর্গাপূজা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিজয়া দশমীর দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে মহা সমারোহের সহিত সহরের বিভিন্ন স্থানের দেবীমূর্ত্তি স্থানীয় তোরষা নদীতে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। মহারাজা ভূপ বাহাদুর স্বয়ং নদীতীরে উপস্থিত থাকিয়া জনগণের আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। ঐ দিন বৈকালে দেবীমূর্ত্তি ও মদনমোহন ঠাকুরবাড়ীর দুর্গামূর্ত্তি শোভাযাত্রা সহকারে সাগরদীঘির পার দিয়া তোরষা নদীর তীরে লইয়া যাওয়া হয়। এই শোভাযাত্রায় সুসজ্জিত হস্তী, অশ্ব, স্থানীয় মিলিটারি, বয়-স্কাউট্, সশস্ত্র পুলিশ এবং জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করে। মহারাজা ভূপ বাহাদুর স্বয়ং দেবীমূর্ত্তি ও ঠাকুরবাড়ীর দুর্গামূর্ত্তির মধ্যস্থলে এক সুদৃশ্য সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে অবস্থান করিয়া শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। মহারাজ বাহাদুরের রাজবেশ ও সৌম্যমূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ অপূর্ব্ব মনোহর শোভা পাইতেছিল।

দশহরা দরবার—

বিজয়া দশমীর দিন সন্ধ্যা আট ঘটিকার সময় মহারাজা ভূপ বাহাদুর রাজবাড়ীতে দশহরা দরবারের অনুষ্ঠান করেন। এই উপলক্ষ্যে দরবার-গৃহ সময়োচিত সাজসজ্জায় বিভূষিত ও আলোকমালায় প্রদীপ্ত হইয়া উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করিয়াছিল। রাজকর্ম্মচারী ও অন্যান্য দরবারীগণ যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে দরবার-সভায় নিজ নিজ আসন গ্রহণ করেন। আট ঘটিকার সময় মহারাজা ভূপ বাহাদুর দরবার কক্ষে প্রবেশ করিলে তোপধ্বনি হয় এবং দরবারীগণ দণ্ডায়মান হইয়া মহারাজাকে অভিবাদন করেন। মহারাজা সিংহাসনে উপবেশন করিলে রাজগুরু আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করেন এবং দরবারীগণ পদমর্য্যাদা অনুসারে একে একে সিংহাসন সমীপে উপস্থিত হইয়া নজর প্রদান করেন। মহারাজা নজরের স্বর্ণমুদ্রা স্পর্শ করিয়া ফিরাইয়া দেন। পরে দরবারীগণের মধ্যে পান আতর বিতরিত হইলে দরবার সমাপ্ত হয় এবং তোপধ্বনির মধ্যে মহারাজা বাহাদুর দরবার-কক্ষ পরিত্যাগ করেন।

বিজয়া দশমী বাঙ্গালীর এক প্রধান জাতীয় উৎসব। পূর্ব্বে এইদিনে কুচবিহারে কোন দরবার অনুষ্ঠিত হইত না। গত বৎসর হইতে মহারাজা ভূপ বাহাদুর দশহরা দরবারের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই জাতীয় উৎসবের দিনে রাজকর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গকে রাজভক্তি প্রদর্শনের সুযোগ দিয়া মহারাজা বাহাদুর সকলের অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

দেশবিদেশের কথা

বাংলা সরকার কর্ত্তৃক ইউনিয়ন বোর্ডে মনোনয়ন প্রথা রহিত—

বাংলাদেশে মোট পাঁচ হাজার ইউনিয়ন বোর্ড আছে; বর্ত্তমান নিয়মানুসারে গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক বোর্ডে তিন জন করিয়া সদস্য মনোনয়ন করেন; বাকী সদস্যগণ সকলেই জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। বাংলা সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে অতঃপর তাঁহারা আর কোনও ইউনিয়ন বোর্ডে সদস্য মনোনয়ন করিবেন না; এখন হইতে সকল সদস্যই নির্ব্বাচিত হইবেন। গবর্ণমেণ্টের এই সিদ্ধান্তের ফলে গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসনের পূর্ণ অধিকার পল্লীবাসী জনসাধারণের করায়ত্ত হইবে।

কবি নজরুল ইস্‌লামকে জগত্তারিণী পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবি নজরুল ইস্‌লামকে ১৯৪৫ সালের জগত্তারিণী পদক প্রদান করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই পদক প্রতি বৎসর বাংলার কোনও শ্রেষ্ঠ জীবিত লেখককে দেওয়া হইয়া থাকে। কবি নজরুলের কবিতা ও গান বাংলা দেশে একটা নূতন জীবনের প্রেরণা আনিয়াছে। কবি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া রোগশয্যায় শায়িত আছেন; এমতাবস্থায় তাঁহাকে এই পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্তই হইয়াছে।

রবীন্দ্র-স্মৃতি-ভাণ্ডারে ব্যক্তিগত বৃহত্তম দান—

বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী রায় বাহাদুর রণদাপ্রসাদ সাহা রবীন্দ্র-স্মৃতি-ভাণ্ডারে প্রথম দফায় একান্ন হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত রবীন্দ্র-স্মৃতি-ভাণ্ডারে যে সকল ব্যক্তিগত দান পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে রায় বাহাদুর সাহার দানই সর্ব্বাধিক।

নেপাল রাজ্যে নোটের প্রচলন—

এতদিন নেপাল রাজ্যে নোটের প্রচলন ছিল না। এক সংবাদে প্রকাশ যে সম্প্রতি নেপালে প্রথম নোটের প্রচলন হইল। নেপালের রাজার প্রতিকৃতিযুক্ত একশত টাকা, দশ টাকা ও পাঁচ টাকার নোটের প্রচলন হইয়াছে।

উড়িষ্যার নবনিযুক্ত ভারতীয় গভর্ণর—

উড়িষ্যার বর্ত্তমান গভর্ণর স্যার হথর্ণ লিউইসের কার্য্যকাল ১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ্চ শেষ হইবে। ভারতসম্রাট তাঁহার স্থলে স্যার চণ্ডুলাল ত্রিবেদীর নিয়োগ অনুমোদন করিয়াছেন। স্যার চণ্ডুলাল একজন অভিজ্ঞ আই-সি-এস্ কর্ম্মচারী; বর্ত্তমানে তিনি ভারত সরকারের যুদ্ধ বিভাগের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত আছেন। স্যার চণ্ডুলাল একজন ভারতীয়; তাঁহার এই নিয়োগে ভারতবাসীমাত্রেই আনন্দিত। ইহার পূর্ব্বে একবার মাত্র একজন ভারতবাসী—বাঙ্গালী আইন বিশারদ লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ—প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সে পঁচিশ বছর আগের কথা; লর্ড সিংহ বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের গভর্ণর হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন—

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ১৯৪৬ সালের ২রা হইতে ৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন বাঙ্গালোর সহরে হইবে। অধ্যাপক এম্, আফজল হোসেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। এই উপলক্ষ্যে তেরটি বিভিন্ন বিভাগীয় অধিবেশন হইবে এবং তাহাদের প্রত্যেকটিতে এক একজন বিশেষজ্ঞ সভাপতিত্ব করিবেন।

হাথোয়া মহারাজের বদান্যতা—

বিহারের অন্তর্গত হাথোয়ার মহারাজা বাহাদুর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় লক্ষ টাকা দান করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মহারাজা বাহাদুরের ইচ্ছা এই টাকার আয় হইতে কারিগরী ও ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারীং, কৃষিবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্য কয়েকটি বৃত্তি, ইতিহাস ও সংস্কৃতে গবেষণার জন্য দুইটি গবেষণা-বৃত্তি এবং সংখ্যাতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য একটি অধ্যাপক-পদ প্রবর্তিত হয়।

অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষের লাইব্রেরী—

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত খ্যাতনামা ইংরাজীর অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার বিরাট লাইব্রেরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিয়াছেন। তাঁহার এই লাইব্রেরীর মূল্য প্রায় ষাট হাজার টাকা হইবে। এতদ্ব্যতীত এই লাইব্রেরী রক্ষার নিমিত্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছেন।

রাজন্যপরিষদের পক্ষ হইতে ভূপালের নবাবের রাজপ্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ—

রাজন্যপরিষদের এক প্রতিনিধিদল ভূপালের নবাবের নেতৃত্বে কিছুদিন পূর্বে দিল্লীতে রাজপ্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকার প্রায় দুই ঘণ্টা ব্যাপিয়া হইয়াছিল। গত বৎসর রাজন্যবর্গ ও ভারতসরকারের রাজনৈতিক বিভাগের মধ্যে যে মতভেদ দেখা দিয়াছিল তৎসম্পর্কেই নাকি রাজপ্রতিনিধির সহিত আলাপ আলোচনা হয়।

আণবিক বোমার আবিষ্কর্তার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি—

এক সংবাদে প্রকাশ যে সুইডিস একাডেমি আণবিক বোমার আবিষ্কারক জার্মাণ বিজ্ঞানী অটো হানকে (Otto Hahn) ১৯৪৫ সালের জন্য রসায়ণ শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার দিয়াছেন। ইনি ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত জার্মাণীতে ছিলেন, বর্ত্তমানে ইনি আমেরিকায় আছেন।

ভারতে পুরাতন ষ্টাণ্ডার্ড টাইম—

যুদ্ধকালে দিবালোক বাঁচাইবার জন্য ভারতে ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা আগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে গত ১৫ই অক্টোবর হইতে আবার ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ তারিখ হইতে নূতন ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম বাতিল হইয়া গিয়াছে; পুরাতন ষ্টাণ্ডার্ড টাইমই পুনরায় চালু হইয়াছে। বাংলা সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে কলিকাতায় যুদ্ধকালীন নূতন ষ্টাণ্ডার্ড টাইমই চালু রহিয়াছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ—

বাংলার জাতীয় উৎসব দুর্গাপূজা শেষ হইয়া গিয়াছে। আমরা আমাদিগের পাঠক, লেখক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক সকলকে আমাদের বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ জানাইতেছি। পূজার পরে বিজয়ার উৎসব মিলনের উৎসব; এই উৎসবে হিন্দু মাত্রেই জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল মানবকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করে এবং অন্তরে ভ্রাতৃভাব পোষণ করে। বিজয়ার মিলনের বাণী সমগ্র ভারত তথা সমগ্র জগৎকে ঐক্যবদ্ধ করুক, আমরা এই কামনা করি।

ভারতশাসন সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারের নূতন প্রস্তাব—

বৃটিশ সরকারের সহিত ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন সংস্কার সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করিবার জন্য বড়লাট লর্ড ওয়াভেল বিলাত গিয়াছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া তিনি এক বেতার বক্তৃতায় এই বিষয়ে বৃটিশ সরকারের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। বৃটিশ সরকার যত শীঘ্র সম্ভব একটি রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রণয়নকারী সভা (Constitution-making body) আহ্বান করিতে ইচ্ছা করেন। এতদুদ্দেশ্যে প্রাদেশিক আইন সভা-সমূহের নির্ব্বাচন হইয়া যাইবার অব্যবহিত পরে বড়লাট আইন সভা-সমূহের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণের সহিত আলোচনা করিবেন। ১৯৪২ সালের ঘোষিত ক্রিপস প্রস্তাব কিম্বা অন্য কোন প্রকার সংশোধিত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া ভারতের শাসনব্যবস্থার একটা সুষ্ঠু সমাধান সম্ভবপর কিনা বিবেচনা করা হইবে এবং আইনসভাসমূহের ও দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিদিগের সহিত আলোচনা করিয়া একটি রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রণয়নকারী সভা গঠিত হইবে। এই সভা ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্র প্রণয়ন করিলে বৃটেন ও ভারতের মধ্যে একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবে। এইরূপে ভারত পূর্ণস্বায়ত্তশাসন লাভ করিবে।

বড়লাট তাঁহার ঘোষণায় একটি সাময়িক কেন্দ্রীয় শাসনপরিষদ গঠনের কথাও বলিয়াছেন। প্রাদেশিক নির্ব্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হইবার পরেই বড়লাট নূতন করিয়া তাঁহার শাসনপরিষদ গঠন করিবেন। ইহা এমন ভাবে গঠিত হইবে যেন প্রধান প্রধান ভারতীয় দলগুলির সমর্থন ইহার পশ্চাতে থাকে। নূতন শাসনতন্ত্র গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত নবনিযুক্ত শাসনপরিষদ কার্য্য করিতে থাকিবে।

দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট—

ভারতসরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন সম্প্রতি তাঁহাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। রিপোর্টের প্রথমাংশে বাংলার দুর্ভিক্ষের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হইয়াছিল; বর্ত্তমান চূড়ান্ত রিপোর্টে সমগ্রভাবে ভারতের খাদ্য-সমস্যা আলোচিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সরকারের খাদ্যনীতি কিরূপে পরিচালিত হওয়া উচিত এবং জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আহার্য্যের কিরূপ উন্নতি সাধন উচিত কমিশন এই সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়াছেন। কমিশন একটি কথা খুব জোর দিয়াই বলিয়াছেন; তাহা এই যে দেশের সকলের খাদ্য সংস্থানের চরম দায়িত্ব রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রকে এই দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হইবে; শুধু তাহাই নহে, আহার্য্যের উন্নতি সাধন করিয়া জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানের দায়িত্বও রাষ্ট্রকে লইতে হইবে। এই সম্বন্ধে কমিশন নানা সুপারিশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে।

খাদ্যশস্যের ব্যাপারে ভারতবর্ষ আত্মনির্ভরশীল নহে; যুদ্ধের পূর্ব্বেও ছিল না, এখনও নহে। সুতরাং ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ রোধ করিতে হইলে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন তন্মধ্যে ভারতবর্ষে শস্যউৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিদেশ হইতে শস্য আমদানীর ব্যবস্থাই প্রধান। আগামী কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সর্ব্বদা পাঁচলক্ষ টন পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত রাখার উপদেশ কমিশন দিয়াছেন, এবং খাদ্যশস্যের দাম যাহাতে খুব অধিক উঠা নামা না করিতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছেন। কমিশন আশা

করেন যে ১৯৫১-৫২খৃষ্টাব্দ নাগাদ ভারতের খাদ্যশস্যের অবস্থা স্বাভাবিক হইবে।

কৃষির উন্নতিসাধন, মৎস্যের চাষবৃদ্ধি, কুটির শিল্প ও গ্রাম সংগঠন, বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন বৃদ্ধি ও বড় বড় কলকারখানা স্থাপন, শিশুমঙ্গল ও মাতৃমঙ্গল প্রভৃতি নানা বিষয়ে কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন। এই সকল সুপারিশ অনুসারে কাজ হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইবে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশের চেহারা ফিরিয়া যাইবে। ভারতসরকার বলিয়াছেন যে তাঁহারা কমিশনের প্রস্তাবসমূহ বিশদভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

বাংলা সরকারের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা—

বাংলাসরকার একটি বিংশবার্ষিকী যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার প্রথম অংশ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রথম অংশে আগামী পাঁচ বৎসরে কি কি কাজ করা হইবে তাহার একটা আভাস দেওয়া হইয়াছে, ইহাকে বৃহৎ পরিকল্পনার অন্তর্গত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বলা যাইতে পারে।

এই পরিকল্পনা প্রধানতঃ কৃষির উন্নতির উপরেই কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে। প্রথমেই ফ্লাউড্ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলিয়া দিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে; এই কাজ সম্পূর্ণ হইতে ৩২ বৎসর লাগিবে, কিন্তু প্রথম পাঁচ বৎসরে ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, সুন্দরবন অঞ্চল এবং বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলা হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলিয়া দিবার কাজ আরম্ভ হইবে। সমগ্র বাংলা দেশ হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠিয়া গেলে বাংলা সরকারের বার্ষিক আয় এক কোটি টাকা বাড়িবে।

জলসেচন ব্যবস্থার উন্নতিসাধনকল্পে কয়েকটি পরিকল্পনা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা প্রধান। এই পরিকল্পনা অনুসারে দামোদরের বন্যা নিরোধ করিয়া চারিদিকে খাল কাটিয়া জলসেচনের সুব্যবস্থা হইবে; ইহাতে হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান এবং বাঁকুড়া জেলার কতকাংশের চাষের সুবিধা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে বহু পতিত জমি অনাবাদী পড়িয়া আছে; এই জমি সংস্কার করিয়া চাষের উপযোগী করিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত কৃষিবিভাগের সম্প্রসারণ, গাছপালা সংক্রান্ত গবেষণাগার স্থাপন, প্রতি থানায় উৎকৃষ্ট বীজের গুদাম স্থাপন, কচুরীপানা নাশ, গবাদি পশুর উন্নতি প্রভৃতি উপায়ে কৃষির উন্নতির পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাজপথ ও জলপথের উন্নতি বিধানের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। প্রথম পাঁচ বৎসরে বাংলার বিভিন্ন জেলায় ২৬০০ মাইল রাস্তা এবং বিভিন্ন প্রদেশের সহিত সংযোজক ৯০০ মাইল রাস্তা তৈয়ার করা হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্যও পরিকল্পনা করা হইয়াছে। প্রধানতঃ সার্জেণ্ট পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করিয়াই বাংলা সরকার তাঁহাদের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা আশা করেন যে তাঁহাদের পরিকল্পনানুসারে কার্য্য হইলে শিক্ষার উন্নতি অধিকতর দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইবে। চল্লিশ বৎসরের স্থলে বিশ বৎসরে তাঁহারা বাংলায় সার্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করিতে পারিবেন। ৫০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং আড়াই লক্ষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত স্বাস্থ্য, চিকিৎসা এবং নার্সিং ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হইবে।

এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে বহুসংখ্যক বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীর প্রয়োজন। বাংলা গভর্ণমেণ্ট এই জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বাংলা সরকারের ১৪৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে; ইহার মধ্যে ৬৯ কোটি টাকা ভারত সরকারের নিকট হইতে সাহায্যরূপে পাওয়া যাইবে, ২৩ কোটি টাকা বাংলা সরকারের সিভিল সাপ্লাই বিভাগ তুলিয়া দিয়া পাওয়া যাইবে, এবং বাকী ৫৩ কোটি টাকা বাংলা সরকারকে ঋণ করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্য হইলে এই ঋণ গ্রহণ মোটের উপর যুক্তিসঙ্গতই হইবে, কেননা, এই ঋণ ফলপ্রসূ ঋণ, ইহাতে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইবে।

দেশব্যাপী বিরাট বেকারসমস্যার সম্ভাবনা—

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। যুদ্ধের বিভিন্ন কার্য্যে সমাজের সকল স্তরের বহুসংখ্যক লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। এখন ক্রমশঃ ইহাদের সকলের কর্ম্মচ্যুতি ঘটিবে এবং দেশব্যাপী বিরাট বেকারসমস্যা দেখা দিবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত সরকার, বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় রাজ্যসমূহকে পূর্ব্ব হইতেই অবহিত হইতে হইবে। অবশ্য, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনায় বহুলোকের কর্ম্মসংস্থান হইবে; কিন্তু এই সকল পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য হইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে, অথচ বেকার সমস্যা অতি শীঘ্রই দেখা দিবে। দেশব্যাপী শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা থাকিলে এই সকল বেকারদের কর্মসংস্থান সহজেই হইত, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে শিল্পোন্নতিরও খুব বেশী সম্ভাবনা নাই, কেননা শিল্পোন্নতির জন্য যে সকল যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তাহা এদেশে নির্ম্মিত হয় না এবং শীঘ্র বিদেশ হইতে আমদানী হইবারও সম্ভাবনা নাই।

বিখ্যাত অর্থনৈতিক পণ্ডিত ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে এই সম্ভাব্য বেকারসমস্যা দূরীকরণের নিমিত্ত সরকারের নানাবিধ জনহিতকর পূর্ত্তকার্য্য আরম্ভ করা উচিত। এইজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ করিয়াও সংগ্রহ করিতে হইবে, যুদ্ধকালীন শিল্পগুলিকে শান্তিকালীন শিল্পে রূপান্তরিত করিয়া, নূতন নূতন রেলপথ ও সেতু নির্ম্মাণ করিয়া, ব্যাপকভাবে রাস্তা নির্ম্মাণ ও গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্যাপক কৃষিকার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া গভর্ণমেণ্ট বেকার সমস্যার সমাধানের সাহায্য করিতে পারেন। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে ভারত সচিব ও বড়লাটের নিকট উপরোক্ত মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছেন। আমরা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ১৯৪৪ সালের কার্য্যবিবরণী—

আমরা প্রসিদ্ধ বীমাব্যবসায়ী ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোং লি এর ১৯৪৪ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব পাইয়া কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতির পরিচয় লাভ করিয়াছি। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী মোট ৪ কোটী ৭৪ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্ব বৎসরের প্রদত্ত বীমাপত্র অপেক্ষা প্রায় দুই কোটি টাকা অধিক। আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন খাতে কোম্পানীর ১ কোটি ১ লক্ষ

টাকার উপর আয় হইয়াছে। বর্ত্তমানে কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলে জমা টাকার পরিমাণ ৪ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ভারতীয় বীমাকোম্পানী সমূহের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে, ইহার প্রিমিয়ামের হার কম, অথচ নিরাপত্তা খুব বেশী। আমরা কোম্পানীর পরিচালকবর্গের কর্ম্মনৈপুণ্যের প্রশংসা করি এবং কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

খেলাধূলা

শোনা যাইতেছে উত্তরবঙ্গে একটী ক্রিকেট লীগ খেলা প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে। এই সম্পর্কে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ক্রিকেট ক্রীড়ামোদীগণের নিকট হইতে তাঁহাদের মতামত জানানোর জন্য অনুরোধ-পত্র প্রেরিত হইয়াছে। কুচবিহার মহারাজার ক্রীড়াসম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজেশচন্দ্র গুহ তাঁহার নিজস্ব মতামত জানাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

ক্রিকেট খেলা ক্রমশঃ যেরূপ জনপ্রিয় হইতেছে, তাহাতে এইরূপ একটি লীগ-খেলার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়। ইহাতে শুধু যে উত্তরবঙ্গের অধিবাসীগণ উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণের খেলা দেখিবার সুযোগ পাইবেন তাহাই নহে, বাংলা প্রদেশের দল গঠনেও বিশেষ সহায়তা হইবে বলিয়া মনে হয়।

অষ্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস দল ভারতে আসিয়া এ পর্য্যন্ত দুইটি দলের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াছেন। খেলা দুইটিতে, উত্তরাঞ্চলে আব্দুল হাফিজ ও ইম তরাজ উদ্দিন এবং পশ্চিমের দলে অমরনাথ ও মুস্তাক আলী শতাধিক রাণ করিয়াছেন।

আশা করা যায় টেষ্ট ম্যাচগুলিতেও ভারতীয় দল তাঁহাদের গৌরব রক্ষা করিতে পারিবে।

সম্পাদক—শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত এম্-এ
কুচবিহার ষ্টেট প্রেসে মুদ্রিত ও ষ্টেট প্রেসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কোচবিহার দর্পণ, প্রথম খণ্ড, ১৩৫২

সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত এম-এ

সূচীপত্র

বৈশাখ—আশ্বিন

বিষয়-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

লেখক সূচী—বর্ণানুক্রমিক

বিজ্ঞাপন।

অত্র রাজ্যে খনিজ তৈল (কেরোসিন, পেট্রোলিয়ম প্রভৃতি) আবিষ্কার মানসে সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে ঘোষণা করা যাইতেছে যে :—

নিম্নলিখিত সংবাদগুলি রাজদরবারে যে কোন ব্যক্তি পেশ করিবেন, যদি উহা গ্রহণযোগ্য অথবা কার্য্যকরী বিবেচিত হয়, রাজদরবার হইতে তিনি যথোপযুক্ত পুরস্কৃত হইবেন।

(১) যদি কোন নদী বা ছড়ার জলের উপরিভাগে তৈলাক্ত পদার্থ জমিতে দেখা যায়,

(২) যে কোন স্থানের নদী বা জলা ভূমির অন্তঃস্থল হইতে জলবুদ্বুদ নির্গত হইতে দেখা যায়,

(৩) যে কোন স্থানে কোনরূপ লবণাক্ত জলের ফোয়ারা বা দুর্গন্ধযুক্ত জলধারা বা এরূপ জল প্রস্রবণ যাহা জলের উপরিভাগে আসিবামাত্র তাম্রবর্ণ পদার্থ (Brown Stuff) পৃথক করিয়া দেয়।

মন্তব্য :—উপরে লিখিত নির্দ্দেশগুলি ভূগর্ভস্থ খনিজ তৈলের পরিচায়ক। উক্ত লক্ষণগুলি সচরাচর বর্ষাকালে অথবা বর্ষার অব্যবহিত পরেই দৃষ্ট হয়।

কুচবিহার।
১১ই অক্টোবর, ১৯৪৫।

শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর সেনগুপ্ত,
সেক্রেটারী ষ্টেট কাউন্সিল, কুচবিহার।

NOTICE.

THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LIMITED, BOMBAY.

Notice having been given of the loss of the Policy number 79482 on the life of Dharma Narayan Kumar of Baneswor, Cooch Behar, a duplicate policy will be issued unless objection is lodged with us within one month from this date.

B K Shah,
General Manager.

NOTICE.

THE INDIA PROVIDENT COMPANY LIMITED, CALCUTTA.

Notice having been given the loss of the policy numbered 60948 on the life of Swarna lata Dey of Shibdhighirpar Cooch Behar a duplicate policy will be isiued unless objection is lodged with us within one month from this date.

Calcutta
The 15th November, 1945.

I. B. Sen,
Secretary.

NOTICE.

THE INDIA PROVIDENT COMPANY LIMITED, CALCUTTA.

Notice having been given the loss of the policy numbered 60948 on the life of Makham Lal Dey of Shibdighirpar Cooch Behar a duplicate policy will be issued unless objection is lodged with us within one month from this date.

Calcutta,
The 15th November, 1945.

I. B. Sen,
Secretary.

Abbasuddin Ahmed.

N, 17006	ও বন্ধু কাজল ভোমরা ওকি গাড়ীয়াল ভাই
N 17233	আজি নদী না যাও ওরে কিসের মোর বাঁধন
N 17285	পতিধন, প্রাণ বাঁচে না একবার আসিয়া সোনার
N 17332	আগা নায়ে ডুবুডুবু ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে
N, 27148	ও মোর চান্দরে তোরষা নদী
N 27342	বাবার দেশের কুড়ুয়া মুখ কোনা তোর ডিবো

Dhirendra Chandra Sarkar.

N 17272	ও মোর কানিয়া বন্ধুরে আরে ও সোনার নাইয়া
N 27495	তোরষা নদীর পারে পারে শালবাড়ীর তলে তলে
N 17322	এ পারে আমার বাড়ী আজি কি মজার দেখনা হাওয়া
N 17408	উঁচাইল যুবতীর পায়রা ভাল করিয়া বাজান রে
N, 27 60	হায় গো আমার মনে কয় সোনার চাঁদ চাঁদ রে
N 27100	ও মুই বুঝুন ওরে রাতি প্রভাত

Keshab Burman.

N 27224	মাছের বিয়াও সোনার মাছ মরা

Nayeb Ali (Tepu).

N 27085	ধিক ধিক আরো কন্যার
N. 27387	শোনেক বাইরাও ধন মোর কানাইয়া
N 27533	আই মোর সতীনতলায় কয় ওকি কালার কালা

Suren Dass.

N 27158	ও মোর কালারে ওরে দইয়োল
N 27195	আমি মরিব রে দরিয়ায় মোর সোনা ছাড়িয়া গেইছে
N 27427	বিধাতার ঘটনা ডাকাইৎ বন্ধুয়া

Surendra Roy Basunia.

N. 17382	ও বন্ধুরে নাও চাপাও নাইয়া রে

—নাটিকা—

N 17452 TO 17455	মকচমতি কন্যা সেট নং ২৭০
N 27147 TO 27151	রূপবান কন্যা সেট নং ২৯৪

দি গ্রামোফোন কোম্পানী লিঃ — দমদম

বিশুদ্ধ নেপানি তামাকে প্রস্তত! স্বাদে ও গন্ধে শ্রেষ্ঠ!!

পান করুন! তৃপ্ত হউন!!
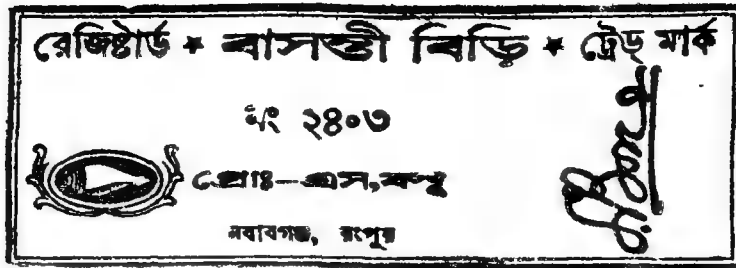
ষ্টকিষ্ট ঃ—শ্রীমথুরাকান্ত দাস কোচবিহার।

বিক্রয়! বিক্রয়!!

গুডিয়াহাটী তালুক মধ্যে ১২।১৩ হাল উৎকৃষ্ট আবাদী জমি, মিলের কাজ চালান উপযোগী অয়েল ইঞ্জিন ১টী, তালাব ৩টী, ঘানি ২ জোড়া, ময়দা ও ডাইল ভাঙ্গান কল ১টী, হারকুলিস সাইকেল ১টী, গ্রামোফোন ১টী ও নানাবিধ ষ্টেশনারী জিনিষ বিক্রয় করা হইবে। নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী।
পুরাতন পোষ্টাফিস পাড়া, কুচবিহার।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে আমার পুত্রত্রয়ের কোন প্রকার লেনাদেনার জন্য আমি দায়ী থাকিব না। অতএব তাহাদের সহিত নিজ নিজ দায়ীত্বে লেন দেন বা কারবার করিবেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী,
পোঃ—কুচবিহার।

কুচবিহারের এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান

বসন্ত বিড়ি ফ্যাক্টরীর আর একটী নূতন নমুনা

হাঁস মার্কা বিড়ি

বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট তামাকে প্রস্তুত। পানে অবসাদ দূর করিয়া আনন্দ ও তৃপ্তি আনয়ন করে।

দামে সস্তা—আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

সোল প্রোঃ—শ্রীপাঁচুগোপাল শেঠ
বসন্ত বিড়ি ফ্যাক্টরী কুচবিহার।

THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LIMITED BOMBAY.

Notice having been given of the loss of the Policy numbered **40319** on the life of Mr Muralidhar Bhattacharyya of Cooch Behar, a duplicate policy will be issued unless objection is lodged with us within one month from this date.

B. K. Shah.
Ag. General Manager.

NOTICE.

THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LIMITED, BOMB

Notice having been given of the loss of the Policy number 79482 on the life of Dharma Narayan Kundw of Baneswor Cooch Behar, a duplicate policy will be issued unless objection is lodged with us within one month from this date.

B K Shah,
General Manager.

হলদিবাড়ী মেলা।

বিজ্ঞাপন।

K. C. GANGULI.
Revenue Minister, Cooch Behar.

রাজ্য কোচবিহার সবডিবিজান মেখলীগঞ্জের অধীন হলদিবাড়ী বন্দরে প্রতি বৎসর শীতকালে যে একটি বৃহৎ ও বিখ্যাত মেলা হইয়া থাকে তাহা বর্ত্তমান বর্ষে আগামী ২৯শে অগ্রহায়ণ ইং ১৫ই ডিসেম্বর শনিবার আরম্ভ হইয়া এক মাস পর্য্যন্ত থাকিবে।

এই মেলাতে বর্ষে বর্ষে কাঁসা, পিত্তলের বাসন, নানাপ্রকারের রেশমী, পশমী, কাপড়, প্রভৃতি পোষাক নানাবিধ মনোহারী দ্রব্য, পাথরের জিনিষ, ভুটীয়া ঘোড়া, চমর, উষ্ট্র, ভুটীয়া কুকুর, কম্বল, গোমুত্তী, সতরঞ্চি কস্তুরী, চামর প্রভৃতি বহুমূল্যের সামগ্রী ক্রয়বিক্রয় হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন এই মেলাতে ৩২।৩৩ বৎসর হইতে উত্তমোত্তম বহুসংখ্যক পশ্চিম দেশীয় গরু ও মহিষ ও গাভীর আমদানী হইতেছে। এবৎসর আরও অধিক পরিমাণ আমদানী হওয়ার বিষয় বিশেষ যত্ন করা হইতেছে। গত বৎসর লক্ষাধিক টাকার দ্রব্যাদি বিক্রয় হইয়াছে। মেলার উন্নতি ও আগন্তুকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য প্রতি বৎসর যাত্রাদি হইয়া থাকে।

দোকানদারদিগের বাসোপযোগী গৃহাদি প্রস্তুত সম্বন্ধে উপযুক্ত বন্দোবস্ত এবং তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রীতিমত প্রহরী নিযুক্ত থাকে।

হলদিবাড়ী জলপাইগুড়ীর ৭ ক্রোশ দক্ষিণ, পাটের কারবারের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ। এখানে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর ষ্টেশন আছে। মেলার স্থান উহার অতি সন্নিকট ৪।৫ রশি মাত্র, দিনাজপুর রেলওয়ে দিয়া এই মেলায় পশ্চিম দেশীয় বহুমূল্য দ্রব্যজাত আমদানী হয়। এতদ্ভিন্ন ষ্টেশনের সহিত আসাম সেণ্ট্রাল এক্সটেন্সন রোডের সংযোগ আছে। সুপ্রশস্ত ও সুগম রাজবর্ত্ম দিয়া পুবড়ী, কোচবিহার, মাথাভাঙ্গা, মেখলীগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে অনায়াসে গাড়ী আদি আসিতে পারে। এরূপ গমনাগমনের সুবিধা থাকায় অনেক প্রধান প্রধান স্থান হইতে মেলায় নানা প্রকার মূল্যবান জিনিষের আমদানী হইয়া থাকে। হলদিবাড়ী অতি স্বাস্থ্যকর স্থান ও উহাতে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। ইতি

সূচীপত্র

সূচীপত্র

নর্থবেঙ্গল আয়ুর্বেদিক ফার্মেসীর
TRADE MARK
রেজিষ্টারীকরা
শ্রীরাধাগোবিন্দ সাহার
আবিষ্কৃত
ধন্বন্তরী পাচন
সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া, প্লীহা, যকৃতের মহৌষধ।
DHANWANTARI PACHAN
মূল্য ১।।০
দেড়টাকা
কুচবিহার, কাঁইয়াপাটি

কোচবিহার দর্পণের নিয়মাবলী।

১। কোচবিহার দর্পণের প্রতি সংখ্যার মূল্য চারি আনা ও বার্ষিক সডাক তিন টাকা; মূল্য অগ্রিম দেয়।

২। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লেখা কাগজের একপৃষ্ঠায় স্পষ্টরূপে লিখিয়া সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে। উৎকৃষ্ট লেখার জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

৩। অমনোনীত লেখা ফেরৎ লইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকেট সহ ঠিকানা লেখা খাম পাঠাইতে হয়, অমনোনীত কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না। অমনোনয়নের কারণ দর্শাইতে সম্পাদক অক্ষম।

৪। মনোনীত লেখা কখন প্রকাশিত হইবে সে সম্বন্ধে সম্পাদক কোনরূপ নিশ্চয়তা দিতে পারেন না।

৫। কোচবিহার দর্পণে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা ১০৲ টাকা; অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৬৲ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা। কভারে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার দ্বিগুণ।

৬। টাকাকড়ি সম্পর্কিত চিঠিপত্র ম্যানেজারের নিকট লিখিতে হইবে।

ম্যানেজার কোচবিহার দর্পণ
ষ্টেট্‌প্রেস, কোচবিহার।

MADAN MOHON THAKURBARI
Cooch Behar

Photo & Block by
Universal Art Gallery

কোচবিহার দর্পণ

অষ্টম বর্ষ { অগ্রহায়ণ ১৩৫২ সন, রাজশক ৪৩৬ } ৮-ম সংখ্যা

বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-মিলন পদাবলী

ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন এম্-এ, পি-আর-এস্, পি-এইচ-ডি

পদকল্পতরুতে[1] 'অথ বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-মিলনং' বলিয়া ছয়টি পদ আছে। প্রথম তিন পদে কবিদ্বয়ের পরস্পর মিলন-উৎকণ্ঠা, বসন্তকালে দিনের বেলায় সুরধুনীতীরে বটতলায় উভয়ের মিলন এবং রসতত্ত্বপরিপৃচ্ছা বর্ণিত হইয়াছে। শেষের তিনটি চণ্ডীদাস ভণিতায় রাগাত্মিক পদ। এই [illegible] পদের অব্যবহিত পূর্ব্বে একটি পদ আছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস পরস্পরের গুণ শুনিয়া মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং একে অপরের নিকট গীত লিখিয়া পাঠাইতেন ('নিজ নিজ গীত লেখি বহু ভেজল তাহে অতি আরতি ভেল')। স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে এই পদটি (২৩৮৮) পরবর্ত্তী পদের (২৩৮৯) উপর নির্ভর করিয়া কল্পিত হইয়াছে। ভণিতায় রচয়িতা নিজের নাম না দিয়া 'তছু পদকমলক ভৃঙ্গ' বলিয়া সই করিয়াছেন এবং ছত্র মিলাইবার জন্য কতকগুলি নাম ঢুকাইয়া দিয়াছেন,

> রূপনারায়ণ[2] বিজয়নারায়ণ[2]
> বৈদ্যনাথ শিবসিংহ,
> মিলন ভাবি দুহুঁ করু বর্ণন
> তছু পদকমলক ভৃঙ্গ।

'তছু' কা'র? বিদ্যাপতির? 'পদকমল = ভৃঙ্গ' তাহা হইলে হয় 'রূপনারায়ণ'। কিন্তু রূপনারায়ণের নাম আগেই করা হইয়াছে। তাহা হইলে ইনি কি পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাস? 'মিলন ভাবি'—ইহা হইতে বুঝিতে পারি যে লেখক বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের মিলন দেখেন নাই, মনে মনে কল্পনা করিয়া বর্ণনা করিতেছেন।

---

১ চতুর্থ শাখা ষড়্বিংশ পল্লব; পদসংখ্যা ২৩৮৯-২৩৯৪।

২ পরিষৎ-সংস্করণের পাঠ '—নরায়ণ' মৈথিলের অনুকরণে সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক কল্পিত।

প্রথম পদটির (২৩৮৯) কর্ত্তৃত্বও সন্দেহজনক। পদের শেষে রূপনারায়ণের নাম থাকিলেও তাহা যেভাবে আছে, তাহাতে ইহা ভণিতা মনে হয় না। রচনাও ভাল নয়। এটিও কি তবে বৈষ্ণবদাসের অথবা অর্ব্বাচীন অন্য কোন কবির লেখা? বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা যে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-মিলন-পদাবলী পুঁথির আলোচনা করিতেছি তাহাতে এই পদ নাই।

বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের মিলন-পদাবলী বৈষ্ণবদাস সম্পূর্ণ পান নাই। সম্পূর্ণ পদাবলীর একটি পুঁথি সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে।[৩] ইহাতে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের রসতত্ত্বজিজ্ঞাসা সম্পূর্ণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের পুঁথির পদসংখ্যা এগারো। ইহার মধ্যে শুধু প্রথম দুইটি পদ পদকল্পতরুতে আছে (২৩৯০, ২৩৯১), বাকি নয়টি সম্পূর্ণ নূতন।

প্রথম পদে দুই কবির মিলন ও নিভৃত আলাপ আরম্ভ,

সময় বসন্ত যাম দিন মাঝহি
বটতলে সুরধুনীতীর,
চণ্ডীদাস কবি- রঞ্জন মিলল
পুলক কলেবর গীর।
দুহুজনে ধৈরজ ধরছ না পার,
সঙ্গহি রূপ- নারায়ণ বৈঠল[৪]
দুহুক অবশ প্রেমধার।
দুহুজনে বৈঠহি[৫] নিভৃত আলাপহি
পুছত [মধুর-]জ রস কি,

রসিক হইতে কিএ রস উ জায়ত
রস হইতে রসিক কহি[৬]।
রসিকা হইতে রসিক কিএ হোয়ত
রসিক হইতে রসিকা,
রতি হইতে কাম[৭] কাম[৭] হইতে রতি
কাহে মানব ভুমিকা।
পুছত চণ্ডী- দাস কবিরঞ্জনে
শুনত রূপনারায়ণ,
কহত বিদ্যাপতি ইহ রস কারণ
লছিমা-পদ করি ধ্যান ॥১॥

দ্বিতীয় পদে বিদ্যাপতি কর্ত্তৃক 'রস কারণ' বর্ণনা—

রসিক কারণে রসিক হোয়ত[৮]
কামাদি[৯] ঘটনে রস,
রসিকা কারণে রসিক হোয়ত
দুহুঁতে দুহার বশ[১০]।
সুলভ[১১] প্রকৃতি[১২] কাম-সুখ[১৩] গতি
সুলভ[১১] পুরুষে[১৪] রতি,
দুহুক ঘটনে যে কিছু[১৫] হোয়ত
ইবে তাহা নাহি গতি।[১৬]

---

[৩] বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা পুঁথি সংখ্যা ১৪, সংগ্রহকর্ত্তা শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল, এম্-এ। তিন পাতায় সম্পূর্ণ পুঁথিটি কোন বৃহত্তর পুঁথির অংশ ছিল, কেননা দুই রকম পত্রসংখ্যা আছে। লিপিকাল আনুমানিক ১৫০ বৎসর। [৪] পাঠান্তর 'কেবল' (২৩৯০)। [৫] ধৈরজ ধরি দুহুঁ' (২৩৯০)।

[৬] ধৃতপাঠ পদকল্পতরুর, পুঁথি 'রস হইতে রসিকি'। [৭] 'প্রেম' (২৩৯০)। [৮] 'রসের কারণ রসিকা রসিক' (২৩৯১)। [৯] 'আদি' (পুঁথি)। [১০] যাহাতে প্রেম-বিলাস' (২৩৯১)। [১১] 'স্থলত' (ঐ)। [১২] 'পুরুষে' (ঐ)। [১৩] 'সুখ' (ঐ)। [১৪] 'প্রকৃতে' (ঐ)। [১৫] 'রস' (ঐ)।

[১৬] অতঃপর পদকল্পতরুতে চারিছত্র অতিরিক্তপাঠ, "দুহুঁক ঘটনে বিসাহ কখন না হয় পুরুষ নারী, প্রকৃতি পুরুষে যে কিছু হোয়ত রতি প্রেম পরচারি। পুরুষ অবশ প্রকৃতি সবশ অধিক রস যে পিয়ে, রতিসুখ-কালে অধিক সুখহি তা নাকি পুরুষে পায়ে।"

দুহুক নয়ানে নিকসই বাণ
বাণ যে কামের হয়,
রসিক সেবন[১৭] নাহিক কখন
তবে কৈছে নিকসয়।
কাম দাবানল বহি সে চঞ্চল[১৮]
সলিল গলয়ময়[১৯],
কুল কাটা ঘট[২০] প্রেমেতে আছএ
পচনে[২১] পবিত্র নয়।
পচনে[২১] পচনে[২১] লোভ উপজয়ে
যব ভেল দ্রবময়,
সেই সে বস্তু বিল সে উপজে
তাহাকে রস যে কয়।
শুণে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস কথি
রূপনারায়ণ সঙ্গে,
দুহু আলিঙ্গন ধবিল[২২] তখন
ভাসিল প্রেমতরঙ্গে ॥২॥

তৃতীয় পদে বিদ্যাপতির প্রশ্ন :—

সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ সঙ্গতি তিন,
সম্পূর্ণ লয়া ধীবেব চিহ্ন।
নায়ক নায়িকা গুণেতে ভিন্ন,
না হইলে রসে ভাসিব কেন।
সামান্য অযে নি সহজে নয়,
চারিটি তিনেতে মর্য্যাদা হয়।
ধীরোদ্ধত ধীর শান্ত যে হয়
ধীরললিত[২৩] তাহাতে বয়।
সম্ভোগ চারি তিনেতে গত,
কোন ভাবে দুটি হইবে নত।
বিদ্যাপতি পুছে রসের রাশি,
চণ্ডীদাস কহে নিকটে বসি ॥৩॥

পরবর্ত্তী সাতটি পদে চণ্ডীদাসের উত্তর :—

গুরুজন ভয়ে অবাকে রয়,
সম্পূর্ণ সম্ভোগ তাহাকে কয়।
সমৃদ্ধ নায়িকা একনে যোগ,
রাগের সহিতে করএ ভোগ।
ধীরললিত[২৩] সহজে পাই,
ইহার অধিক নাহিক চাই।
সম্পূর্ণ সম্ভোগ সবাই পায়,
ধীরোদ্ধত ধীর নায়ক তায়।
অযোনি হইলে রাগেতে গত,
বুঝিয়া ভাবেতে হই বিনত[২৪]।
চণ্ডীদাস কহে শুনহ ভাই,
রসিকারসিক যোগেতে পাই ॥৪॥

যোগেত জনম এ ভাব বিষম
কেবা তাহা জানে ভাই।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে উলসিত চিতে,
রসিক নাগর পাই।
তাহাতে প্রবর্ত্ত সেই উনমত
প্রেম গন্ধরসপুর,
ভোগ হইল খিন নিতি নৌতন
বাড়িব সাধনসুর।
স্থির হইল রতি সেভাব পিরিতি
পুরুষ প্রকৃতি কে,
রূপের স্বরূপ স্বরূপের রূপ
কুমারব্যা (?) হইল সে।

---

১৭ রতির যে বাণ' (২৩১১)। ১৮ 'শীতল' (ঐ)। ১৯ প্রণয়পাত্র' (ঐ) ২০ 'খড়' (ঐ)। ২১ 'পঠনে' (পুঁথি)। ২২ 'করিল' (২৩১১) ২৩ পাঠ 'ধীরের ললিত'।

২৪ পাঠ 'হহারি নত'।

রতির তরঙ্গ কিবা কার সঙ্গ
দেখিতে দেখিতে আখি,
যে জন্মা বজ্যাছে সেই সে মজ্যাছে
সেই সে তাহার সাথি।
চণ্ডীদাস বলে ধরি তার পলে
রজকিনী দেখি তথি,
লছিমা বলিয়া পড়িল ঢলিয়া
অচেতন বিদ্যাপতি ॥ ৫ ॥

স্বরূপ ধরম হইল বিষম
বড়ই বিষম দেখি,
স্বরূপ ধরম মরম নাহিক
রাগাত্মিকা তার সাথি।
সাধনে সে নয় দিএ পরিচয়
স্বরূপ রূপেতে এক,
সে গুরু সেবক না হয় পৃথক
সাধনে পড়িল ঠেক।
ভেদ্যভেদক পোষ্যপোষক
ইথে বিবেচনা চাই,
দশার ঘটন কভু স্তন পান
কভু ত রমণী ভাই।
বাল্যেতে প্রবর্ত্ত পৌগণ্ডেতে রত
আর বাল্য নাহি তায়,
পৌগণ্ডে শাধিয়া কৈশোর ভাবএ
সাধক বলিএ তায়।
প্রবর্ত্তে মধ্যম মধ্যমে উত্তম
এমতি সাধকে চলে,
সিদ্ধের সাধকে প্রবর্ত্ত যজিতে
কোন উপাসকে বলে।
উপাসনা ক্রম দধি দুগ্ধ যেন
দধিতে নবনী হয়,
ঘৃত ছাড়ি কেন শুনি দধি মন
দুগ্ধ দধি নাহি হয়।
রূপনারায়ণ এ সব বচন
শুনিল আপন কানে,
চণ্ডী-বিদ্যাপতি রসের মুরতি
বসতি করুণ মনে ॥ ৬ ॥

কি নারী পুরুষ ভুবনে বহু,
ইহাতে রসিক আছএ কেহু।
রসের নাগর রসের নারী,[২৫]
দোহে দুহু রহু রসেতে ভরি।
যাহার জনম রসেতে ঝিঝে,
সফল শরীর ধরএ সে যে।
রসহীন দেহ বিসের ভরে,
কাষ্ঠের পুতলি বহিয়া মরে
রসের সন্ধান করএ যে,
তা সম চতুর আছএ কে।
চণ্ডীদাস বলে কাতর বাণী,
স্বপনে না ছাড়্য রসিক মুনি ॥ ৭ ॥

দেহেতে বৈসয়ে মদনরাজ,
রতিরসরঙ্গ তাহার কাজ।
সদাই বিরাজে রসিক দেহে,
রসবতী মিলে তাহার নেহে।
পিরিতি পিরিতি পিরিতি কায়,
পিরিতি নগরে বসতি যার।
সেই সে জানএ পিরিতি কথা,
তাহার অন্তরে দ্বিগুণ বেথা।

---

২৫ পাঠ 'নাগরী'।

এ দুই আঁখরে রাধার ভাব,
প্রেম বিনা ইথে কি তার লাভ।
প্রাকৃত বস্তু ইহাতে আছে,
চণ্ডীদাস বলে কে কারে যাচে॥ ৮॥

শুন শুন ওহে সাধক জন,
রসের ভজনে করহ মন।
রসিক নাগর পাইব যথা,
রসের কৌতুক বাড়াবে তথা,
রসিক যুবতি পাইব যেই,
রসিক হইলে না ছাড়ে সেই।
আনন্দ মূরতি শরীরে যার,
রসিক সঙ্গে বিহার তার।
সহজ দেহেতে বুঝিয়া নিল,
দেহ ছাড়ি পুন সহজে গেল।
কি নারী পুরুষ নহেত এক,
চণ্ডীদাস কহে পরিল ঠেক॥ ৯॥

নন্দনন্দন জনম এ,
একথা বুঝিতে আছএ কে।
নন্দ না জানে নন্দন কথা,
না জান্যা ভজিলে ভজন বৃথা।
আনন্দ কালেতে যে রূপ ধরে,
ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিএ তারে।
আনন্দ লহরী যে কালে উঠে,
ব্রজেন্দ্রনন্দন সেই সে বটে।
ইহার স্বরূপ জানিব কে,
রাধাকৃষ্ণ দুটি একুই দে।
ইহার স্বরূপ জানিব যেই,
রাগানুগামার্গে আশ্রয় সেই।
চণ্ডীদাসে কহে গোপতে থুবে,
বেকত করিলে মরিয়া যাবে॥ ১০॥

শেষ পদে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির প্রশ্নোত্তর—
চণ্ডীদাস-কবিশেখরে বসি,
প্রেমসিন্ধুনীরে দোঁহেতে ভাসি।
বিদ্যাপতি কহে স্বরূপ কে,
চণ্ডীদাসে বোলে সেখানে যে।
বিদ্যাপতি বলে এখানে কে,
চণ্ডীদাসে বলে আশ্রয় যে।
বিদ্যাপতি বলে প্রাকৃত নয়,
চণ্ডীদাসে বলে মিলিলে হয়।
বিদ্যাপতি কহে ভাবিছ কি,
চণ্ডীদাসে বলে রজক-ঝি।
বিদ্যাপতি কহে হল্যে সে হয়,
চণ্ডীদাসে তারে সাধকে কয়।
শিবসিংহ রূপনারাণ যে,
বিদ্যাপতি কবি লছিমা সে।
চণ্ডীদাসবাণী স্বরূপ সার,
সাধক সাধিতে নাহিক আর।
চণ্ডীদাসে কবিশেখরে বলে,
সুরধুনীতীরে বটের তলে॥ ১১।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালী বিদ্যাপতি ও কবিরঞ্জন একই ব্যক্তি প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।[২৬] শেষের পদটিতে আমরা দেখিতেছি যে কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতি-কবিশেখর একই লোক। এই হিসাবে পদটির যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

বাঙ্গালী বিদ্যাপতির লেখা অর্থাৎ তাঁহার ভণিতাযুক্ত রাগাত্মিক পদ অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। কতকগুলি কিছুকাল পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম।[২৭] একটি পুঁথিতে আরও কয়েকটি পদ পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি সময়ান্তরে প্রকাশ করা যাইবে।

---

২৬ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, সপ্তত্রিংশ ভাগ, প্রথম সংখ্যা পৃঃ ৪০-৪৫।

২৭ ঐ, একচত্বারিংশ ভাগ, পৃঃ ৯৬-১০০।

উইলিয়ম্ কেরী*

শ্রীঅনাথনাথ বসু এম্-এ (লণ্ডন), টি-ডি (লণ্ডন)

আজ উইলিয়ম কেরীর জন্মদিন। ১৭৬১ সালে ১৭ই আগষ্ট তারিখে এই দিনে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। যে দুই জন বিদেশীর নিকট বাঙলা দেশ ও বাঙালী জাতি চিরদিন ঋণী হইয়া থাকিবে কেরী তাঁহাদের মধ্যে একজন। অপর জন ডেভিড হেয়ার। কেরী ও হেয়ারের ঋণ বাঙালী কোনদিন শোধ করিতে পারিবে না। কিন্তু জাতি হিসাবে আমরা এই দুই মহাপুরুষের বিশেষ করিয়া কেরীর স্মৃতির যথোচিত মর্যাদা দিয়াছি কিনা সন্দেহ। বাঙলা দেশের দুইটি সুপরিচিত বিদ্যায়তনের সহিত হেয়ারের নাম যুক্ত আছে এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে হেয়ারের জীবনকাহিনী আমাদের ছাত্রছাত্রীরা এখনও মাঝে মাঝে পাঠ করিয়া থাকে। এই কারণে তাহাদের নিকট হেয়ারের নাম কেরীর তুলনায় অধিকতর পরিচিত। কিন্তু তাহাদের অনেকেই হয়তো কেরীর নাম জানে না। অথচ কৃতিত্বের বিচারে বা বাঙালী জাতির উপকারক হিসাবে কেরীর আসন হেয়ারের নীচে নয়, পাশে। এবং কয়েকটি কতকগুলি কারণে তাঁহার নিকট আমাদের ঋণ আরও বেশী।

বোধ করি দুইটী কারণে এইরূপ ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ বাঙলা দেশের সমসাময়িক শিক্ষিত বিশেষ করিয়া ছাত্র-সমাজের সঙ্গে হেয়ার যতখানি সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিলেন কেরী ততখানি সাক্ষাৎভাবে মেশেন নাই। কেরীর কর্মচেষ্টা মুখ্যতঃ ছাত্রসমাজের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না, তাঁহার কর্মক্ষেত্র ছিল আরও ব্যাপক ও বিচিত্র। কেরী যে কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহা পরোক্ষভাবে ছাত্রসমাজকে স্পর্শ করিলেও প্রত্যক্ষভাবে করে নাই। দ্বিতীয়তঃ ডেভিড হেয়ার কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। এই জন্যই এদেশের লোক অতি সহজেই তাঁহাকে অন্তরে স্থান দিয়াছে। কিন্তু কেরী একটী বিশেষ সম্প্রদায়ের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন বলিয়াই তাহারা তাঁহাকে অত সহজে আপন করিয়া লইতে পারে নাই। কেরীর স্মৃতি আজও একটী বিশেষ সম্প্রদায়ের গৌরবের বিষয় হইয়া আছে। অথচ তাহা বাঙালী মাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি এবং গৌরবের বস্তু হওয়া উচিত ছিল।

এ ব্যাপারে তিনি যে সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন তাঁহাদের একটা কর্ত্তব্য আছে বলিয়া মনে করি। তাঁহাদের উচিত কেরীর স্মৃতিকে সাম্প্রদায়িক গণ্ডী হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে ভারতবর্ষের সাধারণ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অঙ্গীভূত করিয়া তোলা। কেরী শুধু তাঁহাদেরই আপনার লোক ছিলেন না বা নহেন। তিনি সমগ্র বাঙালী জাতির আত্মীয় ও গৌরবস্থল। ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাঁহার অবদান শুধু সম্প্রদায় বিশেষেরই কল্যাণ সাধন করে নাই, সমগ্র দেশের মঙ্গল বিধান করিয়াছে। সমগ্র বাঙালী জাতি তাঁহার স্মৃতি তর্পণ করিবে। বাঙালী এখনও হয়তো এ বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে সচেতন হয় নাই। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন হইলে দেশের চিত্তকে এই কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করিতে হইবে; দেশের সকলকে ডাকিয়া বলিতে হইবে—কেরী শুধু আমাদেরই ছিলেন না, তিনি তোমাদের আমাদের সকলেরই ছিলেন, তাই তোমরা এস আমাদের স্মৃতি তর্পণে যোগ দাও। তোমরা তাঁহার স্মৃতিরক্ষার আয়োজন কর।

মহাপুরুষগণের স্মৃতিরক্ষার জন্য—সাধারণত আমরা

*১৯৪৪ সালের ১৭ই আগষ্ট উইলিয়ম কেরীর জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে লিখিত।

স্মৃতিফলক বা স্মৃতি-সৌধ প্রতিষ্ঠা করি বা তাঁহাদের নামে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ি। কেরীর অন্য কোন স্মৃতিসৌধের প্রয়োজন আছে কিনা জানি না, বর্ত্তমান বাঙলা ভাষাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ স্মৃতিসৌধ। আজ যে ভাষায় আমরা প্রবন্ধাদি লিখিতেছি, সজ্জনগোষ্ঠীতে বাক্যালাপ করিতেছি কেরী সেই ভাষার অন্যতম স্রষ্টা এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কোন জীবিত ভাষা কোন একজন বিশিষ্ট লোকের চেষ্টায় সৃষ্টি হয় না এ কথা সত্য, কিন্তু এক বা একাধিক লোক তাহাতে নূতন রূপ দিতে পারে। শুদ্ধ ঐতিহাসিক বিচারে কেরীকে হয়তো বাঙলা গদ্যের স্রষ্টা বলা চলে না, কারণ পরম্পরাক্রমে বাঙলা গদ্য দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু যে ভাষা ঘরোয়া কাজের ভাষা হাটবাজারের ভাষা বা স্ত্রীলোকের ভাষা বলিয়া বাঙলার পণ্ডিত সমাজ কর্ত্তৃক অনাদৃত ও অবজ্ঞাত হইয়াছিল, যে ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রয়োজন তাঁহারা স্বীকার করেন নাই, কেরীই প্রথম দিব্যদৃষ্টিদ্বারা তাহার মহত্ত্ব ও ভাবী সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া তাহাকে সুধীজনসমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গৌরব শুধু ভাষার সংস্কারক বা পরিচায়ক হিসাবে নহে। তিনি নিজে এই ভাষায় রচনা করিয়াছেন এবং অন্যকেও এই ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি করিবার অনুপ্রেরণা দিয়াছেন। বস্তুতঃ বাঙলা গদ্যসাহিত্য সৃষ্টির অনুপ্রেরক হিসাবে কেরীর মহত্ত্ব এই সাহিত্যে তাঁহার ব্যক্তিগত দান হয়তে বেশী নহে কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের যে পণ্ডিতগণ তাঁহার নেতৃত্বে ও অনুপ্রেরণায় বাঙলায় নূতন ধরণের এক সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন তাহার কৃতিত্ব অনেক পরিমাণে কেরীরই প্রাপ্য এ কথা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। তিনি নিজে যতটুকু করিয়াছেন অন্যকে দিয়া তাহার চেয়ে অনেক বেশী করাইয়া লইয়াছেন। এটা তাঁহার অনুপ্রেরণা জোগাইবার ও সকলকে পরিচালনা করিয়া লইয়া যাইবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতার অন্যতম পরিচয়।

বস্তুতঃ কেরীর মত বিচিত্রকর্মা ব্যক্তি আমরা খুব কমই দেখিয়াছি। তিনি একই সঙ্গে পাঁচটী ভাষা শিখিতেছেন, সে সকল ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিতেছেন, ব্যাকরণ অভিধান রচনা করিতেছেন, বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সম্পাদন করিতেছেন, অধ্যাপনা করিতেছেন, কলেজ ও বিদ্যালয় চালাইতেছেন, বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাজ করিতেছেন, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক সংকলন করিতেছেন, ছাপাখানা চালাইতেছেন, সংবাদপত্র প্রকাশ করিতেছেন, সকল প্রকার সভাসমিতিতে যোগ দিতেছেন, আবার এগ্রিকালচারাল সোসাইটির সম্পাদকের কাজও করিতেছেন। তাহারই মধ্যে তাঁহাকে মিশন পরিচালনা করিতে হইতেছে, বাঙ্গালীদের সহিত বোঝাপড়া করিতে হইতেছে। কি অদ্ভুত কর্মশক্তি থাকিলে একটা লোক এতগুলি কাজ একসঙ্গে করিতে পারে এবং যোগ্যতার সহিত করিতে পারে তাহা আমাদের মত লোকের পক্ষে অনুমান করাও কঠিন। আমরা হয়তো ইহার মধ্যে একটা কাজ করিতে পারিলেই কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইতাম। বাস্তবিকই কর্মবীর বলিতে যাহা বোঝায় কেরী তাহাই ছিলেন। তাঁহার মত অসাধারণ কর্মশক্তিসম্পন্ন লোক আমাদের জাতীয় জীবনে অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। তাঁহার এই শক্তি তাঁহার প্রতিভার অন্যতম নিদর্শন।

কেরীর জীবনের পর্যালোচনা করিলে তাঁহার বিচিত্র প্রতিভার বহু পরিচয় আমরা পাই, কেরী কিন্তু নিজে বলিয়া গিয়াছেন যে এক অক্লান্ত পরিশ্রম করা ছাড়া অন্য কোন গুণের দাবী তিনি করেন না। অসীম কষ্ট স্বীকার করিবার শক্তিকেই কার্লাইল প্রতিভা বলিয়া

নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং কেরী যদি প্রতিভার দাবী করিতেন সেটা অন্যায় হইত না। কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ে কেরী তাঁহার প্রতিভাকে অস্বীকার করিলেও আমরা তাহা করিব না। আমরা বলিব তাঁহার মত প্রতিভাশালী লোক বিরল এবং আমাদের সৌভাগ্য এই যে তাঁহার প্রতিভা এই দেশকেই আশ্রয় করিয়া বিচিত্র কর্মধারার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তাহাতে আমরা ধন্য এবং উপকৃত হইয়াছিলাম।

কেরীর বিনয়ের একটা কাহিনী এই প্রসঙ্গে মনে পড়িয়া গেল; ইহার মধ্যে কেরীর চরিত্রের মহত্ব এবং একটা দিক অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাহিনীটি এইরূপ—তদানীন্তন বড়লাট কেরীর যথেষ্ট সমাদর করিতেন এবং মাঝে মাঝে তাঁহাকে দরবারে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন। একদিন সেখানে একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "শুনিয়াছি মহাশয় নাকি এককালে জুতা তৈয়ারি করিতেন?" কেরী তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "জুতা প্রস্তুত করিতাম না, মেরামত মাত্র করিতাম।"

মহাভারতে ধর্মব্যাধের কাহিনী আছে। তিনি ধর্মজ্ঞ ছিলেন, এদিকে ব্যাধবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। মধ্যযুগের সাধক রুইদাসও পাদুকা নির্মাণ করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেন। তাঁহারা তাঁহাদের বৃত্তি পালনে অগৌরব বোধ করেন নাই। তাঁহাদের বৃত্তিচর্চা ও সাধনা পরস্পরের পরিপন্থী হয় নাই। কেরীর জীবনেও দেখি যখন তিনি জুতা মেরামতের কাজ শিখিয়াছেন তাহারই সঙ্গে তাঁহার জ্ঞানের সাধনা চলিতেছে। তাহারই অবসরে তিনি বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিতেছেন, জ্ঞান-পিপাসা তৃপ্ত করিতেছেন।

সারাজীবন ধরিয়া কেরী জ্ঞানের সাধনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রকৃতই জ্ঞানতপস্বী ছিলেন। অনুক্ষণ অধ্যয়ননিরত জ্ঞানের সাধনায় মগ্ন এই সাধকের দিনচর্যার একটা বিবরণ আমরা পাইয়াছি। তাহাতে দেখি পৌনে ছয়টায় শয্যাত্যাগ করিয়া তিনি দিনের কাজ আরম্ভ করিয়া দিতেন। সাতটার মধ্যে তাহার হিব্রু বাইবেল পাঠ ও উপাসনা শেষ হইত। তাহার পর তিনি পারিবারিক উপাসনায় যোগ দিতেন। উপাসনান্তে ফারসী পাঠ চলিত। প্রাতরাশের পর দেখি তিনি রামায়ণ অনুবাদ করিতেছেন। সেটা শেষ হইলে কলেজে যাইতেছেন ও বেলা দুইটা পর্যন্ত সেখানে অধ্যাপনা করিতেছেন। বৈকালে ছাপার কাজ প্রুফ দেখা চলিতেছে। সন্ধ্যার পর আবার তিনি সংস্কৃত পড়িতেছেন ও সংস্কৃতে বাইবেল অনুবাদ করিতেছেন। এক অধ্যায় অনুবাদ সম্পূর্ণ হইলেই তিনি তেলিঙ্গা পণ্ডিতের নিকট পাঠ লইতে বসিতেছেন। রাত্রি নয়টা পর্যন্ত এইভাবে চলিত। তাহার পর তিনি বাংলার কাজ করিতেন। দুই ঘণ্টা বাংলা অনুবাদ বা লেখা শেষ করিয়া রাত্রি এগারটার সময় এক অধ্যায় গ্রীক বাইবেল পাঠ করিয়া অবশেষে তিনি শয়ন করিতেন। ইহাই ছিল তাঁহার সাধারণ দৈনন্দিন কর্মতালিকা।

কেরীর কর্মচেষ্টা ও জ্ঞানসাধনার মধ্যে দুইটি বিশেষত্ব আমরা লক্ষ্য করিতে পাই। গুছাইয়া কাজ করিবার ও কাজ করাইবার শক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল, আর সেই সঙ্গে ছিল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। নিয়মানুবর্তিতা ছিল এই দুই গুণের বাহ্য প্রকাশ। তাঁহার সকল কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসঞ্জাত একটি পদ্ধতি লক্ষ্য করি। এই পদ্ধতির ফলে তিনি একজনে যাহা সাধারণতঃ করিতে পারে

তাহার বহুগুণ কাজ করিতে পারিয়াছিলেন। এই বৈজ্ঞানিক মন ও কর্ম্মপদ্ধতির পরিচয় আমরা বিশেষ ভাবে পাই কেরীর দ্বিতীয় বড় কীর্ত্তি এদেশে নূতন শিক্ষাধারা প্রবর্তনের ব্যাপারে। যাঁহাদের চেষ্টায় এদেশে এই নূতন শিক্ষাধারার পত্তন হইয়াছিল কেরী তাঁহাদের অন্যতম। কিন্তু এ বিষয়ে কেরীর চেষ্টা ও অন্যের চেষ্টার মধ্যে একটু প্রভেদ ছিল। অন্য অনেকেও এদেশে নূতন ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন কিন্তু কেরী শিক্ষা সমস্যাকে যেরূপ সমগ্রভাবে দেখিয়াছিলেন অন্য কেহ সেরূপভাবে দেখিয়াছিল কিনা সন্দেহ। সেই জন্যই দেখি অন্যে যেখানে শুধু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন তিনি সেখানে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতেছেন, শিক্ষক তৈয়ারি করিবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। উপযুক্তভাবে শিক্ষিত শিক্ষক না পাইলে যে নূতন শিক্ষাধারা পত্তন করা কঠিন হইবে একথা এদেশে কেরীই প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় ও অনুপ্রেরণায় ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে এদেশের প্রথম শিক্ষকতা-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। কিন্তু কেরীর এই প্রচেষ্টার মূল্য তখনকার লোকে বুঝিতে পারে নাই। পাকাপাকিভাবে শিক্ষকতা শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে আরও প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছিল।

কেরীর অনুপ্রেরণায় রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলির মূল্য বিচার করা আজ আমাদের পক্ষে হয়তো কঠিন হইবে, কারণ এখন আমাদের ছাত্রছাত্রীগণের সৌভাগ্যক্রমে ভাল ভাল পাঠ্যপুস্তক অপেক্ষাকৃত সুলভ হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে কেরীই ছিলেন এ ব্যাপারে অগ্রগামী। যে যুগে পাঠশালার ছাত্রগণ পাট্টাকবুলতি ও চিঠিপত্র লিখিয়া ভাষা শিক্ষা শেষ করিত, যখন তাহাদের হাতে দিবার উপযোগী কোন সাহিত্য ছিল না, তখন কেরীই প্রথম নানা বিষয়ের রচনা সংবলিত ও সাহিত্যরসযুক্ত পাঠ্যপুস্তক তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়া তাহাদের মনের মুক্তির যে আয়োজন করিয়াছিলেন তাহা সত্যই অভিনব হইয়াছিল। তাহার মধ্যে কতখানি নীতি উপদেশ ছিল, তাহার ভাষা আজকার তুলনায় কতখানি কঠিন ছিল এসকল প্রশ্ন আজ ওঠে না। কারণ ইহাই এদিকে প্রথম প্রচেষ্টা এবং কেরীই এ বিষয়ে ছিলেন প্রথম পথপ্রদর্শক। বস্তুতঃ কেরীর জীবনের গৌরব এখানেই। তিনি বহু বিষয়ে প্রথম ছিলেন, পথিকৃৎ ছিলেন। এই কথাটি স্মরণ করিলে আমরা তাঁহার মহত্ত্ব ঠিকমত বুঝিতে পারিব এবং তাঁহার নিকট আমাদের ঋণের পরিমাণ উপলব্ধি করিতে পারিব।

কেরীর চরিতকীর্ত্তন এইখানেই শেষ করি। আশা করি কেরীর স্মৃতির প্রতি সমুচিত সম্মান দেখাইবার স্থায়ী আয়োজন অবিলম্বে করা হইবে এবং তাঁহার নিকট আমাদের যে ঋণ আছে তাহার খানিকটুকু শোধ করিবার জন্য আমরা চেষ্টার ত্রুটি করিব না। এই ঋণ শোধ করি কি না করি তাহাতে কেরীর কিছু যায় আসে না কিন্তু আমাদের সম্মানখানি প্রায় আসে। ঋণ শোধ না করিয়া কোন জাতিই কোনদিন বড় হয় নাই।

শকুন্তলা বিরহে দুষ্মন্ত

(৬ষ্ঠ অঙ্ক, শকুন্তলা)

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় বি-এ

নিরানন্দ রাজপুরী   নিরুৎসব সৌনয়ান
প্রমোদ ভবন
বিষাদের ম্লানছায়া   সমগ্র প্রাসাদখানি
করে আচ্ছাদন।
নাহি নৃত্যগীত ঘটা   নাহি আলোকের ছটা
উড়েনা কেতন,
অমাত্য কিঙ্কর সাথে   নিঃশব্দ চরণপাতে
করে বিচরণ।
বসন্ত এসেছে ফিরে   প্রমোদ উদ্যানে ধীরে,
আগত সৌরভ
ভাগ্যে জুটেনিক তার   বহু রাজ অনুজ্ঞায়
বসন্ত উৎসব।
ম্রিয়মান লতা শাখা   তাদের শাখায় পাখী
বনে উপবনে,
করিয়াছে শিরোধার্য্য   রাজার আদেশ যেন
কঠোর শাসনে।
রসাল মঞ্জরী যত   বহুদিন বহির্গত
আজো রজোহীন,
ফুটেনিক কুরুবক   করেনি কোরক দশা
আজো উত্তরণ।
শিশির বিগত তবু   কোকিলের কণ্ঠে রব
কণ্ঠেই বিলীন,
অত স্মর তূণ হতে   টানি শর অর্দ্ধপথে
করে সম্বরণ।

পূর্ব্বকথা স্মরি আজ   পায় চিত্তে মহারাজ
যাতনা অশেষ,
উদাসীন নরপতি   সর্ব্ব রম্য বস্তু প্রতি
তাঁহার বিদ্বেষ।
সমস্ত রজনী ধরি   এপাশ ওপাশ করি
লুটে শয্যা'পর;
রাজ্ঞীদের প্রশ্নে কভু   বলিবা দাক্ষিণ্যবশে
দেয় সে উত্তর,
শকুন্তলা এই নাম   অন্যমনা হয়ে ভুলে
করে উচ্চারণ;
আপনার ভুল বুঝি   লজ্জায় কুণ্ঠিত হয়ে
রহে সে তখন।
একে একে অঙ্গে তার   সর্ব্ববিধ অলঙ্কার
করেছে বর্জন;
শুধু তার বাম ভুজে   শিথিল হইয়া রাজে
কনক কঙ্কণ।
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে   বিশুষ্ক অধর শোভে
আরক্ত বরণে;
অরুণ হয়েছে আঁখি   দারুণ উদ্বেগ হেতু
নিশা জাগরণে।
ক্ষীণ হইয়াছে তনু   তবু আজ তেজোময়
লাবণ্যচ্ছটায়:
প্রভারাশি বলয়িত   মার্জ্জিত মণির মত
ক্ষীণ নাহি তায়।

(রাজা ও বিদূষক)

রাজা

প্রেয়সী আমার কত বুঝাইল
জাগিলনা মোর সুপ্ত হৃদি।
শুধু পরিতাপ সহিবার তরে
জাগিল সে আজ হারায়ে নিধি।

(বেত্রবতীর প্রতি)
প্রতিহারি, আমি রাত্রি জাগিয়া
ক্লান্ত কাতর দেহ ও মনে,
বল অমাত্যে অক্ষম আমি
বসিতে আজিকে ধর্ম্মাসনে।
প্রতিনিধি হয়ে পৌর কর্ম্ম
তিনিই করুন ন্যায়ানুসারে,
পত্রের যোগে বিবরণ তার
জ্ঞাপন করেন যেন আমারে।

(বিদূষকের প্রতি)
ছিদ্র পেলেই আসে অনর্থ
লোকে বলে ইহা মিথ্যা নয়
বিস্মৃতিতমঃ এতদিন ছিল
আবৃত করিয়া মম হৃদয়।
যেমনি দূরিল সে আঁধিয়ার
প্রহার করিতে মদন জুড়েছে
চূতশর সখে ধনুতে তার।
অকারণে হায় ত্যজিনু প্রিয়ায়
অঙ্গুরী হেরি স্মরিনু সবি
অনুতাপে মরি, বেদনা বাড়াতে
মধুমাস এলো সুযোগ লভি।

বিদূষক

মণিবিখচিত শিলামণ্ডিত
এইত মাধবী লতাবিতান,
স্নিগ্ধ শান্ত নির্জ্জন ঠাঁই
করুন এখানে অবস্থান।
কুশলবার্ত্তা যেন জিজ্ঞাসে
স্বাভাবিক বায়ু হেথায় বহি
চিত্তবিনোদ করুন রাজন্
ইহার ভিতরে ক্ষণিক রহি।

রাজা

—যাহা কিছু তোমা বলেছিনু সখে
একে একে সবি মনে যে আসে
প্রিয়ারে যখন করি বর্জ্জন
ছিলেনাক তুমি আমার পাশে?
আগেও কখনো তোমার মুখেও
শুনিনি শকুন্তলার গান,
তুমিও কি হায় ভুলে গিয়েছিলে
আমিই না হয় ভুলেছিলাম?

বিদূষক

ভবিতব্যতা হায় বলবতী,
কিছু ভুলি নাই ভুলিব কেন?
তুমি যে বলিলে, 'সবই পরিহাস
সত্য বলিয়া ভেবনা যেন।'

রাজা

—মোহবশে আমি বিদায় দিলাম
হানিলেন কর ললাটে তিনি;
নিরুপায় হ'য়ে হ'তে চাইলেন
ঋষিশিষ্যের অনুগামিনী।
'এখানেই থাক সঙ্গে এস না'
কহিল উচ্চে শার্ঙ্গরব,
মোর প্রতি প্রিয়া কাতর চাহনি
হানিল, হাসিনু আমি দানব।

আমি নিষ্ঠুর আমি মূঢ় ক্রূর,
সজল করুণ চাহনি তাঁর
হ'য়ে বিষময় শল্য আজিকে
দহিছে নিরত এ দেহ ভার।

বাঁচাও আমারে বিরহ জ্বালায়
এই দেহ মন পুড়িয়া যায়
কেমনে সহিব দারুণ যাতনা
প্রাণ ধারণের নাহি উপায়।

বিদূষক

—সাধু শোকে কভু অভিভূত নয়,
এত অধীরতা উচিত নহে।
প্রবল ঝঞ্ঝা তরুয়ে কাঁপায়
ভূধর তাহাতে অটল রহে।

রাজা

—প্রিয়ার সঙ্গে আমার মিলন
সত্য তাহা? না স্বপ্ন দেখি?
মতিভ্রান্তি অথবা আমার
মায়ার কুহক অথবা একি।
ভুক্তাবশেষ পুণ্যফল কি?
যাইহোক, সবি হায়রে মম
মনোরথগুলি চূর্ণ করিতে
পাতনে শৈল অতট সম।

বিদূষক

চূর্ণ হবেনা পূর্ণই হবে
কিভাবে হবে তা চিন্তাতীত।
এই অঙ্গুরী প্রমাণ তাহার
ইহাত ছিল না প্রত্যাশিত।

রাজা

(অঙ্গুরীয়কের প্রতি) —
অঙ্গুরী তব পুণ্যের বল
মনে হয় ক্ষীণ বলিয়া যেন,
অরুণ নখর মণ্ডিত তাঁর
অঙ্গুলি হ'তে খসিলে কেন?
বৃথা দুষি তোমা তুমি অচেতন
জাননাত গুণাগুণ বিচার,
আমি সচেতন বিবেকী হইয়া
বুঝিতে নারিনু মর্ম্ম তার॥

(শকুন্তলার চিত্র হস্তে চেটীর প্রবেশ)

(চিত্রদর্শনে)—

দীর্ঘাপাঙ্গবিসারী নয়ন
ভ্রূলতা ইহার লীলাঞ্চিত,
জ্যোৎস্নালিপ্ত অধর সুষমা
দন্তপংক্তি শুচিস্মিত।
পক্কবদরীকান্তি ওষ্ঠে
স্বেদ ছলে যেন সুষমা ঝরে,
চিত্রে লিখিতা তবু যেন প্রিয়া
আমারি সঙ্গে আলাপ করে।
প্রিয়ার রূপের আভাস ফুটেছে
সমতল এই চিত্রপটে
গভীরতা হেরি নাভিপ্রদেশে
উচ্চতা হেরি উরোজ তটে।
তৈলমিশ্র বর্ণের গুণে
ফুটে লাবণ্য তনুলতায়,
মোর মুখপানে চেয়ে চেয়ে হেসে
কি যেন প্রেয়সী বলিতে চায়।

মূর্ত্তিমতী সে প্রিয়ারে আমার
দূর করি দিয়া মোহের ঘোরে
চিত্রলিখিতা প্রিয়ারে সাদরে
হেরিতেছি আজ নয়নভ'রে।
নির্বোধ আমি পথে ফেলে এসে
কূলে কূলে ভরা তটিনী হায়,
আজি প্রাণ যায় বারিপিপাসায়,
লুব্ধ হয়েছি মরীচিকায়।

চতুরিকার প্রতি রাজা—

অসম্পূর্ণ এখনো চিত্র
পূর্ণ করিব বিনোদভূমি,
অয়ি চতুরিকে সত্বর যাও
আনো বর্ণকবর্ত্তী তুমি।
সৈকতে যার হংসমিথুন
সে নদী মালিনী আঁকিতে হ'বে,
হিমালয়গিরি পাদদেশে সেথা
হরিণ হরিণী শুইয়া রবে।
আঁকিতে হইবে শাখালম্বিত
বল্কলধর বৃক্ষগণ,
কৃষ্ণসারের শৃঙ্গে মৃগীরা
বাম আঁখি করে কণ্ডূয়ন।

(রাজার বাষ্পমোচন)

সহিতেছি আমি যে বেদনা সখে
প্রকাশের তার নাইক ভাষা
স্বপ্নেও আর সে প্রিয়তমার
সঙ্গে নাইক মিলন আশা।

স্বপ্ন কোথায় তাহার ভাগ্যে
প্রতিনিশি যেবা নিদ্রাহারা,
চিত্রলিখিতা প্রিয়ারে দেখায়
বাধা দেয় পুন অশ্রুধারা।

(কিছুক্ষণ পরে)

যথাকালে বীজ বপন করিলে
ফলবতী হয় বসুধা তায়;
তাহারি মতন পরিণামফল
ধর্ম্মদারারে ত্যজেছি হায়।

হায়রে আমার কুলপুরুষেরা
বৃথাই চাহিবে ধরার পানে;
আমার মরণ ঘটিলে তাঁদের
কে তুষিবে আর পিণ্ডদানে?

সন্তানহীন আমার নয়নে
ঝরিতেছে যাহা অশ্রুরাশি,
তাহাই তাঁদের তর্পণ-বারি
যতদিন আমি মর্ত্ত্যবাসী।

হবে বিলুপ্ত, বালুকায় যথা
সরস্বতীর প্রবাহ হারা
আমার জীবনে, চিরবহমানা
পৌরব রাজবংশধারা।

(রাজার মূর্চ্ছা)

দুর্ঘটনা

শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী

'নস্যি আছে মশাই!' সহযাত্রী এক ভদ্রলোক অকস্মাৎ প্রশ্ন করেন আমাকে।

একটা দোতলা বাসের দোতলার একেবারে সামনের সিট্‌টায় আরামে চোখ বুঁজে ব'সেছিলাম আমি। চঞ্চল দখিনা বাতাসে মাথার চুলগুলো উড়ে উড়ে প'ড়ছিল চোখের ওপর। ঘুম এসে গিয়েছিল প্রায়। ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞাসা করেন 'নস্যি আছে মশাই নস্যি?' বলি: 'আজ্ঞে না, নস্যি নেওয়ার অভ্যাস আমার নেই।' —'তা বেশ, বেশ। আমার একটু নস্যি নেওয়ার অভ্যাস আছে, বুঝলেন কিনা। হেঃ—হে!' দাঁত বার করে বিশ্রী ভাবে হাসতে থাকেন ভদ্রলোক।

আমি চুপ ক'রে থাকি। কথা বলিনা কোন এর উত্তরে।

একটু পরেই ভদ্রলোক আবার বলেন: 'বুঝলেন মশাই। এই ধরুণ নস্যি। গুরু জনের সামনে তামাক বিড়ি, সিগারেট খেলেই দোষ! অথচ নস্যিতে কোন দোষ নেই। নস্যিটাও তো বলতে গেলে ওই একই জিনিস! এই ধরুণ না আমার বাবা। মাঝে মাঝে নস্যি চেয়ে নেন আমার কাছ থেকে। বলেন: দে তো রে ট্যাঁ ট্যাঁ একটিপ। 'ট্যাঁ ট্যাঁ' টা হ'লো গিয়ে আমার ডাক নাম। মানে ছেলে বেলায় আমি নাকি রাতদিন শুধু কাঁদতাম ট্যাঁ ট্যাঁ ক'রে। সেই থেকে তাই ওঁরা আমাকে ওই নামেই ডাকেন। ভাল নাম আমার অবশ্য শ্রীবঙ্কুবিহারী পয়মাল। ওই খারাপ নামটা আমি যাকে তাকে বলি না সহজে। বুঝলেন?'

গম্ভীর ভাবে বলিঃ হুঁ। মুখখানাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে ব'সে থাকি চুপচাপ।

বেশ কেটে যায় খানিকক্ষণ নীরবে।

হঠাৎ ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞাসা করেন: 'কত দূর যাবেন আপনি?'

বিরক্ত হই মনে মনে অত্যন্ত রকম। উত্তর দিই না কোন। যেন শুনতেই পাইনি কথাটা।

'ও: মশাই শুনছেন?' তর্জনীর এক রাম খোঁচা দেন ভদ্রলোক আমার পেটে। : 'বলি যাবেন কতদূর?'

ঝাঁজের সংগে বলি: 'বউ বাজার।'

—: 'ও, ওই খানেই বাড়ী বুঝি?'

—: 'হ্যাঁ।'

—: 'আমার বাড়ী ওর একটু আগেই। আরপুলি লেন চেনেন? মেডিকেল কলেজের সামনে মশাই।'

বিরক্তিতে আমার গা জ্বালা ক'রতে থাকে। রুক্ষতার সংগে ব'লি: 'হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি চিনি।'

ভদ্রলোক খুসী হন। বলেন: 'চেনেন? তা হ'লে যাবেন একদিন আমার বাড়ী। আমার স্ত্রী মশাই এমন চা ক'রেন একবার খেলে ব'লবেন. 'হ্যাঁ বাবা চিজ একখানা।' যাবেন কিন্তু, চা খেয়ে আসবেন আমার স্ত্রীর হাতের। এই নিন ঠিকানাটা রেখে দিন কাছে। সবুজ একটা ট্রামের টিকিটের উল্টো পিঠে লেখা ঠিকানা তিনি গুঁজে দেন আমার হাতে।

নির্ব্বিবাদে সেটিকে পকেটে রেখে দিলাম আমি। বেশ চলেছি। আবার মুখ খোলেন ভদ্রলোক: 'আচ্ছা আপনি গান গাইতে পারেন?'

—: 'না।'

—: 'কেন?'

রুক্ষভাবে জবাব দিই: 'কী ক'রে জানবো বলুন, কেন পারি না?'

—: 'না, না, আপনার চেহারাটা বেশ লাভলি কিনা তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। আপনি সিনেমায় ঢুকে পড়ুন, উন্নতি করতে পারবেন।'

এবার খুশী হই আমি। প্রথমতঃ, চেহারার প্রশংসা ক'রলে কার না আনন্দ হয়! তার ওপর সিনেমায় নামবার একটা গোপন বাসনা আমারও আছে মনে মনে। দু-একজন ডিরেক্টারের কাছে না গেছি তাও নয়। সুবিধে হয়নি বিশেষ। ভদ্রলোকের সংগে কথা ব'লতে যাচ্ছিলাম এ সম্বন্ধে, কিন্তু তিনি ধড়মড়িয়ে উঠে প'ড়লেন: 'ওই যাঃ! কলুটোলার মোড় এসে গেল এরি মধ্যে। আচ্ছা চলি। তা হ'লে যাবেন কিন্তু একদিন।' নমস্কার ক'রে নেমে গেলেন তিনি বাস থেকে।

এতোক্ষণে সত্যি ভদ্রলোককে অত্যন্ত ভালো লাগতে লাগল। দুঃখও হ'লো আগে তাঁর সংগে ভাল করে কথা না বলার জন্যে। কে জানে হয়তো উনি নাম-করা কোন চিত্র পরিচালকও হ'তে পারেন। ক'জনকে আর আমি চিনি!

বউবাজারের মোড়ে বাস থেকে নেমে আমার কিন্তু মাথা ঘুরে গেল! পকেট থেকে মনিব্যাগটা উধাও। বেবাক ফাঁক আমার পকেট। এ পকেট সে পকেট হাতড়াই, কিন্তু নাঃ, নেইকো কোথাও। র'য়েছে দেখলাম ভদ্রলোকের সেই ঠিকানা লেখা সবুজ টিকিটখানা।

পরের দিন বিকেলে কী খেয়াল হ'লো ভাবলাম, দেখাই যাক না ভদ্রলোকের স্ত্রী কেমন চা করেন। দেখেই আসা যাক্ না একবার, যখন অতো ক'রে নেমন্তন্ন করলেন। এগিয়ে চলি অনাবশ্যক ভাবে।

ঠিকানা মত বাড়ীর সামনে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ দেখি আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক সেই বাড়ী থেকেই বেড়িয়ে এলেন। আমাকে দেখেই লাফিয়ে উঠলেন প্রায় 'আরে ভায়া যে, কি খবর?'

ঘাবড়ে গিয়ে, ব'ললাম: 'ভালই। আপনি?'

'খুব ভাল।' ব'লে রহস্যময়ভাবে হাসলেন ভদ্রলোক। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন: 'তা তুমি জানলে কি ক'রে যে আমি এখানে আছি?'

ভদ্রলোকের সংগে আমার আলাপ হ'য়েছিল কোন এক মফঃস্বল সহরে। উনি যে কলকাতায় আছেন এ খবর আমার জানা ছিল না। কি বলি এখন? আমতা আমতা ক'রে ব'লে ফেলি: 'এই সেদিন অসীম ব'ললে আমাকে।'

—: 'অসীম? কোন্ অসীম?' অসীম আকাশ থেকেই যেন পড়েন ভদ্রলোক।

আমার অবস্থা আরো কাহিল। ব'ললাম: 'ওই, ওই, না, না অসীম নয়, কে যেন ব'ললে একটা, ঠিক মনে নেই।

—: 'যাক্, যাক্ চলো ভেতরে চলো।'

—: 'না দেখুন আমি আজ চলি। একটা জরুরী কাজ আছে।' পালাতে পারলেই বাঁচি তখন আমি।

—: 'সে কী হয় কখন? তোমার বৌদির সংগে আলাপ ক'রে যাও এসে যখন।'

—: 'বৌদি !' ভদ্রলোককে অবিবাহিতই জানতাম আমি।

—: 'হ্যাঁ হে, মাত্র মাস তিনেক হ'লো এসেছেন তিনি আমার জীবনে।' আবার সেই রহস্যময় হাসি হাসলেন ভদ্রলোক !

শেষ পর্য্যন্ত যেতে হ'লো ভেতরে এবং আলাপও হ'লো বৌদির সংগে। বেশ মেয়েটি। আমার চেয়ে কিছু বড় কি আমারই সমবয়সী হবেন। চাও তৈরী করতে পারেন বেশ চমৎকার! চায়ের পেয়ালাটা হাতে তুলে দিয়ে বললেন,—: 'কিন্তু মনে থাকে যেন ঠাকুর পো, এবার যেদিন আসবে সেদিন যে সব কাগজে তোমার লেখা বেরিয়েছে সেগুলো সব নিয়ে আসতে হবে।'

বললাম: 'সে কী আর আছে বৌদি।'

—: 'কেন কি হ'লো?'

—: 'হারিয়ে গেছে হয়তো।' চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সহজ ভাবেই বললাম আমি।

—: 'ওই তো তোমাদের দোষ। শুধু 'হয়তো'র ওপর দিয়েই চালাতে চাও সমস্ত জীবনটাকে। অতো সহজ জিনিস এটা নয় [illegible] বাপু, অতো সহজ জিনিস নয়।'

—: 'হ'লোই না হয় খুব শক্ত। এখন ছেড়ে দাও দিকি একবার কেঁদে বাঁচি।'

রাস্তায় আসতে আসতে ভাবতে থাকি এই বিচিত্র দুর্ঘটনার কথা। স্বপ্নেও যা ভাবতে পারে না মানুষ— তাই ঘটে যায় কোথা দিয়ে অকস্মাৎ তার জীবনে। হতবাক হ'য়ে থাকি আমি!

সাবাস দিই সেই বাসের ভদ্রলোককে।

—গান—

বেগম আমীনা

ব্যথা তুমি দিলে আমায় প্রাণে রে—
তাইতে কাঁদি গহন রাতি গানে রে।
দিনের বেলা সবাই আসি—
নেয় যে আমার হাসি রাশি
রাতে ভাসি চোখের জলের বানে রে।

দেয়ার সুখে সুখী আমি মনে—
ফোটে লাখ পারিজাত আমার ফুলের বনে;
নিশার চাঁদে পুছিনু হায়—
'কোমল পরশ কে রে বুলায়?'
চাঁদ কহে, সাগরে যারে টানে রে,
তাইতে কাঁদি গহন রাতি গানে রে॥

দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ

ঘটনাচক্রে ভারতবর্ষ সদ্যসমাপ্ত মহাযুদ্ধের মধ্যে জড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই যুদ্ধের জন্ম ভারতবর্ষের না ছিল প্রস্তুতি, না ছিল অভিজ্ঞতা। ফলে যুদ্ধের প্রচণ্ড ঘূর্ণিতে পড়িয়া ভারতবর্ষ আর্থিক ও সামাজিক জীবনে বহু ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করিয়াছে। পূর্ব্ব এশিয়ার যুদ্ধে সম্মুখবর্ত্তী ভূমিভাগ হিসাবে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাকে আবার সবচেয়ে বেশী দুঃখ বরণ করিতে হইয়াছে। বাংলাতেই বোমা পড়িয়াছে, বাংলার বুকেই জলিয়াছে দুর্ভিক্ষের সর্ব্বগ্রাসী আগুন। এই দুর্ভিক্ষ শুধু লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবন আহুতি লইয়াই সন্তুষ্ট [illegible] নাই, উহার চাপে বাংলার সমাজজীবনে দারুণ বিপ্লব দেখা দিয়াছে। পেটের দায়ে বাংলার নারী ভুলিয়াছে সম্ভ্রম, পুরুষের আত্মসম্মানবোধ ও সুরুচি অভাবের বহ্নিস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। চারিদিকে অনন্ত রিক্তভার ভয়াবহ ছবি দেখিয়া যাহাদের হাত তুলিয়া দিবার সামর্থ্য ছিল, তাহারাও দুর্ভিক্ষের সময় ভয়ে ভয়ে হাত গুটাইয়া লইয়াছে। গ্রাম ছাড়িয়া সহরের রাজপথে মুষ্টিভিক্ষার জন্ত, এক ভাঁড় ফ্যানের জন্ত কাতারে কাতারে মানুষ আসিয়া জমা হইয়াছে, ইহাদের বিষাক্ত নিঃশ্বাস হইতে, ইহাদের অশুচি স্পর্শ হইতে আপনাদিগকে বাঁচাইবার জন্ত স্বচ্ছলতর সমাজের মধ্যে চেষ্টার ত্রুটি দেখা যায় নাই। ক্রমে অসহায় শীর্ণ মৃতদেহের ভিড়ে ফুটপাথ হইয়া উঠিয়াছে পথিকের চলাচলের অযোগ্য। তারপর আবার নূতন ধানের মায়ায় মুমূর্ষুর দল অসংখ্য সঙ্গীসাথীর স্মৃতি বুকে বহিয়া গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৪৩ সালের পর ১৯৪৪ সালে দুর্ভিক্ষের দক্ষিণা লইতে বাংলার গ্রামে গ্রামে দেখা দিয়াছে মহামারী, আবার রোগজীর্ণ হতভাগ্যেরা দলে দলে মৃত্যুমিছিলে যোগ দিয়াছে। এইভাবে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে এবং ১৯৪৪ সালের দুর্ভিক্ষোত্তর মহামারীতে বাংলার লক্ষ লক্ষ নরনারী অপমৃত্যু বরণ করিয়াছে।

১৯৪৩-৪৪ সালের বাংলা। জাপানীদের কবল হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতে সমাগত বিদেশীর সংখ্যা তখন অনেক। বাংলার দুর্ভিক্ষের মর্ম্মন্তুদ সংবাদ এই সব বহিরাগতের মারফৎ দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মানুষের অবহেলায় বাংলাদেশে যে অভাবের তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে, তাহার সহিত ক্রমে অল্পবিস্তর পরিচিত হইয়াছে পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্যদেশ। সকলেই এই দুর্ভাগ্যের জন্ত শাসকসম্প্রদায়কে দায়ী করিয়াছেন, কারণ ষ্টেটসম্যান পত্রিকাও স্বীকার করিয়াছেন যে, এই মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের পশ্চাতে প্রাকৃতিক কোন বিপর্য্যয় ছিল না। ("As we have often observed India has been lucky that her man-made famine has so far remained uncomplicated by any failure of the monsoon." Statesman Editorial, October 31, 1943). শেষ পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট এই দুর্ভিক্ষের কারণ ও ফলাফল সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্ত এবং ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের উপযুক্ত পরামর্শাদি প্রদানের জন্ত স্যার জন উডহেডকে দলপতি করিয়া একটি কমিশন গঠন করিলেন। এই কমিশনে

স্যার জনের সাহায্যকারী সদস্য হিসাবে নিযোজিত হন স্যার মনিলাল নানাভাতি, মিঃ এ্যাফজেড মি আফজল হোসেন ও মিঃ রামমূর্তি। কমিশন দুর্ভিক্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট ও দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বহু লোকের সাক্ষ্যাদি গ্রহণ করেন এবং খাদ্যাদি সংগ্রহ ও বণ্টনের ব্যাপারে অনেক নথিপত্র পাঠ করেন। তারপর অনেক বিচারবিবেচনার শেষে কমিশন সম্প্রতি তাঁহাদের রিপোর্ট প্রকাশিত করিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের এই রিপোর্টটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। রিপোর্টের প্রথম অংশ প্রকাশিত হয় গত মে মাসে এবং ইহার চারি মাস পরে সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে চূড়ান্ত রিপোর্টটি প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম অংশটিতে কমিশন সাক্ষ্যাদি প্রমাণ হইতে সংগৃহীত বাংলার ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের কারণাদি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং এই দুর্ভিক্ষের ফলে ক্ষয়ক্ষতির একটি আনুমানিক বিবরণ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিতীয় অংশে অবশ্য বাংলার দুর্ভিক্ষের কথা আর বেশী বলা হয় নাই, তবে এই অংশে কমিশন সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কি ভাবে চাহিদার অনুপাতে সরবরাহ ব্যবস্থার সমতা রক্ষিত হইতে পারে এবং আমদানী ও শস্য উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের দ্বারা ভারতসরকার হাতে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত রাখিলে জনগণের দুর্ভিক্ষের আশঙ্কাজনিত মানসিক দুর্বলতা কেমন করিয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব তাহাই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া এই শেষাংশে কমিশন জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা সম্পর্কেও অনেক মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন। কমিশন ভারতসরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগের মত করিয়াই বলিয়াছেন যে "দুর্ভিক্ষের ফলে দেশে মহামারী যাহাতে না দেখা দেয় সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা ভারতগভর্ণমেণ্টের কর্তব্য—ইহা ভারতের শাসকবর্গ গত এক শত বৎসরের মধ্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা দ্বারা দেশের লোককে স্বাস্থ্যবান ও শক্তিমান করিয়া তুলিবার দায়িত্বও যে দেশের শাসকবর্গের, তাহা ভারতবর্ষে এখনও পুরাপুরি স্বীকৃত হয় নাই।" ভারতসরকার ইতিপূর্ব্বে ভারতে দুর্ভিক্ষ সম্ভাবনা রোধ করিতে তিনটি দুর্ভিক্ষ কমিশন নিয়োগ করিয়াছিলেন, এই দুর্ভিক্ষ কমিশনগুলি অনুসন্ধানাদি কার্য্য চালাইয়া যথাসময়ে বিস্তারিত রিপোর্টও প্রকাশ করিয়াছিল; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পুনরায় ভারতে ভয়াবহ তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তর সংঘটিত হইয়া লক্ষ লক্ষ অসহায় নরনারীর প্রাণহরণ করিয়াছে। উডহেড কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টের দ্বিতীয় খণ্ডে ভারতের ভবিষ্যৎ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধকল্পে খাদ্য শস্য উৎপাদন, বাহির হইতে খাদ্য আমদানী, জনস্বাস্থ্য শিল্পাদি প্রচারের দ্বারা জনসাধারণের স্বাচ্ছল্যবৃদ্ধি, পণ্যমূল্য, ভূমি ব্যবস্থা প্রভৃতি নানাবিষয়ে অনেক পরামর্শ দিয়াছেন। মোটের উপর, ব্যাপকভাবে দুর্ভিক্ষের সম্ভাব্য কারণ এবং দুর্ভিক্ষরোধের উপায়গুলি আলোচনা করিয়া কমিশন আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের এই কমিশনই শেষ দুর্ভিক্ষ কমিশন এবং তাঁহাদের পরামর্শ মত কাজ করিলে ভারতে দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা একেবারে কমিয়া যাইবে বলিয়া ভারতসরকারের ভবিষ্যতে আর কোন দুর্ভিক্ষ কমিশন নিয়োগ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

মোটামুটিভাবে স্যার জন উডহেড পরিচালিত এই দুর্ভিক্ষ কমিশন চিন্তাশীলতা ও সত্যানুবর্ত্তিতার পরিচয় দিয়া জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছেন। কমিশন গতানু-গতিকভাবে সরকারের অব্যাহত গুণকীর্ত্তনের চেষ্টা করেন

নাই এবং সাহসের সহিত সরকারী কার্য্যের অনেক কঠোর সমালোচনাও করিয়াছেন। সরকার কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াও এই কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে সরকারী কার্য্যনীতির যে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে ভবিষ্যতে ভারতের জনগণের দু:খের দিনে অধিকতর সরকারী সহানুভূতি লাভের পথ নিঃসন্দেহে অনেকটা পরিষ্কার হইয়া গেল।

দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টের প্রথম খণ্ডে কমিশন বলিয়াছিলেন যে, বাংলার দুর্ভিক্ষে মোটের উপর ১৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে এবং ইহার ১০ লক্ষ মরিয়াছে ১৯৪৩ সালের প্রকৃত দুর্ভিক্ষে ও বাকী ৫ লক্ষ মরিয়াছে ১৯৪৪ সালের দুর্ভিক্ষোত্তর মহামারীতে। কিন্তু অনেকেই এই হিসাব ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগ নানাভাবে সংখ্যাতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায় বাংলার দুর্ভিক্ষে ৩৫ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করিয়াছিল। বলা বাহুল্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মতামতের অবশ্যই একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। তারপর ১৯৪৪ সালে একমাত্র ম্যালেরিয়াতেই বাংলার ছকোটি লোক শয্যাগ্রহণ করিয়াছিল এবং ইহাদের অনেকেই যে অনাহারক্লিষ্ট শরীরে ব্যাধির তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এইভাবে দুর্ভিক্ষোত্তর মহা-মারীতে যাহারা মরিয়াছে তাহাদের ব্যাধির কবলে পতিত হওয়ার পিছনে দুর্ভিক্ষজনিত ভগ্নস্বাস্থ্য অবশ্যই একটি বড় কারণ। ইহাদের একাংশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যার সহিত যুক্ত করিলে দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলার মৃত্যুসংখ্যা ৫০ লক্ষের কাছে গিয়াই পৌছাইবে। যাহা হউক দুর্ভিক্ষের কারণ সম্বন্ধে কমিশন অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উডহেড কমিশন স্বীকার করিয়াছেন যে, বাংলার বিভিন্ন জেলার সরকারী কর্ম্মকর্ত্তারা ১৯৪৩ সালের প্রথম হইতেই জেলার খাদ্যা-ভাব সম্পর্কে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষকে সচেতন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ সেই সাবধানবাণীতে কর্ণপাত করেন নাই। শুধু এই সকল জেলা কর্ম্মকর্ত্তা নয়, বাংলার সংবাদপত্রসমূহও এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাংলা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ১৯৪৩ সালের ২৩শে জানুয়ারী বিলাতের টাইমস পত্রিকাতে পর্য্যন্ত এই সম্পর্কে ভারতসরকারকে সাবধান করিয়া একখানি জরুরীপত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রের প্রথমেই ছিল—The Government of India is embarking on a policy which will produce a famine and cost many thousands of lives." দুর্ভিক্ষ শুরু হইবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বিলাতের 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকাও বাংলার খাদ্যাভাব সম্বন্ধে অবহিত হইয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া বলেন—"So critical the condition created by the high prices and black market appears that the problem of the cost of living threaten to overshadow the war itself." এই কমিশন দুর্ভিক্ষের কারণ নির্দ্দেশ করিতে একদিকে যেমন সরকারের নিশ্চেষ্টতার কথা বলিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি চোরা বাজার, পণ্যাভাব, চাহিদাবৃদ্ধি ও আমদানী হ্রাসের উপরও জোর দিয়াছেন। কমিশন হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, দুর্ভিক্ষে মৃত ১৫ লক্ষ লোকের মৃত্যুর বিনিময়ে চোরাবাজারের ব্যবসায়ীরা লাভ করিয়াছে প্রায় দেড়শত কোটি টাকা, অর্থাৎ প্রত্যেকটি নরবলির

বিনিময়ে তাহারা প্রায় এক হাজার টাকা পকেটস্থ করিয়াছে। চোরাবাজারী নরপিশাচগণ সরকারের চোখের সামনে এই কাজ করিয়াছে।

রিপোর্টের দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলার দুর্ভিক্ষের কথা বিশেষ বলা হয় নাই। এই অংশে কমিশন প্রধানতঃ একমাত্র দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের বিধিব্যবস্থা সম্পর্কেই পরামর্শ দিয়াছেন। প্রথমেই তাঁহারা বলিয়াছেন, সুবিধামত আমদানী বৃদ্ধি করিয়া খাদ্যশস্য মজুত করিবার কথা। ব্রহ্মদেশ হইতে সারাভারতের প্রয়োজনের শতকরা আড়াইভাগ এবং বাংলার প্রয়োজনের শতকরা প্রায় ১০ ভাগ চাউল আসে। ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ যে ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানী বন্ধ, তাহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। তাছাড়া কমিশন এদেশের কৃষির উন্নতিসাধন করিয়া ফসল বাড়াইবার প্রয়োজনের উপরও জোর দিয়াছেন। কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারকে সর্বদা ৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য অসময়ের জন্য হাতে মজুত রাখিতে পরামর্শ দিয়াছেন এবং খাদ্যবস্তুর দাম হঠাৎ খুব পড়িয়া না যায় অথবা খুব চড়া না থাকে. সেই দিকে তাহাদিগকে সজাগ থাকিতে বলিয়াছেন। কমিশন স্বীকার করিয়াছেন যে সাধারণ সময়েও ভারতের শতকরা ৩০ জন লোক পর্য্যাপ্ত আহার না পাইয়া অস্বাস্থ্যজনিত বিড়ম্বনা ভোগ করে, সুতরাং তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পুষ্টিকর খাদ্যব্যবস্থা এবং জনস্বাস্থ্যসংরক্ষণের ব্যাপক ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র দেশে সকলের পক্ষে প্রচুর দুগ্ধসেবন সম্ভব নহে বলিয়া কমিশন মাছের চাষ বাড়াইতে এবং আলু, মিষ্টি আলু ও কলায় উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টের দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রামোন্নয়ন সম্পর্কেও অনেক কথা বলিয়াছেন। চাষ আবাদ বাড়ান ছাড়া সেচ, সার, উন্নতধরণের বীজ, যৌথনীতিতে চাষ প্রভৃতি ব্যবস্থার উন্নতিসাধন ও কুটিরশিল্পের প্রসার এদিক হইতে অত্যাবশ্যক বলিয়া তাঁহারা মতপ্রকাশ করিয়াছেন। জনসাধারণের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করিতে জলতাড়িত বিদ্যুতের সাহায্যে বড়বড় শিল্পকারখানা স্থাপনের প্রয়োজনের উপরও তাঁহারা জোর দিয়াছেন। কমিশন আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতে সম্প্রতি যেভাবে লোকবৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে আগামী ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা বর্তমানের ৪০ কোটি হইতে ৫০ কোটিতে পৌঁছাইবে। এই বাড়তি জনতার একাংশকে তাঁহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত জনবিরল অষ্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড, ক্যানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে ছড়াইয়া দিতে বলিয়াছেন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই মারাত্মক হার রোধ করিতে তাঁহারা প্রসূতিসদন, শিশুমঙ্গল সমিতি ও মহিলা ডাক্তারদের মারফত বহু সন্তানবতী ও দীর্ঘদিন অন্তর সন্তান-কামিনী নারীদের জন্মশাসন সম্বন্ধে শিক্ষাদানের সুপারিশ করিয়াছেন। একটি পৃথক মন্তব্যে কমিশনের অন্যতম সদস্য স্যার মণিলাল নানাভাতি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা আশু রহিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন।

উপরোক্ত উপদেশ ও পরামর্শাদির যৌক্তিকতা আমরা অস্বীকার করিনা; কিন্তু এইগুলির অধিকাংশই বর্তমান কতদূর কার্য্যকরী হইবে তৎসম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে। অবশ্য ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিলে এই বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদশালী দেশে শিল্পাদি প্রসারিত এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধিত হইয়া ভারতবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতি ও আর্থিক সমৃদ্ধি সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু কমিশনের কতকগুলি

সুপারিশের সহিত আমরা একমত নহি। কমিশন বলিয়াছেন যে, ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখিলে ভারতবর্ষে ১৯৫১-৫২ সাল নাগাদ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু আমাদের মনে হয় ভারত-সরকার সহানুভূতিসূচক মনোভাব দেখাইলে যুদ্ধের আগের অবস্থা ফিরিয়া আসিতে ৬।৭ বৎসর লাগিবার কোন কারণ নাই। জনসমস্যা সম্বন্ধে কমিশন যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহা আমাদের ভাল লাগে নাই। অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত উপনিবেশে বর্ণবিদ্বেষের যে বিষ পুঞ্জীভূত হইয়া আছে তাহাতে ভারতবাসীর এই সকল স্থানে যাইবার অর্থ চিরকালীন হীনতা ও অপমান বরণ করা। তার পর জন্মশাসন অবলম্বন করিয়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করার যৌক্তিকতা অন্য যে কোন দেশেই থাকুক, ভারতবর্ষে আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ পূর্ণভাবে কাজে লাগাইলে এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করা হইলে ভারতবর্ষ অনায়াসেই ইহার ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার ভরণপোষণ করিতে পারে। স্যার মণিলাল নানাভাতি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লোপের জন্য যে পৃথক সুপারিশ করিয়াছেন আমরা তাহার সহিত একমত; এই সম্বন্ধে কমিশনের সকল সভ্য কেন একমত হইতে পারিলেন না তাহা ভাবিয়া আমবা বিস্মিত হইয়াছি। তবে আনন্দের কথা বাংলা সরকার ফ্লাউড্ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লোপ করিবার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

উপনদী

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

(৪)

সুলেখা চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। বাহিরের অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠিল—ওই ঘন অন্ধকারের অতল রহস্য সুলেখার ক্লান্ত শ্রান্ত চিত্তের সহিত গভীর মিতালি পাতাইতে চাহে।

বহুদিন পরে আজ তাহার অনেক কথা মনে পড়ে। তাহার কৈশোর এবং যৌবনের দিনের কথা—সেই উত্তেজনাময় জীবন এমনি অন্ধকারের মাঝে নিঃসহায় পথভ্রান্ত হইয়া কখনও কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরে নাই।

অশোককে দেখিয়া তাহার সকলের কথা মনে পড়িল। তাহার পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, একে একে অনেক জনের কথাই আজ তাহার মনের কোণে ভিড় জমাইয়া তাহার বিস্মৃতিকে জাগাইয়া তুলিল। আজ তাহার আর কেহই নাই—আজ সে একা! এই বিজন বিশ্বমাঝে এই কোলাহল-মুখর পৃথিবীর মাঝে একান্ত একা! তাহার কথা ভাবিবার মত সংসারে কেহই নাই। অশোক অলক্ষ্যে তাহার হৃদয়ের গোপনতম প্রদেশে—

তাহার ক্ষতস্থানে আঘাত করিয়াছে। সে আঘাত অতি তীব্র, সুলেখা মর্মের মাঝে সে আঘাতের বেদনা অতি স্পষ্টভাবে অনুভব করিতেছে।

যে নির্জনতার সঙ্গে তাহার এতদিনের পরিচয় আজ সে নির্জনতা অসহ্য। সুলেখা উঠিয়া পড়িল। বইএর সেল্‌ফ হইতে টানিয়া লইল Aldous Huxleyর অমর গ্রন্থ Brave New World, বইখানি তাহার নির্জন মুহূর্তের বন্ধু। গভীর অনুরাগের সহিত সুলেখা পাড়য়া যাইতে লাগিল—The world's stable now. People are happy, they get what they want, and they never want what they can't get, They 're well off; they 're safe; they 're never ill; they 're not afraid of death; they 're blissfully ignorant of passion and old age; they 're plagued with no mothers or fathers: they 've got no wives, or children, or lovers to feel strongly about; they 're so conditioned that they practically can't help behaving as they ought to behave. And if anything should go wrong, there's Soma. সুলেখা চীৎকার করিয়া ওঠে—Oh there's Soma! Soma!!

চোখ দুটি তাহার জ্বালা করিতে থাকে—অক্ষরগুলি অস্পষ্ট হইয়া যায়—সুলেখা বইখানি ফেলিয়া দিয়া পুনরায় গাঢতর ক্লান্তিতে ঢলিয়া পড়ে।

দামিনী ঝি আসিয়া বলে—দিদিমণি অনেক রাত হোল খাবার দিই এবারে?

সুলেখা ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিল—রাত্রি দশটা বাজিয়া গেছে—রাত্রি নয়টায় তাহার আহারের নির্দিষ্ট, সময়, কিন্তু আহারে আজ তাহার রুচি নাই।

সুলেখা কহিল—দামিনি! তুমি খেয়ে দেয়ে রান্নাঘরের কাজ মিটিয়ে ফেল—আমি আজ আর কিছু খাবো না; ক্ষিদে নেই।

তারপর সে অন্ধকার দিগন্তের পানে তাকাইয়া কখন না জানি ঘুমাইয়া পড়িল।

(৫)

পরদিন সন্ধ্যাবেলা অশোক আসিল।

আসিয়াই সাহিত্য-প্রসঙ্গ তুলিল। হাতের একখানি বই দেখাইয়া কহিল

—বইখানা পড়েছেন? *Oh it's a great book!*

—কি, রাশিয়ান লেখক Mikhail Artsibashevএর Sanine তো?

—হ্যাঁ, আপনার তা হলে পড়া বই?

—অনেকদিন আগে পড়েছি।

—যখন পড়েছিলুম তখন খুবই ভালো লেগেছিল।

—এখন আর লাগে না?

—না, তেমন ভালো লাগে না। তার কারণ হচ্ছে—তখন বয়স ছিল কম। পৃথিবী সম্বন্ধে তখনকার ধারণার সঙ্গে আজকের ধারণার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আর সে মনই এখন আর নেই—তাই তখন যেমন ভালো লেগেছিলো আজ আর তেমন ভালো লাগে না।

—কিন্তু খাঁটি রিয়ালিষ্টিক লেখা।

—হ্যাঁ, সিনিক!

—কিন্তু কী boldness বলুন তো? জীবনদর্শনের কী নির্ভীক অভিব্যক্তি! সাহিত্য সম্বন্ধে এতখানি অনুরাগ—সাহিত্যকে এতখানি বড় করে দেখতে খুব কম

লেখককেই দেখেছি। সাহিত্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন লেখক—Literature reconstructs life, and penetrates even to the very life-blood of humanity from generation to generation. To destroy literature would be to take away all colour from life and make it insipid.

অশোকের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরে কাহার গলার শব্দ শোনা গেল—ডাক্তারবাবু আছেন—ডাক্তারবাবু?

সুলেখা উঠিয়া বাহিরে আসিল।

আগন্তুক খুব ব্যস্তভাবে বলিলেন—আমি মৃদুলার বাবা। পরক্ষণেই অশোককে দেখিয়া তিনি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন—এই যে ডাক্তারবাবু, আপনার খোঁজেই এসেছি। আপনার বাড়ীতে শুনলুম আপনি এখানেই এসেছেন।

অশোকের পূর্বেই সুলেখা কহিল—ভেতরে আসুন

আগন্তুক অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—ভেতরে যাবার সময় নেই—ডাক্তারবাবুকে আমার সঙ্গে এক্ষুণি একটু যেতে হবে।

অশোক প্রশ্ন করিল—ব্যাপার কি?

—মৃদুলা কি রকম করছে। তাকে দেখে যেন ভালো বোধ হচ্ছে না।

—কেন কী হোল তার আবার?

—হ্যাঁ আজ সকালেও বেশ ছিলো। বিকেলের দিকে কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে। কেবল বলছে বুক ধড়ফড় করছে—তারপর কিছুক্ষণ আগে অজ্ঞান হয়ে পড়লো।

—অজ্ঞান হয়ে পড়লো? এখন জ্ঞান হয়েছে?

—হ্যাঁ, কিন্তু অত্যন্ত নিস্তেজ ভাব—কথা বলছে না।

—আচ্ছা আপনি যান—আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।

মৃদুলার বাবা চলিয়া গেলে সুলেখা কহিল—চলো অশোক, তোমার সঙ্গে মৃদুলাকে আমিও একবার গিয়ে দেখে আসি।

অশোক বলিল—আপনি যাবেন? এই অন্ধকারে?

—তাতে কি হয়েছে? তুমি বরঞ্চ ফিরবার পথে আমাকে পৌঁছে দিয়ে যেও।

—বেশ চলুন। আমাকে কিন্তু একবার বাড়ি ঘুরে যেতে হবে টেথিস্কোপ আর ব্যাগটা নিতে—একটা কার্ডিজল ইন্‌জেকসনের হয়ত দরকার হবে।

—মৃদুলার কি হার্ট ডিজিস্? এই বয়সেই এমনি বুকের রোগ।

—হ্যাঁ, Heartটা খুব weak সেদিন দেখলুম—ভারী ছেলেমানুষ আর সেন্টিমেণ্টাল। নিশ্চয়ই আজ বাড়ির কারুর সঙ্গে ঝগড়া করেছে তাতেই এমনি করছে।

সুলেখা হাসিয়া কহিল—হ্যাঁ ওর পক্ষে ছেলেমানুষী করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়—She's quite a young girl now! আমাদের দেশ বলেই বাপমায়ে শ্বশুরবাড়ির কথায় পাকা করে তোলে, অন্য দেশে ওদের মতন বয়সের মেয়েরা এখন ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

তারপর সুলেখা স্যাণ্ডেলটা পায়ে গলাইয়া লইয়া টর্চের বোতাম টিপিয়া কহিল চলো—I am ready!

দুজনে রাস্তায় বাহির হইয়া নিঃশব্দে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল।

অশোকের ঘরখানি তেমনি অগোছালো।

সুলেখা দেখিল—ইজিচেয়ার, খাট বালিশ বিছানাপত্র, বই আলমারি, ছবি ফার্নিচার সব কিছুর মাঝেই অপরিচ্ছন্নতা এলোমেলো ভাব। অবিবাহিত ছন্নছাড়া জীবনের উদাসীনতা দৃষ্টির এক লহমাতেই বোঝা যায়।

কিন্তু ইহা লইয়া আলোচনার সময় এখন নাই। অশোক বাড়ি ঢুকিয়াই তাহার ব্যাগটায় প্রয়োজনমত সবকিছু ভরিয়া লইল। দেওয়ালের গা হইতে টেথিস্কোপটি টানিয়া লইয়া বলিল, চলুন।

দুজনে আবার পথে বাহির হইল।

এবারে সুলেখাই প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল—তুমি ভারী অগোছালো—জিনিষপত্রের প্রতি একটুও যত্ন তোমার নেই।

দুর্বল অশোক হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—একদিন এসে ঘরটা গুছিয়ে দিয়ে যাবেন—মেয়েরা ছাড়া ওকাজ ঠিক হয় না।

অন্ধকারের মাঝে সুলেখা হঠাৎ হোঁচট খাইল। অশোক চট্ করিয়া তাহার একখানি হাত ধরিয়া ফেলিল—আস্তে চলুন, রাস্তাটা ভারী উঁচু নীচু।

সুলেখা কহিল টর্চটা আমার হাতে দাও।

নিরুত্তরে অশোক সুলেখাকে টর্চটি দিল।

রাস্তায় দু একজনের সহিত দেখা হইল—অশোকের সহিত দু একজনের দু একটি কথারও বিনিময় হইল—সুলেখার সহিত তাহাদের লৌকিক আলাপ পরিচয় নাই। তাহা না থাকিলেও এখানকার গার্লসস্কুলের হেড্-মিস্ট্রেসকে তাহারা সকলেই চেনে।

আশ্চর্যের কথা, যাহাকে কোনদিনই পথেঘাটে দেখা যায় না, কোন সামাজিক অনুষ্ঠান কিংবা কোন বাড়ীর সহিত যাহার কোন সম্পর্ক নাই—আজ অন্ধকার রাত্রে তাহাকেই দেখা যাইতেছে নবাগত ডাক্তারের সহিত নিঃসংকোচে পথভ্রমণ করিতে।

সুলেখার গম্ভীর পদক্ষেপে মুখ ফুটিয়া কেহই কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারে নাই—কিন্তু অন্ধকারে তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিলে হয়ত দেখা যাইত যে তাহারা মুখ টিপিয়া হাসিতেছে।

(৬)

মৃদুলার বাড়ীতে পৌঁছাইতে দেখা গেল বহুলোকের ভিড়। মৃদুলার অসুখে সবাই যেন চঞ্চল হইয়াছে। পল্লীসেবা সমিতি হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের তরুণ সম্প্রদায়—স্কুলের আর দু একজন মিস্ট্রেস্—কবিরাজ হোমিওপ্যাথ সকলেই আসিয়াছে।

মৃদুলারা খুবই সামাজিক, বিশেষ করিয়া মৃদুলা মেয়েটি সবারই অত্যন্ত প্রিয়।

ডাক্তার অশোক মিত্তিরের সহিত হেড্‌মিস্ট্রেস সুলেখাকে মৃদুলাদের বাড়ীতে অযাচিতভাবে আসিতে দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। মৃদুলার অসুখের কথা ছাড়িয়া সকলেই আজিকার এই আকস্মিকতার কথা ভাবিতে লাগিল।

মৃদুলার মা আসিয়া সুলেখাকে আহ্বান জানাইলেন—আসুন, মৃদুলার কাছে আপনার কথা শুনেছি। ওর অসুখের উপলক্ষে তবু আপনি এলেন!

সুলেখা কহিল—এখন কেমন আছে মৃদুলা?

মৃদুলার মা বলিলেন—আজ বিকেল থেকেই কেমন করছে যেন!

অশোকের মুখে চোখে চিকিৎসকের গাম্ভীর্য। টেথিস্কোপ দিয়া হৃদয় পরীক্ষা করিয়া অশোক মৃদুলার মুখের দিকে তাকাইল। তারপর সমবেত জনতাকে লক্ষ্য

করিয়া কহিল—আপনারা দয়া করে ভিড়টা ছেড়ে দেবেন—ভয় পাবার কিছুই নাই। আপনারা ওঘরে যান—রোগীকে আমার কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে।

সকলেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

অশোক মৃদুলাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—কি, হয়েছে কি তোমার? এবকম দুষ্টুমি করছো কেন?

মৃদুলা ক্ষীণস্বরে বলিল—আমার বুকের ভেতর যন্ত্রণা হচ্ছে খুব।

অশোক প্রশ্ন করিল—হুঁ। আর কি হচ্ছে?

—বড্ড ভয় করছে—কে যেন কেবল আমায় ভয় দেখাচ্ছে।

—নিশ্চয়ই মার সঙ্গে আজ ঝগড়া করেছিলে?

—মা কেন বললে—কেবল ডাক্তার ডাক্তার করছিস্ কেন? তোর চিকিৎসায় যে সর্বস্বান্ত হতে বসলুম—ডাক্তার ডাকলেই তো শুধু হোল না!

অশোক গম্ভীর হইয়া গেল; বলিল—তা ঠিক কথাই বলেছেন। ডাক্তারের কিচ্ছু দরকার নেই, তুমি এখন বেশ ভালো আছো।

—তবে আপনি এসেছেন কেন?

—তোমার বকতিক মেটাতে। অশোক স্পিরিট দিয়া ইনজেকসনের সিরিঞ্জ পরিষ্কার করিতে লাগিল।

মৃদুলা কহিল—ওটা কি হবে?

—তোমার দুষ্টুমির সাজা দিতে হবে তো!

—না, ভারী লাগে আমার। ইনজেকসন আমি নেবো না।

—তাহলে অসুখ সারবে কেমন করে?

—এইতো বললেন—অসুখ আমার নেই।

অশোক হাসিয়া উঠিল। স্পিরিট ভিজানো তুলাটা মৃদুলার কোমল বাহুতে ঘষিতে ঘষিতে বলিল—এখন অবিশ্যি তোমার একটু অসুখ করেছে—মার সঙ্গে ঝগড়া করার দরুণ—ভগবান তাই এইটুকু শাস্তি দিচ্ছেন।

—আপনি কি ভগবান?

—হ্যাঁ, ভগবানের দূত।

অশোক ইনজেকসনের সিরিঞ্জ ঠিক করিয়া লইয়া মৃদুলার বাহুর প্রতি লক্ষ্য স্থির করিতেই মৃদুলা কাঁপিয়া উঠিল—বাহুদ্বয় তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে!

অশোক কহিল, ওকি—ওরকম কাঁপছো কেন

—না, লক্ষ্মী ডাক্তারবাবু, আমি আর ঝগড়া করবো না—আমার হাত ফুটিয়ে দেবেন না, একবার আমার ভারী লেগেছিলো।

অশোক হাসিয়া আশ্বাস দিল—আমার হাতে নিশ্চয়ই নয়।

—না—সে অন্য ডাক্তার।

—আচ্ছা দেখ আমি কেমন লক্ষ্মী ডাক্তার—একটুও লাগবে না তোমার—লাগলে বরঞ্চ তুমি দুটো ঘুঁষি মেরো আমায়।

মৃদুলা আর বাধা দিল না। অশোক ইনজেকসন্ দিয়া বেন্‌জইন্ দিয়া ক্ষতস্থান মুছিয়া দিতে দিতে কহিল—কেমন, লক্ষ্মী ডাক্তার তো? একটুও লাগেনি কিন্তু!

মৃদুলা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

অশোক মৃদুলাকে কহিল—লেখাদি যে তোমাকে দেখতে এসেছেন!

—লেখাদি?

মৃদুলার মা কহিলেন—হেড মিসট্রেস্।

মৃদুলা আগ্রহ প্রকাশ করিল—সুলেখাদি?

সুলেখা ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল—কী খবর মৃদুলা—কেমন আছো?

—এখন বেশ ভালো আছি।

অশোক হাসিয়া কহিল—আপনার ছাত্রী কিন্তু আমার লক্ষ্মী ডাক্তার বলে স্বীকার ক'রেছে। আপনি ওকে একটু শাসন করে যানতো—মার সঙ্গে কেবল ঝগড়া করে।

সুলেখা বলিল—তাই নাকি ?

মৃদুলার মা অশোকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন - তুমি ছিলে তাই বাবা রক্ষে—এমনি ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলো মেয়েটা।

অশোক বলিল—ভয়ের কিছু কারণ নই—কাল ওকে স্পঞ্জ করে বেশ করে চান করিয়ে দেবেন ; আর মাছের ঝোল ভাত খেতে দেবেন। আর একটুও বকবেন না। যখনি দরকার হবে আমাকে ডাকবেন—কোন ইতস্তত করবেন না।

মৃদুলার বাবা আসিয়া ডাক্তারের ভিজিটের টাকা দিতে গেলে অশোক তাহা ফিরাইয়া দিয়া কহিল—ভিজিট্ থাক্।

মৃদুলার মা আপত্তি জানাইয়া কহিলেন—না, না, সে কি। মৃদুলা ছেলে মানুষ কি বলতে কি বলেছে। আমি ওকে বলেছিলুম তোর কেবল ডাক্তারের বাতিক। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই কী ডাক্তার বসে থাকবে ?

অশোক বাধা দিয়া বলিল —না, না, সে কথার জন্যে মোটেই নয়। টাকা থাক্ এখন ; পরে ও বিষয়ে কথাবার্তা বলা যাবে।

সুলেখার দিকে তাকাইয়া অতঃপর সে কহিল—চলুন লেখাদি, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

সুলেখা মৃদুলার মা ও বাবাকে নমস্কার জানাইয়া বলিল— আচ্ছা চলি তবে। আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে খুশী হলুম। এতদিন মৃদুলাকেই শুধু চিনতুম—বড় ভালো মেয়ে ও, লেখাপড়ায় পরিষ্কার মাথা। আমি ওকে খুব ভালোবাসি।

মৃদুলার মা কহিলেন—আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে এই একটি মাত্র মেয়ে আমার, তাই ভারী আব্দারে আর বদমেজাজী। তাছাড়া ওর সব কিছুই ভালো।

সুলেখা এবং অশোক বাড়ীর পথে পা বাড়াইলে মৃদুলার মা অনুরোধ জানাইলেন সুলেখাকে—মাঝে মাঝে আসবেন।

সুলেখা যাইতে যাইতে কহিল—আসবো। আপনিও কিন্তু যাবেন একদিন আমার বাড়ি।

(ক্রমশঃ)

কবি কালিদাস

পণ্ডিত শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ

কবির মধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠ, এই সত্যগর্ভ প্রবাদটি যেমন ভারতীয়দের মনোরাজ্যে তেমনি ভারতের আকাশে বাতাসে যেন অনুক্ষণ অনুরণিত হইয়া থাকে। বহুকাল প্রচলিত কবি কালিদাসের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতাসূচক এই যে গৌরববাণী এটি কি কেবল স্বদেশীয় কবির প্রতি বিচারমূঢ় দেশবাসিগণের অন্ধস্তাবকতা না প্রকৃত গুণীর যথার্থ গুণের সম্যক আদর প্রদর্শন? বিবেকীর সমাজে ঝুটা কোনদিন সাচ্চা বলিয়া সমাদৃত হয় না—হইতে পারে না। দৃষ্টির দোষে খাদ কোনওদিন খাঁটি সোনা রূপে প্রতীয়মান হইলেও দূরদর্শীর বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে উহা চিরদিনই ভেল বোধে উপেক্ষিত হয়। কবি কালিদাসের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ অবধারণে আমরা তাঁরই কথায় বলিব, স্বর্ণের পরীক্ষার নিকষ যেমন অগ্নি, কবিকৃত কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও অপকৃষ্টত্ব বিচারের সাহায্যেই তেমনি কবির বরত্ব ও অবরত্ব নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। "হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা" (রঘু, ১ম, ১০)।

এই বর্ষীয়সী বিবিধজ্ঞান-বিজ্ঞানধাত্রী ভারতভূমিতে কালিদাস বাগ্‌দেবী সরস্বতীর "বরপুত্র", "কবিগুরু" প্রভৃতি অনিতরসুলভ যশোময় নামে চিরদিন সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। ইহা কি সত্যসত্যই কানা ছেলের পদ্মলোচন নামের মত নিছক ব্যাজস্তুতি না প্রকৃত গুণীর স্বরূপকীর্ত্তন? অপক্ষপাত বিচারবুদ্ধিতে অনুধাবন করিলে সুস্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে সরস্বতীর বরপুত্র, কবিগুরু প্রভৃতি গৌরবময় উপাধি সুধীসমাজে কখনও অপাত্রে অর্পিত হইতে দেখা যায় নাই। কোনও ক্ষেত্রে নৈসর্গিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে উহাকে নিছক ব্যঙ্গোক্তি বলিয়াই বুঝিতে হইবে। স্মরণাতীত কাল হইতে অদ্যতন কাল পর্য্যন্ত ঐ অনন্যসাধারণ প্রশংসাত্মক উপাধিগুলি কেবল কালিদাসের নামটিকেই কবিশ্রীমণ্ডিত করিয়া আসিতেছে। এই বৈশিষ্ট্যের কি কোন সুযুক্তি-সম্মত কারণ নাই? অবশ্যই আছে। ঐ বৈশিষ্ট্যের কারণের কিঞ্চিৎ অনুসন্ধানই এই আলোচনার মুখ্য লক্ষ্য। সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত যাঁহারা অন্ততঃ অল্পবিস্তর পরিচিত, তাঁহারা সকলেই বিদিত আছেন, "উপমা কালিদাসের কবিতার সারসর্ব্বস্ব" "উপমা কালিদাসস্য" এই প্রশংসাটি বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার নিদান কি? মূল নিদান—অলঙ্কার বস্তুটি কবিতার (কাব্যের) চরম ও পরম সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক। সংস্কৃত সাহিত্যে স্থূলতঃ অলঙ্কার দ্বিবিধ। প্রথম শব্দালঙ্কার, দ্বিতীয় অর্থালঙ্কার। শব্দঘটিত অর্থাৎ যে শব্দটি থাকিলে যে কবিতায় যে অলঙ্কার হয়, এবং যে শব্দটি না থাকিলে (উঠাইয়া দিলে) যে কবিতায় সে অলঙ্কারটি থাকে না, তাহার নাম শব্দালঙ্কার। যমক, অনুপ্রাস, শ্লেষাদি ভেদে শব্দালঙ্কার নানাবিধ। যেমন 'সেই পুরুষই পুরুষ' 'স পুমান্ পুমান্।' এস্থলে একটি পুরুষ শব্দ উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে 'মানব' শব্দটি বসাইলে আর অনুপ্রাস নামক শব্দালঙ্কারটি হইতে পারে না। এইরূপ নির্দ্দিষ্ট কোনও একটি অর্থের অন্বয় ব্যতিরেক

নিবন্ধন কোনও একটি কবিতায় নির্দিষ্ট একটি অলঙ্কার হইলে উহাকে অর্থালঙ্কার বলে। যেমন, 'নরপতির অধরটি সুধার ন্যায় মধুর,' 'মধুর সুধাবদধর:' এস্থলে সুধা শব্দের অমৃত অর্থটির পরিবর্তে যদি চূণ অর্থ ধরা যায়, তাহা হইলে উপমা অর্থালঙ্কারটি থাকিতে পারে না। হার, বলয়াদি মাংসশোণিতময় দেহের সৌন্দর্যাপুষ্টি করে বলিয়া যেমন উহাদের নাম অলঙ্কার, যমক অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দের, উপমা রূপক দৃষ্টান্ত প্রভৃতি অর্থের উপলক্ষণে রস, গুণ ও রীত্যাদির দেহবিশিষ্ট কবিতার শোভা বর্দ্ধন করে বলিয়া উহাদের নাম অলঙ্কার। উপমা অলঙ্কারটি যাবতীয় অর্থালঙ্কারের উপজীব্য বলিয়া উহা অর্থালঙ্কারের শিরোরত্ন। ইহার কারণ, উৎপ্রেক্ষা রূপক নিদর্শনা প্রভৃতি তাবৎ অলঙ্কারের প্রাণ সাদৃশ্য; উপমায় সাদৃশ্যটি মুখ্যভাবে এবং উপমাজাতীয় উৎপ্রেক্ষাদিতে সাদৃশ্যটি গৌণভাবে বিদ্যমান থাকে। চিন্তাশীল সুধীগণ একটু সূক্ষ্ম অনুধাবন করিলেই প্রত্যেক অর্থালঙ্কারের ভিতর পৃথিবীর সর্বত্র অদৃশ্য বায়ুস্পন্দনের মত উপমার মুকুলিত অবস্থাটি উপলব্ধি করিতে পারেন। উপমা অলঙ্কারটি সকল প্রকার অলঙ্কারের শিরোভূষণ এবং কাব্য সম্পদের শ্রেষ্ঠরত্ন, ইহাই আমার সুদৃঢ় ধারণা।

কালিদাস তাঁহার কাব্যে উপমার যে অপূর্ব হার গাঁথিয়াছেন, অদ্যাপি ভারতে বিদেশীয় মণিকারের বিজাতীয় হারের কোলাহলময় বাজারে উহার মূল্যের এতটুকু হ্রাস হয় নাই। অলঙ্কারের সুবৃহৎ সাম্রাজ্যে উপমার কিরূপ মানমর্য্যাদা উহা অতি প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য হইতে অতি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে রসজ্ঞ পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা কবিতায় অলঙ্কারের কদরের কিঞ্চিৎ খোঁজখবর রাখেন, তাঁহারা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিবেন। আমরা এখানে কালিদাসের কাব্যরত্নাকর হইতে অপটু ডুবরীর দুর্বল হস্তে সংগৃহীত মহাকবির প্রথম মহাকাব্য রঘুবংশ হইতে কয়েকটি উপমার উদাহরণ উদ্ধার করিয়া কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্বের কিঞ্চিৎ নিদর্শন প্রদর্শন করিলাম :—

(১) শব্দ ও অর্থের মত নিত্য সংমিলিত জগতের মাতাপিতা শিব ও শিবানীকে বন্দনা করি। ১ম, ১।

(২) উন্নত বৃক্ষাগ্রস্থিত ফললাভে লোলুপ, উত্তোলিত হস্ত বামনের ন্যায় অল্পবুদ্ধি আমি (কালিদাস) দুর্লভ বিষয়ের কামনা করিতেছি। ঐ, ২।

(৩) ক্ষীরসাগর হইতে ইন্দুদয়ের মত রঘুবংশে নৃপ দিলীপের জন্ম হইয়াছে। ঐ ১২।

(৪) বর্ষণের জন্য মেঘের জল সঞ্চয়ের ন্যায় রাজা দিলীপ কেবল দানের জন্য ধন সঞ্চয় করিতেন। ৪র্থ, ৮৬।

(৫) নক্ষত্র, তারা ও গ্রহগণে সমাকীর্ণা হইলেও রাত্রি কেবল চন্দ্রের আলোকে আলোকিত হয়। ৬, ২২।

(৬) যেমন কেবল মধুররস বৃষ্টির জল উষর মরু প্রভৃতি দেশভেদে মধুরলবণাদি রসযুক্ত হয় তদ্রূপ নির্বিকার অদ্বিতীয় পুরুষ আপনি (বিষ্ণু) সত্ত্বাদি গুণভেদে পালকত্বাদি অবস্থা গ্রহণ করেন। ১০ম, ১৭।

(৭) পুত্র ও রিপু উভয়ের নামে বর্তমান একই নাম রাম ও (পরশু) রাম রাজা দশরথের পক্ষে সর্প মস্তকস্থিত রত্নের ন্যায় যুগপৎ রম্য ও ভয়ঙ্কর শুনাইয়াছিল। ১১শ ৬৮।

(৮) রামের সেই রাজ্যারোহণ বার্ত্তা পয়ঃপ্রণালী উদ্যানের প্রত্যেক বৃক্ষের ন্যায় প্রত্যেক পৌরজনকে আহ্লাদিত করিয়াছিল। ১২, ৩।

(৯) লৌহচক্রসদৃশ লবণসমুদ্রের বেলাভূমি তমাল-তালী বনরাজিতে নীলাভ হওয়ায় দূর হইতে চক্রাঙ্কিত কালিমারেখার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ১৩শ, ১৫। ইত্যাদি।

কাব্যরস-পিপাসু রসিক পাঠক যদি পিপাসার অশান্তি জন্য ক্ষোভ ও অতৃপ্তিবোধ করেন, তাহা হইলে ভাগ্যবান্ প্রবীণ কবির পিপাসু কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া মনে মনে প্রার্থনা করুন, নূতন সর্ষপ শাক, নবান্ন, খাসা দই, যৌবন এবং কালিদাসের কবিতা যেন জন্মে জন্মে সম্ভোগ হয়।

বাঙ্‌লা গদ্যের উদ্ভব ও বাঙ্‌লা গদ্যে সাময়িক পত্রের দান।

শ্রীমদনমোহন কুমার এম্-এ

সকল দেশের সাহিত্যেই পদ্যের আবির্ভাব হয় প্রথমে, এবং পদ্যরচনার রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার অনেক পরে গদ্যরীতির উদ্ভব হয়। দশম শতাব্দী হইতে আমরা ধারাবাহিক বাংলাপদ্যের পরিচয় লাভ করি কিন্তু ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে একচ্ছত্র বাংলা গদ্যরচনার সাক্ষাৎ পাই না। বাংলাগদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন পাই ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণ কর্তৃক আহোমরাজকে লিখিত পত্রে। ১৬শ এবং ১৭শ শতকের প্রথম ভাগে লিখিত গদ্যের যেটুকু বিচ্ছিন্ন পরিচয় আমরা পাই তাহা চিঠিপত্র ও দলিলপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। Father Hasterএর উক্তি হইতে জানা যায় যে ১৫৯৯ খ্রীঃএর পূর্বে পোর্তুগীজ মিশনারীরা বাংলায় দু'একখানি পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ১৭শ শতকের মধ্যভাগ হইতে বৈষ্ণবদিগের এক সম্প্রদায় গদ্যে অথবা গদ্যে পদ্যে রচিত নিজেদের সাধনাবিষয়ক পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ১৭শ শতকের 'শূন্যপুরাণে' কিছু কিছু গদ্যাংশ আছে--কিন্তু সেই গদ্যাংশগুলিকে গদ্য না বলিয়া প্রকৃতপক্ষে ছড়া বলাই উচিত। এই ১৭শ শতাব্দীতেই অবিচ্ছিন্ন গদ্যে রচিত প্রাচীনতম বাংলা পুস্তকের নিদর্শন পাই ১৬৭৩ খ্রীঃএ রচিত দোম আন্তোনিওর 'ব্রাহ্মণ রোমানকাথলিক সংবাদে'। ইহার পরবর্তী বাংলা গদ্য পুস্তক হইতেছে মানোএল-দা-আস্সুম্পসাঁর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ', ইহা ১৭৩৪ খ্রীঃএ ভাওয়ালের কথ্যভাষাকে অবলম্বন করিয়া রচিত হয় এবং ১৭৪৩ এ লিসবন হইতে প্রকাশিত হয়। ১৮শ শতকে রচিত আস্সুম্পসাঁর এই পুস্তকটি কথ্যভাষাকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও ইহার ভাষা স্থানে স্থানে জটিল এবং বাক্যরীতি পোর্তুগীজ-গন্ধী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ১৮শ শতকের কথ্য ভাষায় রচিত একটি গল্প বা উপকথায় সেই সময়ের কথ্য ভাষার অবিকৃত সরল রূপ পাওয়া গিয়াছে। সুনীতিবাবু ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বাংলা কাগজপত্র ঘাঁটিয়া এই গল্পটি উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং কথ্য ভাষায় সাহিত্যরচনা প্রচেষ্টার ইহা প্রাচীনতম সহজ-বোধ্য গদ্যরীতির নিদর্শন। ১৮শ শতকের শেষভাগে একদল সংস্কৃত পণ্ডিত বিভিন্ন বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদে বাংলা গদ্যের ব্যবহার করেন এবং স্বভাবতই তাঁহাদের গদ্যরীতিতে সংস্কৃতের গুরুভার কিছু কিছু লক্ষিত হয়। ১৮শ শতকের শেষভাগে প্রোটেষ্টান্ট ইংরেজ মিশনারীরা বাংলা শিখিবার সাধনা আরম্ভ

করেন এবং মূলত ইঁহাদের চেষ্টায় ও ওয়েলেসলীর আনুকূল্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মাধ্যমে ১৯শ শতকের প্রথমেই বাংলা গদ্যে ধারাবাহিক সাহিত্যসৃষ্টির প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় এবং বাংলা গদ্য দৃঢ়ভিত্তি লাভ করে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতগণের পর রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল, প্যারীচাঁদ, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিকগণের লিপি কৌশলে এই গদ্য আধুনিককালের তটভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাংলা গদ্যের এই সকল সারথিদের অনেকেই সাময়িক পত্রের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া বাংলা সাময়িক পত্রের ধারা হইতে বাংলা গদ্যের বিবর্তনটি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।

আমাদের দেশে সাময়িকপত্রের প্রবর্তন হয় ইংরেজের দ্বারা। ১৭৮০ খ্রী. Hickyর "Bengal Gazette" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, ইহা ইংরেজীতে রচিত এবং ইংরেজ দ্বারা সম্পাদিত। ইহাই বাংলা তথা ভারতের সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র। ১৭৮০ হইতে ১৮১৮ পর্যন্ত "India Gazette", "Calcutta Gazette", "Harkara" প্রভৃতি যে সকল সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় তাহা ইংরেজীতে মুদ্রিত। ১৮১৮ খ্রীঃ এ সাময়িক পত্রিকায় বাংলাভাষা ব্যবহৃত হইল। ১৮১৮র এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর মিশন হইতে 'দিগ্দর্শন' নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'দিগ্দর্শন' প্রথম মাসিকপত্র কিন্তু ইহা সংবাদপত্রের লক্ষণাক্রান্ত ছিলনা, "যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ" ইহার কলেবর পূর্ণ করিত। ১৮১৮র মে-জুনে দুইটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র—শ্রীরামপুর মিশনের 'সমাচার দর্পণ' ও কলিকাতার গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গলা গেজেট' প্রকাশিত হয়, ইহাদের মধ্যে কোনটি যে প্রথম তাহা বলা যায় না। 'বাঙ্গলা গেজেটে'র কোন সংখ্যা এখনও পাওয়া যায় নাই, কিন্তু 'সমাচার দর্পণে'র যে সকল সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের গদ্য রচনার অনেকখানি প্রতিচ্ছবি পাই। ফোর্ট উইলিয়াম পণ্ডিতদের রচনায় একদিকে ছিল গুরুভার সংস্কৃতমূলক আদর্শ, অপরদিকে ছিল অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য সরল গদ্যের আদর্শ। মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার মধ্যে একাধারে এই দুই রীতির পরিচয় পাই। 'সমাচারদর্পণে'র সংবাদ রচনায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সাহায্য লওয়া হইত এবং সেই কারণে সংবাদের ভাষা সংস্কৃতের অন্ধ অনুকরণের জন্য প্রায়ই উৎকট। কিন্তু নানা বিষয়ে যে সকল চিত্তাকর্ষক বর্ণনা বা উপাখ্যান প্রকাশিত হইত তাহা পণ্ডিতী ভাষার আড়ম্বর হইতে বহুলাংশে মুক্ত। ১৮১৮র প্রকাশিত 'জুগন্ড' সম্বন্ধে নিবন্ধটি ইহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

ফোর্ট উইলিয়াম যুগের পর বাংলা গদ্যে রামমোহনের আবির্ভাব। বাংলা ব্যাকরণের সহিত রামমোহনের যথেষ্ট পরিচয় ছিল, সেই জন্য বাক্যরীতিতে ও উপযুক্ত স্থানে ছেদপ্রয়োগে রামমোহনের গদ্য তাঁহার পূর্ববর্তীগণের অপেক্ষা অনেক বিশুদ্ধ। "দেওয়ানজী জলের ন্যায় গদ্য লিখিতেন" কিন্তু গদ্য রচনায় তিনি সংস্কৃতশাস্ত্রের ভাষ্যকারদিগের রচনাপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন, পদে পদে পূর্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং বিতণ্ডামূলক গদ্য রচনারও প্রবর্তন করিয়াছিলেন। রামমোহনপক্ষীয় দুইখানি সাময়িক পত্রে—"ব্রাহ্মণ সেবধি" ও "সংবাদ কৌমুদী"তে (উভয়েই ১৮২১এ প্রকাশিত)— এবং রামমোহন-বিপক্ষীয় দুইখানি পত্রিকা —'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২) ও 'সংবাদতিমিরনাশকে (১৮২৩)—এই যুগের গদ্যের ছাপ পড়িয়াছে। এই

প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে রামমোহনবিপক্ষীয় পত্রিকার ভাষা দুর্বোধ্য না হইলেও খুব সরল ছিল না, কিন্তু 'ব্রাহ্মণ-সেবধি'তে প্রকাশিত রামমোহনের প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত সরল।

১৮৩১ খ্রীঃ এ ঈশ্বর গুপ্ত "সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশ করেন—ইহা প্রথমে সাপ্তাহিক ছিল, পরে দৈনিকে পরিণত হয় এবং ইহাই প্রথম বাংলা দৈনিক পত্রিকা। ঈশ্বর গুপ্ত কিছুকাল কবিদলে গান বাঁধিয়াছিলেন এবং তাঁহার কবিতায় ও ছড়ায় যমকানুপ্রাসের দোল সেযুগে জনসাধারণের কানে সুধাবর্ষণ করিয়াছিল—'প্রভাকরে' তিনি নূতন ধরণের অলঙ্কৃত গদ্যরচনার প্রবর্তন করিলেন এবং ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যশিষ্যের ন্যায় কয়েকজন গদ্যশিষ্যও সেযুগে এই অনুপ্রাসবহুল গদ্যকে প্রতিষ্ঠা দিয়াছিলেন (দ্রষ্টব্য 'প্রভাকরে' হুগলীকলেজের ছাত্র বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গদ্যরচনা)। ১৮৩১ হইতে ১৮৫৩এর মধ্যে বহু সাময়িক পত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তাহাদের কয়েকখানির মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের গদ্যের প্রভাব কিছু কিছু ছিল।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাগদ্যে নূতন প্রাণাবেগের সৃষ্টি হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মারফৎ। এই পত্রিকায় তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যবিবরণ, ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতানুলেখন ও সংবাদ প্রকাশ হইত এবং সেই সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞানের নানাবিষয়ক প্রবন্ধও থাকিত। 'প্রভাকর' পত্রিকা হইতে অক্ষয়কুমারকে 'তত্ত্ববোধিনী'তে লইয়া আসেন দেবেন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়কুমারের যুক্তিপূর্ণ ও শক্তিশালী গদ্যরচনা তত্ত্ববোধিনীতেই প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মোপদেশের ভাষায় ও সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদে ভাবের গাম্ভীর্য্য ও ভাষার প্রাঞ্জলতা বিশেষ লক্ষণীয়। তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত তাঁহার সমস্ত রচনার মধ্যেই তিনি দীর্ঘ-সমাস-বিরল ও জটিলতাহীন বাক্যের দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন ও স্থানে স্থানে স্বল্প অলঙ্কারপ্রয়োগে বাক্যের সরসত্ব সম্পাদন করিয়াছেন।

সুদীর্ঘ মিশ্র বা যৌগিক বাক্য ব্যবহারের কৌশলকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া বাংলাগদ্যের মধ্যে যে শ্রুতিসুখকর গাম্ভীর্য্য ও ওজস্বিতার সৃষ্টি করা যায় তাহা অক্ষয়কুমারের প্রকাশিত বক্তৃতাগুলির মধ্যেই সর্বপ্রথম দেখা যায়। কেবল বাগ্মিতাপ্রকাশে নয়, বৈজ্ঞানিক রচনার তত্ত্বনিষ্ঠায় ও ঐতিহাসিক আলোচনার যুক্তিপূর্ণ গাম্ভীর্যে অক্ষয়কুমারের রচনা সমভাবেই সার্থক একথা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাঁহার প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। জ্ঞানবিজ্ঞানের গভীর ও সূক্ষ্ম আলোচনায়, ইতিহাসের তথ্যানুশীলনে, ভাষাতত্ত্বের বুদ্ধিগ্রাহ্য কঠিন আলোচনায় যে বাংলাভাষার প্রয়োগ কতখানি সুষ্ঠু হইতে পারে অক্ষয়কুমার তাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাষাগত সৌন্দর্য্যবোধের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁহার 'স্বপ্নদর্শন' নামক প্রবন্ধ-ত্রয়ের ভাষায়। বাংলা গদ্যে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনায় পরবর্তীকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকগণ তাঁহার রচনারীতির দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত হইয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্মের বহু পরে কিছুকাল তাহার সম্পাদকতা করিলেও বাংলাগদ্যে তিনি যে নিজস্ব রীতি শিল্পসৌন্দর্য্য ও উপাখ্যান রচনার ধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা কোনও সাময়িক পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলনা। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল ও প্যারীচাঁদ সাময়িক পত্রিকার মধ্য দিয়া বিদ্যাসাগরের রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক জীবন ১৮৪৭ হইতে ১৮৭০ খ্রীঃ। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা

"বিবিধার্থসংগ্রহ" প্রকাশিত হয় এবং প্রথম সংখ্যাতেই ঘোষিত হয় যে "যাহাতে এই পত্র সকলে পাঠ করিতে পারেন ইহা আমাদের অবশ্য কর্তব্য; ... অপভ্রংশ-মিশ্রিত প্রচলিত ভাষা যাহা ভদ্রসমাজে কথোপকথনে সর্বদা ব্যবহার হইয়া থাকে তাহাই এই পত্রের উপযুক্ত পরিচ্ছদ।" 'বিবিধার্থসংগ্রহ' তৎকালীন সাধুভাষাকে খানিকটা হাল্কা করিয়া আনিয়াছিল এবং লোকপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগে এবং সমাস দ্বন্দ্বের প্রায় অভাববশত 'বিবিধার্থের' রীতি 'তত্ত্ববোধিনী'র রীতি হইতে অপেক্ষাকৃত সবল, কিন্তু 'বিবিধার্থে' সাধুভাষার প্রবন্ধও দেখা যাইত। রাজেন্দ্রলালের গদ্যে বিদ্যাসাগরাদির রচনার মত সমাসবাহুল্য ছিল না এবং তাহাতে খাঁটি বাংলা শব্দ প্রয়োজনমত নিঃসংকোচ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের 'মাসিক পত্রিকা'র সংস্কৃতগন্ধী সাধুভাষাকে একেবারে উৎখাত করা হইল, সম্পাদকযুগল ঘোষণা করিলেন "যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয় তাহাতেই প্রস্তাবসকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদের নিমিত্ত এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।" এই পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ভাষাই ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই বিদ্রোহের ফলে সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগর 'সীতার বনবাস'-দির শেষের দিকের সংস্করণগুলিতে বহু সমাসবদ্ধ পদ ভাঙিয়া দিয়া ভাষা কিছু সরল করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সাময়িক পত্রে বিদ্যাসাগরী রীতিকে যাঁহারা আশ্রয় করিয়াছিলেন তাঁহাদের রচনার পরিচয় রহিয়াছে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮) পত্রিকায়।

বিদ্যাসাগরী ভাষার সহিত আলালী ভাষার উপযুক্ত মাত্রায় সংমিশ্রণ করিয়া নিজস্ব ভাষা লইয়া ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমের আবির্ভাব 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়। বঙ্কিমের প্রথম তিনটি উপন্যাস (১৮৬৫-৬৯) 'বঙ্গদর্শনে'র পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনী' বা 'কপালকুণ্ডলা'র প্রথম সংস্করণের ভাষার সহিত ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শনে' ক্রমশঃ প্রকাশিত 'বিষবৃক্ষে'র তুলনা করিলেই বোঝা যাইবে যে বঙ্কিমের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যময় ভাষা ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কতখানি পরিণতি লাভ করিয়াছে। বঙ্কিমের রচনায় বহু স্থানেই বিদ্যাসাগরের ভাষার ধ্বনিটি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, আর প্যারীচাঁদের ভাষার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা 'বাঙ্গলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান' শীর্ষক প্রবন্ধে (১৮৯২) দেখা যাইবে। বঙ্কিম যে গদ্য প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহাই নিঃসন্দেহে আমাদের "Modern Prose", কারণ বঙ্কিমের ভাষাকে নিজেদের প্রয়োজনমত পরিবর্তন করিয়া সকলে তাহাকেই আপনার করিয়া লইয়াছেন, বিশ্লেষণী দৃষ্টি লইয়া তাঁহাদের ভাষার আবরণ তুলিলে বঙ্কিমের কাঠামোটি চোখে পড়ে।

১৮৭৯ খ্রীঃ এ 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রের গদ্যরচনা 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' ক্রমশ প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত 'সাধনা' ও ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রসম্পাদনায় নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনার বান ডাকিয়া আসিল। রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার শিল্পসৌন্দর্য্য ও বাক্যমাধুর্য্য পরবর্তীকালের সকল গদ্যলেখককেই ম্লান করিয়া দিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষাকেই গ্রহণ করিয়া একটি অপূর্ব সারল্য ও বিশিষ্ট ভঙ্গী লইয়া "যমুনা"র ক্ষীণধারার ভিতর দিয়া শরৎচন্দ্রের

আবির্ভাব হইল এবং রবীন্দ্রযুগের মধ্যে তিনি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া লইলেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বীরবলের সম্পাদনায় 'সবুজপত্রে'র আবির্ভাব হইল এবং পুরোধা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যে গদ্য সৃষ্টি করিলেন তাহা প্রথম যুগের কাব্যধর্মী গদ্য হইতে একেবারে পৃথক। 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত 'চতুরঙ্গ' ও 'যোগাযোগ' বাংলা গদ্য রচনায় এক নূতন পথ খুলিয়া দিল—এই ধারার চরমোৎকর্ষ রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'য়। ভাষার শাণিত দীপ্তিতে, বচনভঙ্গীর অস্থির চাকচিক্যে ও বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে রবীন্দ্রনাথের এই গদ্যরীতি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া রহিয়াছে—বীরবল, অতুল গুপ্ত ও অন্নদাশঙ্কর এই ধারাটিকে খানিকটা আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছেন।

চেয়ে আছে রাত্রি-বাতায়ন

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

যৌবন তটিনী বহে, বক্ষে তার জোয়ারের উর্ম্মিস্পন্দন,
অভিসার-তরী দোলে শত।
শ্যামল পুলিন প্রান্তে গন্ধের স্বপন লয়ে বীথিকা চঞ্চল
হিল্লোলিত হেরি অবিরত।
প্রাণের পল্লব যত নবাগত পান্থ পানে ক্ষণেক থমকি
রসে রূপে আনন্দ উচ্ছল;
তোমাতে আমাতে দেখা গানের নির্ঝর তলে পুলকে চমকি,
আঁখি শরে আমি যে আহত।

তব আতিথেয়তার আয়োজন নাহি কিছু হে আনন্দময়,
ওঠে চাঁদ ধূসর প্রান্তর;
বাহুলতা-শৃঙ্খলিত কর মোরে নৈশক্ষণে—নব পরিচয়
সমীরণে অতি সুমধুর।
কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী দোলে সমুখে মোদের তৃণাঙ্কিত পথে
প্রেমে মোর বেপথু হৃদয়।
চুম্বনের মত বয়ে নীরবতা, প্রিয়, যেন কোথা হতে—
বাজে দূর জনমের সুর।

অর্চনা প্রার্থনা আর অশ্রু দিয়ে ডাকি নাই তোমারে দেবতা!
যৌবনের এ বসন্তে মম।
মিনতি তোমারে কভু করি নাই,—সহিয়াছি মরমের ব্যথা
মুকুলের বেদনার সম।
কহি নাই কোন কথা, তব মনোহরণের গাহিনি সে গান
যে গানে তোমার চঞ্চলতা।
মোর অবগুণ্ঠনের রাখি নাই আবরণ পাছে অভিমান
মনে তব জাগে প্রিয়তম!
মোর তনু-লাবণ্যের বসুধারা, মোর নব রূপ-রেণু লয়ে
চেয়ে আছে রাত্রি-বাতায়ন।

আমার কবরীভরা চম্পক চামেলী যূথী অবনত হয়ে
সঙ্গোপনে মাগিছে মিলন।
প্রণয়ের সাক্ষিকা আমি, তবু লাজে কথা গুমরিছে—সাথী!
ভাঙো লাজ সেই কথা ক'য়ে—
ওষ্ঠপুটে যাহা মোর কাঁপে দীপশিখা সম,—এ জোছনা রাতি
উদ্ভাসিত করে অন্তর।

পল্লীকে—

এ, এফ, এম খলিলুর রহমান

জরাজীর্ণ এক পল্লী বলে :
হে উদ্ভাসিত নগর তোমায় প্রণাম।
তোমার স্বর্ণ রশ্মি
আমাদের অন্তরকে করেছে উদ্ভাসিত।
তোমার অপ্রতিহত গতি
আমাদের জীবনকে করেছে বেগবান।
দিগ দিগন্তে
তোমার জয় ধ্বনি।
ঐ শোন তোমার অগণিত ভক্তের
আগমনীর গান।
কণ্ঠে তাদের সুরের ঢেউ
আশায় আনন্দে ভরা তাদের প্রাণ
তুমি আমাদের প্রণতি গ্রহণ করো
হে নূতন নগর।

অহংকারে আত্মহারা হ'ল
নূতন নগর।

আকাশের এক পাখী বলে :
হে নূতন নগর
তোমার এই বিজয়ের পথে
আজ তুমিও
তোমার প্রণতি নিবেদন করো।
: কিন্তু কাকে ?
বিস্ময়ে নূতন নগর শুধায়।
: কেন ঐ পল্লীকে ?
—প্রশ্নের জবাব এল
উদ্ধত হাসি।
: ঐ জরাজীর্ণ
ঐ মৃত্যুদূত পল্লীকে ?
যার আয়ুকাল বিলীন হয়ে এলো
নগরীর পংকিল আবর্তে—
তাকে জানাবে প্রণতি
এই নূতন নগর ?

আকাশের পাখীর কণ্ঠে বেদনার সুর :
ঐ তোমার ভুল বন্ধু
আত্মবিস্মৃত হয়োনা অহংকারে
জরা-মুখী পৃথিবীর পানে তাকাও
তাকে অনুধাবন করো।
জান কি বন্ধু
তোমার জন্মের ইতিহাস ?
পল্লীর বুক চিরে তোমার জন্ম,
আজো তুমি লালিত পালিত
পল্লীর বুক-চেরা ভালবাসায়
তাকে, তার ইতিহাসকে
তুমি জানাবে না অভিনন্দন ?
ওই পল্লী
লালন করেছে তোমাকে
আলো দিচ্ছে পৃথিবীকে

ওই পল্লীর ধারায়
তোমার বিস্তার।
রাত্রির শেফালি ঝরে ঝরে
শেষ রাত্রির শিশির বিন্দু
রৌদ্রদগ্ধ দিনের বুকে নিশ্চিহ্ন হবে
কিন্তু রেখে যা.ব তার ইতিহাস ;
আজকের বসন্ত দগ্ধ হবে
কাল.কর রৌদ্র দাহে
কিন্তু
মাটির বুকে ঘুমিয়ে থাকবে
তার বীজ ;
নব বসন্তের জন্ম কামনায়
ওরই ইতিহাস
তোমায় বাঁচিয়ে রেখেছে !।

তোমার ভাবলোকের যে ইতিহাস
কথা কইছে
দেবে না তাকে তোমার প্রণতি ?

হে নূতন নগর !
তোমার ওই জাবাগ্রার পথে
তোমার প্রণতি নিবেদন করে বলো :
হে আমার অবিচ্ছেদ্য পল্লী
আ মার অহংকারকে তুমি মার্জনা কর ;
বলো :
হে পল্লীর ইতিহাস,
নূতন নগর তোমায় প্রণতি জানায়
তুমি গ্রহণ করো।

পোট্রেট

শ্রীযামিনীমোহন কর

আর্ট স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছে রজত। মাথায় একরাশ চুল, গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ গড়ন। মনে হয় যেন গ্রীক ষ্ট্যাচু, এপোলো। মুখে চোখে বুদ্ধির ছাপ, প্রকৃত শিল্পী-মনের দীপ্তি।

রজত সুন্দর, রজত শিল্পী। তার রেখায় ফুটে ওঠে সুন্দর, নব নব মূর্তিতে। সে স্রষ্টা। প্রতিভা তার চায় যুগান্তর আনতে। বাঁধন কেটে নিয়ম ভেঙে সে চায় প্রকাশ করতে তার শিল্পী-মনকে।

কিন্তু, সে সুযোগ তার কোথায়। রজত দরিদ্র। অন্নসংস্থানের জন্য তাকে আঁকতে হয় পোষ্টার। ধনীর কাছে বেচতে হয় তার প্রতিভাকে। এ বেশ্যাবৃত্তি,—শিল্পের, মনের। রজত সহ্য করতে পারে না এ হীনতা, এ অবমাননা। মন হয়ে উঠে বিদ্রোহী। কিন্তু উপায় কি? রজত দরিদ্র।

ঠিক এই সময় রজতের আলাপ হ'ল মিসি সেনের সঙ্গে। মিসি সেন অ্যাও পার্টি নিউ এম্পায়ারে নাচের

জলসা করবে। পোট্রেট লেখবার জন্য কাগজে আর্টিষ্টের বিজ্ঞাপন দিয়েছে। সেই বিজ্ঞাপনের উত্তরে রজত গিয়ে হাজির হ'ল মিলি সেনের প্রাসাদোপম অট্টালিকায়।

মিলি সেন দেখত রজতকে। গ্রীক ষ্ট্যাচু, রজত। গৌর বর্ণ, বলিষ্ঠ গঠন। মুখে চোখে বুদ্ধির ছাপ। মিলি সেন শিল্পী রজতকে দেখল না, দেখলে যৌবনদীপ্ত জীবনশক্তি-সম্পন্ন একজন পুরুষকে। রজত সেন পোট্রেট আঁকবার কাজ পেল।

দেখতে দেখতে ক'লকাতার সৌখীন সমাজে রজত 'ফ্যাশন' হয়ে দাঁড়ালো। প্রত্যেক বড় লোকের ঘরে রজতের আঁকা ছবি। তার হাতের পোট্রেট না থাকলে আভিজাত্যের অভাব হয়। মিলি সেন এগিয়ে দিলে রজতকে রজতের দিকে। দরিদ্র অখ্যাত রজত হয়ে উঠল ধনী বিখ্যাত।

অর্থ এল, কিন্তু তৃপ্তি এল না। রজত চেয়েছিল নিজের ইচ্ছা মত ছবি আঁকতে। বড় লোকের ফরমাস মত ছবি এঁকে তাদের ইচ্ছা চরিতার্থ করতে নয়। যে অর্থ একদিন সে মন প্রাণ দিয়ে কামনা করেছিল, সেই অর্থই অনর্থ ঘটালো। বৃশ্চিকের মত দংশন করতে লাগল তার বিবেককে, শিল্পী মনকে।

সেই সময় রজতের পরিচয় হল প্রতিমার সঙ্গে। মিলি সেনের পার্টিতে যোগ দিয়েছে গান গাইবার জন্য। গরীব মেয়ে, কিন্তু অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর। আর চেহারায় এক অদ্ভুত মিষ্টতা। দলের অন্য মেয়েরাও রূপসী, কিন্তু কৃত্রিম রঙে আর পোষাকের জৌলুসে সূর্য্যের তেজের প্রখরতা। প্রতিমা যেন পূর্ণিমার চাঁদ—স্নিগ্ধ কোমল তার রূপরশ্মি।

রজত ভাল বাসল প্রতিমাকে। বন্ধ করে দিল ফরমাসী কাজ। নিজের মনে আঁকতে লাগল ছবি প্রতিমার। মিলি সেনের বাড়ী যাওয়া পর্য্যন্ত ত্যাগ করল।

মিলি সেনের চোখ এড়াতে পারেনি রজত। প্রতিমাকে দূর করে দিলে দল থেকে। রজতকে সে চায় একলা ভোগ করতে। সুন্দর শক্তিমান পুরুষ রজত। অখ্যাত রজতকে বিখ্যাত করেছে সে। দরিদ্রকে অর্থবান করেছে। রজত তার কেনা সামগ্রী। অপরকে তার ভাগ দেবে না।

রজতকে তার পোট্রেট আঁকার ভার দিলে মিলি। ষ্টুডিওতে গিয়ে বসে থাকে সমস্ত দিন। পুরুষ জয়ের যত বাণ ছিল তার যৌবনের তূণে রজতের প্রতি সবই সে নিঃশেষে নিক্ষেপ করে।

কিন্তু রজত, বেরসিক রজত, চেয়ে দেখে না সে দিকে। চুপ করে বসে থাকে ক্যানভাসের দিকে চেয়ে। তার পর বলে, 'আর সিটিং দিতে হবে না। আমি দু চার দিনের মধ্যে মন থেকেই এঁকে ফেলব।' বিলোল কটাক্ষ হেনে মিলি বলে,—'মনেই যখন আমাকে এঁকে ফেলেছ, ক্যানভাসে আঁকতে কতক্ষণ। কিন্তু আমার পোট্রেটে নূতনত্ব চাই। পার্সোনালিটি, আমার ব্যক্তিত্ব, আমার মন।'

ক'দিন পর মিলি সেনের বাড়ীতে বিরাট পার্টি। রজত ছবি এনেছে। কাগজে মোড়া। সবাইকে পোট্রেট দেখান হবে। খাবার পর সবাই ড্রইং রুমে জমা হ'ল। মিলি সেন রজতের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে পোট্রেট দেখাতে অনুরোধ করলে। রজত খুললে পোট্রেটের ঢাকা। বার হল রেখাহীন একটি শুভ্র ক্যানভাস।

মিলি সেন বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে,—'একি! এযে খালি ক্যানভাস?' রজত উত্তর দিলে,—'এই তোমার মনের পরিচয়।' তার পরই সে সোজা কারো সঙ্গে কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর রজতকে কলকাতায় কেউ আর দেখে নি।

রাজপরিবারের সংবাদ

ব্রহ্মরণাঙ্গনে দীর্ঘপ্রবাসের পর শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপবাহাদুর গত ১৪ই অক্টোবর নিজরাজধানী কুচবিহারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁহাকে কুচবিহার জনসাধারণ ও প্রজাবৃন্দের পক্ষ হইতে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য একটী কমিটি গঠিত হইয়াছে। মহারাজা ভূপবাহাদুরের অনুমতি পাইলে অভ্যর্থনার দিন স্থির হইবে।

শ্রীশ্রীমহারাণী সাহেবা কুচবিহারেই অবস্থান করিতেছেন। শ্রীশ্রীমদনমোহনঠাকুরের রাসযাত্রা উপলক্ষে সমাগত প্রজাপুঞ্জ ও জনসাধারণ যাহাতে রাজপ্রাসাদ, রাজসিংহাসন ও শ্রীশ্রীমহারাণী মাতার দর্শনলাভ করিতে পারেন তজ্জন্য রাসমেলার কয়েকদিন বেলা বারোটা পর্য্যন্ত রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার শ্রীশ্রীমহারাণীমাতার আদেশে সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হইয়াছিল। সকলে যথেচ্ছা রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া প্রাসাদ ও রাজসিংহাসন দর্শন করেন এবং ভাবাবেগে মুহুর্ম্মুহু শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপবাহাদুর ও শ্রীশ্রীমহারাণীমাতার জয়ধ্বনি করেন।

স্থানীয় সংবাদ

বিশেষ ফৌজদারী আদালতে সৈনিকদিগের বিচার ঃ—

স্থানীয় কলেজ ও হষ্টেলে হাঙ্গামাকারী বন্দি। অভিযুক্ত সৈনিক কর্ম্মচারী ও সিপাহীদিগের বিচার গত ১৫ই নভেম্বর এক বিশেষ ফৌজদারী আদালতের সম্মুখে আরম্ভ হয়। এই ফৌজদারী আদালত মহারাজা ভূপবাহাদুরের আদেশক্রমে তিনজন বিচারক লইয়া গঠিত হইয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মিষ্টার এস, এন, গুহ এই আদালতের প্রেসিডেন্ট এবং কুচবিহার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মিষ্টার এস, সি, দত্ত ও বিচারপতি টি, পি, মুখার্জ্জি ইহার সদস্য।

স্থানীয় ল্যান্সডাউন হলে বিশেষ আদালতের কার্য্য চলিতেছে। মামলায় মোট ১০২ জন আসামী; তন্মধ্যে দুইজন অফিসার এবং বাকী ১০০ জন সিপাহী ও হাবিলদার। এই মামলায় কুচবিহার দরবার ফরিয়াদী। ফরিয়াদী পক্ষে কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট

মিষ্টার এস্, সি, তালুকদার, কুচবিহার ষ্টেট্ এডভোকেট শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দত্ত, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকান্ত বসু মজুমদার প্রভৃতি মামলা পরিচালনা করিতেছেন। আসামী পক্ষে কলিকাতার কৌঁসুলী মিষ্টার এ, কে, বসু ও অন্যান্য কয়েকজন নিযুক্ত রহিয়াছেন।

ফরিয়াদী পক্ষে প্রায় সাড়ে তিন শত সাক্ষী আছে। তন্মধ্যে কুচবিহার রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী, কলেজের অধ্যক্ষ, সিভিল সার্জ্জন প্রভৃতি আছেন।

আদালতের প্রেসিডেণ্ট বিচারপতি গুহ প্রথমদিনেই বলেন যে এই মামলার বিচারব্যবস্থা মহারাজা ভূপ বাহাদুরের আদেশক্রমেই হইতেছে এবং তিনি সকলকে আশ্বাস দেন যে যাহাতে সকল পক্ষই সুবিচার পাইতে পারে তজ্জন্য বিচারপতিগণ তাঁহাদের যথাসাধ্য করিবেন।

রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে মদনমোহন ঠাকুরবাড়ীতে উৎসবঃ—

রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসরই স্থানীয় মদনমোহন ঠাকুরবাড়ীতে বিশেষ পূজা ও উৎসবাদি হয়। সরকারী দেবোত্তর বিভাগ হইতে ইহার আয়োজনাদি হইয়া থাকে। সমগ্র ঠাকুরবাড়ী উজ্জ্বল আলোকমালায় ও অন্য নানারূপে সজ্জিত হইয়া থাকে। এই বৎসরও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ঠাকুরবাড়ী বিশেষ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। মন্দির প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষে নানাবিধ পৌরাণিক মূর্ত্তি কৃষ্ণনগরের শিল্পিগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া শোভা পাইতেছিল। প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিকে একটি কৃত্রিম সরোবর নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তাহাতে ভেলায় ভাসমান বেহুলা ও মৃত লক্ষীন্দরের মূর্ত্তি শোভা পাইতেছিল; সরোবরের তীরে এক স্থলে নেতা ধোপানী কাপড় কাচিতেছে, এক স্থলে এক ধীবর মৎস্য ধরিতেছে এই সকল দৃশ্য দেখা যাইতেছিল। প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিকের মধ্যস্থলে একটি কৃত্রিম পার্ব্বত্যপথ নির্ম্মিত হইয়াছিল; ইহার মধ্যদিয়া মৃত সতীদেহ স্কন্ধে ধারণ পূর্ব্বক রজতগিরিসন্নিভ শোকাকুল মহাদেব ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন এবং পশ্চাৎ হইতে বিষ্ণু অলক্ষ্যে সুদর্শন চক্র দ্বারা সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিতেছেন— এই দৃশ্য বাস্তবের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। বিভিন্ন মূর্ত্তির মধ্যে মৃৎশিল্পের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল। অগণিত নরনারী দূর দূরান্তর হইতে আসিয়া এই সকল দেখিয়া গিয়াছে।

রাসপূজা উপলক্ষ্যে যাত্রাগানের আয়োজন করা হইয়াছিল। এক প্রসিদ্ধ যাত্রাদল চার দিন বিভিন্ন পালা গাহিয়া শ্রোতা ও দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিয়া গিয়াছে। ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে মদনমোহন দেবের বিগ্রহের সম্মুখে বিরাট সামিয়ানা টাঙাইয়া যাত্রা গান হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ, বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং জনসাধারণের জন্য বসিবার পৃথক পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। একদিনের যাত্রা বিশেষভাবে মহিলাদিগের জন্য সংরক্ষিত হইয়াছিল।

রাসোৎসব উপলক্ষ্যে কুচবিহারের নরনারী কয়দিন আনন্দসাগরে ভাসিয়াছে। প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও সরকারী আফিস আদালত প্রভৃতি তিন দিন বন্ধ ছিল।

লাইনের মাঠে দ্বাদশদিন ব্যাপী রাসমেলা—

রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর কুচবিহার লাইনের মাঠে একটি বিরাট মেলা বসে। এই মেলায় স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ ব্যতীত নানা স্থান হইতে নানা জাতীয় ব্যবসায়ী আসিয়া দোকান দিয়া থাকেন এবং লক্ষ লক্ষ টাকার কেনা বেচা হইয়া থাকে। গত কয়েক বৎসর যুদ্ধজনিত

যাতায়াতের অসুবিধার জন্য মেলা তেমন জমিতে পারে নাই। কিন্তু এই বৎসর যাতায়াতের কতকটা সুবিধা হওয়ায় বহু স্থানীয় ও বিদেশী ব্যবসায়ী মেলায় দোকান দিয়াছিলেন। তাঁতের কাপড়, রেশমী ও পশমী বস্ত্র, পিতল কাঁসার বাসন, মনোহারী দ্রব্য, জুতা, আসবাবপত্র, মাটির বাসন ও খেলনা, কাচের চুড়ি ও খেলনা, ফল প্রভৃতি বহু দোকানের সমাবেশ হইয়াছিল। উত্তরবঙ্গের ও আসামের বিভিন্ন স্থান হইতে, পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থান হইতে, এমন কি কলিকাতা হইতেও দোকান আসিয়াছিল। অগণিত নরনারী প্রত্যহ এই মেলা দেখিতে ও দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে আসিতেন। যাত্রীসাধারণের সুবিধার জন্য রেল কোম্পানী স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; সরকারী ষ্টেট্ ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসও বাসের সাহায্যে জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি মেলা পরিষ্কার রাখিয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, মেলা অঞ্চলে স্থানে স্থানে নলকূপ বসাইয়া পানীয় জল সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। মফঃস্বল হইতে আগত লোকজনের থাকিবার জন্য দরবার হইতে অস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

সরকারী উন্নয়ন বিভাগ হইতে একটি তাঁত-নির্ম্মিত সূতী দ্রব্যের ষ্টল খোলা হইয়াছিল। ইহাতে বয়ন বিদ্যালয়ে তৈয়ারী তোয়ালে, গামছা, বিছানার চাদর, সুজনী, সার্ট ও কোটের ছিট, চটের আসন প্রভৃতি প্রদর্শিত ও বিক্রীত হইয়াছিল। বয়ন বিদ্যালয়ে তৈয়ারী দ্রব্যজাত খুব টেঁকসই এবং ইহাদের মূল্য বাজার হইতে কম। সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে একটি ষ্টল খোলা হইয়াছিল। এখানে নানাবিধ চিত্রিত চার্ট যোগে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী এবং আহার, দেহচর্য্যা, রোগনিবারণ প্রভৃতি বিষয়ের প্রাচীরপত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই ষ্টলে সর্ব্বদাই বহু লোকের ভিড় থাকিত। স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে আলোকচিত্র সাহায্যে ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত ও যক্ষ্মারোগের চিত্র দেখান হইত এবং বক্তৃতা সাহায্যে চিত্রগুলির মর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়া হইত। স্থানীয় বয়স্কাউট এসোসিয়েসন হইতে একটি ষ্টল খোলা হইয়াছিল। এখান হইতে বয়স্কাউটের আদর্শ জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া হইত; এই সম্বন্ধে কতকগুলি প্রাচীরপত্রও এখানে প্রদর্শিত হইয়াছিল। স্কাউটগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও তাহাদের স্বহস্ত নির্ম্মিত কতকগুলি শিল্পদ্রব্যও এই ষ্টলে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

রাসমেলা ১৮ই হইতে ২৯শে নভেম্বর পর্য্যন্ত মোট বারোদিন স্থায়ী হইয়াছিল।

দেশবিদেশের কথা

রাজন্যপরিষদের উপদেষ্টা পদে স্যার সুলতান আমেদ—

স্যার সুলতান আমেদ বিশিষ্ট আইন বিশারদ; তিনি বহুদিন যাবত যোগ্যতার সহিত বড় লাটের শাসন পরিষদের সদস্য রূপে কার্য্য করিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি শাসন পরিষদের সদস্য পদ পরিত্যাগ করিয়া রাজন্যপরিষদের উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করিয়াছেন। গত ১লা নভেম্বর তিনি নূতন কার্য্যে যোগ দিয়াছেন। তাঁহার স্থলে স্যার আকবর হায়দারী অস্থায়ী ভাবে বড় লাটের শাসন পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

নৌযুদ্ধে ব্রিটেনের ক্ষতি—

গত মহাসমরে নৌযুদ্ধে ব্রিটেনের কি পরিমাণ জন ক্ষতি হইয়াছে তাহা সম্প্রতি ব্রিটিশ নৌসচিব এক সভায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ব্রিটেনের ৭৩০ খানি জাহাজ খোয়া গিয়াছে এবং পাঁচ লক্ষেরও অধিক অফিসার ও সৈন্য নিহত বা নিখোঁজ হইয়াছে।

সম্মিলিত জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি—

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের বিষয় বিবেচনার জন্য লণ্ডনে সম্মিলিত জাতির এক সম্মেলন হইয়া গেল। এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য ভারতসরকার নিম্নলিখিত শিক্ষাবিদগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন—(১) ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী ডক্টর জন সারজেণ্ট; (২) শিক্ষাবিভাগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা রাজকুমারী অমৃত কুমারী; (৩) দিল্লী জামিয়ামিলিয়া ইসলামিয়ার অধ্যক্ষ ডক্টর জাকির হোসেন; (৪) এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর অমরনাথ ঝা; এবং (৫) রামপুর রাজ্যের শিক্ষাবিভাগের উপদেষ্টা মিষ্টার সৈ দাইন।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ—

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ভারতের একটি বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এই সর্বপ্রথম এই কলেজে একজন ভারতীয় অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সেন। ইনি পূর্বে শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। শ্রীযুক্ত সেন একজন বাঙ্গালী; তাঁহার এই নিয়োগে আমরা আনন্দিত।

নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন—

আগামী জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে বরোদায় নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। বরোদা রাজ্যের গ্রন্থাগার সমিতি এইজন্য যথোচিত উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন।

পেনিসিলিন আবিষ্কারকের "নোবেল পুরস্কার" প্রাপ্তি—

পেনিসিলিন ঔষধ বর্তমান যুগের একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার; ইহা মানবসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছে। সম্প্রতি ইহার আবিষ্কারক স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিংকে ঔষধ সম্পর্কে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে। স্যার আলেকজাণ্ডার লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবতত্ত্বের অধ্যাপক। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন অধ্যাপক পেনিসিলিন সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকেও নোবেল পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে; তাঁহাদের নাম স্যার হাওয়ার্ড ফ্লোরি এবং ডক্টর আর্নেষ্ট সাইন।

মিষ্টার কর্ডেল হালকে শান্তির জন্য "নোবেল পুরস্কার" দান—

যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রসচিব মিষ্টার কর্ডেল হালকে ১৯৪৫ সালের শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে। তিনি বহুদিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসচিব ছিলেন; মাত্র কয়েক মাস পূর্বে স্বাস্থ্যের জন্য ঐ পদ পরিত্যাগ করেন। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রধান উদ্যোক্তারূপে মিষ্টার হাল বিশেষভাবে পরিচিত। স্যানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে তিনি মার্কিণ প্রতিনিধিদলের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন।

কস্তুরবা গ্রাম সেবিকা বিদ্যালয়—

কস্তুরবা ট্রাষ্ট ফাণ্ডের কার্যনির্বাহক সমিতি গ্রামের নারীদিগকে গ্রামাঞ্চলে কাজ করিবার ট্রেনিং দিবার জন্য মধ্যপ্রদেশে দুইটি কস্তুরবা গ্রাম সেবিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই দুই বিদ্যালয়ে প্রধানতঃ বয়স্কাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক সাহায্য, এবং হস্তশিল্প ও পল্লীশিল্প বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়া হইবে।

রেল দুর্ঘটনা—দার্জ্জিলিং মেল ও নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে সংঘর্ষ—

গত ৭ই নভেম্বর শেষ রাত্রে কলিকাতাগামী দার্জ্জিলিং মেলের সহিত আত্রাই ঘাট ষ্টেশনের নিকটে বিপরীত

দিকগামী নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ট্রেণের সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের ফলে ৯ জন যাত্রী হত ও ৫২ জন যাত্রী আহত হন। দুর্ঘটনার কারণ সম্বন্ধে প্রকাশ যে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের চালক নিষেধজ্ঞাপক সঙ্কেত অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ট্রেণ দুর্ঘটনা ঘটিতেছে; ইহার কারণ নির্ণয় আবশ্যক।

বাংলার গভর্ণর মিষ্টার কেসীর পদত্যাগ ও নূতন গভর্ণর নিয়োগ—

নয়া দিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ যে বাংলার গভর্ণর মিষ্টার কেসী পদত্যাগ করিয়াছেন এবং ভারত-সম্রাট তাঁহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার কেসী যখন বাংলার গভর্ণর হইয়া আসেন তখনই শোনা গিয়াছিল যে তিনি যুদ্ধকাল পর্য্যন্তই বাংলায় থাকিবেন এবং যুদ্ধশেষে যথা সম্ভব সম্ভব চলিয়া যাইবেন।

মিষ্টার কেসীর স্থলে ভারতসম্রাট মিষ্টার ফ্রেডারিক জন বারোজকে বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত করিয়াছেন। মিষ্টার বারোজ ইংলণ্ডের এক রেল কোম্পানীর সামান্য শ্রমিকরূপে জীবন আরম্ভ করেন এবং ক্রমশঃ রেল কর্ম্মচারী সমিতির প্রেসিডেণ্ট হন। তিনি শ্রমিকদলের একজন বিশিষ্ট সভ্য। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহল শাসনসংস্কার কমিশনের সদস্য ছিলেন।

প্রকাশ যে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের কোন সময় মিষ্টার বারোজ তাঁহার নূতন পদ গ্রহণ করিবেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

জয়পুরে পি, ই, এন্ সম্মেলন :—

গত অক্টোবর মাসের শেষভাগে জয়পুরে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর সভানেতৃত্বে ভারতীয় পি, ই, এন্ সম্মেলনের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। জয়পুর রাজ্যের দেওয়ান স্যার মীরজা ইসমাইল এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্যার মীরজা বর্ত্তমান জগতের শোচনীয় বিষাদময় অবস্থার উল্লেখ করিয়া বলেন — ইতিহাসে ইহার তুলনা মিলে না। সফোক্লিস বা সেক্সপিয়ারের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডি রচয়িতাগণও এইরূপ অবস্থার কল্পনা করিতে পারেন নাই। মানব-সভ্যতা আজ দ্রুত ধ্বংসের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে; ইহাকে বাঁচাইতে হইলে মানুষের অন্তর্নিহিত মানবতার নিকট আবেদন করিতে হইবে; ইহাই মানবজাতির একমাত্র সম্বল। প্রবুদ্ধ মানবসমাজের ঐক্যবদ্ধ দৃঢ় সংকল্পই আজ মানবসভ্যতাকে রক্ষা করিতে পারে; এই সংকল্প শক্তির ক্ষমতা অপরিসীম; ইহাকে আয়ত্তে আনিতে পারিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে ইহার রক্ষণশক্তি আণবিক বোমার ধ্বংসশক্তি অপেক্ষাও প্রবলতর। স্যার মীরজা লেখকগণকে মানবের অন্তর্নিহিত এই মহাশক্তির নিকট আবেদন জানাইতে, এই মহা-শক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে অনুরোধ করেন।

স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ সাহিত্যের নৈতিক মূল্য (moral values) সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন সভ্যতার বর্ত্তমান স্তরে মানবের বুদ্ধিবৃত্তি যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু নীতিবোধ এখনও যথেষ্ট জাগরিত হয় নাই। লেখকগণের সম্মুখে গুরু

দায়িত্ব রহিয়াছে; তাঁহাদিগকে মানুষের নীতিবোধ জাগাইয়া তুলিতে হইবে। সত্য, শিব ও সুন্দরের সৃষ্টির মধ্য দিয়া মানুষের নীতিবোধ জাগিবে ও নূতন সভ্যতা গড়িয়া উঠিবে। উচ্চতম আদর্শ—যে আদর্শ বুদ্ধ, সক্রেটিস, খৃষ্ট ও গান্ধীর জীবনে প্রতিফলিত—লেখকগণকে মানুষের সম্মুখে সেই আদর্শই তুলিয়া ধরিতে হইবে।

সভানেত্রী সরোজিনী নাইডু তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে ভারতে বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্য বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও যে সকল প্রদেশের লেখকগণ এক সম্মেলনে সমবেত হইয়াছেন ইহার কারণ এই যে ভারত অখণ্ড ও অবিভাজ্য। ভাষা বা লিখনভঙ্গী যতই ভিন্ন হউক না কেন ভারতীয় লেখকগণের মধ্যে একটি আদর্শগত ঐক্য রহিয়াছে। শান্তি ও প্রেমের বাণীই ভারতের চিরন্তন বাণী; ভারতীয় লেখকগণ এই বাণীই যুগে যুগে বহন করিয়া আসিতেছেন।

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ম্যাডাম সোফিয়া ওয়াদিয়া প্রভৃতি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান হইতে যাঁহারা সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া বাণী প্রেরণ করেন তন্মধ্যে এইচ, জি, ওয়েলস্ ও এডিথ্ সিথওয়েলের নাম উল্লেখযোগ্য।

ভারতের সৈন্যবাহিনী ভারতীয়করণের পরিকল্পনা—

কিছু দিন পূর্ব্বে নয়া দিল্লীতে ভারতের প্রধান সেনাপতি স্যার ক্লড অকিনলেক ভারতের সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় করণের এক পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এই সম্পর্কে এক সরকারী ইস্তাহারও প্রকাশিত হয়। এই পরিকল্পনার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে এই যে ভবিষ্যতে ভারতীয় নৌবাহিনীতে স্থায়ী কমিশন কেবলমাত্র ভারতীয়গণকেই দেওয়া হইবে; ভারতীয় বিমান বাহিনীতে ইতিমধ্যেই কেবলমাত্র ভারতীয়গণের মধ্য হইতেই অফিসার নিযুক্ত হইতেছে। অবশ্য বর্ত্তমানে সাময়িক প্রয়োজনের খাতিরে ভারতীয় নৌবাহিনীতে ৪০টি অফিসারের পদ ইউরোপীয়ানদিগের জন্য সংরক্ষিত করিয়া রাখা হইবে; কেনন', প্রধান সেনাপতির মতে নৌবাহিনীর জন্য যথেষ্টসংখ্যক ভারতীয় অফিসার বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে প্রধান সেনাপতি আরও বলেন যে কিছুদিন পর্য্যন্ত হয়ত স্থল ও বিমানবাহিনীতে কিছু কিছু ব্রিটিশ অফিসার নিয়োগের দরকার হইবে।

প্রধান সেনাপতি জানান যে বর্ত্তমানে ভারতে ২৩০০ রেগুলার ব্রিটিশ অফিসার আছেন; যুদ্ধের পূর্ব্বে ইহাদের সংখ্যা ৩৯০০ জন ছিল, তন্মধ্যে প্রায় ১৬০০ জন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন বা নিহত হইয়াছেন। রেগুলার ভারতীয় অফিসারের সংখ্যা মাত্র ৪৫০ জন; ইহারা ১৯১৮ হইতে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সৈন্যদলে যোগ দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমানে ১৯০০০ ইউরোপীয়ান ও ৮০০০ ভারতীয় জরুরী কমিশন প্রাপ্ত অফিসার আছেন; ইঁহাদিগকে বর্ত্তমান যুদ্ধের তাগিদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। জরুরী কমিশন প্রাপ্ত ভারতীয় অফিসারগণকে যত অধিক সংখ্যায় সম্ভব স্থায়ী কমিশন দিবার কল্পনা গভর্ণমেণ্টের আছে।

প্রধান সেনাপতি সৈন্যবাহিনী ভারতীয়করণের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া বলেন যে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে দুই একটি ছাড়া সৈন্যবাহিনীর সমস্ত অফিসার ছিলেন ব্রিটিশ। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ভারতীয়গণকে কিংস কমিশন দিবার সিদ্ধান্ত হয় ও ইন্দোরে একটি ক্যাডেট স্কুল খোলা হয়। এই স্কুলটি মাত্র তিন বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। ইহার

পর বিলাতের স্যাণ্ডহার্ষ্ট বা উলউইচে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয়গণকেই শুধু কমিশন দেওয়া হয়। তাহার পর দেরাদুনে ইণ্ডিয়ান মিলিটারী একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতীয়গণের একটি প্রধান অভিযোগ এই যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রধানতঃ ব্রিটিশ অফিসারদ্বারা পরিচালিত। সরকার বর্ত্তমানে যে পরিকল্পনা প্রচার করিয়াছেন তদনুসারে কার্য্য হইলে হয়ত অচির ভবিষ্যতে ভারতীয়বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়গণদ্বারা পরিচালিত হইবে এবং ভারতবাসী নিজ হস্তে দেশরক্ষার ভারগ্রহণ করিতে পারিবে। বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য ও অফিসারগণ, দেশীয় নৃপতিগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ, বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যে শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহার প্রশংসা সম্মিলিত জাতিসমূহের কর্ত্তৃপক্ষ বারংবার করিয়াছেন। আমরা আশা করি ভারত সরকারের পরিকল্পনা অনুসারে যোগ্য ভারতীয় অফিসার যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যাইবে।

আমেরিকার বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের ঘোষণা—

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট মিষ্টার ট্রুম্যান কিছুদিন পূর্ব্বে এক বক্তৃতায় আমেরিকার বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে একটি ঘোষণা করেন। প্রথমেই ট্রুম্যান বলেন যে আমেরিকার কোনরূপ সাম্রাজ্য বিস্তারের বা পররাষ্ট্র আক্রমণের কামনা নাই। আমেরিকা চায় যে, যে সকল জাতি অন্য কর্ত্তৃক নিজেদের সার্ব্বভৌম অধিকার ও আত্মকর্ত্তৃত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে তাহারা সেই অধিকার ফিরিয়া পাউক। যে সকল জাতি আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভের জন্য প্রস্তুত তাহাদিগকে নিজেদের মনোমত রাষ্ট্রব্যবস্থা বাছিয়া লইবার অধিকার দিতে হইবে; কোনরূপ বৈদেশিক হস্তক্ষেপ থাকিতে পারিবে না; এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা—সর্ব্বত্রই এই নীতি মানিয়া চলিতে হইবে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র জীবনযাত্রার উন্নয়নের জন্য ছোট বড় সকল রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিরক্ষা করিতে হইলে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি প্রতিষ্ঠান আবশ্যক; প্রয়োজন হইলে এই প্রতিষ্ঠান শান্তির জন্য বলপ্রয়োগ করিবে।

আমেরিকার উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই। কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত জাতিসমূহ রাষ্ট্র-স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হইবে ততদিন পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তির আশা নাই। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানও তাহা জানেন; তাই তিনি তাহার বক্তৃতার উপসংহারে বলিয়াছেন—"আমাদের এই নীতিগুলি একদিনের মধ্যে প্রযুক্ত নাও হইতে পারে। তথাপি ইহাই আমাদের নীতি এবং ইহা কার্য্যকরী করিতে চেষ্টা করিব। ইহারজন্য বহু সময়ের প্রয়োজন হইতে পারে। তবু অপেক্ষা করিতে হইবে; এই আদর্শ কার্য্যকরী করার চেষ্টারও মূল্য আছে।"

খেলাধূলা

অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটদলের ভারতে আগমন ঃ—

ভারতবর্ষে ক্রিকেটের মরশুম আরম্ভ হইতেই অষ্ট্রেলিয়ান সার্ভিস ক্রিকেট দল নিমন্ত্রিত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। বোম্বাই সহরে ব্রাব্রোর্ণ ষ্টেডিয়ামে অষ্ট্রেলিয়ান দলের সহিত পশ্চিমাঞ্চল দলের তিনদিনব্যাপী খেলা হয়। অষ্ট্রেলিয়ান দল প্রথম ইনিংসএ ৩৬২ রাণ করেন। ইহার মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ান দলের সহকারী অধিনায়ক মিলারের ১০৬ রাণ উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসএ ৯ উইকেটে ৫০০ রাণ করেন। আর, এস্ মোদী ১৬৮ রাণ করেন। খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

সর্ব্বভারতীয় ক্রিকেট দলের সহিত অষ্ট্রেলিয়ান দলের তিনটি টেষ্ট্ম্যাচ খেলার বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথম টেষ্টম্যাচটি বোম্বাই সহরে ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে ১০ই, ১১ই, ১২ই ও ১৩ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত হইয়াছে। খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়, যদিও অষ্ট্রেলিয়ান দল অপেক্ষাকৃত ভাল খেলিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ান দলের অধিনায়ক হ্যাসেট টসে জিতিয়া প্রথমে ব্যাট করেন এবং সকলে আউট হইয়া প্রথম ইনিংসএ ঐ দ

৩৩১ রাণ করেন। ব্যাটিংএ পেটিফোর্ড ও পেপার যথাক্রমে ১২৪ ও ৯৫ রাণ করেন। ভারতীয় দলের ফিল্ডিং ভাল হয় নাই এবং দু তিনটি ক্যাচ ফস্‌কাইয়া যায়। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে ৩৩৯ রাণ করেন। অমরনাথের ৭৫ রাণ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় দল অষ্ট্রেলিয়ান দল অপেক্ষা ১৫০ রাণের অধিক পশ্চাতে থাকায় "ফলো অন" করিতে বাধ্য হন এবং দ্বিতীয় ইনিংসে সকলে আউট হইয়া ২০৪ রাণ করেন। অষ্ট্রেলিয়ান্ দল দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেট হারাইয়া ৩১ রাণ করিলে খেলার সময় উত্তীর্ণ হয়। গুল মহম্মদ ও আমীর ইলাহীর ব্যাটিং এই দিন ভারতীয় দলকে পরাজয়ের হাত হইতে বাঁচাইয়াছে। তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত ব্যাট করিয়া যথাক্রমে ৪৮ ও ৩২ রাণ করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় দলের অধিনায়ক মার্চেন্ট্ ৬৯ রাণ করেন। ভারতীয় দলে দ্রুতগতিতে বল নিক্ষেপ করিতে পারে এরূপ "ফাষ্ট বোলারের" অভাব অনুভব হইয়াছিল। বোম্বাইয়ের খেলা দেখিয়া বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে ভারতীয় দলে ফাষ্ট বোলার থাকিলে অষ্ট্রেলিয়ান দল এত রাণ তুলিতে পারিতেন না।

১৫ই ও ১৬ই নভেম্বর অষ্ট্রেলিয়ান দলের সহিত পুনা সহরে সম্মিলিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দলের দুই দিন ব্যাপী খেলা হয়। অষ্ট্রেলিয়ান দল তেমন গা লাগাইয়া খেলেন নাই। তাঁহারা প্রথম ইনিংসে ৩০০ রাণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় দল ১ উইকেটে ৩৮৫ রাণ করিয়া ছাড়িয়া দেন। বিশ্ববিদ্যালয় পক্ষে এম্, আর, রেড্ডি ২০০ এবং আব্দুল হাফিজ ১৩১ রাণ করেন। অষ্ট্রেলিয়ান দল দ্বিতীয় ইনিংসে ৩টি উইকেট হারাইয়া ৮৫ রাণ করিলে খেলার সময় উত্তীর্ণ হয় এবং খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

অষ্ট্রেলিয়ান দলের সহিত পূর্ব্বাঞ্চল দলের কলিকাতায় ইডেন উদ্যানের মাঠে তিনদিন ব্যাপী খেলা হয়। এই খেলায় পূর্ব্বাঞ্চল ২ উইকেটে জয়ী হইয়াছে। পূর্ব্বাঞ্চলের পক্ষে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ টেষ্ট খেলোয়াড় কম্পটন দ্বিতীয় ইনিংসে ১০১ রাণ করেন। অষ্ট্রেলিয়ান দলের অধিনায়ক হাসেট দ্বিতীয় ইনিংসে ১২৫ রাণ করেন। বোলিংএ এস্, চৌধুরী বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি প্রথম ইনিংসে ৩৫ রাণে তিনটি উইকেট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৯ রাণে তিনটি উইকেট পান।

গত ২৫শে নভেম্বর ইডেন উদ্যানে অষ্ট্রেলিয়ান দলের সহিত সর্ব্বভারতীয় দলের দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ আরম্ভ হয়। চারিদিন ব্যাপী খেলা হইয়া ২৮শে নভেম্বর খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। ভারতীয়গণ টসে জিতিয়া প্রথম ব্যাটিং করেন। মার্চেন্ট্ দুর্ভাগ্যক্রমে ১২ রাণ করিয়া রাণ আউট হন। ভারতীয়দল মোট ৩৮৬ রাণ করেন। ইহার মধ্যে মানকড়ের ৭৮, হাজারীর ৬৫ এবং মোদীর ৭৫ রাণ উল্লেখযোগ্য। অষ্ট্রেলিয়ান দলের পেপার ৪টি উইকেট পান। অষ্ট্রেলিয়ান দল প্রথম ইনিংসে ৪৭২ রাণ করিয়া ৮৬ রাণে অগ্রগামী থাকেন। উইটিংটন্ ১৫৫ রাণ এবং পেটিফোর্ড ১০১ রাণ করিয়া আউট হন। বোলিংএ অমরনাথ ও মানকড় যথাক্রমে ৩টি ও ৪টি উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় দল ৪ উইকেটে ৩৫০ রাণ করিয়া অষ্ট্রেলিয়ান দলকে ব্যাট করিতে দেন। অষ্ট্রেলিয়ান দল ২ উইকেটে ৪৯ রাণ তুলিলে খেলার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। দ্বিতীয় ইনিংসে মার্চেন্ট্ ও হাফিজ নট্ আউট থাকিয়া যথাক্রমে ১৫৫ রাণ ও ৮৬ রাণ করেন। মার্চেন্ট্ যেরূপ দৃঢ়তার সহিত রাণ তুলিয়া ভারতীয় দলকে পরাজয় হইতে বাঁচাইয়াছেন তাহাতে সকলেই তাঁহার খেলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতীয় দলের ফিল্ডিং নীচুস্তরের হইয়াছিল, সি, এস্, নাইডুর মত খেলোয়াড়ও দুইটি ক্যাচ লুফিতে পারেন নাই।

অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল যে কয়টি ম্যাচ খেলিয়াছেন তাহার মধ্যে একটি খেলায় তাঁহারা পরাজিত হইয়াছেন। বাকী খেলাগুলি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক

নর্থবেঙ্গল আয়ুর্বেদিক ফার্ম্মেসীর
TRADE MARK
রেজিষ্টারী করা
শ্রীরাধা গোবিন্দ সাহার
আবিষ্কৃত
ধন্বন্তরী পাচন
সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া, প্লীহা, যকৃতের মহৌষধ।
DHANWANTARI PACHAN
মূল্য ১৷৹
দেড় টাকা
কুচবিহার, কাইয়াপটি

কোচবিহার দর্পণের নিয়মাবলী।

১। কোচবিহার দর্পণের প্রতি সংখ্যার মূল্য চারি আনা ও বার্ষিক সডাক তিন টাকা; মূল্য অগ্রিম দেয়।

২। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লেখা কাগজের একপৃষ্ঠায় স্পষ্টরূপে লিখিয়া সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে। উৎকৃষ্ট লেখার জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

৩। অমনোনীত লেখা ফেরৎ লইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকেট সহ ঠিকানা লেখা খাম পাঠাইতে হয়, অমনোনীত কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না। অমনোনয়নের কারণ দর্শাইতে সম্পাদক অক্ষম।

৪। মনোনীত লেখা কখন প্রকাশিত হইবে সে সম্বন্ধে সম্পাদক কোনরূপ নিশ্চয়তা দিতে পারেন না।

৫ কোচবিহার দর্পণে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা ১০৲ টাকা; অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৬৲ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা। কভারে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার দ্বিগুণ।

৬। টাকাকড়ি সম্পর্কিত চিঠিপত্র ম্যানেজারের নিকট লিখিতে হইবে।

ম্যানেজার কোচবিহার দর্পণ
ষ্টেট্‌প্রেস, কোচবিহার।

চাঙ্গড়াবান্ধা মেলা।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৯১৬ সনের ১৬ই জানুয়ারী ২রা মাঘ বুধবার হইতে একমাস কাল ধরিয়া রাজ্য কোচবিহারের অন্তর্গত মেখলীগঞ্জ মহকুমার মধ্যে চাঙ্গড়াবান্ধা বন্দরে এক মেলা বসিবে। চাঙ্গড়াবান্ধা বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ের একটি ষ্টেসন ও সমৃদ্ধশালী বন্দর। মেলা স্থান উক্ত রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে দুই রসিমাত্র ব্যবধান। এই বন্দরে রেলপথে আসিবার যেরূপ সুবিধা আছে, সুপ্রশস্ত ও সুগম রাজপথদ্বারা বিবিধ যানের সহযোগে গতায়াত ও মালপত্র আনিবারও সেইরূপ বন্দোবস্ত রহিয়াছে। মেলাতে যে সমস্ত দোকান বিপণ আসিবে তাহাদের সুবিধার জন্য গৃহাদি প্রস্তুতের ব্যবস্থা ও কূপাদি খনন করিয়া দেওয়া হইবে। স্রোতস্বতী নদী নদীর পার্শ্বে মেলা স্থান নির্ব্বাচিত হওয়ায় বিক্রয়ার্থ আগত পশু সমূহেরও কোন প্রকার অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই। শান্তিরক্ষা ও পাহারা দিবার জন্য যথেষ্ট পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত থাকিবে মেলার সৌষ্ঠব বর্দ্ধনার্থ ও মেলা স্থানে লোকের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধ নিবারণার্থে মেখলীগঞ্জের সবডিভিসনাল অফিসার মহাশয় স্বয়ং ও তাঁহার কর্মচারিবর্গ সেখানে মেলার অধিকাংশ সময় উপস্থিত থাকিবেন ও তথায় এজলাস করিবেন।

এই মেলাতে থালা, বিছানা, পাথরের বাসন, নানাপ্রকার রংবেরংএর, পশমী ও সুতি কাপড় কম্বল প্রভৃতি পোষাক বহু বহু স্থানের ও নানাপ্রকার দ্রব্য, লোহা, সতরঞ্চ প্রভৃতি নানাশ্রেণীর বহু প্রকারের দ্রব্য আমদানী হইয়া থাকে পশ্চিম দেশের গরু, মহিষ, ছুটিয়া ঘোড়া, উষ্ট্র, ভেড়া, কুকুর প্রভৃতি এখানে বহুল পরিমাণে আমদানী হয়, ও ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে, এই বৎসর যাহাতে অধিক পরিমাণে আমদানী হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইতেছে। গত বৎসর মেলায় দোকানদারগণের বিশেষ লাভ হইয়াছিল।

আগন্তুকগণের চিত্তবিনোদনের জন্য নানাপ্রকারের নির্দ্দোষ আমোদের বন্দোবস্ত করা হইবে। যথা:—

১। সার্কাস।

২। বায়স্কোপ।

৩। প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালার যাত্রা।

৪। দেশ ও নিকটবর্ত্তী স্থানের নানাপ্রকার রংতামাসা ও অন্যান্য গান।

মেলার দিবস বিশেষ সুবিধাজনক স্থান দখলের জন্য দোকানদারগণ যেন পূর্ব্ব হইতেই মেখলিগঞ্জের সবডিভিসনাল অফিসারের নিকট প্রার্থনা করেন। মেলার দিন যত নিকটবর্ত্তী হইবে, তাহাতে সকলেই সমস্ত প্রধান প্রধান স্থান অধিকৃত হইয়া যাইতে পারে। ইতি ১৯১৫ সনের ২০শে ডিসেম্বর, ১৩২২ সনের ৫ই পৌষ।

K. C. GANGULI,
Revenue Minister of the State,
Cooch Behar.

NOTICE.

THE INDIA PROVIDENT COMPANY LIMITED, CALCUTTA

Notice having been given the loss of the Policy numbered **56366** on the life of Mr. Santosh Chandra Majumdar, Keshab Road, Cooch Behar, a duplicate policy will be issued unless objection is lodged with us within one month from this date

Dated, Calcutta,
The 21st. January, 1916.

I. B. Sen,
Secretary.

সুনীতি একাডেমী
উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়
কুচবিহার
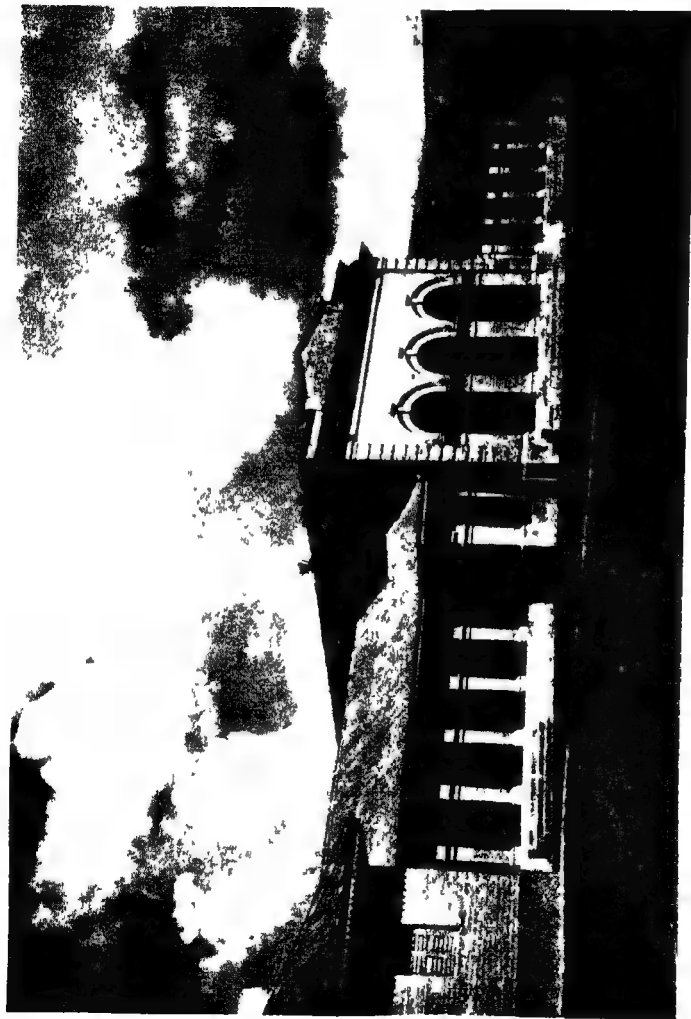
Photo & Block
Universal Art Galler

কোচবিহার দর্পণ

অষ্টম বর্ষ { পৌষ ১৩৫২ সন, রাজশক ৪৩৬ } ৯ম সংখ্যা

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীতমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম্-এ, পি-এইচ-ডি

বঙ্কিমচন্দ্রের অনবদ্য উপন্যাসগুলি অনেক আগে লেখা হইলেও ইহাদের জনপ্রিয়তা এখনও অটুটই রহিয়া গিয়াছে। এই উপন্যাসগুলি আলোচনা করিতে হইলে লেখকের রুচি, শিক্ষা ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক, কারণ প্রায় প্রত্যেক লেখকের লেখার মধ্যেই তাঁহার নিজের মনের একটা ছাপ পড়িতে দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রও তাহা হইতে বাদ যান নাই। এই সম্বন্ধে এই স্থানে দু'একটি কথার উল্লেখ করিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র জাতি হিসাবে কুলীন ব্রাহ্মণ। তাঁহার নিজ গ্রাম কাঁঠালপাড়া (নৈহাটি) সংস্কৃত শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র গঙ্গাতীরস্থ ভট্টপল্লী (ভাটপাড়া) গ্রামের নিকটবর্তী। এমতাবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্রের মনোবৃত্তি একটু রক্ষণশীল হওয়াই স্বাভাবিক। অপরপক্ষে তিনি এই দেশের একজন প্রথম গ্রাজুয়েট। তিনি মোক্ষমুলর, মিল, বেন্থাম, এডামস্মিথ, ম্যালথুস প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীগণের লেখা মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন এবং কতকটা ইহাদের অনুরাগীও হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার ফলে দেশের সমাজসংস্কার, অর্থনৈতিক উন্নতি প্রভৃতির দিকেও তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল এবং তিনি কিছু উদারমতাবলম্বী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আবার সংস্কৃত কাব্য ও দর্শন প্রভৃতির প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগের ফলে তিনি এই দেশীয় আচার নিয়ম প্রভৃতির প্রতিও অনেকাংশে আস্থাবান ছিলেন। ইহার ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবপ্রবাহের অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তিনি কোন মতেবই একেবারে অন্ধ ভক্ত ছিলেন না। অথচ স্বদেশ ও স্বসমাজের প্রাচীনকীর্ত্তি ও রীতিনীতির প্রতি তিনি একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। নিজের সমাজের অর্থাৎ

হিন্দুসমাজের অনেক প্রথা ও চলিত মতবাদই যে ভাল নহে তাহা তিনি বুঝিতেন এবং বুঝিতেন বলিয়াই ইহার সংস্কার প্রয়াসী ছিলেন। উপন্যাসগুলির মধ্যদিয়া তিনি সে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি সমাজ সম্বন্ধে বিপ্লব (revolution) অপেক্ষা ক্রমবিবর্ত্তনেরই (evolution) অধিক পক্ষপাতী ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন সারা দেশময় একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল ; ইংরেজী শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন নাই। তবে তিনি যে হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহের প্রচলন বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই তাহা তাঁহার বিষবৃক্ষ উপন্যাসখানি পড়িলেই অনেকটা বোঝা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবোধ এত বেশী ছিল যে বিশ্ব-মানবের প্রতি প্রীতি দেখাইবার তিনি ততটা অবসর পান নাই। তাঁহার এই জাতীয়তা বোধের মধ্যে পাশ্চাত্য nationalismএর কোনরূপ উগ্র গন্ধ ছিল না। বরং তিনি জাতীয়তাবোধের সহিত বিশ্বমানবতার সমন্বয় সাধনেরই প্রয়াসী ছিলেন।

খুব সম্ভব বঙ্কিমচন্দ্র আন্তরিকভাবে কতকটা উদার মনোভাব পোষণ করিতেন এবং ইংরেজী শিক্ষা তাঁহাকে এইদিকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তিনি নিজ পরিবারের তথা সমাজের রক্ষণশীল প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। বোধ হয় এই দুই প্রভাবের মানসিক দ্বন্দ্বে তাঁহার ভিতরে উদারনীতি অপেক্ষা কার্য্যতঃ রক্ষণশীলতাই অধিক জয়লাভ করিয়াছিল। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যে উদার মনোভাব লইয়া হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ চালাইতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াও ততটা অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। মানুষ হিসাবে বিদ্যাসাগর মহাশয় বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা অনেক উদার ছিলেন। ইহা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র শুধু কাগজে লিখিয়া স্বীয় মত প্রকাশ করিতে ভালবাসিতেন আর বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বীয় মত দেশে কার্য্যকরী করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। হয়ত বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা অধিক ভাবপ্রবণ ছিলেন। তবুও বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে শুধু মতবাদপ্রকাশেই সন্তুষ্ট ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় সেখানে কার্য্যকরী মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মনের ভিতরে কোথায় যেন একটি নারীভাব লুক্কায়িত ছিল। তিনি নারীজাতি সম্বন্ধে অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। নারীজাতির দৈহিক রূপ চালচলন ব্যবহার ও মানসিক অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্ত্রীস্বাধীনতা খুব পছন্দ করিতেন বলিয়া মনে হয় না। সংসারক্ষেত্রে বাঙ্গালী নারীর ভাগ্য যে পুরুষের ভাগ্যাধীন তদানীন্তন বাঙ্গালা সমাজদৃষ্টে তাঁহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। হয়ত তিনি নিজেও ইহা সমর্থন করিতেন। তাঁহার সৃষ্ট দলনী, শৈবলিনী, প্রফুল্ল, চঞ্চলকুমারী, কুন্দনন্দিনী, সূর্য্যমুখী, রোহিণী, ভ্রমর, কপালকুণ্ডলা, আয়েষা প্রভৃতি যেন মূলতঃ একছাঁচে ঢালা। ইহাদের চরিত্রে আপাত বৈষম্য থাকিলেও কোথায় যেন আদর্শগত মিল রহিয়াছে। স্বামিভক্তির উৎস হইতেই এই সকল নারী প্রেরণা লাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসরণ করিতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে সব নারীচরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাদের স্বাধীনতা কোথায় যেন ব্যাহত হইয়া গিয়াছে। যেন মনে হয় এই সব নারী যত স্বাধীন আবেষ্টনের

ভিতরেই বর্দ্ধিত হউক না কেন, কোথায় যেন ইহাদের অন্তরের অন্তরতমস্থলে ইহারা (এমন কি কপালকুণ্ডলা পর্য্যন্ত) অত্যন্ত সংস্কারাবদ্ধ ও সামাজিক আদর্শপ্রবণ রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন জীব। বঙ্কিমচন্দ্র পুরুষের অপরাধ অপেক্ষা নারীর অপরাধ সম্বন্ধে অধিক সচেতন ছিলেন। কুন্দনন্দিনী বিধবা সুতরাং তাহার পুনর্বিবাহে তিনি তাহাকে সুখী করিতে পারেন নাই। বিচার করিয়া দেখিতে গেলে বালবিধবা রোহিণী অপেক্ষা বিবাহিত গোবিন্দলালের অপরাধ হয়তো অধিক। কিন্তু সামাজিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবার ভয়ে তিনি গোবিন্দলালকে লঘু শাস্তি দিয়া রোহিণীকে একেবারে গুলির আঘাতে হত্যা করাইলেন। এইরূপে তিনি সামাজিক শুচিতা রক্ষা করিলেন। আত্মীয় প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর প্রেমকে তিনি বিশেষ ভাল চক্ষে দেখেন নাই। এই ব্যাপারে প্রতাপের প্রেমকে সংযমের গণ্ডির ভিতরে রাখিয়া তাহার মৃত্যু ঘটাইলেন, নতুবা ঘরছাড়া বউকে ঘরে ফিরাইয়া আনা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। কাহারও বউ কুলের বাহির হওয়া ভাল সামাজিক দৃষ্টান্ত নহে। সুতরাং শৈবলিনীকে পুনরায় ঘরে ফিরিতে হইল। অবশ্য ইহাতে একটু শুদ্ধির প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। তাই আমরা শৈবলিনীর উপর যোগবলের প্রক্রিয়ার আরোপ দেখিতে পাই। অজানা ঘরের মেয়ে ও বনে কাপালিক প্রতিপালিত বলিয়া কুলীনের ঘরে বিবাহিতা কপালকুণ্ডলার জীবনেও তিনি সুখ আনিতে পারেন নাই। এই সব নারী চরিত্রের কোথায় যেন একটা অভিশাপ লাগিয়াই ছিল। এই স্থানে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের উপর সাধু-সন্ন্যাসীর বেশ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার এই মনোভাব নারীচরিত্রের পরিণতিতে অনেকটা সাহায্য করিয়াছিল।

অপরপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের অঙ্কিত পুরুষ চরিত্রগুলি নারী চরিত্রগুলির পাশে অনেকক্ষেত্রেই ম্লান হইয়া গিয়াছে। পুরুষ চরিত্রগুলি অনেকক্ষেত্রে কুলীন এবং স্বামী হিসাবে বহুবিবাহপ্রবণ। যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নারীচরিত্রগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন (যথা কোন সমস্যার সমাধান বা পরীক্ষামূলক ব্যাপার) তাহা সুফল লাভ করে নাই। স্বামী হিসাবে পুরুষচরিত্রগুলির অনুপযুক্ততাই যে তাহার কারণ অনেক স্থানে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। ব্রজেশ্বর ও নবকুমারের ন্যায় স্বামী ইহার দৃষ্টান্তস্থল। ইহার ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক মানদণ্ডে নারীঘটিত পরীক্ষা ন্যায্য ফল লাভ করিতে পারে নাই। বহুস্থলেই যেন শেষরক্ষা করিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের রক্ষণশীল মনোভাবই এইরূপ অবস্থার জন্য দায়ী।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস নামে অভিহিত গ্রন্থগুলির কতকগুলি 'রোমান্স" এবং কতকগুলি প্রকৃত উপন্যাস। আবার উভয়ের সংমিশ্রণও কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় (যথা "কপালকুণ্ডলা)। রাজা, বাদসাহ প্রভৃতি সম্বলিত অভিজাত শ্রেণীর বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের যে ঝোঁক ছিল তাহা কতকটা সেকালের পাশ্চাত্য গ্রন্থকারদিগের (যেমন স্কট) ঝোঁকের সহিত তুলনীয়। তিনি সাধারণ বাঙ্গালী সমাজের চিত্রও অবশ্য দিয়াছেন। তবে তাঁহার সব লেখাই আদর্শবাদী মনোভাবের দ্যোতক। তাঁহার প্রবন্ধগুলিও যেমন আদর্শ প্রচারে সাহায্য করিয়াছে উপন্যাসগুলিও তেমন তাঁহার এই কাজে লাগিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের "অনুশীলন" প্রবন্ধ পাঠে জানা যায় যে তিনি পুরুষ ও নারীর আদর্শসম্বন্ধে কোন বিশেষ ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র' আলোচনার মধ্যেও এই সম্বন্ধে বিশেষ অবগত হওয়া যায়। স্ত্রী ও

পুরুষ উভয়ের পক্ষেই দেহ ও মনের উপযুক্ত স্ফূরণ সমভাবে হওয়া উচিত তিনি এইরূপ মত পোষণ করিতেন। এই বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি শুধু তাঁহার প্রবন্ধাবলীর উপরই নির্ভর করেন নাই। তাঁহার কোন কোন উপন্যাসও তাঁহার এই মতবাদের ফল, যেমন, "দেবী চৌধুরাণী" "আনন্দমঠ" ও "সীতারাম"। এই স্থানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে তাঁহার স্বদেশের জনগণের মধ্যে জাতীয় ভাবের উন্মেষেও তিনি যত্নবান ছিলেন। তাঁহার "আনন্দমঠ" উপন্যাসখানি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার জাতীয়তা বোধ একটু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। মূলে আত্মপ্রীতি, তাহার পর সমাজপ্রীতি এবং সর্ব্বশেষে মানবের ক্রমোন্নতির ফলে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয় বলিয়া তিনি বুঝিতেন। দৈহিক ও মানসিক উন্নতির সহিত জাতীয়তাবোধের সম্বন্ধ রহিয়াছে ইহা বোধ হয় তিনি বুঝিয়াছিলেন।

এককথায় বলিতে গেলে বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহার তুলনা নাই।

গোবিন্দদাসের কাব্যে হাস্যরস

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন এম্-এ, কাব্যতীর্থ

কবি ৺গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবি-প্রতিভা ছিল নির্ঝরের মত স্বতঃ-উৎসারিত ও বহু ধারায় প্রবাহিত। দারিদ্র্য-নিপীড়িত কবি উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ না পাইলেও 'প্রতিভা'-রূপ দৈবী সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। প্রাচীন পণ্ডিতেরা প্রতিভার সংজ্ঞা দিয়াছেন 'নব-নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি,' অর্থাৎ যে বুদ্ধি বা দৈবী প্রেরণার বলে নূতন নূতন সৃষ্টি সম্ভবপর হয়। গোবিন্দচন্দ্র দাসের সমগ্র কাব্যগ্রন্থে—'প্রেম ও ফুল,' 'কুঙ্কুম,' 'কস্তূরী,' 'চন্দন,' 'ফুলরেণু' ও 'বৈজয়ন্তী'-তে—কবির এই স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত কবি-প্রতিভার নিদর্শন আছে।

বিষয়-বস্তু অনুসারে কবির কবিতা-সমূহকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যথা—হাস্যরসাত্মক বা ব্যঙ্গকবিতা, প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা, প্রেমবিষয়ক কবিতা, স্বদেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যবোধের কবিতা ইত্যাদি। আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কবির রচিত ব্যঙ্গকবিতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। হাস্যরসের সৃষ্টিতে কবির কি অদ্ভুত শক্তি ছিল, আজ আমরা তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব।

আমরা বর্ত্তমান নিবন্ধে হাস্যরসের উৎপত্তি বা সূক্ষ্ম বিভাগ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিব না, কারণ, গোবিন্দদাসের কাব্যে আমরা হাস্যরসের নানা প্রকার ভেদ দেখিতে পাই না। তাঁহার হাস্যরসের কবিতাগুলি সমস্তই 'স্যাটায়ারের' অন্তর্গত। কবির দৃষ্টি প্রধানতঃ বাংলা দেশেই সীমাবদ্ধ। বাঙ্গালীর চরিত্রে কবি যখনই কোন দোষ ত্রুটি বা গ্লানি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তখনই তিনি স্বজাতিকে তীব্র কশাঘাত

করিয়াছেন। কবি তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতিকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছেন,—কবি চাহিয়াছেন, তাঁহার স্বদেশবাসী মনুষ্যত্বের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হউক। সুতরাং কবি যখন হাসিয়াছেন ও আমাদিগকে হাসাইয়াছেন তখন তাঁহার চক্ষু অশ্রুসজল লইয়া উঠিয়াছে; কবি যখন ক্ষুব্ধ রোষে গর্জ্জন করিয়াছেন, তখন তাঁহার রুদ্র বীণায় যেন মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের সুর ধ্বনিত হইয়াছে।

কিন্তু কবি যেখানে তাঁহার স্বদেশবাসীকে মৃদু কশাঘাত করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার কবি প্রতিভা চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। 'কুঙ্কুম' নামক কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতায় কবি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

'কে আর তোমারে ভালবাসিবে কুঙ্কুম?
আশা, চিন্তা, সুখ সব, যত কিছু অভিনব,
দেশময় নূতনের জবর জুলুম!
যাহারা পুরাণা দল, সকলেই বেদখল,
নাহি আর আগেকার সে ভারত-ভূম!
তোমারো সে দিন নাই, কপালে পড়েছে ছাই,
কামিনী কৌতুকে পরে 'ক্যানেঙ্গা' কুসুম।
লেভেণ্ডার ম্যাকেসার, সুইট ব্রায়ার ওয়াটার,
পাউডার এসেন্সের মহা মরসুম!
কে আর তোমারে খোঁজে? প্রমত্ত অটো-ডি-রোজে,
পারফিউমের দেশে পড়িয়াছে ধুম!
সর্ব্বথা বিলাতী গন্ধ ভারত করেছে অন্ধ,
কে আর তোমারে ভালবাসিবে কুঙ্কুম?

এই কবিতায় কবি আমাদের অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তাকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। ভারতের গৌরবের দিনে ভারতীয় নারীগণ যে সমস্ত প্রসাধন-দ্রব্যে অঙ্গরাগ রচনা করিতেন, তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির পরিচয় ছিল; প্রকৃতির অকৃপণ হস্তের দান তাহাদের দেহের স্বাস্থ্য, অঙ্গের লাবণ্য ও চিত্তের প্রসাদ বিধান করিত। মহাকবি কালিদাসের কাব্যে এই যুগের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। কবি ভবভূতির ভাষায় 'তে হি নো দিবসা গতাঃ।' আজ ভারতের সে দিন নাই; আজ এ দেশের পুরনারীগণ বিদেশী প্রসাধনে অঙ্গের লাবণ্য-বর্দ্ধনের চেষ্টা করে। তাই কবি খেদের সহিত বলিতেছেন—'কে আর তোমারে ভালবাসিবে কুঙ্কুম?' কিন্তু কবির এই কথাটির মধ্যে একটি গভীর ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে হয়। কবি যেন বলিতে চাহিয়াছেন,—বাংলার কাব্য সাহিত্যে এখন বৈদেশিক ভাবের বন্যা আসিয়াছে, খাঁটি বাংলা কবিতার সে মর্য্যাদা বা গৌরব নাই। কবি তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন—আজ কোন্ বাঙ্গালী পাঠক তাঁহার কাব্যগ্রন্থের সমাদর করিবে?

'শজারু' নামক একটি কবিতায় কবি নারীগণের ভূষণ-প্রিয়তাকে ব্যঙ্গ করিতেছেন। কিন্তু কবিতাটির মধ্যে দারিদ্র্যক্লিষ্ট কবির বেদনা ও দীর্ঘশ্বাসই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে ইহার মধ্যে যে হাস্য-রস আছে, তাহা সহজে চোখে পড়ে না। কবি ইঙ্গিতে বলিতেছেন,—নারী যখন সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারে আচ্ছাদিত করিয়া দর্শকগণের চক্ষু ঝলসাইয়া দিতে চাহে, তখন তাহাকে সেই জন্তু বিশেষের সঙ্গে তুলনা করা চলে, যাহার দেহ কণ্টকে আকীর্ণ। আমরা কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

'দীন বাঙ্গালীর হায়, চাকরিই ব্যবসায়,
তাহাও এ অভাগার ভাগ্যে নাহি জুটিল!
ঘরে বঙ্গবালা প্রিয়া, তারেও গহনা দিয়া,
তুষিবারে ষুবদৃষ্টে ঘটে নাহি উঠিল!
প্রেমের প্রতিমা খান, দীনতায় নহে ম্লান,
সরলা হরিণী সম নাচে কাছে ছুটিয়া!

তরল কৌমুদী রাণী, গোলাপী মাখনখানি,
চায়নি গহনা প্রিয়া কভু মুখ ফুটিয়া!
প্রেয়সীর মুখখানা, পাকা দাড়িমের দানা,
টলমল করে বসে, আছে কোণে বসিয়া।
সরল ফুলের প্রাণে, সরল ফুলের ঘ্রাণে,
সরল সুধার ধারা পড়ে যেন খসিয়া।
প্রতিবেশী আছে যারা, সকলেই ধনী তারা
মেয়ে ছেলে বাখে গায় সোনা রূপা ছড়িয়া!
বসায়ে রূপের হাট, উজলে দীঘির ঘাট,
বড় মানুষের মেয়ে কত ভূষা পরিয়া।
বাঙ্গা মুখে রাঙ্গা হাসি, প্রেয়সী কহিল আসি,
'বিধুর গহনাগুলি মরি কিবা সুচারু!'
দিবার যোগ্যতা নাই, আর কি কহিব ছাই,
হাসিয়া কহিনু, 'প্রিয়ে! সাজিবে কি শজারু?'

(কুঙ্কুম)

কবি আর এক ধরণের ব্যঙ্গ-কবিতা রচনা করিয়াছেন, যাহা বিদ্বেষ-প্রসূত না হইলেও তীব্র জ্বালাময়ী। কবি যেখানে দুর্নীতি, অনাচার বা কদর্য্যতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেখানেই তিনি নির্ম্মমভাবে কশাঘাত করিয়াছেন। এরূপ স্থলে কবি প্রায়ই ভাষার সংযম বা শালীনতা রক্ষা করিতে পারেন নাই; এই জন্য তাঁহার কবিতা স্থানে স্থানে গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট হইয়াছে। তাঁহার 'বাঙ্গালী' কবিতা-টির কোন কোন স্থানে এইরূপ অসংযমের পরিচয় আছে। তথাপি কবিতাটির সর্ব্বত্র স্বদেশ-প্রীতির ধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। কবিতাটিকে আমরা আগ্নেয়-গিরির বহ্নি-নিঃস্রবের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। কবির স্বাভাবিকী প্রতিভা এ বিষয়ে যেন 'বায়রণ'কেও অতিক্রম করিয়াছে। কবিতাটির কোথাও 'পোপ' বা 'ড্রাইডেনের' কবিতার মত ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নাই। বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব-হীনতা কবিকে এমন মর্ম্ম-পীড়া দিয়াছে যে, কবি রুদ্ররোষে গর্জ্জন করিয়া বলিয়াছেন—

'বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?
হেন ঘোর মিথ্যাভাষী,
অনুগ্রহ-অভিলাষী,
জগতে ধনীর দাস আর কেহ নয়।
হ'তে তার কৃপাপাত্র,
কি শিক্ষক, কিবা ছাত্র,
উকীল ডাক্তার আদি, সম্পাদকচয়,
যারা বড় মান্যগণ্য,
দেশের উদ্ধার জন্য,
'বঙ্গের উজ্জ্বল আশা' যাহাদেরে কয়,
যত তার অবিচার,
যত তার ব্যভিচার,
যত তার ভয়ঙ্কর কার্য্য পাপময়,
জানিয়া নাহিক জানে,
শুনিয়া শোনেনা কানে,
তাহারি প্রশংসা-গানে করে জয় জয়।
এমন সাহসহীন,
ভীরু কাপুরুষ ক্ষীণ,
বলিতে উচিত কথা সঙ্কুচিত হয়,
পাপেরেও বলে পুণ্য,
হেন মনুষ্যত্ব শূন্য,
এমন করিয়া করে বিবেক বিক্রয়।
এ নীচ নিরয়গামী,
সদা ঘৃণা করি আমি,
দেখিলে এদের মুখ মহাপাপ হয়
বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?

(চন্দন)

কবির বহু কবিতায় তাঁহার স্বদেশ-প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের মত তিনিও তাঁহার কাব্যে দেশাত্ম-বোধ ও জাতীয়তার আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। 'কংগ্রেস' বা জাতীয় মহাসভায় আদর্শের প্রতিও তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। সে যুগে বাংলার একটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাপ্তাহিক পত্র 'কংগ্রেস' কে 'কঙ্গরস' বলিয়া ব্যঙ্গ করিত। এই নিষ্ঠুর ব্যঙ্গে কবির হৃদয়ে আঘাত লাগে; তাই তিনি সেই সাময়িক পত্রের উদ্দেশ্যে একটি ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন। উহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

'কি বল হে ব্যঙ্গভাষী, একি কঙ্গরস ?
এ যে সঞ্জীবনী সুরা,
আগ্নেয় আনন্দ পূরা,
এ যে অমরের সেব্য অমৃত সরস !
এ জলন্ত সুধাপানে,
দৈববল জাগে প্রাণে,
হুঙ্কারে ভুবন ভয়ে কাঁপে চতুর্দ্দশ !
ভগ্ন অস্থি লাগে জোড়া,
ভাল হয় কাণা খোঁড়া,
উল্লাসে নাচিয়া উঠে ধমনী অবশ !
যাবা খায় জুতা লাথি,
জাগে সেই মৃত জাতি,
তাদেরি বিজয়কেতু উড়ে দিক্ দশ !
কি বল হে ব্যঙ্গভাষী, একি কঙ্গরস ?
(বৈজয়ন্তী)

কিন্তু কবির যে ব্যঙ্গ কবিতাটি সে যুগে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, উহা সমাজ-বিষয়ক (Social Satire)। কবিতাটির নাম 'থাকুক আমার বিয়ে।' এই কবিতাটির অংশবিশেষ বহুদিন লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। 'পণপ্রথার' বিরুদ্ধে এরূপ চমৎকার ব্যঙ্গকবিতা আর কেহ রচনা করিয়াছেন কিনা জানিনা। এই দীর্ঘ কবিতাটি হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম—

'বাবা, থাকুক আমার বিয়া,
চাই না আমি এম-এ, বি-এ, কিনতে হয় যা' টাকা দিয়ে
ছাগল গরুর মত যাদের ছেলের হাটে গিয়া,
সোনার চেইন্, সোনার ঘড়ি গর্ব্ব যাদের গলায় পরি
অমন পশু কিন্‌বো নাকো কানা কড়ি দিয়া।

বাবা, থাকুক আমার বিয়া,
চাই না ভণ্ড দেশহিতৈষী ওরাই রক্ত শোষে বেশী
ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের মত বাতাস দিয়া দিয়া,
ধিক্ সে ওদের উচ্চ শিক্ষা। ধিক্ ওদের স্বদেশী দীক্ষা
কিসে তব্‌বে এ পরীক্ষা পশুর আত্মা নিয়া।

* * *

বাবা, থাকুক্ আমার বিয়া,
কার্পেন্টার, নাইটিঙ্গেল, ডোরা, লিট্‌ল্ সিষ্টার হব মোরা,
থাকবো বাবা দীনের সেবায় জীবন সমর্পিয়া,
দেশের হবে সুখ-সুবিধা বজ্জাতেরা হবে সিধা
নারীর গৌরব বৃদ্ধি পাবে পশুর গৌরব গিয়া,
বাঞ্ছা পুরুক্, আশীষ কর চরণ-ধূলি দিয়া'।

কবিতাটির কোথাও অসংযম বা শালীনতার অভাব নাই; অথচ ইহার ভাষা তীব্র ও মর্ম্মভেদী। পিতৃদুঃখকাতরা কন্যা এখানে সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছেন,—শক্তিরূপিণী নারীর মধ্যে যে রুদ্র তেজ প্রচ্ছন্ন আছে, কবিতাটিতে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

আর অধিক দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই। হাস্যরসের সৃষ্টিতে কবি ৺গোবিন্দচন্দ্র দাসের কি অসাধারণ দক্ষতা ছিল, আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। তাঁহার কবি-প্রতিভার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

উকীলের আদর্শ সমাজ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল

প্রহসনের পাগলা বলেছিল যে একতাল সোনা পেলে সে একটা সোনার দুনিয়া বানাতে পারে। নূতন পৃথিবী সৃষ্টির বাসনা যদি পাগলামীর লক্ষণ হয়, তা হ'লে সারা জগতটাই একটা পাগলা গারদ; একই লোকের আবার খেয়াল কিম্বা মেজাজ বদ্‌লে গেলে, তার কল্পিত পৃথিবীর রূপ বদলে যায়। কাব্যের প্রেরণা আকাঙ্ক্ষা জাগায় যে প্রিয়ার উজ্জল আঁখির বিমল জ্যোতিতে জল-স্থল, নভোমণ্ডল উচ্ছ্বসিত ও উল্লসিত হক। আবার পাওনাদার দুর্দান্তের উৎপীড়নে বাসনা জাগে যে পৃথিবীতে আর যে থাকে থাকুক, যেন উত্তমর্ণরূপ অধম জীব-শূন্য হয় আদর্শ সমাজ।

আজ আমার খেয়াল হয়েছে, আমার ব্যক্তিত্বের ওকালতীর ফল্গু ছেঁচে আপনাদের নিবেদন করি, কেমন আদর্শ সমাজে আমি চাই বসবাস কর্ত্তে। কিন্তু ব্যবহারজীবী ব্যক্তিত্বেরও একাধিক স্তর আছে। জল যেমন পাত্র ভেদে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে মানুষের বৃত্তিও প্রবৃত্তির পার্থক্যে রূপ বদলায়। ওকালতীর একটা কুৎসিত স্বার্থপর দিক্ আছে, যার উল্লেখ ঘরের নিরালায় করা চলে। আমার সমব্যবসায়ীর সাক্ষাতে একথা ব'লে অক্ষতদেহে বাকীটুকু বলার সম্ভাবনা থাকবে না। ভণ্ডামী পুণ্যের বেদীতে পাপের অর্ঘ্য। যে যত লঘু তার নিজের গুরুত্ব বোধ তত অধিক। সকল বৃত্তির মত সত্যই ব্যবহার-বৃত্তির একটা কুটিল কদাকার দিক আছে। উকীল-দ্রোহী বলবে সে মনোবৃত্তি চায় জটিল এবং দুর্বোধ আইন, বহু-অর্থবাচক সংজ্ঞায় পূর্ণ। তা হলে, মামলা খুব টেনে লম্বা করা যায়, যার আশীর্ব্বাদে উকীলের ধন-ভাণ্ডারের কায়া হতে পারে স্থূল। বিচারক হবে অব্যবস্থচিত্ত এবং মাথামোটা। তা হলে আপীলের অবকাশ থাকে। ধনী বাপের বিবদমান পুত্র, লাঠিবাজ নাগরিক, বস্ত্রচোর, দত্তচোর, স্ত্রীচোর প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির দেশই উকীলের আদর্শ স্বদেশ।

কিন্তু নিশ্চয়ই এ দুষ্ট অপবাদের সমর্থনের জন্য আজ আমার খেয়াল জাগে নি। নিন্দুকের নিন্দা সত্ত্বেও ব্যবহার-জীবের একটা শুদ্ধ চেতনা আছে। তার বিদ্যা, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা ব্যবহারজীবীর অন্তরাত্মায় প্রভূত পরিমাণে সমাজপ্রীতি এবং সত্যের আদর্শ ফোটাতে পারে। আজ আমি সেই বিশুদ্ধ সত্তার আদর্শ পরিবেষণ করছি। দুষ্টবুদ্ধি যা চায়, এ রূপটা তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

ব্যবহারজীবী বাস করতে চায় বাস্তব জগতে। তার সৃষ্টিতে উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনার স্থান নাই। আমি এবং আমার বঁধু ব্যতীত—বিশ্ব হতে সব লুপ্ত হয়ে যাক আর যা রহিবে বাকী—এ মনস্তত্ত্বকে আইনজীবী পরিহাস করে। কবিতার ভাষায় বলতে গেলে তার বিশ্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে—

"দা বকের তরে ভুলাও জননী
কে বড়, কে ছোট, কে দীন, কে ধনী
কেবা আগে কেবা পিছে।
কার হোল জয় কার পরাজয়
কাহার বৃদ্ধি, কার হোল ক্ষয়,
কেবা ভাল, আর কেবা ভাল নয়
কে উপরে কেবা নীচে

গাঁথা হয়ে থাক এক গীতরবে
ছোট জগতের ছোট বড় সবে
সুখে পড়ে রবে পদপল্লবে
যেন মালা একখানি।'

এই সাম্যবাদের ছন্দে, ব্যবহারজীবীর অন্তরাত্মা স্পন্দিত। তার বাহাদুরীতেও যখন অবিচার হয়, উকীলের শুদ্ধ সত্তা বিদ্রোহী হয়। বিচারক খামখেয়ালী, পক্ষপাতী বা অবিবেচক হলে, ব্যবহারজীবীর চিত্তের গভীরে ক্ষোভ ও ব্যথা গুমরে ওঠে। সুতরাং উকীলের আদর্শ দুনিয়া—সাম্যের দুনিয়া, শান্ত শৃঙ্খলিত সমাজ। সেথায়—

(ক) আইন স্পষ্ট—বিধিনিয়মের ভাষা কুহেলিকা-চ্ছন্ন নয়।

(খ) আইন উচ্চ নীচ, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত ও অজ্ঞ সবার পক্ষে সমান।

(গ) বিচারকেরা নির্ভীক, সচ্চরিত্র, পক্ষপাতশূন্য, দরদী মানুষ।

(ঘ) রাজপুরুষ নির্লোভ, দরদী, পরার্থপর, সত্যনিষ্ঠ এবং সেবাব্রতী।

কথা উঠতে পারে যে, আদর্শ সমাজে আইন আদালত বাদ বিসম্বাদ বিদ্যমান থাকবে কেন? বলা বাহুল্য মনুষ্যের সহজ সংস্কার সম্বন্ধে যে কোন ব্যক্তি অভিজ্ঞ সেই জানে যে, বিবাদকে মানুষ নিজের ব্যক্তিত্ব হতে কোন দিন বিসর্জন দিতে পারেনি। দেবতারাও অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন। বাধ্য হয়ে রাজীবলোচন শ্রীরামচন্দ্রকে সাগর উত্তীর্ণ হয়ে লঙ্কা আক্রমণ করতে হয়েছিল।

সমাজ বহুলোকের সমষ্টি, মানুষ ভিন্নরুচি। চিরদিন নীতিশাস্ত্র এবং সমাজতত্ত্ব এক দেশের, এক সঙ্ঘের প্রত্যেক লোককে এক আদর্শে গড়বার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আদর্শ রামরাজত্ব, সাম্যবাদী ইসলাম বা নবীন সোভিয়েট কেহই সমাজ অঙ্গ হতে ঝগড়াটে লোককে নির্বাসিত করতে পারেনি। শান্তি ও শৃঙ্খলার সুষ্ঠু বিধান না থাকলে স্বৈরাচার, অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং "পরের দ্রব্য না বলিয়া লওয়া" বন্ধ হতে পাবে না।

নিয়মানুবর্তিতা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে শৃঙ্খলিত কোরে খর্ব্ব করে নিশ্চয়। কিন্তু এই শৃঙ্খলিত স্বাধীনতাই প্রকৃত পক্ষে মানুষের আধ্যাত্মিক মানসিক এবং দৈহিক শক্তিকে ফুটিয়ে তোলে। যদি কোন মাতাল, দিনের পর দিন, কালিদাস বা সেক্সপীয়রের কালির দোয়াত ভেঙে দিত আর কাগজ ছিঁড়ে দিত, যদি কোন হিটলার আইনষ্টাইনকে শিশুকাল হতে চিরকাল অবমানিত, লাঞ্ছিত এবং কারারুদ্ধ করে রাখত, তাহলে মানবজাতির জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবার অবকাশ লাভ করত না। শান্তি ও শৃঙ্খলা সমাজের প্রধান কাম্য। উকীল সোনার পৃথিবী গড়বার সময় চায় ঐ মসলা। কিন্তু ঐ নিয়ম সবার পক্ষে হওয়া চাই এক।

প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব সমানভাবে ফোটাবার ব্যবস্থা করা আদর্শ সমাজের কর্ত্তব্য। জ্ঞানপরিবেষণ সঙ্ঘের ধর্ম। প্রত্যেকের উপলব্ধি অনুসারে জগদীশ্বরের আরাধনার সুবিধা দেওয়া রাষ্ট্রের উচিত। বিদ্যার শুভ্র আলোকের ব্যবস্থা সবার ছেলের পক্ষে সমানভাবে করবে রাষ্ট্র, যেমন সে সকল পথচারীর পথের আলোর ব্যবস্থা করে। প্রত্যেক মানুষের আত্মসম্ভ্রম, তার যশ, মান, সম্পত্তি এবং নিরাময়তার সমান অধিকার মানতে হবে রাষ্ট্রকে। এ কার্য্য সম্পাদিত হতে পারে মাত্র আইনের সহায়তায়। অথচ আইনলঙ্ঘীকে শত চেষ্টাতেও সমাজ অবলুপ্ত করতে পারে না। তাই প্রয়োজন নিরপেক্ষ বিচারক ও রাজপুরুষের। একথা একটু বিশেষ করে প্রণিধান করলে সিদ্ধান্ত হবে অনিবার্য্য যে এই বিধিবিধান যাঁরা গড়বেন তাদের হওয়া চাই

সমাজের সকল স্তরের লোকের প্রকৃত প্রতিনিধি। সততা এবং বিদ্যা স্বার্থান্বেষী আপকা-বাস্তে নামকা-বাস্তে আইনরচয়িতাদের দাগাবাজী বন্ধ করবে। সমাজ পরকে আপন করতে শেখাবে, মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা বাড়াবার অবকাশ দেবে। স্বজাতিসেবাই হবে জীবনের অতিপ্রিয় কাম্য।

বলেছি আইনের ভাষার স্পষ্টতার কথা। পরিভাষা ভাবের সহায়ক। কিন্তু সে আবার ততোধিক মাত্রায় কুহেলিকার আশ্রয়স্থল। পরিভাষা একদিকে যেমন বিশেষজ্ঞের, অন্যদিকে তেমনি ভণ্ড বুজরুকের হাতের অস্ত্র। ভাষা ভাবের বাহন। আইন সঙ্ঘজীবনের কর্ত্তব্য তালিকামাত্র। কাজেই তার ভাষা সমাজমনের প্রকৃত ভাবকে যদি না মূর্ত্ত করে, সে ভাষা প্রলাপ।

সমাজে যদি পক্ষপাতিত্ব না থাকে, যোগ্যতাহিসাবে কর্ম্মীর হাতে কাজের ভার ন্যস্ত হবে। সাম্য অর্থ এ নয় যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হতে ছন্নুলাল অবধি প্রত্যেককে পালা করে রিকসাটানা হতে টোলের অধ্যাপনা পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ করতে হবে। মানুষের দেহ এবং মনের বল প্রকৃষ্টরূপে বিচার করে তাকে যোগ্য কাজে নিয়োজিত করলে বিচার হতে দুধ দোয়া অবধি সকল কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পাদিত হবে। আদর্শ রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য প্রত্যেক মানুষের নিজ উপার্জ্জিত ধন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ ব্যবস্থা সাম্যবাদের পরিপন্থী হতে পারে। উপার্জ্জকের পক্ষে বিলাসব্যসন সম্ভবপর হলে তা পরিমার্জ্জনীয়। অনুপার্জ্জিত ধন, বহু জীবনের অভিসম্পাত। জন্মের সাথে যদি কেহ কুবেরের সম্পত্তি লাভ করে, তার পক্ষে অন্যের মত পরিশ্রমের সম্ভাবনা অল্প। অথচ সন্ততির প্রতি স্নেহ, বংশের প্রতি মমতা, এবং অর্থের প্রতি অনুরাগ নরসমাজকে এযাবৎকাল অনেক পরিশ্রমী কর্ম্মী দান করেছে। আদর্শ সমাজে এই দুই বিরোধী সম্ভাবনা সামঞ্জস্যের একান্ত প্রয়োজন। সমাজের মনকে ধীরে ধীরে সাম্যের প্রতি অনুরক্ত করতে হবে। সাধারণের হিতের জন্যে রাষ্ট্রকে সঞ্চিত ধনের বহুলাংশ উত্তরাধিকারী সূত্রে লাভ করতে হবে।

মানুষ অর্থ সঞ্চয় করে দুঃখের দিনের কাঠিন্য এড়াবার জন্য। সন্ততিপালনও অর্থ সঞ্চয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। সমাজ যদি দুঃখের দিনের ভার লয়, কর্মের দিনে মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা করে, নাগরিকের শিশু পালন করে, তার স্বাস্থ্যের উন্নতিকামী হয়, সমাজদেহ হতে ঝগড়ার ব্যাধি প্রভূত পরিমাণে নির্মূল করে, তবে অর্থের লোভ অবসান হওয়া সম্ভব।

একটা কথা ভুললে চলবে না। মানুষে এবং যন্ত্রে বিশেষ প্রভেদ আছে। আদর্শ সমাজের সমান শিক্ষা, শক্তিস্ফুরণের সমতুল অবকাশ সত্ত্বেও মানুষে মানুষে সবিশেষ পার্থক্য থাকবে। নরের জ্ঞান বাড়লে সে তার অন্তঃকরণের হিংসা দ্বেষ, প্রেম সহানুভূতি, সৌন্দর্য্য-পিপাসা অথবা বিশ্ববিজয়ের আশা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তাদের উচ্ছেদ করতে পারে না। মানবপ্রকৃতির মূল সত্যকে বাদ দিলে, আদর্শ সমাজের বিধিনিয়ম হবে নিষ্ফল এবং নিরর্থক। এক তাল সোনা গালিয়ে একই ছাঁচে ঢাললে একই আকারে সমান প্রকারের কাণের দুল নির্মাণ করা যেতে পারে, কিন্তু একই পরিবেশের মধ্যে রেখে সমান শিক্ষা দিলে বা একই মন্ত্রে দীক্ষিত করলেও ঠিক সকল বিষয়ে সমান একাধিক নর বা নারী নির্মিত করা অসম্ভব। সাধারণের হিতের জন্যে আইন কানুন সামাজিক জীবের মতিগতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে মাত্র। মৌমাছিসমাজে শ্রমবিভাগ দৃষ্ট হয়, মানব সমাজে তেমন শ্রমবিভাগ অসম্ভব। ঋষি তত্ত্বালোচনায়

অবসন্ন হয়ে আশ্রমতরুর মূলে জল সেচন করেন। আবার বাগানের মালী গাছের গোড়ায় জল ঢেলে পরিশ্রান্ত হয়ে নীল আকাশের অন্তরে কোন্ বিশ্বনিয়ন্তা লুকানো আছে তা জানবার জন্যে কাতর হয়।

বিধিনিয়মনির্দ্দিষ্ট সমাজ ব্যবহারজীবের আদর্শ সোনার পৃথিবীতেও জাতীয় ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক চেতনা, পিছন-চাওয়া এবং সম্মুখদৃষ্টির যথেষ্ট অবকাশ থাকবে। প্রতি-যোগিতায় মানুষের শক্তি বাড়ে। সাময়িক সাফল্য চরম সাফল্যের অগ্রদূত। বৈজ্ঞানিকের দর্শিত পথে শ্রমশিল্পের উন্নতি করলে দেশে অন্নের সমস্যা থাকবে না। বেকার সমস্যা রাষ্ট্র নায়কদের ব্যথার কারণ হবেনা। বসুমতী মাত্র সর্বংসহা নন। তাঁর লুকানো ভাণ্ডার রত্নে পূর্ণ। তাঁর হাওয়ায় এবং জলে বিজলীর রহস্য লুকানো আছে। সেই বিজলীশক্তিকে আহ্বান করলে মাটির ভিতর হতে অসংখ্য রত্ন পাওয়া যেতে পারে। কৃষকের শ্রম শতগুণ সহস্রগুণ সাফল্যলাভ করতে পারে। বিজ্ঞান যোগের জীবাণুর উচ্ছেদসাধন করে নরদেহকে করতে পারে দৃঢ় ও সবল। কৃষ্টি অনেক সুন্দরের সন্ধান দিয়ে মানবপ্রকৃতির সহজ সৌন্দর্য্যতৃষাকে মেটাতে পারে।

আমি এই প্রবন্ধে যে সব প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি তাতে আইনের মতে নর বা মানুষ শব্দ ব্যবহার করেছি। আইনের সংজ্ঞায় নর শব্দ নর ও নারী উভয় অর্থবাচক। সুতরাং আমার আদর্শ সমাজে চাই নর ও নারীর সমান অধিকার, সমান স্ফূর্ত্তি, সমান শিক্ষা এবং সবার অনুপ্রেরণার একই মূলমন্ত্র। সে মন্ত্র হবে দেশের সেবা, দশের সেবা, দয়দের একসূত্রায় বাঁধা নরনারীর হার। যোগ্যতা অনুসারে শ্রমবিভাগ করে প্রত্যেক নাগরিকের নিকট হতে যথা-যোগ্য সহায়তা লাভ করলে যে কোন মানুষের সঙ্ঘ যে কোন দেশে, পৃথিবীতে স্বর্গ নামিয়ে আনতে পারে।

কিন্তু এসবের মূলে চাই নিয়মানুবর্ত্তিতা, শান্তি ও শৃঙ্খলা। স্ব স্ব প্রধান, বিশৃঙ্খল, পরস্পরবিরোধী মানুষের জনতার পক্ষে সুষ্ঠু সমাজগঠন একান্ত অসম্ভব।

গান

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

সব শেষ—সব শেষ,
বাকী কিছু নাহি আর।
বাঁশী মোর বাজেনাক, থেমে গেছে বেণ তার॥
নিভেছে আলোকমালা, থেমে গেছে উৎসব,
শুকা'য়েছে ফুলদল, নাহি আর কলরব।
এখন আসিলে তুমি! কিবা দিব উপহার!

ভাঙ্গা-আসরের পালা;
যারা ছিল—গেছে চলে।
যত-কিছু ছিল হেথা,
তা'রা গেছে পায়ে দলে!
এখন আসিলে তুমি, কিছু আর নাহি বাকী;
শূন্য আকাশ পানে আনমনে চেয়ে থাকি।
বাতাস আসিয়া কানে করে শুধু হাহাকার॥

ওমর খৈয়াম

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

কবি গাইলেন,—ভ্রান্ত পথ, ভ্রান্ত মত্ !
পণ্ডিতের পণ্ডা আর দার্শনিকের জর্ফরি-তুর্ফবি
ধর্মের চোখ্ রাঙানি, আব নবকেব শাস্তিভয়,
সুবোধ গোপালদেব জন্যে স্বর্গের প্রাইজ্,
রাখালদের জন্যে জাহান্নম্—
সব ঝুটা হায়, সব ঝুটা হায় !

মৃত্যু তার ভয়াল মুখ হাঁ ক'বে আছে,
রেহাই ছায় না পণ্ডিতকে, খাচ্ছে দার্শনিককেও চিবিয়ে,
ধর্মধ্বজীরা সেই যে চলে গেলেন
টপাটপ্ ভব নদীর ওপারে,
কই, কেউ তো এলেন না ফিরে আজও
ওপারের কোনো বার্ত্তা নিয়ে !
কোথায় মুক্তি ? কোথায় নির্বাণ ?—
সব ঝুটা হায়, সব ঝুটা হায় !

সব যদি ঝুটা, তবে সত্যি কি ?
কবি গাইলেন,—যা আমরা পাই অনুভবে,
আর যা হারিয়ে যায় জীবনের পবাভবে
তাই সত্যি, সত্যি আর কিছু নয়।

জীবনের সবটাই তো প্রায় পরাভব,
তাই পরাভবের দিকে
কবি চেয়ে আছেন করুণ নেত্রে।
একে উল্টে দেবার ক্ষমতা নেই,
এ যেন দারুণ এক খামখেয়ালি চেঙ্গীস্ খাঁ
হাতে মাথা কাটে!
কিন্তু, যদি সম্ভব হ'ত এর গতিরোধ করা,
যদি সম্ভব হ'ত ভেঙে গড়তে এই সৃষ্টি
আমাদের মনো-অনুমোদিত ক'রে!
হে প্রিয়া, হে প্রিয়া—।
থাক্ সে কথা।
সে-কথা ঐ মৃত্যুর মতো নিষ্ফল।

তাই অনুভবকে প্রগাঢ় করো।
কে সুলতান আর কে জাম্শীদ!
হাউই-এর মতো জ্ব'লে জ্ব'লে নিঃশেষে পুড়ে যাও
ধিক্কার দিতে দিতে সেই মৃত্যুলোভীকে,
সেই খামখেয়ালি বিধাতাকে
হৃদয়ের অনুশাসন না-মানাই যার সৃষ্টিতন্ত্র!

•

তবে আর মলিন, কৃপণ, মূক হ'য়ে
ঘরের কোণে অন্ধকারে ব'সে ব'সে
নিয়তির মার খাওয়া নয়।
হে সখি, বেরিয়ে এসো বনানীর ঐ শ্যামচ্ছায়ায়
মুক্ত ক'রে দান ক'রে দাও আপনাকে!

যে-বাণী তোমার অন্তরলোকে রুদ্ধ কামনায় গুমরে মরচে
দাও তাকে আজ আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দাও !
চমকে উঠবে ছুনিয়ার লোক,
নিন্দার বান ডাকবে জীবনের নদীতে,
তাতে কী আসে যায় !
খ্যাতি, নিন্দা,—বাক্যের বুদ্বুদ !
ঘরকন্না, সমাজ, সংসার, মান, সম্ভ্রম ?—
সব ঝুটা হায়, সব ঝুটা হায় !

পান করো জীবনের ফেনায়িত সোনালী মদ,
ডেকে আনো কামনার কল্পলোকে
সেই সব নরনারী—যাদের যুগলহিয়ার দ্রাক্ষারস
যুগলের জন্যে উঠেছে গোপনে গোপনে মদির হ'য়ে ।

তারপর—
একটি গানে, একটি তানে
একটি রজনীর অবিচ্ছিন্ন ভুজবন্ধনে
শেষ করে দাও জীবনকে !
কী যায় আসে, কী যায় আসে !
ছুঁড়ে ফেলে দাও মদের পাত্র
ভেঙে ফেলে দাও সোমের কলস,
জীবন-বহ্নি হোক্ নির্বাপিত,—
নাচুক্ মৃত্যু সেই তৃপ্তপ্রেমের ধ্বংসস্তূপে ।

সমাধান

শ্রীরমেন মৈত্র

ভোর হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল বাড়ীটার আর কোন ঘরের কোন লোক না জাগলেও, একটি বিশিষ্ট ঘরের ভিতর হইতে অদ্বিতীয় একখানা গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। একদিন নয়, দুদিন নয়, প্রত্যহ……। সমস্ত বাড়ীটার মধ্যে যেন দাঙ্গা হাঙ্গামা গোছের কিছু একটা বাধিয়া যায়। ঘরের ভিতর ষ্টোভ জ্বলে। তাহার শব্দের সহিত, অদ্ভুত সেই কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসে।

"কইরে উঠলিনি যে বড়ো। কথা বুঝি কানে গেলো না। ছেলেপুলে কোথায় কাক ডাকবার আগেই উঠবে। তা নয় বেলা আটটা পর্য্যন্ত ঘুম। সবই তোদের উলটো। আগেকার আমল হোত তো ঠ্যালা বুঝতিস্।"

ইহার পর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। দুএকটা জানালা খুলিবার শব্দ, ষ্টোভের একঘেয়ে আওয়াজ সোঁ সোঁ। ছাদের উপর কাকের প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান। পথের উপর ও দোকানে কলরব।

"ছেলেদের মতন তোমারও ঘুম বেড়ে গেলো নাকি গো? বলি উঠতে হবে না, না? হ্যাগা শুনছ? ও বাদলের মা।"

"মরণ দশা আর কি। সকাল হ'তে না হ'তেই ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ। উঠছি দাঁড়াও উঠে একবার ছাগোড়ে যাচ্ছি। পিণ্ডি রান্না করে কে দেখবো।" বাদলার মা উঠে।

"সকাল বেলা উঠে তেজ দেখিও না। আমি সাড়ে চারটার সময় উঠেছি তা জানো? এই বাদলা, মন্টি, খুকি, সাবিত্রী, গঙ্গা ওঠ তোরা।" কাল থেকে আমার সঙ্গে যদি না উঠবি তো ইয়েতে জল বিছুটি দোব। এক্জামিন হয়েছে বলে কি হাতে মাথা নিয়েছিস্ নাকি। আর পড়তে হবে না। নে ওঠ, উঠে মুখহাত ধুয়ে বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জোরে জোরে পড়। জোরে না পড়লে কখনও পড়া হয়। এই উঠলি তোরা সব?

"ঘুমোচ্ছে, ঘুমুক না ওরা। উঠলেই তো মড়াকান্না সুরু করবে। আর উঠেই বা করবে কি? এই শীতে যাবে কোথায়?"

"কোথাও যেতে হবে না। ঘরে বসে পড়ুক সব।"

"আহা বয়তো কত! কদিন থেকে বলছি ভাল ফ্ল্যাট ট্ল্যাট একটা দ্যাখো।"

"কলকাতার এখন ফ্ল্যাটের ভাড়া কত জানো! অনেক ভাড়া। এখন ওসব কথা মনেও এনো না। এই বেশ আছি। তোর তো আজ ক্লাসে ওঠাউঠি না রে, বাদলা।"

বাদল উত্তর দিল না। দিল বাদলার মা। "ওর এবার কোন ক্লাস হবে গা।"

"ম্যাট্রিক ক্লাস। এমাস দেখছি উপোস করে চালাতে হবে।"

"কেন?"

"কেন, কিছু জানো না। খেয়াল আছে এবার কত টাকার বই লাগবে? নতুন ক্লাস। তাতে ম্যাট্রিক

ক্লাস। সব কখানাই কিনতে হবে। আর আফিসে যে ধার করবো তারও উপায় নেই।"

"কেন, আর ধার দেবে না বুঝি।"

"ন্যাকা কথা শুনলে গা জলে যায়। এই সেদিন ধার করেছি মনে নেই। কোথা থেকে কি করবো কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। কি দিন কালই পড়লো রে বাবা। বাদ্‌লা এখনও বুঝি ঘুম তোর ভাঙ্গল না। দেখবি দুধা দোব। সকাল বেলায় মার না খেলে বুঝি চলে না।—এই দ্যেখ, কত চিনি দিচ্ছো? বাজারে চিনি একে পাওয়াই যায় না। নাঃ ফেল করিয়ে দেবে দেখ্‌ছি। যা না সাবিত্রী গঙ্গা·····সব মুখ ধুয়ে আয়। গায়ে জামা দে। ভারী শীত পড়েছে আজ। অসুখ হলে ডাক্তার খরচের পয়সা নেই।"

"কিগো তুমি কি আজ ধর্ম্মঘট করেছ নাকি। রান্নাবান্না করতে—হবে না। রোজই তো আপিসে লেট। নতুন একশালা সাহেব এসেছে। আজ লেট হলে চলবে না।'

"কখন বেরুবে তাই শুনি।"

"শীগগির যাও। সাড়ে নটায় হাজরা দিতে হবে।"

"নটার মধ্যে তোমার সব তৈরী হয়ে যাবে।"

"রোজ যেমন হয়। যাই একবার বাজারটা ঘুরে আসি।"

"বাজার আর করতে হবে না।"

"কেন করতে হবে না।"

"আজ আর দরকার নেই।"

"তবে থাক।"

"বাবা, ভাথনা সাবি মারছে।"

"আরম্ভ হয়েছে সকালেই; না, তোদের জ্বালায় বাড়ী ছাড়া হতে হবে দেখছি।"

"ওর ভেতর পাউরুটি আছে নে ভাগ করে খা।"

"আমি পাউরুটি খাবো না।"

"বায়নাক্কার দিন আর নেই। যা পাবে তাই খেয়ে নেবে। পয়সা দিয়েও জিনিষ পাওয়া যাচ্ছে না। তোর তো আজ ক্লাসে ওঠাওঠি না রে বাদ্‌লা।"

"হ্যাঁ।"

"নতুন ক্লাসে কি কি বইটই লাগবে সেগুলো জেনে এসেছিস্।"

"হ্যাঁ। বইয়ের নাম, দাম, কোথায় পাওয়া যায় সব লিখে এনেছি গোপালের কাছ থেকে।"

"গোপালটা কে?"

"ঐ যে এবার ফাস্ কেলাসে উঠলো। পরের বছরেই ম্যাটিরিক দেবে।"

"ওঃ দেখি চশমাটা। এই তোরা পড়তে বোস্। চণ্ডে, চণ্ডে! এই দেখতো চণ্ডেটা গেলো কোথায়।"

আবার নিস্তব্ধ।········মধ্যে দু'একটা খাসের শব্দ। খানিক পড়ে চণ্ডী নামধারী ভৃত্যের কণ্ঠ শুনা যায়। "বলুন।"

"যাতো একবার কয়লাওলা ব্যাটার কাছে। জেনে আয় আজ কয়লা পাওয়া যাবে কিনা। ভাল করে বলে দিয়ে আসবে বাড়ীতে একেবারে কয়লা নেই। না হলে হাঁড়ি চড়বে না, বুঝলি।"

"হুঁ।"

"আর দুধওয়ালাটা এখনও এলো না কেন? ছোটলোক ব্যাটারা আসকারা পেয়ে পেয়ে মাথায় উঠেছে। যা দৌড়ে যা দেরী করিস্‌নি। একবার চেয়ারগুলো আর খাটটা বাইরে রোদ্দুরে দিতে হবে।

রাত্তে ঘুমুতে পারা যায় না। তাহলে পঁয়তাল্লিশ আর কুড়ি পঁয়ষট্টি প্লাস আঠারো। তোমার গিয়ে হল এইট্টি-থ্রি। তিরাশি টাকার বই, এ্যা—।"

"হ্যাঁ—।"

"লেখা পড়া ছেড়ে দে। তোর মাকে বলগে যা আমি আর পড়াতে পারবো না। এর মধ্যে কখানা বই চেয়ে চিন্তে যোগাড় করতে পারবি নে।"

"পারবো কতকগুলো।"

"ছাখ কতকগুলো পারিস্। স্কুল থেকে একটা বুকলিষ্ট নিয়ে আসবি। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বইয়ের দোকানে একবার দেখবো। তোরা বসে আছিস্ কেনরে বই খুলে ?"

কর্ত্তা বোধ হয় এইবার বাহিরে আসেন—মানে একেবারে রান্নাঘরে রন্ধনরতা স্ত্রীর কাছে।

"তিরেশি টাকার বই লাগবে ছেলের।"

"লাগবে, দেবে।"

"বলে তো দিলে। কোথা থেকে দেবো সেটা একবার ভেবে দেখেছো।" আর কাউকেই দেখছি লেখাপড়া করতে হবে না। সকলকে ঐ চাষ কর্‌তে হবে হ্যাট্ হ্যাট্ করে। যা করে গেলুম আমরা। তুমি ঐ অত তরকারি কুটেছো। তরকারীর দরটা কত জানো। আলুর যেমন, কপির তেমন, বেগুনের তেমন। শালাদের দু'পয়সা কম দিলে দু'কথা শুনিয়ে দেয়। তরকারী কম করে কুটবে। নইলে—।"

"রান্নাঘরে কানের কাছে চব্বিশ ঘণ্টা টক্-থাই টক্-থাই কোরো না। যাও বাইরে যাও। বলি অন্য কোন কাজ কর্ম্ম কি নেই ?" স্ত্রী অর্থাৎ বাদলার মায়ের খেদোক্তি শোনা যায়।

কর্ত্তা বাহিরে আসেন। ছেলেরা তারস্বরে চীৎকার করিয়া পড়ে, না গোলমাল করে ঠিক বোঝা যায় না। কিছুক্ষণের পর নিঃস্তব্ধতা ভাঙ্গে। কর্ত্তার কণ্ঠস্বর পাওয়া যায় আবার।

"কি বল্লে কয়লাওলা। পাওয়া যাবে কি না ?"

"বল্লে তো পাওয়া যাবে। তবে দেরী হবে।"

"তার মানে বিকালে ? যাই হোক বিকেলে আর একবার গিয়ে তাগাদা করে আসবি। খালি ঘুষ নেবার মতলব ব্যাটাদের। আয় দিকিন, চেয়ারগুলো আর খাটটা রোদ্দুরে বার করে দি। সমস্ত দিন রোদ্দুরে থাকুক। পারিস্তো বেশ করে গরম জল দিয়ে ধুয়ে দিবি। আয় তাড়াতাড়ি আয়। আপিস যেতে হবে আবার। আজ আর লেট হলে চলবে না। তাহলে তাড়িয়ে দেবে। বাদলা খাটটা একবার ধরবি আয়তো।"

খাট স্থানান্তরিত হইল—চেয়ারগুলিও। বাদলার মা রান্নাঘরের কাজ ফেলিয়া একবার বাধা দিতে গিয়াছিলেন। ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

"রাত্তিরে ঘুমিয়ে বাঁচবে। তোমাদের দেখছি ভাল করতে নেই। চণ্ডে, আজ সমস্ত দিনটা এগুলো রোদ্দুরে থাক্‌বে। বালিশের ওয়ার, চাদর মশারি গরম জলে সাদা করে কেচে রাখবি। গঙ্গা, তেলের বাটি দিয়ে যা। হ্যাঁগা, তাহলে আজ বাজার করতে হবে না তো।"

বাদলার মা তিক্তকণ্ঠে জবাব দেয় "না, হবে না।"

"বিকেলের দিকে কয়লার ওখানে গিয়ে ফিরবার পথে চণ্ডেই না হয় একবার বাজারটা ঘুরে আসবে। তরকারী মশলা কম করে খরচ করো। দুদিন পরে আর পাবে না। ছেলের বই কিনতেই চক্ষু চড়কগাছ।

"ও কিরে কাপড়টা এতখানি ছিঁড়েছিস্।"

"ধোপা ছিঁড়ে দিয়েছে আমি কি করবো।"

"আমি কি করবো। কেন ধোপাকে বলতে পার নি। আমার কি? থাকতে হবে বিনা কাপড়ে। ওর নাম কি কনট্রোলে দাঁড়িয়েও কাপড় পাওয়া যায় না আজকাল। সাবিত্রী ওখান থেকে তোর জুতো তুলে ঘরে রাখ। যেখানে-সেখানে জুতো রাখিস্ কেন। মার খাবার ইচ্ছে হয়েছে? ফের যদি কোন দিন দেখি দূর করে ফেলে দোব—ঐ জুতো।"

"তুমি যে এখনও নাইতে গেলে না।"

"এই যে যাচ্ছি। চণ্ডে জলটল ঠিক করে রাখ। নাওয়া মাথায় উঠে গেছে। ছেলের বইই কিনতে হবে তিরাশি টাকার।"

"তুমি যে বলেছিলে বাবা ফ্রকের কাপড় আনবে। গদার ফ্রক যে আর নেই। সব ছিঁড়ে গেছে।"

"এ মাসে কিছু না, কিছু না। সেই আসচে মাসে। এখানে অনেক খরচ। বাড়ী ভাড়া, ইনসিওরেন্স, বই কেনা। খরচ দিনদিন বেড়েই চলেছে।"

"সরস্বতী পূজার চাঁদা দিতে হবে যে।"

"চাঁদা না আরও কিছু। মানুষ খেতে পাচ্ছে না, উনি চাঁদা দিচ্ছেন। কইগো ভাত বাড়ছো। শীগ্‌গির রেডি করো। আমার চান করতে দু'মিনিট .... কাপড় জামা পরতে চার মিনিট। হ্যাঁগো ধোপা করে আসবে কিছু বলে গেছে।"

"এই তো চারদিন হোল কাপড় নিয়ে গেছে।"

"বল কি। চারদিনেই জামা কাপড়ের এই অবস্থা।"

স্নানপর্ব্ব শেষে পূজাপর্ব্ব সুরু হয়। চীৎকার করিয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে বাধা পড়ে।

"বাবা, সাবিত্রী আবার রাস্তায় বেরিয়েছিলো।"

"রাস্তায় বেরিও না সাবিত্রী। কি রকম গাড়ীর ভিড় দেখছো তো। ঐ গাড়ীর তলায় পড়লে তোমায় আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। চণ্ডে—।"

"ভাত দিয়েছি।"

"এই যে যাচ্ছি। চণ্ডে, ছেলেপিলেদের দ্যাখ বাইরে না যায়। বাইরের ঘরের জানালাগুলো বন্ধ করে দে। যত রাজ্যের ধুলো। ওর থেকেই তো যত রকমের রোগ হয়। খুকী গরম জামা গায়ে দাও। দুদিন আগে জ্বরে ভুগেছো মনে নেই। এই মরেছে নটা বেজে সাত যে।"

"কী ডাল যে নিয়ে এসেছো এবার।"

"এখন আর কথা কইবার সময় নেই। কেন ডালটা ভাল নয় নাকি। ব্যাটা তাহলে রাত্তিরে ঠকিয়েছে। আচ্ছা মজা দেখাচ্ছি।"

"আনা দুয়েক পয়সা দিয়ে যাও।"

"কেন।"

"বাঃ, পান মোটে নেই।"

"এই ত পরশু একশো পান এনে দিয়েছি। পান খাওয়া কমিয়ে দাও। পয়সায় দু'টো পান হয়ে গেছে।"

"সবই যদি কমিয়ে দিতে হয়—তাহলে ত গেছি। তোমাদের জ্বালায় সখ, আহ্লাদ, বায়স্কোপ, থিয়েটার, খাওয়া, দাওয়া, ঘুম সব কমিয়েছি। এর পরেও যদি কমাতে হয় তাহলে আমার দ্বারা হবে না। এ পোড়া মহামারীরও কি শেষ নেই।"

"পান খাও, মানে খেতে তো বারণ করছি না, তবে একটু বুঝে সুঝে খরচ করো। এটা বুঝি আফিসের চাল।"

"হ্যাঁ।"

"তাই কাঁকরটাও খুব বেশী। শালা চোরাবাজারের জন্যে আর কিছু পাবার উপায় আছে! সব ব্যাটা হয়েছে জোচ্চোর।"

"ইস্কুল থেকে আসবার সময় বুকলিষ্ট নিয়ে আসতে ভুলিসনি বাদ্‌লা। রাস্তা-টাস্তা সাবধানে পেরোবি। চণ্ডে, আমি বেরিয়ে গেলে জল গরম করে খাটে চেয়ারে দিবি। সাবিত্রী চশমটা আমায় দিয়ে যা। শীত এখনও যায় নি ভাল করে তবু রোদ্দুরের তেজ দেখছো একবার। ছাতাটা নিয়ে যাবো নাকি? ছাতাটাও অমনি নিয়ে আসিস্। হ্যাঁগা, আফিসের র‍্যাশনটা করে মনে আছে? কাল বোধ হয়।"

"তোমার আফিসের র‍্যাশনের খবর আমার মনে নেই। নিজে মনে রাখতে পারো না।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে কালই—। আমি চল্লুম, বাইরের দরজা বন্ধ করে দাও। দুগ্‌গা, দুগ্‌গা।"

কর্তা আফিস যান বটে কিন্তু কর্ত্রী এবং ছেলে মেয়েদের কলরব মারামারি কান্না সমান তালে চলিতে থাকে। একদিনের জন্যও ইহার ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। কিসের জন্য কাহার জন্য এবং কেন এই কোলাহল তাহা কাহারও জানা নাই। এ কোলাহল অনাবশ্যক না অবাঞ্ছনীয় তাহা বলা কঠিন। এ কোলাহল কাহারো চেষ্টায় থামিবে না। এ কলরব দুঃখের নয়, শোকের নয়, আনন্দের নয়, প্রয়োজনের জন্য নয়। এ কোলাহল বাসর জাগাইয়া রাখিবার কয়েকটা মামুলি পদ্ধতির মত। এমনি করিয়াই ইহাদের দিন কাটে। তারপর সন্ধ্যার কিছু পরেই গৃহকর্ত্তার গৃহে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা সাড়া পড়িয়া যায়। গিন্নীই প্রথমে আগাইয়া আসেন।

"এই যে বল্লে বাজার করবে না, তা এসব কি!"

"সুবিধে দরে পেয়ে গেলুম, কিনে আনলুম।"

"এরপরে কোনদিন বাজে খরচের কথা বোলো।"

"ফ্রকের ছিট এনেছ বাবা?"

"চণ্ডে বাজার গিয়েছে নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"কয়লাওলা ব্যাটা কিছু বলেছে?"

"জানি না। চণ্ডে আসুক।"

"দুধওলা এসেছিল?"

"এসেছিল। দুধ যা দিচ্ছে তা মুখে দেওয়া যায় না। যাচ্ছেতাই, যাচ্ছেতাই।"

"বেশ করে কটা কথা শুনিয়ে দিলে না কেন? একটু চা করো দিকিন্। সারা বইয়ের দোকান ঘুরে বই পাওয়া যায় না। একটা দোকানে বলে এলুম ম্যাট্রিকের বই-টই যদি কিছু থাকে দেখবার জন্য। বাদলা কোথায়?"

"গোপালদের বাড়ীতে গেল যে খানিক আগে। না, এইতো নাম করতে করতেই এস পড়েছে। বলি সন্ধ্যে বেলায় আর আড্ডা কেন?"

"আড্ডা কোথায়। গোপালের কাছে গেছলুম তো।"

"বুকলিষ্ট দিয়েছে স্কুল থেকে?"

"বুকলিষ্ট যে বেশী আসেনি।"

"বেশী আসেনি, তার মানে? নিয়ম হচ্ছে প্রত্যেক ছেলে পাবে একখানা করে। আর তুই বলে দিলি কি না বুকলিষ্ট আসেনি। গোপাল পেয়েছে?"

"হ্যাঁ। কার কাছে থেকে নিয়ে এসেছে।"

"আর তুমি হাঁদারাম পেলে না?"

"আমি কি করবো, স্যার যে বলে দিলো এবার আর বইটই কিনতে হবে না। যে বই আমার আছে এতেই চলবে।"

"কোন্ স্যার—গুপী ?"

"হ্যাঁ।"

"বলিস্ কি বই একবারে কিনতেই হবে না। গুপী তাহলে জানে না।"

"হ্যাঁ জানে।"

"ছাই জানে, চল্ ত একবার গুপীর বাড়ী আমার সঙ্গে এখনই। বই কিনতে হবে না এ কি একটা কথা ? ফেল্ করলে শুনছি বই কিনতে হয় না। ম্যাট্রিক ক্লাসে থার্ড ক্লাসে। বই কখনও চলে ? যত সব। বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দাও তো। আমরা একবার বাইরে যাচ্ছি। আধ ঘণ্টার ভেতরেই ফিরবো।"

মহারাজ প্রাণনারায়ণের সভাকবি শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ

অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন এম-এ

কোচবিহার রাজপরিবার চিরদিনই বিদ্যানুরাগ ও বিদ্যোৎসাহিতার জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিয়াছেন। রাজা বিশ্বসিংহের সময় হইতে প্রায় প্রত্যেক নৃপতির রাজত্বকালেই খ্যাতনামা কবি ও পণ্ডিতমণ্ডলী রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন। মহামান্য নৃপতিদিগের মধ্যেও অনেকেই বিদ্যাচর্চ্চা সঙ্গীতানুরাগ ও কাব্য রচনার জন্য যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। মহারাজা নরনারায়ণ নিজে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার আদেশে তদীয় সভাপণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ সুবিখ্যাত "প্রয়োগরত্নমালা" ব্যাকরণ রচনা করেন। মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বকালে মাধবদেব, গোবিন্দ মিশ্র প্রভৃতি বুধমণ্ডলী সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া রাজসভার গৌরব বর্দ্ধন করেন। মহারাজা প্রাণনারায়ণের পিতা বীরনারায়ণের বিদ্যোৎসাহিতা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। প্রাণনারায়ণ নিজে সুপণ্ডিত ও কাব্যকলার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি সঙ্গীত বিদ্যা সম্বন্ধে উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার ন্যায় তাঁহার রাজসভাও নানা শাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা অলঙ্কৃত থাকিত। শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ এই সভারই একটী অত্যুজ্জল রত্ন। তিনি তাঁহার রচিত গ্রন্থাদিতে ভণিতায় সর্ব্বদা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত মহারাজ প্রাণনারায়ণের গুণাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

প্রাণ দেব নৃপবরে ভূমিপাল পুরন্দরে
বিদগধ পুরুষ কেশরি।
তার আজ্ঞা পরমাণে শ্রীনাথ ব্রাহ্মণে ভণে
সভাসদ বোলা হরি হরি॥

আবার,

কৃষ্ণ পদ পরায়ণ জয় প্রাণনারায়ণ
ভূমিপাল কুল শিরোমণি।

কবিতা কামিনী কান্ত বৈরীপ্রাণের কৃতান্ত
মহোত্তম প্রতাপ তপনি ॥
যস্ত কীর্ত্তি বন্নপমা সকল দিগন্ত সিমা
ধবনী চকাব মহোজ্জ্বলা।
পুণ্ডবীক ধনসাব করকা কুমুদ হার
শবচ্চন্দ্র চন্দ্রিকা ধবলা ॥

শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের বিস্তৃত পবিচয় কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। স্ববচিত দ্রোণপর্ব্ব পুঁথির প্রাবম্ভে কবি সংক্ষেপে তাঁহার পিতা ও পিতামহের এইরূপ পবিচয় দিয়াছেন :—

মল্ল মহীপালেব কনিষ্ঠ সহোদব।
শুক্লধ্বজ নামে দেব ভোগে পুবন্দর ॥
তাহাব পাঠক মহামাত্য ভবানন্দ।
কামরূপ দ্বিজকুল কুমুদিনী চন্দ্র ॥
নামত পণ্ডিত বাজ তাহাব তনয়।
বঘুদেব নৃপতিব পাত্র মহাশয় ॥
তাহার কনিষ্ঠ বামেশ্বব সুদ্ধমতি।
শ্রীনাথ হৈলেন জ্যেষ্ঠ তাহার সন্ততি ॥

অতএব শ্রীনাথ যুববাজ শুক্লধ্বজেব পাঠক ও অমাত্য ভবানন্দের পৌত্র এবং বঘুদেবেব পাত্র শুদ্ধ চবিত্র বামেশ্ববেব পুত্র ছিলেন। রামেশ্বর সম্ভবতঃ প্রথম বয়সে শুক্লধ্বজপুত্র বঘুদেবেব অমাত্য ছিলেন। বঘুদেব যখন তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র মহাবাজ লক্ষ্মীনাবায়ণেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কবেন তখন রামেশ্বব কাহাব পক্ষ অবলম্বন কবিয়াছিলেন তাহা সঠিক জানা যায় নাই। খাঁ চৌধুবী আমানতউল্লা আহম্মদ সাহেবের "কোচবিহারের ইতিহাসে" লিখিত আছে যে রামেশ্বর মহাবাজ প্রাণনারায়ণের নির্দ্দেশে মহাভারতেব পদ রচনা করিয়াছিলেন। প্রাণনাবায়ণ মহারাজ লক্ষ্মীনাবায়ণের পৌত্র এবং বীবনারায়ণেব পুত্র। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে বঘুদেব যখন মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের আনুগত্য অস্বীকাব করিয়া আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন, তখন রাজভক্ত বামেশ্বব তাঁহার নীতি সমর্থন করিতে পাবেন নাই; এবং তাঁহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া কোচবিহারাধিপতি লক্ষ্মীনাবায়ণের আশ্রয়েই বাস কবিতে থাকেন।

শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ ভণিতায় কখনও কখনও নিজ নামের সহিত চক্রবর্ত্তী উপাধি যোগ করিয়াছেন। আবার পূর্ব্বোক্ত "কোচবিহাবেব ইতিহাস" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে মহারাজ প্রাণনারায়ণেব রাজত্বকালে দ্বিজ রামেশ্বর মহাভারতের পদ রচনা কবেন এবং তাঁহার পুত্র কৃষ্ণ মিশ্র প্রহ্লাদ চরিত রচনা কবেন। এই দ্বিজ রামেশ্বর এবং শ্রীনাথেব পিতা বামেশ্বব সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি; কারণ একই বাজার সভায় বামেশ্বর নামে দুইজন সভাপণ্ডিত বর্ত্তমান ছিলেন এইরূপ অনুমানের পক্ষে কোনও উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব মনে হয় শ্রীনাথ ও কৃষ্ণ মিশ্র উভয়েই বামেশ্বরেব সন্তান এবং 'মিশ্র' তাঁহাদেব বংশের অন্যতম উপাধি। মহাবাজ নবনাবায়ণ মিথিলা গৌড় প্রভৃতি স্থান হইতে পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ আনাইয়া নিজ বাজ্যে প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছিলেন একথা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। মিশ্র উপাধিধারী এই পবিবারও ঐ সময়ে মিথিলা হইতে কোচবিহারে আসিয়া বসবাস করিতেছিলেন বলিয়া মনে হয়। আর "বিশ্বসিংহ চবিতম্" গ্রন্থে শ্রীনাথ "ভূদেব রামেশ্বরেব পুত্র" এইরূপ পিতৃ পরিচয় দেওয়ায় বুঝিতে পাবা যায় যে তাঁহাব পিতৃপিতামহগণ কোচবিহার বাজার অধীনে জায়গীব ভোগ করিতেন।

আজ পর্য্যন্ত শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের রচিত তিনখানি পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে তিনি সংস্কৃত ভাষায় "বিশ্বসিংহ চবিতম্" নামে একখানি

কাব্য প্রণয়ণ করেন। ঐ পুঁথি সম্পূর্ণ আকারে এখন পাওয়া যায় না। মাঝখানের কয়েকখানি পাতার কথা "কোচবিহারের ইতিহাসে" উল্লিখিত আছে। ঐ কয়েকখানি পাতা হইতে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোনও ধারণা করা যায় না। যে অংশ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্বকালের কোনও কোনও ঘটনার বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহাতে মনে হয় "বিশ্বসিংহ চরিতম্" নাম হইলেও এই কাব্যে কবি মহারাজ বিশ্বসিংহ ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজাগণের আখ্যায়িকা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই কাব্য কাহার সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তবে "নবীন কবি শ্রীনাথ বিরচিত" এই রূপ ভণিতা হইতে ইহা যে তাঁহার প্রথম বয়সের রচনা তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

"বিশ্বসিংহ চরিতম্" ছাড়া শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের বাংলা ভাষায় রচিত মহাভারত আদিপর্ব্ব ও দ্রোণপর্ব্বের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। কোচবিহার সাহিত্যসভার গ্রন্থাগারে আদিপর্ব্বের একখানি পুঁথি এবং রাজকীয় গ্রন্থাগারে উক্ত উভয় পর্ব্বেরই এক একখানি পুঁথি রক্ষিত আছে। শ্রীনাথের রচিত "দ্রৌপদীর স্বয়ংবর" নামক যে পুঁথির কথা খাঁ চৌধুরী রচিত কোচবিহারের ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে উহা কোনও স্বতন্ত্র পুস্তক নহে। উহা আদিপর্ব্বেরই অংশবিশেষ। তবে এই অংশের রচনাকৌশল এমনই মনোহর যে উহাকে একখানি স্বতন্ত্র কাব্য হিসাবে সহজেই গ্রহণ করা যায়।

শ্রীনাথের "আদিপর্ব্ব" ও "দ্রোণপর্ব্ব" মহারাজ প্রাণনারায়ণের রাজত্বকালে রচিত। উভয় গ্রন্থেই প্রতিটী ভণিতার মহারাজ প্রাণনারায়ণের প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম গুণগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ভণিতাগুলি মহারাজের চরিত্র ও গুণগ্রাম সম্বন্ধে অনেক উপাদেয় ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান দেয়। দ্রোণপর্ব্ব পুঁথির প্রারম্ভে কবি মহারাজের স্তুতিবাদ ছলে লিখিয়াছেন :—

জয় জয় মহারাজ প্রাণনারায়ণ।
জঙ্গম জলিস জাক বলে সর্ব্বজন॥
দানে বলি কর্ণরূপে মেদিনীমদন।
বলে বৈরিবারণ দারুণ পঞ্চানন॥
কবিতাগুণত অভিনব কালিদাস।
বিক্রমে বিক্রমাদিত্য বিপুল সাহস॥
জার ভুজ প্রতাপে উচ্ছন্ন বৈরীপুর।
ঘরের চালত গাজাইল তৃণাঙ্কুর॥
পুণ্যকীর্ত্তি ব্যাপিল জগত সমুদায়।
শঙ্খ-মুক্তা-মৃণাল-কুমুদ-কুন্দ-প্রায়॥
জার তলাপকর দানত পায়া ধন।
দরিদ্রের স্ত্রীর হৈল সোনার কঙ্কন॥

মহারাজ প্রাণনারায়ণ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোচবিহারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৬৩২ হইতে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজত্বকাল। এই সময়টী উদীয়মান বাংলা সাহিত্যের এক গৌরবময় যুগ। ইহার শতাব্দীকাল পূর্ব্বে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে সমগ্র দেশময় এক অভূতপূর্ব্ব প্রেমধর্ম্মের প্লাবন বহিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণানুরাগের মোহনমন্ত্রে বাংলার সর্বশ্রেণীর নরনারী নূতন জীবন লাভ করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পকলায় সমাজজীবনের দিকে দিকে নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বঙ্গভারতী যেন এই প্রথম আপনার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য ও রত্নরাজির সন্ধান পাইয়া ভাবে, ভাষায়, চিত্রে, সঙ্গীতে তাহা পাত্র

ভরিয়া বিলাইয়া দিতে বসিয়াছেন। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কবি ও পণ্ডিতমণ্ডলী রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির অনুবাদে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন. কেহ বা মহাপ্রভুর জীবন বা পুরাণ প্রভৃতির আখ্যায়িকা অবলম্বনে মৌলিক কাব্য রচনা করিয়া স্বদেশী সাহিত্যের পুষ্টিবর্দ্ধন করিতেছেন। হিন্দুমুসলমাননির্ব্বিশেষে দেশের শাসকসম্প্রদায়ও নানা প্রকারে এই কাব্যে সহায়তা ও উৎসাহবর্দ্ধন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এই সময়ে স্বাধীন বাংলার গৌরবস্থল কোচবিহার রাজ্যও কাহারও অপেক্ষা পশ্চাৎপদ ছিল না। কবি শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের অভ্যুদয়ের প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই এখানে দেশীয় ভাষায় কাব্য রচনা ও বিদ্যাচর্চ্চার সূত্রপাত হইয়াছিল। ষোড়শ হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তিন শত বৎসরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কোচবিহারের অবদান কিছু নগণ্য নহে। দুঃখের বিষয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লেখকগণের দৃষ্টি এদিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় নাই।

শ্রীনাথের আদিপর্ব্ব ও দ্রোণপর্ব্ব সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ নহে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারতের মত ইহা স্বাধীন রচনা। শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ কাশীরাম দাসের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন বলা যায়। কিন্তু তুলনায় কাশীরাম দাসের ভাষা অনেক মার্জ্জিত ও সুললিত। শ্রীনাথ সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। এ জন্য তাঁহার বাংলা রচনা সংস্কৃতের প্রভাব মুক্ত হইতে পারে নাই। তাহা ছাড়া কোচবিহার ও আসাম অঞ্চলের দেশজ শব্দ ও প্রত্যয়াদির প্রয়োগে ইহা মাঝে মাঝে প্রাদেশিকতা দোষেও দুষ্ট হইয়াছে। প্রমাণ-স্বরূপ আমরা দুইটী মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাতে দেশজ শব্দের পাশাপাশি খাস সংস্কৃত 'নিগদতি' পদের প্রয়োগ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

> পাণ্ডব সবাক সবে পুছে নানা কথা।
> কথা হন্তে আইলা তোরা সব জাও কথা॥
> ব্রাহ্মণ বর্গক যুধিষ্টির নিগদতি।
> একচক্রপুর হন্তে আসিছি সম্প্রতি॥

ভাষাগত দোষত্রুটীর কথা ছাড়িয়া দিলে কাব্য-সম্পদে শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের রচনা কাহারও অপেক্ষা হীন বলা চলে না। ভাবের ঐশ্বর্য্যে, কল্পনার মাধুর্য্যে, শব্দবিন্যাসের চাতুর্য্যে তাঁহার রচনার অনেক অংশই তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবিদিগের রচনার সহিত তুলনীয় হইতে পারে। স্বয়ংবর সভায় আনীত দ্রৌপদীর রূপ ও বেশ বর্ণনায় কাশীরাম দাস লিখিয়াছেন :—

> পূর্ণ সুধাকর হইতে প্রবর
> বিরচ কমল মুখ।
> গজমতি ভূষা তিলফুল নাসা
> দেখি মুনি মনসুখ॥
> নেত্র যুগ্ম মীন দেখিয়া হরিণ,
> লাজে দোঁহে গেল বন।
> সুচারু ভ্রূলতা দেখি পায় ব্যথা,
> মদনের শরাসন॥
> * * * *
> তড়িত মণ্ডল কর্ণেতে কুণ্ডল,
> হিমাংশু মণ্ডল আছে।
> দেখি কুচকুম্ভ লজ্জায় দাড়িম্ব,
> হৃদয় ফাটিয়া পড়ে॥

শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের রচনা হইতে দ্রৌপদীর বেশ বর্ণনা ইহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। দ্রৌপদীর

সখীগণ তাহার বেশ বিন্যাস করিয়া দিলেন। কবির ভাষায়ঃ—

লোচন যুগলে চারু পিন্ধাইল অঞ্জন।
কমল দলত জেন পরিছে খঞ্জন॥
অঞ্জনের রেখা দিল ভ্রূযুগে লেপন।
কামদেব ধনুত চরাইলা যেন গুণ॥
রবি শশী জলে জেন কর্ণত কুণ্ডল।
লাবণ্য লতার জেন দুই গোটা ফল॥
নাসার উপরে শোভে মুকুতার গল।
তিলপুষ্প পড়িয়াছে যেন হেম জল॥
কুচের উপরে শোভে মুকুতার হার।
সুমেরু শিখরে জেন গঙ্গাজল ধার॥

আবার, লক্ষ্যভেদের প্রাক্কালের ব্রাহ্মণবেশী অর্জ্জনের বীরত্বব্যঞ্জক আকৃতির বর্ণনায় কাশীরামের মহভাবতে এই কয়েকটী পংক্তি প্রসিদ্ধ হইয়া আছে।

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিবর যুগবর জানু সুবলিত।

এই প্রসিদ্ধ বর্ণনার সহিত তুলনায় শ্রীনাথকৃত অর্জ্জুনের রূপবর্ণনা বিশেষ হীন বলিয়া মনে হয় না। আমরা শ্রীনাথের বর্ণনা হইতে দুইটী অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

কতো রাজাগণ আনন্দিত মন
অর্জ্জুনের রূপ দেখি।
বোলে বিপ্র য়েজে শরীরের তেজে
দেবরাজ হেন দেখি॥
দেখ কন্দ কটি সিংহ পরিপাটী
হস্তিসুণ্ড ভুজদণ্ড।
যেন মদমত্ত গজ ঐরাবত
চলিছে বিপ্র প্রচণ্ড॥

আবার,

রাজপুত্র দ্রৌপদির এহি যোগ্য বর।
দেখ ব্রাহ্মণের কেন শরীর সুন্দর॥
* *
সিংহবক্ষ বিশাল ইহার বৈর স্থল।
প্রফুল্ল কমল দল লোচন যুগল॥
সুঠাম কঠিন বাহু আজানুলম্বিত।
রম্য উরু যুগল কামিনীর মনম্বিত॥
শ্যামল সুন্দর তনু যেন নবঘন।
কুলবধূ রমণী উন্মাদ কারণ॥

অনুপ্রাসের বহুল প্রয়োগে এবং পয়ার ছন্দে ত্রিপদীর মাত্রা ও যতি প্রয়োগের ফলে কাশীরামের বর্ণনা পদলালিত্যে অনুপম হইয়াছে। কিন্তু শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ অর্জ্জুনের অসাধারণ বীরত্বব্যঞ্জক আকৃতির বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। প্রথম লক্ষ্যভেদে সমাগত বীর নৃপতিমণ্ডলীর চক্ষে অর্জ্জুনের বিক্রমশালী রূপের বর্ণনা করিয়া দ্রৌপদীর সখীগণের দৃষ্টিতে তাঁহার যেমন মদনমোহন রূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় তাহার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কবির এই সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। এই বর্ণনায় ভাষার মাধুর্য্য এবং ওজোগুণও কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

শ্রীনাথের যুদ্ধবর্ণনায়ও ভাব ভাষা ও ছন্দের অপূর্ব্ব সমন্বয় লক্ষিত হয়। দ্রোণপর্ব্বে অভিমন্যুবধের পর

অর্জ্জুন মৃত্যুপণ করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই সময়ে কৌরব সৈন্যেরাও প্রচণ্ড বিক্রমে তাহার দিকে ধাবমান হইল। কবি বর্ণনা করিতেছেন :—

নানাবিধ চিত্রধনু আকর্ষিয়া পুনু পুনু
অর্জ্জুনে ক ধাইল বীরগণ।
কোদণ্ডের কান্তিচয় প্রকাশিল সে সময়
অতিক্রম করিয়া গগন॥
শক্রপক্ষ ভয়ঙ্কর অর্জ্জুনের ধনুঃশর
গাণ্ডীব বিখ্যাত ত্রিভুবনে
দীপ্তি হৈল দিশচয় জেন হৈল উল্কাময়
অনুরাক্ষ ঢাকিল কিরণে॥

• • •

অর্জ্জুনের চমৎকার দেখিয়া ভূপের সার
গাণ্ডিবের বল বিসদৃশ।
কৌরবের অস্ত্রজাল নিবারিয়া ততকাল
বাণে ঢাকিলেক দশ দিশ।

পুঁথি দুইখানি বাংলার ছন্দে। রচিত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দেই লিখিত। তবে কখনও কোন নূতন কোনও ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়া রচনার একঘেয়ে ভাব দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন আদি সে দ্রৌপদী স্বয়ংবর উপাখ্যানে এক স্থলে একটা ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এই ছন্দে প্রতি চরণে এগার অক্ষর থাকে এবং ষষ্ঠ অক্ষরে যতি পড়ে। শ্রীনাথের রচনা হইতে উদাহরণ দেওয়া গেল :—

ভূপতি গণক চিত্ত চকর।
কৃষ্ণা মুখচন্দ্র হৈগেল ভোর॥
রূপ সুধাকর পিযে নয়ানে।
চন্দ্রের রশ্মি চকর গণে॥
যেভিতি চাহীল আর নয়ানে।
দগ্ধ হৈল সবে মদন বাণে॥

শ্রীনাথ রচিত মহাভারতের পদ্য কবির নিজের দৃষ্টিতে নিছক কাব্য নহে। ইহা তাঁহার কৃষ্ণপদে নিবেদিত পবিত্র ভক্তির অর্ঘ্য। তিনি সর্ব্বদা নারায়ণকে স্মরণ করিয়া রচনা আরম্ভ করিয়াছেন। ভণিতায় প্রায়ই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে কবির ঐকান্তিক ভক্তি ও প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

কৃষ্ণভক্ত মহাত্মা প্রাণনারায়কে "কৃষ্ণপদপরায়ণ" রূপে পরিচিত করিয়া কবি যেন অপরিসীম আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করিয়াছেন। নিজের কবিত্ব শক্তি সম্বন্ধে কবির মনে কোনও উচ্চ ধারণা নাই। তথাপি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণনা বলিয়া তাহার রচিত ভারতকথা সকলের আদরণীয় হইবে ইহাই কবি আশা করেন কবি বলিতেছেন—

যদ্যপি পয়ার মোর না হয় সুন্দর।
কৃষ্ণকথা বলি সবে করিবা আদর॥

কৃষ্ণভক্তির অনুপম রাগে রঞ্জিত হইয়া শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের রচনা সমধিক মনোজ্ঞ হইয়া রহিয়াছে।

উপনদী

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

(৭)

পথে সুলেখা অশোককে কহিল—না, সত্যিই দেখছি ডাক্তারী চিকিৎসাটা তুমি শিখেছো ভালো।

অশোক হাসিয়া বলিল—কিন্তু আপনার'পর এখনও তো এ বিদ্যের পরিচয় দিইনি। এরই মধ্যে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন!

—হ্যাঁ, প্রত্যক্ষ দেখলুম কিনা, তাই। তুমি যাওয়া মাত্র পেসেন্টের ভাব বদলে গেল। তার আগে নাকি ও মোটেই কথা বলতে পারছিল না। ওঁরা তো রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

অশোক কহিল—ও রোগ এমনি হয়।

সুলেখা জিজ্ঞাসা করিল—রোগটা কি?

—কি আবার, হিষ্টিরিয়া!

—হিষ্টিরিয়া? আমারও যেন তাই মনে হচ্ছিল—যদিও আমি ডাক্তার নই।

—বড্ড বেশি সেন্টিমেন্ট্যাল কিনা! ডাক্তার খরচ নিয়ে বাড়িতে আজ কথা হয়েছে অমনি ওর মনে আঘাত লেগেছে। ও রোগের নিয়মই এই।

—ও, তাই বুঝি তুমি ভিজিট্ ছেড়ে দিলে?

অশোক উত্তর দিল—হ্যাঁ। আর রোজ রোজ এক বাড়িতে ভিজিট্ নিতে চক্ষুলজ্জায় বড় বাধে। ওঁরা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন—একটা ভালো জিনিস রাঁধলে পর্য্যন্ত আমাকে তা পাঠিয়ে দেন। সেক্ষেত্রে ভিজিট নেওয়াটা নিতান্তই অভদ্রতা।

সুলেখা কহিল—এটা কিন্তু প্রফেশন। ব্যবসা-বুদ্ধির তোমার আমি তারিফ করতে পারিনে। আর আমার অসুখ হলে তোমাকে তো ডাকা চলবে না দেখছি।

—কেন? ডাক্তার হিসেবে আমি ভালোই। কেমন হাতযশ আজ তা তো স্বচক্ষেই দেখলেন!

—হ্যাঁ, কিন্তু ভিজিট্ তুমি তো নেবে না। আর আমি মনে করি ভিজিট্ না দিলে সে ডাক্তার ভালো ডাক্তারি করতে পারে না। আমিও তো তোমায় চা, ওমলেট খাইয়েছি, নিশ্চয়ই তুমি তার জন্যে কৃতজ্ঞ। আর সেই কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করতে চাইবে বিনা ভিজিটে চিকিৎসা করে।

সুলেখার কথাগুলি অত্যন্ত হাল্কা। অশোক অনুভব করিল—কিন্তু ইহার মাঝে কোথায় যেন ব্যঙ্গের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রহিয়াছে।

একথার আর প্রত্যুত্তর দেওয়া হইল না। তাহারা পথ অতিক্রম করিয়া গৃহদ্বারে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে।

সুলেখা কহিল—ভেতরে এসো। একটু চা খেয়ে যাবে না?

অশোক কহিল—না, অনেক রাত হয়ে গেছে। এতরাত্রে চা খেলে আবার ইনসম্‌নিয়ায় ভুগতে হবে। আচ্ছা, চলি তবে।

সুলেখা হাসিয়া সম্মতি জানাইল।

অশোক চলিয়া গেল।

সুলেখার কিন্তু আজ লাগিতেছে বেশ। হাল্কা পরিবেশ—লঘু হাসি পরিহাসের মাঝে অবসর বিনোদনের বেশ একটা ফিকে রঙ্‌ আছে মনকে যাহা রঙিন করিয়া তোলে। দুর্বোধ্য বইগুলি মস্তিষ্কের শিরাতন্ত্রীতে আঘাত করে অত্যন্ত বেশি। সমস্যা, জটিলতা, বুদ্ধি-দীপ্ততার কূট তর্কজাল মুহূর্তকে অযথা শুধু ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। এই ছুটি সন্ধ্যার পরিস্থিতিতে সুলেখার কেমন যেন নেশা ধরিয়াছে—ফিকে রঙের খানিকটা আমেজ লাগিয়াছে তাহার দেহ-মনে। আজ আর সে পড়াশুনা করিল না। Haxleyর End & Means এর থিওরী তাহার মাথার জট পাকাইয়া তুলিল না। পঁয়ত্রিশ বছরের তুলো-পেঁজা জীবনে আর একবার যেন সে রোমাঞ্চের রঙিন স্বপ্ন দেখিতেছে। সুলেখার নবযৌবন বুঝি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। বহুদিন বাদে আজ সে বৈষ্ণব কাব্য খুলিয়া বসিল। রাত্রির সায়াহ্ন মুহূর্ত আসিয়া তাহার চোখে স্নিগ্ধ ঘুমের কোমল পর্দা টানিয়া দিল।

(৮)

পরদিন নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেল; অশোক কিন্তু এখনও আসিয়া পৌঁছাইল না।

সুলেখার অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হইতেছে। নিজের হাতে আজ সে জেলি তৈয়ারী করিয়াছে। শহর হইতে ভালো রুটি আনাইয়াছে, কিন্তু সব পরিশ্রমকে অশোক আজ মাটি করিয়া দিল।

সুলেখা তাহার না আসার কারণ নির্ণয় করিতে লাগিল। সে কি কোন রূঢ় ব্যবহার করিয়াছে? অশোক কি কিছু আঘাত পাইয়াছে? না, এমন কোন দুর্ঘটনার কথা তাহার মনে পড়িতেছে না। কাল সে হাসিমুখে সুলেখার কাছ হইতে বিদায় লইয়াছে। তবে কি অশোক মৃদুলাদের বাড়ি বসিয়া আছে?

মৃদুলা তাহার ছাত্রী। অশোক তাহার ছোট ভাইয়ের বন্ধু। কথাটা মনে পড়িতেই সুলেখা কেমন শিহরিয়া উঠিল। এ কী কথা ভাবিতেছে সে! কিসের এ সন্দেহ তাহার?

কিন্তু তাহা না হইলে অশোক আসিতেছে না কেন? হয়ত তাহার অপর কোন কাজ থাকিতে পারে—ডাক্তার মানুষ কখন কোন রোগী আসিয়া হাজির হয়।

না। সুলেখার ধ্রুব বিশ্বাস এ সময় অশোকের অপর কোন কাজই থাকিতে পারেনা। থাকিলেও অশোক সে কাজের ক্ষতি করিয়াই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইত!

মৃদুলার অসুখ কি তবে আবার বাড়িয়াছে? হিষ্টিরিয়া, অমন মাঝে মাঝে বাড়ে। ও রোগে কোন ভয়ের কারণ নাই। অনর্থক ওই বালিকা মেয়েটির সহিত বসিয়া রহস্যালাপ করিবার এমন কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?

মৃদুলা কী বালিকা? চোখে কী তাহার এখনও প্রেমের স্বপ্ন জাগে নাই? মনে কী তাহার কোন

মদির রঙের আমেজ লাগে নাই? মুচুগা বয়সের মেয়েরা বাঙলা দেশে বিবাহিত জীবন যাপন করতেছে। সন্তানের জননী হইয়া ঘর-সংসার পাতাইছে।

কিন্তু এসব কী বাজে চিন্তা আজ সুলেখাকে পাইয়া বসিল। অশোক না আসিলেই বা তাহার ক্ষতি কি? তাহার জীবনের মাঝে অশোকের কোন চিহ্ন নাই। এতদিন যে অশোক ছিলনা। শুধু অশোক কেন? আজ দশবৎসর যাবৎ সে সমা ছাড়া। নিজেকে লইয়াই শুধু সে বাঁচিয়া আছে। শান্ত ক্লান্তি বোধ হইয়াছে প্রচুর, জীবনকে মনে হইয়াছে নিরর্থক, তবুও সে সঙ্গীহীন জীবন যাপন করিতে, নির্জনতার মাঝে বাঁচিয়া থাকিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে বহুদিন। আজ মাত্র কয়েকটি দিনেই কি অশোক তাহার জীবন-যাত্রার ধারাকে পাল্‌টাইয়া দিবে?

সুলেখা আর ওকথা ভাবিবে না। চিত্তকে সুদৃঢ় করিয়া লইল সে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে অশোক আসিয়া উপস্থিত।

—লেখাদি, কিছু যদি মনে না করেন, আমি কিন্তু আর বসতে পারছিনে দাঁড়িয়ে থাকা যে দুঃখের কথা।

—বেশতো, শুয়ে পড় বিছানায়। সুলেখা দৃঢ়তা হারাইয়া ফেলিল।

—কিন্তু ওটাযে আপনার বিছানা, অপরিষ্কার হয়ে যাবে!

—সে আমি পালটে নেবো। তুমি এখন শুয়ে পড়।

অশোক সুলেখার শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলিল, কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি আমার ভালো লাগেনা। মুখফুটে বলতে ভদ্রতায় বাধে, অথচ—

—কি, ব্যাপার কী?

—এই রোজ রোজ খাওয়ানো, ডাকাডাকি করা। এ যেন বড্ড বেশি আত্মীয়তা প্রকাশ করা।

সুলেখা বুঝিল। হাসিয়া কহিল—এই ব্যাপার?

—আপনি কি বুঝলেন বলুন তো?

ওদের বাড়ির কথা বলছো তো? তা এত খেয়েছো যে আর বসতে পারছো না। আচ্ছা পেটুক ছেলে যা হোক!

—আপনি অনুমান করতে পারবেন না, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে পতিতও জবরদস্তি আইন প্রয়োগ করেন ওরা।

—অধিকার আছে, তাইতো করেন। সুলেখা আবার হাসিল। অশোক হঠাৎ সচকিত হইয়া উঠিল লেখাদির হাসি দেখিয়া।

লেখাদি কিছু যেন ইঙ্গিত করিতেছেন।

অশোক দৃঢ়তার সহিত কহিল—মোটেই না। আমরা ডাক্তার, ব্যবসার খাতিরে অবিশ্যি আমাদের একটু বেশি লৌকিকতা এবং আত্মীয়তা প্রকাশ করতে হয়, কিন্তু তার সুযোগ যদি কেউ গ্রহণ করতে চান সেটা অন্যায়।

- অন্যায় কি রকম? যে ডাক্তার ভিজিট নেয় না, তাকে যদি দু'খানা ক্ষীরের মালপো কিংবা দুচারদিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানোও না যায় তাহলে মনুষ্যত্ব পালন করা হয় না। সেটা ভীষণ অকৃতজ্ঞতা নয় কি?

অশোক এবার হাসিয়া ফেলিল—ওইতো, আপনি ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিলেন।

—তোমার পেসেন্টের খবর কি?

—She's all right now!

সুলেখা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আর অশোক নীরবে শুইয়া আছে।

বাহিরে দিগন্ত ছোঁয়া অন্ধকার। পল্লীর নিস্তব্ধ রাতে শুধু ঝিঁ ঝিঁ করিয়া ঝিঁঝি পোকা ডাকিয়া চলিয়াছে। আর ঘরের মাঝে টিক্ টিক্ করিয়া টাইম-পিস্‌টা একটানা গতিতে ধাবমান মুহূর্তের গতি নির্ণয় করিতেছে। কিছুক্ষণ ধরিয়া কেহই কোন কথা কহি না। কিন্তু এই নীরব মুহূর্তের মাঝে দুজনের অন্তরে কোন গোপনতম বাণী বুঝি গুমরিয়া মরিতেছে। হঠাৎ ইহারই মাঝে সুলেখা কহিল—অশোক, এইবার তুমি একটা বিয়ে করো।

অশোক বিস্ময়ান্বিত কণ্ঠে বলিল—হঠাৎ একথা কেন বলুন তো?

—মানুষের জীবনে বিয়ের একটা মস্তবড় প্রয়োজনীয় দিক্ আছে। মানুষ সামাজিক জীব। ঘর, সংসার, সমাজ, ধর্ম মানুষের জীবনকে যদি ঘিরে না থাকে তবে সে জীবন অসম্পূর্ণ।

অশোক হাসিয়া কহিল—আজকেই কি একথা আপনার মনে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি?

সুলেখা অশোকের এ ইঙ্গিতের তাৎপর্য হয়ত উপলব্ধি করিল, কিন্তু কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া কহিল—হ্যাঁ, আজকেই আমার মনে হচ্ছে বেশি। আর আমি আমার নিজের জীবনের শূন্যতাকে উপলব্ধি করেই ঐ উপদেশ তোমায় দিচ্ছি। আমরা যতই সংস্কার মুক্ত হতে চেষ্টা করি না কেন, আমাদের আদিম প্রকৃতির মাঝে সামাজিক সংস্কার এমনিভাবে বদ্ধমূল হয়ে আছে যে তাকে এড়িয়ে চলা এক কথায় দুঃসাধ্য।

—কিন্তু এই সংস্কার, এই প্রাচীন মতবাদ, এ থেকে আজকের মানুষকে মুক্তি পেতেই হবে। ঘর, সংসার, সমাজ, ধর্ম—জীবনকে শতবিধ গণ্ডির মাঝে এমনি করে বেঁধে রেখে আমরা ক্রমশই জড়বাদী হয়ে উঠছি। আজকের পৃথিবীকে সংস্কারমুক্ত না করতে পারলে ভবিষ্যতের নবসম্ভাবনাকে কেমন করে আমরা রূপ দেবো বলুন তো?

—কিন্তু মানুষ যে সামাজিক জীব। সে চায় নিজেকে বহুর মধ্যে মিশিয়ে দিতে।

—আমারও ঠিক তাই মত সেখানে, শুধু একটু তার মধ্যে বিশেষত্ব আছে। আমি বহুর একজন হয়ে মিশিয়ে যেতে চাই না পৃথিবীর জনসমুদ্রে। 'শেষের কবিতা'র অমিত রায়ের মতন আমি চাই পাঁচজনের একজন না হয়ে একেবারে পঞ্চমরূপে মাথা তুলে দাঁড়াতে।

আমি প্রথমে আমার নিজের সত্তাকে, শক্তিকে, প্রতিষ্ঠাকে উপলব্ধি করতে চাই। সমাজের ভার হয়ে তার কাছে ঋণ করে তো বাঁচে সবাই—আমি চাই ঋণ দান করতে, উত্তমর্ণ হতে। অধমর্ণ হব না আমি সমাজের কাছে। আমার নিজের সত্তা, শক্তি, প্রতিষ্ঠা দিয়ে যখন সমাজের সেবা করবার যোগ্য হয়ে উঠবো—

অশোকের কথার মাঝখানেই সুলেখা বাধা দিল—এ তো বক্তৃতার কথা। সভাসমিতিতে এমন কথার কিছু মূল্য আছে অবিশ্যি। কিন্তু বাস্তবজীবনে যেখানে মানুষের দুর্বল হৃদয়বৃত্তি আছে সেখানে এই লজিক দিয়ে কি আত্ম-সান্ত্বনা লাভ করা যায়?

অশোক দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—নিশ্চয়ই! মানুষের শিক্ষা দীক্ষা তো এই জন্যেই। সাধারণের সঙ্গে এইখানেই

তো স্বাতন্ত্র্যের বৈষম্য। কিন্তু তর্ক থাক লেখাদি, এইবার চলি। ঘড়ির কাঁটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আপনি আবার ডিস্পেপটিক। সময়ে খাওয়া এবং ঘুমানো আপনার একান্ত প্রয়োজন। অশোক উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার কথায় সুলেখা মৃদু হাসিল—তার চেয়ে বলো না কেন তর্কে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়ছো।

—সেটা নিতান্ত মিথ্যে কথা নয়। উদরের ভারের সঙ্গে তর্কের ভারও এত ভারী হয়ে উঠেছে যে দুটোকে একসঙ্গে সামলানো দায়। আচ্ছা চল্লুম তবে আজ লেখাদি, নমস্কার।

অশোক চলিয়া গেলে সুলেখা ভাবিতে লাগিল—কেন, কেন তাহার এ দুর্বলতা ?

বুদ্ধির শাসন আজ আর তাহার হৃদয়দৌর্বল্যকে দাবাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। জীবনকে আজ তাহার মনে হইতেছে ভারী বোঝাস্বরূপ। সুলেখার এ হইল কী ?

তর্কক্লান্তিতে মাথাটিও তাহার ভারী হইয়া উঠিয়াছে—ক্লান্ত সুলেখা নীরবে শয্যায় আশ্রয় লইল। আর অশোক পথ চলিতে চলিতে সুনির্জনে যেন বেশি করিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। আজ সে নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে চায়, গ্রাম্য ইউনিয়ন বোর্ডের ডাক্তারের জীবনে বৃহত্তর কোন আদর্শ আছে কিনা !

(ক্রমশঃ)

সবার উপর মানুষ সত্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

এমন মানুষ দেখেছি যাহার স্বরূপ অপ্রকট,
ক্ষমতার চেয়ে বেশী ক্ষতিকর, সরম বিহীন শঠ।
শোভাযাত্রায় তাহারা মানায়, চড়ুইভাতিতে সাজে,
নির্ভর কভু করা যায়নাকো তাহাদিকে কোন কাজে।
বংশখণ্ড নহেকো তাহারা, নহেকো পীচের লাঠী,
তারা অশক্ত আমড়া দণ্ড সহজেই যায় ফাটি।
নহে কুম্ভীর শক্তি নাহিক ডুবায় যে নৌকা,
জল করে রাখে দুষিত, তাহারা ক্ষুধিত জলৌকা।
শোভে আশ্রয় ছত্রের মত, অতি নমনীয় ধাতু।
নহে অশ্বথ নহেক বাবলা তা'রা ঠিক পলছাতু।
তাহারা মিয়ানো চিম্‌সে কাগজ সাদাপাতে নীলরেখা,
কালি চুষে লয়, টেকেনা হরফ, চুপসিয়ে যায় লেখা।
ময়দাও নয় আটা নয় যেন সঙ্কী গমের কুচি,
কিছু না করুক কোন ক্রমেই ফুলিতে দেয়না লুচি।
ঠকিতেছি আর ঠকিব এবং ঠকিয়াছি বারবার,
তবু হাসিমুখে বসাই দুবেলা, জানাই নমস্কার।
সবার উপর মানুষ সত্য বলেছেন মহাকবি
অপটু এ হাতে আঁকিনু তাদের সত্য একটা ছবি।

আমরা বাঙালী

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

আমরা বাঙালী, একথা জানাই গর্ব্ব ও গৌরবে
বাংলার বুকে আজো বেঁচে আছি অতীতের সৌরভে।
অতীতের সেই বলী বাঙালীরা, আনন্দময় জাতি,
মনের স্বাস্থ্যে, দেহের স্বাস্থ্যে অতুলন্ দিবারাতি।
ঢেঁকি ঘুরাইযা, লাঠি উঁচাইয়া, তাড়াত ডাকাত-চোরে,
গোটা পাঁঠা খেয়ে করিত হজম, অজেয় মনের জোরে।
উন্নত-গ্রীবা, কপাট-বক্ষ, দেহ সুদীর্ঘ উঁচা,
বিশ্বকর্ম্মা ঘরে যেন আজ ঘোরাফেরা করে ছুঁচা।
মরিতে বসেছি আমরা বাঙালী, সবই গেছে আজ ভেসে,
সোনার বঙ্গে মরিচা ধরেছে,—ভাঙন্ ধরেছে দেশে।
ভাঙন্ ধরেছে বাঙালীর মনে, ভাঙন ধরেছে দেহে,
খাদ মিশে গেছে আন্তরিক সে শ্রদ্ধা-প্রণয়-স্নেহে।
যৌবন-ভরা যৌবনে আজ মৌ নাই এক কড়া,
তিক্ত রসেতে সিক্ত পরাণ, রিক্ততা আগাগোড়া।
বুকে নাই আশা, মুখে নাই ভাষা, নাই সে পূর্ব্ব খ্যাতি,
গৌরবময় বাঙালী এখন মুমূর্ষু এক জাতি।

আধি ও ব্যাধিতে ভুগে ভুগে তারা অকালে আনিছে জরা
জীবন্মৃত্যু সমান্ তাদের, সগোত্র বাঁচা-মরা।
অতীতের সেই প্রাণবান্ জাতি, জীবন্ত ছিল যারা,
কালের গর্ভে লয় পেয়ে গেছে, আজ আর নাই তারা।
তাজা ফুলদল ঝরেছে ধূলায়, মরে গেছে কোন্ কালে,
বাংলা জুড়িয়া ঘোরাফেরা করে বাঙালীর কঙ্কালে।
কেন এই রোগ, কেন এই ভোগ? উত্তর কেবা দেবে
স্বখাত সলিলে মরিতেছি ডুবে, কেহ কি দেখেছে ভেবে?
কার্য্যের ধারা চিন্তার ধারা সকলই গিয়াছে ঘুরে,
ভুল পথ ধরে ক্রমাগত মোরা কেবলি চলেছি দূরে।
তবু আজো মোরা বেঁচে আছি শুধু অতীতের পানে চাহি'
বেঁচে আছি আজো পূর্ব্ব-কীর্ত্তি-গঙ্গায় অবগাহি'!
কবে ভগীরথ আসিবে আবার মুক্তি-শঙ্খ লয়ে
নব-গঙ্গার উদ্দাম স্রোত কবে যাবে পুনঃ বয়ে?
সেই আশা-পথ চেয়ে আছি মোরা—দুর্ব্বল দেহে মনে,
ক্ষণে ক্ষণে দেখি সোনার স্বপন নিদ্রায় জাগরণে।

কোচবিহার অধিপতির জন্মদিনে

শ্রীসুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায় বি-এ

কোচবিহার রাজ্যের অধীশ্বর হিজ্ হাইনেস্ শ্রীশ্রীজগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। এই দিনটি রাজ্যের প্রজাবৃন্দের পক্ষে একটি পরম শুভদিন। প্রতিবৎসর এই দিনে অধিপতির কল্যাণে কোচবিহার সহরের ৺মদনমোহন বিগ্রহের নিকট পূজা দেওয়া হয় এবং দরিদ্রনারায়ণকে অন্ন ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়। রাজপ্রাসাদে জন্মদিনের দরবার অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী এবং ভূম্যধিকারীগণ ভূপবাহাদুরকে অভিবাদন দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করেন। রাত্রিতে কোচবিহারের প্রতিটি গৃহ আলোকমালায় শোভিত হয়।

কোচবিহারের অধিপতিগণ চন্দ্রবংশের শিরোমণি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বংশধর। ইঁহারা জাতিতে ক্ষত্রিয় রাজপুত, ভারতবর্ষের পূর্ব্বাংশে এইরূপ প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজপুত বংশ বিরল। সপ্তম শতাব্দী হইতে কোচবিহার রাজবংশের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই বংশের বিশ্বসিংহ কোচবিহার নামে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার যোগ্যপুত্র মহারাজ নরনারায়ণ প্রবলপরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন এবং তাঁহার সময়ে কোচবিহার রাজ্য প্রায় একলক্ষবর্গমাইল বিস্তৃত ছিল। আসাম, ভোটান, উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ কোচবিহার রাজ্যভুক্ত ছিল। বরোদা, জয়পুর, দেওয়াস্ (জুনিয়র) এবং ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের সহিত কোচবিহার রাজবংশ আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ। কোচবিহারের মহারাজার সম্মানজ্ঞাপনার্থ ১৩ বার তোপ দাগা হয় এবং ইহা বংশানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে।

কোচবিহারের বর্ত্তমান অধিপতির এক ভ্রাতা ও তিন ভগ্নী। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী রাণী ইলাদেবী কয়েক মাস পূর্ব্বে রাজপরিবারের সকলকে এবং প্রজাপুঞ্জকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। ত্রিপুরাধিপতির আত্মীয় কুমার রমেন্দ্রকিশোর দেব বর্ম্মণের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। মহারাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মেজর মহারাজকুমার ইন্দ্রজিতনারায়ণ পিঠাপুরমের অধীশ্বরের চতুর্থকন্যা মহারাজকুমারী কমলাদেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। মহারাজার দ্বিতীয়া ভগিনী মহারাজকুমারী গায়ত্রীদেবীর সহিত জয়পুরাধিপতি লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ কর্ণেল হিজ হাইনেস্ স্যার সোয়াই মানসিংহজী বাহাদুরের বিবাহ হইয়াছে। কনিষ্ঠা ভগিনী মহারাজকুমারী মেনকাদেবীর দেওয়াস (জুনিয়র) রাজ্যের অধিপতি হিজ্ হাইনেস ক্যাপ্টেন শ্রীমন্ত যশোবন্ত রাও আউ সাহেব পুয়ারের পত্নী। মহারাজসাহেব অবিবাহিত।

হ্যারো এবং কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি হলে মহারাজ শিক্ষালাভ করেন। তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন। কথাবার্ত্তায় তিনি বাংলাভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী এবং কোচবিহারের ৺মদনমোহন ঠাকুরবাড়ী, রাসমেলা এবং নানাবিধ পূজাঅর্চ্চনা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে।

মহারাজ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন এবং রাজপরিবারের বিবাহাদি বৈদিকরীতি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় কোচবিহারের "সাহিত্যসভা" বাংলাপুস্তকাদি এবং অনেক পাণ্ডুলিপিতে সমৃদ্ধ। পারিতোষিক বিতরণ উৎসবে বিদ্যালয় সমূহের কার্য্যাবলীর বিবরণ বাংলা ভাষায় লিখিত হয়।

১৯৩৬ সনের ৬ই এপ্রিল তারিখে মহারাজ স্বয়ং রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সুদক্ষ শাসনগুণে রাজ্যের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। মহারাজের নিজের হস্তে রাজ্যের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা অর্পিত আছে। তিনি শাসন পরিষদ, ব্যবস্থা পরিষদ এবং বিচার বিভাগের উপর প্রভূত ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। ব্যবস্থা পরিষদ প্রজাবৃন্দের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি এবং অধিপতির মনোনীত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। জনসাধারণের ভোটে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়। রাজ্যের জোতদারমণ্ডলী হইতে ২জন (একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান), আইন ব্যবসায়ীদের ১জন, পাচটি মহকুমা হইতে বেসরকারী ৫জন সভ্য নির্ব্বাচিত হয়। ১জন রাজগণ, বাণিজ্য বিভাগের ১জন এবং অতিরিক্ত সভ্য (৫জনের বেশী নহে) ভূপবাহাদুর স্বয়ং মনোনয়ন করেন। তিনি এই ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ইহার সহ সভাপতি এবং অপর তিনজন মন্ত্রী ইহার সভ্য। একজন মন্ত্রী নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের মধ্য হইতে অধিকসংখ্যক ভোটে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ইঁহার হস্তে হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের ভার অর্পণ করা হয়। ১৯৪২ সন হইতে এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে প্রজাদের হস্তে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং কোচবিহারাধিপতির এই নীতি বোধ হয় ভারতবর্ষের অন্য কোন দেশীয় রাজ্যে নাই।

মহারাজ সাহেব শাসন পরিষদের সভাপতি এবং প্রধান মন্ত্রী সহ সভাপতি। অপর তিনজন মন্ত্রী এই পরিষদের সদস্য। ব্যবস্থা পরিষদ হইতে নির্ব্বাচিত মন্ত্রী এই তিনজন সদস্যের একজন। বিচারবিভাগ শাসনবিভাগ হইতে পৃথক করা হইয়াছে এবং রাজ্যে একটি হাই কোর্ট স্থাপিত হইয়াছে।

মহারাজার শাসনকালে শিক্ষাবিভাগ বিশেষ ভাবে উন্নত হইয়াছে। ১৯৪৫ সন হইতে কোচবিহারের সর্ব্বত্র [illegible] বালিকাদের [illegible] শিক্ষা [illegible] করিয়াছে। ইহার ফলে শিক্ষা বিশেষ প্রসার লাভ করিবে। পল্লী অঞ্চলে বালিকাদের শিক্ষার নিমিত্ত ২৫টি বিদ্যালয় [illegible] ছাত্রীদের জন্য [illegible]টি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা আবশ্যিক করিবার জন্য একটি পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজে মেয়েদের সহ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য অনেক বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। কোচবিহার সহরের একটি লাইব্রেরী কোচবিহারের গৌরবের বস্তু, ইহা রাজধানীর ল্যান্সডাউন হলে অবস্থিত।

চিকিৎসা বিভাগ ও জনস্বাস্থ্য বিভাগে অনেক অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। এক্স রে, প্যাথোলজিকাল বিভাগ, প্রসব চিকিৎসাগার ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপিত হওয়ায় রাজ্যের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতেছে। গ্রামের স্বাস্থ্য উন্নয়ন কল্পে কূপ খনন করিবার জন্য মহারাজার দরবার বহু টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। মহকুমা এবং বড় বড় গ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয় সমূহে এম্-বি ডাক্তার নিযুক্ত হইতেছেন।

সমগ্র উত্তর বঙ্গে কোচবিহার সহরের জিতেন্দ্রনারায়ণ দাতব্যচিকিৎসালয়ের ন্যায় বিরাট প্রতিষ্ঠান আর নাই।

ইহা ব্যতীত এস্ পি সি এ, রেড্ ক্রস্ সোসাইটি, পশু চিকিৎসা বিভাগ, উন্নয়ন বিভাগ (ইহার অধীনে শিল্প তৈয়ারী, মৎস্য চাষ, কৃষি প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ) স্থাপন করিয়া ভূপবাহাদুর বিশেষ দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন।

মহারাজ একটি বিরাট সৈন্যবিভাগ স্থাপন করিয়াছেন। সহরের এই সৈন্যাবাস বহু আগন্তুকের প্রশংসাদৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোচবিহারবাসী অনেকে এই সৈন্যবিভাগে যোগদান করিয়া যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইবার সুবিধা পাইতেছেন। যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ অনেকে এই বিভাগে নিযুক্ত আছেন। মহারাজা সাহেব সৈন্যবিভাগের প্রধান কম্যাণ্ডেণ্ট্। তিনি স্বয়ং যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তিন বৎসরের মধ্যে তিনি লেপ্টেন্যাণ্ট্ পদ হইতে মেজর পদে উন্নীত হইয়াছেন—ইহা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। বিগত পৃথিবীব্যাপী মহাসমরে তিনি বর্ম্মা অঞ্চলে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন এবং একটি সৈন্যদলের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি কে, সি, আই, ই, খেতাব লাভ করিয়াছেন।

কোচবিহার বাংলাদেশের খেলাধূলায় চিরকালই অগ্রণী এবং বর্ত্তমান অধিপতি তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয় পিতামহ ও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। তিনি ফুটবল, টেনিস এবং ক্রিকেট খেলায় বিশেষ দক্ষ। রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতায় তিনি দুইবার বাংলার ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ছিলেন। কোচবিহার কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের নানা স্থান হইতে প্রসিদ্ধ ফুটবল দল কোচবিহারে খেলিতে আসেন।

সমগ্র বাংলাদেশের উপর দিয়া যে সময় দুর্ভিক্ষ করালছায়ার মত দেশের লক্ষ লক্ষ প্রাণ গ্রাস করিয়াছিল সে সময়ে কোচবিহার রাজ্যের অধিবাসীরা মহারাজার শাসনগুণে অন্নকষ্ট জানিতে পারে নাই। সুদূর পল্লী অঞ্চলেও অন্নের অভাবে কাহারও প্রাণবিয়োগ হয় নাই। মহারাজা রাজ্যের কল্যাণে নানা সদনুষ্ঠান করিয়াছেন; কিন্তু যদি তিনি আর কিছু নাও করিতেন তাহা হইলেও এই দুর্ভিক্ষের হাত হইতে যে প্রজাপুঞ্জের জীবন রক্ষা করিয়াছেন সেজন্য যুগ যুগ ধরিয়া তাঁহার যশোগাথা ধ্বনিত হইবে। প্রজার হৃদয়ে তিনি যে আসন লাভ করিয়াছেন সে আসন সমস্ত প্রজার আন্তরিক প্রীতি, কৃতজ্ঞতা এবং রাজভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এত বড় মহৎ কীর্ত্তির তুলনা নাই। ভবিষ্যতের ইতিহাসে তাঁহার স্থান চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে।

কোচবিহারের অধীশ্বর সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতে ভালবাসেন। অতি সাধারণ তাঁহার পরিচ্ছদ তবুও দশের মধ্যে তাঁহার দীর্ঘ ঋজুদেহ, শান্ত দীপ্ত মুখশ্রী এবং মহিমময় উন্নত মস্তক তাঁহার পরিচয় জানাইয়া দেয়। মহারাজের এই শুভ জন্মদিনে পরম কল্যাণময় ভগবানের নিকট প্রজাবৃন্দের সমবেত প্রার্থনা তিনি যেন অধীশ্বরকে দীর্ঘজীবন দান করেন, এবং অনন্ত যশের অধিকারী করেন।

ভক্ত রামপ্রসাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন বি-এ

তাবে দিলেন দিব্য দৃষ্টি মহাকালের মনমোহিনী
কণ্ঠে ঢেলে দিলেন সুধা সুরনরের সম্মোহিনী।
চাইল সে মা'র তবিলদারী নিমকহারাম নয় [illegible],
আর চাইল মা'র উদয় [illegible] ।
মানব জমিন রইল পতিত, সেই [illegible] অশ্রু ঝরে,
আবাদ করলে ফলত সোনা [illegible] ।

[illegible]ইল সে পূজিত মা'কে মুণ্ডমালী কালীরূপে,
[illegible] না ডুব যেতেন নিরাকারে চুপেচুপে।
[illegible] পুরাইতে সাকার হতেন নিরাকারা,
[illegible] নয়, ভক্তিমার্গের এমনি ধারা।
[illegible] মাণিক্য [illegible] আলোকিত হৃদি ঘরে,
[illegible] আনন্দিনী—শ্যামা মা'কে প্রাণ ভরে।

তার [illegible] বিরাজিত [illegible] বিশ্বপ্রাণ।
'মালসী' [illegible] বঙ্গকুঞ্জে তাহার বাণী।

গান

শ্রীমতী ঝংকৃতা দেবী বি-এ

ভুল করে ভুলিতে চেয়ে,
অশ্রু আসে (মোর) নয়ন ছেয়ে।
তারে ভুলিতে চাওয়া
শুধু বেদনা পাওয়া
তাই জাগিয়া থাকি নিশি
স্মৃতিটি নিয়ে।

আজ শুধু মনে পড়ে বিগত কথা,
প্রাণের মাঝারে কাঁদে বিরহ ব্যথা।
মোহ-মধুর-অতীত
যেন প্রদীপ তিমিত
জ্বলে মনের কোণে, মৃদু
আলোক দিয়ে।

তাহার গাওয়া গান গাহিতে গেলে,
মধুর সে সুর তার পরাণ ভোলে।
কভু পারি না ভুলিতে
রহে সে মোর স্মৃতিতে
তাই কাঁদন ঝরে চোখে
গাহিতে যেয়ে।

রাজপরিবারের সংবাদ

গত ১৩ই ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপবাহাদুরের জন্মতিথি উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। ইহার কিছুদিন পরই সংবাদ আসে যে মহারাজা ভূপবাহাদুর ব্রিটিশ সেনাদলের অনারারী "মেজর" পদে উন্নীত হইয়াছেন। রাজ্যবাসীর পক্ষে ইহা অতীব শুভ-সংবাদ। এবারেও মহারাজ "রণজি" প্রতিযোগিতায় বাংলাদলের ভাইস ক্যাপ্টেনরূপে যোগদান করেন এবং ইউ পির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংস্এ ৮২ রাণ করিতে সমর্থ হন। অতঃপর কলিকাতায় রবীন্দ্র মেমোরিয়াল খেলায় সার্ভিসেস্ দ্বাদশের নেতৃত্ব করেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসএ ৮টি উইকেটের মধ্যে তিনটিই গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। মহারাজ গত ৫ই জানুয়ারী মঙ্গলবার রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

মাতৃশ্রী শ্রীশ্রীমহারাণী সাহেবা মহারাজকুমার ও ঈশরাণী সাহেবা সহ কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন।

স্থানীয় সংবাদ

মাননীয় রেসিডেন্টের কুচবিহার পরিদর্শন—

গত ৩০শে নভেম্বর ইষ্টার্ণ ষ্টেটস্ এজেন্সীর মাননীয় রেসিডেণ্ট মিঃ এইচ, জে, টড্, আই, সি, এস্ কুচবিহার পরিদর্শনে আসেন এবং চারিদিন এখানে অবস্থান করিয়া ৩রা ডিসেম্বর কলিকাতা চলিয়া যান। রেসিডেণ্ট মহোদয় বিভিন্ন সরকারী আফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি পরিদর্শন করেন, ইহার মধ্যে একদিন দিনহাটায় যাইয়া সেখানকার আফিসাদিও দেখিয়া আসেন। জেঙ্কিন্স স্কুল পরিদর্শনকালে রেসিডেণ্ট বয় স্কাউটদের সমাবেশ দেখেন। নিজ আবাসে তিনি প্রত্যহই উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের সহিত দেখা করিয়া নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন। একদিন মহারাজা জিতেন্দ্র-নারায়ণ ক্লাবের সভ্যগণ তাঁহাকে চা-পার্টিতে অভ্যর্থিত করেন।

মিসেস্ টড্ স্থানীয় সরকারী উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয় সুনীতি একাডেমি পরিদর্শন করেন এবং গার্ল-গাইডদিগের ক্রীড়ানৈপুণ্যাদি দেখেন।

কুচবিহার রাজ্যে বাংলা দেশের নূতন পুলিশ রেগুলেশনের প্রবর্ত্তন—

সরকারী এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে রাজকার্য্যের সুবিধার জন্য কুচবিহার দরবার ১৯৪৩ সালের বঙ্গদেশীয় পুলিশ রেগুলেশন এই রাজ্যে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে যে পুরাতন পুলিশ রেগুলেশন কুচবিহারে প্রচলিত ছিল তাহা আর এই রাজ্যে বলবৎ থাকিবে না। রাজ্যে প্রগতিমূলক শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তন করিবার জন্য কুচবিহার দরবার বাংলা গভর্ণমেণ্টের নূতন পুলিশ রেগুলেশন গ্রহণ করিয়া দরবার ইহাতে বাংলা প্রদেশের পুলিশব্যবস্থার সহিত সমতা সাধন করিলেন।

ভারতীয় রোড্ কংগ্রেস ও বিজয়চাঁদ মেমোরিয়াল তহবিলে কুচবিহার দরবারের দান—

ভারতীয় রোড্ কংগ্রেস ভারতবর্ষে রাস্তা নির্ম্মাণের উন্নতিকল্পে বহু মূল্যবান কার্য্য করিতেছেন। কংগ্রেস যাহাতে এই কার্য্য চালাইয়া যাইতে পারেন তজ্জন্য কুচবিহার দরবার বর্ত্তমান আর্থিক বৎসর হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য কংগ্রেসকে প্রতি বৎসর ১০০০, টাকা করিয়া আর্থিক সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্যার বিজয়চাঁদ মহাতাবের স্মৃতিরক্ষাকল্পে যে তহবিল খোলা হইয়াছে তাহাতে কুচবিহার দরবার ১০০০, টাকা চাঁদা দিয়াছেন। দরবারের ইচ্ছা যে এই মহাপুরুষের স্মৃতি যোগ্যভাবে রক্ষিত হয়।

জড়বুদ্ধি শিশুদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা—

কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবহারজীব শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ মুখোপাধ্যায় বাংলাদেশে জড়বুদ্ধি ও স্বল্পবুদ্ধি বালক-বালিকাগণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বোধনা-নিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এক মামলা উপলক্ষ্যে কুচবিহার আসিয়াছিলেন। গত ৫ই ডিসেম্বর স্থানীয় নববিধান মন্দির গৃহে মাতৃশ্রী শ্রীশ্রীমহারাণী সাহেবার সভানেত্রীত্বে এক সভায় মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'বোধনা'র আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানা তথ্যপূর্ণ এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি প্রথমে জড়বুদ্ধি ও স্বল্পবুদ্ধি মানবের বিভিন্ন শ্রেণীর কথা উল্লেখ করিয়া এই প্রকার বুদ্ধিবিকারের শারীরিক ও মানসিক কারণ ব্যাখ্যা করেন, অতঃপর ইহাদের জীবনের নানা সমস্যাগুলির উল্লেখ করিয়া "বোধনা" হইতে এই সকল সমস্যা সমাধানের যে চেষ্টা হইতেছে তাহা বিবৃত করেন। সভায় সহরের বহু মহিলা ও ভদ্রমহোদয় উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় রামভোলা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে কুচবিহার দরবারের সাহায্য—

১৯৪১ সালে "পাবলিক হাই স্কুল" নাম দিয়া কুচবিহারে একটি নূতন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিছু কাল পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রামভোলা সরকার নামক স্থানীয় এক দাতা স্কুলটির উন্নতি কল্পে দশ হাজার টাকা দান করেন। তৎপর কর্তৃপক্ষ দাতার নামানুসারে স্কুলের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "রামভোলা হাই স্কুল" নাম দেন। স্কুলটি প্রথমে এক বৎসরের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করিয়াছিল, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় ইহাকে আরও দুই বৎসরের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন। কুচবিহার দরবার বিদ্যোৎসাহিতার জন্য চিরদিনই প্রসিদ্ধ, মহারাজা ভূপ বাহাদুর এই স্কুলের জন্য প্রায় দশ বিঘা জমি দান করিয়াছেন, এবং সম্প্রতি দরবার ইহার জন্য মাসিক একশত টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। আমরা এই স্কুলের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপবাহাদুরের জন্মতিথি

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা নবমী শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুরের জন্মতিথি। গত ২০শে অগ্রহায়ণ (১৩ই ডিসেম্বর) শুক্লা নবমী তিথিতে কুচবিহারে মহারাজা ভূপ বাহাদুরের জন্মতিথি উৎসব সম্পন্ন হয়। প্রাতে শ্রীশ্রীমদনমোহন ঠাকুর বাড়ীতে জন্মতিথি পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং মহারাজার একত্রিংশ জন্মতিথি ঘোষণা করিয়া একত্রিংশবার তোপধ্বনি হয়। স্থানীয় নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে মহারাজার দীর্ঘ-জীবন কামনা করিয়া একটি বিশেষ উপাসনা হয়। দ্বিপ্রহর দ্বাদশ ঘটিকায় রাজবাড়ীতে জন্মতিথি দরবার অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালে মদনমোহন ঠাকুর বাড়ীতে দরিদ্র নারায়ণের সেবা হয়। সন্ধ্যায় রাজবাড়ী, সকল সরকারী গৃহ এবং জনসাধারণের আবাসগৃহ আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়। সারাদিন ব্যাপিয়া সহরবাসী সকলে পরমানন্দে মগ্ন হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুর একত্রিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেন। আমরা তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া ভগবানের শ্রীচরণে আমাদের প্রার্থনা জানাইতেছি। মহারাজের সুশাসনে ইতিমধ্যেই রাজ্যে নানাবিধ উন্নতি-মূলক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; আমরা বিশ্বাস করি ভবিষ্যতে এই রাজ্যের আরও অশেষ উন্নতি হইবে।

রাজপ্রাসাদে জন্মতিথি দরবার—

গত ১৩ই ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে রাজবাড়ীতে জন্মতিথি দরবারের অনুষ্ঠান হয়। মধ্যাহ্নে দ্বাদশ ঘটিকায় মহারাজা ভূপ বাহাদুর দরবার কক্ষে প্রবেশ করেন। তৎপূর্ব্বেই দরবারীগণ দরবার পোষাকে সজ্জিত হইয়া নিজ নিজ আসন গ্রহণ করেন, মহারাজা দরবারকক্ষে প্রবেশ করা মাত্র দরবারীগণ দণ্ডায়মান হইয়া মহারাজাকে অভিবাদন করেন। মহারাজা সিংহাসনে বসিলে হাউসহোল্ড মন্ত্রী মহাশয় মহারাজার আদেশক্রমে দরবার আরম্ভ হইল বলিয়া ঘোষণা করেন। প্রধান রাজগুরু আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিলে রাজকর্ম্মচারী ও অন্যান্য দরবারীগণ পদমর্য্যাদানুসারে একে একে মহারাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্বর্ণমুদ্রা নজর প্রদান করেন, মহারাজা মুদ্রা স্পর্শ করিয়া ফিরাইয়া দেন। অতঃপর দরবারীগণকে পান ও আতর প্রদান করা হইলে মহারাজার আদেশে হাউসহোল্ড মন্ত্রী মহাশয় দরবারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং মহারাজ দরবার কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। দরবারের আরম্ভে ও শেষে তের বার করিয়া তোপধ্বনি হয়।

চন্দনচর্চ্চিতভালে রাজবেশে সিংহাসনে উপবিষ্ট শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুরের পবিত্র স্নিগ্ধ কান্তি অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছিল। আমরা অন্যত্র দরবার কক্ষে সিংহাসনোপবিষ্ট মহারাজার প্রতিকৃতি প্রকাশ করিলাম।

দেশবিদেশের কথা

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বার্ষিক অনুষ্ঠান—

প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত বসুবিজ্ঞান মন্দিরের বার্ষিক অনুষ্ঠান গত ৩০শে নভেম্বর কলিকাতায় বসুবিজ্ঞান মন্দিরে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে মন্দিরের প্রধান পরিচালক ডক্টর ডি, এম্, বসু মন্দিরের কার্য্যকলাপ

সম্বন্ধে ও আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে বর্ণনা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে বিগত দুই বৎসর যাবত মন্দিরে ইউবেনিয়াম সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা চলিতেছে। বর্ত্তমানে গভর্ণমেন্ট ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই মন্দিরে অর্থ সাহায্য করিতেছেন; কিন্তু আরও অর্থের প্রয়োজন। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর পারিজা বৃক্ষলতাদির গ্রহণ শক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

সিন্ধুর উপকূলে ভূমিকম্প ও জলোচ্ছ্বাস

গত ২৮শে নভেম্বর সিন্ধুর উপকূলে ভীষণ ভূমিকম্প ও জলোচ্ছ্বাস হয়। ইহার ফলে বহু লোক মারা যায় এবং আরও অনেক লোক গৃহহীন হয়। এই দৈবদুর্ব্বিপাকের কারণ এখন ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতেছে। প্রকাশ যে সমুদ্রগর্ভস্থ আগ্নেয়গিরির উৎপাতেই এই অনর্থ ঘটিয়াছে। ইহার ফলে করাচীর ১৮০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে সমুদ্রগর্ভে দুইটি ছোট দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে। এই দ্বীপ দুইটি নাকি পূর্ব্বে জলমগ্ন পাহাড় ছিল।

আমেরিকা হইতে বৃটেনের ঋণ গ্রহণ—

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিলেও বৃটেনের আর্থিক বনিয়াদ শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সহসা ঋণ ইজারা চুক্তি অনুসারে বৃটেনকে সাহায্য করা বন্ধ করায় বৃটেন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল। তাই বৃটেন আমেরিকায় একটি অর্থনৈতিক মিশন পাঠাইয়া যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে সুবিধাজনক সর্ত্তে ঋণগ্রহণের চেষ্টা করিতেছিল। এই চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। সম্প্রতি সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনকে ৪৪০ কোটি ডলার (প্রায় ১৩৪৬ কোটি টাকা) ঋণ দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। ১৯৫১ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের পরবর্ত্তী ৫০ বৎসর কালের মধ্যে শতকরা দুই টাকা সুদে এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। এই ঋণের অর্থে যুদ্ধবিধ্বস্ত বৃটেন তাহার আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারিবে।

বাঙালী শিল্পীর চীনদেশে আমন্ত্রণ—

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় একজন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ও চিত্রসমালোচক। ইনি কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগীশ্বরী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে বৌদ্ধ শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য ইনি চীন দেশ হইতে আমন্ত্রণ পাইয়াছেন। বিদেশে বাঙালী শিল্পীর এই সম্মানলাভে আমরা আনন্দিত।

ভারতে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের এক প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত—

ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্স গত ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড সভায় এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই ভারতবর্ষে এক পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধি দল প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছেন। এই প্রতিনিধিগণ ভারতের প্রধান রাজনৈতিক নেতাদের সহিত প্রত্যক্ষ আলাপ আলোচনা করিয়া তাহাদের মতামত জ্ঞাত হইবেন এবং ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের শুভেচ্ছার কথা জানাইবেন। প্রথমে কথা হইয়াছিল যে এম্পায়ার পার্লামেণ্টারী এসোসিয়েশন এই প্রতিনিধিদল নির্ব্বাচিত করিবেন, কিন্তু পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট লর্ড সভার প্রেসিডেণ্ট ও কমন্স সভার স্পীকারের উপর প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ভার দিয়াছেন।

কলিকাতা করপোরেশনের শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট ঃ—

যুদ্ধোত্তর জগতে শ্রমিক ধর্ম্মঘট একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কলিকাতা করপোরেশনকে এইরূপ একটি ধর্ম্মঘটের সম্মুখীন হইতে হয়। ইহাতে শ্রমিকগণ ব্যতীত অল্পবেতনের কর্ম্মচারীগণও যোগ দিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মঘট ৪।৫ দিন চলিয়াছিল; ইহার ফলে কলিকাতায় জল সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছিল এবং রাস্তাঘাট আবর্জ্জনার স্তূপে পরিণত হইয়াছিল। ধর্ম্মঘটের সময় সেনাবিভাগের হস্তে জল সরবরাহের ভার দেওয়া হয়, তাহাতেই সহরবাসীগণ সামান্য যাহা কিছু জল পাইয়াছিলেন। কলিকাতা করপোরেশনে এইরূপ ব্যাপক ধর্ম্মঘট এই প্রথম।

শোকসংবাদ ঃ—

গত এক মাসে বাংলা দেশের কতিপয় সুসন্তান পরলোকগমন করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

(১) **কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়—** ইনি বাঁশবেড়িয়ার বিখ্যাত রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা ও ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের (Library movement) ইনি একজন প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। মৃত্যুকালে রায় মহাশয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৫ সালে তিনি স্পেনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক লাইব্রেরী কংগ্রেসের একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

(২) **শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী—** শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী কলিকাতায় এক মোটর দুর্ঘটনায় আহত হইয়া শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে মারা গিয়াছেন। শ্রীযুক্তা গাঙ্গুলী বিশিষ্ট সমাজসংস্কারক ও শিক্ষাব্রতী দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর কন্যা। ১৯০৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্-এ পাশ করিয়া তিনি বেথুন কলেজ ও কটন্ ব্যারেন শ গার্লস্ কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং পরে সিংহলে বৌদ্ধ বালিকা কলেজের অধ্যক্ষা নিযুক্ত হন। তিনি আরও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কার্য্য করিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে টাঙ্গাইলের কুমুদিনী গার্লস কলেজের অধ্যক্ষা হন। সমাজের নানা জনহিতকর কার্য্য এবং দেশসেবার কার্য্যেও শ্রীযুক্তা গাঙ্গুলী সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। আমরা এই মহিয়সী মহিলার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

(৩) **শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়—**বাংলার বাহিরে যে সকল সাংবাদিক প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায় ছিলেন তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয়। শ্রীযুক্ত রায় প্রথম জীবনে সুরেন্দ্রনাথের "বেঙ্গলী" পত্রিকায় যোগদান করেন এবং অল্পদিন মধ্যেই একজন বিশিষ্ট লেখক বলিয়া গণ্য হন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি "পাঞ্জাবী" পত্রিকার সম্পাদক হইয়া লাহোর যান এবং পরে লাহোরের প্রসিদ্ধ "ট্রিবিউন" পত্রিকার সম্পাদক হন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত রায় এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

(৪) **শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে—**স্বর্গীয় দীনেশ সেন সম্পাদিত 'ময়মনসিংহ গীতিকা" ও "পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা" বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছিল। এই দুই গ্রন্থের গীতিকাসমূহের অধিকাংশই ময়মনসিংহের

চন্দ্রকুমার দে কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল। দে মহাশয় সম্প্রতি তাঁহার ময়মনসিংহের বাটিতে পরলোকগমন করিয়াছেন।

(৫) শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ—বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ গত ১৬ই ডিসেম্বর তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যু কালে তাঁহার বয়স ৭৯ হইয়াছিল। তিনি বহু বৎসর কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ ছিলেন; এতদ্ব্যতীত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও ইংরাজীর অধ্যাপনা করিতেন। ইংরাজী ব্যতীত গ্রীক্, লাটিন, ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল মূল গ্রীক হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া তিনি বাংলা ভাষায় সক্রেটিস সম্বন্ধে একখানি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

এই সকল সুসন্তানের মৃত্যুতে বাংলা দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারত-সরকারের রেকর্ড ডিপার্টমেন্টের কার্য্যাবলী—

ডক্টর সেন ভারত সরকারের রেকর্ড ডিপার্টমেন্টের কার্য্যভার গ্রহণ করার পর হইতেই এই বিভাগের তৎপরতা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডক্টর সেন একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক; ভারত সরকারের দপ্তরে অনেক প্রাচীন দলিল ও কাগজপত্র আছে যাহার ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। ডক্টর সেন এইগুলি প্রকাশ করিবার এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। ভারত সরকারের অনুমোদন ক্রমে স্থির হইয়াছে যে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ২০ খণ্ড সুনির্ব্বাচিত রেকর্ড প্রকাশিত হইবে। এই জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য গ্রহণ করা হইতেছে। ইতিমধ্যেই প্রথম খণ্ড রেকর্ড প্রকাশিত হইয়াছে; এই খণ্ডে কেবলমাত্র বাংলা দলিলপত্র প্রকাশ করা হইয়াছে; এই সকল দলিল বাংলার ইতিহাস রচনায় নূতন আলোকসম্পাত করিবে। ছয় খণ্ড রেকর্ড ছাপিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে; এবং অন্য খণ্ডগুলিও প্রস্তুত হইতেছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্য শেষ হইবার পর ডিপার্টমেন্ট একটি বিংশ-বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যে সকল রেকর্ড প্রকাশিত হইবে তাহার মধ্যে ইংরাজী ও বাংলা ভাষার রেকর্ড ব্যতীত ভারতীয় বিভিন্ন আধুনিক ভাষার রেকর্ড ত আছেই, এমন কি ফারসী, আরবী, সংস্কৃত, চীনা প্রভৃতি ভাষার রেকর্ডও আছে। ডক্টর সেনের পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্য হইলে ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকগণ হাতের কাছে এমন সব মূল্যবান দলিলপত্র পাইবেন যাহাতে তাঁহাদের ইতিহাস রচনার কার্য্য অনেক সহজ হইবে।

পুষ্করিণী খননের অর্থ নৈতিক উপকারিতা

বাংলা সরকারের মৎস্য বিভাগের ডিরেক্টর ডক্টর এস, এল্ হোরা কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতার রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে পুষ্করিণী খননের অর্থ নৈতিক উপকারিতা সম্বন্ধে এক মূল্যবান বক্তৃতা দেন। সমস্ত ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলা দেশে, বহু নিম্ন জলাভূমি অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই সকল জলাভূমির সন্নিকটে মাঝে মাঝে পুষ্করিণী খনন করিলে সেই মৃত্তিকাদ্বারা জলাভূমিগুলি ভরাট করিয়া চাষের উপযোগী করা যাইতে পারে। এইরূপে পুষ্করিণী ও জমি দুই হইতেই অর্থাগম হইতে পারে। গ্রাম্য জীবনে পুষ্করিণী একটি সম্পদ-বিশেষ। পুষ্করিণীর জলে মৎস্যচাষ করিয়া ও হাঁস পালন করিয়া পুষ্টিকর আমিষজাতীয় খাদ্যের সংস্থান করা যাইতে পারে। পুষ্করিণীর পাড়ে তরিতরকারী জন্মান যাইতে পারে। পুষ্করিণীর জলের দ্বারা শীতকালে সেচের ব্যবস্থা হইতে পারে। ডক্টর হোরা তাঁহার বক্তৃতায় বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে পুষ্করিণী খননের উপর খুব জোর দেন।

ডক্টর হোরা কুচবিহার রাজ্যের মৎস্য বিভাগের উপদেষ্টা। তাঁহার উপদেশ মত কুচবিহার রাজ্যে পুষ্করিণী খনন ও মৎস্যচাষের ব্যবস্থা হইতেছে।

মহাত্মা গান্ধীর বাংলায় আগমন—

গত ১লা ডিসেম্বর মহাত্মা গান্ধী কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি কলিকাতার সন্নিকটে সোদপুরস্থ খাদি-প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করিতেছেন। বহুদিন পরে মহাত্মাজী এই বাংলায় আসিলেন। প্রত্যহ বহু নরনারী তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সোদপুরে যাইতেছেন। সন্ধ্যায় মহাত্মাজীর প্রার্থনা সভায় বহু লোক সমবেত হইতেছেন। প্রত্যহই প্রার্থনান্তে তিনি জনগণকে উদ্দেশ করিয়া প্রার্থনার উদ্দেশ্য ও মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতেছেন। একদিন বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মহাত্মাজী বলেন, "পৃথিবীতে আজ সর্ব্বব্যাপী অন্ধকার, এই অন্ধকারে মানুষকে ভগবানের নিকট আলোকের প্রার্থনা করিতেই হইবে। কেবল ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র পৃথিবীর আজ শান্তি চাই। এই পৃথিবীতে হিংসা আছে অহিংসাও আছে, সত্য আছে মিথ্যাও আছে, আলো আছে অন্ধকারও আছে। কিন্তু মানুষকে অহিংসার আশ্রয় করিয়া সত্য ও আলোকের সন্ধান করিতে হইবে।"

বাংলার গভর্ণর মিষ্টার কেসী চারদিন মহাত্মা গান্ধীর সহিত গভর্ণমেণ্ট হাউসে দেখা করিয়াছেন। প্রকাশ যে উভয়ের মধ্যে নানাবিষয়ে হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা হইয়াছে। বড় লাট লর্ড ওয়াভেলের সহিতও একদিন মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাৎকার হইয়াছে। এই সকল সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে একটি সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে কোনরূপ দলগত রাজনৈতিক আলোচনার জন্য মহাত্মা গান্ধীর সহিত গভর্ণর বা বড় লাটের সাক্ষাৎকার হয় নাই; নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে এইরূপ কোন আলোচনা চালান হইবে না, তবে

ব্যক্তিগত ভাবে ভারতীয় নেতৃগণের সংস্পর্শে আসিতে তাঁহারা সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

এসোসিয়েটেড চেম্বার অফ কমার্সের সভায় বড় লাটের বক্তৃতা—

গত ১০ই ডিসেম্বর বড় লাট লর্ড ওয়াভেল কলিকাতায় এসোসিয়েটে্ চেম্বার অফ কমার্সের সভায় এক বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতায় বড় লাট সমগ্র জগতের তথা ভারতের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় যে সকল দুর্নীতি দেখা দিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে দ্রব্যাভাবই এই দুর্নীতির কারণ। ভারতের সাধারণ খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে মোটের উপর অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু এখনও যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। বস্ত্রাভাব সম্বন্ধে তিনি বলেন যে জনসাধারণের দুর্গতি এক সময় চরমে উঠিয়াছিল, কিন্তু দুর্গতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইতেছে; তবে পৃথিবীব্যাপী বর্ত্তমান বস্ত্রাভাব দূর না হইলে এই দুরবস্থা সম্পূর্ণ দূরীভূত হইবে না। ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে বাণিজ্য ব্যবস্থার উন্নতি সাধন সম্বন্ধে তিনি বলেন যে উভয় দেশের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন একান্ত আবশ্যক; কোনও রূপ রক্ষাকবচ অপেক্ষা ইহাই অধিকতর কার্য্যকরী হইবে। ভারতীয় রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে এই সমস্যার সমাধান অসম্ভব নহে। "সিসেম দ্বার খোল" বলিয়া আলিবাবা যেমন গুহার দ্বার খুলিয়াছিল সেইরূপ "ভারত ত্যাগ কর" বলিলেই ভারতীয় সমস্যার সমাধান হইবে না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ভারতীয় রাজন্যগণ এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এক মত হইতে পারিলেই এমন একটি নূতন শাসনতন্ত্র গঠিত হইবে যাহাতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবে। এইরূপ মতৈক্য যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তজ্জন্য সাহায্য করিতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই প্রস্তুত। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে বড়লাট প্রতিশ্রুতি দেন যে ভারতের শাসনতন্ত্র গঠন করিতে সর্ব্বদলের মতৈক্য প্রতিষ্ঠার যথাসাধ্য চেষ্টা তিনি করিবেন। আগামী বৎসর যে আলোচনা আরম্ভ হইবে জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক বিরোধের ফলে যদি তাহার গতি ব্যাহত হয় এবং বলপ্রয়োগ নীতির উদ্ভব হয় তাহা হইলে ইহা ভারত ও সমগ্র জগতের পক্ষে খুবই মর্ম্মান্তিক হইবে।

খেলাধূলা

ক্রিকেট

মাদ্রাজে ২রা ডিসেম্বর হইতে দক্ষিণাঞ্চল দলের সহিত অষ্ট্রেলিয়ান দলের তিনদিন ব্যাপী খেলা আরম্ভ হয়। টসে জিতিয়া দক্ষিণাঞ্চল দল ব্যাট করেন এবং সকলে আউট হইয়া ১৫৯ রাণ তুলেন। ইহার মধ্যে পালিয়ার ৪৮ রাণ এবং আইবাবার ৪৯ রাণ (নট আউট) উল্লেখযোগ্য। বোলিংএ অষ্ট্রেলিয়ান দলের এলিস্ ২১ রাণে ৪টি এবং প্রাইস ৩৩ রাণে ৪টি উইকেট পান। অষ্ট্রেলিয়ান দল প্রথম ইনিংসে ১২৫ রাণ করেন। ওয়াকম্যানের ৭৬ রাণই সর্বাপেক্ষা বেশী রাণ সংখ্যা। বোলিংএ রামসিং ৫৭ রাণে ৩টি এবং গোলাম আমেদ ৫৬ রাণে ৪টি উইকেট পান। ৩৬ রাণ পিছনে পড়িয়া দক্ষিণাঞ্চল দল দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করেন এবং ২৩৩ রাণে সকলে আউট হন। রামসিং ও আইবারা যথাক্রমে ৪২ ও ৪৫ রাণ করেন। অষ্ট্রেলিয়ান দল দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ১৮৮ রাণ করিয়া ৬ উইকেটে বিজয়ী হইয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ান দলের ফিল্ডিং খুব উঁচুদরের হইয়াছিল। খেলাটি দুইদিনে শেষ হয়।

মাদ্রাজে ৭ই ডিসেম্বর হইতে অষ্ট্রেলিয়ান দলের সহিত ভারতীয় দলের চারদিন ব্যাপী তৃতীয় এবং শেষ টেষ্ট খেলা আরম্ভ হইয়া ১০ই ডিসেম্বর খেলাটি শেষ হয়। এই খেলায় ভারতীয় দল ৬ উইকেটে জয়ী হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ান দলের অধিনায়ক হ্যাসেট টসে জিতিয়া প্রথমে ব্যাট করিতে আরম্ভ করেন। ১২০ রাণে অষ্ট্রেলিয়ান দলে ৫টি উইকেট পড়িয়া যায়। হ্যাসেট ও পেপার ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে ১৮১ রাণ তুলেন। অষ্ট্রেলিয়ান দলের সকলে আউট হইয়া ৩৩৯ রাণ করেন। ইহার মধ্যে হ্যাসেট ১৪৩ এবং পেপার ৮৭ রাণ করেন। সুঁটে ব্যানার্জি ৮৬ রাণে ৪টি এবং সারভাতে ৯৪ রাণে ৪টি উইকেট পান। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে সকলে আউট হইয়া ৫২৫ রাণ তুলেন। অমরনাথ ১১৩ রাণ এবং মোদী ২০৩ রাণ করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে অষ্ট্রেলিয়ান দল ২৭৫ রাণে সকলে আউট হন। কারমোদী ৯২ রাণ তুলেন। বানার্জি ৮১ রাণে ৪টি এবং সারভাতে ১১৪ রাণে ৪টি উইকেট পান। ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ৯২ রাণ তুলিলে অষ্ট্রেলিয়ান দলের রাণ সংখ্যা অতিক্রম হয় এবং ভারতীয় দল ৬ উইকেটে বিজয়ী হন। বানার্জি এবং সারভাতের বোলিং এবং মোদী ও অমরনাথের ব্যাটিং ভারতীয় দলকে জয়ী করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে।

আন্তঃপ্রাদেশিক রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতায় বাংলা দলে ১৫ জন খেলোয়াড় নির্বাচিত হইয়াছেন—কে বসু, কুচবিহারের মহারাজা, কে ভট্টাচার্য্য, এম্ সেন, পি দত্ত, পার্থসারথি, ডি আর্ পুরী, পি সেন, ডি দাস এস্ ঘোষ, এন্ চৌধুরী, এ গার্বিস, এস বানার্জি, এন মিত্র, এন চাটার্জি। কে, বসু দলের ক্যাপ্টেন এবং কুচবিহারের মহারাজা ভাইস ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হইয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়ানদলের সহিত সমগ্র সিংহলদলের ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় অষ্ট্রেলিয়ান দল এক ইনিংস্ এবং ৪৪ রাণে জয়লাভ করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ান দল প্রথম ইনিংসে ৩০৬ রাণ করেন। সিংহল দল প্রথম ইনিংসে ১০৩ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫৯ রাণ তুলেন।

ব্যাড্‌মিণ্টন্

আন্তঃপ্রাদেশিক ব্যাড্‌মিণ্টন্ প্রতিযোগিতার ফাইনালে পাঞ্জাবদল বোম্বাইদলকে পরাজিত করিয়াছেন। দেবীন্দ্রমোহন ও প্রকাশনাথ (পাঞ্জাবদল) বি ডি সরক্ এবং ডি এ মদ্‌গভ্‌কর্‌কে (বোম্বাইদল) পরাজিত করিয়াছেন। সিঙ্গল্‌স্‌এ প্রকাশনাথ (পাঞ্জাব) দেবীন্দ্রনাথকে (পাঞ্জাব) পরাজিত করিয়াছেন।

টেবল্ টেনিস্

বোম্বাই সহরে ২২শে ডিসেম্বর হইতে আন্তঃ-প্রাদেশিক টেবল্ টেনিস্ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবে। নিম্নলিখিত খেলোয়াড় লইয়া বাংলাদল গঠিত হইয়াছে। অরুণ ঘোষ (ক্যাপ্টেন), অমর সরকার, কুমার ঘোষ, কমল ব্যানার্জি, অসিত মুখার্জি, ইটেগুই, এফ্ পি ডেবোট্রি এবং এম্ হালদার। অমর মুখার্জি টিমের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

টেনিস্

ববি রিগস্ পৃথিবীর পেশাদারী হার্ডকোর্ট টেনিস্ প্রতিযোগিতায় ডোনাল্ড বান্‌কে পরাজিত করিয়াছেন।

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত এম্-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও কুচবিহার ষ্টেট্ প্রেস হইতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক
১।	সংস্কৃত নারী কবি পদ্মাবতী (প্রবন্ধ)	ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী এম্-এ, ডি-ফিল (অক্সন)	৪০৫
২।	পত্রলেখা (প্রবন্ধ)	ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে এম-এ, পি-আর-এস, ডি-লিট্ (লণ্ডন)	৪০৯
৩।	চিত্র ও চিত্রকর (কবিতা)	শ্রীধীরানন্দ ভট্টাচার্য্য	৪১২
৪।	অগ্নিশুদ্ধি (গল্প)	শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি এস	৪১৩
৫।	গান	শ্রীভোলানাথ দাশ	৪১৬
৬।	সাধু রামতনু লাহিড়ী (প্রবন্ধ)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন বি-এ	৪১৭
৭।	উপনদী (উপন্যাস)	শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য	৪২৪
৮।	অনির্ব্বচনীয় (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৪২৯
৯।	কোচবিহারী ভাওয়াইয়া (প্রবন্ধ)	আবদুল করিম	৪৩০
১০।	গুড়িয়াহাটীতে নূতন বসতি গেলো (কবিতা)	শ্রীহেমন্তকুমার বসু বি-এ	৪৩৩
১১।	রাজকীয় ভারতীয় নৌবাহিনী (প্রবন্ধ)	শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম-এস-সি	৪৩৪
১২।	রাজপরিবারের সংবাদ		৪৩৭

সূচীপত্র

নর্থবেঙ্গল আয়ুর্বেদিক ফার্মেসীর
TRADE MARK
রেজিষ্টারী করা
শ্রীরাধাগোবিন্দ সাহার
রোগ অবস্থা
আরোগ্য অবস্থা
আবিষ্কৃত
ধন্বন্তরী পাচন
সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া, প্লীহা, যকৃতের মহৌষধ।
DHANWANTARI PACHAN
মূল্য ১।৷০
দেড় টাকা

কোচবিহার দর্পণের নিয়মাবলী।

১। কোচবিহার দর্পণের প্রতি সংখ্যার মূল্য চারি আনা ও বার্ষিক সডাক তিন টাকা; মূল্য অগ্রিম দেয়।

২। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লেখা কাগজের একপৃষ্ঠায় স্পষ্টরূপে লিখিয়া সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে। উৎকৃষ্ট লেখার জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

৩। অমনোনীত লেখা ফেরত লইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকেট সহ ঠিকানা লেখা খাম পাঠাইতে হয়; অমনোনীত কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না। অমনোনয়নের কারণ দর্শাইতে সম্পাদক অক্ষম।

৪। মনোনীত লেখা কখন প্রকাশিত হইবে সে সম্বন্ধে সম্পাদক কোনরূপ নিশ্চয়তা দিতে পারেন না।

৫। কোচবিহার দর্পণে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা ১০৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৬৲ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা। রঙ্গীনভাবে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার দ্বিগুণ।

৬। টাকাকড়ি সম্পর্কিত চিঠিপত্র ম্যানেজারের নিকট লিখিতে হইবে।

ম্যানেজার কোচবিহার দর্পণ
ষ্টেট্‌প্রেস, কোচবিহার।

জন্মতিথি দরবারে সিংহাসনোপবিষ্ট শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর
কোচবিহার

কোচবিহার দর্পণ

অষ্টম বর্ষ | মাঘ ১৩৫২ সন, রাজশক ৪৩৬ | ১০ম সংখ্যা

সংস্কৃত নারী কবি পদ্মাবতী

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী এম্-এ, ডি-ফিল (অক্সন্)

শীলা, বিজ্জা, বিকটনিতম্বা, গৌরী, মারুলা, মোরিকা প্রমুখ সংস্কৃত নারী কবিগণের কবিতাবলী কিছু কিছু সংগৃহীত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে পদ্মাবতী নাম্নী একজন সংস্কৃত নারী কবির সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব। পদ্মাবতীর পারিবারিক ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই। তাঁহার দুইটী কবিতা ("দন্তালি-দাড়িমী-বীজ" এবং "হরিণ্যস্তরণ্যে") হরিভাস্কর তাঁহার "পদ্যামৃত-তরঙ্গিণী" নামক সুবিখ্যাত কোষকাব্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। "পদ্যামৃত-তরঙ্গিণী" ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। সুতরাং পদ্মাবতী সেই সময়ের পূর্ব্বে ধরাধাম ধন্য করিয়াছিলেন—অবশ্য কত পূর্ব্বে তাহা জানিবার উপায় নাই। "পদ্যবেণী" নামক অপর একটী বিখ্যাত কোষকাব্যের প্রণেতা বেণীদত্তও পদ্মাবতীর আঠারটী কবিতা তাঁহার "পদ্যবেণী"তে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বেণীদত্তও খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। পদ্মাবতী তাঁহার দুইটী কবিতায় গুর্জ্জরদেশীয়া ললনার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হইতে বোধ হয় যে, সম্ভবতঃ তিনিও গুর্জ্জরদেশীয়া ছিলেন—অবশ্য এ বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা চলে না।

পদ্মাবতী নানা বিষয়ে কবিতা রচনা করেন। তাঁহার কয়েকটী কবিতার বাংলা অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

[রাজস্তুতি]

"যিনি নৃপগণের অগ্রগণ্য ও শরণ্য, যাঁহার হস্তে সুন্দর ধনুঃ এবং গলদেশে নীলবস্ত্র, মৃগানুসারী (সেই রাজাকে) অরণ্যে অবলোকন করিয়া চঞ্চলনেত্র হরিণীগণ কামদেব বলিয়া মনে করিতেছে।"

[কৃপণ]

"কোষে বিন্যস্ত, বদ্ধমুষ্টি, দৈত্যের ন্যায় ভীষণাকার 'কৃপাণ' ও 'কৃপণের' মধ্যে ভেদ কেবল আকারতঃই।"

এই কবিতার প্রত্যেক শব্দ দ্ব্যর্থবোধক এবং 'কৃপাণ' ও কৃপণ' উভয় পক্ষেই প্রযোজ্য। 'কোষে নিষণ্ণস্য' —কৃপাণের পক্ষে ইহার অর্থ, 'কোষে (খাপে) রক্ষিত'; কৃপণের পক্ষে, 'যাহার অর্থ ধনকোষে লুক্কায়িত থাকে'। "বদ্ধমুষ্টেঃ'—কৃপাণের পক্ষে, 'যে তরবারির বাঁট বদ্ধমুষ্টির ন্যায় আকারবিশিষ্ট' কৃপণের পক্ষে, 'যে অর্থব্যয়ে অনিচ্ছুক'। 'মলিম্লুচাকার-বিভীষণস্য'—কৃপাণের পক্ষে, 'যাহার আকার রাক্ষসের (মলিম্লুচস্য) ন্যায় ভীষণ'; কৃপণের পক্ষে, 'যাহার আকার চোরের ন্যায় ভীষণ'। এইরূপে, 'কৃপাণ' ও 'কৃপণের' মধ্যে গুণতঃ কোনো ভেদ নাই, কেবল আকারতঃই বা রূপেরই মাত্র ভেদ আছে। অথবা, উভয়ের মধ্যে ভেদ কেবল একটী 'আকারেই' ("আ"—কৃপাণ ও কৃপণ')।

[খল]

" 'খল' ও 'হলের' বক্রতা স্বভাবসিদ্ধ। ইহাদের দুজনের মুখের আঘাত কেবল একজনই সহ্য করিতে পারেন—তিনি ক্ষমা।"

এস্থলেও শব্দগুলি দ্ব্যর্থবোধক এবং 'খল' ও 'হল' উভয় পক্ষেই প্রযোজ্য। "বক্রত্ব"—খলের পক্ষে, 'অসাধুতা'; হলের পক্ষে, 'আকারের বক্রতা'। "মুখাক্ষেপ"—খলের পক্ষে, 'বাক্যের (মুখের) কর্কশতা'; হলের পক্ষে, 'ভূমিকর্ষণ কালে হলের অগ্রভাগ (মুখ) দ্বারা ভূমিতে সজোরে আঘাত'। "ক্ষমা"—খলের পক্ষে, 'ক্ষমা,' কারণ ক্ষমাশীল ব্যক্তিরাই কেবল খলের কর্কশ বাক্য সহ্য করিতে পারে; হলের পক্ষে, 'পৃথিবী', কারণ সর্ব্বংসহা ধরিত্রীই কেবল হলের কঠোর আঘাত সহ্য করিতে সমর্থ।

[সুন্দরীর কেশদাম]

"ইহারা কি চারুচন্দনলতাশ্রিতা ভুজঙ্গী? অথবা, ইহারা কি প্রস্ফুটিত পদ্মের মধুসংশ্লিষ্টা ভ্রমরী? ইহারা কি মুখচন্দ্রবিজয়ী রাহুসদৃশ বিষাক্ত অলি? অথবা, গুর্জ্জরদেশীয়া শ্রেষ্ঠা ললনাদের কেশদামই কি শোভা পাইতেছে?"

এস্থলে সুন্দরীর শুভ্র মুখবেষ্টনকারী কৃষ্ণ কেশগুচ্ছকে বিভিন্ন উপমা দ্বারা বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা, 'চারুচন্দন লতা' শুভ্র মুখ ও 'ভুজঙ্গী' কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশগুচ্ছের দ্যোতক। এইরূপে 'প্রস্ফুটিত পদ্ম' সুন্দর মুখ ও 'ভ্রমরী' কৃষ্ণ কেশদামের, এবং 'রাহু' অলিতুল্য কেশগুচ্ছের দ্যোতক। যেরূপ শুভ্র চন্দ্রমা কৃষ্ণ দৈত্য রাহু কর্ত্তৃক বিজিত অথবা গলাধঃকৃত হয়, সেইরূপ সুন্দরীর শুভ্র মুখও কৃষ্ণ কেশদাম কর্ত্তৃক বিজিত বা পরিবেষ্টিত হইয়াছে।

[মুখ]

"তোমার সুন্দর মুখেন্দুর কান্তিরূপ পীযূষধারা সদ্য আস্বাদন করিয়া, চতুর চকোরীবৃন্দ তাহাদের প্রভূত মধুলিপ্ত চঞ্চুর জড়তা অপনয়নের জন্য চন্দ্রমণ্ডলকে অম্ল পানীয় রূপে ভ্রম করিতেছে।"

এই কবিতায় সুন্দরীর মুখ যে চন্দ্রাপেক্ষাও অধিকতর সুন্দর তাহাই সুকৌশলে ব্যক্ত করা হইয়াছে। কেহ ক্রমাগত মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ করিলে তাহার জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া যায়, এবং সে আর মিষ্ট আস্বাদনে সমর্থ হয় না। তখন সে কিছুকালের জন্য অম্লদ্রব্য আস্বাদনে রত থাকে যাহাতে সে পুনরায় মিষ্টরসোপভোগে সমর্থ হয়। এস্থলেও চকোরীগণ সুন্দরীর মুখচন্দ্রের সুমিষ্ট অমৃত ক্রমাগত পান

করিয়া বীতশ্রদ্ধ হইয়া সম্প্রতি অম্ল চন্দ্ররশ্মি পানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ, মুখচন্দ্রের তুলনায় চন্দ্রও পরিম্লান, এবং মুখচন্দ্রের মিষ্টতার তুলনায় চন্দ্রের সুধাও অম্ল। অর্থাৎ, সুন্দরী চন্দ্রাপেক্ষা অধিক সুন্দরী।

[নাসিকা]

"আমি মনে করি যে, এই নাসিকা দন্তাবলী রূপ দাড়িম্ববীজ ভক্ষণে উৎসুক মন্মথরূপ শুকের চঞ্চু মাত্র।"

[তিলক]

"পঞ্চবাণবিশিষ্ট (কন্দর্পের) ধনুর মধ্যবর্ত্তি বাণফলকের ন্যায়, তোমার এই কস্তুরী দ্বারা অঙ্কিত, ভ্রূমধ্যবর্ত্তি তিলক শোভা উৎপাদন করিতেছে।"

[কণ্ঠ]

"ইহা ত কণ্ঠ নহে, কিন্তু কামদেবের জয়শীল শঙ্খ মাত্র, কারণ অদ্যাপি (তাঁহার) অঙ্গুলির চিহ্ন ইহাতে রেখাচ্ছলে শোভা পাইতেছে।"

এস্থলে সুন্দরীর কণ্ঠকে কামদেবের শঙ্খের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কণ্ঠের তিনটী রেখা যেন কন্দর্পের অঙ্গুলির চিহ্ন—তিনি শঙ্খটীতে ফুৎকার দিবার জন্য তাহা যখন হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন সেই সময়ে ঐ রেখাত্রয় অঙ্কিত হইয়াছিল।

[বাহুদ্বয়]

"ইহারা কি প্রেমসমুদ্রের কল্পলতা, অথবা মৃণাললতা? ইহারা কি বক্ষোরূপ পর্বতের চন্দনলতা, অথবা কন্দর্পের পাশলতা? ইহারা কি লাবণ্যসুধাসিন্ধুর প্রবাললতা? ইহারা কি—যেরূপ আমি মনে করি—গুর্জ্জরদেশীয়া কুলস্ত্রীর পত্ররূপ অঙ্গুলিসংযুক্তা সুললিতা বাহুলতা?"

[সিংহ]

"হে গর্ব্বদীপ্ত, প্রচণ্ডদণ্ডতুল্যভুজবিশিষ্ট পশুরাজ সিংহ! তুমি মাননীয় বলশালী হস্তীর মাংস (ভক্ষণে) রত হইয়া হরিণ বধ কর না"।

[অশ্ব]

"অবরুদ্ধ, উন্নতকেশর, ভ্রমরীগণ কর্ত্তৃক নিবিড় ভাবে আবৃত, পদ্মসদৃশ অশ্ব প্রকম্পিত হইতেছে।"

এই কবিতার পদগুলি দ্ব্যর্থবোধক—অশ্ব ও পদ্ম উভয় স্থলেই প্রযোজ্য। "বারিতঃ"—অশ্বস্থলে, "অশ্বশালায় অবরুদ্ধ"; পদ্মস্থলে, 'জল হইতে' (বারি+তস্)। "প্রস্ফুরতি"—অশ্বস্থলে 'প্রকম্পিত হইতেছে'; পদ্মস্থলে প্রকম্পিত হইতেছে অথবা দীপ্তি পাইতেছে। "সমুদঞ্চিত-কেশরঃ"—অশ্বস্থলে, 'উন্নতকেশরবিশিষ্ট'; পদ্মস্থলে, 'উন্নত-পরাগবিশিষ্ট'। "ভ্রমরী-কীর্ণ"—উভয় স্থলেই ভ্রমরীবৃন্দ কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত। সম্ভবতঃ প্রচুর ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে বলিয়াই অশ্বটী ভ্রমরাচ্ছাদিত। অথবা, অশ্বস্থলে, "ভ্রমরী" শব্দের প্রকৃত অর্থ ভ্রমর বা আবর্ত্ত, অর্থাৎ দেহলোমের কুঞ্চন। কুঞ্চিত দেহলোম অশ্বের উৎকর্ষ সূচনা করে।

[কাক]

"শত শত কোকিল কর্ত্তৃক অনুসৃত, উত্তরোত্তর গর্ব্বোদ্ধত, হে কাক! পক্ষিরাজকে অবমাননা করিয়া এই স্থান পরিত্যাগ করিও না। তোমাকে কাক বলিয়া জানিতে পারিলে, তাহারা তোমাকে রত্নসমূহ হইতে ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।"

[দীপ]

"অগ্নিজাত, সুজনের মঙ্গলের কারণ, কৃষ্ণের সম্মুখস্থিত দীপ অভিমন্যুর ন্যায় শোভা পাইতেছে।"

এই কবিতাবাপদগুলিও দ্ব্যর্থবোধক—দীপ ও অভিমন্যু উভয় স্থলে প্রযোজ্য। "ধনঞ্জয়-সম্ভূতঃ"—দীপ স্থলে, অগ্নি হইতে উৎপন্ন; অভিমন্যু স্থলে, "অর্জ্জুন হইতে উৎপন্ন"। "সুভদ্রোৎসাহ-বর্দ্ধনঃ"—দীপস্থলে, 'ভদ্রমতোদয়গণের (চৌরের নহে) মঙ্গলের কারণ'; অভিমন্যু স্থলে, 'মাতা সুভদ্রার আনন্দবর্দ্ধক'। "কৃষ্ণপুরসরঃ"—দীপস্থলে, 'কৃষ্ণ-বিগ্রহের সম্মুখে স্থাপিত', অভিমন্যু স্থলে, 'মাতুল কৃষ্ণের সম্মুখীন'।

[প্রভাতবেলা]

"অঙ্কুরিত-অংশুমালা-বিশিষ্ট সূর্য্যমণ্ডলরূপ আরতি পাত্র হস্তে ধারণ করিয়া, কন্দর্পরাজপুত্রী প্রভাতবেলা (উষা) সমুদ্রকন্যা (লক্ষ্মীকে) আরতি করিবার জন্য আগমন করিতেছেন।"

[রাত্রি]

"ত্রিভুবনের বিজয়াভিযানে উন্মুখ কন্দর্পের জন্য চন্দ্ররূপ কুঙ্কুম-পাত্র ধারণ করিয়া প্রদীপ্তশোভাময়া তারকাবলীকে আতপ-তণ্ডুলের ন্যায় প্রকাশিত করিয়া পুরস্ত্রী নিশা তাঁহার (কন্দর্পের) মঙ্গলের জন্য আগমন করিতেছেন"।

রাজা যুদ্ধজয়ে বহির্গত হইবার সময়ে তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া পুরস্ত্রীগণ তাঁহার সম্মুখে কুঙ্কুমপাত্র প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য সংস্থাপন করেন, এবং আতপ-তণ্ডুল প্রভৃতি লাজবর্ষণ করেন। এস্থলেও কন্দর্প যেন ত্রিভুবনজয়ে বহির্গত হইতেছেন। সেই সময়ে পুরস্ত্রী নিশা যেন রক্তবর্ণ পাত্রসদৃশ চন্দ্রকে কুঙ্কুমপূর্ণ পাত্রের ন্যায় ধারণ করিয়া এবং শুভ্র তারকাগণকে লাজের ন্যায় বর্ষণ করিয়া কন্দর্পের মঙ্গল কামনা করিতেছেন। অর্থাৎ, জ্যোৎস্নাদীপ্ত, তারকাখচিত রাত্রিই প্রেমের প্রকৃষ্ট সময়।

[গ্রীষ্মবায়ু]

"ধূলি ও কঙ্করবহুল, প্রচণ্ডতপনশিখার মালাধারী, স্পর্শমাত্রেই মুহূর্ত্ত মধ্যে নদীজল ও বৃক্ষপত্রের সম্পূর্ণ শোষণ-কারী, (নাগরাজ কর্তৃক) পীত ও উদ্গারিত, (অতএব) নাগরাজের ফুৎকৃতির সহিত নির্গত বিষাক্ত শিখাযুক্ত হইয়াই যেন এই গ্রীষ্মের বাতাস স্বচ্ছন্দে বারংবার পরিভ্রমণ করিতেছে"।

বায়ুভুক্ সর্প বায়ু পান ও উদ্গার করে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। গ্রীষ্মবায়ু এরূপ বিষের ন্যায় জ্বালাময় যে, মনে হয় ইহা যেন বিষধর নাগরাজ কর্তৃক পীত হইয়া বিষযুক্ত ফুৎকৃতি সহ নির্গত হইতেছে।

[গ্রীষ্ম]

প্রিয়া জায়া পদ্মিনীকে শীতক্লিষ্টা দর্শন করিয়া, প্রচণ্ড-জ্যোতি, উষ্ণরশ্মি (সূর্য্য) গ্রীষ্মকালকে স্বীয় সখারূপে গ্রহণ করিয়া, জয়াভিলাষী হইয়া দীপ্তি পাইতেছে"।

[বর্ষা]

"ইহা ত (মেঘ) গর্জ্জন নহে, কিন্তু মদনের নির্গমনের গর্জ্জনধ্বনি। ইহারা ত মেঘ নহে, কিন্তু মদনের শক্তিশালী হস্তিযূথ। ইহা ত বিদ্যুৎ নহে, কিন্তু তাঁহার হস্তে জয়িনী কোনো শক্তি। ইহা ত ইন্দ্রধনু নহে, কিন্তু মদনের জগন্মোহনকারি অস্ত্র মাত্র"।

বর্ষাকালে মদন পৃথিবীজয়ে নির্গত হন অর্থাৎ বর্ষাকাল যে প্রেমের প্রকৃষ্ট সময়, তাহাই এই কবিতায় কৌশলে বলা হইয়াছে।

[বীভৎসরস]

"কুষ্ঠরোগগ্রস্থ, বিষ্ঠানুলিপ্ত, কৃমিসমূহ কর্তৃক আবৃত, পূযধারাসিক্ত, মক্ষিকাপরিবেষ্টিত, হস্তধৃত প্রসারিত নিম্বশাখার উগ্রগন্ধযুক্ত, রক্তক্ষরণশীল গলিত হস্তপাদযুক্ত,

নিষ্ঠীবনত্যাগী জনগণ কর্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত এক ব্যক্তি (স্বীয়) দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছে।"

পদ্মাবতী যে শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত নারী কবিগণের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ভাবের নবীনতা ও ভাষার সরসতা, উভয় দিক্ হইতেই তিনি ছিলেন সুদক্ষা। শ্লেষাত্মক (দ্ব্যর্থবোধক) কবিতা রচনায় তিনি ছিলেন বিশেষ রূপে সিদ্ধহস্তা। তাঁহার চারিটী কবিতায় আমরা শ্লেষের অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাই। কৃপাণ ও কৃপণ, খল ও হল অশ্ব ও পদ্ম, দীপ ও অভিমন্যু—এই সকল সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তুদ্বয়কে একই শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা অতি দুষ্কর ব্যাপার; এবং কেবল তিনিই ইহা পারেন যিনি সংস্কৃত ভাষায় অতি সুপণ্ডিত। সুতরাং ইহা হইতেই পদ্মাবতীর গভীর সংস্কৃত-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার প্রকৃতিসম্বন্ধীয় কবিতাসমূহ বিশেষভাবে উপভোগ্য। প্রভাতবেলা, রাত্রি, বর্ষা প্রভৃতি কবিতা তাঁহার কবিত্বশক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি যে অতি সুন্দর রূপক ও উপমা প্রয়োগে সুনিপুণা ছিলেন তাহাও এই সকল কবিতা হইতে প্রমাণিত হয়। অপরপক্ষে, তিনি যে জীবন্ত, বাস্তব চিত্রাঙ্কনেও সমভাবে পটু ছিলেন তাহাও তাঁহার গ্রীষ্মবায়ু, বীভৎসরস প্রভৃতি কবিতা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

পত্রলেখা

ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে এম্-এ, পি আর-এস, ডি-লিট্ (লণ্ডন)

কবি বাণভট্টের কাদম্বরী-কাহিনীর পত্রলেখা, তাঁহার মুখ্য সৃষ্টি না হইলেও একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি, যাহার তুলনা সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যত্র পাওয়া যায় না। কোন সুপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধে, রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের যে সকল অনাদৃতা নায়িকার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার মধ্যে পত্রলেখারও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে পত্রলেখার চিত্র নাকি পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি নয়, পত্রলেখা নাকি কবি বাণভট্ট কর্তৃক উপেক্ষিতা। বাণভট্টের কল্পনা অপরিমিত ও অবিশ্রান্ত, কিন্তু কাদম্বরী ও মহাশ্বেতার বিষয়ে তিনি যেমন মুক্তহস্ত পত্রলেখার সম্বন্ধে তিনি নাকি তেমনি অন্ধ ও পক্ষপাত-কৃপণ। যে অন্তর্নিহিত মাধুর্য্য নারী-চরিত্রকে সার্থক করে, পত্রলেখার চরিত্রে তাহার যথেষ্ট সম্ভাব্যতা থাকিলেও তাহা নাকি কবির দ্বারা সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত ও অপমানিত! রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রসজ্ঞতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের কথা উঠিতে পারে না, কিন্তু মনে হয় যে, পত্রলেখার প্রতি সুবিচার করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বাণভট্টের প্রতি অবিচার করিয়াছেন।

আমাদের প্রথম জানা দরকার বাণভট্ট কি ভাবে পত্রলেখার চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। যুবরাজ চন্দ্রাপীড় যখন অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিয়া রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন, কবির ভাষায়, তিনি পরিসমাপ্ত-সমগ্র-কলা-বিজ্ঞান এবং সমারূঢ়যৌবন। একদিন প্রাতঃকালে তাঁহার কক্ষে কৈলাস নামক এক কঞ্চুকী একটি কন্যা লইয়া প্রবেশ করিলেন। কন্যাটি নবাবতীর্ণযৌবনা,

বিকসিতপুণ্ডরীক-নয়না, বক্তাম্বরগুণ্ঠিতা। তাহার অঙ্গ স্বর্ণালঙ্কারভূষিত, অধর তাম্বুলরাগরঞ্জিত, ললাট চন্দন-তিলকাঙ্কিত, ক্ষীণ কটিতট কনকমেখলাবেষ্টিত, চরণ ক্বণিত-মণিনূপুর-মুখরিত। রাজকুলে বাস ও বয়সোচিত প্রাগল্‌ভ্য সত্ত্বেও কন্যাটি সুশীলা ও অপরিত্যক্তবিনয়া। কঞ্চুকী রাজপুত্রকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন—মহারাণী বিলাসবতী কন্যাটিকে যুবরাজের তাম্বূল-করঙ্ক-বাহিনী করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার নাম পত্রলেখা তিনি কুলুত দেশের রাজার দুহিতা। মহারাজ কুলুত-রাজধানী বিজয়ের সময়ে তাহাকে বন্দী করিয়া আনিয়া অন্তঃপুর পরিচারিকাদের মধ্যে নিবেশিত করেন। কিন্তু মহারাণী পরিচয় পাইয়া তাহাকে আপনার কন্যার মত স্নেহে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। মহারাণী আদেশ করিয়াছেন যে, যুবরাজ যেন কন্যাটিকে সামান্য পরিচারিকার মত জ্ঞান না করেন, রাজকন্যার মত সম্মানে ও সমাদরে রাখেন, আপন সখী ও শিষ্যার মত সমস্ত বিশ্রম্ভ-ব্যাপারে নিযুক্ত করেন, এবং নিজের চিত্তবৃত্তির মত চাপল্য হইতে রক্ষা করেন। কঞ্চুকীর মুখে মাতৃ-আজ্ঞা শুনিয়া চন্দ্রাপীড় নিমেষশূন্য নয়নে পত্রলেখাকে অনেকক্ষণ দেখিয়া, 'জননীর আদেশ গ্রহণ করিলাম' এই বলিয়া কঞ্চুকীকে বিদায় দিলেন।

ইহার পর হইতে পত্রলেখা চন্দ্রাপীড়ের তাম্বূল-করঙ্ক-বাহিনী হইয়া নিদ্রায় জাগরণে, উপবেশনে উত্থানে ভ্রমণে, দিবারাত্র সমুপজাত-সেবা-রসা, ছায়ার মত রাজকুমারের অনুবর্তিনী হইয়া রহিল। শুধু মাতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য নয় তাহার অবিরাম সেবায় ও গুণে দিন দিন প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া চন্দ্রাপীড়ও তাহাকে আত্মহৃদয় হইতে অব্যতিরিক্ত মনে করিতে লাগিলেন। এই সুমধুর সৌহার্দ্যের মধ্যে কোথাও কিছু বাধা বা সঙ্কোচ ছিলনা। অসাধারণ হইলেও এই একত্রবাসের নিবিড় সান্নিধ্যের মধ্যে দুই দিক হইতেই যে কোনও অন্তরাল ছিল না, তাহা বাণভট্ট স্পষ্টই দেখাইয়াছেন। দিগ্‌বিজয় যাত্রার সময় একই অশ্বপৃষ্ঠে চন্দ্রাপীড় পত্রলেখাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। রাত্রিকালে শিবিরে একই কক্ষে যখন চন্দ্রাপীড় তাঁহার সখা বৈশম্পায়নের সঙ্গে আলাপ করিতেন, তখন তাহারই অনতিদূরে সখী পত্রলেখা নিশ্চিন্তমনে শয্যা গ্রহণ করিতেন। তারপর যখন চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীর প্রেমে আসক্ত হইলেন তখনও পত্রলেখার সখিত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইলনা। প্রিয় সুহৃদের মত পত্রলেখা চন্দ্রাপীড়ের সন্দেশ-বাহিনী হইয়া যখন কাদম্বরীর নিকট উপস্থিত হইল তখন পত্রলেখার এই প্রীতি-অমলিন সৌহার্দ্দ-সম্বন্ধ ছিল বলিয়াই কাদম্বরী তাহাকে আপনার প্রিয়সখীর মত গ্রহণ করিলেন। পত্রলেখা চন্দ্রাপীড়ের দিন-রজনীর সঙ্গিনী, সুখদুঃখের সাথী কিন্তু তাহার জন্য পত্রলেখার প্রতি কাদম্বরীর কোনও ঈর্ষা সংশয় বা দ্বন্দ্বের আভাসমাত্রও ছিলনা। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, বাণভট্ট তাঁহার কাব্যের কোথাও পত্রলেখা ও চন্দ্রাপীড়ের সহজ সখ্য-সম্পর্কের মধ্যে অন্য কোনও ভাবের বা সঙ্কটের কিছুমাত্র ইঙ্গিত করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ এ সমস্তই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তরুণ-তরুণীর এই অসামান্য সখ্যকে অস্বাভাবিক মনে করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"কাদম্বরী কাব্যের মধ্যে পত্রলেখা যে অপরূপ ভূখণ্ডের মধ্যে আছে, সেখানে ঈর্ষা সংশয় সঙ্কট বেদনা কিছুই নাই, তাহা স্বর্গের ন্যায় নিষ্কণ্টক অথচ সেখানে স্বর্গের অমৃত-বিন্দু কই?" তাঁহার মতে পত্রলেখাকে অপ্রশস্ত সখিত্বের গণ্ডির মধ্যে বসাইয়া তাহার নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তিকে অবরুদ্ধ করিয়া বাণভট্ট নাকি তাহার নারীত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই। এই গণ্ডির একটু

এ-দিকে বা ও-দিকে পা ফেলিলেই সঙ্কট কিন্তু সে সঙ্কটের কথা কোথাও নাই কেন—রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্নই উত্থাপন করিয়াছেন। বন্দিনী রাজকুমারীর চারিদিকে সখিত্বের পর্দা টানিয়া দিয়া তাহাকে বন্দিনী করিয়াই রাখা হইয়াছে, কোনও দিন কোনও "অসতর্ক বাতাসে এই সখিত্ব-পর্দার একটি প্রান্তও উড়িয়া পড়িলনা,"—ইহাই নাকি আশ্চর্য্যের বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ এ কথাও স্বীকার করিয়াছেন যে, পত্রলেখা পত্নী নয়, প্রণয়িনী নয়, কিঙ্করী নয়, কেবলমাত্র পুরুষের সহচরী। কিন্তু তিনি ভাবুকের ভাষায় প্রশ্ন করিয়াছেন— "এই প্রকার অপরূপ সখিত্ব দুই সমুদ্রের মধ্যবর্তী একটি বালুতটের মত, কেমন করিয়া তাহা রক্ষা পায়? নবযৌবন কুমার-কুমারীর মধ্যে অনাদিকালের যে চিরন্তন প্রবল আকর্ষণ আছে, তাহা দুই দিক হইতেই এই সঙ্কীর্ণ বাঁধটুকু ক্ষয় করিয়া লঙ্ঘন করে না কেন?" কিন্তু এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, বাণভট্ট পত্রলেখাকে পুরুষের অন্তরঙ্গ সহচরী ভিন্ন অন্য কোনও ভাবে অঙ্কিত করেন নাই, বা অন্য কোনও ভাবের অবতারণা করিয়া চরিত্রটির সহজ সঙ্গতি নষ্ট করেন নাই। পরস্পরের সাহচর্য্যের অন্তরালে যে "প্রণয়তৃষার্ত্ত বঞ্চিত একটি নারী হৃদয় রহিয়া গিয়াছে", তাহা রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু বাণভট্ট তাহার ইঙ্গিত মাত্রই করেন নি। আপত্তি সেখানে নয়, আপত্তি হইতেছে এই যে, নরনারীর এরূপ লজ্জাবোধহীন নিরবচ্ছিন্ন সখিসম্পর্কের চিত্র অস্বাভাবিক। বাণভট্ট যদি সংশয় বা সঙ্কটের লেশমাত্র অবকাশ দিতেন, তাহা হইলেই নাকি পত্রলেখার "নিগূঢ়তম" নারীত্বের সম্মান রক্ষা করিতেন; কারণ এই অপূর্ব্ব সম্বন্ধ-বন্ধন সুমধুর হইলেও ইহার মধ্যে নাকি "নারী-অধিকারের পূর্ণতা" নাই। তাই রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া কবিজনোচিত ভাষায় বলিয়াছেন—

"এই দুটি তরুণ-তরুণীর মধ্যে লজ্জা আশঙ্কা সন্দেহের দোদুল্যমান স্নিগ্ধ ছায়াটুকু পর্য্যন্ত নাই। পত্রলেখা তাহার অপূর্ব্ব সম্বন্ধবশতঃ অন্তঃপুর তো ত্যাগই করিয়াছে, কিন্তু স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সমীপবর্ত্তী হইলে স্বভাবতই যে সঙ্কোচে, সাবধানে, এমন কি সহাস্য ছলনায়, একটি লীলান্বিত কম্পমান মানসিক অন্তরাল বিরচিত হইতে পারে ইহাদের মধ্যে সেটুকুও হয় নাই।"

এ কথা স্বীকার করা যায় যে, নরনারীর নিবিড় ও একান্ত সম্পর্ক তাহাদের পরস্পরের প্রেমের মধ্যেই পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করে; কিন্তু এ কথা বলা যায় না যে, প্রণয়-সম্পর্ক ভিন্ন নরনারীর মধ্যে অন্য কোন ভাবপ্রধান সম্পর্ক থাকিতেই পারে না। অন্ততঃ বাণভট্ট এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। সংস্কৃত কবিরা প্রেমলীলা বর্ণনায় অফুরন্ত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন; এ বিষয়ে বাণভট্টের কৃতিত্বও কিছু কম নয়। মহাশ্বেতা ও কাদম্বরীর প্রেম-চিত্র সংস্কৃত-সাহিত্যেও অতুলনীয়। কিন্তু মহাশ্বেতা ও কাদম্বরীর চিত্রে বাণভট্ট যাহা দেখাইতে চাহিয়াছেন, পত্রলেখার চিত্রেও সেই ভাবের পুনরুক্তি, অথবা তাহারই অবস্থা-বৈচিত্র্য আঁকিবার চেষ্টা করেন নাই। প্রেমের সম্বন্ধ ভিন্নও নারী যে পুরুষের সঙ্গিনী হইতে পারে—অপূর্ব্ব হইলেও এ সম্পর্ক অসত্য নয় এই কথাই খুব সহজ ও সবলভাবে পত্রলেখার চরিত্র-চিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তরুণ-তরুণীর এরূপ সম্বন্ধ-সূত্র অনন্যসাধারণ সত্য, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়, তাই কোথাও কোন অবস্থার টানে তাহা মুহূর্ত্তের জন্যেও ছিন্ন হয় নাই। চন্দ্রাপীড়ের মনে ও জীবনে পত্রলেখা যে সহজ ও স্পষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা সীমাবদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু সীমার মধ্যে অসীম স্নেহ ও সেবার অবকাশ ছিল। এ স্থান পত্রলেখার নিজস্ব, তাই কাদম্বরীর আগমনেও অব্যাহত। পত্রলেখার

আভিজাত্য বিনয় ও শালীনতার উল্লেখ বাণভট্ট প্রথম হইতেই করিয়াছেন, সুতরাং চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গে তাহার সেবারস-সমুপজাত সৌহার্দ্দ কোনও নিরর্থক লজ্জাবোধ বা সঙ্কোচের দ্বারা পীড়িত নয়, অথবা অযথা আকাঙ্ক্ষায় ও সংশয়ে সঙ্কটাপন্ন হয় নাই। এই সেবা, সান্নিধ্য ও সখিত্ব প্রেমের লীলায় লালায়িত না হইতে পারে, কিন্তু প্রীতির মাধুর্য্যে মহিমান্বিত। অন্তঃপুর-বিচ্যুতা হইলেও পুরুষের সাহচর্য্যে অন্তঃপুরিকা পত্রলেখা কোথাও পুরুষ-ভাবাপন্ন হয় নাই। সুতরাং, পত্রলেখাকে উপেক্ষিতা হতভাগিনী বলিয়া, অনুকম্পার পাত্রী করিবার কিছুমাত্র অবকাশ বাণভট্ট কোথাও দেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, বাণভট্টের দৃষ্টি কাদম্বরী ও মহাশ্বেতার উপরেই নিবদ্ধ, তাই পত্রলেখার হৃদয়ের নিগূঢ়তম কথা তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন। এরূপ কল্পনা করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই, এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে পত্রলেখার অক্ষত চিত্তে কেবল বাধাহীন স্নেহ ছিল, কোন বেদনার আভাসমাত্রও ছিল না। যে নিরাকুল মনোভাবের মধ্যে স্বভাবতই কোন সমস্যা নাই, সেখানে কেন সমস্যার অবতারণা করা হয় নাই—এই আক্ষেপের কোন অর্থ হয় না। যে হিসাবে রামায়ণের ঊর্ম্মিলা অথবা শকুন্তলা নাটকের অনুসূয়া ও প্রিয়ম্বদা কাব্য-পরিত্যক্তা বা উপেক্ষিতা, পত্রলেখাকে সে হিসাবে ধরা যায় না। ঊর্ম্মিলাকে আমরা কেবলমাত্র একবার দেখি বিদেহ-নগরের বিবাহ-সভায়; বাল্মীকি তাঁহার সমস্ত কাব্যের মধ্যে আর তাহার উল্লেখ করেন নাই; অথচ লক্ষ্মণের আত্মত্যাগের পার্শ্বে ঊর্ম্মিলার আত্মত্যাগের কি কোন মাত্রা বা মূল্য নাই? কিন্তু বাণভট্ট পত্রলেখাকে কোথাও বিস্মৃত হইয়া আড়াল করিয়া রাখেন নাই। সহজ স্নিগ্ধ সেবার আবরণে, আলোবাতাসের মত, পত্রলেখা চন্দ্রাপীড়ের অন্তর-অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছিল, অলক্ষ্য হইলেও তাহা লক্ষ্যের বহির্ভূত নয়। শকুন্তলার দুইটি তাপসী সখী তাহার মুখ-সৌন্দর্য্য বা গৌরব-গরিমা বৃদ্ধি করিবার জন্য কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু কাদম্বরীর জন্য পত্রলেখা সে ভাবে সৃষ্ট হয় নাই। পত্রলেখা আপন গৌরবে ও নিজস্ব স্থানে স্বপ্রতিষ্ঠ, এবং এই প্রতিষ্ঠা কাব্যের শেষ পর্য্যন্ত রক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের মনে হয়, পত্রলেখা কাব্যের উপেক্ষিতা নয়। কাদম্বরী ও মহাশ্বেতার অনুরাগ ও বেদনারঞ্জিত চিত্রের পার্শ্বেও পত্রলেখার স্বচ্ছ সহজ চিত্র নিষ্প্রভ হয় নাই, তাহা আপন মহিমায় আপনি পরিপূর্ণ।*

*ঢাকা বেতারকেন্দ্রের সৌজন্যে।

চিত্র ও চিত্রকর

শ্রীধীরানন্দ ভট্টাচার্য্য

তুলির কোমল টানে এঁকে মূর্ত্তি এক,
চিত্রকর চিত্রে বলে—"দেবি, চেয়ে দেখ।"
সারাদিন চিত্রকর বসে মূর্ত্তি পাশে,
হাতে গড়া মূক মূর্ত্তি তবু নাহি হাসে।
অন্তর্য্যামী হেসে কয়—"ওরে মূক ছবি,
অন্তরে দেবীরে আঁক কথা যদি কবি।"

অগ্নিশুদ্ধি

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস্

দুজনে দেখা। নদীর পুলিনে নয়, সমুদ্রসৈকতে নয়, কুঞ্জবনে নয়, গ্রামের প্রান্তরে।

গিরিবালা নিশিকান্তের বোন। বয়স হবে তার বছর কুড়ি। সে বালবিধবা। ভাগ্য তার প্রতি বিরূপ হলেও প্রকৃতি তার দেহকে উপেক্ষা করেনি। ভরা যৌবনের বন্যা তার দেহকে সুন্দর সুঠাম করে গড়ে তুলেছে। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ীর সহিত সম্পর্ক তার বিচ্ছিন্ন। তবু তার আশ্রয়ের অভাব হয়নি। ভায়ের সে অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী। বাড়া তাদের গ্রামের একেবারে উত্তর প্রান্তে, তার পরে ফাঁকা মাঠ। গ্রাম ঘন বসতিপূর্ণ। লাগালাগি দক্ষিণে সরাসরি অনেকগুলি বাড়ী চলে গিয়েছে। গ্রামের রাস্তা উত্তর বেয়ে মাঠ পেরিয়ে জেলা বোর্ডের রাস্তার সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

গিরিবালা গিয়েছিল তাদের একটা হারানো বাছুরের খোঁজে উত্তরের মাঠে। সেখানে দেখা তার শশীমোহনের সঙ্গে।

শশীমোহন গ্রামের প্রধান ব্যক্তি। অবস্থা বেশ ভালই। গ্রাম সম্মান প্রতিপত্তি তার প্রচুর। বয়স, যৌবন পার হয়ে প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় গিয়ে ঠেকেছে। বাড়ীতে বর্দ্ধিষ্ণু সংসার, স্ত্রী, পুত্র, কন্যানিলে বেশ মশগুল।

বয়সে ভাঁটা পড়লেও শশীমোহনের যৌবনসুলভ চাঞ্চল্য তখনও কাটেনি। বিশেষত গ্রামে বিধবা যুবতীর অবস্থিতি মাত্রই তাকে তার ইন্ধন যুগিয়েছে। গিরিবালার প্রতি আকৃষ্ট সে পূর্ব্বেই হয়েছে এবং তাকে জয় করবার কলা কৌশল অবলম্বন করতেও ছাড়েনি। কিন্তু ভাগ্যের প্রতিকূলতায় গিরিবালার তরফ হতে সে কোনরূপ উৎসাহ পায়নি। তবে সম্পূর্ণ হতাশ সে এখনও হয়নি।

এ হেন শশীমোহনের সঙ্গে গিরিবালার দেখা। সময়টা ঠিক অনুকূল নয়, দুপুর বেলা, কালটাও বসন্ত নয়, ভরা শীতকাল; তবুত প্রান্তর নির্জ্জন। তৃতীয় ব্যক্তিটি নাই সাক্ষী দেবার। এহেন সুযোগ ভাগ্যবলে ঘটে।

সুতরাং শশীমোহন নিতান্ত উৎসাহিত হয়ে তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহারের চেষ্টা যে করেছিল তা অস্বাভাবিক নয়। সে প্রথমে কৌশলে গিরিবালার সহিত আলাপ সুরু করতে চেষ্টা করল।

কিন্তু গিরিবালা কোন দিন তাকে আমল দেয় নি, আজও দিল না। শশীমোহনের সন্নিধি অনুভব করেই সে নিজের বেশ সংযত করতে প্রবৃত্ত হল। শশীভূষণ নিকটবর্ত্তী হয়ে যখন সুরু করলে কথা—সে রইল নিরুত্তর। তার দিক হতে কথার চেষ্টা যেমন বাড়তে লাগল, গিরিবালার ঘোমটার পরিমাপও তেমন দীর্ঘ হতে লাগল।

এমন ভাবেই তারা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হয়েছিল। হঠাৎ অধীর হয়ে শশীমোহন করে বসল একটা অদ্ভুত কাণ্ড। সে দুইহাত বিস্তার করে গিরিবালার পথ রোধ করে দাঁড়াল।

এবার মূক গিরিবালার মুখ ফুটল। সে বলে উঠল, বয়স ত অনেক হয়েছে আপনার। এ রসিকতা করতে আপনার লজ্জা করে না।

একথা শশীমোহনকে যেন কষাঘাত করল। তার ভীষণ অপমান বোধ হল। হবেই ত, গ্রামের অন্তর

একটা গণ্যমান্য লোক সে, আর গিরিবালা এইত একটা অসহায় বিধবা। একটা ভীষণ বিদ্বেষ ভাব, একটা প্রচণ্ড প্রতিহিংসাস্পৃহা তার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করল। সে পথ ছাড়ল; কিন্তু বেশ একটু তিক্ততা মিশিয়ে জবাব দিল, ভারি যে তোর দেমাক। তবু যদি সতী হতিস্।

শশীমোহনের এই শ্লেষের পেছনে ছোট একটি ইতিহাস আছে। বাস্তবিকই গিরিবালা সতীত্বের শুষ্ক গৌরব নিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে প্রস্তুত ছিল না। তার সতেজ মন বৈধব্যকে অখণ্ডনীয় ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করতে পারেনি। সে জীবনের নিঃসঙ্গতা খণ্ডনের জন্য দোসর খুঁজেছিল এবং ভাগ্য জুটিয়েও ছিল তার জন্য এমন একটী লোক। সে পাশের গ্রামের ছেলে নবীন। শশীমোহন বিচক্ষণ লোক। কর্ম্মক্ষেত্রে বলীয়ান্ প্রতিদ্বন্দ্বীর অস্তিত্ব তার সজাগ মন আন্দাজ করে নিয়েছিল। এবং তার অনুসন্ধানী দৃষ্টি বার করে ফেলেছিল কে তার সেই প্রতিদ্বন্দ্বী।

সুতরাং গিরিবালার এই রূঢ় আচরণ তার মনে দুই কারণে বিশেষ দুঃখ দিয়েছিল। প্রথম কারণ তার প্রেম নিবেদনে সাড়া দেবার পরিবর্ত্তে গিরিবালার রূঢ় প্রত্যাখ্যান। দ্বিতীয় কারণ, এক যুবক প্রতিদ্বন্দ্বীর অস্তিত্ব জ্ঞান। সুতরাং যে পরিমাণে তার অন্তরের জ্বালা পরিবর্দ্ধিত হয়েছিল সেই পরিমাণে গিরিবালার প্রতি তার বিদ্বেষভাব প্রজ্জ্বলিত হল। দুঃখে রাগে অভিমানে সে মনে মনে একটা প্রচণ্ড প্রতিজ্ঞা করে বসল যে গিরিবালাকে সে একটা রীতিমত শিক্ষা দেবে।

প্রবীণ শশীমোহন বৈষয়িক লোক। সংসারের ঘূর্ণা-চক্রে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে নাড়াচাড়া করে করে সে রীতিমত হাত পাকিয়েছে। কুবুদ্ধি মাথায় রাখে সে প্রচুর। গিরিবালার পরম দুর্ভাগ্য যে সে এ হেন শক্তিশালী মানুষের বিদ্বেষবহ্নি জ্বালিয়েছে। একদিকে ওই সামান্য সহায়হীন মেয়ে, অপর দিকে প্রবল শত্রু। সুতরাং শীঘ্রই যে তার ফল ফলতে সুরু হল, তা আর বিচিত্র কি?

শশীমোহন গ্রামের মোড়ল। তার ব্যবস্থায় গ্রামের মাতব্বরদের নিয়ে এক বৈঠক আহ্বান করা হল। তাতে গিরিবালার ভাই নিশিকান্তের ডাক পড়ল।

বিচারের বিষয় গিরিবালার অবৈধ প্রণয়। শশীর চক্রান্তে মানুষের অভাব হল না সাক্ষ্য দিতে যে নবীনকে আর গিরিবালাকে নির্জ্জনে কোনদিন একত্র দেখা গিয়েছে। এই বিষয়কে অবলম্বন করে সুরু হল শশীমোহনের তীব্র বক্তৃতা। অবৈধ প্রণয়, ব্যভিচার, সমাজশৃঙ্খলা প্রভৃতি বড় বড় কথার সে প্রয়োগ করল, আর অতি সারগর্ভ ভাষায় বুঝিয়ে দিল, সমাজকে ব্যভিচার হতে মুক্ত রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা।

কিন্তু হায়রে শশীমোহন কেন যে আজ সমাজে দুর্নীতি দমন করতে এমন করে উঠে পড়ে লেগেছে, সে রহস্যটা বিচারকদের কর্ণগোচর হল না। আর কর্ণগোচর করবেই বা কে? নিশিকান্ত ত তার কিছুই খবর রাখে না আর গিরিবালারও তেমন সুযোগ নাই যে সেই বৈঠকে সে রহস্য প্রকাশ করে দেবার অনুমতি সে পায়। আর অনুমতি পেলেও গরজও যে তার এমন কিছু ছিল, তাও নয়।

সুতরাং বক্তৃতা করে শশীমোহনের দু রকম লাভ হল। দুর্নীতির প্রতি রোষজ্ঞাপন তার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করল, অপর পক্ষে সকলেই এই সিদ্ধান্তে মত দিল যে এই দুর্নীতি দমনের ব্যবস্থা করতেই হবে।

সঙ্গে সঙ্গে দমনের জন্য যে ব্যবস্থা পেশ হল, তা বড় কঠিন। প্রস্তাব হল গিরিবালাকে গ্রাম হতে নির্ব্বাসন দণ্ড দিতে হবে। সোজাসোজি এই কঠোর ব্যবস্থায়

যেটুকু গররাজি ভাবের লক্ষণ কারও কারও আচরণে দেখা গিয়েছিল, তাকে আয়ত্তে আনতে শশীমোহনের বেশী বেগ পেতে হল না। আরও দুচারটা ওজস্বী কথার প্রয়োগের ফলে সে বিধান সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। সমাজ-দেহের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এ ব্যবস্থা কঠোর হলেও অবশ্য প্রয়োজ্য, এ যুক্তি সকলকে স্বীকার করতেই হল।

কিন্তু বাধা এল এমন দিক হতে যে বিষয় শশীমোহন আদৌ কোন আশঙ্কা পোষণ করেনি। গিরিবালা নিশিকান্তের একমাত্র ভগিনী। সংসারে তাদের কারও আর কোন আকর্ষণ নাই। ছোট বোনটি তার অতিশয় আদরের বস্তু।

সে গিরিবালার প্রণয়কাহিনী বিশ্বাস করতেই চাইল না। যদি বা তা সত্য হয় এবিষয় সে নিশ্চিত যে সে বোনকে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারবে না। সুতরাং সে বেশ বেপরোয়া ভাবে মাতব্বরদের জানিয়ে দিলে যে সে হুকুম তামিল করতে কিছুমাত্র প্রস্তুত নয়।

এমন কি শশীমোহনের তর্জনগর্জনও তার প্রতিজ্ঞাকে কিছুমাত্র টলাতে পারলে না। নিষ্ফল আক্রোশে সে তখন শাসাল, দেখে নেব।

শশীমোহনের এই শাসনবাণী সক্রিয় হবার লক্ষণ শীঘ্রই দেখা গেল। ভাই বোন এখন প্রায় একঘরে হয়ে গিয়েছে; অতি ভয়ে ভয়ে তাদের দিন কাটে। তাদের রাত্রিও কাটে সন্ত্রাসে। কি জানি গাঁয়ের মোড়লের রোষবহ্নি কোন দিন কি উৎপাতের ব্যবস্থা করে রাখে তাদের জন্য।

আশঙ্কা তাদের ভিত্তিহীন হয় নি। একদিন গভীর রাতে হঠাৎ তাদের ঘরের চালে আগুন দেখা গেল। তারা সজাগ ছিল তাই রক্ষা। ভাইবোনের মিলিত চেষ্টায় সে আগুন নিভে গেল। সুরুতেই ধরা পড়ে গিয়েছিল, তাই সহজে তাকে দমন করা সম্ভব হয়েছিল। রাত্রে তাদের যে কেউ সাহায্য করতে এল, তাও নয়; পরের দিন তাই নিয়ে যে গ্রামে কোন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল, তাও নয়।

বেশী দিন যায় নি। আবার একদিন গভীর রাত্রে তাদের ঘরের চালে আগুনের আবির্ভাব হল। ভাই বোন এখনও সজাগ; বরং বেশী রকম প্রস্তুত ছিল, কারণ বিপদ কি আকারে আসবে, সে সম্বন্ধে তাদের একটা অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছে। আবার সুরুতেই সংগ্রাম। ভাইবোনের চেষ্টায় এবারও বহ্নির পরাজয় সহজেই সংঘটিত হল।

এর পর অতি বড় মূর্খেরও এটা অনুমান করা কষ্টকর ছিল না যে এই অগ্ন্যুৎপাত আকস্মিক ব্যাপার নয়, এটা মানুষের ইচ্ছাকৃত কাজ এবং প্রেরণা জুগিয়েছে সেই বিধানদাতারা এবং তাদের নেতা শশীমোহন।

মানুষের দুষ্কর্ম যখন আর গোপন থাকে না, সে বেপরোয়া হয়ে যায়। দুকাণ কাটা গাঁয়ের মধ্য দিয়ে যেতে লজ্জা বোধ করে না। যখন শশীমোহন ও তার উৎসাহ-দাতারা দেখল যে তাদের কুকর্ম প্রকাশ হয়ে পড়েছে, তখন তারা অবলম্বন করল ভিন্ন পথ। বার বার পরিকল্পনার ব্যর্থতাও তাদের অত্যন্ত কোপাবিষ্ট করেছিল। কাজেই এবার লুকিয়ে নয়, প্রকাশ্যেই তারা নিশিকান্ত ও গিরিবালার শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা করল।

কয়েক দিন বাদে শশীমোহনের নেতৃত্বে কলেকজন বাছাই করা মাতব্বর নিশিকান্তর বাড়ী গিয়ে হাজির হল। তারা আস্ফালন করে জানিয়ে দিল যে আর তারা নিশিকান্তের অবাধ্যতা সহ্য করবে না। দুদিনের মধ্যে যদি তারা গ্রাম ছেড়ে না চলে যায়, তা হলে তারা বলপ্রয়োগে তাদের তাড়াবে।

এতগুলি মাতব্বরের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে, নিশিকান্তের এমন কি শক্তি আছে? কাজেই সে কোন জবাব দিতে পারল না, রইল

সম্পূর্ণ নিরুত্তর। তারা চলে গেলে ভাইবোন ভাবতে সুরু করল, কিন্তু কোন কিনারা পেল না।

অনেক ভেবে চিন্তা করে তারা অবশেষে ঠিক করল যে এক্ষেত্রে রণে ভঙ্গ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। ভিন্ন গ্রামে তাদের এক দূর সম্পর্কের ভাই ছিল। সেইখানেই যাওয়া তারা ঠিক করল। তাদের অন্ন যা কিছু পুঁজি তা বেঁধে নিয়ে তারা প্রস্তুত হতে লাগল। পুরানো গরুর গাড়ীটাকেও সারিয়ে ঠিক করে নিল।

কিন্তু তারা আদৌ কল্পনা করতে পারে নি যে সেই নীতিপরায়ণ বিধানদাতার দল, তাদের প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে বলেই সংকল্প করেছিল। তাই তৃতীয় দিন প্রাতে তারা যখন তাদের বাড়ীতে এসে হাজির হল, তারা বেশ খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

তাদের হুকুম তামিল করা ছাড়া, তখন তাদের গত্যন্তর ছিল না। তারা তখনিকটা প্রস্তুত হয়েই ছিল। সব জিনিষ গাড়ীতে তুলতে দেবার মত ধৈর্য্য অপরপক্ষের ছিল না। তার আগেই তারা দিল নিশিকান্তের ঘরের চালে আগুন লাগিয়ে। কি উল্লাস তাদের। এবার আর আগুনকে নির্বাপিত করে কে? ধর্ম্মপরায়ণ সমাজনেতা শশীমোহন স্বয়ং সদলবলে তার রক্ষী। ধূমায়মান অগ্নি-কুণ্ডলী তাদের বড় সাধের ঘরখানিকে ভস্মসাৎ করবার পূর্ব্বেই নিশিকান্ত ও গিরিবালা তাদের গাড়ী নিয়ে অগত্যা সেখান হতে সরে পড়ল।

বিশ্বের যিনি বিধানদাতা তিনি কিন্তু স্বতন্ত্র বিধান করলেন।

ইন্ধন পেয়ে আগুন ক্রমে পরিপুষ্ট হল। উত্তর হতে বাতাস উঠে তার সহায়তা করল। তখন আগুন যে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করে দিল তার পরিণাম মাতব্বরদের কল্পনাতীত। নিশিকান্তের বাড়ীকে উদরসাৎ করে সে আগুনের ক্ষুধা নির্বাপিত হল না। বাড়ী হতে বাড়ীতে লাফিয়ে তা ক্রমশ দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়ল। কি হতে চলেছে এবং তার কি প্রতিবিধান করতে হবে, তা ঠিক করবার মত মনের অবস্থা ফিরে পাবার পূর্ব্বেই সে বিধানদাতারা দেখলেন যে গ্রামের সবগুলি বাড়ীই ভস্মসাৎ হয়ে গিয়েছে। আগুন কোনটিকে উপেক্ষা করেনি।

গান

শ্রীভোলানাথ দাশ

মোদের মনের দেবতা জাগ হে
আজ মরণ-নদীর পারে,
পাষাণ দেবতা ঘুমায়ে রয়েছে
আর জাগিবে না রে।
মোদের হৃদয় কমলাসনে
যে দেবতা আছে আনমনে
জাগাও শুধু তারেই আজ—
মোদের ঘরে ঘরে।

আজ যত ভাই বোন[illegible]
জাগো রে দুই বাহু তুলি'
মরণ-দুয়ার ধর আগুলি'
নব দেবতার তরে।
আজ বাঁধন খুলে সব ছুটে আয়,
মোদের দেবতা ধুলায় গড়ায়;
পাষাণ-দেবতা আসিবে না
আর বাঁচাতে রে।

বাঁচিতে হবে, বাঁচাতে হবে
মোদের প্রাণের দেবতারে॥

সাধু রামতনু লাহিড়ী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন বি-এ

৫৬ কি ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে, কলিকাতায় এখন যেখানে কলেজষ্ট্রীট মার্কেট, ঐখানে ৮২ নং কলেজষ্ট্রীট বাটীতে একটী বোর্ডিং ছিল। আমি কিছুদিন সেখানে বোর্ডার ছিলাম। আফিসের কর্ম্মচারী, ব্যবসায়ী, কলেজ এবং স্কুলের ছাত্র প্রভৃতি নানাশ্রেণীর লোক সেখানে থাকিতেন, তন্মধ্যে উড়িষ্যা এবং আসাম নিবাসী কয়েক জনও ছিলেন। উত্তরকালে ইঁহাদের কেহ কেহ কর্ম্মজীবনে যথেষ্ট খ্যাতি এবং সাফল্য অর্জ্জন করেন। তন্মধ্যে একটী বিশিষ্ট নামের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি অধুনা স্বর্গগত হোমিওপ্যাথিক ঔষধব্যবসায়ী দানবীর, ঋষিপ্রতিম, মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বোর্ডিংএ আমি অনেক সময় তাঁহার ঘরে তাঁহার কাছে কাটাইতাম। একদিন সন্ধ্যার পরে বাসায় ফিরিয়াই তাঁহার ঘরে যাইয়া শুনিলাম যে তাঁহার ঘরের পাশের ঘরেই একজনের কলেরা হইয়াছে, অবস্থা খারাপের দিকে। শুনিয়াই সেই ঘরের দ্বারের কাছে গেলাম, কিন্তু প্রবেশ করিতে পারিলাম না। যিনি শুশ্রূষা করিতেছিলেন, তিনি হাত নাড়াইয়া নির্ব্বাক ইসারায় ঘরে ঢুকিতে নিষেধ জানাইলেন। তিনি ল্যাভেণ্ডার মাখা একখানা রুমালে নাক ঢাকিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে রোগীর বমি এবং মল নিজ হাতে সরাইতে ছিলেন এবং গুন্ গুন্ করিয়া "তোমারি কথায়, তোমারি সেবায় যার প্রাণ যায়, সেই প্রাণ পায়" ব্রহ্মসঙ্গীতটী গাহিতে ছিলেন। তাঁহার চমৎকার চেহারায় আমি আকৃষ্ট হইলাম। তাঁহার লম্বা চওড়া গৌরকান্তি দেহ, মুখে দাড়ী গোঁফ চক্ষে প্রসন্নদৃষ্টি। কখনও দুহাতে মল বমি সরাইতেছেন, কখনও হাতপাখায় রোগীকে বাতাস করিতেছেন। মুখে গান লাগিয়াই আছে। তাঁহাকে মহেশ বাবুর প্রায় সমবয়সী বলিয়া মনে হইয়াছিল। এই মহাশয় ব্যক্তিটীর মধ্যে একটু উৎকেন্দ্রিক পাগলাটেভাব লক্ষ্য করিয়াছিলাম। যাইয়া মহেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম উনি কে? তিনি বলিলেন যে উনি সুপ্রসিদ্ধ ভগবৎভক্ত ব্রাহ্মসাধু রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্র, নাম বসন্তকুমার। রোগী সারিয়া উঠিলেন। বসন্ত বাবুর সঙ্গে পরিচিত হইলাম এবং আমাদের দুইজনের মধ্যে অন্তরঙ্গতা জন্মিয়া গেল।

একদিন বসন্তকুমার আসিয়া আমাকে বলিলেন তাঁহার পিতা আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন। সাধু রামতনু তখন প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধ। তিনি তখন ঝামাপুকুরে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতেন। জীবনে পুনঃ পুনঃ বহু পারিবারিক বিপৎপাতে, মনে না হইলেও দেহে, তিনি অথর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি উজ্জ্বল গৌরকান্তি সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। তাঁহার তুষারশুভ্র কেশশ্মশ্রু আনন্দোজ্জ্বল শান্ত সমাহিত মূর্ত্তি দেখিয়া প্রাচীন ভারতের ঋষিমুনিদের মানসী মূর্ত্তি আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তখন তিনি ঘরেই থাকিতেন এবং ভগবদ্ধ্যানেই সময় কাটাইতেন। একমাত্র ১লা জুন তারিখে কলেজস্কোয়ারে, তাঁর কৈশোরের শিক্ষাগুরু, বাঙ্গালীর অকৃত্রিম বন্ধু মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের সমাধিমূলে যে স্মৃতিসভা হইত, অতিকষ্টে পাল্‌কী করিয়া তিনি সেই সভায় উপস্থিত হইতেন এবং গললগ্নবস্ত্র হইয়া নিকটস্থ একখানি বেঞ্চের উপরে বসিয়া থাকিতেন। ইহা ছাড়া বাড়ীর

বাহিরে আর কোথাও, এমনকি উপাসনা মন্দিরেও, আমি তাঁহাকে কখনও দেখিতে পাই নাই। বসন্তকুমার আমাকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া পরিচয় দিতেই আমি তাঁর পদধূলি লইলাম। তিনি পরম সমাদরে আমাকে কাছে বসাইয়া আমার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। সেই পুণ্যস্পর্শানুভূতির গভীর আনন্দে আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়াছিল, আমি কাঁপিয়া উঠিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—ওকি? কিন্তু আমি কোন জবাব দিতে পারি নাই। তিনি তখন আমাকে লেখাপড়া এবং ঈশ্বরবিশ্বাস প্রভৃতি বিষয়ে কিছু কিছু বলিয়া বসন্ত বাবুকে আদেশ করিতেই তিনি একখানি প্রকাণ্ড কাগজের খাতা আনিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন এবং তাহাতে আমার নাম, ধাম, ঠিকানা এবং অন্যান্য সমস্ত জ্ঞাতব্য পরিচয় লিখিয়া দিতে বলিলেন,—উদ্দেশ্য সাধু রামতনু উহা দেখিয়া সেইদিন আমার, এবং যাহারা আমার, তাহাদের সকলের দেহ, মন ও আত্মার কল্যাণে বিশেষভাবে ভগবৎকরুণা ভিক্ষা করিয়া উপাসনা করিবেন। যাঁহারাই তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাত করিতে যাইতেন, প্রথমদিন তাঁহাদের সকলের জন্যই এইরূপ করা, বোধহয় তাঁহার সাধনার একটী বিশিষ্ট অঙ্গস্বরূপ ছিল। আমি ঐ খাতায় আমার বলিবার মতন সকল কথাই লিখিয়া দিয়াছিলাম।

সাধু রামতনু সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিধি তাঁহার জীবনের শেষ ৬/৭ বৎসরে সীমাবদ্ধ। তাঁহার আদ্য এবং মধ্যজীবনের যাহা কিছু জানি তাহার কতক তাঁহার নিজ মুখে, কতক পুত্র শরৎকুমারের (প্রসিদ্ধ-পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক এস কে লাহিড়ী) মুখে এবং কতক বসন্তকুমারের মুখে শোনা। অবশিষ্ট যাহা কিছু জানি তাহা ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ" গ্রন্থে পড়িয়াছি।

শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ এক সময়ে রামতনুর পুণ্য চরিত্রের নৈতিক প্রভাবে কিরূপ প্রভাবিত হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য স্বর্গগত কবি দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের সুরধুনি কাব্য হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

"পরম ধার্ম্মিকবর এক মহাশয়
সত্যবিমণ্ডিত তাঁর কোমল হৃদয়,
সাংখ্যের পুত্তলিকা পরহিতে রত,
সুখ দুঃখ সমজ্ঞান ঋষিদের মত,
জিতেন্দ্রিয় বিজ্ঞতম বিশুদ্ধ বিশেষ,
রসনায় বিবর্জ্জিত ধর্ম্ম উপদেশ,
একদিন তাঁর কাছে করিলে যাপন,
দশদিন থাকে ভাল দুর্বিনীত মন,
বিদ্যাবিতরণে তিনি সদা হরষিত
তাঁর নাম রামতনু সকলে বিদিত"।

দীনবন্ধুর অমর লেখনী এই দশটী ছত্রে রামতনু চরিত্রের একটি পরিপূর্ণ, নিখুঁৎ ছবি অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রথম সাক্ষাতের শুভক্ষণে তাঁর সস্নেহ করস্পর্শ আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। তারপরে প্রায়ই আমি সেই স্পর্শ লাভের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিয়া তাঁহার নিকটে যাইতাম। সময় সময় দুই একজন বন্ধুকেও সঙ্গে লইতাম। তিনি ছিলেন বিনয় ও সৌজন্যের জীবন্ত মূর্ত্তি। তাঁহার বিনয়ের মধ্যে এক তিল ভেজাল ছিলনা। এমন শিশুজন-সুলভ সরলতা আর কোথাও দেখা যায় নাই। তিনি যখন তাঁর বাল্যের অতি নগণ্য ত্রুটি বিচ্যুতির কথাও বলিতেন, তখন একেবারে ধূলির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে চাহিতেন। আমাদের সামান্য একটী বিনয় বাক্য বা একটী শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার তাঁহাকে

বিচলিত করিত। তিনি বলিতেন—আঃ আপনারা কী বিনয়ী! আপনারা কী শ্রদ্ধাবান। আমি আপনাদের মতন এত ভাল ছিলাম না। একদিন যখন তিনি পুনঃ পুনঃ এইরূপে নিজের নিন্দা এবং আমাদের প্রশংসা করিতেছিলেন তখন একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বোধ হয় লাহিড়ী পরিবারের সহিত আত্মীয়তা ছিল। তিনি যেন একটু বিরক্তির ভান করিয়াই বলিয়া উঠিলেন —নাঃ, আপনার সঙ্গে আর পারা গেল না। কেবলই ঐ এককথা—আমি আগে ছিলাম অতি মন্দ, আমি আগে ছিলাম Spoilt Child ইত্যাদি। তবে কি আপনি আমাদের বোঝাতে চান যে এখন আপনি একজন অত্যন্ত সাধু এবং আদর্শ-পুরুষ হয়ে বসেছেন? যেমনি এই বলা, অমনি সাধু বৃদ্ধের মুখ লাল হইয়া উঠিল, তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। ভদ্রলোকের একখানি হাত দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া অনুতপ্ত অপরাধীর মতন কাকুতি মিনতি করিয়া বলিতে লাগিলেন—না, না, আমি তা বোঝাতে চাই না, সত্যই বল্‌ছি, তুমি বিশ্বাস কর, আমি তা বোঝাতে চাই নাই, খালি বলেছি আমি প্রথম বয়সে মোটেই ভাল ছিলাম না, সত্যই ভাল ছিলাম না। ছি, ছি এখন আমি সাধু হয়েছি একথা কি আমি বল্‌তে পারি? ছি, ছি, তুমি অমন কেন ভাব্‌লে? তখন বিপন্ন ভদ্রলোক বহু অনুনয় বিনয় করিয়া অনেক চেষ্টায় হাত ছাড়াইয়া লইলেন।

মহতের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও অনুরাগ ছিল অসীম। তাঁহার কৈশোরের শিক্ষক মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার এবং অপর শিক্ষক মিষ্টার ডিরোজিওর প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতার অবধি ছিল না। তাঁহাদের কথা বলিতে গেলে ভাবাবেগে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিত। নিঃসম্বল দরিদ্র বালক রামতনু হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্তি হইবার জন্য প্রায় দুই মাস কাল কিভাবে তাঁর পালকীর পিছু পিছু 'স্তর আমি একটি গরীব ছেলে' বলিয়া পুনঃ পুনঃ ধ্বনি করিতে করিতে, কোন কোন দিন একেবারে অনাহারে ৭।৮ ঘণ্টা ধরিয়া ছুটিতেন, সে কাহিনী তাঁহার মুখে রূপকথার মতই শুনাইত।

রামতনুর প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন—রামগোপাল ঘোষ, যাহাকে তাঁহার অসাধারণ বাগ্মীতার জন্য সে সময়ে বাংলার ডিমস্থিনিস্ বলা হইত। এই রামগোপালের প্রশংসা করিতে তিনি পঞ্চমুখ হইতেন। সুপসিদ্ধ রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং রাজা দিগম্বর মিত্রের প্রসঙ্গও তিনি মধ্যে মধ্যে তুলিতেন। দিগম্বরের জননীদেবীর কাছে তিনি মাতৃস্নেহ পাইয়াছিলেন। পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার কতবড় প্রিয়পাত্র ছিলেন, সে কথা পরে বলিব। অসাক্ষাতে কারও সম্বন্ধে কোন অপ্রিয় প্রসঙ্গ তোলা, রামতনু অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন। ঋষি রাজনারায়ণ আমাকে বলিয়াছিলেন যে রামতনু ছিলেন বিধাতার এক অদ্ভুত সৃষ্টি। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে চেষ্টার দ্বারা, সাধনার দ্বারা, অনেক কিছুই হওয়া যায়, কিন্তু রামতনু হওয়া যায় না। এমন আজীবন অপাপবিদ্ধ সংসারী জগতে সুদুর্লভ।

একদিন ভোরে ঘুম হইতে উঠিয়াই রামতনু বাবুর পদধূলি পাইবার ইচ্ছা হইল। হাতমুখ ধুইয়াই তাঁহার কাছে চলিয়া গেলাম। যাইয়া দেখি তিনি বাসার প্রাঙ্গণে দুই তিনটী শিশু নাতি লইয়া বসিয়াছেন। তাঁহার পদধূলি লইয়া আমি তাঁহার কাছেই বসিলাম। তখন তাঁহার চা খাওয়ার সময়। একজন চাকর ট্রেতে করিয়া চা, দুধ, চিনি প্রভৃতি সম্মুখে রাখিয়া গেল। তিনি চামচে করিয়া চিনি তুলিয়া চায়ে মিশাইবার সময়ে একটু চিনি নীচে পড়িয়া গেল। প্রথম তিনি ঐ পতিত চিনিটুকু দুই আঙ্গুলে টিপিয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সমস্তটুকু নিঃশেষে তুলিতে

না পারিয়া পরে তর্জ্জনী চায়ে ডুবাইয়া ভিজা আঙ্গুলের দ্বারা চিনিটুকু তুলিয়া চাবে মিশাইলেন। তখন তাঁহার বড নাতিটী বলিয়া উঠিল—ছি ছি দাদা, তোমার যে কী হয়েছে। ঐ একরতি চিনি অমন করে না তুললেই কি আর চল্‌তো না? তখন রামতনু বাবু বলিলেন—দাদা, অমন কথা বল্‌তে নেই। ওরে, **এমন যে মানুষ** বিধাতার সৃষ্টিতে যার তুলনা নাই, তার একবিন্দু পরিশ্রমও যাতে ব্যয় হয়েছে, তাকে কি অবহেলা করা যায়? ঐ এমন যে মানুষ কথাটী উচ্চারণ করিবার সময়ে তার সমস্ত হৃদয়ের প্রীতিরস যেন উথলিয়া উঠিয়াছিল বলিয়া আমার মনে হইল। এ ত বরেণ্য কবি চণ্ডীদাসের সেই অমৃত বাণীরই সক্রিয় পুনরাবৃত্তি।

"শুনরে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই"।

আর একদিন আমি এবং আরও দুই একজন লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে বসিয়া আছি, এমন সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় সেখানে আসিলেন এবং একেবারে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া রামতনু বাবুকে প্রণিপাত করিতে লাগিলেন। রামতনু বাবু অত্যন্ত বিব্রত হইয়া বলিতে লাগিলেন—ও শম্ভু তুমি ওঠ, তুমি ওঠ; ভাই অমন করে কি মাটীতে লুটাতে আছে? কথিত আছে যে এই শম্ভুচন্দ্রেরই বিবাহে জননী দেবীর আহ্বানে, যথাসময়ে গৃহে পৌঁছিবার ব্যাকুলতায়, দুর্যোগের জন্য খেয়ানৌকা না পাইয়া, "বীরসিংহের সিংহশিশু বিদ্যাসাগর বীর" ঝটিকাবিক্ষুব্ধ রূপনারায়ণ বক্ষে সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। শম্ভুচন্দ্র উঠিলে লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার মাথায় এবং সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় তখন তাঁহার রচিত একখণ্ড 'চরিতমালা' গ্রন্থ বাবুর পদতলে উপহার স্বরূপ রাখিলেন। পুস্তকের উপরে রামতনু নামের সঙ্গে এত সব সম্ভব ও অসম্ভব বিশেষণ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছিল যে তাহা স্মরণ রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। উহা দেখিয়া লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন—শম্ভু, এত সব এ লিখেছ কি? বিদ্যারত্ন বলিলেন—আপনি যখন বিদ্যাসাগরেরও গুরু, তখন কোন বিশেষণই আপনার প্রতি অতিশয়োক্তি হতে পারে না। আমাদের দিকে চাহিয়া শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, দেখুন, দুনিয়ার লোক জানে বিদ্যাসাগর ভুত রক্তে কাহারও তোয়াক্কা রাখিতেন না, কথাটা সত্য হইলেও ষোল আনা সত্য নয়। দাদা মাত্র একজনের তোয়াক্কা রাখিতেন, তিনি এই মহাপুরুষ। বিদ্যাসাগর এঁর অনুমতি ও পরামর্শ ব্যতীত কোন বড় কাজেই হস্তক্ষেপ করিতেন না। লাহিড়ী মহাশয় তখন অত্যন্ত অস্বস্তির ভাবে ব্যাকুলকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—ও শম্ভু, তুমি অমন কথা বোলো না, বোলো না, বোলো না। আমি বিদ্যাসাগরের গোলাম, তুমি তোমার গোলাম, বিদ্যাসাগরের যে যেখানে আছে আমি তাদের সকলের গোলাম। বিদ্যারত্ন তাঁর চরিত-মালায় রামতনুচরিত লিখিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিন অনুমতি পাইযাছিলেন কিনা আমার স্মরণ নাই।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার আর একজন অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। আমি একদিন রামতনু বাবুকে বলিলাম—আপনাকে সকলেই দেখিতে চায়। পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয় যখন সভাসমিতিতে আপনার কথা বলেন, তখন সমস্ত লোক মন্ত্র-মুগ্ধের মতন শোনেন। তখন তিনি বলিলেন—ওটা আলোর রং নয়, ওটা লণ্ঠনের রঙ্গীণ কাচের রং। শিবনাথের মুখে আমারও রং বদলাইয়া যায়। সে ত আমার বাহিরটাই দেখিয়াছে, অন্তর ত দেখে নাই, শিবনাথ নিজে মহৎ তাই আমাতেও সে মহত্ত্ব

দেখিতে পায়। শিবনাথ বাবুর মুখে ভগবদুপাসনা শুনিয়া তিনি একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। সময় সময় উপাসনাস্থান হইতে অস্থির হইয়া উঠিয়া পড়িতেন এবং হাঁটুতে ভর করিয়া উঁচু হইয়া সারা ঘরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন আর বলিতেন,—আহা, শিবনাথ কী কথাই বল্লেন, কী কথাই বল্লেন।

ঈশ্বরের মঙ্গল বিধানে অটল বিশ্বাসী সাধু রামতনু শোক জয় করিয়া অশোক হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়া কন্যা ইন্দুমতী যক্ষ্মারোগাক্রান্ত জ্যেষ্ঠ সহোদর নবকুমারের আপ্রাণ সেবা করিয়া ঐ নিদারুণ ব্যাধিতে ভ্রাতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই নিজে মৃত্যু বরণ করিলেন। সেবা ধর্ম্মে তিনি জন্মসিদ্ধা ছিলেন। একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে তিনি পিতাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন—বাবা এখন আমি যাই? পিতা শান্ত করুণ কণ্ঠে বলিলেন—হাঁ মা যাও। ইন্দুমতী তখন বক্ষোপরি হাত দুখানি রাখিয়া জগজ্জননীর শান্তিময় কোলে চিরকালের মতন ঘুমাইয়া পড়িলেন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে বিদেশ হইতে একজন আত্মীয় পত্রদ্বারা জানিতে চাহিলেন—ইন্দুমতী কেমন আছে? রামতনু জবাব দিলেন—ইন্দু এখন বেশ ভালই আছে। কি আশ্চর্য্য বিশ্বাস! সাধু রামতনুর ন্যায় ঈশ্বরের মঙ্গলরূপে যথার্থ বিশ্বাসী মহাজনেরা কখনই শোকসাগরে নামেন না।

নবকুমার মেডিকেল কলেজের একজন বিশিষ্ট প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন। পাস করিয়া বাহির হইবারও বেশী বিলম্ব ছিল না। তিনি একজন আদর্শ চরিত্রের অতি সুদর্শন যুবক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে 'বঙ্গবাসী' সম্পাদক লিখিয়াছিলেন যে নবকুমারের ন্যায় পুত্র ইন্দ্রও আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। নবকুমারকে বাঁচাইবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাই করা হইয়াছিল। কিন্তু সকল প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া তিনি ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন। যে দিন এই শোকাবহ ঘটনা ঘটিল, সপ্তাহের সেই দিনটিতে রামতনু বাবু তাঁহার কয়েকজন প্রিয় ছাত্র লইয়া এক সঙ্গতসভা করিতেন। ছাত্রেরা যথাসময়ে আসিয়া গুরুগৃহে উপস্থিত হইলেন। লাহিড়ী মহাশয় বাহিরে আসিয়া তাহাদিগকে বলিলেন—আমার একটা বড় ভুল হয়ে গেছে। তোমাদের সংবাদ দেওয়া আমার উচিত ছিল। তাঁহাকে একেবারে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখিয়া ছাত্রেরা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই! তিনি পুনরায় বলিলেন—তোমরা ঘরের ভিতরে যেও না, ওখানে নবকুমারের মৃতদেহ পড়ে আছে, দেখলে তোমাদের কষ্ট হবে। ছাত্রদের আর বাঙ্‌নিষ্পত্তির সাধ্য রহিল না।

একদিন আমি আমার আত্মীয় সুহৃদ সেনহাটী নিবাসী কুমুদবন্ধু দাশগুপ্ত মহাশয়কে (উত্তরকালে তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন) লইয়া রামতনু বাবুর কাছে যাই। যাইয়া আমরা দুজনেই তাঁহার পদধূলি লইলাম। কুমুদবাবু এন্ট্রান্‌স এবং এফ-এ দুই পরীক্ষাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া তখন ডবল অনার্‌স লইয়া বি-এ পড়িতে ছিলেন। এই পরিচয় পাইয়া তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি কুমুদকে বলিতে লাগিলেন—আপনি ত একজন রত্নতুল্য যুবক। আপনি না জানি কত কেতাবই পড়েছেন, কত জ্ঞানই অর্জ্জন করেছেন। তা নাহলে কি আর এত বিনয়ী হতে পারতেন? আপনি আমার পায়ের ধুলো নেওয়ায় আমার বড় লজ্জা হচ্ছে। আপনি নিশ্চয়ই একজন বড় লোক হবেন এবং দেশের অনেক উপকার করবেন। এর পরে কুমুদের একখানি হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—দেখুন, আপনার কাছে আমার একটী অনুরোধ আছে। যদি বলেন যে সে অনুরোধ আপনি রাখবেন, ত বলবো। কুমুদ

বলিলেন—মাথা আমার মাথায়ত্ত হ'লে আমি রাখতে চেষ্টা করবো। তখন লাহিড়ী মহাশয় পুনরায় বলিতে লাগিলেন—দেখুন, এ সংসারে যারা সুন্দর ও মেধাবী তাদের সকলেই ভালবাসে এবং আদর করে, কিন্তু যারা অল্পবুদ্ধি এবং যাদের চেহারা ভাল নয়, তাদের সকলেই অবহেলা করে। ওরা বড় দুঃখী। স্কুলের ঐরূপ ছাত্রদের আমি কাছে ডাকিয়া অনেক আদর করিতাম, তারা কাঁদিয়া ফেলিত। তাদের মানুষ করিয়া তুলিতে আমি একটু বেশী করিয়া চেষ্টা করিতাম। ঈশ্বরকৃপায় সে চেষ্টা নিষ্ফল হতো না আপনি যখন কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করবেন তখন যদি ঐ জাতীয় ছেলেদের প্রতি একটু সস্নেহ নজর রাখেন ত ঈশ্বর আপনার অনেক কল্যাণ করবেন। যখনই তাঁহার কাছে গিয়াছি তখনই তিনি এইরূপ নূতন কিছু না কিছু বলিয়া আমাদের চিন্তার খোরাক জোগাইয়াছেন।

সেকালের সাহেব-সুবোরাও রামতনুবাবুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি যখন ভাগলপুরে হেডমাষ্টার তখন সেখানকার কমিশনার সাহেব তাঁহাকে এক ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। মিষ্টার গ্রিমলে নামক একজন নবাগত যুবক সিভিলিয়ানও সেই ভোজে উপস্থিত ছিলেন। (এই গ্রিমলে পরে বাংলার রেভিনিউ বোর্ডের সিনিয়র মেম্বার হইয়াছিলেন।) আহারের সময়ে যুবক গ্রিমলে বাংলাদেশ এবং বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে একটা ঘৃণাব্যঞ্জক মন্তব্য করায়, রামতনু বাবু তৎক্ষণাৎ খাওয়া বন্ধ করিয়া উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিলে কমিশনার সাহেব অনেক বলিয়া কহিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু রামতনু বাবুর আহত স্বদেশপ্রীতি এবং আত্মমর্য্যাদাবোধ তাহাতে শান্ত হইলনা। তিনি বলিলেন—যেখানে আমার স্বদেশ এবং স্বজাতির নিন্দা হয়, সেখানে বসিয়া আহার করিবার অপমান আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারি না। তখন অনন্যোপায় হইয়া কমিশনার সাহেব মিষ্টার গ্রিমলেকে লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে ক্ষমা চাহিতে বাধ্য করেন এবং রামতনু তখন ঐ যুবক সিভিলিয়ানের করমর্দ্দন করিয়া পুনরায় আহারে প্রবৃত্ত হন। বহু বৎসর পরে একদিন লাহিড়ী মহাশয় গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের সম্মুখে একখানি গাড়ীতে বসিয়া আছেন, এমন সময় একজন প্রবীনবয়সী ইংরাজ আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কি আমাকে চিনিতে পারেন? রামতনু বাবু জবাব দিলেন—না, চিনিতে পারিতেছিনা। তখন সাহেব বলিলেন আমি গ্রিমলে, এখন চিনিলেন কি? তখনও উত্তর হইল—না। মিষ্টার গ্রিমলে তখন ভাগলপুরের সেই অতীত কাহিনী স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন বহু কাল পরে আজ আপনাকে দেখিতে পাইয়া বড় আনন্দিত হইলাম। আপনিও শুনিয়া সুখী হইবেন যে, আমি এখন আপনার দেশ এবং জাতিকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছি। রামতনু বাবু তখন গাড়ী হইতে নামিয়া মিষ্টার গ্রিমলেকে আবেগভরে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়দিক হইতেই ঘটনাটী কী সুন্দর! কী হৃদয়গ্রাহী!

রামতনুর দ্বিতীয় পুত্র শরৎকুমার পুস্তকের ব্যবসায়ে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ পিতার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তিনি সর্ব্বদাই ব্যাকুল থাকিতেন। হ্যারিসন রোডে একটি রমণীয় বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া তিনি পিতৃদেবকে সেখানে আনিলেন। আমি তখন তাঁহার বাড়ীর সন্নিকটেই একটি বাড়ীতে থাকিতাম। এই বাড়ীটি হ্যারিসন রোড ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের সঙ্গমস্থলে বঅস্থিত ছিল।

একদিন ভোরে উঠিয়া শিয়ালদামুখী হাওয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইলাম একখানি খুব

সুন্দর অনাবৃত ল্যাণ্ডো গাড়ীতে চড়িয়া গেরুয়া-পরা একজন পরম সুন্দর বৃদ্ধ আসিতেছেন। নবোদিত সূর্য্যের প্রথম কিরণ পড়িয়া তাঁহার সুপ্রশস্ত ললাট উজ্জ্বল কাচ-খণ্ডের ন্যায় ঝলমল্ করিতেছে। আমার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে স্বয়ং মহর্ষিদেব সাধু রামতনুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন। এমন দুইজন নরদেবতার শুভমিলন দর্শন কদাচিৎ বহু ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। আমি অবিলম্বে শরৎবাবুর ভবনের দিকে ছুটিলাম। যাইয়া দেখিলাম, মহর্ষিদেবকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া শরৎকুমার এবং বসন্তকুমার দোতলার ঘরে তুলিতেছেন। সেই ঘরে দুই মহাজন মিলিত হইলেন। সে কী অপূর্ব্ব স্বর্গীয় দৃশ্য! মহর্ষিদেব অন্ধ-প্রায়, কানেও শোনেন না বলিলেই হয়, আবেগপূর্ণ স্পর্শের দ্বারা সাধু রামতনুকে প্রেম নিবেদন করিলেন। রামতনু তখন ভাবসাগরে নিমগ্ন। কথা কহিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিতেছেন বলিয়া মনে হইল। প্রায় রুদ্ধ-কণ্ঠেই আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন - দেখুন, আমরা সকলেই এঁকে মানি, কেননা, ইনি ভগবানকে মানেন। এই সামান্য কথা কয়টী বলিয়া তিনি আজ আবার আমাদিগকে নূতন চিন্তার খোরাক জোগাইলেন। কথা কয়টি বারবার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করিতে লাগিল। ভাবিলাম, ভগবানকে ত আমরাও মানি, তবে আমাদের কেহ মানে না কেন? আমরা কি তবে আত্মপ্রতারণা করিয়া চলিয়াছি? ঐ কথা কয়টি শোনার পরে অর্দ্ধ শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্তর হইতে এই মুহূর্ত্তেও ঐ প্রশ্নই উঠিতেছে। সদুত্তর কবে মিলিবে জানিনা। ব্রহ্মার্পিত প্রাণ এই দুই মহাপুরুষের ইহাই ইহলোকের শেষ মিলন। মহর্ষিদেব রামতনুবাবুকে বলিলেন—স্বর্গে দেবগণ তোমার জন্য অপেক্ষা করিতে-ছেন, তোমাকে তাঁহারা সাদরে গ্রহণ করিবেন। রামতনু গদগদস্বর হইয়া নমস্কার নিবেদন করিলেন। বিদায়কালে মহর্ষিদেব পুনরায় স্পর্শের ভাষায় সাধু রামতনুকে কি বলিয়া গেলেন তাহা আমরা জানি না। ইঁহাদের দুই জনেরই কালপূর্ণ হইতে আর বিশেষ বিলম্ব ছিল না। সে দিক দিয়া এই মিলন বিশেষ অর্থপূর্ণ বলিয়া মনে হইয়াছিল।

এই মিলনের অল্প পরেই লাহিড়ী মহাশয় কেমন করিয়া খাট হইতে পড়িয়া যাইয়া পা ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং অন্তিমশয্যা গ্রহণ করেন। সেই অবস্থায় একদিন একজন অধ্যাপক বন্ধুকে লইয়া তাঁহাকে দেখিতে যাই। তখন তাঁহার পূর্ণ চৈতন্য নাই এইরূপ মনে হওয়ায় আমরা তাঁহার পায়ের দিকে বসিয়াছিলাম। হঠাৎ তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণাব্যঞ্জক অস্বস্তির ভাবে ছট ফট্ করিতে লাগিলেন। তখন বাড়ীর একজন তাড়াতাড়ি আসিয়া মুখের কাছে কান রাখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অতি মৃদুস্বরে জানাইলেন যে আমরা তাঁহার পায়ের কাছে বসায় তিনি স্বস্তি পাইতেছেন না। আমরা তখন তাঁহাকে ভক্তি প্রণতি নিবেদন করিয়া বিদায় লইলাম। ইহাই তাঁহাকে তাঁহার জীবদ্দশায় আমার শেষ প্রণতি। ইহার পরে আর বেশিদিন তিনি এজগতে ছিলেন না। মানুষকে তিনি কতখানি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন সেদিনের ব্যবহারই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁহার স্বর্গারোহণের দিন আমি কলিকাতায় না থাকায় তাঁহার শবদেহ বহনের সৌভাগ্য আমার হয় নাই। এই সাধু মহাত্মা ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিয়াছিলেন। জীবনের সর্ব্ব কর্ম্মই ব্রহ্মকর্ম্ম জানিয়া ফলাফল ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া অতি শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিতেন।

উপনদী

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

(৯)

গভীর রাত্রে অকস্মাৎ অশোকের ঘুম ভাঙিয়া গেল।

—ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, অ ডাক্তারবাবু!!!

অশোক উঠিয়া আলো জ্বালিয়া দরজা খুলিতে একজন অপরিচিত গ্রাম্যলোক তাহার দু'পা জড়াইয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বিস্মিত অশোক এ দৃশ্যে হতভম্ব হইয়া গেল। ডাক্তারি পাশ করিয়া শহর হইতে সবে সে গ্রামে আসিয়াছে। গ্রাম্যজীবন সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে তাহার বিশেষ কোন ধারণা ছিল না। বাল্যকাল হইতেই সে শহরে লালিতপালিত। শিক্ষা-সংস্কৃতি যাহা কিছু তাহার তাহাও শহরের জীবন হইতে সে লাভ করিয়াছে। তবুও গ্রামের জীবনকে সে তাহার আদর্শ দিয়া অনুপ্রাণিত করিতে চায়—তাই স্বল্প বেতনে এই সামান্য চাকরিই সে গ্রহণ করিয়াছে। তাহার আত্মীয়-স্বজন বলিতে তেমন নিজের কেহ নাই—সংসারে সে বন্ধনহীন। মাতাপিতার মৃত্যুর পর শহরের বাড়ী ভাড়া দিয়া এখানে আসিয়াছে। জীবনের ব্রত তাহার—সাধ্যমত দেশের এবং দশের সেবা করিয়া জীবনকে তাহার সার্থক করিয়া তুলিবে।

এখানে আসিয়া অবধি সে গ্রামকে দেখিতে এবং চিনিতে চেষ্টা করিতেছে। শহরের জীবন-ধারার সহিত গ্রাম্য-জীবনের তফাৎ আছে। এখানকার রোগীরাও শহরের রোগীদের মত নয়।

গ্রাম্য লোক চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও কিছু সে অর্জন করিয়াছে, কিন্তু এ ঘটনায় সে বিস্ময়াম্বিত হইয়া উঠিল।

লোকটিকে প্রশ্ন করিলে বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় কথার উত্তর দেয় না। শুধু পা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রু ভাঙা কণ্ঠে কাঁদিয়া সে বলে—না করলে চলবি না ধম্ম অবতার। গরিবের তোমরাই বাপ মা। তিন গেরাম ঘুরে কেউকেই পেলুম নি কত্তা।

অশোক কৃত্রিম ধমকের সুরে কহিল—বাজে কথা রাখো। কী, হয়েছে কী তোমার? কোথায় যেতে হবে?

—গরিবের আশ্রমে। ছেলেতো আছে কি নেই কত্তা—লোকটি আবার হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অশোক আশ্বাস দিয়া কহিল—ভয় নেই তোমার, চুপ করো। ছেলের তোমার হয়েছে কী?

—দাস্ত আর বমি করতি করতি লেতিয়ে পড়েছে। কত জনার কাছে গেনু—হারা কোবরেজ, বিপিন ডাক্তার, পরাণ ওঝা—কেউ এত আত্তিরে এলো নি। তা বলে

ছেলেডা কী আমার বিনি চিকিচ্ছেয় মরবে—আর আমি বাপ হয়ে তাই সহ্যি করবো ?

অশোক ক্ষিপ্র হস্তে ব্যাগ গোছাইয়া লইল। এতটুকু সময় আর অপব্যবহার করা চলে না। স্যালাইনের বোতল ঠিক করিয়া লইয়া অশোক কহিল—তোমার বাড়ী কোথায় ? কিসে করে যাবো ?

—মল্লিকপুরের ঘাটে শাল্‌তি আছে। সেখান থাকি চারঘাট—তার পর পাল্‌কি আছে। ভোর লাগ্‌দার পৌঁছিবখন !

অশোক রিষ্টওয়াচের দিকে তাকাইয়া দেখিল—রাত্রি দুইটা বাজিয়া গেছে। কিন্তু আর দ্বিধা করা চলে না। কলেরা রোগে এতটুকু কাল বিলম্ব ঘটিলে ডাক্তারী শাস্ত্র ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অশোক কম্পাউণ্ডারকে চিঠি লিখিয়া দিল—তাহার ফিরিতে দেরী হইবে সে যেন সব ব্যবস্থা করিয়া নেয়।

মল্লিকপুরের ঘাটে শাল্‌তিতে চড়িয়া অশোক দেখিল—দিগন্ত ঘেরা অন্ধকার। কালো অন্ধকারে ক্ষীণস্রোতা নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া বিসর্পিল গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। দাব ঠেলিয়া, লগি বহিয়া শাল্‌তি চলিতেছে বাঁকাচোরা জীবন-ধারায়।

সঙ্গের লোকটির কৃতজ্ঞতার আর অন্ত নাই। অশিক্ষিত মন তাহার আশার আনন্দে দুলিয়া উঠিতেছে—ছেলে তাহার নিশ্চয়ই ভালো হইয়া উঠিবে। এ কী হেতুবে বিপিন ডাক্তার ? দস্তুর মতন পাশ করা সাহেব ডাক্তার—জীবনে শহরের হাঁসপাতালে একবারমাত্র চিকিৎসা করাইতে গিয়া যাহা সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

হাফপ্যান্টের মাঝে সিগারেট টানিতে টানিতে অশোক প্রচুর লজ্জা অনুভব করিতেছিল—জাতির জীবনে এই যে বিরাট সমাজ, ইহাদের অজ্ঞতা, দৈন্য আর দারিদ্র্যের মাঝে মুষ্টিমেয় দল তাহারা শিক্ষা এবং আভিজাত্যের গর্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাদেরই মাঝে তাহারা গড়িয়া তুলিতে চায়—Our world is not the same as Othello's world !

কিন্তু সে কথা চিন্তা করিয়া এখন কোন লাভ নাই। দীর্ঘতর পথে এমনিতর চিন্তা মানুষকে শুধু উৎক্ষিপ্ত করিয়া তোলে—বিশেষ করিয়া জীবন-মরণ লইয়া প্রতিনিয়ত যাহাদের খেলা করিয়া বেড়াইতে হয়।

অশোক তাই রোগী সম্বন্ধে আরও গুটিকয়েক প্রয়োজনীয় তথ্য জানিয়া লইল। কলেরা, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সারাদিনের মধ্যে এক ফোঁটাও ঔষধ পড়ে নাই।

অশোক চিন্তিত হইয়া উঠিল—সকল পরিশ্রম হয়তো তাহার ব্যর্থ হইয়া যাইবে- সকল প্রচেষ্টা নিস্ফলতা লাভ করিবে শেষকালে। চারঘাটে আসিয়া পালকী মিলিল।

লোকটির নাম সনাতন—জাতিতে নমঃশূদ্র। সমস্ত পথ অনর্গল সে বকিয়া চলিয়াছে—ওই সন্তানটিই তাহার জীবনের সব কিছু। আর একটু বড় হইলেই হালজোল ধরিতে শিখিবে। তখন আর কোন দুঃখই তাহার থাকিবে না। কত কষ্ট করিয়া কত যত্নেই না সে জীবনের সমস্ত সঞ্চয়কে তাহার উহার পিছনে নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াছে !

—ছোট লোকের ছাবাল হলি কী হয় কত্তা, বেটা আমার অজপুত্তুর। ইয়া বুকের ছাতি। রঙ্‌ কালো, তাতি কি হয় ? চোখ, মুখ, নাক—কে বলবে যে চাষার ছাবাল। কিন্তু কা যে হোল কত্তা—একদিনেই একেবারে পট্‌কে দিলে ! চোখ, মুখ

বসে—সনাতন সে কথা স্মরণ করিয়া আবার কাঁদিয়া উঠিল।

—বাঁচাতে পারবে না কর্তা ? আমার যথা সর্বস্ব নিও! অশোক রাগ করিতে পারিল না—জীবনে তাহার এ এক বিচিত্র অনুভূতি!

রাঙচিতার বেড়ার দরজা ঠেলিয়া অশোক ঘরে ঢুকিয়াই বাহির হইয়া আসিল। যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। স্যালাইনের বোতল আর খুলিবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু সনাতন তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না। হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে বলিল—ভালো করে একবার দেখ না কর্তা, হয়ত ছোঁড়ারে এখনও বাঁচাতি পারো ; এত দয়ার শরীল তোমার। আর সনাতনের স্ত্রী মৃত দেহের পর আছড়াইয় আছড়াইয়া পড়িতেছে—বত্রিশ নাড়ি ছেঁড়া তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সন্তান, মরিয়া গেছে বলিলেই হইল ?

অশোক গাঁয়ের মোড়লকে ডাকিয়া সব পরিষ্কার করাইয়া দিতে উপদেশ দিল। কঠিন বিসূচিকা রোগ, শুধু একজনের প্রাণনাশ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। সারা গ্রামকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইবে। অশোক পালকীতে উঠিতে যাইতেছে, রক্তচক্ষু পাগলের মতন ছুটিতে ছুটিতে সনাতন আসিয়া সিঁদুর মাখানো দুইটি টাকা তাহার পায়ের তলায় রাখিয়া কহিল, এই আমার শেষ সম্বল কর্তা। আর আমার কিছুই নেই। ঘাটের খরচার জন্যি বলদ দু'টি বাঁধা রাখছি মোড়লের কাছে। মিথ্যি মিথ্যি তোমাকে কষ্ট দিনু আবতা!

অশোকের চোখ ফাটিয়া অশ্রু ধারা বাহির হইয়া আসে।

টাকা দু'টি সনাতনকে ফিরাইয়া দিয়া ব্যথিত কণ্ঠে সে কহিল—সনাতন লক্ষ্মীর ধন লক্ষ্মীর কৌটাতেই রেখে দাও। ঘরে তোমার এখনো লক্ষ্মী রয়েছেন যে। তোমার ব্যবহারেই আমি খুসী হয়েছি। আমার দুর্ভাগ্য ছেলেকে তোমার বাঁচাতে পারলুম না।

আশোক ম্যানিব্যাগ হইতে পঁচিশটি টাকা বাহির করিয়া সনাতনের হাতে দিল—বলদ জোড়া তোমার বাঁধা দিতে হবে না সনাতন। এ টাকা তোমায় আমি এমনি ধার দিচ্ছি। এর পরে সময়মত তুমি আমায় এ টাকা দিয়ে দিও।

সনাতন কৃতজ্ঞতায় কাঁদিয়া ফেলিল। কোন কথাই সে অশোককে বলিতে পারিল না—দুই চক্ষু বহিয়া শুধু তাহার দরদর ধারায় অশ্রুরাশি গড়াইয়া পড়ে।

আশোক তাহার পিঠে হাত রাখিয়া কহিল—বিপদের সময় অধৈর্য হলে চলে না সনাতন। তুমি পুরুষ মানুষ, সংসারে তোমার কত শক্ত হওয়া দরকার। পৃথিবীতে মানুষের জন্ম দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে। জন্মমৃত্যু এতো ভগবানের হাত। তোমার আমার কোন হাতই নেই এতে। নাও ওঠো—তাড়াতাড়ি ওদিককার ব্যবস্থা করো, তাছাড়া তোমার স্ত্রী আরও কষ্ট পাবেন।

পাড়াপ্রতিবেশীদের ডাকিয়া শবযাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া শোকার্ত্ত হৃদয়ে অশোক পালকীতে চড়িয়া বসিল।

চাবাগানে পৌঁছাইয়া পালকিতে উঠিতে গিয়া তাহাকে আবার ফিরিতে হইল—সনাতনের স্ত্রী ইহারই মধ্যে পেটে কেমন যেন অসহ্য বেদনা অনুভব করিতেছে।

ক্লান্ত অশোক ফিরিয়া চলিল।

সনাতনের স্ত্রী সম্বন্ধে যে আশঙ্কা করিতেছিল সে তাহা নয়। পূর্ণ গর্ভবতী সনাতনের স্ত্রীর প্রসব বেদনা উঠিয়াছে। অশোককে থাকিয়া যাইতে হইল।

আশ্চর্য এই পৃথিবী!

সনাতনের একপুত্রের চিতাগ্নি নদীর ধারে এখনও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে—শূন্য মাতৃক্রোড়ে নূতন শিশুর আবির্ভাব ঘটিতেছে ইহার মাঝেই। জন্ম এবং মৃত্যুর কী অদ্ভুত লীলাখেলা।

নবজাত সন্তান ক্রোড়ে পুত্রশোক ভুলিয়া জননী হাসিতেছে—আর প্রজ্জ্বলিত চিতাগ্নিতে পিতৃত্বের আশা আকাঙ্ক্ষা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে।

সন্ধ্যার প্রারম্ভে সনাতনের স্ত্রী নবজাত সন্তান লাভ করিল। অশোক সমস্ত বিধিব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিয়া এতক্ষণে খানিকটা নিশ্চিন্ততা লাভ করিল।

রাত্রির অন্ধকারেই অশোক পুনরায় শালতিতে চাপিয়া বসিল। গ্রামের চাষা-ভুষা, তাহারা অশোককে এই রাত্রে ছাড়িতে চাহে না। সমস্ত দিন প্রায় ডাক্তারবাবুর কিছু খাওয়া হয় নাই।

অশোক তাহাদের নিরস্ত করিল। এই রাত্রেই তাহাকে যাইতে হইবে। ডাক্তারদের শারীরিক সামান্য ক্লেশে বিচলিত হইতে নাই।

শুধু সনাতন নয়, সনাতনের গ্রামের সবকটি মানুষই অশোকের অতি আপনজন হইয়া উঠিল। তাহাদের কাছে অশোক তো মানুষ নয়—সে যে নররূপী দেবতা!

তাহার ডাক্তারীজীবনে অশোক এই প্রথম দেখিল—মানুষের জীবন। লেখাদি ও মৃদুলা—ইহারা অশোকের মনে এই কয়দিনেই অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সনাতন, তাহার স্ত্রী এবং এই গ্রামখানির আশঙ্কিত এই কয়েকটি চাষা-ভুষা আজ যে তাহাকে চেতনা দিল—অশোক তাহার মাঝে দেখিল তাহার পরিকল্পিত আদর্শের ছবি। দেশের বৃহত্তর সমস্যা এইখানেই—যেখানে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। গ্রাম্য ইউনিয়ন বোর্ডের ডাক্তার অশোক মিত্তির—এইখানেই তাহার আদর্শকে সার্থক করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহে। ইহাদের মাঝে সে চেতনাকে জাগাইয়া তুলিবে—ইহাদের বাঁচাইতে সে তাহার সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করিবে।

ওথেলো এবং ডেস্‌ডিমোনার জগত এ মুহূর্তে তাহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে দূরে সরিয়া গেছে। লেখাদি এবং মৃদুলা তাহাদেরও দেখা পাইতেছে না সে।

অশোক দেখিতেছে—পরাধীন মুমূর্ষু জাতি দেহের ক্ষুধায় ছটফট করিয়া মরিতেছে। রুদ্ধকণ্ঠ তাহাদের রুদ্ধশ্বাসের মৃত্যু যন্ত্রণা। ডাক্তার অশোক মিত্তির রাত্রির ঘন অন্ধকারে প্রত্যক্ষ করিতেছে সে মৃত্যুকে,—ভয়াবহ সেই মৃত্যু! সমস্ত সমাজকে ঘিরিয়া জীবনগ্রাসী সেই বীভৎস মৃত্যু অন্ধকারে পৈশাচিক অট্টহাসি হাসিয়া চলিয়াছে। অশোক ডাক্তার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিকিৎসা-শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিল—মেটিরিয়া মেডিকায় জাতিক্ষয়কারী এ বিসূচিকার কোন প্রতিষেধক ঔষধ আছে কিনা।

ব্যর্থ এই চিকিৎসা-বিজ্ঞান।

অন্ধকার দিগন্তে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিল। আকাশ ভরিয়া গেছে কালো ঘন মেঘে।

(১০)

বাড়ি ফিরিয়া অশোক ডুবিয়া রহিল তাহার নব অভিজ্ঞতালব্ধ চিন্তারাশির মাঝে। সমস্ত দিনে তাহার

ভালো করিয়া আহার হয় নাই—খাইতে বসিয়া তবুও সে ভালো করিয়া আহার করিতে পারিল না। দুই রাত্রি অনিদ্রায় কাটিল। পরিশ্রান্ত দেহ তবুও ঘুমাইতে চাহে না।

মনে তাহার এতদিন বাদে সত্যিকারের প্রশ্ন জাগিয়াছে—জীবনে তাহার আদর্শ কী?

ইউনিয়ান বোর্ডের ডাক্তার। দিনান্তে গোটা কয়েক রোগী দেখিয়া আর ঔষধপথ্যের বিধি ব্যবস্থা করিয়াই কি সে তাহার এই মূল্যবান জীবন অতিবাহিত করিবে?

ঔষধ সে প্রত্যহই দিতেছে এবং রোগীর যে তাহাতে রোগ একেবারেই প্রশমিত হয় না এমন নহে। কিন্তু সনাতনের মতন মানুষরা নিরন্তর যে রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে—জীবনের নামে অচেতন মৃত্যুর মাঝে মুমূর্ষু হইয়া বাঁচিয়া আছে—সে রোগকে এতদিন তাহার দেখিবার এবং জানিবার সুযোগ হয় নাই। এ রোগী আজ সমষ্টি ভাবে তাহার দরজায় আঘাত করিয়া মিনতি জানাইয়া প্রাণ-ভিক্ষা মাগিতেছে—ডাক্তারবাবু আমাদের বাঁচাও। তোমার ডাক্তারী শস্ত্র দিয়া নয়। তোমার সেবা দিয়া, চিন্তা দিয়া, ত্যাগ দিয়া, কর্ম্ম দিয়া—বাঁচাও তোমার দেশের অগণ্য রোগীদের। তাহাদের স্বাস্থ্য দাও, জ্ঞান দাও, চিন্তা দাও, আত্ম-চেতনা দাও। দাও আলো—দাও জীবন!!! অশোক উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল

সংসারে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মৃদুলার হার্ট দুর্ব্বল হইলে দেশের সারা সমাজ যেখানে ব্যস্ত হইয়া ওঠে—জমিদার, ধনী, ব্যবসায়ী, কিংবা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট রায় বাহাদুরের ছেলের সামান্য সর্দ্দিকাশি হইলে যেখানে ডাক্তারের দল ঔষধ দিয়া ঘিরিয়া রাখে—সেখানে সনাতনের পুত্র বিসূচিকায় বিনা চিকিৎসায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া কেন মরিবে? দেশের ডাক্তারদের নিদ্রায় এতটুকুও ব্যাঘাত ঘটিবে না কেন? আর সেই দুরন্ত বিসূচিকা কেন পল্লী হইতে গ্রামে সকল দুঃখীজনের সংসারের মাঝে মৃত্যুর বীজ ছড়াইয়া বেড়াইবে? সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও সনাতনের ডাক্তার ডাকিবার মতন সঙ্গতি কেন থাকিবে না? কোন্ অপরাধে ডাক্তারেরা তাহাকে ফিরাইয়া দিবে? আর খাটখরচার ব্যয় বহন করিতে কেন তাহাকে হাল-জোল পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হইবে? এ প্রশ্নের মীমাংসা অশোক খুঁজিয়া পায় না। সমাজে যাহাদের প্রয়োজনকে নিত্য তাহারা অনুভব করিতেছে—যাহাদের পরিশ্রমে তাহারা আহার পাইতেছে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছে, এমন কি বাঁচিয়া আছে—তাহাদের জীবনকে এমনি করিয়া দলিয়া পিষিয়া মারিতেছে কাহারা? কাহারা তাহাদের এমনি করিয়া বঞ্চিত করিতেছে? অশোকের ঘুম আসে না। রাত্রির গভীরতায় নিদ্রাহীনতার মাঝে সমস্যার পর সমস্যা আসিয়া তাহার চিন্তাধারাকে গভীরতায় ভরাইয়া তোলে।

পরদিন সকাল হইতেই অশোক নানা কাজের মধ্যে ডুবিয়া রহিল। ডাক্তারখানায় অনেক রোগী আসিয়াছে।

অপরাদিনের মত অশোক শুধু প্রেস্‌ক্রিপসন লিখিয়া দিয়া আর পথ্যের নির্দ্দেশ দিয়াই আপন কর্তব্য সমাধা করিল না। এপাশ ওপাশ হইতে নানা গ্রামের নানা প্রকারের রোগীদের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া তাহাদের জীবনের কথা, সংসারের কথা, তাহাদের অবস্থা প্রভৃতির সহিত পরিচয়লাভ করিল সে।

সন্ধ্যার সময় সে বাহির হইতে যাইতেছে এমন সময় বাহিরে ডাক শুনিল।

—ডাক্তার বাবু, ডাক্তার বাবু!

অশোক বাহির হইয়া আসিল।

মৃদুলার বাবা কিশোরীবাবু বলিলেন—আপনাকে আবার কষ্ট দিতে এলুম। মৃদুলার আবার ফিট হয়েছে।

অশোক কহিল—ও রোগের চিকিৎসা ডাক্তারীশাস্ত্রে নেই। ও আপনিই সেরে যাবে। এখন আমি গেলে কোন লাভই হবে না। এরপর বরঞ্চ আমি যাবো এবং অন্য ওষুধের ব্যবস্থা করবো।

কিশোরীবাবু সে কথা শুনিলেন না। সংসারে ওই একটি মাত্র কন্যা তাঁহার; সকল আশাআকাঙ্খার প্রতীক সে। তাহার একটু কিছু হইলেই স্ত্রী অপেক্ষা তিনিই অধিকতর ব্যস্ত হইয়া উঠেন।

কিশোরীবাবু তাই পুনরায় অনুরোধ জানাইলেন, তবু একবার আপনি চলুন। মৃদুলার এই ষ্টেজটা দেখলে আপনার ডায়োগনিসিসের কিছু সুবিধা হবে হয়ত।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও অশোককে যাইতে হইল কিশোরী বাবুর সহিত।

মৃদুলার হার্টটি সত্যিই দুর্বল হইয়াছে। পাল্‌সের বিটিং অতিশয় মন্থর।

অশোক ইন্‌জেকসনের সিরিঞ্জ ঠিক করিয়া লইল। চোখে তাহার উদ্বেগের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে মৃদুলার চেতনা ফিরিয়া আসিল। গ্রামের বহু শুভজন এবং সমাজহিতৈষীদের আগ্রহ-আতিশয্যকে উপেক্ষা করিয়া অশোক ডাক্তার গম্ভীর কণ্ঠে কহিল—দেখুন, ঘরে একদম ভিড় করবেন না। শুধু মৃদুলার মা ছাড়া এ ঘরে আর কেউই আসবেন না। আর মৃদুলার নড়াচড়া পর্যন্ত একেবারে বন্ধ। কম্‌প্লিট্‌ বেডরেষ্ট—হার্টটা খুবই উইক্‌। আমি কাল এসে আবার দেখে যাবো।

মৃদুলার পিতা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন—ভয়ের কোন কারণ আছে নাকি?

—না, ভয়ের কোন কারণ বিশেষ কিছু নেই। তবে সাবধান হওয়া দরকার। একটু সুস্থ করে তুললে এবার কিছুদিন একটা ভালো চেঞ্জের জায়গায় ওকে নিয়ে যান। হার্টটা এ বয়সে এত দুর্বল থাকা ভালো নয়।

কিশোরীবাবু ভিজিটের টাকা লইয়া আসিলেন। অশোক সকলের বিস্ময়কে বর্দ্ধিত করিয়া তাহা গ্রহণ করিল এবং পরক্ষণেই অন্ধকার পথে তাঁহার মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল।

ক্রমশঃ

অনির্ব্বচনীয়

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

পাইনা ময়ূরকণ্ঠী রঙের সীমা—
একি ঝিলিমিলি অপূর্ব্ব মাধুরিমা!
সোনা সিন্দুর মেঘের আড়ালে?
ভুবন ভুলানো কে মুখ বাড়ালে
এ রূপের খেলা কোথা পেলে অরুণিমা।

২

তুমি অপরূপ লাবণ্য পারাবার,
কয় জনে দাও দেখিবার অধিকার?
শেষ হয়ে যায় সব বিশেষণ
অস্ফুরণ রয় তবু বর্ণন
দোষ নাই বলে যে তোমারে নিরাকার।

৩

রূপে ও গন্ধে সুরে কি যে মিশে রয়
অস্ফুট তবু কি বিরাট বিস্ময়।
যত বলি তবু বাকি থাকে কিছু,
সে অব্যক্তে কবি মাথা নীচু
রসনা পিছায়, বুকেতে তুফান বয়।

৪

তুমি সবে আছ হে অনির্ব্বচনীয়,
তাই তো প্রকাশ করা সুকঠিন প্রিয়
তাই যত বলি হয় নাকো বলা
ফুরায় না যেন এই পথ চলা
ডাক শেষ যেথা আসি আগাইয়া নিয়ো।

কোচবিহারী ভাওয়াইয়া

আবদুল করিম

ভাওয়াইয়া গান উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারের নিজস্ব সম্পদ। উদাস হাওয়ার মতো এর সুরের গতি, তাই এর নাম ভাওয়াইয়া। অজ্ঞাত-নামা কবির রচিত এই গান যে শুধু উত্তর-বংগের প্রাণের জিনিষ ব'লে তাদের আদর পেয়েছে তা নয়—এই গানের ভেতর সত্যিকারের কবিতা, এই গানের সুরে সত্যিকারের উদাসকরা ভাব, সারা বাংলার অন্তর-বীণার তারে এক অভূতপূর্ব্ব স্পন্দন তুলেছে, কারণ এ শুধু কল্পনা বিলাস নয়, এ হ'চ্ছে মানব-হৃদয়ের চিরন্তন সত্যের প্রতিচ্ছবি, তার সুখ-দুঃখ-বিজড়িত জীবনের অকৃত্রিম চিত্রলেখা। যাঁরা পূর্ববংগের গানের সংগে পরিচিত, উত্তরবংগের গান শুনলে তাঁরা এক নূতন রসের আস্বাদ পাবেন। আকাশছোঁয়া পাহাড় আর কূল-হারানো নদী, দুই-ই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও বিস্ময়ের অপরূপ লীলা—কিন্তু তাদের পার্থক্য অনেক—উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরুর মতোই এদের ব্যবধান। পরিপূর্ণ-যৌবনা আবেগ-উচ্ছল-ভরা নদীর সুরের সংগে উপল-নূপুর-মুখরিত চটুল পাহাড়ী ঝর্ণার মিল কোথায়? এ যেন কৈশোর ও যৌবনের তারতম্য।

কাজে কাজেই উত্তরবংগের ভাওয়াইয়া গানের বিচার করতে গেলে সকলের আগে উত্তরবংগের মানচিত্রের দিকে আমাদের চাইতে হয়। মাথার উপরে উন্নত বিরাট পাহাড় মেঘের জটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—সেই ধূসর পাহাড়ের পাদদেশে শাল সেগুনের অরণ্যানী। দক্ষিণের প্রচণ্ড বাতাস সেই ঘন বনস্থলীকে আলোড়িত করে চালিয়েছে তার অবাধ অভিযান। খেয়ালী প্রকৃতির এই দুরন্তপনার ভিতরে এই গান জেগে ওঠে বিদ্যুতের মতো ধারালো সুরে—মহিষের-পিঠে-চড়া কত মৈশালের দৃপ্ত কণ্ঠশিখায়। সেই সুরে সুর মিলিয়ে বেজে ওঠে কত বেণু, কত দোতারা। আধুনিক সভ্যজগতের অভিযান আজো সেখানে পৌঁছোয় নি। গ্রাম্য বধূ কাঁখে কলসী নিয়ে জলকে চলে সেই গান শুনতে শুনতে, মাঠের চাষীর দল খুঁজে পায় এই গানে তাদের কর্ম্মপ্রেরণা, এই গানকে অবলম্বন ক'রে রচনা হয় তাদের নিজ নিজ জীবনের ছোট খাটো বিচিত্র কাহিনী, তাদের অব্যক্ত মনের একান্ত বারতা মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে এই গানের ভাষাতেই। উত্তরবংগ তথা কোচবিহারের ভাওয়াইয়া গান এদের নিজস্ব হৃদয়ের সত্যিকারের বাহন। চাষী ধান কাটছে মাঠের মাঝখানে, গেয়ে উঠলো দু'টো লাইন,—কী তার সুর, কী তার কথা!! ভদ্রবেশে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই গান যায় থেমে, আবার গাইতে বল্লেই লজ্জায় তার চোখ মুখ হ'য়ে ওঠে রাঙা,—কতো সাধ্য সাধনা ক'রে এলোমেলো গানের অস্থায়ী অন্তরা গেঁথে নিতে হয় মনে মনে!

যাঁরা ভাওয়াইয়া গানের সাথে বেশী পরিচিত নন—তাঁদের কাছে এর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়—এই শ্রেণীর গানের বিশিষ্ট সুর ছাড়া রচনাও অন্যতম আকর্ষণ। শিক্ষিত নাগরিক কবির চশমা প'রে—এই সহজ অনাড়ম্বর বাণী-সেবকের

পরিচয় পাওয়া যায় না। ক্ষুরধার বুদ্ধির ছুরি চালালে ভাওয়াইয়া কবিতার কাব্যলক্ষ্মী যান দূরে পালিয়ে। কোমল হৃদয়ে বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্যের অভিযান অসহ্য হ'য়ে ওঠে। প্রাণ দিয়ে যাঁরা প্রাণকে বুঝতে চান ভাওয়াইয়া কবির সহজ হৃদয় অতি সহজেই তাঁদের কাছে ধরা পড়ে। তাই রেস্তোরাঁ বা ক্লাবে বসে প্রাণহীনভাবে একে আবৃত্তি করা চলে না। মন যখন একান্ত মনের বশে -তখনই ভাওয়াইয়া গানের অলকানন্দা মনের কূল ভাসিয়ে নেমে আসে।

ভাওয়াইয়া গান শুনতে শুনতে মনে হয় কোথায় যেন কোন আকস্মিক বেদনায় আচমকা যায় সুর ছিঁড়ে—যা অব্যক্ত যা প্রকাশের নয় তাকে নেন আর প্রকাশ করা চলে না—তাই কণ্ঠ আসে ভিজে— ইংরেজীতে ব'লতে গেলে—Silence is more eloquent than speech—সুরের দিক দিয়ে এইটিই ভাওয়াইয়ার সব চেয়ে বড় বৈচিত্র্য।

এবারে একখানি গান উদ্ধৃত করছি—

তোরষা নদীর পারে পারে ও
দিদিও মানসাই নদীর পারে—
দিদিও মানসাই নদীর পারে—
আজি সোনার বঁধু গান করি যায় ও
দিদি তোরে কি মোরে
কি শোনেক দিদিও।।
বড় বইনে ভুকায় ঢেকি ও
দিদি ও মাইজান বোনে ঝাড়ে
আর ছোট বইনের চোখের পানি ও
দিদি হি'ডস বাঁধি পড়ে—
কি শোনেক দিদিও।।

কেমন করি ডাকাও দিদি ও
দিদিও ঐদি' ঐদি' যায়—
দিদিও ঐদি' ঐদি' যায়—
বুকের আগুন জলে দিয়া যায়—
দিদি তোরে কি মোরে
কি শোনেক দিদিও।।

তোরষা নদী মানসাই নদীর মোহনায় বিষাণদের বসতি। তিন বোনে ঢেঁকি ঘরে ধান ভানছে। এমন সময় তারই ধার দিয়ে পায়ে-চলা বাঁকা পথে তরলা বাঁশের বাঁশী হাতে নিয়ে গোচারণে গান গেয়ে চলেছে নবীন রাখাল। তার অনুসন্ধানরত চঞ্চল বনমৃগের মতো দুটি আঁখি এদিকে ওদিকে চায়—কার খোঁজে?—যার খোঁজে সে কিন্তু হাতের কাজে মন দিতে পারে না—ঢেঁকি ঘরে দুই বোন কাজের স্রোতে ভেসে চলে। একজন ভেসে চলে চোখের জলের স্রোতে. তার সোনার বন্ধু যে তারই উদ্দেশ্যে গান গেয়ে যায়—মন কী আর কাজে বশ মানে? সে কেঁদে বলে, "দিদি, তোরা বেশ আছিস্—কিন্তু আমার অবস্থা একবার ভেবে দেখতো; সোনার বন্ধু, আমার মনের মধ্যে যে আসল মন, সেই কিনা কেঁদে চলে গেল—কিন্তু সাড়া দিতে পার্‌লুম কৈ? কুলের বাধন, ঘরের শাসন লোকলজ্জা—আমার পথ রোধ ক'রছে—এ ব্যথা আমি কেমন ক'রে ভুলি?" এ যেন কৃষ্ণ-সঙ্গ-সুখ-বঞ্চিতা শ্রীরাধিকা—দূরের বাঁশীর কান্না শুনে জটিলা কুটিলার ভয়ে মনের আগুন চোখের জলে নেভাতে চায়—কিন্তু মনের আগুন, সে কি ছাই নেভে? তাই কেঁদেই যায় জন্ম—কেঁদেই যায় জীবন! ভাওয়াইয়া কবি কাব্য-দৃশ্যের পটভূমি বড় সুন্দর ক'রে এঁকেছেন! জাপানী পটুয়ার মতো দু'একটি তুলির নিপুণ টানে—

যা প্রকাশের নাগালের বাইরে তাও যেন প্রকাশ পেয়েছে।

বৈষ্ণব কবিদের নৌকাবিলাসের অনেক মধুর কাব্যগীতিকা আমরা শুনেছি—কিন্তু ভাওয়াইয়া কবির নৌকাবিলাস সম্পূর্ণ নূতনত্বে সমৃদ্ধ। সেই অনাঘ্রাত পুষ্পগীতিকার একখানির উল্লেখ করছি :—

পুরুষ : আগা নাওয়ে ডুবু ডুবু পাছানাওয়ে বৈস
ঢোঙায় ঢোঙায় ছেকোং জলরে।
ও কন্যা পাছা নাওয়ে বৈসো
ঢোঙায় ঢোঙায় ছেকোং জলরে॥
জল ছেকিতে জল ছেকিতে সেঁউতির ছিড়িল্ দড়ি
গলার হার খসেয়া বন্ধারে—
ও কন্যা সেঁউতিত নাগাও দড়ি
গলার হার খসেয়া বন্ধারে॥
স্ত্রী : তোক সে বলোং ছওয়াল কানাই
তোর সে ভাঙা নাও—
ভাঙা নাওয়ের খেওয়া দিয়া যে—
ও তুমি কেমন মজা পাও
ভাঙা নাওয়ের খেওয়া দিয়া রে॥
পুরুষ : ভাঙাও নোয়ায় ফুটাও নোয়ায়
সোনা রূপায় গড়া
রাজার হস্তীক পার করিচোং রে—
ও কন্যা তোর বা কতোয় ভরা—
রাজার হস্তী পার করিচোং রে।
এক সুন্দরীক পার করিতে নিচোং আনা আনা—
তোক সুন্দরীক পার করিয়া রে—
কন্যা খসাইম কানের সোনা
তোক সুন্দরীক পার করিয়া রে।

চতুর কানাই শ্রীরাধিকাকে সেদিন নাওয়ে তুলেছেন। রসিকা শ্রীমতী বিপরীত মুখে অর্থাৎ আগা না'য়ে গিয়ে বসলেন—রসের নাবিক কানাইএর সম্পূর্ণ নাগালের বাইরে। ছলে, কৌশলে শ্রীকৃষ্ণ চান রাধাকে একান্ত সান্নিধ্যে—তাই ছল ক'রে বললেন "আগা নাওয়ে ডুবু ডুবু পাছা নাওয়ে বইস।" এই রসালাপের মাধুর্য্য অনেকখানি। গীতিনাট্যের ভঙ্গীটুকু সুন্দর পরিস্ফুট হয়েছে গীতি-আলাপনের মধ্য দিয়ে। তাতেও যখন শ্রীরাধা ধরা দিলেন না তখন সময় বুঝে একান্ত প্রয়োজনেই সেঁউতির দড়ি ছিঁড়লো। দড়ি আর কোথায় পাবেন—তাই শ্রীমতীর কণ্ঠ-হারের প্রয়োজন হ'লো—গলার হার খসিয়ে সেঁউতির দড়ি করবার বাসনা প্রকাশ করলেন। শ্রীমতীকে বাহুবন্ধনে পেতে হবে, তাই না এই কৌশলের অবতারণা। প্রেমিকের লোভ সেই কণ্ঠহারের প্রতি নয়—প্রেমিকার কণ্ঠলগ্ন হওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু এ প্রচেষ্টাও হ'লো ব্যর্থ। তখন কৃষ্ণ বুঝলেন—খুলে বলাই ভালো। তাই বললেন—তোমার প্রেম বইবার মত শক্তি আমার আছে। আমার কাঠ মন তোমার প্রেম ধারণে সম্পূর্ণ সক্ষম। এ নৌকায় রাজার হাতীকে আমি পার করেছি—কৃষ্ণ-জীবন-তরণী রাধাপ্রেমের বোঝা বইতে পারবে। কী চমৎকার উপমা। এর পর চতুর শিরোমণি দাবী করে বললেন—কানের সোনা আর গলার মালা।— খেয়া ঘাটের কড়ি চাইতো! এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারে মেয়েরা যে পুরুষকে পতিরূপে বরণ করে একমাত্র তারই হাতে কানের সোনা বা গলার হার খসিয়ে দেয়। শ্রীকৃষ্ণের চরম দাবী শ্রীরাধা নিশ্চয়ই অস্বীকার করেন নি। এই গানটির প্রকাশ ভঙ্গীতে

এমন একটা সম্পদ আছে যা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি না করে পাবা যায় না।

বিশ্বের প্রথম শোক-বিহ্বল কবিতা রচিত হলো ক্রৌঞ্চ-বিরহ অবলম্বনে। সেই তমসা তীর—ক্রৌঞ্চ মিথুনের মিলন মধুর চিত্র—এমন সময় একটির বুকে এসে লাগলো নিদয় ব্যাধের নির্মম তীর। আসন্ন বিয়োগব্যথায় ক্রৌঞ্চবধূর মর্মবেদনায় বসুন্ধরার চোখে এলো জল। এই করুণ ছবি দেখে দস্যু রত্নাকর হ'লেন কবি বাল্মীকি। বাঁধন ভেঙে প্রথম সেই দিন নেমে এলো কাব্যের সুরধুনী। কবি তাঁর কবি-প্রতিভাকে অনেক সময় Symbolism এর মারফৎ ফুটিয়ে তুলতে চান ; পাখী, নদী, ফুল প্রভৃতির ছদ্ম-সাজে মানুষ তার নিজের কথাই বলে যায়। কাব্য লোকের ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, সাত ভাই চম্পা আর তাদের পারুল বোন বা অশ্রুমতী নদীর মুখে সুখ-দুঃখ-বিজড়িত যে সব কাহিনী আমাদের হৃদয়কে অভিভূত করে তা' চিরন্তন মানুষের নিজের কথাই। অভাবনীয় পথে কাব্যের ঘোড়া ছোটানোর শক্তি আমাদের দেশের ভাওয়াইয়া কবিদেরও কম নয়। অনেক সময়ই তার পরিচয় পেয়ে আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হ'য়ে যাই।

প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব গেঁয়ো কবি রচিত কতক গান আছে, যেমন মালদহের গম্ভীরা, ঢাকা ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানের গাজীর গান, কাইজার গান, কবির লড়াই, জারি গান, সারি গান প্রভৃতি। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

গুড়িয়াহাটিতে নূতন বসতি হোলো*

শ্রীহেমন্তকুমার বসু বি-এ

গুড়িয়াহাটিতে নূতন বসতি হোলো—
অবগুণ্ঠিতা খোলো গুণ্ঠন খোলো।
ঘোঁটু শটীবনে যেমালুম ঢাকা ছিলে,
—কাটিয়া কাটিয়া আমরা করিনু টিলে,
ফাঁকা দিয়া মুখ হেরিয়া লাফায় পিলে।
কে বলে ছিনালী ? বসন তোমার খোলো।
অবগুণ্ঠিতা, খোলো গুণ্ঠন খোলো।

বেণুবন-চাপা সফেদ অলকরাজি
মুক্তি লভিয়া চিকণিয়া ওঠে আজি।
না জানিয়া কিছু 'বিজ্ঞেনেশন' যুগে
হে প্রাচীনা, তুমি মিছেই ভুগেছ দুখে।
এতদিনে কিরে গেল আপশোষ চু'কে
'মড়া দীঘি'—জলে নিজ রূপ হেরে ভোলো—
দুরিত-কুণ্ঠা খোলো গুণ্ঠন খোলো।

স্বজাতি প্রীতিতে যাহাদের সাথে ছিলে—
বাঘা শেয়ালেরা কোথা আস্তানা নিলে ?
মশা ও মশক ক্রমেই যেতেছে কমি
ছুছুন্দরেরা বেজায় গিয়াছে দমি'—
'নেউর' গন্ধ এবে আসে কিবে বমি ?
হে রূপসি, নাকে রুমাল কেন না তোলো।
খুসী শিহরিতা, খোলো গুণ্ঠন খোলো।

নবজীবনের জাগরণ শিহরণে—
হেরি যে নিমেষে মাতিয়াছ মহারণে।
মিলিটারিদের করিবারে আনাগোনা
অঙ্গনে পথ রচি দিলে অঙ্গনা,
জাপানী বোমার ধ্বনি কোথা যায় শোনা—
'কনভয়' ফোঁসে, তুমি মহারোষে ফোলো,—
চটিতা চণ্ডী, খোলো গুণ্ঠন খোলো।

---

*গুড়িয়াহাটি কুচবিহার সহরের উপকণ্ঠে এক নবীন পল্লী।

রাজকীয় ভারতীয় নৌবাহিনী

শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্-এস্-সি

চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকের সমুদ্রে আরবদেরই আধিপত্য ছিল। ইহার পর পর্ত্তুগীজরা ১৬২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতমহাসাগর ও আরবসাগরে অধিকার বিস্তার করে। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে অল্‌মিডা (Almeida) তদানীন্তন পর্ত্তুগালরাজ ইমানুয়েলকে পরামর্শ দিয়াছিলেন—"Let it be known to your Majesty that if you are strong in ships the commerce of the Indies is yours and if you are not strong in ships little will any fortress on land avail you." এই কারণেই ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ এবং পর্ত্তুগীজরা ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সমুদ্রপথে একাধিপত্যের জন্য যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকে। অবশেষে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে এই অধিকার সম্পূর্ণভাবে ইংরাজদের হাতে চলিয়া যায়। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণ সমরতরণ "এমডেন" মাদ্রাজ উপকূলে গোলাবর্ষণ করে এবং বিগত পৃথিবীব্যাপী মহাসমরে জাপানী নৌবহর বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন নৌবহর আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের উপকূলে আক্রমণ চালাইতে পারে নাই। ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশের পক্ষে ভারতীয় নৌবাহিনীর একান্ত উপযোগিতা এই ঘটনা হইতে অনুভূত হয়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজকীয় ভারতীয় নৌবাহিনী খুব বেশী প্রসার লাভ করিয়াছে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ইহাতে ভারতীয় কর্ম্মচারীর সংখ্যা ছিল এক হাজার। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশ হইতেই ভারতীয় যুবকেরা এই নৌবাহিনীতে যোগদান করিতেছে এবং আশা করা যায় ১৯৫০ সালে ইহাদের সংখ্যা পাঁচ হাজারে দাঁড়াইবে।

ভারতীয় নৌসৈন্য গত মহাসমরে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া নৌবিভাগের বড় কর্ত্তাদের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। ভারতীয় নৌসৈন্য আকিয়াব এবং আরাকান সমুদ্রতীরে জাপানীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়াছে এবং নানা দুর্য্যোগপূর্ণ অবস্থার মধ্যেও ব্রহ্মদেশে অবস্থিত মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের রসদ যোগান দিয়াছে। সুযোগ এবং সুবিধা পাইলে যে ভারতবাসীরা নৌবিভাগে বিশেষ দক্ষতা অর্জ্জন করিতে পারে সে বিষয়ে নৌবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ সম্পূর্ণ একমত।

ভারতীয় নৌবাহিনীতে প্রধানতঃ বড় যুদ্ধ জাহাজ, সৈন্য বহনোপযোগী জাহাজ এবং মোটর লঞ্চ সমূহ আছে। এই যুদ্ধজাহাজ সমূহের দুইজন ক্যাপ্টেন ভারতীয়। ভারতবর্ষের নদীগুলির নামানুসারে অধিকাংশ জাহাজের নামকরণ করা হইয়াছে। মোটরলঞ্চ সমূহ গত মহাযুদ্ধে বিশেষ সাফল্যের সহিত শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়াছে। লোহিতসাগর ও পারস্য উপসাগরে ভারতীয় নৌবাহিনী রাজকীয় নৌবাহিনীর সহিত একত্র কাজ করিয়াছে। নৌসেনাধ্যক্ষ ফিজ হারবার্ট ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রসারতাবৃদ্ধিকল্পে বিশেষ যত্নবান ছিলেন।

ভারতবর্ষে বোম্বাই একমাত্র স্বাভাবিক পোতাশ্রয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা বড় বন্দর। ইহা ব্যতীত করাচী, মাদ্রাজ,

ভিজাগাপত্তম প্রভৃতি স্থানে কৃত্রিম পোতাশ্রয় নির্মিত হইয়াছে। করাচীতে "হিমালয়" জাহাজে গোলন্দাজ সৈন্যদের শিক্ষা দেওয়া হয়। "চামাক", "বাহাদুর", "দিলোয়ার" প্রভৃতি জাহাজে নৌসৈন্যের শিক্ষাকেন্দ্র আছে। বোম্বাইতে ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রায় ত্রিশ চল্লিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। "হামলা", "তালোয়ার", "আকবর", "ম্যাকলিমার" প্রভৃতি যুদ্ধ জাহাজে নৌযুদ্ধের নানাবিধ কৌশল, নৌচালনা, বেতারে সংবাদ আদান-প্রদান ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। ভারতীয় নৌবাহিনীর যাবতীয় কার্য্য পরিচালনার দায়িত্ব Flag Officer Commanding এর উপর ন্যস্ত আছে। দিল্লী হইতে তিনি কাজকর্ম পরিচালনা করেন।

নৌবিভাগের কাজে যাঁহারা যোগদান করিবেন তাঁহাদের কিছুটা ইংরাজী ও পৃথিবীর কোথায় কি ঘটিতেছে সে বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কারণ নৌবাহিনীতে এত বিভিন্ন রকমের কাজ করিতে হয় যে মোটামুটি শিক্ষিত না হইলে চলে না। নৌসৈন্যদের কাজ বিশেষ [illegible]। তাহাদের উত্তম খাদ্য, বাসস্থান, পোষাক পরিচ্ছদ এবং বেতন দেওয়া হয়। নৌবাহিনীতে শুধু যে জাহাজে করিয়া সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় তাহা নহে, দেশের মধ্যে নানা আফিসে এবং কলকারখানাতেও কাজ করিতে হয়।

রাজকীয় ভারতীয় নৌবাহিনীতে মহিলাদিগের নিমিত্তও একটি বিভাগ খোলা হইয়াছে। ইহাকে Women's Royal Indian Naval Service (W. R. I. N. S.) বলা হয়। ইহাতে এ পর্য্যন্ত অনেক মহিলা যোগদান করিয়াছেন। তাঁহাদের সাধারণতঃ নৌসংবাদ প্রেরণাদি বিভাগে কাজ করিতে হয়। W. R. I. N. S. Women's Auxiliary Corps (India) এর অন্তর্গত এবং মিসেস্ ফুলার W. R. I. N. S. এর চীফ অফিসার।

আজকাল ভারতবর্ষে অনেক শিক্ষিতা মহিলা শিক্ষকতা, চিকিৎসা, আইন প্রভৃতি নানা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করেন। শিক্ষিতা মহিলাদের পক্ষে W. R. I. N. S. স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের একটি সহজ ও সুগম পথ খুলিয়া দিয়াছে। শিক্ষাকালীন [illegible] মহিলাগণ বোম্বাইতে সমুদ্রতীরে অবস্থিত "মার্বেল হল" নামক হোষ্টেলে বাস করেন এবং এখানে তাঁহাদের আহার ও বাসের অতি সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে আপনা হইতে না চাহিলে কখনও কোন মহিলাকে ভারতবর্ষের বাহিরে পাঠান হয় না। তাঁহাদের বিভিন্ন বন্দরে অবস্থিত নৌবাহিনীর অফিসে কর্ম্ম দেওয়া হয়। ভারতীয় মহিলাগণ এই বিভাগে থাকাকালীন সাদা সাড়ী অথবা ইউরোপীয় মহিলাদের ন্যায় পোষাক পরিধান করিতে পারেন।

ভারতীয় নৌবাহিনীতে উত্তম বেতন দেওয়া হয়। নৌসেনার আনন্দ বিধানের জন্য প্রতি মাসে বিভিন্নভাষায় লিখিত ত্রিশ হাজার পত্রিকা সরবরাহ করা হয়। প্রত্যেক জাহাজে এবং বন্দরে লাইব্রেরী আছে। ছুটি নিয়া যাহাতে ভারতীয় নৌবাহিনীর কর্ম্মচারীগণ স্বাস্থ্যকর জায়গায় বাস করিতে পারেন সেই জন্য বিভিন্ন পার্ব্বত্যস্থানে হোষ্টেল আছে। কেহ মারা গেলে তাহার বিধবা পত্নী এবং পুত্রকন্যাদের পেন্সন্ দেওয়া হয়। অসুস্থ সৈন্যদের বিনা খরচায় চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে। নৌবিভাগের কোন কর্ম্মচারী নৌবিভাগের কার্য্যে হঠাৎ অক্ষম হইয়া পড়িলে তাহাকে সিভিল বিভাগে কাজ দিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। মাননীয় দেশরক্ষাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেম্বর বোম্বাইতে নৌবিভাগ পরিদর্শন করিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন—"The Honourable the Defence Member was very much impressed with

the amenities and welfare of R. I. N. establishments. He was very pleased to see the good spirit amongst the officers and ratings, and all realised that the R. I. N. were doing everything possible for the amenities and welfare of their officers and ratings."

এই বাহিনীতে লোকসংগ্রহের জন্য প্রতি বৎসর মার্চ্চ ও অক্টোবর মাসে দিল্লীতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা লওয়া হয়। প্রতি অক্টোবর মাসে বোম্বাইতেও একটি বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। পরীক্ষায় যাহারা উপযুক্ত বিবেচিত হয় তাহাদিগকে কয়েক সপ্তাহ ভারতবর্ষেই শিক্ষাদান করিয়া ইংলণ্ড পাঠান হয়। সেখানে সাড়ে তিন বৎসর হইতে চারি বৎসর শিক্ষাসমাপনান্তে শিক্ষার্থী "সব লেপ্টেনাণ্ট" ও পরে "লেপ্টেনাণ্ট" পদে উন্নীত হন। আট বৎসর লেপ্টেনাণ্ট পদে কাজ করিবার পর "লেপ্টেনাণ্ট-কমাণ্ডার" পদ দেওয়া হয় এবং এই পদে চারি বৎসর কাজ করিয়া "কমাণ্ডার" হইতে পারা যায়। সাধারণতঃ "কমাণ্ডার" হইতে "ক্যাপ্টেন" পদ লাভ করিতে ছয় বৎসর সময় লাগে। ক্যাপ্টেন ৫৫ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন।

অনেকের ধারণা নৌবাহিনী যতই বিশাল হইবে ততই শক্তিশালী এবং কার্য্যকরী হইবে। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে ইহা সত্য নহে। প্রত্যেকটি নৌসৈন্য যদি সুশিক্ষিত হয় এবং নৌবাহিনী যদি উত্তমরূপে শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হয় তবে তাহা আকারে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও কার্য্যকারিতায় খুব শক্তিশালী হইতে পারে। ব্রিটিশ নৌবাহিনীর মত দ্বিতীয় নৌবাহিনী আর নাই। ইহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এই যে নৌবাহিনীর কার্য্য অতি উত্তমরূপে পরিচালিত হয়।

ভারতবর্ষ অদূর ভবিষ্যতে স্বায়ত্তশাসন লাভ করিবে। তখন ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব একমাত্র ভারতবাসীগণের উপর ন্যস্ত হইবে। ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশকে রক্ষা করিতে হইলে একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী রাখিতে হইবে। সেই জন্য এখন হইতেই দেশের স্বাস্থ্যবান ও শিক্ষিত যুবকদের রাজকীয় ভারতীয় নৌবাহিনীতে যোগদান করা কর্ত্তব্য। দেশের জনসাধারণের সহানুভূতি যদি এদিকে আকৃষ্ট হয় তবেই নৌবাহিনীর উন্নতি সম্ভব।*

---

* John H. Godfrey'র (Vice-Admiral, Flag Officer Commanding, Royal Indian Navy) কতিপয় বক্তৃতার সারাংশ।

রাজপরিবারের সংবাদ

শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুর বর্ত্তমানে রাজধানীতে অবস্থান করিতেছেন। আন্তঃ-প্রাদেশিক বিদ্যালয়সমূহের ক্রিকেট প্রতিযোগিতার জন্য মহারাজা একটি "কাপ" প্রদান করিয়াছেন ; কলিকাতা অবস্থানকালে এই প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায় উপস্থিত থাকিয়া তিনি খেলোয়াড়দিগকে উৎসাহিত করেন এবং খেলাশেষে বিজয়ী দলকে "কাপ"টি উপহার দেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি বলেন যে, ছাত্রজীবনে খেলাধূলার বিশেষ প্রয়োজন আছে ; একতা, দায়িত্ববোধ, নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি গুণ ছাত্রগণ খেলার মাঠ হইতে শিখিতে পারেন। তিনি আরও বলেন যে, ক্রিকেট বা অন্য যে কোন খেলায় যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইলে যথেষ্ট অনুশীলনের আবশ্যক।

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জয়পুরের মহারাণী শ্রীশ্রীগায়ত্রী দেবী আমাদের মহারাজা ভূপ বাহাদুরের সহিত বিমানযোগে কুচবিহারে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। শ্রীশ্রীমহারাজকুমার ইন্দ্রজিতেন্দ্র-নারায়ণ ও শ্রীঈশরাণী কমলা দেবী পুত্রকন্যাসহ কুচবিহারে আছেন। মাতৃশ্রী শ্রীশ্রীমহারাণী সাহেবা বর্ত্তমানে বোম্বাই নগরীতে অবস্থান করিতেছেন।

স্থানীয় সংবাদ

কুচবিহার আইন-সভার নূতন নির্ব্বাচন—

কুচবিহার রাজ্যে প্রতি চারি বৎসর অন্তর আইন-সভার নির্ব্বাচন হইবার নিয়ম আছে। ১৯৪৩ সালের ২৮শে জুলাই বর্ত্তমান আইন-সভার মেয়াদ ফুরাইবে। মহারাজা ভূপ বাহাদুর আদেশ দিয়াছেন যে এই বৎসর আইন-সভার নূতন নির্ব্বাচন হইবে।

বিদ্যোৎসাহীর সম্মান লাভ—

স্থানীয় বনচুকামারী তালুকের শ্রীযুক্ত রামভোলা সরকার একজন দাতা ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে স্থানীয় পাব্লিক স্কুলে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে স্কুলের নাম "রামভোলা হাই স্কুল" রাখিয়াছেন।

সরকার মহাশয়ের বিদ্যোৎসাহিতার জন্য মহারাজা ভূপ বাহাদুর তাঁহাকে রাজদরবারে আসন দিবার জন্য এক বিশেষ আদেশ প্রদান করিয়াছেন। বিদ্যোৎসাহী দাতার এই সম্মানলাভে আমরা আনন্দিত।

জন-নিরক্ষরতা দূরীকরণে কুচবিহার দরবারের প্রচেষ্টা—

প্রাপ্তবয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের ও তাহাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য কুচবিহার দরবার গ্রামাঞ্চলে পঁচিশটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। মেথর, মুচি, চামার ও অন্যান্য নীচ জাতীয়দিগের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য রাজ্যের পাঁচটি মহকুমা সদরে পাঁচটি হরিজন বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত হিন্দীভাষী বালকবালিকাদের সুবিধার জন্য রাজ্যের সদরে একটি বিশেষ বিদ্যালয় আছে।

যক্ষ্মা-হাসপাতালে কুচবিহার সরকারের দান—

কুচবিহার রাজ্যের যক্ষ্মারোগাক্রান্ত রোগীদিগের সুচিকিৎসার জন্য কুচবিহার সরকার যাদবপুর ও কার্সিয়ং হাসপাতালে দুইটি শয্যা সংরক্ষিত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কুচবিহার আইন-সভার ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি নিয়োগ—

মহারাজা ভূপ বাহাদুরের আদেশক্রমে কুচবিহার আইন-সভার একটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। মহারাজা নিজ বিবেচনাক্রমে শাসনসম্বন্ধীয় যে সকল ব্যাপার—বিশেষতঃ শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ব্যাপার—ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে প্রেরণ করিবেন তাঁহারা সেই সম্বন্ধে দরবারকে পরামর্শ দিবেন। নিম্নলিখিত সদস্যগণ লইয়া ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠিত হইয়াছে—

১। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী—সভাপতি।
২। জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রী।
৩। মৌলভী আনসারউদ্দীন আহ্মদ—অর্থবিভাগের সেক্রেটারী।
৪। রায় সাহেব সুরেন্দ্রকান্ত বসু মজুমদার, এম্-এল্-সি।
৫। খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহ্মদ, এম্-এল্-সি।
৬। কুমার টিকেন্দ্রনারায়ণ, এম্-এল্-সি।
৭। শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ রায়, এম্-এল্-সি।

কুচবিহার মিউনিসিপ্যালিটির নূতন কমিশনার ও কর্ম্মকর্ত্তা নিয়োগ—

বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে নূতন কুচবিহার মিউনিসিপাল আইন পাশ হইয়াছে। এই আইন অনুসারে গত ১লা জানুয়ারী হইতে কুচবিহার টাউন-কমিটির নাম কুচবিহার মিউনিসিপ্যালিটি রাখা হইয়াছে এবং ইহার কমিশনারের সংখ্যা এগারো জন হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। নূতন বেসরকারী কমিশনার নির্ব্বাচন সাপেক্ষে কুচবিহার দরবার দুই বৎসরের জন্য ছয়জন সরকারী কর্ম্মচারী ও পাঁচজন বেসরকারী ব্যক্তিকে কুচবিহার মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নিযুক্ত করিয়াছেন। সরকারী কমিশনারদিগের মধ্যে ফৌজদারী আহিলকার, ষ্টেট্ ইঞ্জিনিয়ার, হেল্থ অফিসার, সদরের সিনিয়ার নায়েব আহেলকার প্রভৃতি আছেন। রায় সাহেব উমানাথ দত্ত, শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য, মৌলভী মজির উদ্দীন আহমদ, শ্রীযুত সুধাংশুমোহন বক্সী এবং শ্রীযুত উমেশচন্দ্র বণিক বেসরকারী কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। দরবার রায় সাহেব

উমানাথ দত্ত মহাশয়কে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিয়াছেন ; কমিশনারগণ সদরের সিনিয়র নায়েব আহিলকার শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র মুস্তাফীকে ভাইসচেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। কুচবিহার মিউনিসিপ্যালিটীতে এই সর্ব্বপ্রথম বেসরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইলেন।

কুচবিহার সংক্রামক হাসপাতালের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন—

কুচবিহারে কলেরা ও বসন্ত রোগের চিকিৎসার জন্য পৃথক কোন হাসপাতালের বন্দোবস্ত ছিল না। কুচবিহার দরবার এইরূপ একটি হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে ঐ জন্য অর্থ মঞ্জুর করেন। কুচবিহার সহর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে রাজারহাট নামক স্থানে হাসপাতাল নির্ম্মাণের স্থান নির্ব্বাচিত হয়। গত ১২ই জানুয়ারী বৈকাল ৫টার সময় মহারাজা ভূপ বাহাদুর স্বয়ং এই হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। রাজ্যের বহু সরকারী কর্ম্মচারী ও বেসরকারী ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী মহাশয় মহারাজাকে অভ্যর্থনা করিয়া সংক্রামক হাসপাতালের উপকারিতা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন এবং মহারাজা বাহাদুর তাহার উত্তর দেন। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরের মধ্যেই হাসপাতাল নির্ম্মিত হইবে ; ইহার জন্য একলক্ষ তিপান্ন হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

দেশবিদেশের কথা

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধিদলের ভারত ভ্রমণ—

দশ জন সদস্য লইয়া গঠিত ব্রিটিশ পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধিদল গত ৫ই জানুয়ারী ভারতবর্ষে পৌছিয়াছেন। মিষ্টার রিচার্ড এই দলের দলপতি, এই দলে একজন মহিলাও আছেন। ভারতে পৌছিয়াই দলপতি মিষ্টার রিচার্ড বলেন যে, তাঁহারা সরকারীভাবে এদেশে আসেন নাই, এদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহারা ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন ; এবং তাঁহারা আশা করেন যে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা দ্বারা তাঁহারা ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে বন্ধুত্ব ও প্রীতির ভাব বর্দ্ধিত করিতে পারিবেন। প্রতিনিধিদল কখনও একত্রে এবং কখনও ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহারা প্রধান প্রধান ভারতীয় নেতাদের সহিত দেখা করিতেছেন এবং গ্রামাঞ্চলে যাইয়া গ্রামবাসীদের সহিতও আলাপ আলোচনা করিতেছেন। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে যে সকল বিবৃতি দিতেছেন তাহাতে তাঁহাদিগকে ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলিয়াই বোধ হয়।

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবর্দ্ধনা—

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার জীবিত কবিদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। গত ৩রা জানুয়ারী তাঁহাকে

কলিকাতায় এক জনসভায় সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন; কবিশেখর কালিদাস রায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই কবি করুণানিধানের প্রতিভা বিশ্লেষণ করিয়া বক্তৃতা দেন। কালিদাস রায় করুণানিধানকে "রূপের কবি, স্বপ্নের কবি, আনন্দের কবি" বলিয়া অভিহিত করেন। কুমুদরঞ্জন মল্লিক বলেন যে, "ভাষার এত বড় নিপুণ চিত্রকর, এমন অপরাজেয় শিল্পী বিরল।"

অনুষ্ঠানে কবিকে একখানি মানপত্র ও বিবিধ উপহার দেওয়া হয়। অভিনন্দনের উত্তরে কবি নিজ জীবনের কাব্যসাধনার ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া বিদায়-গ্রহণচ্ছলে বলেন—

"লহ গো সবে আমার নমস্কার,
হৃদয়—ভরা প্রীতির ফুল-হার।"

বর্দ্ধমানের গ্রামে যক্ষ্মা স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপন—

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী রামকুমার বাঙ্গুর একটি যক্ষ্মানিবাস স্থাপনের জন্ত প্রায় তিন লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। বর্দ্ধমান জিলার আমুলিয়া গ্রামে একটি যক্ষ্মানিবাস স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই যক্ষ্মানিবাসে ৬০০ রোগীর স্থান হইবে। আমুলিয়া গ্রামটি স্বাস্থ্যকর এবং এখানকার বায়ু শুষ্ক। গত ৫ই জানুয়ারী বাংলার গভর্ণর মিষ্টার কেসী এই স্বাস্থ্যনিবাসের ভিত্তি স্থাপন করেন।

দেশীয় রাজ্য মন্ত্রী সম্মেলন—

জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে নয়া দিল্লীতে ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের মন্ত্রীগণের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফলাফল দেশীয় রাজ্যসমূহের উপর কিরূপ হইবে তৎসম্বন্ধে এবং অন্তান্ত নানা বিষয়ে আলোচনা হয়।

চীনে গৃহযুদ্ধের অবসান—

চীনে বহুদিন পর্য্যন্ত কমিউনিষ্ট ও কুওমিণ্টাং দলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলিতেছিল। জাপানী যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই গৃহযুদ্ধ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। আপোষের নানা প্রচেষ্টা কেবলই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে চীনে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত জেনারেল মার্শালের মধ্যস্থতায় এই গৃহযুদ্ধের অবসান হইয়াছে। আমরা আশা করি দুই দলের মিলনের ফলে চীন ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিবে।

লণ্ডনে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের (U. N. O) অধিবেশন—

গত ১০ই জানুয়ারী লণ্ডনে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের অধিবেশন আরম্ভ হয়। পৃথিবীর ৫১টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছেন। বেলজিয়ামের পররাষ্ট্রসচিব ডক্টর স্প্যাক অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। শুভবুদ্ধি চালিত হইয়া জাতিপুঞ্জ জগতে শান্তি স্থাপনে সক্ষম হউক ইহাই প্রার্থনা করি। নিজ নিজ রাষ্ট্রস্বার্থের কথা না ভাবিয়া সমগ্র জগতের কল্যাণের কথা ভাবিলেই প্রকৃত শান্তি আসিবে; নতুবা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অচিরেই দেখা দিবে।

জার্ম্মাণীর নিকট হইতে আদায়ী ক্ষতি-পূরণে ভারতের অংশ—

জার্ম্মাণীর নিকট হইতে যে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হইবে তাহার অংশ মিত্রপক্ষের মধ্যে কি ভাবে বণ্টন করা হইবে তাহা নির্দ্ধারণের জন্য গত ডিসেম্বর মাসে প্যারিসে মিত্রপক্ষের এক সম্মেলন হইয়াছিল। ইহাতে স্থির হইয়াছে যে জার্ম্মাণীর নিকট যে সকল দ্রব্যসম্ভার আদায় হইবে ভারতবর্ষ তাহার শতকরা প্রায় তিন ভাগ এবং অন্যান্য আদায়ের শতকরা দুই ভাগ পাইবে।

অ্যালবেনিয়ায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা—

রয়টারের এক ঘোষণায় প্রকাশ যে অ্যালবেনিয়া রাজ্যে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। রাজা জোগ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংলণ্ডে বাস করিতেছিলেন; তাঁহাকে নির্ব্বাসনেই জীবন কাটাইতে হইবে।

বঙ্গীয় রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটিতে স্যার উইলিয়াম জোন্সের দ্বিশত জন্ম বার্ষিকী অনুষ্ঠান—

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে স্যার উইলিয়ম জোন্স বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন। স্যার উইলিয়ম ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন এবং কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হইয়া ভারতবর্ষে আসেন। বর্ত্তমান ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে স্যার উইলিয়ামের জন্মের দুই শত বৎসর পূর্ণ হইল। স্যার উইলিয়ামের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নিমিত্ত বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি—ইহা রাজকীয় অনুমোদন লাভ করিয়া বর্ত্তমানে রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি নামে পরিচিত—জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিশেষ অনুষ্ঠানাদি করেন। প্রধানতঃ স্যার উইলিয়ামের চেষ্টাতেই পাশ্চাত্য জগতে প্রথমে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার আরম্ভ হয় এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতকে শ্রদ্ধা করিতে শেখেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া সোসাইটি যোগ্য কাজ করিয়াছেন।

ডক্টর রমা চৌধুরীর সম্মান লাভ—

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে বাঙ্গালী মহিলা দার্শনিক ডক্টর রমা চৌধুরী রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির "ফেলো" নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনিই নারীদিগের মধ্যে প্রথম এই সোসাইটীর সদস্যা নির্ব্বাচিত হইলেন। ডক্টর চৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ ও এম্-এ পরীক্ষায় দর্শনে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া অক্সফোর্ড পড়িতে যান এবং সেখান হইতে দর্শনে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া ডি-ফিল উপাধি পান। তিনি বহু গবেষণামূলক পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার স্বামী ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর সহযোগে তিনি কলিকাতায় "প্রাচ্য বাণীমন্দির" স্থাপন করিয়া গবেষণাকার্য্যে সকলকে উৎসাহ দিতেছেন। ডক্টর চৌধুরীর একটি প্রবন্ধ আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করিলাম।

ডক্টর চৌধুরী স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের পৌত্রী।

ভূপালের নবাব বাহাদুরের জিন্না ও গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎকার—

ভূপালের নবাব বাহাদুর ভারতীয় রাজন্য পরিষদের চ্যান্সেলার। ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র রচনায় একদিকে ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং অপরদিকে

রাজন্যবর্গ এই উভয়কে মিলিতভাবে কার্য্য করিতে হইবে। এইজন্য ভূপালের নবাব বাহাদুর রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিরূপে রাজনৈতিক নেতৃগণের সহিত আলাপ আলোচনা করিতে ইচ্ছুক। জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি মিষ্টার জিন্নার সহিত আলাপ করিয়াছেন। এক সংবাদে প্রকাশ যে, তিনি মহাত্মা গান্ধীকে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সময় ভূপালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর পক্ষে ভূপাল যাওয়া সম্ভব না হইলে নবাব বাহাদুর দিল্লীতে তাঁহার সহিত দেখা করিবেন।

চট্টগ্রামে সৈনিকদিগের অনাচার—

বিগত ৭ই জানুয়ারী চট্টগ্রামের উপকণ্ঠে কাহার-পাড়া নামক গ্রামে সিভিল লেবার ইউনিটের একদল সৈন্য অমানুষিক অত্যাচার করে। ঐদিন সন্ধ্যায় লেবার ইউনিটের কয়েকজন লোক উক্ত গ্রামে প্রবেশ করিয়া একটি স্ত্রীলোককে ধরিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। গ্রামবাসীরা ইহাতে বাধা দেয় এবং লোকদিগকে তাড়াইয়া দেয়। কিন্তু তৎপরে রাত্রে প্রায় তিনশত সৈনিক ঐ গ্রামে প্রবেশ করিয়া ঘর বাড়ী আগুন দিয়া পোড়াইয়া দেয় এবং লুটতরাজ করে। গ্রামের বহু লোক গৃহহীন হয়, কয়েকজন আহত হয় এবং একজন মারা যায়। সরকারী এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে অনাচারী সৈনিকগণকে বিচারের জন্য গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং গ্রামবাসীগণকে ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ডায়মণ্ড হারবারে গঙ্গাসাগর যাত্রীদিগের প্রাণনাশ—

যুদ্ধকালে গঙ্গাসাগর মেলা বন্ধ ছিল; পাঁচ বৎসর পরে গত পৌষ সংক্রান্তিতে পুনরায় এই মেলার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রায় পঁচিশ হাজার তীর্থযাত্রী ডায়মণ্ড হারবার হইতে গঙ্গাসাগরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। গত ১২ই জানুয়ারী ডায়মণ্ড হারবারে এক শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে। যাত্রীগণের ষ্টীমারে উঠিবার জন্য দুইটি সাময়িক জেটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। সকালে এগারোটার সময় একটি জেটি ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ১৩ জন যাত্রী নিহত ও ২৫ জন আহত হয়; বিকাল পাঁচটায় আবার অপর জেটিটি ভাঙ্গিয়া যায় এবং ১২৯ জন যাত্রী নিহত ও ৫৫ জন আহত হয়। নিহতদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক ও অবাঙ্গালী। আমরা নিহতদের আত্মীয়গণকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব—

গত ১৭ই জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার মিষ্টার কেসী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে বর্ত্তমান বৎসরের মধ্যেই ঢাকার মেডিক্যাল স্কুলটি কলেজে পরিণত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ভাইস-চ্যান্সেলর ডক্টর হাসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আরও অর্থ দাবী করেন এবং বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে ইহার সহিত জনসাধারণের আশাআকাঙ্ক্ষা, আদর্শ বা ঐতিহ্যের কোন সামঞ্জস্য নাই; বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন—

গত ২৫শে হইতে ২৭শে ডিসেম্বর মীরাটে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে দুই শতাধিক প্রতিনিধি এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মূল সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। কথা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন দর্শন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত বৃহত্তর বঙ্গ, এবং শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্প ও বাণিজ্য শাখায় সভাপতিত্ব করেন। এতদ্ব্যতীত দিল্লী ইন্দ্রপ্রস্থ কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীযুক্তা প্রভা সেনগুপ্তার সভানেত্রীত্বে একটি মহিলাশাখার অধিবেশন হয়। যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি স্যার সীতারাম সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ একটি সংবাদপত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; এই প্রদর্শনী একটি বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হইয়াছিল।

সম্মেলনের মূল সভাপতি এবং বিভিন্ন বিভাগীয় সভাপতিগণ কয়েকটি সারবান্ বক্তৃতা প্রদান করেন। এস্থলে ঐ সকল বক্তৃতার বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে, আমরা কয়েকটি বক্তৃতার উল্লেখমাত্র করিতেছি। মূল সভাপতি পণ্ডিত সেন বাংলার সংস্কৃতি ও আধুনিক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বাংলার বর্তমান অবনতির কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া পণ্ডিত সেন বলেন, "চরিত্রের অভাবই তার সর্বনাশের মূল। এই দোষেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি গ্রীকেরা মরেছেন রোমানদের দাস হয়ে। চরিত্র নেই বলেই বিধাতার কৃপায় আমরা বঞ্চিত। ... এই চরিত্রের অভাবেই আমরা একজন অন্যের সঙ্গে মিলতে পারিনে। মিশতে পারি, কিন্তু মিলতে পারিনে। ... চরিত্রের অভাবেই বাঙ্গালী অধ্যবসায়-হীন। দীর্ঘকাল ধরে সে কোন সাধনাই চালাতে পারে না।" তাই পণ্ডিত সেন বারংবার বাঙ্গালীর চরিত্রগঠনের উপর জোর দেন। প্রবাসী বাঙ্গালীদের সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন যে তাঁহারা যে যে প্রদেশে আছেন তাঁহাদিগকে সেই সেই প্রদেশের অধিবাসীদের আপন করিয়া লইতে হইবে। তাঁহার ভাষায়ই বলি, "তাই বার বার এই কথাই মনে হচ্ছে, স্বার্থ দ্বেষ দ্বন্দ্ব ক্ষুদ্রতা ছেড়ে মহৎ আদর্শে বড় হয়ে সকলকে এক হতে হবে। এদেশের সুখদুঃখের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। শুধু তাই নয়, আমাদের চরিত্রের জোরে এই সব দেশের সঙ্গেও বাঙ্গলা দেশের যোগ সত্য করে তুলতে হবে। নানাদিক দিয়েই আমাদের এক হবার জন্য তাগিদ আছে। আমাদের সাধনার দ্বারা তাকে সত্য করে সার্থক করে তুলতে হবে। বাংলা দেশ ও অবাংলার মধ্যে প্রেমের যোগ স্থাপন করতেই হবে।"

সাহিত্যশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, সাহিত্যের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি হইলেও সাহিত্যিককে সমাজ-সচেতন হইতে হইবে এবং বাস্তবতার উপর ভিত্তি করিয়া রসের সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তিনি বলেন, "সমাজ-সচেতনতা লেখকের মস্ত বড় গুণ।

যিনি দেশের অভাব-অভিযোগের প্রতি উদাসীন থেকে সাহিত্য-রচনা করেন, তিনি নিজের কবি-মানসের প্রতি অবিচার করেন।...... সাহিত্য শুধু রস-বিলাস নয়; জীবনসমস্যার সমাধানের গূঢ় ইঙ্গিত থাকবে যে সাহিত্যের মধ্যে, তারই মধ্যে আমরা পাব কলালক্ষ্মীর কল্যাণতম মূর্ত্তিটির সন্ধান।" দর্শনশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন আক্ষেপ করিয়া বলেন যে, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহে ভারতীয় দর্শন অপেক্ষা ইউরোপীয় দর্শনের পঠন-পাঠনের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। ইহার ফলে জীবনের সহিত দর্শনের ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয় নাই। তিনি বলেন যে জাতীয় জীবন গঠনে দর্শনের প্রেরণা আবশ্যক, জাতিকে জীবন-মন্ত্র শুনাইবার জন্য তিনি ভারতীয় দার্শনিকগণকে আহ্বান করেন। বৃহত্তর বঙ্গ বিভাগের সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত বলেন যে, "বাঙ্গলার বাহিরে যেখানে বাঙ্গালী তাহার ভাষা, শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি অনুসারে বাস করিতেছে, সেই সকল স্থানই খণ্ড খণ্ড বঙ্গদেশ এবং এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন বঙ্গদেশ লইয়াই বৃহত্তর বঙ্গ গঠিত। এই মতের মূল কথা এই যে যেখানেই বাঙ্গালী, সেইখানেই বাঙ্গলাদেশ।...... এই বৃহত্তর বঙ্গের স্থান মাটিতে নহে, ইহার প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালীর মনে।" শিল্প ও বাণিজ্য শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দেশকে সর্ব্বতোভাবে শিল্পসমৃদ্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন এবং বাঙ্গলার যুবক সম্প্রদায়কে শিল্প ও বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ দেন। মহিলাশাখার সভাপতি শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা বলেন যে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে অস্বীকার করা কখনও নারীসমাজের আদর্শ হইতে পারে না।

সম্মেলনের এই অধিবেশনে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "ভারতীয় বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন" নাম রাখা হইয়াছে। সম্মেলনকে একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে স্থির হইয়াছে যে এলাহাবাদ দিল্লী এবং কলিকাতায় উহার কার্য্যকলাপ কেন্দ্রীভূত করা হইবে এবং আগামী অধিবেশনের পূর্ব্বেই ৫০ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সম্মেলনের জন্য একটি স্থায়ী তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন—

জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে বাঙ্গালোর সহরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৩শ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাংলা দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের অন্যতম সদস্য অধ্যাপক আফজল হোসেন এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে বহু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক এই অধিবেশনে যোগদান করেন। মহীশূরের দেওয়ান সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং মহীশূরের মহারাজা একটি বাণী প্রেরণ করেন। এই বাণীতে মহারাজা বলেন, "বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য্য নব নব আবিষ্কার ও সাফল্য অতীত যুগকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছে। তবে বিজ্ঞানের এই শক্তি যেন বিশ্বের জাতিপুঞ্জের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ও মানবজাতিকে সুখশান্তির উচ্চতম গ্রামে লইয়া যাইবার জন্য নিয়োজিত হয় ইহাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।"

অধ্যাপক হোসেন তাঁহার অভিভাষণে ভারতের খাদ্যসমস্যা লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীর পুনর্গঠনে বৈজ্ঞানিকগণের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। ইউরোপ, সুদূর প্রাচ্য ও

ভারতবর্ষে খাদ্যের ঘাটতি রহিয়াছে। ভারতের বর্ত্তমান লোকসংখ্যা প্রায় চল্লিশ কোটি। এই বিরাট জনসংখ্যাকে উপযুক্তভাবে খাওয়াইতে হইলে খাদ্যের উৎপাদন হার বাড়াইতে হইবে। একর প্রতি জমির উৎপাদন হার অতি দ্রুত বাড়াইতে না পারিলে ভারতের খাদ্যসমস্যার সমাধান হইবে না। অধ্যাপক হোসেনের মতে ধান্য গম ইত্যাদি শতকরা ১০ ভাগ, ফল ৫০ ভাগ, শাক সবজী ১০০ ভাগ, ডাল ২০ ভাগ, চর্ব্বি ও তৈল ২৫০ ভাগ, দুগ্ধ ৩০০ ভাগ, মৎস্য মাংস ও ডিম ৩০০ ভাগ বেশী উৎপন্ন করিতে হইবে।

রসায়ন বিভাগের সভাপতি ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ পুষ্টিকর খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে ভারতের শতকরা আশী হইতে নব্বই জন লোক পুষ্টিকর খাদ্য পায় না; অথচ বহু খাদ্যদ্রব্যের অপচয় ঘটিয়া থাকে। খাদ্যবিজ্ঞানের সাহায্যে এই অপচয় নিবারণ করিতে হইবে। ডক্টর গুহ খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

ভূতত্ত্ব ও ভূগোল বিভাগের সভাপতি ডক্টর ক্রুকস্যাঙ্ক (Crookshank) সদ্য সমাপ্ত মহাযুদ্ধে ভারতীয় খনিজ শিল্পের কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহার একটি বিবরণ দেন এবং কয়লা, তৈল, অভ্র ও লৌহ শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি জানান যে পাঞ্জাবে একটি নূতন তৈলের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পুরাতত্ত্ব বিভাগের সভাপতি মিষ্টার মর্টিমার হুইলার একটি কেন্দ্রীয় পুরাতত্ত্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। পুরাতত্ত্ব আবিষ্কারে আকাশ হইতে ফটোগ্রাফ গ্রহণের উপর তিনি খুব জোর দেন; তিনি মনে করেন যে এইরূপ ফটোগ্রাফ গৃহীত হইলে মরুভূমিতে অনেক বিস্ময়কর আবিষ্কার হইতে পারে।

আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বিজ্ঞান কংগ্রেস একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে বিভিন্ন দেশে আণবিক শক্তি সম্বন্ধে যে সকল গবেষণা হইতেছে তাহা গোপন না রাখিয়া একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানপরিষদের নিকট উদ্ঘাটিত করা উচিৎ; তাহা হইলে এই শক্তি ভবিষ্যতে ধ্বংসকার্য্যে নিয়োজিত না হইয়া শান্তির-কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারিবে।

নোট ও ব্যাঙ্ক অর্ডিন্যান্স—

ভারত সরকার সম্প্রতি নোট ও ব্যাঙ্ক অর্ডিন্যান্স নামে দুইটি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। নোট অর্ডিন্যান্সটি ২ই জানুয়ারী এবং ব্যাঙ্ক অর্ডিন্যান্সটি ১৪ই জানুয়ারী জারী করা হয়।

নোট অর্ডিন্যান্সে বলা হয় যে অর্ডিন্যান্স জারীর তারিখ হইতে পাঁচ শত টাকা, হাজার টাকা ও দশ হাজার টাকার নোট আর বৈধ মুদ্রারূপে (legal tender) স্বীকৃত হইবে না। দেশে চোরাবাজারী কারবার বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এই অর্ডিন্যান্স জারী হইয়াছে। এক সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে চোরাকারবার চালাইবার জন্য বাজারে বহু পরিমাণ বেশী মূল্যের নোট আটক আছে বলিয়া মনে হয়; গভর্ণমেণ্ট, বিশেষ করিয়া আয়কর বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ, যাহাতে চোরাকারবারে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ অবগত হইতে পারেন, সেই জন্যই এই অর্ডিন্যান্স জারী হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করেন যে ইহার ফলে চোরাবাজারী কারবার অনেকটা কমিয়া যাইবে এবং জনসাধারণ ইহা দ্বারা উপকৃত হইবেন। জনসাধারণের নিকট উর্দ্ধমূল্যের যে সকল নোট আছে নির্দ্দিষ্ট ফর্ম্মে

অবশ্য জ্ঞাতব্য কতগুলি বিবরণ জানাইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক কিম্বা গভর্ণমেণ্ট ট্রেজারীতে দরখাস্ত করিলে নোটের ভাঙ্গানি পাওয়া যাইবে। গভর্ণমেণ্ট বলেন যে জনসাধারণের এই অর্ডিন্যান্সে শঙ্কিত হইবার কিছুই নাই।

চোরাবাজারী কারবার বন্ধ হউক ইহা সকলেই কামনা করে। আমরা আশা করি এই অর্ডিন্যান্সের ফলে চোরাবাজারী কারবার কমিয়া যাইবে এবং জনসাধারণের দুর্গতির অনেকটা লাঘব হইবে। ইংলণ্ড এবং অন্য কোন কোন দেশে ইতিপূর্ব্বেই উর্দ্ধমূল্যের নোট অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতের জনসাধারণ অজ্ঞ ও নিরক্ষর। অনেকে তাহাদের জীবনের সঞ্চয় উর্দ্ধমূল্যের নোটে রূপান্তরিত করিয়া রাখে, বিশেষতঃ, স্ত্রীলোকদের মধ্যে এই প্রথা বহুল প্রচলিত। এই সকল জনসাধারণের যাহাতে কোনরূপ ক্ষতি না হয় তৎপ্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

ব্যাঙ্ক অর্ডিন্যান্স দ্বারা ভারতসরকারকে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে তাঁহারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে যে কোনও ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তদন্ত করিবার নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন। তদন্তের ফলে যদি দেখা যায় যে কোন ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কার্য্য করিতেছে তাহা হইলে ভারতসরকার ব্যাঙ্কের ঐ প্রকার কার্য্য বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন। গভর্ণমেণ্ট কোন ব্যাঙ্কের নূতন করিয়া আমানত গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিতে পারেন, ব্যাঙ্কটিকে সিডিউল্ড বলিয়া গণ্য করিতে অস্বীকার করিতে পারেন, অথবা কোনও সিডিউল্ড ব্যাঙ্ককে তালিকা-বহির্ভূত করিয়া দিতে পারেন।

যুদ্ধজনিত মুদ্রাস্ফীতির ফলে ব্যাঙের ছাতার ন্যায় বহু নূতন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং কোন কোন পুরাতন ব্যাঙ্কও আমানতকারীদিগের স্বার্থবিরোধী কার্য্য করিতেছে। এমতাবস্থায় ভারতসরকার এই ব্যাঙ্ক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া ঠিক কাজই করিয়াছেন। *প্রকাশ যে ভারতসরকার শীঘ্রই একটি নূতন ব্যাঙ্কিং* বিল তৈয়ারী করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

রাজন্য পরিষদের অধিবেশন—

প্রায় দুই বৎসর পরে গত ১৭ই ও ১৮ই জানুয়ারী দিল্লীতে রাজন্যপরিষদের (Chamber of Princes) অধিবেশন হয়। ভারতসরকারের রাজনৈতিক বিভাগের সহিত মতান্তরের ফলে গত বৎসর রাজন্য-পরিষদের কোন অধিবেশন হয় নাই। এই বৎসরের অধিবেশন নানা দিক দিয়াই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়া বড়লাট বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে বিগত মহাযুদ্ধে ভারতীয় নৃপতিগণ বিশ্বস্তভাবে মিত্রশক্তিবর্গকে সাহায্য করিয়াছেন। দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে যে সব সৈন্যদল বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছে তাহারা সর্ব্বত্রই অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে এবং পাঁচ জন সৈনিক ভিক্টোরিয়া ক্রস লাভ করিয়াছে। বড়লাট রাজন্যবর্গকে প্রতিশ্রুতি দিয়া বলেন যে সম্রাটের সহিত তাঁহাদের বর্ত্তমানে যে সম্পর্ক রহিয়াছে অথবা সন্ধিসূত্রে তাঁহারা যে সকল অধিকার ভোগ করিতেছেন তাঁহাদের সম্মতি ব্যতীত ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময় ইহাদের কোন পরিবর্ত্তন করা হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে বড়লাট এই আশাও পোষণ করেন যে ভারতীয় নৃপতিগণ ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করিবেন এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী

সভায় (Constitution-making body) আলাপ আলোচনার ফলে যদি কোন পরিবর্ত্তন করাব সিদ্ধান্ত হয় যুক্তিযুক্ত হইলে নৃপতিগণ তাহাতে সম্মতি দিবেন। বড়লাট দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পথে কোনও বাধা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা নৃপতিগণের নাই। যুদ্ধের সময় নৃপতিগণ যেমন নেতার আসন গ্রহণ করিয়াছেন, বড়লাট আশা করেন যে শান্তির সময়েও তাঁহারা সেইরূপ নেতার আসন গ্রহণ করিবেন।

বড়লাটের আশা যোগ্যপাত্রেই ন্যস্ত হইয়াছে। ১৮ই জানুয়ারী রাজন্য পরিষদের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে পরিষদের চ্যান্সেলার ভুপালের নবাব বাহাদুর দেশীয় রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে এক প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া আবেগের সহিত বলেন যে, রাজন্যবর্গের মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে স্বাধীন এবং জগতের জাতিসমূহের নিকট সম্মানিত দেখিতে ইচ্ছা করেন না। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহ ভারতের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদালাভের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ সমর্থন করে এবং ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য সর্ব্ববিধ সাহায্য করিতে তাহারা সর্ব্বদাই ইচ্ছুক। এই সম্পর্কে দেশীয় রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক যে সকল সংস্কার অবিলম্বে প্রবর্ত্তিত হইবে তৎসম্বন্ধে নবাব বাহাদুর রাজন্যপরিষদের পক্ষ হইতে একটী ঘোষণা প্রদান করেন। এই ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে দেশীয়রাজ্য সমূহে প্রজাসাধারণের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা হইবে; শাসন কর্ত্তৃপক্ষ বিচারবিভাগের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না, প্রত্যেক রাজন্যের ব্যক্তিগত ব্যয়ের হিসাব (Civil list) সাধারণ বাজেট হইতে পৃথক করিয়া রাখা হইবে, ন্যায়সঙ্গতভাবে কর ধার্য্য করা হইবে এবং সংগৃহীত রাজস্বের একটী মোটা অংশ জনসাধারণের কল্যাণকল্পে, বিশেষতঃ জাতিগঠনমূলক কার্য্যে, ব্যয়িত হইবে।

দেশীয় রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে সময় সময় এই অভিযোগ আনা হয় যে তাঁহারা মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক নীতিতে চলিতে অভ্যস্ত, কিন্তু এই ঘোষণা হইতে দেখা যাইবে যে তাঁহারা গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজ নিজ রাজ্যের মঙ্গলবিধানে আগ্রহশীল। আমরা আশা করিতে পারি যে ব্রিটিশ ভারত ও ভারতীয় ভারতের সমবেত প্রচেষ্টায় অদূর ভবিষ্যতে এক স্বাধীন মহাভারত জন্মলাভ করিবে।

রাজন্যপরিষদের ঘোষণায় দেশীয় রাজ্য প্রজাসম্মেলনের প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে ইহা স্পষ্টতঃই যুগোপযোগী হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে ভারতে যে বৃহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিতে চলিয়াছে এই ঘোষণা দ্বারা তাহাই বুঝা যায়।

খেলাধুলা

ক্রিকেট

গত ২০শে ডিসেম্বর কানপুরে বাংলাদলের সহিত যুক্তপ্রদেশ দলের রঞ্জিট্রফি প্রতিযোগিতা উপলক্ষে একটি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলাদল ৪৪ রাণে জয়ী হইয়াছে। বাংলা দলে পি দত্ত, এন্ চাটার্জ্জি এবং কোচবিহারের মহারাজা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

ডিসেম্বরের শেষভাগে কোচবিহার দলের সহিত ক্যাবলস্ দলের একটি ক্রিকেট ম্যাচ কলিকাতায় উড্ল্যাণ্ডস্এ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ক্যাবলস্ দল খেলায় পরাজিত হইয়াছেন। কোচবিহার দলে বিখ্যাত টেস্ট খেলোয়াড় এস্ বানার্জ্জি নট আউট থাকিয়া ১০ রাণ করেন।

রবীন্দ্রস্মৃতি ফাণ্ডে অর্থ সংগ্রহের জন্য ইডেন উদ্যানে সি, এ, বি, দলের সহিত সার্ভিস দলের ৫ই জানুয়ারী হইতে তিনদিন ব্যাপী একটি ক্রিকেট খেলা হয়। সি, এ, বি, দলের অধিনায়ক ছিলেন মুস্তাক আলী এবং কোচবিহারের মহারাজা সার্ভিস দলের অধিনায়ক ছিলেন। খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। কোচবিহারের মহারাজা বোলিংএ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

রেডক্রস ফাণ্ডে অর্থসংগ্রহের জন্য জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে কোচবিহার মহারাজার একাদশের সহিত গবর্ণর একাদশের মধ্যে ইডেন উদ্যানে একটি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

গত ১৯শে, ২০শে ও ২১শে জানুয়ারী বাংলাদেশের সহিত হোলকার দলের একটি ক্রিকেট ম্যাচ (রঞ্জিট্রফি প্রতিযোগিতা) কলিকাতায় ইডেন উদ্যানের মাঠে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলাদল ১ম ইনিংসে ১১৯ এবং হোলকার দল ১ম ইনিংসে ২৮৪ রাণ করেন। বাংলাদল দ্বিতীয় ইনিংসে ২৬৬ রাণ তুলেন। নির্ম্মল চাটার্জ্জির ৯৯ রাণ উল্লেখযোগ্য। হোলকার দল দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে ১০২ রাণ করিয়া বাংলাদলের রাণসংখ্যা অতিক্রম করে এবং ৫ উইকেটে জয়ী হয়।

দাবা

ইংলণ্ডের হেষ্টিংস্ সহরে ১লা জানুয়ারী তারিখে স্যার জর্জ্জ টমাস দাবা প্রতিযোগিতায় হল্যাণ্ডের ডাক্তার এম্ ইউইকে পরাজিত করিয়াছেন। ডাক্তার এম্ ইউই দাবা খেলায় পৃথিবীর চ্যাম্পিয়ন ছিলেন।

স্থানীয় খেলা-ধুলা

গত ৫ই জানুয়ারী দিনহাটা (কোচবিহার) পায়োনিয়ার্স ক্লাবের ৭ম বার্ষিক স্পোর্টস বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ে বহুসংখ্যক প্রতিযোগী যোগদান করায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষিত হয়। প্রথম বিভাগে ননী দাস, দ্বিতীয় বিভাগে নাবু বোস, তৃতীয় 'ক' ও 'খ' বিভাগে পুনু বসু ও পিণ্টু মিত্র কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। স্থানীয় নায়েব আহেলকার শ্রীযুত মানবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এল মহোদয় বিজয়ীগণকে পুরস্কার বিতরণ করেন।

পুস্তক-পরিচয়

মরণ মেলার যাত্রী—লেখক শ্রীবাসবিহারী মণ্ডল প্রকাশক—বিশ্ববাণী ৯, ডবলু, সি, ব্যানার্জ্জি রোড কলিকাতা। মূল্য ১৷৷০

আলোচ্য পুস্তকখানি ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস। লেখক এই পুস্তকে এক ভুক্তভোগী কিশোর বালকের মুখে পঞ্চাশের মন্বন্তরের যে করুণ আখ্যায়িকাটী বিবৃত করিয়াছেন তাহা যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি রোমাঞ্চকর।

কিশোর বালক ফটিক দুর্ভিক্ষের প্রথম চোটে বৃদ্ধ বাবা, মা ও কাকার হাত ধরিয়া গাঁ ছাড়িয়া চলিল কলিকাতার দিকে খাবারের সন্ধানে। সঙ্গে তাহার ছোট ভাই আর দুইটী বোন। পথে ঘুমন্ত মায়ের কোল হইতে ঘুমন্ত ছোট বোনটাকে শিয়ালে টানিয়া খাইল। কাকা হাটে কাপড় চুরি করিয়া স্বেচ্ছায় ধরা দিল, জেলে যাইয়া অন্ততঃ দুইবেলা খাইতে পাইবে এই আশায়। কোনও রকমে কলিকাতা পৌঁছিয়া বৃদ্ধ কঙ্কালসার পিতা অতি কষ্টে তাহাদের জন্য দুইগ্রাস অন্ন খুঁটিয়া আনিতেছিল মিলিটারি লরীর নীচে পড়িয়া সেও একদিন মরণ মেলার যাত্রী হইল। সন্তপ্ত মায়ের কাছে বাবার লরীচাপা পড়ার কথা গোপন রাখিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে ফটিক ভিক্ষা করিয়া মা, ভাই বোনের প্রাণ রক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু শীঘ্রই একদিন অপ্রত্যাশিত লাভের পুলকে উৎফুল্ল হইয়া ভিক্ষা হইতে ফিরিয়া দেখে তার মা, ভাই বোন কেহ নাই—পুলিশের লোকে তাহাদের কোথায় লইয়া গিয়াছে কে জানে।

খাবারের চেষ্টা করিতে করিতে এরপর সে আসিয়া পড়ে এক গুণ্ডার দলে। তাহারা চেষ্টা করিল এই নবাগতকে নিজেদের পেশা শিখাইয়া দলপুষ্ট করিতে। ফটিক কিন্তু দৃঢ় থাকিল ন্যায় ও সত্যের পথে। একদিন রাত্রির অন্ধকারে বাধ্য হইয়া এইদলের একজনের সঙ্গে তাহাকে যাইতে হইল কোনও বড়লোকের বাড়ীতে চুরি করিবার জন্য। দেওয়াল বাহিয়া ভিতরে যাইয়া দরজা খুলিয়া দেওয়ার ভার পড়িল এই ছিপছিপে বালকের উপর। ভিতরে সে নামিল; কিন্তু তাহার নৈতিক সংস্কার পরের সর্বনাশ করিতে বাধা দিল তাহাকে। দরজা না খুলিয়া সে উপরে উঠিয়া গৃহ-কর্ত্রীকে জাগাইয়া তুলিল এবং অকপটে সব কথা স্বীকার করিয়া তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিল। ফলে সে স্থায়ী আশ্রয়লাভ করিল এই পরিবারে।

বইখানির ভাষা যেমন ঝরঝরে, বর্ণনাগুলি তেমনি মর্ম্মস্পর্শী। কোমলমতি শিশুদের মনে এই শিক্ষাপ্রদ উপন্যাসখানি গভীর রেখাপাত করিবে সন্দেহ নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

মুকুলের স্বপ্ন—কবি শামসুদ্দীনের রচিত ছোটদের কবিতা বই। কলিকাতা চন্দ্রনিকা পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। দাম বার আনা।

এই পুস্তকে ছোট বড় ১৪টী কবিতা আছে। প্রথম পাঁচটী কবিতায় কবি মা ও খোকার আলাপের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ, মহম্মদ মহসীন, চিত্তরঞ্জন, সিরাজদ্দৌলা ও বীর মোহনলাল—বাঙ্গলার এই পাঁচজন স্মরণীয় পুরুষের ছোট

অথচ অতি সুন্দর পাঁচখানি ছবি আঁকিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দিতে কবি লিখিয়াছেন—

আকাশ ধরা যাহার বাণী শুনে
ধন্য হল, ভ যা পেল ছবি।

সিরাজের কথা স্মরণ করিয়া গভীর ক্ষোভের সঙ্গে কবি বলিয়াছেন —

স্বাধীন দেশের ওই ছেলেটীর সাথে
অস্ত গেছে মোদের দেশের রবি।

বাকী কবিতাগুলিতে আমরা পাই খোকার মুকুল-মনের রঙ্গীন স্বপনের সোনালি ছবি। কবি স্বাধীনতার পূজারী। তাই মুকুলের স্বপনগুলির মধ্যে তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন স্বদেশের শৃঙ্খল মোচনের জন্য দুর্দমনীয় সংকল্প। স্বাধীনতার জন্য শিশুমনের এই সংকল্পবাণী কবির অনবদ্য ভাষায় ঝঙ্কৃত হইয়াছে—

দুরন্ত দুর্মদ বেগে চল ছুটে যাই
সকল বাঁধন ভাঙ্গি আমরা সবাই।

'স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় মা খোকাকে বলিতেছেন—

স্বাধীন দেশের
স্বাধীন ছেলে হয়ে
মুক্ত পথে
ছুটবি আলো রথে।
পথের তরে
প্রাণ যদি তোর যায়
দুঃখ তাতে নাই।

বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট সরস কথায় কবির রসগ্রাহী মনের পরিচয় ফুটিয়া উঠে। স্বদেশের বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন,

ঝরণায় গান গায় নিখিলের কবি
সোনার স্বপন আনে আমাদের রবি।

'ঈদ' কবিতায় কবি পংক্তিকাতরতার যে আদর্শ আঁকিয়াছেন তাহা শিশু পাঠকপাঠিকাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে। প্রচ্ছদপটটি খুবই মনোরম। বাংলাদেশের অভিভাবকেরা ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে এই বইখানি তুলিয়া দিলে কবির পরিশ্রম সার্থক হইবে।

গ্রাহকগণের প্রতি

দরবারের ইং ১৩।৯।৪৫ তারিখের ২৮৭৭ নং আদেশসূত্রে দর্পণের গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে যে তাঁহারা যেন ১৩৫২ সনের চৈত্র পর্য্যন্ত নিজ নিজ বাকী চাঁদা মার্চ্চ মাসের মধ্যে পরিশোধ করিয়া দেন, অন্যথায় তাঁহাদিগকে দর্পণের গ্রাহক তালিকাভুক্ত রাখা যাইবে না। উক্ত আদেশসূত্রে ষ্টেট অফিসারদিগকে বিশেষ করিয়া জানান যাইতেছে যে তাঁহারা দর্পণের বাকী চাঁদা যদি মার্চ্চ মাসের মধ্যে পরিশোধ না করেন তবে তাঁহাদিগের বেতন হইতে বাকী চাঁদা আদায় করা হইবে।

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত এম্-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও কুচবিহার ষ্টেট্ প্রেস হইতে
সুপারিন্টেন্ডেন্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক
১২। মহাকবি গিরিশচন্দ্র (কবিতা)	শ্রীপ্যারীমোহন সেন গুপ্ত	৫৩৪
১৩। গান	বেগম আমিনা	৫৩৪
১৪। রাজপরিবারের সংবাদ		৫৩৫
১৫। স্থানীয় সংবাদ		৫৩৬
১৬। দেশ বিদেশের কথা		৫৩৮
১৭। সাময়িক প্রসঙ্গ		৫৪০
১৮। খেলাধূলা		৫৪৩
১৯। পুস্তক সমালোচনা		৫৪৩

নর্থবেঙ্গল আয়ুর্বেদিক ফার্ম্মেসীর
শ্রীরাধাগোবিন্দ সাহার
আবিষ্কৃত
ধন্বন্তরী পাচন
সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া, প্লীহা, যকৃতের মহৌষধ।
DHANWANTARI PACHAN
মূল্য ১৷৷৹
দেড় টাকা
কুচবিহার, কাইয়াপট্টি

মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণ ক্লাব

কুচবিহার

কোচবিহার দর্পণ

অষ্টম বর্ষ { চৈত্র ১৩৫২ সন, রাজশক ৪৩৬ } ১২শ সংখ্যা

ইংরেজী সাহিত্যে ভিক্টোরীয় যুগ

ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, পি-এইচ্-ডি

এলিজাবেথীয় যুগের সহিত সপ্তদশ শতাব্দীর যেরূপ সম্বন্ধ, রোমান্টিক যুগের সহিত ভিক্টোরীয় যুগের সম্বন্ধ তাহারই অনুরূপ। উভয় ক্ষেত্রেই পূর্ব্বগামী যুগে যে অভূতপূর্ব্ব কল্পনার ঐশ্বর্য্য কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী যুগে তাহাই নানা শাখা-উপশাখায় বিভক্ত হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ ও মন্দীভূত এবং নূতন উপকরণ ও দৃষ্টিভঙ্গীর সংস্পর্শে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। উভয়ত্রই অব্যবহিত অতীতের সহিত সম্বন্ধ অস্বীকার করা হয় নাই—বরং উহারই সঞ্চিত মূলধন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া নানা নূতন বিষয়ের আলোচনায় ব্যবহৃত হইয়াছে। শেক্সপিয়রের কল্পনাসম্পদের উত্তরাধিকার যেমন ডন (Dorne) ও দার্শনিক কবি গোষ্ঠীর (Metaphysical poets) মধ্যে খণ্ডিত ও কতকটা বিকৃতরূপে ক্রিয়াশীল তেমনি রোমান্টিক যুগের মৌলিক প্রেরণা টেনিসন্, (Tennyson) ব্রাউনিং (Browning) ও ম্যাথু আরনল্ডের (Matthew Arnold) মধ্যে ক্ষীণ ও বিচ্ছিন্নভাবে সংক্রামিত হইয়াছে। রোমান্টিক যুগের কল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য কবিমনের উপর একাধিপত্য হারাইয়াছে; ইহার সৌন্দর্য্য ও বর্ণনাপদ্ধতি আর কবির জীবনদর্শনের সহিত সম্পর্কান্বিত বা তাহার অখণ্ড মানস-প্রকৃতির অভিব্যক্তি নহে। পরবর্ত্তী কবিদের রচনায় ইহা বহিরঙ্গসৌষ্ঠব, শিল্পপ্রসাধনের পর্য্যায়ে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্থির, আত্মসমাহিত বিশ্বাস ম্যাথু আরনল্ডের ক্ষেত্রে করুণ নৈরাশ্যবাদ ও সান্ত্বনাহীন, অবসাদক্লিষ্ট চিত্তের ব্যথিত দীর্ঘনিঃশ্বাসে রূপান্তরিত হইয়াছে। টেনিসনের প্রকৃতি-বর্ণনায় সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ও শিল্পসৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু ইহাতে জীবন্ত, নিবিড় অনুভূতির উষ্ণ জীবনীশক্তি নাই। শেলীর কল্পনার ঊর্দ্ধাভিযান ও কল্পলোকবিহার ব্রাউনিং-এর কাব্যে চিরাভ্যস্ত প্রবণতা হইতে সাময়িক উচ্ছ্বাসে পরিণত হইয়া নূতন লক্ষ্যাভিমুখী হইয়াছে, ব্রাউনিং শেলীর আদর্শলোক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া

বাস্তবজগতের নব-নারীর অফুরন্ত বৈচিত্র্যের, প্রেমের ভাবোচ্ছ্বাসের পরিবর্তে ইহার অদ্ভুত মানস প্রতিক্রিয়ার প্রতি নিবদ্ধ করিয়াছেন। মনে হয় যেন শেলীর কল্পনা নূতন প্রতিবেশে, নূতন বাস্তববোধ ও কৌতূহলী মনোভাবের প্রেরণায়, নিজ গতি ও প্রকৃতি পরিবর্তন করিয়াছে—যে শক্তি আকাশবিহারের পক্ষবেগ যোগাইত তাহাই যেন নিম্নাভিমুখী হইয়া মানবমনের অন্ধকারময় গুহার রহস্যোদ্ভেদের আলোক জ্বালিয়াছে। কীটসের সবল ও স্বতঃস্ফূর্ত রূপমোহ ও চিত্রসৌন্দর্য্যকুশলতা Pre-Raphaelite কবিগোষ্ঠীতে একটা বিশেষ-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, সচেতন ভাবমণ্ডলরচনা ও আঙ্গিকসৃষ্টির প্রয়াসে পরিণত হইয়াছে। কীটস কাব্যমন্দিরে যে সৌন্দর্য্যপ্রদীপ জ্বালিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তীরা তাহাকে এক গূঢ় উপাসনা-পদ্ধতির অঙ্গীভূত আরতি-বর্ত্তিকায় রূপান্তরিত করিয়াছেন ও মন্দিরের বায়ুমণ্ডলকে ধূপধূনার সুরভিত ধূমে অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত করিয়াছেন, এই বদ্ধবায়ুতে আমরা যে সৌন্দর্য্যমায়া অনুভব করি তাহা যেন জীবনের স্পন্দনরহিত, মৃত্যুর শীতলস্পর্শজড়িত। সুইনবার্ণ শেলীর গীতি-প্রতিভার অধিকারী; কিন্তু শেলীর গীতি-কবিতায় যে গভীর হৃদয়াবেগ ও আন্তরিকতার স্পর্শ পাই তাহার পরিবর্তে সুইনবার্ণে আছে অপরিমিত ও সময় সময় অর্থহীন উচ্ছ্বাস।

ভিক্টোরীয় যুগে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই সৌন্দর্য্য-প্রবণ মনোভাবের সঙ্গে কয়েকটি নূতন উপাদান ও একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী যুক্ত হইয়াছে। গণতন্ত্র ও বিজ্ঞান সাহিত্যের উপর নূতন প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে ও উদ্দেশ্যমূলক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমশঃ নিছক সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রেরণাকে অভিভূত করিয়াছে। ১৮৩২ সালকে ভিক্টোরীয় যুগের আরম্ভকালরূপে নির্দ্দেশ করা হয়—এই সালে পার্লামেণ্ট সংস্কারের আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গণতন্ত্রের প্রকৃত অভ্যুদয়ের সূচনা হয়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতেও রাজনৈতিক দলাদলির প্রভাব সাহিত্যে উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল—কিন্তু উহার মূল প্রেরণা ছিল দলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্কীর্ণ স্বার্থ। ভিক্টোরীয় যুগে রাজনৈতিক চেতনা দলের পক্ষ সমর্থনের স্তর অতিক্রম করিয়া উদার সাম্যবাদ ও নিষ্পেষিত দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতির রূপে সাহিত্যে আবির্ভূত হইয়াছে। সামাজিক বিবেক-বুদ্ধি ও ন্যায়-নিষ্ঠতা জাগ্রত হইয়া সাহিত্যের মধ্যবর্ত্তিতায় দরিদ্রের অধিকাররক্ষণ, তাহাদের জীবনের অসহনীয় গুরুভার কিছু লাঘব করার প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সাহিত্য বিশেষতঃ উপন্যাস শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনের সমবেদনাপূর্ণ চিত্র আঁকিয়াছে—সামাজিক অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া উদ্দেশ্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। ডিকেন্সের (Dickens) উপন্যাসসমূহে নানাবিধ সামাজিক দুর্নীতি ও শাসনব্যবস্থার অপপ্রয়োগ একদিকে তীব্র শ্লেষ অন্যদিকে ভাবার্দ্র করুণরস উদ্দীপন করিয়াছে। থ্যাকারে (Thackeray) অভিজাত সম্প্রদায়ের ভণ্ডামি ও নৈতিক দুর্ব্বলতার প্রতি নির্ম্মমভাবে কশাঘাত করিয়া আভিজাত্যমোহের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন ও পরোক্ষভাবে গণতান্ত্রিক সাম্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিয়াছেন। জর্জ্জ ইলিয়ট্ (George Eliot) সাধারণ অবস্থার নব-নারীর জীবনে অসাধারণ ভাবগভীরতা ও প্রবৃত্তি-সংঘর্ষ উদ্ঘাটিত করিয়া তাহাদের প্রতি সাহিত্যিক আভিজাত্যমর্য্যাদা অর্পণ করিয়াছেন। রাস্কিন (Ruskin), মরিস (Morris) প্রভৃতির রচনায় সমাজতন্ত্রবাদের নূতন প্রেরণা সমাজব্যবস্থায় নূতন সৌন্দর্য্য ও নীতিবোধ প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পাঠককে

সচেতন করিয়াছে। এমন কি যে কার্লাইল (Carlyle) গণতন্ত্রের বহির্ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, ভোটের দ্বারা যোগ্যতা নির্ণয়ের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে যিনি বদ্ধমূল অবিশ্বাস পোষণ করিতেন, যিনি একমাত্র বিধিনিয়োজিত ঐশ্বরিকগুণসম্পন্ন বীরের প্রতি নির্বিকার নেতৃত্ব অর্পণের পক্ষপাতী ছিলেন, তিনিও তাঁহার সমর্থিত স্বেচ্ছাচারকে অমোঘ নীতিনিষ্ঠা ও কারুণ্যস্নিগ্ধ সহানুভূতির সিংহাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিশিষ্ট গদ্যলেখকদের মধ্যে ম্যাথু আর্নল্ড (Matthew Arnold) ও নিউম্যান (Newman) এই দুইজনের রচনায় গণতন্ত্রের প্রভাব সেরূপ লক্ষণীয় নহে। আর্নল্ড সংস্কৃতি ও শিষ্টাচারের উপর অতিরিক্ত জোর দিয়া জীবন হইতে সমস্ত অশোভন উগ্রতা, সাফল্যের জন্য উৎকট আগ্রহ ও গণতন্ত্রের ইতর রুচিবিকার ও সূক্ষ্মবোধের অভাবকে নির্ব্বাসিত করিতে চাহিয়াছেন। নিউম্যান ধর্ম্মযাজক ও শিক্ষাব্রতীর শান্ত নিস্তরঙ্গ বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, গণতন্ত্রের মূলসূত্র যে স্বাধীন চিন্তার অধিকার তাহা পর্যন্ত অস্বীকার করিয়াছেন, ও ভুল ভ্রান্তির অতীত নির্ব্বিচার গুরুবাদের নিরাপদ দুর্গে শেষ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মধ্যযুগসুলভ মনোবৃত্তিকে এই আধুনিক যুগে আবাহন করিয়াছেন।

গণতন্ত্রের পর বিজ্ঞানের প্রভাব ভিক্টোরীয় সাহিত্যের আর একটী উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। সপ্তদশ শতাব্দীতে Royal Societyর স্থাপন ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুক্তিবাদমূলক মনোভাবের প্রতিষ্ঠা এই বৈজ্ঞানিক প্রভাবের ক্রমপ্রসারের নিদর্শন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের একটী যুগান্তরকারী আবিষ্কার—ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদ—সমস্ত সাহিত্যিক চিন্তাধারার প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে। অষ্টাদশ শতকে কবিতা বিজ্ঞানের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয় নাই; কাব্যের মধ্যে শুষ্ক যুক্তিবাদের প্রাদুর্ভাব অভাবাত্মক (negative) লক্ষণ, স্বভাবাত্মক (positive) নহে। গভীর ভাবাবেগের অভাবই এই যুগের কাব্যরচনাকে আলোচনাধর্ম্মী করিয়াছে, বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতির প্রত্যক্ষ প্রভাব নহে। কিন্তু ঊনবিংশ শতকে বিজ্ঞানের প্রভাব কাব্যের ও কবিমনোভাবের মধ্যে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে—বিশ্বজগৎ ও নৈতিক জীবনের ভিত্তিভূমি সম্বন্ধে কবির ধারণাকে সম্পূর্ণ নূতনপথে প্রবাহিত করিয়াছে।

এই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ভিক্টোরীয় যুগের প্রধান কবিসমূহ টেনিসন, ব্রাউনিং ও ম্যাথু আর্নল্ডের মধ্যে বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। টেনিসন তাঁহার In Memoriam কাব্যে বিশ্ববিধানের নীতি ও জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন তাহা বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সংশয়জড়িত। ভগবানের আশ্বাস বাণী ও বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য উভয়ে মিলিয়া তাঁহার মনে যে আশাবাদের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও আত্মপ্রতিষ্ঠ নহে। এই অনিশ্চয়াত্মক মানসপরিস্থিতি তাঁহার গীতিকবিতার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল প্রতিবেশ রচনা করিতে পারে নাই—পরিপূর্ণ নির্ভর ও একনিষ্ঠ আদর্শের অভাবে তাঁহার গীতধারা প্রায়ই ক্ষুণ্ণ ও প্রতিহত হইয়াছে। সেইজন্য এই কাব্যের দার্শনিক মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে না; ইহা আধুনিক মনের সন্দেহ নিরসন ও পথনির্দ্দেশের পক্ষে যথেষ্ট নহে। ব্রাউনিংএর উল্লসিত সংশয়লেশহীন আশাবাদ, জীবনের অবিচ্ছিন্ন প্রগতিতে তাঁহার অবিচল আস্থাও ঠিক ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ব্রাউনিংএর মননশীলতার আতিশয্য—যুক্তিতর্কের

উপর অসাধারণ অধিকার ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য—নিসংশয় ভক্তিবাদের সহিত খাপ খায় না। মনে হয় যে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহ, জীবনের মধ্যে আনন্দ ও অগ্রগতির সম্ভাবনা আবিষ্কার করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, যুগের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত হইতে নূতন প্রেরণা ও গতিবেগ আহরণ করিয়াছে। 'ভগবান স্বর্গ হইতে পৃথিবীকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতেছেন' এই উৎসাহ দীপ্ত আশার বাণীর মূলে কোন গভীর অধ্যাত্ম অনুভূত নাই, আছে বিজ্ঞা পুষ্ট সতেজ আনন্দময় মনোভাব।

যে বিজ্ঞান টেনিসন ও ব্রাউনিং এর কাব্যাভিব্যক্তিকে যথাক্রমে দ্বিধা-কুণ্ঠিত ও প্রাণশক্তিসমৃদ্ধ করিয়াছে তাহা ম্যাথু আরনল্ডের ক্ষেত্রে গভীর অবসাদ ও নৈরাশ্যবাদের ছায়া-বিস্তারের হেতু হইয়াছে। তিনি বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাসের সহিত বিজ্ঞানপ্রভাবের ভাটার টানে মানবজীবনের কূল হইতে আস্তিক্যবাদ-সমুদ্রের দূরাপসরণ লক্ষ্য করিয়াছেন। বিশ্বাসের স্রোতোবেগ সরিয়া যাওয়াতে জীবনের উপকূলে খানিকটা কর্দমাক্ত, উপলাকীর্ণ বালুকাবিস্তার উদ্ঘাটিত হইয়া ইহার সৌন্দর্য্য-সুষমার হানি করিয়াছে। তাই তিনি জীবনে আঁকড়াইয়া ধরিবার কোন নিশ্চিন্ত আশ্রয় পান না। তাঁহার জীবনে উদ্দেশ্য ও আদর্শবাদের মূল শিথিল হইয়াছে। অতীতের আদর্শ নষ্ট হইয়াছে, বর্ত্তমান এখনও সূতিকাগারের ভ্রূণাবস্থা হইতে পরিণতি লাভ করে নাই; এই অরাজকতার যুগে তাঁহার মন উদ্‌ভ্রান্ত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছে। তাই তিনি অতীতের দিকে তাকাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন; বর্ত্তমানের বিশৃঙ্খল ও নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্যে তিনি কোন স্বস্তি পান না। আধুনিক মনের এই মূঢ় বিক্ষেপ, এই উদ্‌ভ্রান্ত লক্ষ্যহীন গতি গভীর আবেগ ও বৈজ্ঞানিক সত্যনিষ্ঠার সহিত অভিব্যক্ত হইয়া ম্যাথু আরনল্ডের কবিতায় কাব্যলোকের অমরতা লাভ করিয়াছে।

ইহা ছাড়া এই যুগে বিজ্ঞান আরও নিগূঢ় ও ব্যাপক-ভাবে সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কবির উপমা-নির্ব্বাচন ও প্রকৃতিবর্ণনা বিজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। কাব্যের ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যেও অধিকতর বস্তুনিষ্ঠা লক্ষিত হয়। ব্রাউনিং আদিম সভ্যতা, মধ্যযুগ ও রেনেসাঁস যুগের মনোভাবের বৈশিষ্ট্য নিখুঁতভাবে, বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস আলোচনার সাহায্যে তাঁহার কবিতায় প্রতিফলিত করিয়াছেন। নৃতত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে অর্দ্ধবর্ব্বর মানুষের মনে অতি-প্রাকৃত শক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধে প্রথম সচেতনা, ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রথম বিকৃত ধারণার স্ফুরণ তিনি অতি সুন্দরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। ঔপন্যাসিক-দের মানবচরিত্র বিশ্লেষণ, ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকের তথ্যালোচনা সমস্তই এই সর্ব্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সাক্ষ্য দেয়। ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ আশা করিয়াছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের ভাবোত্তেজিত মুখশ্রী (the impassioned expression which is in the countenance of all Science) কবিতার কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিবে। এ আশা এখনও সফল হয় নাই; কিন্তু উহার বিপরীত সম্ভাবনা—কাব্যের মুখশ্রী ও অন্তঃপ্রেরণার উপর বিজ্ঞানের সন্ধানী আলোর নিক্ষেপ—ভিক্টোরীয় যুগে বহুলাংশে সার্থকতা লাভ করিয়াছে ইহা বলা যাইতে পারে।

রূপ ও সৌন্দর্য্য

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায় এম্-এ, পি-আর্-এস্

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় তাঁহার 'সুখ ও দুঃখ' গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট 'অজানার রূপ' নামধেয় প্রবন্ধে রূপের দার্শনিক বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন "রূপের স্বরূপ কি? রূপ কি বস্তুর স্বধর্ম্ম? না, আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা নিজেদের জ্ঞান ও শক্তি অনুসারে রূপ রচনা করিয়া লই? আমার বক্তব্য এই যে, সমস্ত রূপই আমাদের ধারণাকে অপেক্ষা করে। ধারণার নিরপেক্ষ রূপ নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির চিত্ত বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন; তাই রূপের অনুভূতি সম্বন্ধে এত বিচিত্রতা। ...

"আমাদের মনের দ্বারাও মোটামুটি রূপ এমনিভাবে রূপান্তরিত হয়। নহিলে একই রূপ সকলের চিত্তে সমান ভাবে কার্য্য করে না কেন? আমি কাহারও রূপ দর্শন করিলাম, কিন্তু সে রূপ আমার মনে ধরিল না। আমি দেখিয়াও দেখিলাম না। আর একজন দেখিল, দেখিয়া সে মুগ্ধ হইল। তাহার হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রী এক সঙ্গে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।

"রূপ মনকে মানাইয়া চলিতেছে। মনের কল্পনা নয়; স্বপ্নসৃষ্টি নয়, বিভ্রান্ত অনুভূতি নয়; রূপের স্বাভাবিক, স্বরূপগত পরমার্থসত্তাই এই। রূপ বিশ্বেরও নহে, মনেরও নহে; বিশ্ব ও মনের মিলনে রূপ। রূপ মনের বাধ্য; মনের তৃপ্তির জন্যই রূপের স্বরূপতঃ বিকাশ।"

শ্রদ্ধেয় মিত্র মহাশয় এই প্রসঙ্গে যে সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন তাহা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। অধুনা আমাদের সাহিত্যে সৌন্দর্য্যতত্ত্বের বহু আলোচনা দেখা যায়। কিন্তু মিত্র মহাশয়ের এই সিদ্ধান্তের কোন আলোচনা হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। অথচ যুক্তির আড়ম্বর না থাকিলেও, তাঁহার বিদগ্ধ মনের রসানুভূতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত সৌন্দর্য্যবিচারক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার যোগ্য, সন্দেহ নাই।

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, সাধারণ দৃষ্টিতে আমাদের ভাষায় রূপ ও সৌন্দর্য্য শব্দ দুইটীর মধ্যে বিশেষ কোন অর্থের ভেদ না থাকিলেও, দার্শনিক বিচারপ্রসঙ্গে উভয়ের অর্থপ্রকৃতির যথাযথ স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট না করিলে বহু অবান্তর জটিলতায় পড়িতে হয়। বস্তুতঃ রূপ ও সৌন্দর্য্য শব্দ দুইটীর প্রয়োগার্থের কেমন একটা অস্পষ্টতার জন্য আমাদের সাহিত্যে সৌন্দর্য্যতত্ত্বের প্রায় আলোচনার অঙ্গহানি ঘটিয়াছে দেখা যায়। মিত্র মহাশয়ও উপরে রূপশব্দ দার্শনিক পরিভাষা-সম্মত অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। রূপশব্দের সাধারণ প্রয়োগার্থ বস্তুর আকার বা সংস্থান (form)। ইহাই রূপশব্দের ব্যাপক অর্থ। বেশ বুঝা যায়, মিত্র মহাশয় ইহা হইতে সঙ্কীর্ণ পারিভাষিক অর্থে রূপশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট রূপশব্দের অর্থ 'ধারণার বিষয়ীভূত সৌন্দর্য্য'—বলিতে পারি। সুতরাং রূপ ও

সৌন্দর্য্য শব্দ দুইটার প্রকৃত অর্থ লইয়া কিছু আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কোন বস্তুর রূপ অর্থাৎ আকার বা সংস্থান সম্বন্ধে মূলতঃ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের যে জ্ঞান হয় তাহাকে দার্শনিক ভাষায় আমরা বলি সেই বস্তুর দর্শনজ্ঞান। কোন বস্তুর সত্তা যখন দর্শনজ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় তখন সেই বস্তুর রূপ আমাদের মনে আকারিত হইয়া আমাদের মনকে সেই রূপ সম্বন্ধে সচেতন করে। কিন্তু মন এই রূপকে বা আকারিত সত্তাকে আপনার করিয়া গড়িয়া লইতে চায়। কোন না কোন জৈব প্রয়োজনের তাগিদেই মন এইরূপ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। এই গড়িয়া লওয়ার কাজে মন যে পরিমাণে সফল হয় ঠিক সেই পরিমাণে আনন্দ লাভ করে। কিন্তু জৈব প্রয়োজনের যে ক্ষণিক ও পরিবর্ত্তনশীল আনন্দ তাহাতে মন কখনও সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয় না। তাই প্রয়োজনের বাহিরেও রূপের যে একটা স্বাধীন সত্তা আছে মন চাহে রূপকে সেই সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করিতে। কারণ যাহা স্বাধীন এবং প্রয়োজন-নিরপেক্ষ তাহা আপন সত্তার পূর্ণতায় আপনি সার্থক। রূপের এই পূর্ণতার আস্বাদন হয় কল্পনার সাহায্যে। কল্পনার অনুভূতিতে রূপের নিগূঢ় আনন্দময় সত্তাটী ধরা পড়ে। কল্পনার আস্বাদনে রূপের যে নিগূঢ় সত্তার প্রকাশ তাহাকেই আমরা দার্শনিক পরিভাষায় বলিতে পারি—সৌন্দর্য্য। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়পথে রূপের যে আস্বাদন হয় তাহা হইতে এই অনুভূতি স্বতন্ত্র। মনের বৃত্তি যখন ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উর্দ্ধে উঠিয়া কোনও বস্তুসম্বন্ধে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি জাগাইয়া তোলে তখন তাহাকে বলি কল্পনা। আর রূপের সত্তায় ও অনুভূতিতে যে আনন্দের উৎস স্বতঃ উৎসারিত হইতেছে, যে আনন্দ আপনাতে আপনি সংহত ও পরিপূর্ণ সেই আনন্দের অভিব্যক্তি বা প্রকাশই সৌন্দর্য্য। অতএব সৌন্দর্য্য ও মনের কল্পনাবৃত্তি উভয়ে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরাও বলিয়াছেন—ক্ষণে ক্ষণে যন্ নবতামুপৈতি তদেব রূপং রমণীয়তায়াঃ।

এই সৌন্দর্য্যের অনুভূতি স্থূল ইন্দ্রিয়ের ভার হইতে মুক্তির আনন্দে উচ্ছল। আমাদের অন্তরের চৈতন্য ইন্দ্রিয়ের মায়াজাল হইতে মুক্ত হইয়া রূপের সত্তায় নিজেকে হারাইয়া ফেলে, রূপের অনুভূতিতে আনন্দে বিভোর হইয়া যায়। এই যে চৈতন্যের আনন্দস্বরূপে মুক্তি তাহাতে জৈব প্রয়োজনের দীনতা ও সংকীর্ণতা নাই, আছে সহজ স্বাভাবিক এমন একটা স্থিতি যাহাতে প্রয়োজনের ক্ষণিক সুখ তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। বাস্তব প্রয়োজনের ক্ষণিক আনন্দ বস্তুর বাহ্যিক আকার ও বৈচিত্র্য হইতে জন্মে, কিন্তু পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যে যে রসের ব্যঞ্জনা তাহা বস্তুর স্বরূপের, প্রাণস্পন্দনের অনুভূতি—তাহাই সৌন্দর্য্য।

দেখা গেল রূপ শব্দটীর যে সাধারণ প্রয়োগার্থ বস্তুর আকার বা সংস্থান, সেই আকার বা বস্তুসংস্থান মাত্রেরই জ্ঞানের অনুভূতি ও আনন্দের অনুভূতি এই দুইটী দিক আছে। উহার জ্ঞানের দিক যেমন প্রয়োজনের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত, আনন্দের দৃষ্টিতে তেমনি উহা প্রয়োজননিরপেক্ষ। তাই আনন্দের দৃষ্টিতে রূপের পরিচয় উহা সুন্দর কি অসুন্দর এইরূপ একটা সাধারণ জিজ্ঞাসায় মাত্র পর্য্যবসিত হয় না। উহা একেবারে হয় সুন্দর বলিয়া আমাদের ভাল লাগে, না হয় কুৎসিত বলিয়া ভালো লাগে না। এই ভালো-লাগা ভালো-না-লাগার কোনও জবাবদিহি করিতে মন একান্ত নারাজ। তাহার কারণ, মন এখানে বুদ্ধির মাপকাঠি ছাড়িয়া আনন্দের অতলে ডুব দিয়াছে, সে কল্পনার কাছে

সংগোপনে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তাই ভবভূতি বলিয়াছেন, তত্তস্য কিমপি বস্তু যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ। আনন্দের মধ্যে মনের যে অন্তর্মুখীনতা তাহারই ফলে রূপের মধ্যে সৌন্দর্য্যের প্রকাশ হয়। প্রয়োজনের খাতিরে রূপের সঙ্গে মনের যে পরিচয়, সে পরিচয় একান্তই বাহ্যিক—যদিও সাধারণের কাছে রূপের এই পরিচয়ই পর্য্যাপ্ত।

আমরা গোড়াতেই মিত্র মহাশয়ের সৌন্দর্য্যতত্ত্বের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে রূপ শব্দের পারিভাষিক অর্থ তাঁহার মত "ধারণার বিষয়ীভূত সৌন্দর্য্য" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। ইহার যৌক্তিকতা বোধ হয় এখন প্রতিপন্ন হইবে। তাঁহার "রূপ মনেরও নহে, রূপ বিশ্বেরও নহে, বিশ্ব ও মনের মিলনে রূপ" এই উক্তির সারবত্তাও রূপ শব্দের এই নিগূঢ় অর্থের উপরই নির্ভর করিতেছে। বিশ্ব ও মনের যে নিত্যনূতন বৈচিত্র্যবিলাস আর সেই বৈচিত্র্যের যে উদ্বেলিত আনন্দ তাহাতে বিশ্ব বা মন দুয়ের কোনটিকেই পৃথক করা চলে না। মানুষের মনকে বাদ দিলে বিশ্বের এই বৈচিত্র্যবিলাস মনুষ্যেতর প্রাণিজগতের কাছে রসের দিক দিয়া মূল্যহীন। মানুষের জ্ঞান বা কল্পনার বিষয়ীভূত হইয়াই বিশ্বের এই বৈচিত্র্যবিলাস অন্তর্গূঢ় সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তেমনি বিশ্বকে বাদ দিয়া মানবমনের অস্তিত্ব যদিও বা সম্ভব হয়, সে মন রূপের সৌন্দর্য্য ও আনন্দময় সত্তার আস্বাদন হইতে একেবারেই বঞ্চিত। কাজেই রূপের নৈর্ব্যক্তিক ধারণা করিতে যাওয়া যেমন এক প্রকার অন্ধ গোঁড়ামি, তেমনি রূপের স্থূল দিকটাকেই বড় করিয়া আমাদের জৈব প্রয়োজনের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া আর একরকমের নিরঙ্কুশ অর্বাচীনতা। জৈব প্রয়োজনের মধ্যে রূপের কিছুটা সার্থকতা স্বীকার করিলেও, প্রয়োজননিরপেক্ষ সৌন্দর্য্যের সাধনাই আমাদের মনে সুকুমার (aesthetic) অনাবিল আনন্দের সৃষ্টি করিতে পারে। দেশ-কাল-নির্ব্বিশেষে বিশ্বের কলারসিক সম্প্রদায় এই সাধনায় প্রাণমন উৎসর্গ করিয়া মানবমনের এই চিরন্তন আনন্দের ব্যাকুলতাকে রেখা ও ছন্দের বিচিত্র ভঙ্গিতে তরঙ্গায়িত করিয়াছেন; লোকনয়নের অন্তরালে সৌন্দর্য্যের নব, নব মানসী-প্রতিমার পায়ে জীবনের সর্ব্বস্ব অর্ঘ্য দিয়াছেন। সেই মহাজনবাঞ্ছিত বন্ধুর পন্থাই মানব তাহার সভ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ও আদর্শ বলিয়া চিরকাল বরণ করিবে।

ত্যজিনু গাণ্ডীব

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

কুরুক্ষেত্ররণে
যোদ্ধবেশী ধৃতধনু আত্মীয়স্বজনে
হেরিয়া পার্থের মনে উদ্বেজিত ভয়
কৃপাবিষ্ট বিষণ্ণ বিস্ময়।
অতীতের সব স্মৃতি যেতে হবে ভুলে
আচার্যে পিতৃব্যে পুত্রে শ্বশুর মাতুলে
নিজ হাতে হইবে বধিতে।
স্নান করি রক্তের নদীতে
আত্মীয়ের শবগন্ধী বিজয়-লক্ষ্মীরে
শিরে লয়ে যেতে হবে নির্বান্ধব শূন্য গৃহে ফিরে!
ধুলায় লুটায়ে কান্না পিতৃহীন অনাথ শিশুর,
তারি সাথে মিশিতেছে হতপুত্র আতুরার বুকফাটা সুর,
বিধবার দীর্ঘশ্বাসে ভারাক্রান্ত হাওয়া,
—এদের সম্মুখে বসি রাজভোগ খাওয়া।—
ধিক রাজ্যে, ধিক্ এ সংগ্রাম।—

পার্থের নয়ন হতে অশ্রুধারা নামে।
রাজ্যলোভে বধিয়া স্বজন
রক্ত-দিগ্ধ কোন্ স্বর্গে করিব গমন!
লক্ষ দুঃস্থ অনাথের অভিশাপ কুড়ায়ে মাথায়
কোন্ প্রেয় পুণ্যলোকে উত্তরিব হায়!
এর চেয়ে মৃত্যু ভালো। এর চেয়ে হ'য়ে দীন-হীন
দ্বারে দ্বারে হস্ত পাতি ভিক্ষা অন্নে কাটাইব দিন।
ভ্রান্ত শৌর্য-অভিমান! ঢের ভাল ক্লীব,
হে কেশব, ত্যজিনু গাণ্ডীব।

আসন্নবর্ষণ শ্রান্ত ক্রন্দনের দিনে
প্রলয়ের বজ্র বাজে বাতাসের বীণে
মৃত্যু তার পক্ষ মেলি হিংস্র ক্রূরতায়
প্রিয়েরে বন্ধন ছিঁড়ি কোথা লয়ে যায়!
গৃহদ্বারে রূঢ় বার্তা জাগিছে সদাই,
নাই, নাই, সে যে মোর নাই!
নানা বর্ণে গন্ধে বোনা এই বসুধায়
রাত্রির শোকের নদী কালো হয়ে ঐ ব'য়ে যায়।
নিভে আসে এ-প্রাণের আলো,
নামে চোখে ব্যর্থতার কালো,
তখনো কর্তব্য ডাকে,—'শোকে তব নাহি আসে যায়,
আমার সময় নাই, কর ত্বরা, আছি প্রতীক্ষায়!'
ধিক্ কাজ, ধিক্ এ সংসার,
এর চেয়ে মৃত্যু ভালো শত শত বার।

তপ্তধুলা দিনশেষে অবসন্নকায়
গোধূলি সন্ধ্যায়
আকাশের বর্ণচ্ছটা ধীরে ধীরে ম্লান হ'য়ে আসে,
রাত্রির প্রলেপ নামে ঘাসে,
তিমির-বিজন গেহে একমনে বসে বসে ভাবা
যে-জন গিয়েছে চলে তার চোখে দেখেছি কি আভা,
কোন বাণী বলিবারে
চেয়েছে, বলিতে পারি নারে!
অভিমান ক'রে গেছে সেকি?- যবে কাজ নিয়ে
মত্ত হ'য়ে, সকলি ভুলিয়ে
ছুটায়েছি জীবনের রথ
উল্লঙ্ঘিয়ে সমুদ্র পর্বত।
আজ সে তো নাই,—মোর কাজ আছে পড়ে,—
প্রাণহীন আশাহীন কাজ।
হে ঈশ্বর, হে রাজাধিরাজ,
আমিও বলিতে চাই, পার্থসম আজিকে নির্জীব,
থাক পড়ে কাজ তব,—ত্যজিনু গাণ্ডীব!

কুবের ও কন্দর্প

শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল

হেড্‌ মিস্‌ট্রেস্‌ 'রেণুদি'র অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে অনেকটা প্রেমপাগলিনী শ্রীমতীর মতো, 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি'; কোথায় যে পা বাড়াবে ভেবেই আকুল। তার অনাহত যৌবনে এক সঙ্গে দুজনে দু'দিক থেকে তীক্ষ্ণশর নিক্ষেপ ক'রে বসেছে। রেণুদি আঘাতের যন্ত্রণায় ছটফট করছে—শরবিদ্ধা হরিণী কোন্‌ শিকারীর পদতলে গিয়ে লুটিয়ে পড়বে, কে জানে। যে রেণুদি প্রেমের নামে নাক সিঁটকে বান্ধবীদের ঘৃণা করতো, যে রেণুদি একান্ত মেয়েলিপনাকে মেয়েদের জীবনের সব চেয়ে বড় দুর্বলতা ও ট্রাজেডি ব'লে লম্বা বক্তৃতা দিত, যে রেণুদি পুরুষ বন্ধুদের সাথে অবাধ মেলামেশা সত্ত্বেও তার আগাছার জঙ্গলে ভরা হৃদয়উদ্যানটিকে তাদের কাছে একান্ত অনধিগম্য ক'রে রেখেছিল হঠাৎ সেখানে যে কবে ফুল ফুটলো, কবে অবাধ মলয় তার বক্ষ'পরে দোল্‌ দিয়ে গেল সে নিজেই বুঝে উঠতে পারে না। সেই অনধিগম্য হৃদয়-উদ্যানে পুরুষের প্রথম পদধ্বনি হলো সাতাশ বছর বয়সে। মেয়েলিপনাকে ঘৃণা করতো বলেই রেণুদি সাতাশ বছরের অনাঘ্রাত যৌবনকে জগতে যেন একেবারে সাঁইত্রিশের কোঠায় পৌঁছে দিয়েছিল। হঠাৎ সে যখন পেছন ফিরে তাকালো, তখন সে যৌবনের খোলসটাকে দেহের মাঝে আঁকড়ে ধ'রে রাখবার জন্যে ব্যগ্র হ'য়ে উঠলো। মনে রঙ্‌ ধরতেই, দেহে উঠলো রঙের সাড়া। উঁচু ক'রে টেনে-বাঁধা চুলগুলো আলগা হয়ে কপালখানাকে ঢেকে ছোট ক'রে দিলে আর কানের দুপাশে ফাঁপা চুলগুলো লতিয়ে গালের ওপর উড়ে লুটোপুটি খেতে লাগলো। রেণুদির বয়স একেবারে দুয়ের কোঠার গোড়ার দিকে ফিরে এলো। নিটোল পুরন্ত গালে রঙের ছোঁয়াচ লাগলে—কালো পক্ষ্মঢাকা টানা চোখ দুটো উৎসুক ও সন্ধানী হ'য়ে উঠলো—চলার গতি লীলায়িত হয়ে উঠলো, কথা বলার স্বর ও ভঙ্গিমা গেল বদলে। ছাত্রীরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, কানাকানিও করে।

অমলা বলে, হাল্‌কা কচি কলাপাতা রঙের শাড়ীখানায় রেণুদিকে মানিয়েছে বেশ!

দিদির মনেও যে সবুজের রঙ্‌ ধরেছে—ব'লে দুষ্ট সবিতা মুখ টিপে হাসে।

মঞ্জুরী কনুয়ে ভর দিয়ে উৎসুক হয়ে বলে, কী রকম? এই বয়েসে কনে সাজবে নাকি?

চোখ পাকিয়ে সবিতা বলে, ক'নে সাজবার আবার মেয়েমানুষের বয়েস অবয়েস আছে নাকি?

অমলা বলে, আলবৎ আছে। বুড়ী মাগী আবার কনে সাজবে কী? বর এত সস্তা নয়।

বাসন্তী এতোক্ষণ একমনে অঙ্ক ক'রছিল। সে হঠাৎ ঘাড় কাৎ ক'রে গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে, দিদিমার কী আর দাদামশায় নেই?

সকলে খিল্‌ খিল্‌ ক'রে সশব্দে হেসে উঠলো।

ললিতা মুখ টিপে হাস্‌তে হাস্‌তে বলে, ব্যাপারটা কিন্তু সিরিয়াস্‌। তলে তলে একটা তরঙ্গ বইছে! ন'ইলে অমন কড়া মেজাজী রেণুদি হঠাৎ পাখা মেলে প্রজাপতির মত উড়বে কেন?

বাসন্তী অঙ্ক কষায় মন দিয়েছিল, সে হঠাৎ খাতা বন্ধ ক'রে গভীর বিরক্তির স্বরে ব'লে উঠ্‌লো, তোরা অঙ্কটা কষ্‌তে দিলি না দেখ্‌চি। রেণুদি কী মানুষ নয় বল্‌তে চাস্? না হয় একটু বয়সই হয়েচে, তা ব'লে কী আর বর জোট্‌বার বয়েস পার হ'য়ে গেচে? না। তা যায়নি—কারুর যায় না। আমার ঠান্‌দি বল্‌তো—

অলকা তাকে থামিয়ে দিল: তুই বড় ভাল্‌গার, বাসি। তোর ঠান্‌দির গল্প আমরা অনেক শুনেচি। থাস্ রেণুদির যদি কোন নতুন খবর জানিস্ তো বল্!

বাসন্তী বলে, বাসো এইখানে ব'সে হিট্‌লার ষ্টালিনের গুপ্তখবর রাখো আর হাতের কাছের রেণুদির খবর রাখ্‌বে না?

সকলে উৎসুক দৃষ্টি মেলে বাসন্তীর মুখের পানে চাইলে। বাসন্তী ঠোঁট্ উল্‌টে ভুরু কুচকে বল্‌ল, রেণুদি বিয়ে করলেও আমাদের নেমন্তন্ন করচে না। সে আশায় গুড়।

ললিতা সশব্দে হেসে উঠ্‌লো, তা না করুক্, তুই রেণুদির বরের খবর বল্।

বাসন্তী বললে, রেণুদি শুধু মজেচে নয় একেবারে মরেচে। একসঙ্গে দুটি পুরুষ তাকে দু'দিক থেকে তাড়া করেচে, বেচারী যে কোথায় আশ্রয় নেবে তাই ভেবে আকুল।

অলকা আগ্রহে অধীর হ'য়ে বল্‌লে, কাজ নাই বাথ্ বাসি, লোকদু'টি কে তাই আগে বল্, নইলে হাঁপিয়ে ম'রে যাবো—

মঞ্জুরী বল্‌লে, সত্যি, দম বন্ধ হ'য়ে যাবে—

বাসন্তী মুখ টিপে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, একজন হ'চ্ছে আমাদের স্কুলের প্রেসিডেন্ট জমিদার শ্রীব্যোমকেশ বাবু স্বয়ং—সম্প্রতি পত্নীবিয়োগ হ'য়েছে। রেণুদি তাঁর ছেলেমেয়েদের শিক্ষয়িত্রীর পর্য্যায় হ'তে মাতৃপর্য্যায়ে ওঠ্‌বার স্বপ্ন দেখ্‌চেন—

অলকা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, আর দুনম্বর?

বাসন্তী বল্‌লে, শুন্‌লে হিংসে হবে। দুনম্বর হলেন, আমাদের থার্ড মাষ্টার শশধরবাবু—

অলকা চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, সে কীরে? সত্যি?

বাসন্তী মুরুব্বিয়ানা চালে ঘাড় নেড়ে বললে, নিছক সত্যি। যদিও শশধরবাবুর সঙ্গে আমাদেরি প্রেমে পড়া উচিৎ।

সকলে মুখে আঁচল চেপে বিস্তারিত হাসির শব্দ চাপবার বৃথা চেষ্টা করলে।

বাসন্তী বললে, তোরা হাস্‌চিস, হাস্—কিন্তু এটা হাস্‌বার কথা নয় মোটেই। এমনি হয়, রেণুদির মতো নিরেট পাথর জলের তোড়ে গ'ড়িয়ে বেড়াচ্ছে। গাছের কোন্ মগডালে লুকিয়েছিলেন মদন দেবতা, নজরে পড়তেই ব্যস্। এমনি ধারালো বাণ হেনেচেন যে বেচারা একেবারে বানচাল হ'য়ে গেছে—

অলকা প্রশ্ন করলে, কেন? এখনো কারুকে সিলেকট করতে পারচে না?

বাসন্তী ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, দু'জনের কারুকেই রিজেক্ট করা চলে না। একদিকে কুবের অন্যদিকে কন্দর্প—কাকে রাখবে, কাকে ফেল্‌বে? একসঙ্গে দুটো হ'লেই তবে মেয়েমানুষের মন ভরে। কিন্তু তাতো হয় না।

বাসন্তী সত্যিই ব'লেচে দোটানার মধ্যে পড়ে রেণুদির প্রাণ যায়। একদিকে শশধরের পূর্ণিমার জোয়ার, তার ঢলঢলে মুখ, আকাশের বুকে উড়ন্ত পাখীর ডানার মতো একজোড়া বাঁকা ভুরু আর

কালো আয়ত চোখ। অন্যদিকে প্রৌঢ় ব্যোমকেশের লোহার সিন্দুক, প্রাসাদতুল্য মনোরম অট্টালিকা, ক্রিশ্‌লার মোটর ও দাসদাসী পরিজন পরিবেষ্টিত সাজানো সংসার। দুজনেরই প্রেমে রেণুদি আকণ্ঠ নিমজ্জিত। বেচারী করে কী? এ সমস্যার হাত হ'তে তার নিষ্কৃতি কোথায়? তার মুক্তি কোন্ পথে?

ব্যোমকেশের বাড়ীতে যায় রেণুদি তার ছেলেমেয়েদের পড়াতে। ব্যোমকেশ নিরিবিলিতে তাদের কাছে এসে বসে। ছেলেমেয়েরা যখন পড়া মুখস্থ করে রেণুদি তখন সদ্য পত্নীহারা ব্যোমকেশের অন্তরের নিঃসঙ্গতা ঘোচায়। ব্যোমকেশের ছেলেমেয়ে এতোদিন তাকে রেণুদি বলে ডাকতো। ব্যোমকেশের আদেশে এখন তারা তাকে মাসীমা ব'লে ডাকে। রেণুদি মনে মনে হাসে কিন্তু মন তার আলোকসন্ধানী পাখীর মতো আকাশে উড়ে বেড়ায়। কত নব নব আশা, কত নব নব স্বপ্ন তার মনের মাঝে ভিড় ক'রে তাকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তোলে। এই কল্পলোকের সে রাণী হবে। এই ছেলেমেয়ে তাকে মা বলে ডাকবে। রেণুদির অন্তরের গোপন মা বাহুবিস্তার ক'রে তাদের আঁকড়ে ধরতে চায়। ব্যোমকেশ একসময় নিরালায় বলে, আর আমি এমনিভাবে শূন্যে বিচরণ করতে পারিনে রেণু, আমায় মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়াবার একটু ঠাঁই ক'রে দাও।

রেণুর আকর্ণ রাঙা হ'য়ে ওঠে, সে নতমুখে নীরব হ'য়ে থাকে। তার মনের আকাশে জল্ জল্ ক'রে ওঠে তরুণ শশধরের দীপ্ত মুখখানি। শশধর মাত্র ক'মাস স্কুলে এসেই যেন রাহুর মত তাকে গ্রাস ক'রে ব'সেচে। হেড্ মিষ্ট্রেস্ হ'য়েও সে তার নিম্নস্তরের একজন সামান্য শিক্ষককে যে কি ক'রে ভালোবাসলে তাই ভেবে তার বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। যে রেণুদি কলেজে ছাত্রী অবস্থায় তরুণ ছাত্র ও প্রফেসরদের নির্মম প্রত্যাখ্যানে জর্জরিত করেচে, যে চিরদিন মেয়েদের এই প্রেমজনিত দৌর্বল্যকে একটা উৎকট ব্যাধি ব'লে উপহাস ক'রে এসেছে, সেই আজ ষাট টাকার স্কুলমাষ্টার শশধরের প্রেমের মন্দিরে যে এমন ভাবে ধর্না দেবে, এ ছিল তার কল্পনার অতীত। শশধরকে দেখা পর্য্যন্ত রেণুদির মনের গতি গেল বদলে। রূঢ় রৌদ্রতপ্ত জীবনের আকাশে নামলো আলোর স্নিগ্ধতা। এখন মনে [illegible] এতদিন সে জীবনের অপচয় ক'রেচে, যৌবনকে প্রত্যাখ্যান ক'রেচে। শশধর গরীবের ছেলে; বি-এ, বি-টি পাশ ক'রে নিরুপায় হ'য়ে স্কুলমাষ্টারী গ্রহণ করতে হ'লো এবং এখানে ভর্ত্তি হ'য়েই রেণুদির সুনজরে পড়লো। দরিদ্র হ'লেও শশধরের সুদর্শন দেহের জলুসে রেণুদির চোখ ঝল্‌সে গেল, মনের রুদ্ধ দুয়ারের মরচে-ধরা শিকল ঝন্ ঝন্ ক'রে খুলে গেল।

শশধরের সঙ্গে রেণুদির অন্তরঙ্গতা অন্তঃশীলার মতই গোপনে পথ ও গতি পেল। রেণুদির মন চায় শশধর সর্ব্বক্ষণ তার চোখের সামনে থাকে। সে কাছে থাক্‌লে তার শরীরে রোমাঞ্চ জাগে, রঙীন ফানুসের মত মনটা ফুলে কেঁপে ওঠে, দ্রুত যৌবন দেহের রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়। জীবনের সাথে তার চেতনার পরিধি বিস্তৃতিলাভ করে।

শশধর যখন ক্লাস করে, রেণুদি মাঝে মাঝে ছুটে যায় তার ক্লাশ ইন্‌স্পেকশন করতে। শশধর পড়ায়, রেণুদি স্তব্ধ হয়ে তার পানে চেয়ে থাকে। বয়সে তরুণ হ'লে কী হবে রেণুদির মন বলে এমন ভাবে পড়াতে বুঝি আর কোন মাষ্টারই পারে না।

হঠাৎ একদিন অকারণে, অসময়ে রেণুদি শশধরের বাসায় এসে পৌছয়। শশধর নিজে রান্না করছিল। রেণুদি' স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে রান্না দেখে।

রেণুদি বল্লে, সব গুণই আছে দেখ্ চি।

শশধর দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দেয়, সুতরাং, মানে কাজে কাজেই। নইলে পেট বুজ্ বে কেমন ক'রে ?

রেণুদি তেরছা চোখে বিদ্যুৎ হেনে বলে, এতোই যদি দুখ্, বিয়ে করেন না কেন ?

শশধর মুখ নীচু ক'রে খুন্তি নাড়তে নাড়তে বলে, ষাট টাকা মাইনের বিয়ে করলে কী দুঃখ্য ঘুচবে, না বাড়বে ? দেশে বিধবা মা আছেন।

রেণুদি কি ভেবে প্রশ্ন করে, তাকে আনেন্ না কেন ?

শশধর বলে, ঘর ছেড়ে থাকতে চান্ না। কুলদেবতা আছেন—

রেণুদি [illegible] হেসে বলে, এদিকে বংশপ্রদীপ যে নিভে যায়।

শশধর চোখ তুলে কটাক্ষ হেনে বলে, তা যাবে না, মা তা বোঝেন। প্রদীপে তেল না থাকলেও সলতে পুড়েও বেঁচে থাকবে অনেকদিন।

রেণুদি হাসে।

আবার কিছুক্ষণ পরে রেণুদি বলে, উপার্জ্জনক্ষম কারুকে বিয়ে করুন না কেন। দুজনের উপার্জ্জনে স্বচ্ছলতা আসবে।

শশধর বলে, কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার মতোও সঙ্গতি যে আমার নেই,—

রেণুদি সশব্দে খিল খিল ক'রে হেসে বলে, দুষ্টুর রাজা !

ব্যোমকেশের কাণে পৌঁচেছে, শশধরের কথা। প্রেমের ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব কোন রকমেই তুচ্ছ নয়। বিশেষ ব্যোমকেশের কাছে শশধর কন্দর্প ও বয়সে তরুণ !

ব্যোমকেশ বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্ত পাঠক। তিনি বলেচেন, "চাঁদ মুখের সর্বত্র জয়"। কাজেই ব্যোমকেশ উদ্বেগে অস্থির হ'য়ে উঠলো। গোপনে রেণুদির গতিবিধি নিরীক্ষণ করবার জন্যে চর নিযুক্ত হলো—এবং সংবাদ দিয়ে দেশ হ'তে হঠাৎ একদিন রেণুদির মাকে আনানো হলো।

মায়ের আকস্মিক আগমনে রেণুদির বিস্ময়ের অন্ত রইল না, অথচ সে কিছুই বুঝলে না।

ব্যোমকেশের প্রস্তাবে রেণুদির মা হাতে স্বর্গ পেলেন। রাজার ঘরে মেয়েকে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখলে কোন্ মা না খুশী হন। হলোই বা একটু বয়েস, মেয়েও তো তাঁর খুকী নয়। সাতাশ আটাশ বছরের বি-এ, বি-টি - মেয়ে। মেয়ের যে বিয়ের কথা মনে হয়েচে এই ভেবেই বুড়ীর আনন্দের সীমা পরিসীমা রইল না।

একদিন মা বললেন, বিয়ে না করলে মেয়ে জন্মই বৃথা। তোমার যে এতদিন পরে সুমতি হ'য়েচে মা—হবেই আমি জানতুম। আমার বিদ্বান্ বুদ্ধিমান মেয়ে তুমি, তুমি কী আর ভুল করবে মা। আহা, বেশ হবে। খাসা ছেলে ব্যোমকেশ। আর ছেলে মেয়ে দু'টি—মাসিমা বলতে অজ্ঞান। যার ঘর সেইতো করবে মা। দু'দিন পথ আগ্ লে দাঁড়িয়েছিল ওদের মা, অভাগী - চলে গেল। তোমায় দিয়ে গেল ওই দু'টি ফুল। ওদের নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার করো মা—

বুড়ী অশ্রুসজল চক্ষে রেণুদির চিবুক স্পর্শ করে চুম্বন করলে। রেণুদি বিস্ময়ে হতবাক্।

মা বললেন, না মা, আর দেরী করতে আমি একটি দিনও দোব না। যখন তোমাদের দুজনের

মন হ'য়েছে তখন আর দেরীই বা কিসের? একটা ভালো দিন দেখে শুভকাজ মিটিয়ে ফেল। আমি দেখে যাই।

কিছুক্ষণ নতমুখে চুপ ক'রে থেকে রেণুদি প্রশ্ন করলে, ব্যোমকেশবাবু তোমায় কিছু ব'লেচে না?

মা বল্‌লেন, হ্যাঁ সবই বলেচেন। গয়নাগাঁটি সবই তৈরী করতে দিয়েছেন। ওঁর ইচ্ছে এই মাসেই বিয়ে হয়।

রেণুদি মুখ নীচু ক'রে বল্‌লে, এই মাসেই। এতো শীগ্‌গির?

উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই রেণুদি উঠে গেল।

মা মুখ টিপে হাস্‌লেন।

ব্যোমকেশ যতক্ষণ কাছে থাকেন বা রেণুদি যতক্ষণ ব্যোমকেশের বাড়ীতে থাকে, ততক্ষণ রেণুদি ব্যোমকেশের বিপুল ঐশ্বর্য্যের পরিবেশে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। ব্যোমকেশের ঐশ্বর্য্য তার কাছে স্বপ্ন, তপস্যার জিনিষ।

আবার পথে বের হতেই বিস্তৃ অবারিত আকাশের মতো শশধর ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হ'য়ে বৃত্তাকারে রেণুদিকে ঘিরে দাঁড়ায়। তখনি তার মনে হয় প্রকৃতির এই অনন্ত ঐশ্বর্য্যের কাছে মানুষের সম্পদ? গাড়ী, বাড়ী গহনা সেই কি জীবনের সবচেয়ে বড় উপাদান? মনকে উপবাসী রেখে দেহ বাঁচবে কেমন ক'রে? প্রেমের কাছে ঐশ্বর্য্য? রেণুদি মনে মনে হাসে আর জোরে জোরে হাঁটে। পথের পাশে তারি অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে শশধর। শশধর তাকে দেখে হাসে, সেই হাসির বন্যায় ব্যোমকেশ ও তার বিপুল ঐশ্বর্য্য লুপ্ত হ'য়ে যায়। জোৎস্নার বন্যায় জোনাকীর দীপ্তি যায় নিভে। শশধরের অনাবরিত বলিষ্ঠ বাহু ও চওড়া ছাতির পানে চেয়ে চেয়ে রেণুদির চোখ দুটো জ্বালা করতে থাকে। সেই বলিষ্ঠ বাহুর বাঁধনে তার বিস্তৃত বুকের ওপর মাথা রেখে ধরা দেবার জন্যে তার শরীরে কাঁপুনি ধরে। শশধর তার পানে চেয়ে মুখ টিপে হাসে। কী দুষ্ট আর কী মধুর ওই হাসি।

শশধর জিজ্ঞেস ক'রে বসে, হঠাৎ এমন সময় এ পথে যে? রেণুদির মাথাটা লাট্টুর মত বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরতে থাকে। কী উত্তর দেবে সে? ব্যোমকেশের বাড়ী হ'তে বাড়ী ফেরবার পথ তো তার এ না! তবে সে এতখানি পথ অকারণে কেন এলো? শশধরই বা তার কাছে এ কৈফিয়ৎ চায় কেন? কী শুন্‌তে চায় সে? রেণুদি মনে মনে জ্ব'লে ওঠে। অপ্রস্তুতের ভঙ্গীতে সে মুহূর্ত্ত চেয়েই তার পানে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। খুব কড়া একটা উত্তর দেবার জন্যে সে তৈরি হ'য়ে ওঠে, কিন্তু শশধরের মুখের পানে চেয়ে সে নির্বাক হয়ে যায়। শশধর সশব্দে হাসে। রেণুদি মাথা নীচু ক'রে বলে, কেন এ পথে চল্‌লে কী আপনার ভয় করে নাকি?

শশধর বলে, ভয়? আমার আবার ভয় কিসের?

রেণুদি চকিত দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে বলে, যদি এক কাপ চা চেয়ে বসি?

শশধর হাসে। বলে, তাতে আর আমার ভয় কী? কাপ আমার একটাই আছে—হাতলভাঙ্গা। অতিথি সৎকার করবার বাসনা আমার থাক্‌লেও—

রেণুদি হেসে বলে, থাক্। খুব হ'য়েচে। সত্যিই চাইছি না।

শশধরের গলার স্বর ভেঙ্গে আসে। সে সহসা খুব কাছে এসে রেণুদির একখানা হাত চেপে ধ'রে ভাঙ্গা গলায় বলে, তা আমি জানি রেণু, তুমি চাইবে না কোন দিন। তুমি যে দিতেই চাও, তা আমি জানি। আমি শুধু অঞ্জলি ভরে নোব—তুমি দিও।

রেণুদি কাঁদচে—অঝোরে ফুঁপিয়ে কাঁদচে! জনহীন পথের মাঝে শশধরকে আশ্রয় ক'রে সে ভেঙ্গে পড়েচে। তার দুচোখে অশ্রুর বন্যা।

হঠাৎ শশধর এ কী কাণ্ড ক'রে বসলো।

রেণুদি সারারাত ঘুমুতে পারলে না।

কন্দর্পের অব্যর্থ সন্ধানে রেণুদি মাথা তুলতে পারলে না, কুবেরের ঐশ্বর্য্য গেল তার ভুবন হ'তে লুপ্ত হ'য়ে। শশধর তার অস্থিমজ্জায় রক্তের অণু পরমাণুতে প্রকট হ'য়ে উঠলো। তার মোহময় স্পর্শ রেণুদির চেতনাকে বিস্ফারিত ক'রে তুলেচে, শশধরকে কেন্দ্র ক'রে একটি ছোট্ট সংসারের স্বপ্নে সে দিনরাত বিভোর হ'য়ে থাকে। সে গড়তে চায়, নিজের নারীত্বকে লুটিয়ে দিয়ে সে নিজের হাতে নীড় রচনা করতে চায়। সেই হাতে-গড়া নীড়ে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। সেখানে থাকবে পত্রশ্যাম লতাকুঞ্জ, অবারিত নীল আকাশ আর পুষ্পোজ্জ্বল বৃক্ষরাজি। সে নিজে গড়বে, নিজে রচনা করবে, তপোবনের ঋষিকন্যার মত নিজে সেই লতাকুঞ্জে জলসেচন করবে, দুজনে মিলে নিজেদের কুটির রচনা করবে। সে চায় না ব্যোমকেশের পাষাণ-প্রাচীর বেষ্টিত সুরম্য কারাগার। সে পারবে না বন্দিনী হয়ে থাকতে। সে চায় মুক্তবিহঙ্গিনীর মত দূরবিস্তারী আকাশের কোলে কোলে গান গেয়ে উড়ে বেড়াতে। শুধু শশধরকে সঙ্গী করে। শশধরের দারিদ্র্যের কুণ্ঠাকে, তার মনের সকল নিঃস্বতাকে সে ঘুচিয়ে দেবে, নিজের শক্তি, সামর্থ্য ও নারীত্বের উপাদান দিয়ে।

রেণুদি মন ঠিক করেচে, আর সে ব্যোমকেশের সঙ্গে দেখা করে না। নিজের মনের সঙ্কল্প তাকে জানিয়ে দেবে মায়ের মারফতে। ব্যোমকেশের বিপুল ঐশ্বর্য্য তার মনের নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে পারবে না। সে ঐশ্বর্য্য চায় না, সে চায় মানুষ, সে চায় প্রাণ! আশা-আকাঙ্ক্ষাভরা সবল ও সতেজ প্রাণ। সে চায় অধীর উত্তেজনা—সে চায় নিঃশেষ সমর্পণের অবাধ আনন্দ! তার উদ্দাম বাসনাকে ধ'রে রাখবার কোন সম্পদই নেই ব্যোমকেশের মাঝে। ব্যোমকেশের কুবেরের ভাণ্ডার তার মনের দৈন্য ঘোচাতে পারবে না। শশধর তাকে উত্তাল তরঙ্গের মতো প্রবল আকর্ষণে টেনে নিয়ে যায় জীবনের গভীরে,—ব্যোমকেশ দুহাত প্রসারিত ক'রে তাকে টেনে নিরাপদ তীরে এনে তোলে। সে কিন্তু ভাসতেই চায়। সে জীবনের গভীরে ডুব দিয়ে তার তল দেখতে চায়, সে নিরাপদ তীরে দাঁড়িয়ে জীবনসমুদ্রের পানে চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েচে।

রেণুদি তার মাকে মনের কথা জানিয়েচে। ব্যোমকেশকে জানাবার জন্যে তাঁকে অনুরোধ করেচে। মা'র মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো, মা যৌবনের এই সঙ্কটকে উপেক্ষা করতে পারেন না। শশধরের বিশাল যৌবন যে মেয়ের সমস্ত সত্তা জয় ক'রে বসেচে এ কথা বুঝতে তাঁর বাকি রইল না।

ব্যোমকেশ কিন্তু রেণুদির এই প্রত্যাখ্যান-জনিত কুণ্ঠাকে চাপা দেবার জন্তই সাগ্রহে তাকে অভিনন্দন জানালে এবং শশধরের সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাবে আনন্দ প্রকাশ করলে। রেণুদি লজ্জিতও হলো আশ্বস্তও হলো। এত সহজে যে সে ব্যোমকেশের কাছে মুক্তি পাবে সে ভাবতেও পারে নি। সে হাল্কা পায়ে পাখা মেলে দিয়ে সোজা শশধরের বাসায় গিয়ে উঠলো।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে রেণুদি দেখলে, শশধরের ঘরের দরজা বাইরে হতে তালা বন্ধ। ফিরে যেতে কিন্তু রেণুদির

মন চাইল না। শশধরের সঙ্গে দেখা না ক'রে সে ফিরে যেতে পারে না। সে অপেক্ষা করবে। আগ্রহে তার অপেক্ষা করবে যার অপেক্ষায় তার ভবিষ্যৎ জীবনখানি নিয়ন্ত্রিত হবে, যার আগমন প্রত্যাশায় ছোট্ট সংসারটির মাঝে একা কত দিন কত রাত্রি তাকে অপেক্ষা করতে হবে। কী সে মধুর প্রতীক্ষা—তার মাঝে কী উদ্দাম উত্তেজনা, কী অসহ্য আবেগ!...... নিজেদের হাতে গড়া ভবিষ্যৎ সংসারটির স্বপ্নে রেণুদি ডুবে গেল। সেখানে কত আলো, কত সমারোহ। সেখানে আর কেউ থাকবে না, শুধু তারা দুজনা।

রেণুদি বাড়ীর সামনের রাস্তায় পায়চারী করতে লাগল। কতক্ষণ যে সে পায়চারী করলে, কত লোক যে তার সামনে দিয়ে এলো গেল—রেণুদি জানতেও পারলে না। তার প্রতীক্ষায় কাতরতা নেই, অধীর চাঞ্চল্য নেই, ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। সে ভাবের নেশায় বিভোর হয়ে যে শশধরের বাড়ী হ'তে অনেকখানি পথ এগিয়ে এসেচে তা বুঝতেও পারেনি। হঠাৎ তার সম্বিৎ ফিরলো, নারীকণ্ঠের চাপা হাসির খিল্ খিল্ শব্দে। পাশেই একটা গাছের অন্ধকার ছায়ায় দাঁড়িয়ে কারা যেন হাসচে আর গল্প করচে। রেণুদি থমকে দাঁড়ালো। এ যে শশধরের কণ্ঠস্বর। শশধর কার সঙ্গে গল্প করচে। রেণুদি পা টিপে টিপে গাছের অন্ধকার ছায়া আশ্রয় ক'রে দাঁড়াল। শশধরই বটে! একটি মেয়ের সঙ্গে শশধর গাছের নীচে দাঁড়িয়ে গল্প করচে। মেয়েটি শশধরের খুব কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে সশব্দে হাসচে—হাসতে হাসতে শশধরের গায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ছে।

শশধর বলচে, আমি কী করবো বলো অলকা, আমার অপরাধটা কোন্‌খানে? সে যদি আমার পেছনে পেছনে পাগলের মত ঘোরে আমি কী করতে পারি? ভদ্রতা ও সৌজন্যের দিক হ'তেও তো আমাকে দুটো মিষ্টি কথা বলতে হয়।

অলকা গম্ভীর হ'য়ে বলে, শুধু মিষ্টি কথা! তুমি রীতিমত প্রেমের অভিনয় ক'রে ওকে আকাশে তুলে দিলে, তুমি কি কম দুষ্ট!

শশধর মেয়েটিকে আকর্ষণ করে বলে, কিন্তু তুমি যে আমায় ভুল ভাবোনি অলকা, সেই আমার সৌভাগ্য।

অলকা চাপা গলায় বলে, ইস্! আমার দায় পড়েচে। আমার পজিসন্ সম্বন্ধে সিওর না হ'য়ে আমি পথে পা দিই না।

শশধর বলে, তাই নাকি?

না তো কী? ঐ বুড়ি মাগী এসে আমার পথ আগ্‌লে, দাঁড়াবে? তার আগে মরণ ভালো!

শশধর হাসে। অলকা বলে দিদিমণি কিন্তু যখন জানবে, তখন হার্টফেল না করে।

শশধর বলে, ক্ষেপেচো অলকা, ব্যোমকেশ বাবুর লোহার সিন্দুক ওকে সব ভুলিয়ে দেবে।

অলকা উত্তর দেয়, তবে লোহার সিন্দুক ছেড়ে এখানে মরতে আসে কেন?

শশধর বলে, প্রেম বড় বাজে নেশা—এ একটা মানুষের জীবনের দুর্ঘটনা, এর হাতে কারুর নিস্তার নেই।

হঠাৎ পেছনে একটা 'ধুপ্' ক'রে শব্দ হ'তেই দুজনে চমকে ওঠে। শশধর ত্রস্তে টর্চ জ্বাল্‌তেই, অলকা অস্ফুট আর্ত্তস্বরে ব'লে ওঠে, এযে দিদিমণি।

...... রেণুদির দেহটা শক্ত হ'য়ে ঘাসের বুকে লুটিয়ে পড়েচে।

এ্যাটম্ বোমার ইতিহাস

শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্-এস্-সি

আমেরিকার কয়েকটি সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে ১৯৪৫ সনের ১৬ই জুলাই নিউ মেক্সিকোতে শেষ রাত্রির দিকে এক প্রকার অদ্ভুত আলো দেখা গিয়াছে। কেহ কেহ এই ঘটনা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। অবশেষে ৬ই আগষ্ট প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের ঘোষণাতে হিরোসিমা বন্দরে এ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের ফলাফল প্রকাশিত হইলে এই ঘটনার কারণ জানা যায়। নিউ মেক্সিকোতে এলমাগার্ডো এরোড্রোমের নিকট এক মরুভূমিতে একশত ফুট উচ্চ একটি ইস্পাতের স্তম্ভের উপর প্রথম এ্যাটম বোমাটি স্থাপন করা হয়। গভীর রাত্রিতে ইঞ্জিনিয়ারগণ বোমাটি স্থাপন করিয়া বিদ্যুৎবাহী তারের সহিত ইহাকে সংযুক্ত করিয়া দেন। ২০ মাইল দূরে তারের অপর প্রান্ত বিদ্যুৎ পরিচালনার কণ্ট্রোল ঘরে যুক্ত থাকে। অনেক বৈজ্ঞানিক এবং সৈন্যবিভাগের কর্ত্তারা কণ্ট্রোল ঘরে উপস্থিত থাকেন। ডাঃ জে, রবার্ট ওপেন্‌হামার বোমাটি পরীক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেদিন রাত্রিতে আকাশ মেঘে সমাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে বারিপাত হইতেছিল, মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল। অবশেষে শেষ রাত্রিতে সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় বিদ্যুৎ চালনা করিয়া বোমাটিকে ফাটান হইল। যাহা ঘটিল তাহা যেন বিশ্বাস করা যায় না। তিন চার সেকেণ্ড ব্যাপিয়া এরূপ তীব্র আলোকছটা নির্গত হইল যে তাহা দ্বিপ্রহরের সূর্য্যালোক অপেক্ষাও উজ্জ্বল। ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত পর্ব্বতসমূহ তীব্র আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। জ্বলন্ত বাষ্পরাশি ও ভস্মসমূহ ব্যাঙের ছাতার আকারে তীব্র গতিতে ৪০,০০০ ফুট ঊর্দ্ধে উঠিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। ১৫০ মাইল দূরে এক অন্ধ ব্যক্তি পর্য্যন্ত এই দীপ্তি অনুভব করিয়াছিল। বাষ্পরাশি পরিষ্কার হইলে পর বৈজ্ঞানিকগণ যেস্থানে বোমাটি অবস্থিত ছিল সেস্থানে আসিয়া দেখিলেন—স্তম্ভের চিহ্ন মাত্র নাই—প্রচণ্ড তাপে ইস্পাত বাষ্প হইয়া উড়িয়া গিয়াছে এবং প্রকাণ্ড একটি গহ্বরের সৃষ্টি হইয়াছে। তীব্র উত্তাপে পাথর পর্য্যন্ত গলিয়া গিয়াছে। বোঝা গেল ধ্বংসকার্য্যে ইহার আর জুড়ি নাই। ইহার পর হিরোসিমা ও নাগাসাকির উপর দুইটি আণবিক বোমার বিস্ফোরণের ফলে জাপানীরা পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। হিরোসিমায় একটি বোমার বিস্ফোরণে ৬০,০০০ লোক প্রাণ হারায় এবং লক্ষাধিক লোক আহত হয়।

এই বোমার বিস্ফোরণের কারণ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে পদার্থবিজ্ঞানের বিগত ৪০ বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিতে হয়। ১৯০৫ সনে আইনষ্টাইন্ দেখাইয়াছেন যে শক্তি এবং জড় একই পর্য্যায়ভুক্ত। আইনষ্টাইনের মতে যদি একগ্রাম জড়কে সম্পূর্ণরূপে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তবে যে পরিমাণ তেজ নির্গত হইবে ২৫০০ টন কয়লা পুড়াইয়া সেই তেজ পাওয়া যায়। পরমাণুর ভর মাপিতে গিয়া সর্ব্বপ্রথম ইহার প্রমাণ পাওয়া গেল।

পরমাণুর মৌলিক উপাদান তিনটি—প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রন। প্রোটন ও নিউট্রনের ভর

এক বলিয়া ধরা হয়। দুইটি প্রোটন ও দুইটি নিউট্রনের মিলনে হিলিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রক গঠিত হয়। সুতরাং হিলিয়ম পরমাণুর ভড় হিসাব মত ৪ হওয়া উচিত কিন্তু পরীক্ষায় দেখা যায় যে ইহার ভড় প্রায় ৩৮ ভাগের এক ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। যখন প্রোটন ও নিউট্রনের সংযোগে হিলিয়ম কেন্দ্রক গঠিত হয় তখন খানিকটা তেজ বিকীর্ণ হয় এবং সেই জন্যই ভড় কমিয়া যায়। অর্থাৎ জড় যেন শক্তিতে পরিবর্তিত হইতেছে। সুতরাং প্রত্যেকটি পরমাণু শক্তির আধার কিন্তু এই শক্তিকে বাহিরে আনিয়া কাজে লাগাইবার উপায় জানা ছিল না। আণবিক বোমাতেই সর্বপ্রথম সেই শক্তিদ্বারা ধ্বংস ঘটান হয়।

ইটালিদেশীয় বৈজ্ঞানিক ফার্মি পরমাণুর কেন্দ্রকের শক্তিকে কাজে খাটাইবার উপায় উদ্ভাবনে চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহার কাজের জন্য তাঁহাকে ১৯৩৮ সনে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ফার্মি দেখান যে কেন্দ্রক ভাঙ্গিয়া শক্তি নির্গত করিতে হইলে নিউট্রনদ্বারা আঘাত করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। তিনি এর পরমাণুর কেন্দ্রক ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন পরমাণু গঠন করিবার জন্য পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। পৃথিবীতে মোট ৯২টি মৌলিক পদার্থ বিদ্যমান। ফার্মি যুরেনিয়ম্ পরমাণুকে (আণবিক সংখ্যা ৯২) নিউট্রনদ্বারা আঘাত করিয়া নানা প্রকারের পরমাণু সৃষ্টি করিলেন এবং রাসায়নিক উপায়ে এই নূতন পরমাণুসমূহকে পৃথক করিলেন। এই সমস্ত পরমাণুর আণবিক সংখ্যা ৯৩ হইতে ৯৬ অর্থাৎ তিনি এর আরও চারিটি নূতন মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাইলেন। মেণ্ডেলিফের পিরিয়ডিক টেবিলে ৯৩ সংখ্যক মৌলিক পদার্থের নাম দেওয়া হইয়াছে একা-প্লাটিনাম্—প্লাটিনাম্ ধাতুর সহিত এই পদার্থের রাসায়নিক সাদৃশ্য থাকিবার কথা।

এই সময় জার্মানীতে হান ও মিট্নার এবং ফ্রান্সে কুরী ও স্যাভিচ্ ফার্মির নির্দিষ্ট প্রণালীতে পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা এই উপায়ে আরও অধিক সংখ্যক নূতন পরমাণু আবিষ্কার করিলেন। হান নয় রকম বিভিন্ন পরমাণুর সন্ধান পাইলেন। কুরী ও স্যাভিচ্ আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে হয়ত যুরেনিয়ম্ বিভাজন আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু তাঁহারা এই কাজ লইয়া বেশী পরীক্ষা চালাইলেন না। হান্ ও তাঁহার সুযোগ্য ছাত্র ষ্ট্রাস্‌ম্যান্ নিউট্রন দ্বারা যুরেনিয়ম্ পরমাণুকে আঘাত করিয়া নিঃসংশয়রূপে প্রমাণ করিলেন যে যুরেনিয়ম্ কেন্দ্রক ভাঙ্গিয়া যে সমস্ত নূতন পরমাণু সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের আণবিক সংখ্যা ৯২ হইতে বেশী ত নহেই বরং কম অর্থাৎ নূতন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয় নাই। যুরেনিয়ম্ কেন্দ্রক ভাঙ্গিয়া দুইটি পরমাণু গঠিত হইয়াছে। একটি হইতেছে ৫৬ সংখ্যক মৌলিক পদার্থ বেরিয়ম্, রেডিয়ম্ নহে। হানের মত রাসায়নিকের পক্ষেই ইহা প্রমাণ করা সম্ভব হইয়াছিল কারণ রেডিয়ম্ ও বেরিয়মের রাসায়নিক ধর্ম প্রায় এক। এই আবিষ্কারের ফল হইল অতীব বিস্ময়জনক। নিউট্রনের আঘাতে যুরেনিয়ম পরমাণু ভাঙ্গিয়া দুইটি পরমাণুতে পরিবর্তিত হয়—একটির আণবিক সংখ্যা ৫৬ এবং অপরটির আণবিক সংখ্যা ৩৬ বা ৩৭। এতকাল পর্যন্ত পরমাণুর কেন্দ্রকে আঘাত করিয়া কেন্দ্রক হইতে প্রোটন বা নিউট্রন নির্গত করা হইয়াছে কিন্তু পরমাণুকে দুইটি টুকরায় বিভক্ত করা বিজ্ঞানী হানের পরীক্ষা দ্বারাই সম্ভব হইল। নিউট্রনের আঘাতের শক্তিতেই যে যুরেনিয়মের বিভাজন ক্রিয়া হইয়া থাকে তাহা নহে। স্বল্পগতিবিশিষ্ট নিউট্রনের আঘাতেও যুরেনিয়ম্ বিভাজন সম্ভব এবং এই বিভাজন একমাত্র যুরেনিয়ম্,

প্রোটোএ্যাকটিনিয়ম্ এবং থোরিয়ম্ এই তিনটি অত্যন্ত ভারী তেজ-বিকিরণকারী পদার্থেই ঘটিতে পারে। যুরেনিয়ম্ পরমাণুর কেন্দ্রকের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনশীলতার জন্যই এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। বন্দুকের টিপকল টানিলেই যেমন বন্দুকের গুলি ছুটিয়া বাহির হয় কিন্তু টিপকল গুলিকে গতিদান করে না সেইরূপ যুরেনিয়ম্ কেন্দ্রকে নিউট্রনের আঘাত টিপকল টানিবার মত। কেন্দ্রকে নিউট্রন কণিকা আসিয়া পড়িলে তীব্র স্পন্দন সৃষ্টি হয় এবং ফলে কেন্দ্রক দুইটি টুকরায় বিভক্ত হয়।

যুরেনিয়মের দুইটি আইসোটোপ্ (একই মৌলিক পদার্থের পরমাণু সমূহের বিভিন্ন ওজন কিন্তু রাসায়নিক ধর্ম্ম এক হইলে ঐ সমস্ত পরমাণুসমূহকে মৌলিক পদার্থটির আইসোটোপ্ বলা হয়)। ইহাদের আণবিক ওজন ২৩৫ ও ২৩৮। ২৩৫ ওজনের যুরেনিয়ম একটিনো-যুরেনিয়ম্ নামে অভিহিত এবং যুরেনিয়মের ১৪০ ভাগের একভাগ পরিমাণ যুরেনিয়ম্ হইতেছে ২৩৫ যুরেনিয়ম্। অধ্যাপক বর্ দেখান যে যুরেনিয়মের বিভাজনক্রিয়া ২৩৫ যুরেনিয়মে প্রবলভাবে ঘটিয়া থাকে এবং সাধারণ যুরেনিয়ম্ হইতে ইহার কার্য্যকারিতা ১০০০ গুণ বেশী।

যুরেনিয়ম বিভাজনে যে দুইটি অংশ সৃষ্টি হয় তাহারা তীব্র শক্তিতে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ছুটিয়া যায়। আইনষ্টাইনের হিসাবে জানা যায় যে ২০ লক্ষ গ্রাম কয়লা পুড়াইয়া যে পরিমাণ তেজ পাওয়া যায় ১ গ্রাম যুরেনিয়ম্ বিভাজনে সেই পরিমাণ তেজ নির্গত হয়। অবশ্য যদিও সম্পূর্ণ এক গ্রাম যুরেনিয়ম তেজে রূপান্তরিত হইলে আরও হাজারগুণ তেজ পাওয়া যাইত তবুও এই তেজের পরিমাণ অতি অসম্ভব রকমের এবং যদি এই তেজকে কাজে লাগান যায় তবে দুই টন কয়লার কাজ এক গ্রাম যুরেনিয়মদ্বারা চলিয়া যাইবে।

সুতরাং যুরেনিয়মের শক্তিকে কার্য্যকরী করিতে হইলে ২৩৫ যুরেনিয়ম পাওয়া চাই। যুরেনিয়ম হইতে ইহার আইসোটোপ ২৩৫ যুরেনিয়ম্ পৃথক করা অত্যন্ত কঠিন। একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে যে ১৯০৬ সনে বৈজ্ঞানিক এ্যাষ্টন নিয়ন গ্যাসের আইসোটোপসমূহ পৃথক করিতে আরম্ভ করেন এবং দশ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়াও সফলকাম হন নাই। কি উপায়ে যে ২৩৫ যুরেনিয়ম পৃথক করা হইতেছে তাহা সঠিক জানা যায় নাই তবে সম্ভবতঃ যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্লসিয়াস্ ও ডিকেলের উদ্ভাবিত Thermal diffusion প্রথায় এই পৃথকীকরণ সম্পাদিত হইতেছে।

এ্যাটম বোমাতে এই ২৩৫ যুরেনিয়মকে নিউট্রন কণিকাদ্বারা আঘাত করিয়া তেজ নির্গত হয় এবং তাহা দ্বারা ধ্বংসকার্য্য সাধন করা হয়। নিউট্রন উৎপাদন সাইক্লোট্রোন্ নামক যন্ত্রের সাহায্যে হইতে পারে কিন্তু সাইক্লোট্রোনের মত সুবৃহৎ ভারী যন্ত্র এ্যাটম্ বোমায় থাকিতে পারে না। বেরেলিয়ম্ ধাতুর সহিত রেডিয়ম্ রাখিলে নিউট্রন উৎপন্ন হয় কিন্তু এই উপায় অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। সম্ভবতঃ ডয়টেরন সাহায্যে বোমার মধ্যে নিউট্রন উৎপাদন করা হয়। একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন লইয়া ডয়টেরন গঠিত এবং ভারী হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রক একটি ডয়টেরন। একটি ডয়টেরন অপর একটি ডয়টেরনকে আঘাত করিলে নিউট্রন বাহির হইয়া আসে। বোমার মধ্যে ভারী হাইড্রোজেন গ্যাস রাখিয়া সেই গ্যাসে বেশী চাপে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করিয়া ডয়টেরন উৎপাদন করা যাইতে পারে। এই ডয়টেরনসমূহ পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটাইয়া নিউট্রন উৎপন্ন করে। নিউট্রনকে প্যারাফিন বা ক্যাডমিয়াম্ ধাতুর মধ্য দিয়া চালনা করিয়া ইহার

গতি মন্দীভূত করা হয়। এই স্বল্পগতিবিশিষ্ট নিউট্রন ২৩৫ যুরেনিয়মের উপর পড়া মাত্র যুরেনিয়ম কেন্দ্রকের ভাঙ্গন ঘটে এবং কেন্দ্রক হইতে অন্ততঃ ২টি নিউট্রন নির্গত হয়। এই নির্গত নিউট্রনকণিকা আবার অন্য কেন্দ্রককে ভাঙ্গিয়া দেয় এবং পুনরায় নিউট্রন বাহির হইয়া আসে। একবার বহিঃস্থ নিউট্রনদ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইবার পর যুরেনিয়ম্ কেন্দ্রক হইতে উৎপন্ন নিউট্রনসমূহই যুরেনিয়মের বিভাজন ঘটাইয়া থাকে। অবশেষে আঘাতকারী নিউট্রনের সংখ্যা যখন অবশিষ্ট যুরেনিয়ম্ কেন্দ্রক হইতে যে সমস্ত নিউট্রন নির্গত হইবার সম্ভাবনা তাহাদের সংখ্যার সমান হয়, মাত্র তখনই বিভাজন ক্রিয়া বন্ধ হয়। এ্যাটম্ বোমায় সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত প্রণালীতে কার্য্য হইয়া থাকে।

হিসাবে দেখা গিয়াছে যে একটি বোমায় যদি দেড় পাউণ্ড যুরেনিম্ থাকে তবে তাহার বিস্ফোরণক্ষমতার সহিত সেদিন বোম্বে সহরে যে বিস্ফোরণ ঘটিয়াছিল তাহার তুলনা করা যায়। বোম্বের সমুদ্রতীর হইতে একমাইল দূরে অবস্থিত একটি জাহাজে ২০০০ টন্ টি, এন, টির বিস্ফোরণ যাহা ঘটিয়াছিল দেড় পাউণ্ড যুরেনিয়ম তাহা ঘটাইতে পারে। বোম্বে সহরের মধ্যস্থলে বিস্ফোরণ ঘটিলে কি হইত তাহা সহজেই অনুমেয়। হিরোসিমাতে যে এ্যাটম্ বোমাটি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহার বিস্ফোরণ ক্ষমতা ২০০০০ টন টি, এন, টির সমান।

এ্যাটম্ বোমার বিস্ফোরণে উৎপন্ন তাপের পরিমাণ প্রায় একশত লক্ষ হইতে এক সহস্র লক্ষ ডিগ্রীর সমান। এরূপ তাপমাত্রা কোন কোন নক্ষত্রের অভ্যন্তরে দেখা যায়। এইরূপ প্রচণ্ড তাপের ফলে কয়েক মাইলের মধ্যে সমস্ত বস্তু ভস্মীভূত হইয়া যাইবে এবং তাপে প্রসারিত বায়ুর গতি সেকেণ্ডে একশত মাইলের বেশী হয় বলিয়া সেই বায়ুর ঝাপটায় ঘরবাড়ী চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া উড়িয়া যাইবে। জলন্ত সূর্য্য হইতে একটী টুকরা পৃথিবীর উপর ছুঁড়িয়া মারিলে যাহা ঘটিতে পারে এ্যাটম বোমা সেইরূপ কিছু ঘটাইয়া থাকে। ইহার পরও যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে তাহাদের আরও দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। বোমাবিস্ফোরণের পর কিছুদিন ধরিয়া তেজবিকিরক রশ্মিসমূহ সেই স্থান ব্যাপিয়া নির্গত হইতে থাকে। রক্তকণিকার উপর এই রশ্মির ক্রিয়ায় মানুষ ধীরে ধীরে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে আগাইয়া যাইবে। কয়েক বৎসর পর এমন কি ভবিষ্যদ্বংশীয়দের উপরও ইহার বিষময় ক্রিয়া লক্ষিত হইবার সম্ভাবনা।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা দেখাইয়াছেন যে এক একটি বোমা প্রস্তুত করিতে এত অধিক ব্যয় পড়ে যে আমেরিকার মত দেশের পক্ষেও বৎসরে ৫০টির বেশী বোমা প্রস্তুত করা সম্ভব নহে এবং ভারতবর্ষের পক্ষে বৎসরে মাত্র ৩।৪টি বোমা প্রস্তুত করা সম্ভব।

এই বোমার কোন প্রতিষেধক আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই এবং অনেক বিজ্ঞানীর মত যে ইহার কোন প্রতিষেধক হইতে পারে না। বিজ্ঞানী পরমাণুর শক্তির কথা বহুদিন হইতে অবগত ছিল—ধ্বংসকার্য্যে সেই শক্তির প্রথম প্রকাশ হইল। যে শক্তিকে বিজ্ঞানী আজ হাতে পাইয়াছে সেই ঘুমন্ত শক্তিকে জাগান ঠিক হইয়াছে কিনা ভাবিবার বিষয়। আজ এ্যাটম বোমা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভবিষ্যতে "এ্যাটমতর" বা "এ্যাটমতম" বোমা আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। এই শক্তি লইয়া খেলা করা চলে না। যদি এই শক্তিকে মানুষের কল্যাণে নিয়োগ করা যায় তবেই ইহার সার্থকতা। বিজ্ঞানী সেই চেষ্টা করুন। জীবনকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে। আর যেন পৃথিবী এরূপ ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ না করে। শিব ও সুন্দরের জয় হউক।

আমার জীবন-রজনীগন্ধা তুমি

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

প্রথম মানব-হৃদয়-চিত্ররেখা
তোমার হৃদয় গুহায় আজিও অঙ্কিত নিরিবিলি,
হাজার হাজার বছরের দোলে স্মরণের ঝিলিমিলি—
প্রেমউন্মেষলেখা।
ভীরু প্রণয়ের সুষমা অঙ্গে মাখা,
তোমারে প্রথম দেখেছিনু মোর কুটিরের কিনারায়,
পরশ করিতে পেয়েছিলে ব্যথা মৃদুল দখিণ বায়
লাজগুণ্ঠনে ঢাকা।

সিন্দুর ফোঁটা তোমার শুভ্র ভালে,
মধুপূর্ণিমা মন্থর হয়ে মিশেছে তোমার মাঝে।
স্বরগের দ্যুতি পত্রলেখায় গোলাপী বক্ষে রাজে
বসন অন্তরালে।
আলিঙ্গনের মিষ্ট না পিয় সম মম,
রাঙা অঞ্চল জ্যোছনা আলোকে আধো লুণ্ঠিত তব,
দুটি আঁখি কোণে নীরবতাময়ী কবির কবিতা নব
প্রণয়ের তারা সম।

পুষ্পিত এই কামনার উৎসবে
হিন্দোলরাগে যৌবনবীণা বাজে অনুরাগে মোর।
তোমার কণ্ঠে যে গান শুনাবে,—না ভাঙিলে ঘুমঘোর
সে গান কেমনে হবে!
আমার জীবন-রজনীগন্ধা তুমি,
পথে প্রান্তরে অনাদরে ফোটা কুসুমের মত নও।
স্বপনের মালা অলকে জড়ায়ে কথা কও—কথা কও
এখনো রহিলে ঘুমি।

উপনদী

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

(১২)

দলের সকলেই উঠিয়া পড়িল।

পথে বাহির হইয়া অশোকের অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। তাহার স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রায় হঠাৎ অশান্তির ঝড় উঠিয়াছে। সেই ঝড়ের আবর্তে জীবন তাহার ঘুরপাক্ খাইতেছে। অশান্তচিত্তে সে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল।

জীবনে আদর্শের পূজারী সে। সাধারণতঃ মানুষের যাহা কাম্য সে পথ হইতে স্বেচ্ছায় সে বাহির হইয়া আসিয়াছে। যে পথে সে চলিতে চায়, সে পথ সম্বন্ধেও তাহার ধারণা অস্পষ্ট। তাহার আদর্শবাদ কোন সুনিয়ন্ত্রিত কর্মপদ্ধতিতে বাঁধা নয়। জীবনও তাই তাহার সুদৃঢ় নীতিকে সত্য করিয়া চলে না। অত্যন্ত ভাবপ্রবণ সে।

দেশের কথা সে ভাবে। ভাবে পরাধীন ভারতের দুঃখদুর্দশার কথা। তাহার মন এক একটি ঘটনায় অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া উঠে। কিন্তু তাহা যেন ক্ষণিকের স্ফুলিঙ্গ--দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াই আবার তাহা নিভিয়া যায়।

হাজার হাজার লোক যেদেশে অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করিল, শুধু মাত্র অদৃষ্ট আর ঈশ্বরের দোহাই দিয়া সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া সে কিছুই করিতে পারিল না, এ আফ্‌শোষের আর পরিসীমা নাই তাহার নিকট। সে কথা ভাবিতে গেলেও আত্মগ্লানিতে মন তাহার ভরিয়া উঠে—নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু কী করিতে পারে সে? কিছুই কী করিবার নাই? কংগ্রেসের কথা—মহাত্মা গান্ধীর উপদেশবাণী তাহার মনে পড়িয়া যায়। গ্রামে অসংখ্য কাজ পড়িয়া আছে। পল্লী-শিল্পের ভিতর দিয়া দেশের বৃহত্তম জনসমাজকে আত্মসচেতন করিতে হইবে। ম্যালেরিয়াকে জয় করিলে চলিবে না—শহরে জীবনের মোহ লইয়া বসিয়া থাকিলে জাতির প্রাণ-প্রদীপ নিভিয়া যাইবে।

অশোকের কল্পনা ক্ষুদ্রায়তন নয়—বিরাট দায়িত্ব-জ্ঞান লইয়া এখানে তাহাকে কাজ করিতে হইবে। "এইসব ম্লানমুখে দিতে হবে ভাষা—"

অশোকের চিন্তাস্রোত হঠাৎ বাধা প্রাপ্ত হইল।

তাহার সম্মুখে টর্চের আলো পড়িতে সে দেখিল—কিশোরীবাবুর সঙ্গে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে। অশোকের সঙ্গে তাঁহার মৌখিক আলাপ পরিচয় না থাকিলেও অশোক তাঁহাকে জানে। তিনি গ্রামের প্রাচীন ডাক্তার বিপিনবাবু। কঠিন পেশাদারী মনোবৃত্তি—তাহার পরিচয় সনাতনের মুখে অশোক ইতিপূর্বেই পাইয়াছে। সনাতনের পুত্রের কঠিন রোগ প্রশমিত হইতে পারিত হয়ত, সময়কালে বিপিনবাবু যদি

চিকিৎসা করিতেন। চিকিৎসার অভাবেই হতভাগ্য বালক মৃত্যুকে যেন বরণ করিয়াছে।

সনাতনকে অশোক ধিক্কার জানাইয়াছিল—যে ডাক্তার তোমার ছেলের মৃত্যুর জন্যে দায়ী তাকে শাস্তি দিতেও কী তোমরা জান না?

সনাতন বলিয়াছিল—কী করবো কর্ত্তা। হাতপা যে বাঁধা—ভগবানের মার দুনিয়ার বার—

অশোক উত্তর দিয়াছিল—না সনাতন, তা ঠিক নয়। ভগবানের দোষ দিও না। ভগবান তো তোমাদের শক্তিহীন করেন নি। এ তোমাদের শিক্ষার অভাব—তোমাদের ভীরুতা! পুত্রশোকাতুর সনাতনের অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে একথায় আগুনের শিখা জ্বলিয়াছিল—সুদৃঢ় বাহুদ্বয় তাহার উত্তেজিত হইয়াছিল।

—বিপিন ডাক্তারকে একবার বাগে পেলে হয়। দেখো কর্ত্তা কী করি আমি তার!

সেই বিপিন ডাক্তারকে কিশোরীবাবুর সঙ্গে দেখিয়া অশোক বিস্মিত হইয়া উঠিল। কয়েক ঘণ্টা পূর্বে সে মৃদুলাকে দেখিয়া আসিয়াছিল। ইহারই মধ্যে এমন কী ঘটিল যে তাহাকে বাদ দিয়া বিপিনবাবুকে ডাকিতে হইল? অশোককে দেখিয়া বিপিন ডাক্তার জ্বলিয়া উঠিলেন। শিকারী শিকার দেখিলে যেমন মারণাস্ত্র প্রয়োগে উৎসুক হইয়া ওঠে—বিপিন ডাক্তারের অবস্থাও হইল ঠিক সেইরূপ।

কিশোরীবাবুকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি অশোককে আক্রমণ করিলেন—ছেলেছোকরার দ্বারা কী মশাই জটিল রোগের চিকিৎসা হয়? আপনারা প্রথমে তো ভাবেন না—চল্লিশটা বছর ধরে শুধু রোগ দেখেই চুল পাকানুম। ওই সব তেজী ইন্‌জেক্‌সন কী এই ছোট মেয়েদের দিতে আছে!

অশোক লোকটির অভদ্রতায় বিস্মিত হইয়া উঠিল। লোকটি শিক্ষিত ডাক্তার বলিয়া পরিচিত—তাহারই সামনে তাহাকে পরোক্ষে এইভাবে আক্রমণ করিতে দেখিয়া প্রথমে সে হতবাক্ হইয়া গেল।

লজ্জিত কিশোরীবাবু বিশেষ অপ্রস্তুত হইলেন।

অশোক উদ্বিগ্নের সুরে প্রশ্ন করিল—কী ব্যাপার কিশোরীবাবু?

কিশোরীবাবু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন—আপনি চলে আসার পর মৃদুলার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ে।

—এখন কেমন আছে সে?

—ডাক্তারবাবু এই তো দেখে এলেন।

অশোক বিপিন ডাক্তারকে অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া কহিল—আপনার কথা ইতিপূর্বেই শুনেছি বিপিনবাবু। আপনি এ গ্রামের একজন বিচক্ষণ ডাক্তার। আপনার অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক। আমার নাম অশোক মিত্তির। এখানকার ইউনিয়ন বোর্ডে চাকরি করি। কিশোরী বাবুর মেয়ের চিকিৎসা আমি করছিলুম। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হল। আমার বাড়ি এই কাছেই—যদি দয়া করে পায়ের ধুলা দেন! মৃদুলার অসুখ সম্বন্ধে তাহলে একটু আলোচনা করি। আপনি তাকে দেখে এলেন ভালোই হোল। রোগটার প্রপার ডায়গোনিসিস্ করা যাবে আপনার সঙ্গে কনসাল্ট করে।

বিপিন ডাক্তার রুখিয়া উঠিলেন—যোগ্য লোক ছাড়া আমি আলোচনা করিনে। তোমার ভুল চিকিৎসাতেই মেয়েটি এমনি ভুগছে। এই আমার সুস্পষ্ট অভিমত।

কিশোরীবাবু বিশেষ সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলেন—বিপিনবাবু, থাক এখন অপ্রিয় আলোচনা। আমি আপনাকে ডেকেছি বলে একথা বলিনি যে অশোকবাবুর চিকিৎসায় কোন ত্রুটি আছে।

অশোক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল—যোগ্যতার মাপকাঠিটা কী তা যদি জানতে পারি আপনার কাছ থেকে! লেখাপড়ায় আমি বোধহয় আপনার থেকে বিশেষ নিকৃষ্ট নই। আর মেডিকেল কলেজের গ্রাজুয়েটরা বোধকরি হেতুড়ে গেঁয়ো ডাক্তারা চিকিৎসায় অভ্যস্ত নয়, কিন্তু সে কথা থাক্; অকস্মাৎ আমাকে রাস্তায় এভাবে অপমান করার কারণটা জানতে পারা কী? আমি যত অনভিজ্ঞই হই না কেন তবু আপনার ফেলো ব্রাদার। এ ক্ষেত্রে একটা কমন কার্টসিও তো আছে?

বিপিন ডাক্তার প্রদীপ্তকণ্ঠে কহিলেন—এ অভদ্রতা আমার তোমার কাছ থেকেই ধার করা। যে রোগীকে আমি বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিনি—তাকে তুমি মহানুভবতা দেখিয়ে মেরে ফেলেছ। শুধু তাই নয়—তুমি সেই ছোটলোক ব্যাটাদের এমনি ক্ষেপিয়ে তুলেচো যে তারা দল বেঁধে আমাকে আক্রমণ পর্যন্ত করতে এসেছিল। কিন্তু আমিও বলে রাখছি, অশোক মিত্তির, জাতসাপ নিয়ে খেলা করতে যেও না—তার ছোবল সর্বাগ্রে তোমার গায়েই লাগবে। আমি এর সমুচিত শিক্ষাই দেবো তোমাদের। অশোক অনুমানে বুঝিল—পুত্রশোকাতুর সনাতন একটা কিছু অঘটন ঘটাইয়াছে।

মন তাহার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—সনাতনের দল আজ তাহাদের চেতনাকে ফিরিয়া পাইয়াছে দেখিয়া! অশোক তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল—ওঃ, এই ব্যাপার? বড় আনন্দ পেলুম বিপিনবাবু এ খবরে। আশা করি এর পর আপনার কর্তব্য সম্বন্ধে আপনি আত্ম-সচেতন হবেন। ডাক্তারদের কাছে পয়সাটাই সব কিছু নয়। ডাক্তারদের আদর্শটাই হচ্ছে বড়। জীবন-মরণ যাঁদের হাতে তাঁদের মনুষ্যত্ব বোধ না থাকলে অবশ্যই তার জন্যে শাস্তি পাওয়া দরকার।

আর কোন কথা না কহিয়া অশোক হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

আহারাদি সারিয়া শয্যার আশ্রয় লইতে অশোকের অনেক রাত্রি হইয়া গেল। চিন্তার জটিলতা তাহার মস্তিষ্কের শিরাতন্ত্রীকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। আজিকার সমস্ত ঘটনার মধ্যে অশান্তি এবং অস্বস্তির ঝটিকা তুফান তুলিয়াছে। ডাক্তার অশোক মিত্তির সেই তুফানতরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছে।

লেখাদির ব্যবহারে আর যে নিদারুণ উপেক্ষা—অশোককে তাহা অত্যন্ত মর্মপীড়া দিতে লাগিল। লেখাদি তাহাকে এমনি ভুল বুঝিল?

বিপিন ডাক্তার তাহাকে অপমান করুক—অশোকের তাহাতে কিছুই যায় আসে না। কিশোরীবাবু তাহার চিকিৎসাজ্ঞানকে অবজ্ঞা ও কাশ করিলেও তাহার ক্ষতি নাই—সুতরাং তাহাকে ভুল বুঝিলেও অশোক তাহাতে বিক্ষুব্ধ হইবে না, কিন্তু লেখাদি তাহার সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা পোষণ করিলে তাহার সত্যই অনুশোচনা জাগে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ শুইয়া থাকিয়াও অশোক স্থির হইতে পারিল না। ঘুম তাহার আসিতেছে না, নিদ্রাহীনতার মাঝে সে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল।

কি ভাবিয়া হঠাৎ অশোক শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

আলো জ্বালিয়া সে তাহার ডাক্তারী ব্যাগ এবং প্রয়োজনমত কয়েকটি ঔষধপত্র গুছাইয়া লইল।

ঘড়িতে একটা বাজিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি। বাহিরে জনমানবের আর সাড়া-শব্দ

নাই। কিছুক্ষণ অশোক আবার কী ভাবিল—তার ব্যাগটা লইয়া অন্ধকার পথে সে বাহির হইয়া পড়িল।

মৃদুলাদের বাড়ী পৌঁছাইয়া সে দেখিল—ভিতরে আলো জ্বলিতেছে। সঙ্কোচ এবং কুণ্ঠার আধিক্যে অশোকের কণ্ঠ দিয়া কিছুক্ষণ কোন স্বরই বাহির হইল না। যুক্তি এবং বুদ্ধি তাহার উন্মাদনার আধিক্যে লোপ পাইয়াছে, নচেৎ না হইলে রাত্রি একটার সময় যাচিয়া রোগী দেখিতে আসার কী সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে?

না—অশোক এখন সে সব কথা ভাবিবে না। আত্ম মনে প্রশ্ন না তুলি। [illegible] কোন কথা না ভাবিয়া সে কিশোরী বাবুর নাম ধরিয়া ডাকিল।

অশোককে অযাচিত ভাবে আসিতে দেখিয়া কিশোরী বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী [illegible] উঠিলেন। বিপিন ডাক্তারের ব্যবহারে তাঁহারা [illegible] এবং মর্মাহত হইয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, তাঁহাদের উৎকণ্ঠাও দারুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে মৃদুলাকে ঘন ঘন অচৈতন্য হইতে দেখিয়া।

অশোক কহিল—রাত্রে একটা জরুরি কল ছিল। ফিরবার পথে দেখলুম—আপনাদের বাড়ীতে আলো জ্বলছে। ব্যাপার কী [illegible]? মৃদুলা কেমন আছে? কিশোরীবাবু অশোকের হাত ধরিয়া বলিলেন—আমি সত্যিই বড় অনুগৃহীত অশোকবাবু

অশোক বাধা দিয়া কহিল—ওসব কী বলছেন? ডাক্তারের কী সেন্টিমেন্ট্যাল হলে চলে? মৃদুলার খবর কী বলুন?

—কিছু বুঝছিনা ডাক্তারবাবু। এতো সাধারণ হিষ্টিরিয়ার ফিট নয়। থেকে থেকে কেবল অচৈতন্য হয়ে পড়ছে। তার অবস্থা দেখে সত্যিই ভয় পেয়ে যাচ্ছি।

—এখন জেগে আছে মৃদুলা?

—হ্যাঁ, দয়া করে যদি একবার দেখেন!

অশোক প্রচুর গাম্ভীর্যের সহিত অন্দরমহলে প্রবেশ করিল।

মৃদুলাকে দেখিলে ভয় পাইবারই কথা। হার্ট পরীক্ষা করিয়া অশোক সত্যই চিন্তিত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অশোক কহিল—আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তা হলে এক্ষুণি আমি একটা ইনজেক্শন দিতে চাই।

কিশোরী বাবুর স্ত্রী বলিলেন—এ কথা আবার আমাদের জিজ্ঞাসা করছ কেন বাবা? তোমার পর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে। তোমাকে না পেয়ে নিরুপায় হয়েই বিপিন বাবুকে ডাকতে হয়েছিল,—দেখলে তো লোকের কাণ্ড? এরকম দেখে কী চুপ করে থাকা যায়? বাপমায়ের মন বোঝতো বাবা!

অশোক কহিল—ও কথা তুলে কেন আপনারা কুণ্ঠা প্রকাশ করছেন? সত্যিই আমার কোন অভিযোগ নেই আপনাদের পর। আর আমি আপনাদের আত্মীয় বলেই ভাবি।

অশোক সিরিঞ্জ পরিষ্কার করিয়া লইল। মৃদুলা তখন অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে।

ইনজেক্শন দিয়া অশোক কহিল—আপনারা কিছু ভাববেন না। আমি এখন এখানেই থাকবো।

গভীর উৎকণ্ঠার মাঝে অশোক মৃদুলার নাড়ী পরীক্ষা করিতেছিল। চিকিৎসকের গাম্ভীর্য তাহার চোখেমুখে স্পষ্ট রূপে জাগিয়া উঠিয়াছে। এমন অদ্ভুত রোগের সহিত তাহার সম্যক্ পরিচয় নাই।

তবুও অশোকের দৃঢ় বিশ্বাস—হিষ্টিরিয়া ছাড়া ইহা আর কিছুই হইতে পারে না। মৃদুলাকে কলিকাতায় একজন স্নায়ুরোগপারদর্শী ডাক্তারকে দেখাইলে ভালো হয়।

অশোক মৃদুলার পাশে বসিয়াছিল। অকস্মাৎ [illegible] পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া সে বিশেষ উৎসুক হইয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

কপটতা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কেহ বলে তুমি মগ্ন শৈল,
কেহ মায়ানদী কয়।
মানব মনের সুন্দরবন
এই ঠিক পরিচয়।
লুকায়ে রেখেছে শ্যাম লতাজাল,
শত হিংস্র জন্তু ভয়াল,
আঁখি সতর্ক প্রতারিত হয়
পদে পদে সংশয়।

যেথা কাল জল করে চলচল
তালে তালে নাচে ঢেউ,
ক্রূর কুম্ভীর লুকাইয়া আছে
বুঝিতে পারেনা কেউ।
হেরি আনমনে সারি হরিণের,
ভাবিনে সর্প দিবে আসি বেড়,
গুপ্ত ব্যাঘ্রে জানাইয়া দিতে
এখানে ডাকেনা কেউ।

৩

ময়ূরপুচ্ছ দেখিতে যখন
ঊর্দ্ধে চাহিয়া আছি,
ঝাঁক বেঁধে আসি বিঁধে বিষ হুল
বুনো ডাঁস মৌমাছি।
যেথা ফুল ফল সেইখানে ভয়,
যেথা বেণুরব সেইখানে শর,
যেথা সৈকত সেথা চোরাবালি
কেমন করিয়া বাঁচি।

৪

তব হলাহল সাগর সলিল
ধৌত করিতে নারে।
কপিলের খর নেত্রার্চ্চিও
দগ্ধ করেনা তারে।
তোমাতে মিশেছে কঠিনে তরলে,
তোমাতে মিশেছে মধু ও গরলে,
জড়াজড়ি করে লতা বিষলতা
কখন ছোবল মারে।

৫

বিসুভিয়সের অগ্ন্যুৎপাত
প্রবলের রোষানলে।
বিশাল পল্লী ভস্ম হয়েছে
শুনি ইতিহাসে বলে।
কপটতা ওযে যাদুকরী পুরী
সব চেয়ে বেশী ওরই বাহাদুরী
ও জতুগৃহ কত পাণ্ডবে
ভুলায়ে এনেছে ছলে।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বধ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

হাতে কাজ না থাকিলে ভ্রাতুষ্পুত্রগণ নাকি কনিষ্ঠ পিতৃব্যের গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। একালে অনেক সাহিত্যসেবী বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসকে বধ করিতেছেন। তাঁহাদের গবেষণা, সমালোচনা বৈষ্ণব সাহিত্যকে গজেন্দ্রবিক্রমে দলিত মথিত করিতেছে। হয়তো প্রাচীন কালেও এইরূপ অলস মস্তিষ্কের অভাব ছিল না। তাঁহারা কবিতার ছন্দে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের হত্যাকাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন।

আমার নিজের নিকট বিদ্যাপতিবধের একখানি পুঁথি আছে। ঢাকার খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের অনুরোধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালার উৎসাহী কর্ম্মী শ্রীমান্ সুবোধলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ মহাশয় ঐরূপ একখানি পুঁথি আমাকে নকল করিয়া দেন। মূল পুঁথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাণো পুঁথিশালায় আছে। আমি ১৩৪২ সালের ভাদ্র মাসের ভারতবর্ষে এই দুইটী পুঁথি মিলাইয়া বিদ্যাপতিবধ শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। এই পুঁথির বিবরণ সংক্ষেপে এইরূপ—

বিদ্যাপতি বাল্যকালে যখন পাঠশালায় পড়িতেন সেই সময় একদিন রাত্রিতে সহাধ্যায়ীগণের সঙ্গে বাজি রাখিয়া শ্মশানে শূল পুঁতিতে যান। শ্মশানে গিয়া এক অপূর্ব্ব সুন্দরীর দর্শন পান। দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। প্রভাতে চেতনা পাইয়া ঘরে ফিরিয়া আসেন।

রাণী লছিমা প্রত্যহ রাজা শিবসিংহকে বলেন তোমার বন্ধু বিদ্যাপতিকে একবার দেখাও। রাজা টালবাহানা করেন। একদিন রাণীর দাসী গিয়া বিদ্যাপতিকে ডাকিয়া আনিল। বিদ্যাপতি আসিয়া দেখেন রাণী ঘুমাইতেছেন। বিদ্যাপতি শ্মশানে যে মন্ত্র পাইয়াছিলেন, তাহাই জপ করিতে রাণী জাগিলেন। দুই জনের প্রেম হইল। ক্রমে রাজার সন্দেহ হইল বাড়ীতে চোর আসে। চারিধারে কাঁটার পাঁচিল তুলিয়া দিলেন। বিদ্যাপতি পাঁচিল টপকাইতে গিয়া কাঁটায় পড়িলেন। রক্তারক্তি কাণ্ড। লছিমা তো মাথায় ঘা মারিতে লাগিলেন। বিদ্যাপতি পদ লিখিলেন—

কাঁটা কাঁটা বাঙ্কল বাট।
বাট বহি যাএ ফুটল কাঁট॥
একেত কাঁট গহির গম্ভীর।
কাঁটা দিয়া কাঁটা করত বাহির॥
বিদ্যাপতি কহে উহু উহু।
কাঁট বহি বহি পড়ত লহু॥

রাজা শূল পুঁতিয়া রাখিলেন। বিদ্যাপতি অন্তঃপুরে যাবার পথে ঠিক শূলে গিয়া পড়িলেন। বিদ্যাপতি শূলে পড়িয়া পদ লিখিলেন। রাজা বিদ্যাপতির উপদেশেই শূল পুঁতিয়া দিলেন। সুতরাং তিনিও বিদ্যাপতিকে সম্বোধন করিয়া পদ লিখিলেন। বিদ্যাপতি আর

একটী অর্দ্ধপদাংশ লিখিয়া রূপনারায়ণকে দিলেন। অতঃপর তাহার মৃত্যু হইল। রাজা লছিমাকে সংবাদ দিলেন। লছিমাও এক পদ রচনা করিয়া বিদ্যাপতির সঙ্গে সহমৃতা হইলেন। রাজা অট্টালিকা হইতে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিলেন। পদে কবিরঞ্জন ভনিতাও আছে। শিবসিংহ পরজন্মে গোবিন্দদাসরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

১৩২৬ সালের ২য় সংখ্যক পরিষৎ পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য হরপ্রসাদ একখানি পুরাণো পুঁথি হইতে কয়েকটী পদ প্রকাশ করেন। তিনি মন্তব্য করেন—"এই পদগুলি হইতে জানিতে পারা গেল চণ্ডীদাস রামী রজকিনীর সহিত কোন গৌড়েশ্বরের বাড়ীতে গান করিতে গিয়াছিলেন। গানে মুগ্ধ হইয়া রাণী চণ্ডীদাসকে কামনা করেন এবং তিনি সে কথা সাহসপূর্ব্বক রাজাকে বলেন। রাজা শুনিয়াই হুকুম দেন যে চণ্ডীদাসকে হাতীর উপরে কাছি দিয়া কসিয়া বাঁধিয়া হাতীকে চালাইয়া দেওয়া হউক। ইহাতে চণ্ডীদাসের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাহার দেহ প্রাণ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই রাণী প্রাণত্যাগ করেন। শুনিয়া রজকিনীও রাণীর পায়ে গিয়া পড়িল।" শাস্ত্রী মহাশয় একটা কথা বলেন নাই। চণ্ডীদাসকে হাতীর পিঠে বাঁধিয়া একটী বাজপাখী ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই বাজপাখী চলন্ত হাতীর পিঠে বাঁধা চণ্ডীদাসকে ছোঁ মারিতে মারিতে সঙ্গে উড়িতেছিল। এইরূপ পৃষ্ঠাঘাতে চণ্ডীদাস মারা যান। শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন পুঁথিখানা দুইশত আড়াইশত বৎসরের পুরাতন। পুঁথিতে রামীর, চণ্ডীদাসের এবং পাৎসাহের বেগমের গানে উক্তি প্রত্যুক্তি ও খেদ আছে।

চণ্ডীদাসের না হয় মাথামুরুব্বি নাই। কিন্তু বিদ্যাপতি তো রাজকবি ছিলেন। তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। বিদ্যাপতির গানে রাজা রাণীর, যুবরাজ যুবরাজপত্নীর, মন্ত্রী মন্ত্রীপত্নীর অনেক নাম আছে। সুতরাং লছিমা নাম দেখিয়া একদিন বাঙ্গালার সহজিয়া সম্প্রদায় বিদ্যাপতিকে নব রসিকের একজন রসিক বানাইয়া তাহার নামে এই যে দুরপনেয় কলঙ্ক লেপিয়াছে ইহা কি কেহ বিশ্বাস করিবেন?

নান্নুরে এবং সন্নিহিত কীর্ণাহারে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে দুইরকম প্রবাদ আছে। একটা প্রবাদ চণ্ডীদাসের গান শুনিয়া নবাবের বেগম অন্তঃপুরের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন, নবাব সেই ক্রোধে সৈন্য পাঠাইয়া নান্নুরের মন্দির ও চণ্ডীদাসের কুটীর ধ্বংস করেন। চণ্ডীদাস মন্দির চাপা পড়িয়া মারা যান। বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুরের উৎসাহে ও বীরভূমের সাধারণের অর্থসাহায্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে নান্নুরের চণ্ডীদাসের ভিটা নামে পরিচিত স্তূপ খনন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। যতদিন কার্য্য শেষ না হয়, অথবা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত না হয়, ততদিন এ প্রবাদ বিশ্বাস করা শক্ত।

কীর্ণাহারের প্রবাদ, চণ্ডীদাস রামীর সঙ্গে কীর্ণাহারে কীর্ত্তন গাহিতে গিয়াছিলেন। অকস্মাৎ ভূমিকম্পে নাটমন্দির চাপা পড়িয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। কীর্ণাহারে লোকে একটী ভগ্ন মন্দিরস্তূপকে চণ্ডীদাসের সমাধি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এ প্রবাদও বিশ্বাস করা চলে না। চণ্ডীদাস যে রামীকে লইয়া কীর্ত্তন গাহিয়া বেড়াইতেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। একখানি পুরাণো পুঁথিতে চণ্ডীদাস রাজকবি ছিলেন এইরূপ কবিতা আছে।

ইনি কীর্ণাহারের রাজা। চণ্ডীদাস স্বামীর সংশ্রবে পতিত হইলে এই রাজার সাহায্যে চণ্ডীদাসের ভাই নকুল চণ্ডীদাসকে সমাজে উদ্ধার করেন। সুতরাং প্রবাদকে এখন প্রবাদ বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। চণ্ডীদাসও অন্তত তিনজন ছিলেন এইরূপ অনুমান করিবার প্রচুর উপাদান পাওয়া গিয়াছে।

বলিতে ভুলিয়াছি—বিদ্যাপতির ও লছিমার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া—

> এক জন্ম রাজা তবে আপক্ষা রহিল।
> সেই চিত্ররূপে তিনজন প্রাপ্তি হইল।
> এই কথা চণ্ডীদাস হঠাৎ শুনিল।
> বিচ্ছেদের কথা শুনি পদ যে রচিল॥

তথা পদং

> কবি বিদ্যাপতি কহিছে সার।
> লছিমা হৈতে হইল পার॥
> মরিল লছিমা পীরিতি শোকে।
> পীরিতি মরণ দেখুক লোকে॥
> সকল সহিতে বাউক ইহা।
> আসকে নাশিল আপন দেহা॥
> যা বোলে লাছমা তাই সে বলি।
> তাহার পীরিতি রসের কলি॥
> কহে বিদ্যাপতি লছিমা ধন্য।
> পীরিতে মরিল না জানে অন্য॥
> চণ্ডীদাস কহে এ তত্ত্ব সার।
> ইহা বিনে কিছু নাহিক আব॥

সম্প্রতি অগ্রহায়ণ সংখ্যা (১৩৫২) কোচবিহাব দর্পণে ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম, এ, পি, আব, এস, পি, এইচ, ডি মহাশয় "বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-মিলন পদাবলী" নাম দিয়া একটী লেখা প্রকাশ করিয়াছেন। এই মিলনের কয়েকটী পদ পদকল্পতরুতে আছে। বলা বাহুল্য এই মিলনেব পদগুলি সন্দেহজনক। আদৌ এই মিলন হইয়াছিল কিনা, হওয়া সম্ভব কিনা তাহারও স্থিরতা নাই। সুতরাং হাতের লেখা পুরোণো পুঁথিতে পদ পাইলেই যদি তাহা বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের হত্যার পদেও অবিশ্বাস করা চলে না। সুকুমাব বাবু একজন প্রকৃত অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে বেশ বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে যুক্তি প্রমাণেব উপব নির্ভব করিয়া সাহিত্য ও তাহার ইতিহাসেব বিচাব করিয়াছেন। তাঁহার ইংরাজীতে লেখা ব্রজবুলিব ইতিহাসও প্রামাণ্য গ্রন্থ। তিনি কি সত্যই বিশ্বাস কবেন যে মিথিলার বিদ্যাপতি বাঙ্গালায় আসিয়া পবিষ্কার বাঙ্গালা ভাষায়—যে ভাষায় মৈথিল ও ব্রজবুলিব গন্ধ নাই—চণ্ডীদাসের সঙ্গে গুড়ুক টানিতে টানিতে 'চণ্ডীদাস কহে সেথানে কে? আর বিদ্যাপতি বলে এখানে কে?" এই ধবণেব রসতত্ত্ব আলাপ কবিয়াছিলেন? এই আলাপ যদি আসল বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ কথোপকথন না হয়, তাহা হইলে কে সেখানে বেদব্যাস ছিল যে আপন ভাষায় তাহা লিখিয়া লইয়াছিল, অথবা কে সেই গণপতি যিনি দ্রুতহস্তে এই দ্রুত লিখন লিখিয়াছিলেন? যদি এই মিলন কল্পনা করিয়া পরবর্ত্তীকালে কেহ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসেব জবানী এই পদগুলি লিখিয়া থাকে তাহা হইলে সে পদের মূল্য কি? সুকুমাব বাবু মন্তব্য করিয়াছেন—"শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালী বিদ্যাপতি ও কবিরঞ্জন একই ব্যক্তি প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। শেষের পদটীতে আমরা দেখিতেছি যে কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি কবিশেখর একই লোক। এই হিসাবে পদটীর যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে।"

সুকুমার বাবুর মত ঐতিহাসিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন লেখক যদি এইরূপ মন্তব্য করেন, তাহা হইলে আমাদের আর গতি কি? এ যে দেখিতেছি দাঁড়াইবার স্থান নাই। কোনও একটা অখ্যাত অজ্ঞাত লেখক অথবা প্রায় নিরক্ষর লিপিকর কি একটা নামের পরিবর্তে কি লিখিয়া গিয়াছে, তাহারই ঐতিহাসিক মূল্য দিতে হইবে? আবার "যথেষ্ট?" শ্রীখণ্ডের রামগোপাল দাস নিজের পুঁথিতে তারিখ দিয়া গিয়াছেন। এই তারিখযুক্ত পুঁথি রসকল্পবল্লীর প্রতিলিপি শ্রীখণ্ড হইতে, ঢাকা হইতে এবং বীরভূম হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। প্রত্যেক পুঁথিতেই কবিশেখর, কবিরঞ্জন, বিদ্যাপতির পদ পৃথক ভাবে চিহ্নিত রহিয়াছে। রামগোপাল দাসের শাখানির্ণয় আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীখণ্ড হইতে ছাপা হইয়াছে। তাহাতে কবিরঞ্জন ও কবিশেখরের পৃথক পরিচয় রহিয়াছে। রামগোপালের পুত্র পীতাম্বর স্বপ্রণীত রসমঞ্জরী ও অষ্টরস ব্যাখ্যায় ইহাদের পদ পৃথক পৃথক ভাবে চিহ্নিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। পিতাপুত্রে ইঁহারা তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। এই তিনশত বৎসরের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিবার হেতু কি?

সুকুমার বাবু যদি বিশ্বাস করেন তাহা হইলে বিদ্যাপতিবধের কবিতা চণ্ডীদাসবধের কবিতা এবং এইরূপ বাঙ্গালায় প্রচারিত বহু গ্রন্থ যেমন কর্ণানন্দ, অদ্বৈত-প্রকাশ, গোবিন্দ দাসের কড়চা প্রভৃতি নির্বিচারে বিশ্বাস করিতে হইবে। অন্যথায় পণ্ডিতগণের নিকট তিনি অন্ধকুক্কুরী ন্যায়ের ফেরে পড়িতে পারেন।

হরেকৃষ্ণবাবুর মন্তব্য সম্বন্ধে বক্তব্য

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যা কোচবিহার দর্পণে প্রকাশিত "বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-মিলন পদাবলী"-র শেষে আমি লিখিয়াছিলাম, "শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালী বিদ্যাপতি ও কবিরঞ্জন একই ব্যক্তি প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। শেষের পদটিতে আমরা দেখিতেছি যে কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতি-কবিশেখর একই লোক। এই হিসাবে পদটির যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে।"

আমার এই উক্তিতে হরেকৃষ্ণবাবু আপত্তি করিয়াছেন। আমিও এখন করিতেছি,—তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। প্রথমত, বাঙ্গালী বিদ্যাপতি ও কবিরঞ্জনের অভেদত্ব সর্বপ্রথম প্রদর্শন করিয়াছিলেন শাখানির্ণয়ের বচন তুলিয়া বহুকাল পূর্বে শৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত। শৌরীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধগুলি বাহির হইয়াছিল ১৩১২ সালে প্রদীপে আর হরেকৃষ্ণবাবুর প্রবন্ধ ১৩৩৭ সালে সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায়। দ্বিতীয়ত, যেরূপ প্রমাণের বলে বিদ্যাপতি-কবিরঞ্জনের অভিন্নত্ব ধরা হইয়াছে কতকটা সেই রূপ প্রমাণেই কবিরঞ্জন কবিশেখরের অভিন্নত্ব অনুমান করা চলে, অর্থাৎ শাখানির্ণয়ের প্রামাণ্য যেমন আমার পুঁথির প্রামাণ্যও তেমনই। এই কথাটা একটু বুঝাইয়া বলিতেছি।

শৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত শাখানির্ণয়ের মূল পুঁথি দেখিয়াছিলেন। তিনি ইহাতে (রাম) গোপাল দাস এবং রসিক দাস দুইজনের ভণিতা পাইয়াছিলেন। মুদ্রিত শাখানির্ণয়ে রসিক দাসের ভণিতা নাই। এবং ইহার মূল পুঁথিও বোধ করি নাই। সুতরাং মুদ্রিত শাখানির্ণয় সর্বাংশে রামগোপাল দাসের রচনা বলিয়া নেওয়া চলে না। রামগোপালের রসকল্পবল্লীতে এবং তৎপুত্র পীতাম্বরের রসমঞ্জরীতে পদ উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়াই হরেকৃষ্ণবাবু মনে করেন যে রামগোপাল-পীতাম্বরের মতে কবিরঞ্জন ও কবিশেখর পৃথক ব্যক্তি। কিন্তু এই দুই নাম এক ব্যক্তিরই ভণিতাদ্বয় হইতে বাধা কি? রামগোপালকর্তৃক

উদ্ধৃত অনেক পদেই তো ভণিতার ব্যতিক্রম ও কারচুপি দেখা যায়।

অথচ, কোন এক বিদ্যাপতির সহিত কোন এক চণ্ডীদাসের মিলনকাহিনী নিতান্ত আজিকার গুজব নয়। পদকল্পতরুতে আছে, সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের এদিকে নয়। আর এই পদগুলি আমার পুঁথি ছাড়া অন্যত্রও পাওয়া গিয়াছে। আমার পুঁথি আরামবাগ অঞ্চলের। দ্বিতীয় পুঁথিটি বাঁকুড়া অঞ্চলের, এটির লিপিকাল ১১০৫ মল্লাব্দের অর্থাৎ ১২০৬ সালের এদিকে নয়। এই পুঁথি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় ১৩৪৬ সালে।

হরেকৃষ্ণবাবু আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "তিনি কি সত্য বিশ্বাস করেন যে মিথিলার বিদ্যাপতি বাঙ্গালায় আসিয়া" ইত্যাদি। এখানেও আমার প্রবল আপত্তি আছে। প্রথমত, ইতিহাসের আলোচনায় ব্যক্তিগত বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা উঠিতে পারে না। বিশ্বাস প্রমাণ-নিরপেক্ষ আর ইতিহাসের আলোচনা একান্তভাবে প্রমাণ-পরতন্ত্র। যেখানে ইতিহাসসম্মত দলিল-প্রমাণের অভাব সেখানে কিংবদন্তী ও গালগল্প লইয়াই নাড়াচাড়া করিতে হয়। ঐতিহাসিকের কাছে জনশ্রুতিও অবজ্ঞেয় নয়। তাই আমি বলিয়াছি, "পদটির যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে।" অবশ্য "যথেষ্ট" কথাটিতে কেহ যদি আপত্তি করেন তবে আমি কিছু বলিব না।

দ্বিতীয়ত, হরেকৃষ্ণ বাবু কোথায় পাইলেন যে আমি এই মিলন পদাবলীর বিদ্যাপতিকে মৈথিল বিদ্যাপতি বলিয়াছি? শাখানির্ণয়ের সাক্ষ্য অনুসারে বাঙ্গালী কবিরঞ্জন "ছোট বিদ্যাপতি" নামে খ্যাত ছিলেন। গোবিন্দদাস কবিরাজ তাঁহার কয়েকটি পদের ভণিতায় তাঁহার কতিপয় সুহৃদের নাম লইয়াছেন, যেমন—রায় সন্তোষ, রায় বসন্ত ইত্যাদি। দুই একটি পদে বিদ্যাপতির উল্লেখ আছে। এই বিদ্যাপতি গোবিন্দদাসের সমসাময়িক শ্রীখণ্ডের বিদ্যাপতি হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। মৈথিল বিদ্যাপতির পূর্বেও বিদ্যাপতি নাম বা উপাধিধারী কবি ছিলেন। সদুক্তিকর্ণামৃতে এক বিদ্যাপতি কবির শ্লোক উদ্ধৃত আছে।

আসল কথা, হরেকৃষ্ণবাবুর বিশ্বাস যে কদাপি কোন চণ্ডীদাসের সঙ্গে কোন বিদ্যাপতির মিলন হয় নাই। বোধ করি আমার প্রবন্ধ হরেকৃষ্ণ বাবুর এই বিশ্বাসে আঘাত করিয়াছে, তাই তিনি যুক্তিতর্কের পথ এড়াইয়া আমাকে অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়ের ভয় দেখাইয়াছেন।

বিদ্যাপতিবধ ও চণ্ডীদাসবধ কাহিনী যে চৌরপঞ্চাশিকা কাহিনীর ছাঁচে ঢালাই তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। আমাদের দেশের প্রাচীন কবিদিগকে অবলম্বন করিয়া বিবিধ জনশ্রুতি ও রূপকথা গড়িয়া উঠিয়াছে, কালিদাসের সম্বন্ধে তো অনেক কথাই শোনা যায়; তাহার সবগুলি কখনই সত্য হইতে পারে না। কিন্তু কোনটিরই মধ্যে যে সত্যের সংস্রবমাত্র থাকিতে পারে না এমন কথা জোর করিয়া কোন ইতিহাসজিজ্ঞাসু বলিতে পারেন কি?

শ্রীসুকুমার সেন।

দ্রষ্টব্য—এই বিষয়ে আর কোন আলোচনা প্রকাশিত হইবে না।

সম্পাদক

ফাটল

শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী

প্রাণপণে চেষ্টা করি অনুপমকে সুখী ক'রতে। বেচারী! যদিও সে আমার স্বামী তবু ওকে যেন মনে হয় বড্ড অসহায়, বড্ড ছেলেমানুষ। যেন মনে হয় ও আমার চেয়ে অনেক ছোট, নতুন এসেছে সবে এই সংসারে। করুণা হয় ওর মুখের দিকে চাইলে।

মাত্র বাইশ বছরেই কেমন ক'রে যে এত বুড়ো হ'য়ে গেলাম আমি বুঝতে পারি না নিজেই। সবই তো পেয়েছি। সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান, বিদ্বান স্বামী। পয়সার স্বচ্ছলতা। স্নেহ, ভালবাসা। মধ্যবিত্ত পারিপার্শ্বিক। তবু কি যেন পাইনি। কোথায় যেন একটা ছেঁড়া তার কিছুতেই বাঁধতে পারছি না।

প্রণবের কাছে সেদিন তাই ধরা পড়ে গিয়েছিলাম প্রায় আর একটু হলেই। ওই আর একটি অদ্ভুত ছেলে প্রণব। মনের কথাগুলো সময় সময় এমন ধ'রে ফেলে যে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। দৃষ্টিটা ওর বড্ড অন্তর্মুখীন। গল্প কবিতা লেখে কিনা, অনুভূতিটা তাই খুব প্রখর।

সটান সেদিন ব'লে ব'সলে প্রণব,—আচ্ছা মলিনাদি কেন তুমি নিজেকে এমন ক'রে ফাঁকি দিচ্ছ ব'ল তো? আর কতদিন এই ভাবে অভিনয় ক'রবে শুনি?

বুকের ভেতরটা চমকে উঠেছিলো অকস্মাৎ। হাসতে হাসতে ব'লেছিলাম,—সে কী ভাই, অভিনয় কোথায় পেলে? অভিনয়ের আমি যে 'অ'ও বুঝি না।

অতো হাসি সব সময় যার মুখে লেগে থাকতো সেই প্রণবই হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গিয়েছিলো ভীষণ রকম। ওই ওর আর একটা বিশেষত্ব। প্রাণ খুলে হাসতেও যেমন পারে, তেমনিই পারে দার্শনিকের মত গম্ভীর হ'য়ে থাকতে। ধীরগলায় সে বললে,—আর যাকেই ফাঁকি দাওনা কেন, আমাকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না মলিনাদি। তোমার শূন্যতাকে আমার কাছেও যদি ঢাকতে পারবে ভেবে থাকো তো ভুল ক'রেছো।

তেমনি হাসতে হাসতেই ব'ললাম,—হঠাৎ কোন নতুন উপন্যাস আরম্ভ করলে নাকি? নায়িকার ভূমিকাটা আমাকে দিয়েই অভিনয়টা করিয়ে নিতে চাও বুঝি? কিন্তু পার্টটা যে বড় শক্ত বলে মনে হ'চ্ছে ভাই। বোধ হয় পারবো না ঠিক মত ক'রতে।

—ঠাট্টা রাখো। সত্যি বলো মলিনাদি, কেন তুমি নিজেকে এইভাবে তিলে তিলে হত্যা ক'রছো? ব্যাকুল মমতা ঝরে প'ড়েছিলো ওর কণ্ঠে।

একটা তীব্র বেদনা কণ্ঠনালী ঠেলে বেড়িয়ে এসেছিলো। মনে হয়ছিলো কেঁদে লুটিয়ে পড়ি ওর পায়ের তলায়। সামলে ছিলাম অনেক কষ্টে নিজেকে। ছোট্ট একটা উত্তর দিয়েছিলাম,—এ ছাড়া আর কোন পথ নেই ভাই।

—একটা কথা রাখবে মলিনাদি?

—বলো চেষ্টা ক'রবো। অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হ'য়ে গিয়েছিলাম এবার আমিও।

—পুরাণো দিনের কথাগুলো ভুলে যাও। আমার অনুরোধ। হাতখানা চেপে ধরেছিলো সে।

—চেষ্টা তো আমি করি যথেষ্ট, কিন্তু পারি কই ভাই ?

—কেন পারো না ?

হয়তো বুঝতে পারতে যদি মেয়ে হয়ে জন্মাতে। মেয়েরা তোমাদের মত অতো ছ'ল করতে পারে না। যাকে ধরা দেয় তাকে একেবারে সব দিয়ে বসে। বড্ড বোকা জাত কিনা। ঠোঁটের কোণে এক ঝিলিক হাসির রেখা দেখা দিয়েছিলো বিলিতী মদের মত রঙীন।

আশ্চর্য্য ছেলে প্রণব। দমলো না একটুও। আবার বললে,—তুমি কি ভাবো অনুপমদা বোঝে না তোমার এই ছলনা ?

—কেন, কোন কষ্ট তাঁর যাতে না হয় সে চেষ্টা তো আমি সর্ব্বদাই করি। কোন অভিযোগ তো তাঁর করবার নেই।

—শুধু সেবা করাটাই স্ত্রীর কর্ত্তব্য নয় মলিনাদি। তার চেয়েও বড় জিনিস আছে।

—আমার মধ্যে যে তা নেই তাই বা জানলে কী ক'রে ?

—কেন মিথ্যে ভোলাচ্ছ নিজেকে ? না মলিনাদি, তোমায় ভুলতে হবে সুধীন বাবুর কথা। যা মিথ্যে হ'য়ে গেছে জীবনে তাকে আর আঁকড়ে থেকো না এমন ক'রে ?

সুধীন !

সমস্ত দেহে একটা বিদ্যুৎস্পর্শ অনুভব ক'রলাম। সেই ছেঁড়া তারটায় আঘাত ক'রেছে প্রণব। তালহীন একটা সুরের রেশ নেচে বেড়াতে লাগলো শরীরের শিরায় উপশিরায়। প্রবল জলস্রোতের বাঁধটা যেন ভেঙ্গে গেল অকস্মাৎ।

সুধীন !!

আমার জীবনের প্রথম পুরুষ, যাকে আঁকড়ে ধ'রেছিলাম একান্ত নির্ভরতায়, যাকে বিশ্বাস করে তুলে দিয়েছিলাম আমার সমস্ত অন্তর, যার উষ্ণ স্পর্শে আমার প্রথম যৌবন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলো ক্ষণে ক্ষণে, সেই বিশ্বাসঘাতক সুধীন ! না, না, বিশ্বাসঘাতক সে নয়। সে কাপুরুষ, সে ভীতু। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস যার হয়নি তাকে ভীতুই বলবো।

রাগের মাথায় কেন তখন এ বিয়েতে মত দিতে গেলে তা হ'লে ? যাকে ভুলতে পারবে না কোন দিন, ভেবেছিলে খুব শাস্তি দিলে তাকে, নয় ? হেসে উঠে প্রণব।

কে যেন আমার সমস্ত বাক্‌শক্তিকে সবলে চেপে ধরে। উত্তর দিতে পারিনা কোন। কীই বা উত্তর দেব ? সত্যিই ভুল করেছিলাম। ভেবেছিলাম আমি বুঝি আমিই আছি। কিন্তু কই ? এই সাত মাস ধরে প্রতি মুহূর্ত্তে চেষ্টা ক'রেছি আমার অস্তিত্বকে অনুভব করতে। পারিনি। যাকে ঘৃণা করতে চেয়েছি, যাকে ক্ষমা করা আমার দিক থেকে উচিৎ নয় কিছুতেই একমাত্র তাকেই ক্ষমা করেছি সব চেয়ে আগে। পৃথিবীর সবাইকে মনে হয়েছে শত্রু, একমাত্র তাকে ছাড়া যে আমার সব চেয়ে শত্রু।

—কেন তখন তুমি রাজী হতে গেলে তোমার বাবার কথায় ? মাত্র একটা সপ্তাহ সময় আমি চেয়েছিলাম তোমার কাছে, তার মধ্যে যে করে হোক রাজী করাতাম সুধীনবাবুকে। কেন তখন নিজে হাতে বন্ধ করতে গেলে সে পথ শুনি ?

হ্যাঁ, বলেছিল তখন প্রণব। কিন্তু ঘৃণা হ'য়েছিল আমার এই ভিক্ষার কথায়। বুঝিনি সেদিন যে ভিক্ষাই মেয়েদের চিরদিন করতে হয় পুরুষের কাছে।

—তোমার অপরাধ তুমি গরীবের মেয়ে। তোমার অপরাধ তুমি লেখাপড়া শিখেছিলে। তাই সুধীনবাবুর বাবা—রক্ষণশীল আভিজাত্যগর্বিত জমিদার—রাজী হতে পারেন নি এ বিয়েতে। পিতৃভক্ত পুত্রও তোমাকে ছাড়তে বাধ্য হলেন। সুধীনবাবুর বাবাকে আমি দোষ দিই না। কি করবেন তিনি? পূর্ব্বপুরুষের বেঁধে দেওয়া শৃঙ্খলের বাইরে আসবার তাঁর ক্ষমতা নাই। চিন্তাজগতের পরাধীন মানুষ এ আঘাত তিনি সইবেন কিসে? কিন্তু সুধীনবাবু, that scoundrel! বাবু বলতে তাকে আমার ঘৃণা হয়। পিতৃভক্তির নামান্তরে একটা অনাদর্শের জন্যে একটা আদর্শকে যারা বলি দিতে পারে এমন করে, তারা সব পারে। চোখ দুটো জ্বলে ওঠে প্রণবের।

কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম,—আমার জন্যে কারুর তো দুঃখ নেই, অথচ তোমার এতো ব্যথা কেন ভাই?

—হয়তো বুঝতে মলিনাদি, যদি কারুর ভাই হ'য়ে জন্মাতে। বোনকে সুখী করতে ভায়েদের যে কতো আগ্রহ সে তুমি বুঝবে না কোন দিন। অদ্ভুত দরদ ওর কণ্ঠে।

আর একবার সামলাতে হয়েছিল চোখের জলকে। সম্পূর্ণ অনাত্মীয় একটি ছেলের এই ভালবাসার তুলনা আজো আমি খুঁজে পাই না। ওকে তাই ভাল লাগে সকলের চেয়ে বেশী। খুসী হই কাছে থাকলে ও। মনের অসহ্য গুমোটটাকে মাঝে মাঝে হাল্কা ক'রে দিই ওর কাছে।

গলির মোড়ে বাদুরঝোলার মতন ঝুলন্ত একটি ট্রাম থেকে নামল অনুপম। জানালার নীচে দিয়ে আসবার সময় মুখ তুলে একটুখানি হাসলে ফিক্ ক'রে।

মলিনা উঠে গিয়ে খুলে দিলে দরজাটা।

হাসতে হাসতে অনুপম ব'ললে,—একা একা বসে আছো যে?

—দোকা না থাকলে আর কি ক'রবো ব'লো?

—কেন, প্রণব আসেনি আজ?

—তার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই রোজ রোজ আগলাতে আসবে পরের জিনিস।

—তা এমন একটী সুন্দরীকে পেলে আমি কিন্তু খুব রাজী ছিলাম আগলাতে। তাই ব'লে যেন ভেবোনা এখনও আছি। হেসে বলে অনুপম।

গম্ভীর হ'য়ে উত্তর দেয় মলিনা,—বিশ্বাস কি? পুরুষদের আমি মোটেই বিশ্বাস করি না।

ওটা তোমাদের ধর্ম। বিশ্বাস তোমরা কাউকেই ক'রতে পার না আমি কিন্তু তোমাকে খু-উ-ব বিশ্বাস করি।

—সৌভাগ্য সেটা আমার।

—তাই নাকি? দুটো আঙ্গুলের সাহায্যে ছোট্ট একটা টোকা মারে অনুপম ওর গালে।

মুখ টিপে একটুখানি হেসে মাটিতে বসে পড়ে মলিনা; অনুপমের জুতোর ফিতে খুলতে থাকে।

ওর মাথার চুলগুলাকে এলোমেলো ক'রতে ক'রতে সস্নেহে অনুপম বলে,—সত্যি, হাসলে তোমাকে এতো সুন্দর দেখায়! অফিসে ব'সে ব'সে কেবলই তাই মনে হয় কতক্ষণে বাড়ী যাবো। আদরের আরো একটু উঁচু স্তরে এবার উঠে আসে অনুপম।

ঘৃণায় শিউরে উঠে মলিনা। মনে হয় এ যেন গণিকা-বৃত্তিরই রূপান্তর। এ পাপের বুঝি কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। সংস্কারের বাঁধনে সমাজের ভয়ে কত নীচে সে নেমে গেছে। নারীত্বের এই অভিনয়, পদে পদে মানুষকে এই ফাঁকি দেওয়া কেন? কার জন্যে? সমাজ? সেই সমাজ যে তিল তিল করে শুষে নিলো তার জীবনের প্রতিটি রক্তবিন্দু? যে সমাজ তার জীবনে ছড়িয়ে দিয়েছে তীব্র বিষবাষ্প? বিদ্রোহের অগ্নিশিখায় একবার জ্বলে ওঠে মলিনার চোখ দুটো।

কিন্তু বৃথা! কোন উপায় নেই। বিংশ শতাব্দীর সমাজ-সৌধ দাঁড়িয়ে আছে এই চোরাবালির স্তূপে। স্তরে স্তরে তার অজস্র ফাটল হাঁ ক'রে রয়েছে উর্মি অভিশাপের মতন।

দেশীয় রাজ্য ও শাসনতান্ত্রিক প্রগতি

অধ্যাপক শ্রীদেবীসাদ সেন এম্-এ

প্রায় দুই বৎসর পরে বিগত ১৭ই ও ১৮ই জানুয়ারী তারিখে দিল্লীতে নরেন্দ্রমণ্ডলের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ ছয় বৎসর ব্যাপী জাগতিক মহাসমরের অবসান হইয়াছে। সমস্ত রণাঙ্গণে পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী জনগণের ভরসাস্থল মিত্রশক্তি চূড়ান্তভাবে জয়লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষও দ্রুতগতিতে এক নূতন পরিবর্ত্তনের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। এই অবস্থায় সৌহার্দ্দপূর্ণ পরিবেশে নূতনতর আব-হাওয়ায় সমবেত হইয়া ভারতীয় রাজন্যবৃন্দ দেশীয় রাজ্য তথা বৃটিশ ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নরেন্দ্রমণ্ডলের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। অধিবেশনের প্রারম্ভে বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের আবেগপূর্ণ বক্তৃতা এবং দেশীয় রাজ্যের নীতি সম্পর্কে নরেন্দ্রমণ্ডলের চ্যান্সেলার ভূপালের নবাবের গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ঘোষণা দেশীয় রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় নবযুগের সূচনা করে।

অধিবেশনের উদ্বোধনে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল বিগত মহাসমরে ভারতীয় রাজন্যবৃন্দ একান্ত বিশ্বস্তভাবে মিত্রশক্তিবর্গকে যে সাহায্য দান করিয়াছেন তাহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। দেশীয় রাজ্যের যোদ্ধৃগণের মধ্যে পাঁচজন সৈনিক ভিক্টোরিয়া ক্রশ পাইবার সম্মান অর্জ্জন করিয়াছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন রণাঙ্গনে তাঁহারা অসামান্য বীরত্ব ও যুদ্ধনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। ভারতের ভবিষৎ শাসনতন্ত্র রচনায় দেশীয় নৃপতিবৃন্দকে তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত অংশ গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়া বড়লাট বলেন, "যুদ্ধের সময় যেমন আপনারা নেতার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন শান্তির সময়েও যে আপনারা তাহাই করিবেন তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।"

নরেন্দ্রমণ্ডলের এই বৈঠকে নিম্নোক্ত প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়: "নরেন্দ্রমণ্ডল পুনরায় দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছে যে ভারতীয় দেশীয় রাজন্যগণ জনসাধারণের ন্যায় ভারতভূমিকে অবিলম্বে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত দেখিতে ইচ্ছা করেন এবং দেশের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধানকল্পে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার সম্ভাব্য উপায়ে সাহায্য দান করিবেন।" এই প্রস্তাবের আলোচনা-প্রসঙ্গে এক স্মরণীয় বক্তৃতায় নরেন্দ্রমণ্ডলের চ্যান্সেলার ভূপালের নবাব বাহাদুর বলেন:—

"শাসক বা কৃষক নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক চিন্তাশীল ভারতসন্তান মাতৃভূমিকে যে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন তাহার জন্য প্রয়োজন ন্যায়নিষ্ঠা, পারস্পরিক আত্মত্যাগ ও পূর্ণ সহযোগিতা। আমাদের মধ্যে কি এমন কেহ আছেন যিনি চাহেন না যে আমাদের এই জন্মভূমি রাজনৈতিক স্বাধীনতা, মহত্ত্ব এবং জাতিসমূহের মধ্যে তাহার যোগ্য মর্য্যাদা লাভ করুক, এবং প্রাচীন কালের ন্যায় আবার মানব-সভ্যতার ঐশ্বর্য্য সাধনে আপনার উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করুক?"

ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া চ্যান্সেলার বলেন, "এই ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য যে ঠিক কি আকারে হইবে তাহা

বর্ত্তমানে নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে, কারণ ভাবী শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ কি হইবে তাহা আমরা এখনও জানি না। তবে আমরা এ পর্য্যন্ত প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে এই শাসনব্যবস্থা প্রণয়নে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিবে তাহার সমাধানের জন্য আমরা যে কোনও ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত উপায়ে সহযোগিতা করিব।”

এই প্রসঙ্গে দেশীয় রাজ্যে শাসন-সংস্কারের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া নরেন্দ্রমণ্ডলের চ্যান্সেলার আবেগময়ী ভাষায় বলেন—“নরেন্দ্রমণ্ডল বিশেষ আগ্রহের সহিত দেশীয় রাজ্যে শাসন-সংস্কারের কথা বিবেচনা করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তাঁহাদের মন্ত্রিপরিষদের সহিত তাঁহারা পরামর্শ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁহাদের নীতি ও অভিমত প্রকাশ করা প্রয়োজন বোধ করেন। যে সকল রাজ্যে এই নীতি এখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই সেখানে উহা অবিলম্বে কার্য্যকরী করিবার জন্য নরেন্দ্রমণ্ডল আগ্রহান্বিত।’

অতঃপর নরেন্দ্রমণ্ডলের পক্ষ হইতে চ্যান্সেলার ভূপালের নবাব একটী ঘোষণা প্রদান করেন। এই ঘোষণায় দেশীয় রাজ্যে শাসনসংস্কার ও প্রজাদের নৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে নরেন্দ্রমণ্ডলের নীতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। শাসনসংস্কার সম্বন্ধে নরেন্দ্রমণ্ডলের ঘোষণা এই যে প্রত্যেক রাজ্য ও উহার রাজবংশের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নৃপতিবৃন্দ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাঁহাদের শাসনক্ষমতা বিনিয়োগ করিবেন। তদনুযায়ী অবিলম্বে সর্ব্বত্র গণতন্ত্র সম্মত নূতন শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে। শাসন ব্যাপারে প্রজারাও তাহাদের ন্যায্য অংশ গ্রহণ করিবে। এই উদ্দেশ্যে সর্ব্বত্র গণতান্ত্রিক পরিষদসমূহ গঠিত হইবে। এই সকল পরিষদে নির্ব্বাচিত সদস্যের সংখ্যা অধিক থাকিবে। ইহা শাসনবিধি সম্পর্কে নরেন্দ্রমণ্ডলের সাধারণ নীতি। বিশেষ বিশেষ স্থলে স্থানীয় অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শাসনবিধি রচিত হইবে।

প্রজাবৃন্দের অধিকার।

প্রজাবৃন্দের অধিকার সম্বন্ধে এই ঘোষণায় বলা হয় যে ইতিমধ্যে অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যে প্রজাদের অধিকার সংরক্ষণ করিবার নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে তাহারা যাহাতে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে তাহার জন্যও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে সমস্ত রাজ্যে এই অধিকারসমূহ এখনও স্বীকৃত হয় নাই সেখানে ইহা অবিলম্বে স্বীকার করিয়া লওয়া প্রয়োজন। আর ঐ অধিকার সংরক্ষণের জন্য আইন প্রণয়ন করিয়া বিচারালয়সমূহকে উপযুক্ত ক্ষমতা অর্পণ করা প্রয়োজন। অতঃপর প্রজাদের অধিকারসংক্রান্ত নিম্নলিখিত নীতিসমূহ ঘোষণা করা হয়—

(১) কাহারও ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করা হইবে না; আইনসম্মত উপায় ভিন্ন অন্য কোনও প্রকারে কাহারও বাসস্থান বা জমি জমায় প্রবেশ করা হইবে না, কিংবা উহা বাজেয়াপ্ত অথবা মালিকের হস্তচ্যুত করা হইবে না।

(২) কেবলমাত্র যুদ্ধ, বিদ্রোহ অথবা কোন আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে এই অধিকার সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা যাইবে।

(৩) প্রত্যেকের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিবার, স্বাধীনভাবে মেলামেশা করিবার এবং অস্ত্রশস্ত্র না লইয়া বেসামরিকভাবে আইন ও নীতিসম্মত সভায় যোগদান করিবার অধিকার থাকিবে।

(৪) প্রত্যেকের বিবেকের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইবে এবং নীতি ও সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া নিজ নিজ

ধর্ম্মমত পোষণ করিবার ও ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবার অধিকার স্বীকৃত হইবে।

(৫) জাতি ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকলকেই আইনের চক্ষে সমান বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(৬) কেবলমাত্র জাতি, ধর্ম্ম অথবা সাম্প্রদায়িক মতামতের জন্য কাহাকেও সরকারী চাকুরি, কর্তৃত্বপূর্ণ বা সম্মানজনক পদ, অথবা কোনও পেশা কিংবা ব্যবসায় হইতে বঞ্চিত করা হইবে না।

(৭) 'বেগার' প্রথা (যেখানে প্রচলিত আছে) রহিত করা হইবে।

নূতন শাসনব্যবস্থা যে সকল প্রাথমিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাও এই প্রসঙ্গে ঘোষণা করা হয়, এবং ভূপালের নবাব বাহাদুর বলেন যে যে স্থলে এই নীতি এখনও স্বীকৃত হয় নাই, সেখানে ইহা দৃঢ়তার সহিত প্রয়োগ করা হইবে।

শাসনতান্ত্রিক নীতিগুলি এই :—

(ক) শাসন কর্তৃপক্ষ বিচারবিভাগের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। ব্যক্তিবিশেষ ও রাজ্যের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে নিরপেক্ষভাবে মধ্যস্থতা করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

(খ) প্রত্যেক রাজন্যকে নিজ নিজ ব্যয়ের হিসাব (Civil Lists) শাসন পরিচালনার হিসাব (Administrative Budget) হইতে পৃথক্‌ভাবে দেখাইতে হইবে এবং প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যয়ের পরিমাণ মোট রাজস্বের একটি সঙ্গত অংশ হইবে।

(গ) সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত ভাবে কর ধার্য্য করা হইবে, এবং জনসাধারণের কল্যাণকল্পে বিশেষতঃ জাতিগঠনমূলক কার্য্যে রাজস্বের এক মোটা অংশ ব্যয়িত হইবে।

উক্ত ঘোষণার উপসংহারে ভূপালের নবাব বাহাদুর এই আশা পোষণ করেন যে নরেন্দ্রমণ্ডলের এই স্বতঃপ্রণোদিত নীতি অবিলম্বে দেশীয় রাজ্যসমূহে এক নবযুগের সূত্রপাত করিবে; প্রজাবৃন্দের সর্ব্ববিধ অভাব ও শঙ্কা দূর হইবে এবং সর্ব্বত্র চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ভূপালের নবাব বাহাদুরের বক্তৃতা ও নরেন্দ্রমণ্ডলের এই ঘোষণায় যে নীতি ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহা পূর্ব্ব হইতেই প্রগতিশীল দেশীয় রাজ্যসমূহে অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, বরোদা, গোয়ালিয়র, বিকানীর, জয়পুর, কুচবিহার প্রভৃতি রাজ্যে পূর্ব্ব হইতেই গণতান্ত্রিক পরিষদের সাহায্যে শাসনকার্য্য পরিচালিত হইতেছে। জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ রাজ্যশাসন ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছেন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও শিল্পে কোনও কোনও দেশীয় রাজ্য বৃটিশ ভারত অপেক্ষা বহুলপরিমাণে অগ্রগামী। যাহারা এ সব বিষয়ে এখনও পিছনে পড়িয়া আছে উপস্থিত ঘোষণা কার্য্যে পরিণত হইলে তাহারাও দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। তাহা ছাড়া রাজন্যবর্গের এই সম্মিলিত ঘোষণার ফলে সমস্ত দেশীয় রাজ্যের শাসনতন্ত্রে এক সাধারণ মূল নীতি প্রবর্ত্তিত হইবে। এক রাজ্যের সহিত অপর রাজ্যের এবং বৃটিশ ভারতের সহিত 'ভারতীয় ভারতের" শাসনবৈষম্য প্রভূত পরিমাণে কমিয়া যাইবে।

দেশীয় নৃপতিগণের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সময় সময় বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনিতে পাওয়া যায়। একথা বলা হয় যে তাঁহারা মধ্য-যুগীয় সামন্তনীতি আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন। তাঁহারা কালের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে সম্মত বা সক্ষম নহেন। নরেন্দ্রমণ্ডলের সাম্প্রতিক ঘোষণায় কিন্তু ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির ন্যায় নরেন্দ্রমণ্ডল ও তাহার

সভ্যবৃন্দ ভারতের ভাবী মঙ্গল ও অগ্রগতির সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন। তাঁহারাও ঐকান্তিকভাবে ভারতমাতার রাজনৈতিক মুক্তি এবং সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করেন। তাঁহারা উপলব্ধি করিয়া থাকেন যে ভারতের কোনও একটা অংশ অপর সকল অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে না। কোনও এক অংশ অপর অংশ সমূহ হইতে নিরপেক্ষভাবে সামাজিক বা অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করিতে পারে না। তাঁহারা ইহাও বুঝিয়া থাকেন যে এই বিরাট ও বিচিত্র দেশের কোনও এক বৃহৎ অংশে যে সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা, যে আদর্শ ও রাজনৈতিক চেতনা প্রসার লাভ করে, তাহার প্রভাব হইতে অপর কোনও অংশকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন রাখা সম্ভবপর নহে। আবার, ভৌগোলিক বিচারে ভারত এক ও অখণ্ড। ইহার বাণিজ্যের প্রসার, শিল্পের সমৃদ্ধি, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি এক সাধারণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে। আজ ভারতবর্ষ জাতীয় ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে উপনীত হইয়াছে। চারিদিকে তাহার যে জীবনস্পন্দন ও কর্ম্মপ্রেরণা উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে এই মহাদেশের অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিকটবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। দেশের এই যুগসন্ধিক্ষণে দেশীয় রাজন্যগণ তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন রহিয়াছেন। দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে ন্যায্য অংশ গ্রহণ করিতে তাঁহারা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেন না। নরেন্দ্রমণ্ডলের ঘোষণা তাঁহাদের এই প্রগতিশীল মনোভাবেরই সাক্ষ্য প্রদান করে।

দেশীয় রাজ্য প্রজাসম্মেলনের সভাপতি হিসাবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুও নরেন্দ্রমণ্ডলের এই ঘোষণায় আনন্দ প্রকাশ করিয়া এবং ইহার জন্য নরেন্দ্রমণ্ডলকে অভিনন্দিত করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা যথার্থই যুগোপযোগী হইয়াছে; অদূর ভবিষ্যতে ভারতে যে বৃহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিতে চলিয়াছে এই ঘোষণা তাহারই সূচনা করিতেছে।

বার্ষিক অধিবেশনে এই ঘোষণা ও তাঁহাদের নীতি ব্যক্ত করিয়াই নরেন্দ্রমণ্ডল ক্ষান্ত হন নাই। ইহার পরেও সাংবাদিকদের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে এবং স্বতন্ত্র বিবৃতি দ্বারা চ্যান্সেলার ভূপালের নবাব ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য তাঁহাদের আন্তরিক আগ্রহের কথা দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। দেশের রাজনৈতিক দলগুলির সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য এবং রাজনৈতিক সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য তিনি রাজন্যবর্গের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধী এবং মুসলিম লীগের সভাপতি জিন্নার সহিত আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গত ৯ই মার্চ্চ তারিখেও আমেরিকার কোনও সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট তিনি বলিয়াছেন যে, দেশীয় নৃপতিদের সম্বন্ধে লোকে যাহাই বলুক না কেন ভারতের অগ্রগতির পথে তাঁহারা কোনও বাধার সৃষ্টি করিবেন না, কারণ তাঁহারাও ভারতকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত দেখিতেই ইচ্ছা করেন।

মহাকবি গিরীশচন্দ্র

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

প্রণাম তোমারে হে মহাকবি,
প্রণাম তোমারে নাট্যরবি।
হে কবি তোমার সন্ধানী চোখ
পাপী তাপী, সৎ শতেক লোক
সরল, কুটিল, উদার যত
ত্যাগী, অত্যাগী ধর্মব্রত—
সবাকার রীতি, প্রকৃতি ধরি'
দেখালে সমুখে উজল করি'।
হে বীর, তোমার আলোক-রেখা
যেথা যত ছবি আছিল লেখা
আঁধারে, গোপনে, আকাশে, ঘরে
সকলি নয়নে বিকাশ করে।

উচ্চ, উদার মহান গিরি,
তোমার বিপুল অঙ্গ ঘিরি,
কত তৃণ লতা, তরু শোভন,
কত নদী-ধারা, প্রস্রবণ।
কভু ছায়া লভি, কভু বা জল,
ছায়ায় সলিলে দেহ শীতল।
তব আশ্রয়ে আরাম পাই,
দুখে সুখে তাপে প্রাণ জুড়াই।
প্রণাম তোমারে হে মহাকবি,
প্রণাম তোমারে নাট্যরবি।

গান

বেগম আমীনা

ঐ যে নদীর পারে রে—
কেয়া বনের পারে রে,
ঘরছাড়া কোন রাখাল ডাকে আমারে॥
সই গো সই – মুখের ভাষায় কয় না কথা
বাঁশীর সুরেই কয়,
পাও চলে না ঘরকে যেতে
সেথা—মন পড়িয়া রয়॥
আমি কেমন করে ঘরের পথে
ফিরাই তাহারে॥
সই গো সই—রাখাল ছেলের বাঁশীর সুরে
নাচে নদীর জল—
ও তার ঢেউ লাগে মোর কলসীতে তাই
জল করে ছল্ ছল্।
আমি স্বপন ছবি দেখি শুধুই
নদীর কিনারে॥

রাজপরিবারের সংবাদ

শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর বর্ত্তমানে কুচবিহার রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিতেছেন। ১৬ই মার্চ্চ রাজ বাড়ীর টেনিস গ্রাউণ্ডে টেনিস প্রীতিসম্মিলনের ফাইনাল খেলা হয়। সিঙ্গিল্‌স-এ মহারাজ ভূপ বাহাদুর ক্যাপ্টেন বি-ঘোষকে পরাজিত করেন এবং ডাবল্‌সে মহারাজ ভূপ বাহাদুর ও মিঃ এন-বসু তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যাপ্টেন বি-ঘোষ ও ক্যাপ্টেন ডিকা টকে পরাজিত করেন। ১৮শে মার্চ্চ মহারাজ ভূপ বাহাদুর স্থানীয় সুইডিস মিশন স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সেইদিনই বিশেষ কার্য্য উপলক্ষ্যে কলিকাতা গমন করেন, কলিকাতা হইতে ২১শে মার্চ্চ কুচবিহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সন্ধ্যায় ষ্টেট কাউন্সিলের এক বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন, পর দিবস কুচবিহার আইন পরিষদের অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

মহারাজকুমার শ্রীইন্দ্রজিতেন্দ্রনারায়ণ কুচবিহারেই অবস্থান করিতেছেন। মহারাজ ভূপবাহাদুর মহারাজকুমারকে লেঃ-কর্ণেল পদগৌরব প্রদান করিয়াছেন। ইতিমধ্যে ব্যাঘ্রের অত্যাচারের সংবাদ পাইয়া একদিন অপরাহ্ণে মহারাজকুমার কামিনীর ঘাট তালুকে গমন করেন এবং অল্পসময়ের মধ্যেই বিরাট একটি চিতা শিকার করিয়া ফিরিয়া আসেন। মহারাজকুমার বর্ত্তমানে কুচবিহার গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারিয়েটে সেক্রেটারিরূপে যোগদান করিয়াছেন। স্থানীয় সাহিত্যসভার কার্য্যেও মহারাজকুমার যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। সভার কার্য্যকরী সমিতির সভ্যবৃন্দের সহিত ইতিমধ্যেই তিনি এক বিশেষ বৈঠকে মিলিত ও পরিচিত হন এবং সভার উন্নতির বিষয়ে আলোচনা করেন।

রাজভগ্নী জয়পুরমহারাণী শ্রীশ্রীগায়ত্রীদেবী কুচবিহার রাজপ্রসাদে অবস্থান করিতেছেন। তিনি স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণ ক্লাবে একটি "ভ্যারাইটি সো' এর ব্যবস্থা করিতেছেন। এই সম্পর্কে টিকিট বিক্রয় লব্ধ সমুদয় অর্থ আর্ত্তের সেবায় প্রদান করা হইবে।

মাতৃশ্রী শ্রীশ্রীমহারাণী সাহেবা বোম্বাই নগরীতে অবস্থান করিতেছেন।

স্থানীয় সংবাদ

কুচবিহার ব্যবস্থাপক সভায় মহারাজ ভূপ বাহাদুরের উদ্বোধনী বক্তৃতা –

গত ২৬শে মার্চ্চ কুচবিহার আইনসভা গৃহে শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরের সভাপতিত্বে কুচবিহার ব্যবস্থাপক সভার শীতকালীন অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন উদ্বোধন করিয়া মহারাজ ভূপ বাহাদুর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, মহাযুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণের সম্মুখে এক নূতন যুগের আবির্ভাব দেখা দিয়াছে। ভারত আজ যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্ত্তনের অপেক্ষা করিতেছে। রাজা প্রজা নির্ব্বিশেষে ভারতের সকলেরই ইহা কাম্য যে ভারতবর্ষ অচিরে পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে যোগ্য আসন গ্রহণ করুক। ইহা অতিশয় আনন্দের কথা যে নিকট ভবিষ্যতে ভারতবাসীর আশাআকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে এবং আশা করা যাইতেছে যে ভারতবাসীরা স্বয়ং তাহাদের ভাগ্য নির্ণয়ের অধিকার লাভ করিবে। এমতাবস্থায় দেশীয় রাজ্যসমূহকে পশ্চাতে পড়িয়া না থাকিয়া উন্নতি ও সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতীত কোন গভর্ণমেণ্টই সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্য লাভ করিতে পারে না। তাই মহারাজ বাহাদুর আইনসভার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণকে তাঁহার গভর্ণমেণ্টকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়া রাজ্যে শান্তি এবং সমৃদ্ধি আনয়নের কার্য্যে সহায়তা করিতে আহ্বান করেন। আইনসভার ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সভ্যগণকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিয়া মহারাজ ভূপ বাহাদুর বলেন যে, তাঁহাদের সহায়তায় মহারাজের গভর্ণমেণ্ট রাজ্যের জনসাধারণের বৈষয়িক ও নৈতিক উন্নতির জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু এই সঙ্গে মহারাজ বাহাদুর আইনসভাকে ইহাও স্মরণ করাইয়া দেন যে কেবল পরিকল্পনা করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে না, ইহার জন্য অর্থ ব্যয় আবশ্যক। নূতন কোনরূপ কর না বসাইয়াই মহারাজের গভর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে কতকগুলি পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়াছেন, কিন্তু জনসাধারণের উন্নতিমূলক আরও যে সকল পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহাদের সকলগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে আরও অর্থের আবশ্যক; এবং নূতন কর স্থাপন করিয়া এই অর্থের সংস্থান করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, মহামান্য রাজপ্রতিনিধি নরেন্দ্রমণ্ডলের গত অধিবেশনে তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে দেশীয় রাজ্যসমূহের করের হার বাড়াইয়া ব্রিটিশ ভারতের মতন করিতে হইবে; অবশ্য নরেন্দ্রমণ্ডলের চ্যান্সেলার ও ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি ভারত গভর্ণমেণ্টের এই দাবীর যথাসাধ্য প্রতিরোধ করিতেছেন, কিন্তু মনে হয় যে অনতিবিলম্বেই দেশীয় রাজ্যসমূহের করভার বৃদ্ধি করিয়া ব্রিটিশ ভারতের ন্যায় করিতে হইবে। ইহা না করিলে দেশীয় রাজ্যসমূহের উন্নতি বা উন্নয়ন সম্ভবপর হইবে না।

বক্তৃতার শেষে মহারাজ ভূপ বাহাদুর ভারতের বহু স্থলে খাদ্যশস্যের যে অপ্রতুলতা দেখা দিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে কুচবিহার রাজ্যে খাদ্যশস্যের

অভাব হয় নাই; কিন্তু কুচবিহার ভারতেরই অংশ এবং ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে কুচবিহারে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আমদানী করিতে হয়। সুতরাং আইনসভার ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি কুচবিহারের সহরগুলিতে খাদ্যশস্যের রেশনিং প্রবর্ত্তন করিবার যে সুপারিশ করিয়াছেন মহারাজ ভূপ বাহাদুর আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি আশা করেন যে আইনসভার নির্ব্বাচিত সদস্যগণের সহযোগিতায় এই রেশনিং সাফল্য-লাভ করিবে।

কুচবিহার দরবারের ট্রাক্টর ক্রয়—

কুচবিহার রাজ্যে যান্ত্রিক কৃষিকার্য্য প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা হইতেছে। কৃষিকার্য্যের জন্য এবং রাস্তা ও সেচের খাল নির্ম্মাণের জন্য কুচবিহার দরবার ত্রিশ হাজার টাকারও অধিক মূল্যে একটি ট্রাক্টর ক্রয় করিয়াছেন।

কুচবিহারে ধান্য ও চাউলের বাধ্যতামূলক রেশনিং—

গত ১লা এপ্রিল হইতে কুচবিহার রাজ্যের সহর অঞ্চলে ধান্য ও চাউলের বাধ্যতামূলক রেশনিং প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আপাততঃ দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ, মেখলীগঞ্জ ও হলদিবাড়ী সহরে এবং চাংড়াবান্ধা বন্দরে রেশনিং আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, কুচবিহার সহরেও শীঘ্রই রেশনিং আরম্ভ হইবে। বারো বৎসর বয়সের অধিক প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য দৈনিক অর্দ্ধসের চাউল বা তিনপোয়া ধান্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। বারো বৎসরের কম কিন্তু দুই বৎসরের বেশী বয়সের শিশুদের জন্য উক্ত পরিমাণের অর্দ্ধেক বরাদ্দ করা হইয়াছে। কায়িক শ্রমজীবিদের শতকরা ২৫ ভাগ অধিক শস্য দেওয়া হইবে।

রেশনকার্ডে যাহার যে পরিমাণ ধান বা চাউল প্রাপ্য তাহার অধিক ধান বা চাউল রেশনিং এলাকায় কেহ রাখিতে পারিবেন না। তবে যাহাদের নিজেদের জমিতে ধান জন্মে তাহারা নিজেদের পরিবারবর্গের প্রয়োজনানুরূপ ধান বা চাউল রাখিতে পারিবেন।

সিভিল ডিফেন্স ডিপার্টমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত ব্যবসায়ীরাই রেশনিং এলাকায় ধান বা চাউল বিক্রয় করিতে পারিবেন।

বাৎসরিক স্কাউট-ক্যাম্প—

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৩রা মার্চ্চ পর্য্যন্ত তুফানগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত কামাতফুলবাড়ী নামক স্থানে রায়ডাক নদীর তীরে কুচবিহারের বাৎসরিক স্কাউট-ক্যাম্প স্থাপিত হইয়াছিল। রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল হইতে মোট ৬০ জন স্কাউট এখানে ক্যাম্প-বাসের জন্য সমবেত হইয়াছিল। ২৬শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় সময় শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর ক্যাম্পের দ্বারোদ্‌ঘাটন ও উদ্বোধন করেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রমুখ রাজ্যের উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও তুফানগঞ্জের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। যে স্থানটিতে ক্যাম্প স্থাপিত হইয়াছিল মহারাজ ভূপ বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ঐ স্থানের নাম "জগদ্দীপেন্দ্রনগর" রাখা হয়। উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষ্যে বহুদূর গ্রামাঞ্চল হইতে বহু স্ত্রীপুরুষ ক্যাম্প-দ্বারে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। মহারাজ ভূপ বাহাদুর গাড়ী হইতে অবতরণ করা মাত্র গ্রাম্যস্ত্রীলোকগণ উলুধ্বনি করিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

ক্যাম্পে অবস্থান কালে স্কাউটগণ সর্ব্বসাধারণের নদী পারাপারের সুবিধার জন্য রায়ডাক নদীর উপর একটি বাঁশের পুল প্রস্তুত করিয়াছিল।

দেশবিদেশের কথা

শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মবার্ষিকী—

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ১১০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গত ৫ই মার্চ বেলুড় মঠে ঠাকুরের জন্মতিথিপূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতে মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, ভজন, কীর্ত্তন ও পূজা হয়; এবং অপরাহ্ণে স্বামী পবিত্রানন্দজীর সভাপতিত্বে এক জনসভার অনুষ্ঠান হয়।

গত ১০ই মার্চ ঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে বেলুড় মঠে দুই লক্ষাধিক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত মাইক্রোফনযোগে বিভিন্ন ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ অবলম্বনে সঙ্গীত, পাঠ ও আলোচনার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রায় ১২০০ লোকের সমবায়ে গঠিত ৩০টি স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী উৎসবের সকল সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

দেরাদূন এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা—

গত ৪ঠা মার্চ লক্ষ্ণৌ হইতে ৪৮ মাইল দূরে ভাগালী রেলওয়ে ষ্টেশনে একটি ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা ঘটে। উক্ত রেলওয়ে ষ্টেশনে একটী মালগাড়ীর সহিত দেরাদূন এক্সপ্রেসের সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের ফলে ৪৩ জন নিহত এবং ৪৬ জন আহত হয়। চূর্ণবিচূর্ণ কামরাগুলি রেলপথের উপর পড়িয়া থাকায় বহুক্ষণ ট্রেণ চলাচল বন্ধ ছিল। আহতগণের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার খান বাহাদুর ডক্টর মামুদ হাসান অন্যতম ছিলেন।

বিভিন্ন রেলপথে আজকাল ঘন ঘন ট্রেণ দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। ইহার কারণ নির্ণয় ও ভবিষ্যতে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে বেসরকারী স্কুলের প্রতিনিধিত্ব—

বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভায় বাংলার বেসরকারী স্কুলসমূহের কোনও প্রতিনিধি নাই। এই সম্পর্কে কিছুদিন পূর্ব্বে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির এক প্রতিনিধিমণ্ডলী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। চ্যান্সেলার প্রতিনিধিগণের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া আদেশ দিয়াছেন যে অতঃপর সেনেট সভায় দুইটি আসন বেসরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হইবে; ইহার একটি আসন বালিকাবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। ভবিষ্যতে সেনেটের সদস্যপদ খালি হইলেই শিক্ষক মনোনয়নের ব্যবস্থা করা হইবে।

ডাক কর্ম্মচারীদিগের দাবীর মীমাংসা—

ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীগণ কতকগুলি অভাব অভিযোগ প্রতিকারের নিমিত্ত ধর্ম্মঘটের নোটিশ দিয়াছিলেন। ভারত সরকার তাঁহাদিগের কতকগুলি অভাব অভিযোগ মানিয়া লইয়া তাহার প্রতিকার করিয়াছেন, এবং অন্য কতকগুলি বিষয় সালিশী করার জন্য বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাধ্যক্ষের উপর ভার দিয়াছেন। ফলে কর্ম্মচারীগণ ধর্ম্মঘটের নোটিশ প্রত্যাহার করিয়াছেন।

ভারতে এরোপ্লেন নির্ম্মাণ—

এক সংবাদে প্রকাশ যে ভারত সরকার ভারতবর্ষে এরোপ্লেন নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের সদস্য স্যার আকবর হায়দারী বলেন যে ভারতে এরোপ্লেন নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য ব্রিটেন হইতে একদল অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে আহ্বান করা হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কচ্ছেদ—

বহুদিন হইতেই দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট ভারতীয়গণের সহিত অসম্মানজনক বৈষম্যমূলক ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি অবস্থা চরমে উঠিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট আইন করিয়া ন্যাটাল ও ট্রান্সভালে অবস্থিত ভারতীয়গণের জমিজমা ও সম্পত্তি ক্রয়ের অধিকার সঙ্কুচিত করিতে যাইতেছেন, তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে একদিন দক্ষিণ আফ্রিকার শেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকগণের প্রয়োজনেই ভারতীয়গণকে সেখানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল; শেতাঙ্গদিগের আর্থিক সম্পদ ভারতীয় শ্রমেই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক, ভারত সরকার দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্ণমেণ্টের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্ণমেণ্টের সহিত পূর্ব্বে যে বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা বাতিল করিবার নোটিশ দিয়াছেন। ভারতের আত্মসম্মান রক্ষার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন খুবই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে।

নরেন্দ্রমণ্ডলের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির অধিবেশন—

গত ১১ই হইতে ১৩ই মার্চ্চ নয়া দিল্লীতে নরেন্দ্রমণ্ডলের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দেশীয় রাজ্যসমূহের খাদ্যাসমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। নরেন্দ্রমণ্ডলের চ্যান্সেলার ভূপালের নবাব বাহাদুর ভারতীয় নেতৃগণের সহিত তাঁহার যে সকল আলোচনা হয় অধিবেশনে তাহা বিবৃত করেন। অধিবেশনের প্রাক্কালে নবাব বাহাদুর এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে গান্ধী ও জিন্না উভয়ই তাঁহার বহুদিনের বন্ধু। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একটি আপোষ আনয়নের জন্য তিনি সর্ব্বদাই আগ্রহশীল। তিনি আরও বলেন যে ভারত যাহাতে বৈদেশিক অধীনতা পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীন হইতে পারে ভারতীয় নৃপতিগণ সর্ব্বদাই তাহা কামনা করেন।

ত্রিবাঙ্কুরে থোরিয়াম প্রাপ্তি—

থোরিয়াম একটি মূল্যবান এবং বিরল মৌলিক পদার্থ। সুবিধাজনক পরিবেশে ইহা হইতে আণবিক শক্তি বাহির করা সম্ভব হইতে পারে; ইহার তেজবিকিরণের শক্তিও প্রচুর। সম্প্রতি ত্রিবাঙ্কুরের বালুকার সহিত থোরিয়াম মিশ্রিত পাওয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে ত্রিবাঙ্কুরের পাহাড় পর্ব্বতে এই জাতীয় বালুকা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। ভাটনগর, ভাভা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ লইয়া গঠিত একটি কমিটি ত্রিবাঙ্কুরের খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছেন।

ভারতীয় সেনার বিস্তৃতি—

ভারতের প্রধান সেনাপতি স্যার ক্লড অচিনলেক এক কনফারেন্স উপলক্ষ্যে বিলাত গিয়াছেন। সেখানে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় বাহিনী উন্নতিকল্পে বিবিধ পরিবর্ত্তনের কথা বলেন। প্রথমতঃ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তিনটি ছয় ইঞ্চি কামান বিশিষ্ট যুদ্ধ জাহাজ আনয়ন ভারতীয় নৌবাহিনী বিস্তৃততর করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় বিমান বাহিনীতে আরও জঙ্গী ও

বোমারু বিমানের ব্যবস্থা করিয়া ইহাকে আধুনিক ভাবে সজ্জিত করা হইবে। তৃতীয়তঃ, স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীতে অধিক সংখ্যায় ভারতীয় অফিসার নিয়োগ করা হইবে। ইহার ফলে ভারতীয় স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী একটি প্রথম শ্রেণীর শক্তিশালী বাহিনীতে রূপান্তরিত হইবে এবং পৃথিবীর যে কোনও দেশের যুদ্ধ বাহিনীর সমকক্ষ হইবে।

ভারতের উত্তরাধিকার কর—

ভারত সরকার ভারতে উত্তরাধিকার কর স্থাপনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় পরিষদে একটি বিল উত্থাপন করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি রাখিয়া মারা গেলে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ এই সম্পত্তির মালিক বলিয়া পরিগণিত হইতে চাহিলে তাঁহাদিগকে সম্পত্তির একটি বিশিষ্ট অংশ গভর্ণমেণ্টকে কর হিসাবে দিতে হইবে। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এই কর বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে। ভারতবর্ষে এই কর নূতন; কিন্তু ২১ বৎসর পূর্ব্বে "ভারতীয় কর তদন্ত কমিটি" এইরূপ একটি কর ধার্য্যের সুপারিশ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বিলে এক লক্ষ টাকা বা তদধিক মূল্যের সম্পত্তির উপর এই কর ধার্য্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহা কৃষি ব্যতীত অন্য প্রকার সম্পত্তির উপর ধার্য্য করা যাইবে, কৃষিজাত সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার কর ধার্য্যের ক্ষমতা প্রদেশ সমূহকে দেওয়া হইয়াছে। প্রস্তাব করা হইয়াছে যে এই কর হইতে যে টাকা আয় হইবে ভারত সরকার তাহা প্রদেশ সমূহের মধ্যে জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়ের নিমিত্ত বণ্টন করিয়া দিবেন।

ভারতে ধনবৈষম্য অত্যন্ত অধিক। এই করের ভার ধনীদিগকেই বহন করিতে হইবে এবং দরিদ্র জনসাধারণই প্রধানতঃ ইহার ফলভাগী হইবে। সুতরাং ইহা দ্বারা ধনবৈষম্য কতক পরিমাণে দূরীভূত হইবে। আমরা এই কর সমর্থন করি।

সাময়িকপ্রসঙ্গ

ভারতসরকারের ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারতসরকার ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট পেশ করিয়াছেন। ইহাই যুদ্ধোত্তর প্রথম বাজেট। আগামী বৎসরে ৩০৭ কোটি টাকা আয় এবং ৩৫৫ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে, সুতরাং ৪৮ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। চলতি বৎসরে (১৯৪৫-৪৬) মোট ১৪৪ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। দেশরক্ষা খাতে চলতি বৎসরে ৩২৫ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল, আগামী বৎসরে ইহা কমাইয়া ২৪৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

আগামী বৎসরে কতকগুলি কর বাড়াইবার বা কমাইবার প্রস্তাব অর্থসচিব করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান—(১) ১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ্চের পর হইতে

অতিরিক্ত মুনাফা কর রহিত করা হইবে; (২) কেরোসিন তৈলের শুল্ক গ্যালন প্রতি ৪ আনা ৬ পাই হইতে কমাইয়া ৩ আনা [illegible] পাই করা হইবে (ইহা পরে আরও কমাইয়া [illegible] আনা করা হইয়াছে); (৩) আমদানী করা সুপারীর উপর শুল্কের পরিমাণ বাড়াইয়া পাউণ্ড প্রতি ৫ আনা ৬ পাই করা হইবে, (৪) আমদানী করা স্বর্ণ ও স্বর্ণ মুদ্রার উপর তোলা প্রতি ২৫৲ টাকা শুল্ক ধার্য্য করা হইবে; (৫) অল্প আয়ের উপর আয়করের হার কমান হইবে এবং পনর হাজার টাকার অধিক আয়ের উপর আয়করের হার বাড়ান হইবে; এবং (৬) কোম্পানীর উপর আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের হার কমান হইবে।

ফাইনান্স বিল আলোচনার প্রস্তাবকালে অর্থসচিব আরও কতকগুলি ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাতে বলা হইয়াছে যে পোষ্টকার্ডের মূল্য কমাইয়া তিন পয়সা হইতে দুই পয়সা করা হইবে, দেশলাইয়ের মূল্য কমাইয়া দুই পয়সা করা হইবে এবং কেরোসিন তৈলের উপর শুল্ক গ্যালন প্রতি দুই পয়সা কমান হইবে।

অর্থসচিবের বাজেট নানা দিক দিয়াই প্রশংসনীয়। দরিদ্র জনসাধারণের করভার লাঘবের কিছু চেষ্টা ইহাতে করা হইয়াছে। কেরোসিন, পোষ্টকার্ড ও দেশলাইয়ের মূল্য কমাইবার ব্যবস্থা করায় জনসাধারণ উপকৃত হইবে। সুপারীর উপর আমদানী শুল্ক না বাড়াইলে আমরা আরও সুখী হইতাম, কেননা, সুপারী দরিদ্র জনসাধারণের একটি নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু। অতিরিক্ত মুনাফাকর তুলিয়া দিবার ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের ও শিল্পপ্রসারের সহায়তা হইবে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় এই কর একেবারে তুলিয়া না দিয়া ইহার হার আপাততঃ কমাইয়া দিলে ভাল হইত।

মোটের উপর অর্থসচিবকে দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলিয়াই মনে হয়। সরকারী করের হার অনুসন্ধানের নিমিত্ত অর্থসচিব একটি কর-অনুসন্ধান-কমিটি (Taxation Enquiry Committee) নিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা আশা করি যে এই কমিটি স্থাপিত হইলে দরিদ্রের করভার লাঘব হইয়া ধনীর নিকট হইতে উচ্চতর হারে কর আদায়ের ব্যবস্থা হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব

গত ৯ই মার্চ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব (Convocation) হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এই উৎসবে বক্তৃতা দিবার জন্য বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সমগ্র বিশ্বে আজ পরিবর্ত্তনের যুগ আসিয়াছে, এই যুগ-সন্ধিক্ষণে যে নবভারত গড়িয়া উঠিবে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ তাহাতে কি অংশ গ্রহণ করিবে পণ্ডিত নেহেরু তৎসম্বন্ধে আলোচনা করেন। ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীর অন্ন বস্ত্র ও বাসস্থান সমস্যা, তাহাদিগের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সভ্য জীবনযাপনের উপকরণ জোগাইবার সমস্যা আজ ভারতের প্রধান সমস্যা। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে এই সকল সমস্যা সমাধানের উপযোগী করিয়া ছাত্র-সমাজকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইউরোপ এতদিন কেবল অস্ত্রবলে নহে—তাহার জ্ঞানবিজ্ঞানের বলে পৃথিবীর নেতৃত্ব করিয়াছে, এশিয়া এতদিন সুপ্ত ছিল, কিন্তু আজ এশিয়ার সকল দেশেই নবজাগরণের সূচনা দেখা দিয়াছে। ভারত এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত; একদিন ভারত হইতে জ্ঞানের বর্ত্তিকা এসিয়ার বিভিন্ন দেশে আলো প্রদান করিয়াছিল; ভারতকে আবার সকলের সঙ্গে যুক্ত হইয়া চলিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার বাংলার গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে কোনও দেশের শিক্ষার উপরই সেই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। ভারতবর্ষে যখন প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় তখন আশা করা গিয়াছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের সহায়ক হইবেন; কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় নাই। আজও দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারলাভ করে নাই। শিশুদের শিক্ষার বিরাট দায়িত্ব সামান্যবেতনভোগী সামান্যশিক্ষিত শিক্ষকগণের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। চ্যান্সেলার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত যুবকগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে তাঁহারা যেন নিজ নিজ শিক্ষাকে শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রয়োজনে না লাগাইয়া দেশের জনসাধারণের উপকারার্থ নিয়োগ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর রাধাবিনোদ পাল ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীগণকে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ দেন, তাহাদিগের মস্তিষ্ক, হৃদয় এবং ইচ্ছাশক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে বলেন।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতকে স্বাধীনতা দানের সংকল্প ঘোষণা—

গত ১৫ই মার্চ্চ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার এট্‌লী একটি উল্লেখযোগ্য ঘোষণা করেন। ভারতবর্ষ যত শীঘ্র সম্ভব যাহাতে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে সে বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য মন্ত্রিসভার তিন জন সদস্য ভারতে আসিতেছেন। তিনি বলেন যে ভারতবর্ষে সম্প্রদায়গত ও অন্যান্য বহুবিধ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তা বোধ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ দুইবার স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে রক্তপাত করিয়াছে; আজ তাহারা নিজেদের জন্য স্বাধীনতা দাবী করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। তিনি আশা করেন যে স্বাধীন ভারত ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিতে রাজী হইবে, কিন্তু যদি ভারত তাহাতে রাজী না হয় তাহা হইলেও ইংলণ্ডের আপত্তি করা চলিবে না। ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের অধিকার সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সচেতন; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সংখ্যাগরিষ্ঠের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করিতে দিবেন না।

মিষ্টার এট্‌লীর বক্তৃতায় আন্তরিকতার সুর আছে; আমরা আশা করি ভারতবর্ষ এইবার সত্যসত্যই স্বাধীনতা লাভ করিবে।

খেলাধূলা

হকি

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব দল ২—০ গোলে বাংলা দলকে পরাজিত করিয়াছেন। খেলাটি গত ৭ই মার্চ্চ ক্যালকাটা মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। পাঞ্জাব দল খেলায় বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন এবং তাঁহাদের জয়লাভ সঙ্গতই হইয়াছে। বলবীর সিংহ ও আজিজ প্রত্যেকে একটি করিয়া গোল করেন।

হকি লীগ খেলা চলিতেছে। গত ১৬ই মার্চ্চ মোহনবাগান ও ইষ্ট বেঙ্গল দলের হকি খেলা হয়। ইহা দেখিতে বহু জনসমাগম হয়। মোহনবাগান দল ৩—০ গোলে জয়লাভ করেন। দলের এ, মুখার্জ্জি, কুশল সিং এবং দীনদয়াল প্রত্যেকে একটি করিয়া গোল করেন। এ পর্য্যন্ত মোহনবাগান লীগ কোঠায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন।

ক্রিকেট

গত ২৩শে হইতে ২৭শে মার্চ্চ ইন্দোরে রঞ্জী ট্রফির ফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। হোলকার ও বরোদা দল এই খেলায় প্রতিযোগিতা করেন। হোলকার দল প্রথম ব্যাট করিয়া প্রথম ইনিংসে ৩৪২ রাণ করেন; ইহার মধ্যে লেঃ কর্ণেল সি, কে, নাইডুর ২০০ রাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বরোদা দল প্রথম ইনিংসে ১৯৮ রাণ তোলেন; হাজারী আউট না হইয়া ৮৩ রাণ করেন। হোলকার দল ১৪৪ রাণে অগ্রগামী থাকিয়া দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করেন এবং ২৭৩ রাণে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করেন। বরোদা দল দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৬১ রাণ করেন। ফলে বরোদা দল ৫৬ রাণে পরাজিত হন। লেঃ কর্ণেল নাইডুর কৃতিত্বের জন্যই হোলকার দল রঞ্জী প্রতিযোগিতায় বিজয়লাভ করিলেন।

পুস্তক-সমালোচনা

কবিতা ১৩৫০—কবি শামসুদ্দিন রচিত। চয়নিকা পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। দাম বার আনা। এই পুস্তিকায় ছোট ছোট বাইশটী কবিতা আছে। ইহাতে কবি সাংকেতিক ভাষায় ১৩৫০এর মন্বন্তর উপলক্ষ্য করিয়া নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। "১৩৫০ সাল" শীর্ষক প্রথম কবিতায়

কবির মূল সুরটী ধ্বনিত হইয়াছে।

"ছায়ায় ছায়ায় ঘোরে মৃত্যুদূত দুরন্ত নেশায়
তীক্ষ্ণ ধারাল দাঁত করে শুধু তীব্র পরিহাস।"

কবিতাগুলি স্থানে স্থানে পাঠকের মর্ম্মস্পর্শ করে। ধনীরা যখন প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বিলাস ব্যসনে মত্ত, তখন এক এক মুষ্টি অন্নের জন্য যে সর্বহারার দল পথে প্রান্তরে তিলে তিলে প্রাণ দিল তারা যেন এ পৃথিবীর কেহ নয়। এই মৃত ও মুমূর্ষদের অন্তরের বেদনা কবির লেখনীমুখে ভাষা পাইয়াছে।

সাংকেতিক ভাষার প্রয়োগে কবিতাগুলি অনেকস্থলে দুর্বোধ্য হইয়াছে। কবি ইংগিতে যাহা বলিতে চাহেন তাহা সাধারণ পাঠক যে বুঝিবেন এমন ভরসা হয় না। আমরা একটীমাত্র উদাহরণ তুলিয়া দিলাম—

"উষ্ণ ধমনীর রক্ত কোথায় ছুটে
অনাগত দিনে রবে কি নিলীন তারা
চোরা বালুকায় বন্ধনভয় টুটে
পূর্ব তোরণে ছুটাতে অগ্নিপার ?"

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত এম্-এ কর্তৃক সম্পাদিত ও কুচবিহার ষ্টেট্ প্রেস হইতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত।

কুচবিহার দর্পণ

দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৫২

সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত এম-এ

সূচীপত্র

কার্ত্তিক—চৈত্র

বিষয়-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

লেখক-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

লেখক	বিষয়	পত্রাঙ্ক